মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জন্মশতবর্ষে

বাংলা একাডেমীর

সশ্রদ্ধ নিবেদন

জন্ম : ১৯০৮ মৃত্যু : ১৯৫৬

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
৩৬ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৫ ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮
[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা]

বাএপ ৬৬৩
[২০০৮–২০০৯ ॥ ভাসাসপ : পত্রিকা : ৫]

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল হাই
পরিচালক
ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

লোগো
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ
রাজিব রায়

মূল্য : তিনশত টাকা

UTTARADHIKAR : Literary Quarterly Vol-3 : Year 36 (July 2008 - September 2008) Editor : Dr. Syed Mohammad Shahed, Executive Editor : Dr. Sarker Amin. Published by Bangla Academy Dhaka-1000, Bangladesh. Price : Taka Three Hundred only.

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৫/ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

উত্তরাধিকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা উত্তরাধিকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা উত্তরাধিকার

সূ চি প ত্র

কিশোর গল্প

শৈশব স্মৃতি

প্রবন্ধ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অশ্রুকুমার সিকদার
আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, রণেশ দাশগুপ্ত
গণশক্তি শারদ সংখ্যা, ১৪১৫
পথের শেষ কোথায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব
পরিচয়
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : কায়েস আহমেদ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : ভূঁইয়া ইকবাল
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস, জলার্ক
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
মানিক বিচিত্রা, সম্পাদক : বিশ্বনাথ দে
লেখকের কথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

স ম্পা দ কী য়

'উত্তরাধিকার'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) প্রতি শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা কথাশিল্পে বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার সমন্বয় সাধনে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মার্কসীয় সমাজবীক্ষা— বিশ শতকের মননশীলতায় সর্বাধিক প্রভাববিস্তারী এই দুই দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বোধকে তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। জীবন অনুধ্যানে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরো গভীর, তীক্ষ্ণ ও যুক্তিশাসিত হতে পেরেছিল। ফলে তাঁর সৃষ্টিশীলতায় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল পরিমিতিবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ। মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয় জীবনবিশ্লেষণে তাঁর ভিন্নস্বাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কথাশিল্পে নতুনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। ব্যতিক্রমধর্মী এই মহান সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন করে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিষয়টিকে বাংলা একাডেমী কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছে।

এ উপলক্ষে নিবেদিত 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় দেশের সৃষ্টিশীল ও মননশীল ধারার একচল্লিশজন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের রচনা স্থান পেয়েছে। বাংলা একাডেমীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই তাঁরা মানিক-মূল্যায়নে এগিয়ে এসেছেন। মানিকের প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশেষ সংখ্যাটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় এ যাবৎকালে প্রকাশিত মানিক সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশটি বাছাই করা লেখা পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এসব রচনা মানিক-অনুরাগী পাঠককুলের মনে এই লেখক সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। এছাড়া একালের পাঠকদের কথা ভেবে এই বিশেষ সংখ্যাটিতে মানিকের বিভিন্ন ধরনের রচনার প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ পত্রস্থ করা হল। এর মধ্যে রয়েছে *খুনী*— যে উপন্যাসটি পত্রিকায় মুদ্রণের (১৯৪৩-৪৫) পর কখনও গ্রন্থাকারে বের হয় নি, এমনকি গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক তেরো খণ্ডে প্রকাশিত *মানিক গ্রন্থাবলী*তেও (১৯৬৩-৭৬) অন্তর্ভুক্ত হয় নি; কেবল ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*-এর একাদশ খণ্ডে এটি প্রথম সংকলিত হয়েছে।

পত্রিকায় লেখা মুদ্রণের ক্ষেত্রে লেখক-নামকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন এবং যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। উপদেষ্টা সম্পাদকদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হলুদ নদী সবুজ বন : শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণীশত্রু বনাম শ্রেণী আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

অনন্ত মাহফুজ

হলুদ নদী সবুজ বন উপন্যাসের শুরুতে একটি আশার বাণী ধ্বনিত হলে পাঠক সচকিত হন এই ভেবে যে *পদ্মানদীর মাঝি*তে হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপ যে আশার সঞ্চার করেছিল, যে ময়না দ্বীপের পরবর্তী জীবন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমাদের আর জানা হয় না, তার কোনো বাস্তবিক উপস্থাপন হয়ত পাওয়া যাবে *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসে। সেই আশা আমাদের লেখক শুনিয়ে দেন, 'ওদের যেন জগৎ-সংসারকে জানিয়ে দেবার দায় যে, প্রাণীরা রাত্রির অবসরে একটু ঘুমিয়েছে, তারা মরে নি, তারা আবার জাগবে।' (*হলুদ নদী সবুজ বন*) এরকম একটি প্রতীকী মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। এই প্রাণিকুল কেবল অরণ্যচারী নয়, এরা ভাড়াটে শিকারি ঈশ্বরসহ এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের দল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন যে কয়টি উপন্যাসে ধরা পড়ে *হলুদ নদী সবুজ বন* তাদের মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বিশ্বাস উপস্থাপনের যে শৈল্পিক পথটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা পাঠকদের আশান্বিত করে কখনো কখনো তবে আলোচিত উপন্যাসে পাঠক আশাহতও হন গল্পের সমাপ্তিতে। অবশ্য এই দায়টি লেখক স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেন। [illegible]তলার মানুষ, জীবন ও জীবিকা, উৎপাদন উপায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্ক এবং সর্বোপরি প্রকৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামের একেবারেই সাদামাটা বাস্তব জীবনের ছবি আঁকেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক উপন্যাসের শুরুতে শ্রেণীবিভাজিত যে সমাজের চিত্র উপস্থাপন করেন তাতে শোষণের চূড়ান্ত পর্যায় বিবেচনায় এনে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকে। এটাও সত্য যে মানিক মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করবার পরও রাজনৈতিক শ্লোগান সর্বস্ব কোনো উপন্যাস লেখেন নি। সে দায়ও বোধ হয় লেখকের নয়। লেখক তার উপলব্ধির জায়গাটা কেবল পরিষ্কার করেন পাঠকের সামনে। তত্ত্ব বা থিওরি খুঁজে বের করবার দায় পাঠকের। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহজে চেনা যায় বলেই হয়ত-বা কাহিনীর শুরুতেই আর কিছু না হোক কেতুপুরের বাস্তবতা থেকে বের হয়ে আশাবাদীরা ময়না দ্বীপ সন্ধান করে বসেন। আলোচিত উপন্যাসে মানুষের বিজয়ের আশা-করা পাঠকগণ অবাক হয়ে লক্ষ করেন ঈশ্বর কিংবা তার আশপাশের মানুষগুলো কী এক অজ্ঞাত কারণে সম্ভাবনা থাকার পরও আন্দোলনের জন্য সংঘটিত হতে পারে না।

ঈশ্বর খেটে খাওয়া মানুষ। তাকে ঘিরে আবর্তিত হয় *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসের ঘটনা। সে ভালো শিকার করতে পারে। ফলে মাঝেমধ্যে ভাড়ায় শিকারে যায় ইংরেজ সাহেব বা দেশীয় প্রভুদের সঙ্গে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটা বন্দুক সঙ্গে থাকে ঈশ্বরের। এরকম একটি শিকারের ঘটনা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। লক্ষণের

গরু মেরে পালিয়ে যাওয়া বাঘটা আবার ফিরে আসলে গুলি চালায় তিনজন– প্রভাস, রবার্টসন আর ঈশ্বর। বাঘ মারার কৃতিত্বের দাবি নিয়ে প্রভাস এবং রবার্টসনের মধ্যে বচসা হয়ে যাবার পর গুলির ধরন পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয় বাঘটা আসলে মরেছিল ঈশ্বরের গুলিতে। বাঘ মারা নিয়ে রবার্টসন এবং প্রভাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যে ঝগড়া হয় তা শ্রেণীদ্বন্দ্ব নয়; একান্তই ব্যক্তিগত ঝগড়া। পরে তাদের এই বিবাদ মিটেও যায়। আবারো তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে প্রভাসের লঞ্চ ধার করার ঘটনা নিয়ে। শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিয়ে আসা অসন্তোষের আঁচ পাবার পর জনসনদের সহায়তায় আবার দুইজন একত্র হয়। তাদের স্বার্থের জায়গায় আঘাত আসার মতো ঘটনা ঘটবার আগে প্রভাস বা রবার্টসনদের বিবাদ থাকে না। উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হলে পাঠক লক্ষ করেন মূল দ্বন্দ্ব আসলে ঈশ্বরসহ খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ আর প্রভাস-রবার্টসনদের মধ্যে।

সুন্দরবনঘেঁষা সোনাতলা গ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চেতনার একটি প্রতীকী অঞ্চল যেখানে গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেঙে গড়ে উঠতে থাকে মিল-কারখানা। পাল্টে যেতে থাকে চিরচেনা বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবন। সোনাতলায় এসে বাসা বাঁধে রবার্টসন, প্রভাস, জনসন এবং অন্যরা। তবে মানিক গ্রামটিকে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপনের ত্রুটি রাখেন না। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার আদর্শিক জায়গা হয়ে ওঠে সোনাতলা যা ভারত উপমহাদেশের চিরন্তন এবং শত শত বছরের ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে। যে ঐতিহ্যের অনেকটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খেসারত হিসেবে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। তবু বাংলার মানুষের মনোভূমি প্রচলিত ধর্মাচারের সীমানা পার হয়ে মানুষের সার্বজনীন ধর্মকে লালন করে। মানিকের সেই উপলব্ধির জায়গায় কোনো ঘাটতি ছিল না। মুসলমান বা হিন্দু ধর্মপরিচয় অধিকাংশ লেখকের কাছে বড় বিষয় না হলেও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সমাজ ও ধর্মীয় বিষয় তাদের লেখায় প্রাধান্য পেয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। মানিককে সে রকম দায় থেকে আলাদা করে ফেলা যায়। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে হোসেন মিয়াকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অনেকটাই বিপ্লবী চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করেন মানিক। আলোচ্য উপন্যাসে শান সাহেবের মতো জনহিতৈষী চরিত্রও পাই আমরা। ঈশ্বরের বিপদের দিনে– যখন তার চুলোয় আগুন জ্বলে না, রবার্টসন আর প্রভাসের শত্রুতার জের হিসেবে যখন সে না খেয়ে মরবার জোগাড় তখন শান সাহেব তার খেয়া ঘাটে ঈশ্বরের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বা বিদ্বেষ এখানে নেই। 'বন ও নদীর এই আদিম বুনো অঞ্চলে দু-একটা শহর গড়ে উঠে থাক, স্বার্থান্বেষীদের প্রাণপণ চেষ্টায় এখানে ওখানে দু-একটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে গিয়ে থাক– এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান বহুদিন থেকে পীর আর দেবদেবীকে মিলিয়ে মিশিয়ে ধর্মকর্ম করে আসছে।' (*হলুদ নদী সবুজ বন*:)। তাই পীরের দরগায় মানত করা খাবার অনায়াসে সারাদিনের খাবারের জোগাড় হিসেবে পেয়ে ঈশ্বরের অন্নচিন্তা ঘুচে যায়। মুসলমানের পীরের দরগার খাবারকে তারা অবহেলা করে না। এলাকার সবাই মিলে চাঁদা তোলে ঈশ্বরের পোড়া ভিটায় নতুন ঘর তুলে দেয়। এই একতা– হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদহীন, কাহিনীর শেষে যেন কোনো কাজে আসে না। সোজা হয়ে দাঁড়াবার, প্রতিবাদ করবার অনেক কারণ থাকলেও তা আর হয়ে ওঠে না। এখানেই মানিককে আলাদা করে চিনবার প্রয়োজন হয়। সোনাতলায় শ্রেণীবিপ্লব না হবার যুক্তিসঙ্গত দিকগুলোই উপন্যাসের কাহিনীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের চাকরি যাবার পর কারখানার অন্য শ্রমিকরা যখন তার সঙ্গে থেকে এর প্রতিবাদ জানাতে চায়, তখন

ঈশ্বরই তাদের বারণ করে। এই বারণ করবার পিছনে ঈশ্বর যতই যুক্তি খুঁজুক, মানিক নিজে হয়ত বোঝাতে চান এখানে, এই আধা শহর আধা গ্রামে শ্রেণীআন্দোলনের মতো কোনো প্লাটফরম দাঁড় করানো মুশকিল। যে দোষ ঈশ্বরের ওপর চাপানো হয়, তার বহুগুণ বেশি দোষ রবার্টসন আর প্রভাস করলেও ঈশ্বর কেন সব দায়ভার নিয়ে অন্যদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায় না, তা পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। এখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের একতা এবং সংঘবদ্ধ হবার নজির থাকলেও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার মতো জায়গায় আসতে পারে না শোষিত শ্রেণী। সংগ্রামের ইতিহাস এই অঞ্চলে ঘটে না।

প্রায় সবাই মনে করেন পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য প্রথমবারের মতো অস্তমিত হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ইংরেজদের হাতে চলে যায় বাংলা শাসনের ক্ষমতা। বিষয়টির সঙ্গে অনেকেই একমত পোষণ করেন না। তারা মনে করেন বাংলা মূলত হাজার বছর ধরেই পরাধীন। আলীবর্দী খাঁ এই বাংলার সন্তান নন। তিনি তার মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন তারই ভাইয়ের সন্তানদের সঙ্গে। বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগও ছিল না। ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগ ইংরেজ বণিকরা নিয়েছিল। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা ছিল এরকম অনেকেই ইন্ধন জুগিয়েছিল এতে। আলীবর্দী খাঁ বা তার নাতি সিরাজদ্দৌলা কি বাংলায় কথা বলতেন? বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা শাসক তারা নন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাসের জন্মবৃত্তান্ত বলতে গিয়ে এররকম একটি বিতর্কের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন পাঠকদের। প্রভাস এবং রবার্টসন একই শ্রেণীস্বার্থ লালন করে। রবার্টসন বিদেশী এটা সবাই জানে। তবে প্রভাসের বিষয়টি সুরাহা করে উঠতে পারে না এলাকাবাসী। সোনাতলার 'সকলে জানত কোনো বংশের রক্তধারায় নতুন কিছু ঢোকাতে পারে শুধু পুরুষ,...আশ্চর্য এই যে, পুরোনো রূপকথা উপকথায় ছেলে ছেলে করে পাগল রাজাদের নানা বিচিত্র উপায়ে পুত্রলাভের গল্প-জানা মানুষগুলির কল্পনাতেও আসে না যে, ইরানি উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজের ধর্মপত্নীর সন্তান বলে চালিয়ে দেওয়া মোটেই কঠিন বা অসম্ভব ছিল না।" (*হলুদ নদী সবুজ বন*)। সুতরাং জানা হয়ে যায় প্রভাস কোনো ইরানি নারীর গর্ভজাত ইরানি কোনো চাকর-বাকরের সন্তান। সেই সূত্রে প্রভাস আর রবার্টসনের মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য নেই। সোনাতলায় একটি ক্লাবঘর নির্মাণে তাই দেশীয় এলিটদের রাখা হয় যারা একই স্বার্থ সংরক্ষণ করে। নেটিভদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অবিকল দুর্গের মতো করে একটি ক্লাবঘর নির্মাণের বুদ্ধিটা প্রথমে আসে প্রবীণ জেটকিনসের মাথায়।

বাঘ মারার কৃতিত্বের দাবি প্রভাস বা রবার্টসন কেউ ছাড়তে না চাইলে কৌশলে গোপনে টাকার বিনিময়ে কৃতিত্ব কিনে নিতে চায় দু'জনেই। সুখেন্দুর মাধ্যমে প্রথমে দুইশত তিরিশ টাকার বিনিময়ে রবার্টসনই ঈশ্বরের কাছ থেকে লিখিয়ে নেয় বাঘটি আসলে ঈশ্বরের গুলিতে মরেনি, মরেছে রবার্টসনের গুলিতে। পরে প্রভাসও কিনে। এক কৃতিত্ব দুইজনের কাছে বিক্রি করার পশ্চাতে ঈশ্বরের একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে-স্ত্রী গৌরীকে বাঁচানো। গৌরীর অসুখ সে ভালো করে। তবে এর ঋণ ঈশ্বরকে শোধ দিতে হয়। বিস্ময়ের কারণ থাকে না যে একে একে ঈশ্বরের সব চুরি হবে, তার ঘর পুড়বে আগুনে এবং শরীরের ওপর আঘাতও আসবে। চাকরিটাও যাবে তার। গৌরীকে হাসপাতালে দেখে আসার পর রাস্তায় প্রভাস আর রবার্টসনকে একসঙ্গে পথ চলতে

দেখে ঈশ্বর এরকম আন্দাজ করেছিল যে তার নিস্তার নেই। হয়ত পাঠকই ভাবেননি যে এতটা মাশুল তাকে গুনতে হবে।

'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস' (*কমিউনিস্ট ইশতেহার: কার্ল মার্কস, ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস*)। এবং 'প্রত্যেকটা শ্রেণীসংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম' (প্রাগুক্ত)। ঈশ্বরের চাকরি হারানো নিয়ে একটা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলে আশা করবার কারণ থাকে, একটা লড়াই জমবে। জমে না, কারণ লড়াই জমাবার মতো রাজনৈতিক বাস্তবতা থাকলেও কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সংঘটিত হবার বাস্তবিক উপাদানগুলোর অভাব থাকে বলে। রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলে যে সচেতনতা দরকার হয় তারও অভাব এই উপন্যাসের কাহিনীতে অনুপস্থিত থাকে। অথচ ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশরাজের শেষ দশকগুলোতে তখন টালমাটাল অবস্থা। বাংলার আনাচে-কানাচে তখন গড়ে উঠতে শুরু করেছে অনেক গোপন সংগঠন যারা গান্ধীর অহিংস নীতি পরিহার করে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। এসব সংগঠনের অনেকেই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলোর কোনো ঘটনা কেন এই উপন্যাসের কোথাও ছুঁয়ে গেল না তাও ভাববার দাবি রাখে। একটি যুক্তি হয়ত দাঁড় করানো যায়– ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন কোনোক্রমেই শ্রেণীআন্দোলন নয়। ফলে এই অঞ্চলে কোনো নেতা তৈরি হয় না। ঈশ্বরকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি ঔপন্যাসিক কেন করেননি তার কিছু ব্যাখ্যা এখানে থেকে যায়। কেউ হয়ত বলতে পারেন, শেষ অবধি শোষক এবং শোষিতের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিলে কোনো এক পক্ষকে জিতিয়ে দেবার দায় থাকে। লড়াইয়ে যে কোনো একটা পক্ষ বিজয়ী হয়, আরেক পক্ষ হারে। বিত্তহীনদের জিতিয়ে দিলে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত একটি কল্পকাহিনীর আকার ধারণ করত। মানিক সচেতনভাবে মেলোড্রামাটিক উপাদানগুলো পরিহার করেছেন। এই যুক্তিই মেনে নিতে হবে। মানতে হবে এজন্য যে, এখানকার সামাজিক বাস্তবতা পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে। তবে মানিকের কাছে পাঠকের আশা অন্যরকম। নদীর কিনারে সন্ধ্যার পর হাঁটতে গেলে নদীর পাড় ভেঙে নদীতে পড়ে গেলে প্রভাসকে বাঁচায় ঈশ্বরই। ঈশ্বরকে সাহায্য করতে আসা বংশীর মন্তব্য, 'নদী থেকে তুলে আনতে গেলি কেন বোকা হাঁদা? নদীতে ভেসে যেত– তোর কোনো দায় থাকত?' (*হলুদ নদী সবুজ বন*)।

ঈশ্বরের কী দায় থাকত? সে কি মালিকদের টিকিয়ে রাখবার দায়? এখানে মালিক–শ্রমিকের সম্পর্ক স্পষ্ট। তবু মানবিক দিক থেকে ঈশ্বর, আজিজ কিংবা শান সাহেব উৎপাদনের মালিকদের থেকে অনেক বেশি মানবিক। ঈশ্বর প্রভাসকে প্রাণে বাঁচিয়ে যে মানবিক দিকটি স্পষ্ট করে, ঈশ্বরকে তার বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি দিয়ে সে কাজটি কিন্তু করেনি প্রভাস। ঈশ্বরকে চাকরি দেবার পিছনে প্রভাসের অন্তত দুটো কারণ থাকতে পারে। লঞ্চ নিয়ে প্রভাস আর রবার্টসনের মধ্যে কিছুটা স্থায়ী হয়ে যাওয়া শত্রুতার ফলে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ঈশ্বরের মতো একজন পাকা শিকারি তার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সুযোগমতো একটা বাঘ মেরে নিজের বীরত্ব জাহির করা। দ্বিতীয় কাজটি ঈশ্বরকে নিয়ে প্রভাস ঠিকই করে এবং ঈশ্বরের গুলিতে বাঘ মরলেও প্রভাস সেই কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেয়। প্রভাসের বাড়ি পাহারার কাজটি হারাতে হয় বাঘ মারার পরই।

ঈশ্বরকে নিয়ে এবার খেলা জমে। প্রভাসের বাড়ির চাকরি হারাবার পর রবার্টসন তার কারখানায় চাকরি দেয় ঈশ্বরকে। কারখানার ফটকে সামরিক পোশাক পরে গেট পাহারা দেওয়া। রবার্টসন যে প্রভাসকে টেক্কা দেবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে

তা নিশ্চিত করে বলা যায়। আরও একটা উদ্দেশ্য থাকে রবার্টসনের। কিছুদিন ধরে শহরের কারখানাগুলোয় অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। কারখানা মালিকরা সেই খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যায়। বড় কোনো অঘটন ঘটবার আগে ঈশ্বর যাতে প্রাথমিক বিপর্যয় সামাল দিতে পারে, উদ্দেশ্য মূলত সেটিই। বাকিটা সামলাবে পুলিশ। আজিজ ঈশ্বরকে জানায়, 'এবার আর ছুটকো ব্যাপার নয় বাবা– মোরা আটঘাট বেঁধে নামছি। সবাই নামলে ইস্ট্রাইক হবে। নইলে কাজ নেই।' (*হলুদ নদী সবুজ বন*)। ঈশ্বরকে আজিজ মন্টারা সম্মান করে। তার কথায় অনেক লোক জমায়েত হয় মুহূর্তে। সুতরাং ঈশ্বরই পারবে প্রাথমিক কাজটুকু সেরে ফেলতে।

এই অঞ্চলের মালিক-শ্রমিক বা এলিট-নেটিভদের মাঝখানের এরকম একটি সম্পর্কের বাইরে আরও একটি সম্পর্ক আছে, আছে একটি সমাজব্যবস্থাও। যে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি আর আবহাওয়ার দ্বারা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বাস্তবতাকে বুঝেছিলেন। যতদূর সম্ভব শ্রেণীবিপ্লব নিয়ে যারা সরাসরি কাজ করেছেন, মার্কসীয় দর্শনের রাজনৈতিক রূপটি যারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখতে চেয়েছিলেন, তারা এই গূঢ় কথাটি বুঝতে পারেননি। ভারত উপমহাদেশে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা ছিল তা বাস্তব রূপ পায়নি এ কারণেই।

সুন্দরবনলাগোয়া এই জনপদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা ভারত উপমহাদেশের হাজার বছরের পুরনো সমাজের প্রতিচ্ছবি। অন্য দশটা শহর বা গ্রাম থেকে একে আলাদা করবার জো নেই। এই যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা এর বাইরে যাওয়া কতটা সম্ভব? প্রভাসের আদি ইতিহাস সকলের জানা থাকলেও সে এখন ভারতীয়, উৎপাদনের যন্ত্রটি তার হাতে। তার স্ত্রী বনানী খাঁটি বাঙালি। যে রবার্টসন হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে শহরের কারখানা চালায়, সে বিয়ে করেছে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে। এই অঞ্চলের বাসিন্দা লখার মা। মধ্যযৌবনের এই মহিলার দ্বিতীয়বার বিয়ে করে অপার সুখে থাকবার সম্ভাবনা থাকার পরও বিয়ে না করে গান গেয়ে আসর জমিয়ে উপার্জন করে দিন চালায়। লখার মা'র আসর জমানোর জন্য বনানী ত্রিপল আর বাতি দেয়, গৌরীর জন্য খাবার পাঠায়। বাগানের মালীর মাথা ফাটিয়ে নিজেই ডাক্তার এনে তার চিকিৎসা করায় বনানী। মানিক বলেন–

> একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী? বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষী মজুরদের হাজির করে ছককাটা গল্প রচনা করা?
>
> এতকাল সাহিত্যচর্চা করে আমার কাণ্ডজ্ঞান তাহলে নিশ্চয় লোপ পেয়েছে বলতে হবে।
>
> শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনো নেই, সোনার পাথর বাটির মতোই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।
>
> কথাটা ভুল বোঝা সম্ভব– আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি বলছি জীবনের কথা– শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হল– কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন?
>
> ঈশ্বর, আজিজরা থাকে এক স্তরে, প্রভাস, রবার্টসনরা আরেক স্তরে। তাই বলে কি জীবন তাদের সম্পর্কহীন?
>
> পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব?
>
> সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়? (*হলুদ নদী সবুজ বন*)।

উপন্যাসের মাঝখানে লেখকের এরকম বক্তব্য না থাকলেও এরকম একটি সিদ্ধান্তে আসতে পাঠকের তেমন কোনো বেগ পেতে হত না। তবু সহজ-সরল স্বীকারোক্তি উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় না। সুতরাং পিছন ফিরে গিয়ে আরেকটি নাতিদীর্ঘ উপলব্ধি টেনে আনা যায়–

> বড় ধর্মঘট কিন্তু ঘটবে ঘটবে করেও পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। অসন্তোষ ধোঁয়াচ্ছে প্রায় সকলের প্রাণেই। দাবি-দাওয়া আদায় আর অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের জন্যে লড়াই করার পক্ষে সমর্থনও আছে অধিকাংশ শ্রমিকের কিন্তু কাজের বেলা একটা অঙ্কে কিছুতেই জোটে আনা যাচ্ছে না।...ছুটকো হাঙ্গামা লেগেই থাকে– অসন্তোষের বারুদের স্তূপে তার প্রত্যেকটির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করার কথা। কিন্তু ভিজে বারুদের মতো বনের ছায়া মাটির মায়ায় নরম স্যাঁতসেঁতে প্রাণে তা ঘটে না। (*হলুদ নদী সবুজ বন*)।

এখানে এই হল বাস্তবতা। শ্রেণীবৈষম্যের সোনাতলায় জীবন সমান্তরাল বয়ে চলে না। শুধু জীবন নয়, জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাও যেন সমান্তরাল নয়। ঘটনার পরে পাল্টা ঘটনা ঘটে। সাহেব-মেমদের ঘটা করে বনে যাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেয় শান সাহেবের মেয়ে, রুস্তম আর লখার মা'র বনবিহার। প্রভাসের জন্মদিনের বেলেল্লাপনাকে হারিয়ে দেয় ঈশ্বরের বাড়ির আঙিনায় লখার মা'র আসর। তবু সব ঘটনা মিলিয়ে যে জীবন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভাজিত যে জীবন তা যেন একে অন্যের সঙ্গে ঘটনা-দুর্ঘটনায়, বন্ধুতা-শত্রুতায় মিলেমিশে বয়ে চলে। হয়ত এসব ঘটনা এলিটদের আর্টিফিসিয়াল অভিব্যক্তির বিপরীতে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলোর প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের ভিতর লুকিয়ে থাকা হাসি-কান্নার গভীর অনুভূতিকে তুলে নিয়ে আসে। শ্রমনির্ভর ঈশ্বর আজিজ, মন্টা, লখার মা'র জীবন-সংগ্রাম মিথ্যে নয়, মেকিও নয়। পার্থক্য এখানেই। অন্যদিকে যাপিত জীবনে নানা অলিগলির ভিতর সাহেব-মেমদের সম্পর্কের মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে লুকিয়ে থাকা হাজারো ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় শ্রমজীবীদের শোষণ ও বঞ্চনার গোপন এবং প্রকাশিত নানা উপকরণ। তবে তা 'ভিজে বারুদের মতো', কারো প্রাণে আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা রাখে না। এখানে বিদ্বেষেও জীবন জড়াজড়ি করে থাকে।

প্রকৃতিও এখানে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেয় না। কখনো কখনো প্রকৃতিই যেন শোষকের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় ঈশ্বর, আজিজ, মন্টা, মেঘনাদ নদেরচাঁদের বৌয়ের বিরুদ্ধে। গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায় বন্যার পানির তোড়।

শ্রমজীবী মানুষেরা সুখে-দুঃখে, বিপদে বা আনন্দে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। এটাই বাংলার আবহমান সংস্কৃতি। ঈশ্বর ঘর হারালে তার ঘর তোলা হয় চাঁদা তুলে। বন্যার পানির তোড় কিছুটা কমে আসলে নৌকা নিয়ে উদ্ধার অভিযানে বেরিয়ে পড়ে লখার মা, রোস্তম, নিরঞ্জন, ভূতনাথ। বনানীর তাগিদে প্রভাসও ব্যবস্থা করে নৌকার। জরাগ্রস্ত ঈশ্বরকে বাঁচাতে ছুটে আসে তাদের নৌকা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষগুলো কাছাকাছি আসে। লখার মা, পালা গেয়ে যার জীবন চলে, উপন্যাসের শেষে তাত্ত্বিক অথচ বুকভরা ভালোবাসার বাণীটি শোনায়, '...পায়ের নিচের মাটি তো সরে যায় নি। আয় সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে নৌকায় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক আর ভূমিকম্প হোক।' (*হলুদ নদী সবুজ বন*)। এবং এই উচ্চারণের মাধ্যমে লখার মা নিজেকে নিয়ে যায় এক অনন্য উচ্চতায় যে উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারে না ঈশ্বর, আজিজ কিংবা শান সাহেব। এখানে কহিনীর শেষপ্রান্তে লখার মা'র ভিতরে আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কোনো সমবেত জীবনের ইঙ্গিত রেখে যান মানিক।

অতসীমামী : প্রতিভা কি সহজাত হতে পারে না?

আনিসুল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী' কিংবা প্রথম দিককার উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য*-কে পরবর্তীকালে আর স্বীকার করতে চান নি। 'অতসীমামী' সম্পর্কে তাঁর পরিণত বয়সের মূল্যায়ন, 'রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখি নি–লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপানো নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।'

কী ছিল সেই বহু বিখ্যাত তর্ক?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সদ্য আইএসসি পাস করেছেন। তারপর ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, অঙ্কে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়তে। ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা চলছে। একজন সহপাঠী বললেন, নামকরা লেখক বা দলের লেখক না হলে পত্রিকাওয়ালারা লেখা ছাপায় না।

আরেকজন সহপাঠীর লেখা গল্প বিভিন্ন কাগজ থেকে ফিরে এসেছে অমনোনীত হয়ে। তিনি সম্পাদকদের উদ্দেশে কটুকাটব্য করতে লাগলেন।

মানিক বললেন, বাজে বকছ কেন? নামকরা লেখক বা দলের লেখক না হলে কাগজওয়ালারা লেখা ছাপে না! এটা হতে পারে না। ভালো লেখা হলে ছাপবে না কেন?

'আমারটা ছাপে নি।'

'তোমারটা ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপা হতো?'

'মুরোদ থাকলে লিখে ছাপিয়ে দেখাও।'

'ঠিক আছে। তাই হবে। আমি নিজে গল্প লিখব আর তিন মাসের মধ্যে কোনো বিখ্যাত কাগজে গল্প প্রকাশ করে দেখাব তোমাদের ধারণা কত ভুল।'

'বাজি?'

'বাজি।' এই বাজি ধরেই মানিক লিখে ফেললেন তার প্রথম গল্প 'অতসীমামী'। তিন মাস নয়, তিন দিনের মধ্যে। জমা দিয়ে এলেন তখনকার বিখ্যাত মাসিকপত্র 'বিচিত্রা'য়।

সেই গল্প পড়ে পত্রিকার সম্পাদক নিজে চলে এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডেরায়, লেখকের হাতে কুড়ি টাকা দিয়ে বললেন, আরও একটা গল্প চাই। (তথ্য-উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বিশ্বনাথ দে, *মানিক বিচিত্রা*, সাহিত্যম)

সেটা ১৯২৮ সালের কথা। তখন তার বয়স মাত্র ২০। ১৯২৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেন উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য*।

কুড়ি বছরের একজন মানুষের জীবনের ঝুলিতে কী বা এমন থাকতে পারে—অভিজ্ঞতা, জীবনোপলব্ধি? তার গদ্যের হাতটাই বা কতটা পরিপক্ব হতে পারে?

আমরা 'অতসীমামী'তে সেটাই মূলত নিকেশ করে দেখতে চাইব। পাশাপাশি হয়তো প্রায় একই সময়ে লিখিত বলে *দিবারাত্রির কাব্য*-র প্রসঙ্গও আসবে।

'অতসীমামী' গল্পের প্রথম বাক্যটি এই :

"যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, 'শোনবার মতো বটে!"

নাটকীয়তা দিয়ে শুরু হল মানিকের গল্প 'অতসীমামী'। যেহেতু প্রথম গল্প আর প্রথম প্রকাশিত রচনা, বলতে পারি, আকস্মিকতা দিয়ে শুরু হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের পথচলা।

কী শোনবার মতো? যতীন্দ্রনাথ রায় নামে একজন বংশীবাদকের বাঁশি বাজানো। মামার কাছ থেকে গল্পের কথক আরো বেশি করে শুনেছেন এই বংশীবাদনের প্রশংসা। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে তাই তিনি হাজির যতীনবাবুর বাড়ির সামনে। এ পর্যন্ত আসতে মানিক ব্যবহার করেছেন ছোট-বড় মোট ১০টি বাক্য। তাও আবার চারটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা। প্রথম বাক্যটি নিজেই একটা অনুচ্ছেদ।

এরপর শুরু হল বাড়ির বর্ণনা। খুব যে বিশদ তা নয়, তবে গোটা ১০/১২ বাক্য তো ব্যবহৃত হয়েছে সে 'ইট বার করা তিনকালের বুড়োর মতো নড়বড়ে ইটের খাঁচা'র বিবরণে। তবুও পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে সার্থকভাবে, নির্মিত হয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা। এরপর দেখা হবে যতীনবাবুর সঙ্গে। তার চেহারার বর্ণনা আমরা পাব। তাঁর কণ্ঠস্বরের বর্ণনাও। চেহারা আর কণ্ঠস্বর অবশ্য বিপরীতধর্মী। বর্ণনার এই বৈপরীত্য চরিত্রটিকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় বৈকি। এরপর বেশি করে পাব যতীনবাবুর চরিত্রের পরিচয়। দিলদরিয়া ধরনের লোক, সহজেই বাইরের লোককে আপন করে নেন। ঠাঁই দেন অন্দরে আর অন্তরে।

প্রায় ছ হাজার শব্দের গল্প। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *শ্রেষ্ঠ গল্প*/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮) সংস্করণে বেশ ছোট পয়েন্টে ১৬ পৃষ্ঠার গল্প। এই ১৬ পৃষ্ঠার প্রায় ৬ পৃষ্ঠা ধরে এরপর গল্পের কথক সুরেশ থাকবেন এই যতীনবাবুর বাড়িতে। একটা বিকাল থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটাবেন। যতীনবাবু বন্ধুর ভাগ্নে হিসেবে সুরেশকে ভাগ্নে ভাগ্নে বলে ডাকবেন। নিজের স্ত্রী অতসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। সেই সূত্রে অতসী সুরেশের তো মামী বটেই, গল্পপাঠকদের কাছেও অতসীমামী হয়ে উঠবে।

মামা দিলদরিয়া বটে, কিন্তু তার সামর্থ্য খুবই কম। ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলছে এই সংসার। ঘর কপর্দকশূন্য। মামা বেরোলেন দুটো পাওনা টাকা ফেরৎ পাবার আশায়। একবারে আক্ষরিক অর্থেই দুই টাকা। অতসীমামী আর সুরেশ রইল বাড়িতে।

এইবার অতসীমামীর কাছে গল্পচ্ছলে আমরা পাব যতীনের স্বভাবের খানিকটা পরিচয়। মামী বলছেন, 'ওই রকম স্বভাব ওর। বাক্সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজারে গেলেন। বললাম, থাক। জবাব দিলেন, কেন? রাস্তায় ভুবনবাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘুরে ঢুকলেন।'

অতসীমামীর কাছ থেকে সুরেশ জানতে পারবেন, সেই সূত্রে আমরাও, যে বাঁশি বাজালে যতীনের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তারপর পাওনা টাকা না নিয়েই ফিরবেন মামা। মামী বেরিয়ে গিয়ে কোত্থেকে গোটা চারেক রসগোল্লা আর দুটো সন্দেশ জোগাড় করে ফিরবেন। সেই মিষ্টি পুরোটা নিজে না খেয়ে মামা রেখে দিলেন মামীর জন্য। মানিক বাবু সংলাপ দিচ্ছেন মামার মুখে, "ওয়াক! কী বিশ্রী রসগোল্লা! রইল পড়ে খেয়ো তুমি, নয়তো ফেলে দিও। দেখি সন্দেশটা কেমন!'

মানিক লিখছেন, "অতসীমামীর চোখ ছলছল করে এল! মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না! কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির ঢিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।"

আমরা এই জায়গায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব টের পাব।

তারপর সন্ধ্যা নেমে এল। মামী ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখালেন, ধুনো দিলেন। 'আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো।'

যতীন মামা হেসে বললেন, 'আরে লজ্জা কিসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবে না। ভাগ্নের কাছে লজ্জা করতে নেই।'

ঘটনা কী? ঘটনা হল, মামী রোজ সন্ধ্যায় মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। আজও করলেন। শরৎবাবু আরো একবার প্রসন্ন হবেন নিশ্চিত।

তারপর একসময় মামা বাঁশি তুলে নিলেন হাতে। কেমন বাজালেন তিনি? কেমন লাগল সুরেশের?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা পড়ি, "হঠাৎ আমার মনে হল, আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা খেপা উদাসীন ঘুমিয়েছিল, আজ বাঁশির সুরের নাড়া পেয়ে জেগে উঠল। বাঁশির সুর এসে লাগে কানে, কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেছে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছায় নি, বাইরের ঘরদোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদুভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে, বহুদূরে, যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মধ্যে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথাবোধ করে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশির সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।"

এতক্ষণ মানিক মোটামুটি ছোট ছোট বাক্যেই গল্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঁশির বর্ণনায় এসে বাক্য দীর্ঘ আর জটিল রূপ লাভ করল। এই বর্ণনাটা আরেকবার পড়তে পারি আমরা। এইবার একটু স্থির হয়ে ভাবতে বসতে হয়–এই বর্ণনা যিনি লিখছেন তাঁর বয়স মাত্র বিশ। এটা তার জীবনের প্রথম লেখা। আর তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র।

ঘণ্টা দেড়েক বাঁশি বাজানোর পর মামা কাশতে আরম্ভ করলেন। রক্ত উঠল মুখ দিয়ে।

যতীন মামা আর অতসীমামীর সঙ্গে সুরেশের প্রথম পরিচয় পর্বটা গল্পের চল্লিশভাগ জায়গা নিয়ে নিয়েছে। সুরেশ বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে মানিক তার মুখে সংলাপ বসালেন, 'খিলটা লাগিয়ে দিও মামী।'

তার পরের অনুচ্ছেদটায় সুরেশের নিজের ভাবনা। সেটা কোন জায়গায় কখন তিনি ভাবছেন, সেই বর্ণনা নাই। বেশ দার্শনিকতাপূর্ণ স্বগত ভাবনা–"কেবলই মনে হয়,

নেশাকে মানুষ এত দাম দেয় কেন। লাভ কী? এই যে যতীনমামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ করে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যে শোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি, এ তো ক্ষণিকের! যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু ততক্ষণ এর স্থিতি। তারপর বাস্তবের কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নের চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কী বিচিত্র! আমারও ইচ্ছে করে যতীনমামার মতো সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুরের আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা রইল।"

সত্য বটে, এই বর্ণনাটা কাব্যধর্মী, একটু উচ্ছ্বাসময়, কিন্তু শিল্প ও শিল্পীর অনির্বচনীয় রহস্যময় যে দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ সম্পর্ক, তা এই বাক্যগুলোয় বেশ সফলভাবেই ফুটে উঠেছে বৈকি।

প্রথম বিকাল ও সন্ধ্যার সুপরিসর বর্ণনার পর ঘটনার সময় বদলে যাবে এই বাক্যে এসে, "একদিন বললাম, 'বাঁশি শিখিয়ে দেবেন মামা?"

একদিনটা কোনদিন, কতদিন পর, তা আর মানিক আমাদের জানান না। তবে 'খিলটা লাগিও দিও মামী' থেকে 'বাঁশি শিখিয়ে দেবে মামা' এই দুটি সংলাপের মধ্যে সময় পার হয়ে যায় কিছুদিন। সেই ফারাকটা ভরে তুলতে তিনটা অনুচ্ছেদে সুরেশের দোহাই দিয়ে লেখকের স্বগত-কথন। বিচার-বিশ্লেষণ।

তারপর কয়েকটা বাক্য পরেই আবার বলা হল, "একদিন বললাম, 'মামা, আর বাঁশি বাজাবেন না।' মাঝখানে আরও কয়েকটা দিন সময় নিশ্চয়ই অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই সংলাপের পিঠেপিঠি সংলাপ আসতে থাকে। মামা বাঁশি বাজানো ছাড়বেন না। সংলাপ–যতীনের, সুরেশের, অতসীমামীর–আমাদের জানাল যে যতীনমামা বাঁশি বাজানো ছাড়বেন না।

তারপর এল গল্পের তৃতীয় পর্যায়।

মানিক একটা সাদা স্পেস ব্যবহার করে নতুন পর্যায় শুরু করলেন এই বাক্য দুটো দিয়ে, "কিন্তু একদিন যতীনমামাকে বাঁশি ছাড়তে হল। মামীই ছাড়াল।"

বাঁশিটা মামা বিক্রি করতে যাবেন, কারণ মামীর টাইফয়েড, ডাক্তার ডাকতে হবে, টাকা নেই, আর তখন মামীর কপালে আইসব্যাগ ধরে আছে সুরেশ। আড়াই পৃষ্ঠার এই বর্ণনা, পুরোটাই সংলাপে সাজানো। সুরেশই বাঁশিটা কিনে নেবে বলে টাকা শোধ করল। মামীও মামার হাত ধরে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, মামা আর বাঁশি বাজাবেন না কোনোদিনও।

মামী সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই সময় মামার মুখে সুরেশ তথা পাঠক জেনে যাবে, এই দুজনের বিয়ের কাহিনী। মা-বাবাকে হারিয়ে বাপের পিসতুতো ভাই এক খুড়োর কাছে অতসী ছিলেন ১৭ বছর পর্যন্ত। খুড়ো তাকে ভয়ানক মারধর করতেন। পাশের বাড়িতে যতীনমামা বাঁশি বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। 'নিতান্ত চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে করে ফেললেন।'

আবার একটা সাদা স্পেস। তারপর বাক্য—'মাস দুই পরের কথা।'

এবার যতীন মামা আর অতসীমামী বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। তারা দেশে চলে যাচ্ছেন। শিয়ালদা স্টেশনে মামা-মামীকে বিদায় জানালেন সুরেশ, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে।

এই ঘটনাটা ঘটল মোটামুটি সংলাপ আর বিবরণ মেশানো এক পৃষ্ঠার বর্ণনায়। তারপর সাদা স্পেস। এইবার আবার দার্শনিক উপলব্ধি, "মানুষের স্বভাবই এই, যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলের বড় করে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীনমামা আর অতসীমামীর বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসীমামী একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের আবর্জনার তলে চাপা পড়ে যাবেন।" চাপা পড়েই গেলেন তারা। তবে, মানিক জানাচ্ছেন, "মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীনমামাদের দেশে চলে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিশন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে।"

এই তিনটা বছর পার করতে মানিক আধা পৃষ্ঠারও কম পরিসর ব্যয় করলেন। কারণ এটা তার কাহিনীর জন্য দরকারি নয়। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছর কেটে গেছে–এই বলে আরও চারটা বছর পার করে দিলেন একবাক্যে।

এইবারের ঘটনাস্থল ট্রেনের কামরা। সুরেশ সেই কামরায়। আর আছেন এক র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া স্ত্রীলোক। এক স্টেশনে সব যাত্রীই নেমে গেল। শুধু স্ত্রীলোকটাকে ফেলে রেখে গেলেন বোধ করি একজন যাত্রী, সম্ভবত ভুল করে। সুরেশ যাত্রীটিকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে হাঁকও ছাড়লেন, 'ও মশায়–মশায় শুনছেন?'

এইবার আর কামরায় আর কেউ নেই কেবল স্ত্রীলোকটি আর সুরেশ ছাড়া। এই স্ত্রীলোকটিও আর কেউ নয়, অতসীমামী।

মামা মারা গেছেন চার বছর আগেই। এইসব কথাবার্তা খুব বিস্তারিত না করতে অতসীমামীর মুখে মানিক বসালেন এই সংলাপটি, 'বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না!'

সুরেশ বাঁশি বার করল, সেই যতীনমামার বাঁশিটি। মামী সেই বাঁশি বাজাতে লাগলেন অভূতপূর্ব দক্ষতায়।

মামী পরের স্টেশনে নেমে যাবেন। কেন? কারণ আজ সতেরই অঘ্রান। আজ থেকে চার বছর আগে ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। 'সামনের স্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনের ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ওই তীর্থ দর্শন করতে যাই।

মামীর সংলাপ, "ওই ওই ওইখানে! দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয়তো!–উহ মাগো, আমি তখন কোথায়!'

তারপর পরের স্টেশনে বাঁশিটা নিয়ে সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অতসীমামী নেমে পড়লেন।

মানিক গল্পের শেষ দুটো বাক্য লিখবেন, "আবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ করে আছড়ে বন্ধ হয়ে গেল।"

মানিকের এই গল্পের দুর্বলতার উৎস হল, পুরো গল্পটিই ভীষণভাবে বানিয়ে তোলা। কিন্তু লেখকের মুন্সিয়ানা এই যে ট্রেনে ওঠার আগে, ১৬ পৃষ্ঠার গল্পের অন্তত ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠক এই গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে বাধ্য হয়। বাড়ির বর্ণনা,

পাত্রপাত্রীর বর্ণনা, ঘটনা ও সংলাপের উৎকর্ষের কারণে এক কল্পবাস্তবতাও আমাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা বলে মনে হয়! লেখকের কাজই তাই। সব লেখকই আসলে গল্প বানিয়েই তোলেন, কিন্তু তার বর্ণনার উৎকর্ষই নির্মিত জগতকে বাস্তব জগতের সমবর্তী করে তোলে। আর বানানোর সময় নির্মাতা যদি দক্ষ না হন, তার মালমশলা উপকরণ নকশা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, নিতান্ত সত্যিকারের জীবনভিত্তিক গল্প আস্বাদনেও পাঠক অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন, তার মনে প্রশ্ন উঠতে থাকে, যাহ! এটা কি সম্ভব! যে লেখক অসম্ভবকেও সম্ভবপর করে তুলতে পারেন, পাঠক এতই মগ্ন হয়ে পড়েন যে তিনি প্রশ্ন তুলতেও ভুলে যান যে এটা আদৌ সম্ভবপর কিনা, সেই লেখকই সফল বলে গণ্য হন।

তারপর ১৭ অঘ্রানে ট্রেনে সুরেশের সঙ্গে অতসীমামীর সাক্ষাৎপর্বে এসে পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে, এত বড় কাকতাল সম্ভব কিনা। শেষটুকুন, ১৭ অঘ্রানে অন্ধকার প্রান্তরে রেললাইনের ধারে প্রতিবছর অতসীমামী এসে তীর্থদর্শন করেন সারারাত বসে থেকে, সেটার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় না। সংলাপও বানিয়ে তোলা ও নাটুকে বলে মনে হয়।

'অতসীমামী' গল্পের প্লট নির্বাচনে, চরিত্র নির্মাণে ও ঘটনাসংস্থানে শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কথা তো আগেই আঁচ করা গেছে।

কিন্তু সব ছাপিয়ে এই চিন্তা আমাদের মন থেকে কিছুতেই আমরা সরাতে পারি না যে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সী এক বিজ্ঞানের ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে তার জীবনের প্রথম গল্পটি এত সুচারুভাবে ফাঁদতে পারলেন কী করে?

প্রতিভা, সহজাত প্রতিভা ছাড়া একে আর কীভাবেই ব্যাখ্যা করব আমরা?

হ্যাঁ, মানিক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, প্রবেশিকা ও আইএসসি দুটো পরীক্ষাতেই তিনি লাভ করেন প্রথম বিভাগ। ১৯২৮ সালে আইএসসি পাস করেন তিনি। সেই বছরেই লেখেন এই গল্প 'অতসীমামী'। সদ্য আইএসসি পাস করা এক তরুণ শিল্প নিয়ে, শিল্পের জীবনসংহারী নেশাকর রহস্যময় অমোঘ টান সম্পর্কে এত গভীর উপলব্ধির স্তরেই বা পৌঁছালেন কী করে? মাত্র এক বছর পরে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে তিনি বলবেন, একা একা হাসা যায় না। একা একা হাসলে লোকে পাগল বলে। হাসতে অন্তত আরেকজন লাগে।

ভালোবাসা নিয়েও সেই বাণীগুলো করে যাবেন তিনি হেরম্বর মুখে, যা উত্তরকালে অমর হয়ে থাকবে, 'কতকাল স্থায়ী হয় ভালোবাসা? প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর ব্যবধান বেশি নয়।' কিংবা ওই উপন্যাসের দৃশ্যের বর্ণনা, চরিত্রের বর্ণনা, সংলাপে কী এক জাদুকরি দক্ষতার স্বাক্ষর তিনি রাখেন যে, তার ওই কল্পিত জগতটাকে নিতান্ত বাস্তবের জগত বলে আমাদের ভুল হতে থাকে?

পরবর্তীকালে এই লেখক যে নিটোল, যেন পাথর কেটে কেটে বাহুল্য ঝরিয়ে বানানো, *পদ্মানদীর মাঝি* লিখবেন, কিংবা লিখবেন অস্তিত্ববাদী উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথা*, তার পেছনে তার পঠন-পাঠন, প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা যতই কাজ করুক না কেন, আমাদের পক্ষে এ কথা ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে তিনি এক সহজাত প্রতিভার মানুষ, যিনি জন্মেছেন জিনিয়াস হয়ে।

তিনি নিজে কিন্তু এই কথা স্বীকার করতে চাইতেন না। তার নিজের কথায়, 'আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোনো লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই তার প্রস্তুতি চলে।'

তিনি বলেন, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানরা কথাটা মেনে নেন। মাথা নিচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা।... প্রতিভা এই দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছু নয়।'

না, মানিক এই একটা জায়গায় অন্তত নিজের বাক্যের সঠিক ওজন ধরতে পারেননি। আর কিছু নয় বলে 'দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা'কে তিনি একটু কম মূল্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতাই তো ব্যক্তিবিশেষে হেরফের হতে পারে। বুঝলাম, অন্য কাজগুলো, চাকা ঘোরানো কিংবা তাঁত চালানোও কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম সম্মানের নয়, কিন্তু একেকটা লোক একেকটা ব্যাপারে যে দক্ষ হয়ে ওঠে, কেউ হয়তো ক্রিকেটটা ভালো খেলে, কেউ হয়তো ছবিটা ভালো আঁকে, কারও হয়তো তাঁত চালানোর দক্ষতাটা ভালো হয়, সেটা যে জিনেটিক হতে পারে, তাতে আজ আর কারো সন্দেহ থাকবার কথা নয়। শচীন টেন্ডুলকারের প্রতিভা আর পিকাসোর প্রতিভায় সন্দেহ করার সুযোগ কোথায়? তেমনি সুযোগ নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার সহজাততায় অবিশ্বাসের।

তবে হ্যাঁ, তারও প্রস্তুতি নিশ্চয়ই ছিল। 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ', 'গোরা', 'চরিত্রহীন' পড়া হয়ে গিয়েছে।...বড়ো ঈর্ষা হতো বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর।"

প্রস্তুতি ছিল, ছিল প্রতিভাও, দুইয়ের প্রথম সংযোগ ঘটল 'অতসীমামী' গল্পে। পরে তার বয়স বাড়বে, উচ্ছ্বাস কমবে, তিনি লিখবেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই উপন্যাসসমেত আরো উপন্যাস ও কালজয়ী গল্প। তবুও, যেমন জীবনানন্দের বেলায়, তেমনি মানিকের বেলাতেও মনে হয়, হয়ত তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন সমকালীন দুর্বল লেখকরা। দেবেশ রায়ের এই উক্তি স্মরণ করে এই লেখা শেষ করি–'সর্বত্রই লেখককে তত্ত্ব বাতলানোর অবিনয়, ঔচিত্যবিচারের ঔদ্ধত্য। যেন মানিকবাবু লিখতে পারেন, মাত্র এটুকুই তার জোর। তাই বলে কী লিখতে হবে ও কেন লিখতে হবে–সেটা তার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ বিপদ সমালোচকরা যতটা বাড়ান, প্রায় ততটাই বাড়ান সমকালীন দুর্বল লেখকরা।' (সময় সমকাল)

মানিকের 'প্রাগৈতিহাসিক': মানুষের আদিম প্রবৃত্তির গল্প

আহমাদ মাযহার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি বাংলা ভাষার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ঔপন্যাসিক হিসেবে যতটা, গল্পকার হিসেবে সম্ভবত ততটা নয়। অথচ রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম সেরা এই লেখকের ছোটগল্পে রয়েছে স্বতন্ত্র এক জীবনদৃষ্টির পরিচয়। সেই জীবনদৃষ্টির প্রকাশ তিনি ঘটাতে পেরেছেন নির্মোহ এক গদ্যভাষার আশ্রয়ে এ-কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু দেখা যায় যে, তাঁর উপন্যাসই সমালোচকদের কাছে বেশি পছন্দের। অন্তত তাঁর সম্পর্কিত সমালোচনামূলক রচনার দিকে তাকালে এ-কথা প্রতীয়মান হবে যে, ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাস প্রাসঙ্গিক আলোচনার পাল্লা অনেক ভারী। *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *জননী* কিংবা *চতুষ্কোণ* উপন্যাস নিয়ে আনেকেই আলোচনা করেছেন। এমনকি স্বল্পপঠিত কয়েকটি উপন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার প্রতিষ্ঠা এতটাই গভীরে পৌঁছেছে যে তাঁর ছোটগল্পের শিল্পসিদ্ধি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকলেও তা নিয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ তেমন ঘটে নি। ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর শক্তিকে সাহিত্য সমালোচকরা যে স্বীকার করে নেন নি তা অবশ্য নয়; কয়েকটি গল্পের আলোচনাও হয়েছে। কয়েকটিই মাত্র গল্পের কথা উল্লিখিত হয়েছে বারবার। এর মধ্যে 'প্রাগৈতিহাসিক' বহুল উল্লিখিত, সঙ্কলিত ও আলোচিত একটি গল্প। বাংলা ছোটগল্পের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো সঙ্কলনে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি বাদ পড়ে না। ফলে এর টেক্সট অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর একটি। সম্ভবত তাঁর খ্যাততম গল্পও। ছোটগল্পের পাঠকদের কাছে অতি পরিচিত ও প্রিয় বলে এর সম্পর্কে আলোচনাও একেবারে কম হয় নি। এমন একটি গল্পের পুনর্মূল্যায়ন সহজ নয়। আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরুক্তি দোষের প্রবল আশঙ্কা থেকে যায়।

ভালো গল্প পেলে সম্পাদকরা ছাপাবেন না এমনটা হতে পারে না। তাঁরা গল্প পান না বলেই ভালো গল্প ছাপা হয় না। অতিতরুণ বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসূত্রে মানিক বলেছিলেন এ-কথা। বন্ধুরা এ-কথা মানতে না চাইলে এক পর্যায়ে বাজি ধরে *অতসী মামী* নামে একটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন *বিচিত্রা* পত্রিকায়। একদিন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন এমন মনোভাব *অতসী মামী* গল্পটি লেখার আগে তাঁর ছিল না। *অতসী মামী* তো ছাপা হয়েছিলই, পরন্তু সম্পাদক নিজে এসে এর জন্য সম্মানী দিয়ে গিয়েছিলেন।

'প্রাগৈতিহাসিক' যখন লেখা হয় তার আগে আমরা বাংলা ছোটগল্পের বড় শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে পেয়ে গেছি। বাংলা ছোটগল্পের একটা সম্পন্ন চেহারাও দাঁড়িয়ে গেছে ততদিনে। জীবনকে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়ে গেছে বিচিত্র

ভাবে। রবীন্দ্রনাথ তখনও সক্রিয়, শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার সদ্য বিগত হয়েছেন, তখনও সরব প্রমথ চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্যকে অন্ত্যজ ও মজুরশ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন । *কল্লোল* ও *কালিকলম* পত্রিকায় রবীন্দ্রোত্তর লেখকরাও অবতীর্ণ হয়ে গেছেন ততদিনে।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু ডাকাত দলের সদস্য। এক স্থানে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের সঙ্গীরা ধরা পড়ে। নিজে বর্শার খোঁচায় আহত হয়েও সক্ষম হয় পালাতে। এরপর শুরু হয় তার বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম। জীবন সংকটের নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে। শ্বাপদসংকুল বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সে বেঁচে ওঠে পেহ্লাদের সহযোগিতায়। এমন এক বনে সে লুকিয়ে থেকেছে 'বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না'। 'জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো-না-কোনো অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করে জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচার ওপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না।' বর্ষার খোঁচা খাওয়া তার ডান হাতটি পঙ্গু হয়ে যায়। যে পেহ্লাদ বাগদীর বাড়িতে আশ্রিত হয়ে আরোগ্য লাভ করেছে ভিখু সমর্থ হয়ে হাত বাড়ায় সেই পেহ্লাদের বউয়ের দিকেই। পেহ্লাদ বোনাইয়ের সহযোগিতায় তাকে মেরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। প্রতিশোধপরায়ণ ভিখু সেদিনই গভীর রাতে আগুন ধরিয়ে দেয় পেহ্লাদের ঘরে। তারপর থেকে শুরু হয় ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। অন্যদিকে ভিখু ভেবেছিল এতবড় ক্ষতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ভিখু হয়তো পুলিশের কাছে তার নাম বলে দেবে। কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে শেষ পর্যন্ত পেহ্লাদ ভিখুর নাম বলে দেয় নি। অল্প কথায় অসাধারণ বর্ণনায় ভিখুর জীবনযাপনকে এখানে মানিক ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতর তার পক্ষে আত্মগোপনে থাকা সম্ভব হয় নি। অন্য উপায় না পেয়ে মরিয়া হয়ে সে ভিক্ষাকেই বেছে নেয় জীবিকা হিসেবে। এই উপায়ে তার ভালোই চলতে তাকে দিনকাল। উন্নতি ঘটতে থাকে স্বাস্থ্যের। মেজাজ-মর্জিও তার বেশ উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকে। আশানুরূপ ভিক্ষা না পেলে দাতার ওপর ক্ষেপে গিয়ে অশ্লীল ভাষায় গাল দেয়। এক পয়সার জিনিস কিনে ফাউ না পেলে দোকানিকে মারতে ওঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করতে নামলে সেখানে হাজির হয় ভিক্ষার জন্য। মেয়েরা ভয় পেলে সে খুশি হয়, সরে যেতে বললে সরে না, দাঁত বের করে দুর্বিনীত হাসি হাসে। এরপর থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুকে ক্রমশ এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে থাকেন যাতে মানুষের মধ্যকার আদিম জান্তব আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। নারীবিবর্জিত 'নিরুৎসব' জীবনে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ভিখুর প্রতি লেখক এখানে মমতার দৃষ্টিতে তাকান। ভিক্ষাসূত্রেই তার দেখা হয় ভিখারিনী পাঁচীর সঙ্গে। লেখক বর্ণনা করেছেন, 'বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ের হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।' এই ঘাটুকুই তার ব্যবসায়ের পুঁজি। তাই 'অসুদ দিলে অখনি সারে' যে ঘা সেটা সে সারাতে চায় না।

এই মেয়েটির প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। তার সামর্থ্যের আওতায় মনে করে মেয়েটিকে। চেষ্টা করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার। মেয়েটি তাকে গ্রাহ্য করে না। জোয়ান দাড়িওয়ালা এক ভিখারির সঙ্গে ভালোই আছে সে। নানাভাবে ভিখারিনীর উপেক্ষা তাকে দমাতে

পারে না। একই জায়গায় দীর্ঘকাল ভিক্ষা করায় উপার্জন কমে আসলেও ভিখু পড়ে থাকে এখানেই। কারণ ভিখারিনী পাঁচীকে ফেলে তার কোথাও যেতে মন চায় না। মানিকের বর্ণনায় ভিখুর অবস্থা এ-রকম : 'আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাহার চলার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়।' আর তখনই ভিখু তার ভেতরকার জান্তব শক্তিকে অনুভব করতে থাকে প্রবল ভাবে। একদিন সে পাঁচীর থাকার জায়গা দেখে এসেছিল। লোহার একটা শিক নিয়ে এক রাতে পাঁচীর সঙ্গী বসিরকে খুন করল। তার জান্তব অনুভূতি উঠল আরও প্রবল হয়ে। বসিরের মাথায় লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়ে সবলে তার গলা চেপে ধরল। পাঁচীকে বলল, 'চুপ থাক, চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।' তারপর পাঁচীরই সহায়তায় খুঁজে বের করল বসিরের সমস্ত সঞ্চয়। তারপর চলল তার জীবনে পরবর্তী স্তরের সন্ধানে। পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ পেল। বলল, 'অখনই চান্দ উঠব পাঁচী।' উৎসবময় এই যাত্রায় পাঁচী তার সঙ্গী। সেজন্য চাঁদের ওঠা দেখা সম্ভব হয়ে উঠেছে। ঘেয়ো পা নিয়ে পাঁচীর চলতে অসুবিধা। তার প্রতি মমতা জাগল ভিখুর, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?' ভিখু তাকে পিঠে তুলে নিতে চাইল। পাঁচীর বিশ্বাস হতে চায় না সে-কথা। ভিখু তাকে তুলে নিল পিঠে। ভিখুর গলা জড়িয়ে পাঁচী ঝুলে রইল তার পিঠের ওপর। সামনের দিকে ঝুঁকে জোরে পথ হাঁটতে থাকে সে। এখানেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির পরশ বুলিয়ে দেন– 'দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।' গল্পের সর্বশেষ স্তবকটিকে একবার মনে হয় যেন এর বাড়তি অংশ আবার মনে হয় এটুকু ছাড়া গল্পটির আবেদন যেন হৃদয়কে স্পর্শ করতে অক্ষম থেকে যেত।

'কল্লোল' পত্রিকাকেন্দ্রিক সাহিত্যধারায় লিবিডোচেতনা ছিল অন্যতম অনুষঙ্গ। মানিক 'কল্লোল' পত্রিকায় না লিখলেও তাঁকে 'কল্লোল'-এরই কুলবর্ধন জ্ঞান করা হতো তাঁর লেখক-স্বভাব বিবেচনায়। লিবিডোচেতনার কারণে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের বিষয়বস্তুকেও হয়তো কল্লোল-স্বভাবী বলা যাবে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটির আগের বাংলা ছোটগল্পে মানব-জীবনের মৌল সংগ্রাম ও জৈবিক আকাঙ্ক্ষাকে একযোগে এমন একটা প্রাকৃতিক পটভূমিকায় দেখা যায় নি। জীবন সম্পর্কে এই নতুনতম দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনচেতনায় দেখা দিয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক ভাঙন। মানুষ মুখোমুখি হয়ে পড়ছিল জটিল জীবনজিজ্ঞাসার। ভিখু চরিত্রটির মধ্যে এই জটিল জীবনজিজ্ঞাসারই প্রতীক খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেকার লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তিগুলো কখনোই প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হতো না। এমনকি হয়ে উঠত না সাহিত্যের বিষয়ও। ফ্রয়েড মানবমনস্তত্ত্বের এই গূঢ় স্বভাবধারাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। ফ্রয়েডীয় জীবনসূত্রের আলোকে মানিক বাংলার মানুষের জীবনকে যেভাবে দেখেছিলেন তার অন্যতম আধার হয়ে উঠেছে এই গল্পটি। ভিখুর জীবনের চিহ্নায়নযোগ্য শক্তি হচ্ছে ডাকাতি, খুন করার প্রবৃত্তি, পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি আদিমস্বভাব। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের অদম্য সাহস, শারীরিক সামর্থ্য, কামনাবাসনাসমন্বিত এক সম্পন্ন মানবিক গুণ ধরা পড়েছে ভিখুর চরিত্রে। ভিখারি হয়েছিল ভিখু নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। এই আদিমতাগুলো তার ভিক্ষাবৃত্তির অনুকূল। মানুষের এই আদিমতার মৃত্যু নেই। সুতরাং পাঁচীর স্বামীকে হত্যা করে তাকে অধিকার করার মধ্য দিয়ে মানুষের এই

আদিম প্রবৃত্তিরই জয় দেখানো হয়েছে। এই গল্পে মানিক মনে করছেন মানবচৈতন্যের এই ধারা সুদূর অতীতকাল থেকে বহমান রয়েছে, অনাগত ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতোই মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষাও এক মৌল চাহিদা। বাংলা কথাসাহিত্যে এই মৌল জীবন-আকাঙ্ক্ষা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের আগে এমন তীব্রভাবে প্রকাশ পায় নি। এদিক থেকে বলা যায় যে মানিক স্বতন্ত্র এক জীবনবোধেরও আবিষ্কারক।

তাঁর লেখকসত্তায় রয়েছে 'গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা' সম্পর্কে গভীর চেতনাবোধ। এই বোধেরই প্রকাশ আমরা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পেও দেখতে পাই। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আগের লেখকদের কেউ কেউ দারিদ্র্যকে হয়তো খানিকটা চিত্রিত করেছেন যা ছবিমাত্র রয়ে গেছে, বাস্তবজীবনের উপলব্ধি তাতে প্রকাশ পায় নি। সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের এমন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনবাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বকে উপজীব্য করা হয় নি তাঁদের গল্প-উপন্যাসে। এই দিক থেকেও মানিক পথিকৃৎ কথাসাহিত্যিক।

গাওদিয়া

ইমদাদুল হক মিলন

শ্যামল বলল, এই তো আমাদের বাড়ির পাশেই শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি।

আমি চোখ তুলে তার দিকে তাকালাম। কোন শরৎচন্দ্র?

বই লেখেন। দেবদাসের লেখক।

না ওটা শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাবাড়ি। আমি ওই বাড়িটার খোঁজেই এসেছি।

কদিন ধরে সূর্যের মুখ দেখাই যাচ্ছিল না। আষাঢ় মাসের শেষ দিককার আকাশ এই একটু ফর্সা হচ্ছে, এই অন্ধকার। তুমুল বৃষ্টিতে ঢাকা শহর ভেসে গেছে। কোনও কোনও রাস্তায় হাঁটু পানি। মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই।

আজ সকালে ঝকঝকে রোদ। আমি আর দুলাল বাসে চড়েছি দশটার দিকে। ইলিশ কোম্পানির বাস গুলিস্তান থেকে মাওয়া যায় পঞ্চাশ মিনিটে। আগে ভাড়া ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। দুদিন ধরে চুয়াল্লিশ। হঠাৎই তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই অবস্থা।

ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে রওনা দিলেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে আমার। আমরা থাকতাম জিন্দাবাহার থার্ডলেনে। সকালে ছটায় সদরঘাট থেকে লঞ্চে চড়তাম। সদরঘাটে তখনও টার্মিনাল হয় নি। নদীতীরের বালিয়াড়িতে লঞ্চগুলো দাঁড়িয়ে থাকত। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে চড়তাম। মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর হয়ে, মেঘনা পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যা ছটা সাড়ে ছটায় লঞ্চ গিয়ে থামত মাওয়ার ঘাটে। ঢাকা থেকে বারো সাড়ে বারো ঘণ্টার পথ। এখন সেই পথ অতিক্রম করতে লাগে পঞ্চাশ মিনিট। রাস্তা ফাঁকা থাকলে আরও পাঁচ-দশ মিনিট কমে যায়।

মাওয়া চৌরাস্তা থেকে স্কুটার নিয়েছি। স্কুটার চলছে, আমার পাশে দুলাল বসে আছে। সে আমার খালাতো ভাই। আমার বয়সী। বিক্রমপুরের গ্রাম এবং মানুষজন সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তার। ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে, মানুষের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসে। দুলালের পাশে বসেও কোন ফাঁকে যেন একা হয়ে গেছি। গতি সব সময়ই আমাকে স্মৃতির দিকে নিয়ে যায়। আজও নিয়েছে। আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা, বহু বহু বছর পিছনে ফেলে আসা বিক্রমপুরের কথা। মেদিনী মণ্ডল গ্রামে নানির কাছে বড় হয়েছি, কাজির পাগলা হাইস্কুলে কয়েক বছর পড়েছি। এই যে এখন মাওয়া থেকে পুব দিকে যাচ্ছি, পথে পড়ছে কত গ্রাম, কুমারভোগ শিমুলিয়া হলদিয়া ঘোড়দৌড় কনকসার ব্রাহ্মণগাঁও লৌহজং। আমার ছেলেবেলায় আরও কত গ্রাম ছিল পদ্মাতীরে। দিনে দিনে সেইসব গ্রাম চলে গেছে পদ্মায়।

এখনকার বিক্রমপুর দেখে আগের সেই বিক্রমপুর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিক্রমপুর ছিল নিম্নাঞ্চল। বিক্রমপুরের বর্ষা মানে পানি আর পানি। পানির ওপর দ্বীপের মতো ভেসে আছে বাড়িগুলো। বাড়ির ঘাটে নৌকা একটা আছেই। নৌকা ছাড়া

চলাচলের কোনও উপায় নেই। এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি যেতে হলেও নৌকা। শস্যের মাঠগুলোকে বিক্রমপুর অঞ্চলে বলে 'চক'। চক আর বিলে আট-দশ হাত পানি হত বর্ষাকালে। সেই পানি সবুজ হয়ে থাকত আউশ আমন ধানে। আউশ ধান বর্ষাকালেই পাকে, আমন পাকে অগ্রহায়ণে। এখন আর সেই ধান চাষ হয় না। এখন হয় ইরি। পাট এবং তিল, কাউনও প্রচুর হত বিক্রমপুরে। এখন পাটের চাষ বলতে গেলে নেই। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বিক্রমপুর ভরে থাকত পাট পচা গন্ধে। সেই গন্ধ এখন পাওয়াই যায় না। এখনকার বর্ষায় প্রবল বন্যা না হলে পানি বলতে গেলে হয়ই না। চকে বিলে শুধুই ধনচে চাষ হয় বর্ষাকালে। আউশ-আমন দেখাই যায় না। চারদিকে পাকা রাস্তা, দারুণ সব ঘরবাড়ি। বিক্রমপুরের ঐতিহ্য হচ্ছে চৌচালা টিনের পাটাতন করা ঘর। অবস্থাপন্ন লোকের ঘর হত দোতলা। এখনও কোনও কোনও বাড়িতে সেরকম অনেক ঘর। কোনও কোনও বাড়িতে ঢাকার গুলশান, ধানমণ্ডি টাইপের বিল্ডিং।

স্বাধীনতার পর বিক্রমপুরের লোকের ভাগ্য খুলে গেছে। বিক্রমপুর এখন বাংলাদেশের সবচে' ধনী এলাকা। কোনও কোনও বাড়ির চার শরিকের চারজনই কোটিপতি। ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন বদলে ফেলেছে এই অঞ্চলের মানুষ। বিক্রমপুরের বহু যুবক আছে জাপান, আমেরিকা, ইতালি, ইংল্যান্ড এইসব দেশে। কয়েক বছর আগে জাপানেই ছিল বেশি। জাপানি টাকায় বিক্রমপুরের বহুগ্রাম বদলে গেছে। বিক্রমপুরের ঐতিহ্যবাহী টিনের ঘর নতুন আঙ্গিকে উঠেছে অনেক বাড়িতে। ঘরগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, এ যেন বাংলাদেশের বিক্রমপুর না, এ যেন জাপানের কোনও গ্রাম।

কুমারভোগ পেরিয়ে যাচ্ছে স্কুটার, একটা জায়গা দেখিয়ে দুলাল বলল, এই জায়গাটা চিনো? জায়গাটার নাম 'নূরইতলা'। এখানে বিশাল একটা বটগাছ ছিল। কী যেন কী বিশ্বাস থেকে সেই বটগাছের দিকে নাড়ার আঁটি ছুঁড়ে মারত লোকে। কিংবদন্তি ছিল, এই গাছের তলায় 'সাতকলসি' ইলিশমাছ বন্দি হয়ে আছে। ভাঙতে ভাঙতে পদ্মা যেদিন এই গাছের কাছে আসবে, যেদিন এই গাছ ভেঙে পড়বে পদ্মায়, সেদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে।

পদ্মা এখনও এতদূর আসে নি, কিন্তু গাছটা বিলীন হয়ে গেছে। গাছের জায়গায় এখন পিচঢালা পথ। পথের দুপাশে অজস্র দোকান। বিশাল বিশাল বাস-ট্রাক যায়, রিকশা-স্কুটার-প্রাইভেট কার যায়। বিক্রমপুরের বহুলোকের এখন নিজস্ব গাড়ি। শুক্রবার গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসে তারা। জাপানের বিশাল দামি দামি গাড়ি।

ওয়ারি গ্রামটা কোনদিকে?

হাত তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখাল দুলাল। এই গ্রামে জন্মেছিলেন রাজকাপুরের ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার। ছেলেবেলায় আমি যে স্কুলে কয়েক বছর পড়েছি, কাজির পাগলা এ, টি ইনস্টিটিউশন সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন রাধু কর্মকার। বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি মালখাননগর, সমরেশ বসুর বাড়ি রাজানগর, সুবোধ ঘোষের বাড়ি বহর। ষোলঘর গ্রামটি হচ্ছে প্রতিভা বসুদের। জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি রাড়িখাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অতীশ দীপঙ্কর কত বিখ্যাত মানুষ বিক্রমপুরের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাম মালপদিয়া। মামাবাড়ি গাওদিয়া।

বাংলা সাহিত্যে যে অমর হয়ে আছে তাদের গ্রাম, গাওদিয়ার মানুষ তা জানেই না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের পটভূমি এই গ্রাম।

গাওদিয়া পূর্ব বিক্রমপুরের গ্রাম। লৌহজং থানায় পড়েছে। পদ্মার একেবারে গা ঘেঁষা। বিক্রমপুর নামে সত্যিকার অর্থে এখন আর কোনও অঞ্চল নেই। একসময় ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ছিল বিক্রমপুর। মুন্সিগঞ্জ এখন জেলা হয়ে গেছে। সরকারি নথিপত্র থেকে কবে কখন কীভাবে উধাও হয়ে গেছে বিক্রমপুর কে জানে। উপমহাদেশের এই বিখ্যাত অঞ্চলটি এখন আছে কিংবদন্তি হয়ে, মানুষের মুখে মুখে। যে বিক্রমপুর ছিল বিখ্যাত মানুষদের জন্মের অহংকারে অহংকারী, সেই নামটিই এখন নেই। কয়েক বছর আগে বিষয়টি নিয়ে আমি কিছু লেখালেখি করেছিলাম। প্রস্তাব করেছিলাম মুন্সিগঞ্জ জেলার নাম হোক 'মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর জেলা'। মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরের বিখ্যাত সব রাজনীতিবিদের মতামত নিয়েছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত। অন্তত বিক্রমপুর নামটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই হওয়া উচিত। ওই পর্যন্তই। কার্যত কিছুই হয় নি। এখন আর কেউ এই নিয়ে ভাবেনই না। কারও একবার মনেও হয় না, এখনও পর্যন্ত মুখে মুখে যেটুকু আছে বিক্রমপুর, কালক্রমে তাও থাকবে না। পরের প্রজন্ম মনেই রাখবে না বিক্রমপুরের কথা। তারা তাদের জীবন বৃত্তান্তে জেলার নাম লিখবে মুন্সিগঞ্জ। সঙ্গে যদি বিক্রমপুর শব্দটা থাকত, তাহলে লিখত 'মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর'। বিক্রমপুরের বহু বিখ্যাত গ্রাম চলে গেছে পদ্মায়। লৌহজং বন্দরটি তো নেই। এখন সেখানে লৌহজং বাজার, এই বাজার থেকে দুই আড়াই মাইল দক্ষিণে ছিল প্রকৃত লৌহজং। পদ্মার বুকে যেভাবে হারিয়ে গেছে বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রামগুলো, মানুষ যেভাবে ভুলে গেছে সেইসব গ্রামের পথ, একদিন বিক্রমপুর নামটিও সেইভাবে ভুলে যাবে। এই একটি মাত্র কারণে আমি চেয়েছি জেলার নাম হোক, 'মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর জেলা'।

লৌহজং ছাড়িয়ে চমৎকার নামের এক গ্রাম। মালিরঙ্ক। কোথাও কোথাও সাইনবোর্ডে লেখা 'মালির অংক'। আসলে 'মালিরঙ্ক'। মালির কোল। বিক্রমপুরে চমৎকার সব গ্রামের নাম। সুবচনী বনসীমান্ত লৌহজং শ্রীনগর দীঘিরপার। বিচিত্র নামও আছে। যেমন পয়সা, যেমন কলিকাতা।

লৌহজং ছাড়াবার পর রাস্তা একটু নির্জন হয়ে আছে। দুপাশে জলের ওপর কোমর ডুবিয়ে নিবিড় হয়ে আছে ধনচে ক্ষেত। ছোট ছোট হলুদ ফুলে ভরে আছে ধনচে গাছ। ডগায় বসে দোল খাচ্ছে বুলবুলি পাখি। কালো জলে রচিত হয়েছে ধনচে ফুলের হলুদ শয্যা। সূর্যের তলায় কখন এসে দাঁড়িয়েছে কালোমেঘ। মেঘের ছায়ায় বিষণ্ন হয়েছে বিক্রমপুরের গ্রামগুলো।

গাওদিয়া ঢোকার মুখে দোতলা হলুদ লম্বা একটা দালান। বন্যার্তদের আশ্রয়কেন্দ্র। কাঁচাপথ ঢুকে গেছে গ্রামে। এমন থকথকে কাদা, মসজিদের পাশ দিয়ে বাজারের দিকে সামান্য এগিয়েই স্কুটার থেমে গেল। কাদায় আটকে যাচ্ছে চাকা। আর যাওয়া যাবে না। স্কুটার থেকে নেমে মাটিতে পা দিতেই আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এই সেই গাওদিয়া! শশী ডাক্তার এবং কুসমের গ্রাম। এরকম থকথকে কাঁদা ভেঙে, বর্ষায় বৃষ্টিতে কতদিন হেঁটে গেছে শশী!

গাওদিয়া বাজার একেবারেই নির্জন। খুব বেশি দোকানপাট নেই। যা আছে তারও বেশির ভাগই বন্ধ। দুপুর পৌনে বারোটায় গ্রামের কোনও বাজার এরকম নির্জন হয়ে যায় আমার জানা ছিল না। একটা মুদি-মনোহারি দোকান, সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাও আছে আর একটা সেলুন খোলা। লোকজন বলতে গেলে নেই-ই।

বাজার ছাড়িয়ে শ কদম পথ, তারপরই পদ্মা। ওইটুকুই পথ কাদায় ডোবা, দু'পাশে নিবিড় হয়ে আছে গাছপালা। বর্ষায় বৃষ্টিতে গাছের পাতা বেশি সবুজ, বেশি চকচকে। চারদিকে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। মাটির গন্ধ, নিবিড় গাছপালা আর মাথার ওপরকার আষাঢ় মাসের আকাশ, কালোমেঘের চলাচল, গাওদিয়া যেন চলে গেছে বাহাত্তর বছর আগের এক বর্ষাকালে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *পুতুলনাচের ইতিকথা*। বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসটির কোনও তুলনা নেই।

পুতুলনাচের ইতিকথায় বিক্রমপুর শব্দটি কোথাও নেই। গাওদিয়া যে বিক্রমপুরে সে-কথা কোথাও বলা হয় নি। উপন্যাসে অন্যান্য যে-সব গ্রামের নাম আছে তার অনেকগুলোই বিক্রমপুরের গ্রাম নয়। যেমন বাজিতপুর। বাজিতপুর হচ্ছে কিশোরগঞ্জে। যেমন রসুলপুর। এই গ্রামটি হচ্ছে ফরিদপুরে। সাতগাঁ, নন্দনপুর, রাজাতলা তেইশগাছা এসব গ্রামের মধ্যে শুধু সাতগাঁ হচ্ছে বিক্রমপুরে।

আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি কাল আগে 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' লিখেছিলেন শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বিক্রমপুরের গ্রামগুলোর নাম নিয়ে এই বইতে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। যেমন 'সং-দ্বীপ মূল অর্থ দুইদিকে জলবেষ্টিত ভূমি। চারদিকে জলবেষ্টিত হইলেও দ্বীপ। পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ, এই প্রকার দ্বীপকে হিন্দিতে টিকা বা টিলা বলে। বিক্রমপুরের 'দী' ও 'দীয়া' শব্দার্থক গ্রামসমূহই ওই সকল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছে। যথা, হলদিয়া রাজদীয়া গাড়িদীয়া কাঠাদীয়া মালাপদীয়া।'

আশ্চর্য, এই বইটিতে 'গাওদিয়া'র উল্লেখ নেই। অথচ গাওদিয়া ছিল বিশাল গ্রাম। পাঁচ সাতগ্রাম মিলে এক ইউনিয়ন, গাওদিয়া একাই ছিল একটি ইউনিয়নের সমান। এখন বারো আনাই ভেঙে গেছে পদ্মায়। দক্ষিণ থেকে ভাঙতে ভাঙতে উত্তর আর পুবে পশ্চিমে কিছুটা আছে গাওদিয়া।

গ্রামটি বিক্রমপুরে এ কথা না লিখলেও *পুতুলনাচের ইতিকথায়* বিক্রমপুরের প্রচুর শব্দ ব্যবহার করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন, ঠিরঠির কর্তালি খেদাইয়া কাবার চক্ষুটি আর বছর, বাড়িতে দালান দিয়েছে, বিক্রমপুরের এইসব শব্দ, এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়। উপন্যাসে একটা লাইন আছে 'নৌকা, স্টিমার, রেল তবে কলকাতা।' এই লাইনটি পড়লে বোঝা যায় বিক্রমপুর অঞ্চলের কথাই বলা হচ্ছে। বর্ষাকালে বিক্রমপুরের গ্রাম থেকে স্টিমারঘাট লৌহজং কিংবা তারপাশা'য় যেতে হত নৌকা করে। তারপর পদ্মা পাড়ি দিয়ে স্টিমার যেতো গোয়ালন্দ। সেখান থেকে ট্রেন সরাসরি কলকাতা, শিয়ালদা স্টেশন।

গাওদিয়া বাজার ছাড়িয়ে পদ্মার দিকে যেতে যেতে এসব মনে পড়ছিল আমার। গাওদিয়ার গা-ঘেঁষা পদ্মা এখন আর সেই উন্মত্ত পদ্মা না। এপার ওপার দেখা যেত না যে নদীর, সেই নদী এখন বড়সড় খাল। বর্ষাকাল বলে ঘোলাজল কিছুটা ফুলে উঠেছে। পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে যাচ্ছে জলস্রোত। ওপারের চর কাশবন আর ঘাসে ঘাসে সবুজ হয়ে আছে। ওই চরের পর চর আবার শীর্ণ খালের মতো পদ্মা, তারপর আবার চর, আবার নদী। এভাবে চার-পাঁচটা চর, চার-পাঁচটা পদ্মা। সব মিলিয়ে ছিল একটি পদ্মা।

পদ্মার জলে তাগড়া জোয়ান আটটা গাই গরু গোসল করাচ্ছেন বয়স্ক একজন মানুষ। সঙ্গে কিশোর বয়সী একজন রাখাল আছে। একজন প্রায়-বৃদ্ধ পাড়ে বসে অনেকগুলো চায়ের কাপ ছাই দিয়ে মাজছেন। কাপ-পিরিচ ধোয়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা

যায় চায়ের দোকান আছে তার। আরেকজন বৃদ্ধ মানুষ গোসল সেরে উঠেছেন। তার বয়স পঁচাশি বছর। গাওদিয়া গ্রাম আর পদ্মানদী নিয়ে টুকটাক কথা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে। জানা গেল গাওদিয়ায় এখন একটি মাত্র হিন্দু পরিবার আছে। এই তো, পদ্মার এই ঘাটের সঙ্গেই পশ্চিম দিককার বাড়ি। ডাক্তার বাড়ি। বাড়ির কর্তার নাম সুজিত দে। পঁচাশি বছর বয়সের ভদ্রলোক আমাদের সেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ির এদিক ওদিক অনেকগুলো টিনের ঘর। একটি পাটাতন করা ঘরে ডিসপেনসারি। আলমারি ভরা ওষুধ। ভেজা মাটির উঠোনে বসে চিংড়ি মাছ ধরার একখানা চাঁই নাইলনের সুতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধছেন এক ভদ্রলোক। খালি গা, পরনে লুঙ্গি। তার পাশে দুটো বেতের মোড়া। পশ্চিম দিককার পাটাতন ঘরে টিভি চলছে। রামানন্দ সাগর এর 'কৃষ্ণ' সিরিয়াল হচ্ছে টিভিতে। একটি কিশোরী মেয়ে চৌকিতে বসে টিভি দেখছে। উঠোনের দিককার জানালা দিয়ে সে আমাদের দিকে তাকাল।

এই চাঁই ঠিক করতে থাকা মানুষটিই সুজিত দে, এলাকার বিখ্যাত ডাক্তার। দূর দূর গ্রাম থেকে রোগী আসে তাঁর কাছে। পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। দাঁতে পানের ছোপ। একেবারেই মাটির মানুষ তিনি। সহজ-সরল, ঘোরপ্যাঁচ না–জানা মানুষ। জন্ম ১৩৪২ বাংলা। কলকাতায় ডাক্তারি পড়েছেন। লৌহজংয়ে অনেকদিন মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর বড়ভাই অপূর্বরঞ্জন দেও ছিলেন ডাক্তার। আর ছোটভাই চিত্তরঞ্জন দে ছিলেন মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের ভিপি। '৭৩ সালের একরাতে কোনও এক রাজনৈতিক দলের কিছু উগ্রদস্যু এই বাড়িতে ঢুকে ক্রসফায়ার করে একসঙ্গে দুইভাইকে হত্যা করে। সঙ্গে বড়ভাইয়ের চার বছরের একটি ছেলেও মারা যায়। ছোটভাই ছিলেন অবিবাহিত। বড়ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী পরে তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে উত্তর দিনাজপুরে চলে যান। এই বাড়ির চৌকিদারের গায়েও গুলি লেগেছিল। বাড়ির একটি ঘরের টিনের বেড়ায় এখনও গুলির চিহ্ন লেগে আছে। আর গুলির স্পর্শ লেগে আছে সুজিত ডাক্তারের হৃদয়ে। সুজিত ডাক্তারের দুই ছেলে। বড় ছেলে স্বপন দে পাঁচ বছর জাপানে ছিল, ছোটছেলে শ্যামল দে ঘোলতলীর ওদিককার জোড়পুল বাজারে বাবার সঙ্গে ডিসপেনসারিতে বসে। খুবই বিনয়ী ছেলে শ্যামল।

সুজিত দের বাড়িতে বসে আর একটি কথা ভেবে আমি খুবই শিহরিত হলাম। *পুতুলনাচের ইতিকথার* নায়ক শশী ডাক্তার ছিলেন। আজকের গাওদিয়ার সুজিত দেও ডাক্তার। কী অদ্ভুত মিল। গাওদিয়ায় এখন একটি মাত্র হিন্দু পরিবার, সেই পরিবারটি ডাক্তার পরিবার।

সুজিত ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়েছিলাম সেই বাড়িতে, যে বাড়ির খোঁজে আমি এসেছি, যে বাড়িকে শ্যামল বলেছিল শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি। শ্যামলই নিয়ে গেল। বাস্তবিকই, সুজিত ডাক্তারের বাড়ির একেবারেই কাছে। পশ্চিম দিকে। বাড়ির সামনে বহু পুরনো, বড় একটা পুকুর। শ্যাওলা-পড়া প্রাচীর বাঁধানো ঘাটলা। পুকুর পাড়ে ঘাটলার মতোই পুরনো দুতিনটা কড়ইগাছ। আকাশ আবার মেঘলা হয়েছে, মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়েছে চারদিককার আলো। বাড়িটি বহুকাল ধরেই মুসলমান মালিকের। পুরনো গেটে এলোমেলো অক্ষরে লেখা 'আনোয়ার ভিলা' তার নিচে দুপাশে লেখা 'সন ১৩৪৯'। আনোয়ার ভিলা 'মুখার্জী বাড়ি' বলে পরিচিত। বাড়ির পুবপাশটা অন্ধকার হয়ে আছে মেহগনি গাছে। শ খানেক মেহগনি গাছের বাগান। বাড়ি এবং বাগানের মাঝখান দিয়ে মেঠোপথ দক্ষিণে গেছে। সেই পথের পাশে একদা ছিল

বাড়ির নিজস্ব কালীমন্দির। এখন আর কিছুই নেই। হাতখানেক চওড়া, হাতদুয়েক লম্বা পাথরের একটা টুকরো পড়ে আছে। তাতে কী কী লেখা আছে। এখন আর পড়া যায় না সেই লেখা।

শ্যামল বলল, বাড়িতে ঢুকবেন?

ঢুকতে দেবে?

নিশ্চয়। আসুন।

বাড়িতে ঢুকে আমার গা আবার কাঁটা দিয়ে উঠল। গেটের পরেই পুবদিকে রান্নাচালা। এক মহিলা দুপুরের রান্না করছেন। শ্যামলকে দেখে সুন্দর করে হাসলেন। রান্নাচালার লাগোয়া দক্ষিণে একতলা পুরনো একটা দালান। দু'তিনটা কামরা করে বাড়ির লোক এই দালানেই বসবাস করেন। বোঝা যায় দালানটি নীরদাসুন্দরী দেবীর বাবার আমলের। নীরদাসুন্দরী দেবী মানিকের মা।

বাড়ির দোতলা মূল দালানটি পশ্চিম দিকে। এক চিলতে উঠোনের পাশে। সেটা একেবারেই পরিত্যক্ত। যখন তখন ভেঙে পড়ার ভয়ে কেউ থাকে না। নিচতলায় ডাঁই করে রাখা আছে লাকড়ি খড়ি, অপ্রয়োজনীয় কাঠকুটো। গাঢ় সবুজপাতার একটা 'ডেউয়া' ফলের গাছ দাঁড়িয়ে আছে দালানটির পশ্চিম-উত্তর কোণে। বাড়িতে বেশ কিছু ফলের গাছ। বিলেতি গাব, আমড়া, কামরাঙা। বিক্রমপুর এলাকায় এই ফলগুলো তেমন ফলে না। এই বাড়িতে ভালোই ফলেছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত দালানটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন চলে যায় ড. নিতাই বসুর লেখা *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা* বইটির পাতায়। সেই বইয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'মানিকের মায়ের নাম নীরদাসুন্দরী দেবী *পুতুলনাচের ইতিকথায়* উল্লিখিত গাওদিয়া গ্রামের মেয়ে ছিলেন তিনি। চৌদ্দ সন্তানের জননী নীরদাসুন্দরী। মানিক যখন ষোল বছর বয়স্ক তরুণ, তখন ১৯২৪ সালের ২৮ মে তারিখে টাঙ্গাইলে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নীরদাসুন্দরী পরলোক গমন করেন। মানিকের পিতামহ করুণাচন্দ্র গাওদিয়ার পার্শ্ববর্তী মালপদিয়া গ্রামে মাতুলালয়ের সাহায্যে ও সহায়তায় বসবাস করতে শুরু করেন। মোটামুটি এই সামান্য ঘটনাগুলো বাদ দিলে নীরদাসুন্দরী সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আর কিছুই জানা যায় নি। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে মানিক জননীর বিষয়ে আশ্চর্যরকম নীরব, যদিও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসটির নামই 'জননী', চিঠিপত্রে বা আলাপচারিতায় মাতৃপ্রসঙ্গ অনুপস্থিত; শৈশবসংক্রান্ত যাবতীয় স্মৃতিচারণায় জননীর রক্তমাংসহীন সত্তার গৌণ উপস্থিতি নজরে আসে। দুর্দান্ত বেপরোয়া মানিক শৈশবের দুরন্ত দিনগুলোর সীমা ছাড়িয়ে যে মুহূর্তে কৈশোরে পদার্পণ করেন সেই সময়েই ঘটে তাঁর মাতৃবিয়োগ এবং 'কী' ও 'কেন'র রোগে আক্রান্ত ঐ তরুণ বালক অতঃপর বলগাহীন বেপরোয়া উদ্দাম জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হতে থাকেন।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবন শুরু হওয়ার বছর তিনেক পর তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখণ্ডের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী পাওয়া যায় দুটো বাঁধানো খাতায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো কাগজপত্রের সঙ্গে ছিল খাতা দুটো। এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য আছে যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে মানিকের পিতৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন পাঁচপুরুষের একটি বংশতালিকা আছে।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'প্রপিতামহ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন রীতিতে প্রথম বংশজে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন, সুতরাং আমরা ভঙ্গ কুলীন রূপে চতুর্থ পুরুষে নামিয়াছি। রাজকৃষ্ণ ১১টি বিবাহ করেন। কোথায় বিবাহ করিয়া ছিলেন তাহা বাবার নিকট শুনিয়া ছিলাম কিন্তু এখন আর মনে নাই। পিতামহ রামনিধি বিক্রমপুরের অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেন ... যতদূর মনে হয়, তিনি দুই বিবাহ করেন ... পিতামহদেবের দ্বিতীয় পক্ষে একমাত্র পিতৃদেব করুণাচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালপদিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুল ব্রজনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে লালিত-পালিত হন এবং সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। আমরাও মালপদিয়া বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছি...'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্রমপুরে জন্মান নি। তিনি জন্মেছিলেন সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। ১৯ মে ১৯০৮। বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'অবসর' প্রকাশ করেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সম্পাদনা করেছেন হায়াৎ মামুদ, জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি রচনা করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত মানিকের জীবনপঞ্জি থেকে জানা যায়, মানিকের পিতৃপ্রদত্ত নাম, প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম, মানিক। পিতামাতার ১৪ সন্তানের মধ্যে পঞ্চমপুত্র মানিক। পিতার চাকরিসূত্রে মানিক পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং পরে সাবডেপুটি কালেক্টার ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এই মহান ঔপন্যাসিকের মৃত্যু হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাবাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুটারের কাছে এসে দেখি খালি গায়ে স্কুটারের সিটে ঘুমাচ্ছে ড্রাইভার। দু'বার ডাকতেই ধড়ফড় করে উঠল। শার্ট গায়ে দিলো। রওনা দেব, হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, সবই দেখা হল গাওদিয়ায় কিন্তু খালটি দেখা হল না। যে 'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন'।

খাল দেখাতে নিয়ে গেল শ্যামল। বাজারের পুব-দক্ষিণ কোণে এক চিলতে বদ্ধ ডোবা দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে গাওদিয়ার খাল। এটুকুই আছে। খাল ভরাট হয়ে এখন গাওদিয়া বাজার।

দেখে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ফেরার সময় 'আকাশে দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া' কোনও হুংকার ছাড়ে নি। তবে 'জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবিম্ব

কাজী নাসির মামুন

নায়কোচিত গুণাবলির সমন্বয়ে মানুষকে যেমন মহান করে তুলেছিল রোমান্টিক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য তাকেই লঙ্ঘন করে মানুষকে নামালো কীটের পর্যায়ে। জীবনযন্ত্রণার দগ্ধ পরিসরে পরিশিষ্ট মহত্ত্বও ধোপে টিকল না। যদিও এনলাইটেনমেন্ট-এর ধারণা দিয়েই ইউরোপে শুরু হয়েছিল আধুনিকতা। যার মূল কথা ছিল মানুষকে আলোকিত করা। যতদূর বুঝি মানুষের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের চরিত্রের আলোকিত অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আধুনিকতার এ হচ্ছে এক স্ববিরোধ। ব্যক্তিত্ব-বিবর্জিত মানুষের অনিঃশেষ হতাশার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আত্মদ্বন্দ্ব, নিরাশ্রয়তা, যুদ্ধোত্তর মানবিক বিপর্যয়, প্রযুক্তির ক্রমবিভীষিকা, নারীর অবমাননা, প্রকৃতিবিমুখতা, আবহমান ঐতিহ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নাগরিক আত্মপরতায় জীবন-সন্ধান এবং সর্বোপরি একটি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বিশুষ্কতাকে মেনে নিয়ে বিকল বস্তুতে সর্বস্ব খোয়ানো মন, শরীর হাতড়ে বেড়ানো আগুনের দিকেই এর অগ্রযাত্রা বহুলাংশে। নানা অনুষঙ্গে জড়িত এসব বিষয় আধুনিক সাহিত্যকে একটি অমাঙ্গলিক নেতির দিকে নিয়ে গেছে। ভালো বা মন্দের নীতিগত প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে জড়িত নয়, বরং বলছি সাহিত্যের প্রবণতার কথা। ধ্রুপদী সাহিত্যের দেবতা-বন্দনা পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন রোমান্টিক সাহিত্যিকেরা। সাহিত্যকে আনতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাতারে। এ ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে মানুষের ওপরই। দেবতা-বন্দনা একটা পোশাকি রূপ পেল মানব-বন্দনায়। ঐশ্বরিক গুণাবলিতে সাজানো হল মানুষকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চার্লস ডিকেন্সের *A Tale of Two Cities* উপন্যাসটির কথা। একই চেহারার আরেক বন্ধু চার্লসকে বাঁচাতে নিজে প্রাণ দিল সিডনি কার্টন। স্বেচ্ছায়। কেননা বন্ধুর বউ লুসির জন্য গভীর প্রেম ছিল তার। পরিণয় সম্ভব হয়নি। প্রেমিকার পরিবার বাঁচাতে তাই এই স্বেচ্ছামৃত্যু। বৃহৎ পরিসরে বলতে গেলে পৃথিবীর সবার জন্যই আত্মত্যাগের মানবিক মহিমা ছড়িয়ে গেল সে। উৎসমূলে রয়ে গেল অনুরণিত বাইবেল : I am the Resurrection and the life...। মানুষকে দেখানো হল খুব বড় করে। অন্যদিকে কাফকার *মেটামরফসিস*-এর নায়ক এক সকালে নিজেকে আবিষ্কার করল আরশোলা হিসেবে। আধুনিক জীবনে একজন যুবকের ব্যক্তিত্ব এমনকি পারিবারিক কাঠামোতেও কতটা হীনতর পর্যায়ে পৌঁছে তারই রূপকায়ন ওই আরশোলা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই তার কোন চরিত্র নায়ক পর্যায়ে উপনীত নয়। নায়ক চরিত্রের সেই প্রথাগত মহিমান্বিত রূপটিকে তিনি পরিহার করলেন। তার চরিত্রগুলো রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। দোষ-গুণ সমন্বিত। সবকিছু মিলিয়েই যেন একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়বে বেড়ে ওঠা। কাউকে হয়ত প্রধান চরিত্র বলা যায়।

কিন্তু অতিমানবীয় গুণসম্পন্ন নয় কেউই। যেমন নয় *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের তারক চরিত্রটি। তারক কুঁড়ে স্বভাবের। স্বার্থপর এবং ভাববিলাসী। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান—বিবর্জিত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত একটা প্রশ্নশীল মনও তার আছে। ফলে তাকে যুক্তিবাদী না বললেও ভাবসর্বস্ব বলা যায় না কিছুতেই। শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু তা ভাবকল্পনায়। বাস্তবে রাজনৈতিক দলের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সে আগ্রহী নয়। এমনকি চাকরির ব্যাপারেও তার ব্যাপক অনীহা। 'খবরের কাগজ ঘেঁটে বাবা নিজেই ছেলের জন্য বহু সম্ভাব্য চাকরি এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন এবং ছেলেকে দিয়ে দরখাস্তও পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে সব দরখাস্তের একটা জবাবও আসেনি।' আসলে তারক একটা দরখাস্তও পাঠায়নি। ব্যক্তিজীবনে বাবা-মার আদুরে সন্তান তারক বেশি রকমের প্রশ্রয়প্রাপ্ত। সেই প্রশ্রয়ের সূত্র ধরে বাবার সঙ্গে এই ন্যূনতম প্রতারণার একটা ছুতো সে নিজের মনেই আবিষ্কার করে নিয়েছে : 'বাপের মনে কষ্ট না দিয়ে নিজের ইচ্ছা বজায় রাখার জন্য সে এই প্রবঞ্চনাটুকু করেছে।' বড় ছেলের গঞ্জনায় মেজাজ বিগড়ে গেলে বাবা যখন সোজা কথায় নেমে আসেন, 'সংসার চলে কী করে?' তারকের মনে তখন কোন দরদ উথলে উঠতে দেখা যায় না। এ ব্যাপারে তার সংবেদনশীলতা শূন্যের কোঠায়। তার সোজাসাপটা জবাব, 'আমি কী করব?' অথচ বাবার মনে কষ্ট দেবে না বলে সে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এ শুধু প্রবঞ্চনা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা। সে চায় 'সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস, মন্থর, সরস, কোথাও নিয়ম নেই, বাধ্যবাধকতা নেই; রাজকতা নেই, আর বেশি রোজগার দিয়ে তার কী হবে? নেহাত দরকার হয়, সদরে চায়ের দোকান দিয়ে বসবে একটা।' এ হচ্ছে মধ্যবিত্তের জাত মানসিকতা। তারক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সে এত স্বাধীনচেতা যে চাকরি করবে না। অথচ বাবার সংসারে ভাইয়ের টাকায় গলগ্রহ জীবনযাপনে সে দারুণ অভ্যস্ত। ম্যাথু আর্নল্ড তার *কালচার এন্ড এনার্কি* গ্রন্থে মধ্যবিত্তকে আত্মতুষ্ট, অর্থলিপ্সু, 'ফিলিস্তিন' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণীসচেতন ছিলেন। মার্কসবাদী শিক্ষা গ্রহণের কিছু পূর্বে লিখেছেন *প্রতিবিম্ব*। সম্ভবত মানুষের মুক্তির জন্য পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। তাই মধ্যবিত্তের অনুৎপাদনশীল আত্মতুষ্টিকে তারক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রকাশভঙ্গি বিদ্রূপাত্মক, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে *বাংলা কথাশিল্পের কয়েকজন গ্রন্থে* হাসান আজিজুল হক মন্তব্য করেছেন, 'ভাষা সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলেই ভাষা যেন মানিকের প্রতিপক্ষ। তাঁর কাছে ভাষা একটা চ্যালেঞ্জের মতো, তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক দাঁড়ায় বিরোধিতামূলক। ভাষার সর্বসাধারণত্বটিকেই তিনি নাকচ করতে চান, ঝেড়ে ফেলে দিতে চান ভাষার গায়ে লেগে থাকা সর্বজনের সর্বক্ষণের ব্যবহারের দাগ।' এই মন্তব্যের কারণ বোধহয় এই যে, প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* থেকেই মানিকের ভাষায় একটা স্বতন্ত্র পরিশীলন আছে। আছে তার দার্শনিক সত্তার প্রতিফলন। আর দার্শনিকতা স্বভাবতই সাধারণতাকে পরিহার করে চলে। দার্শনিকতার এটি কোন দোষ নয়, প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিকে রূপ দিতে গিয়েই তার ভাষার কাঠামো বদলে গেছে। ভাষার ভিতরে এসেছে একটা নিস্পৃহ কিন্তু অনিবার্য আরোপণ। যেটি ছাড়া মানিকের স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ অসম্ভব হত। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো রসালো তিনি নন, কিন্তু তার চেয়ে নির্মোহ পরিব্রাজক। তথাপি আশ্চর্য লাগে *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে ভাষাকে তিনি অনেকটাই উল্টো স্রোতে প্রবাহিত রেখেছেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভাষাই যেন তাকে চালিত করেছে কোনরূপ আরোপণ ছাড়াই। তারকের বাবা 'প্রতিমাসে পেনশন পান।

বাড়ি-ঘর আছে, জমি-জমা থেকেও বছরে শ' দুই টাকা আয় হয়।' এভাবে ভাষা সরলীকরণের ভিতর দিয়ে একটানে শেষ লাইনটিতে গিয়ে পৌঁছে। শুধু তাই নয়, তারক-সম্পর্কিত অনেক কথা ন্যূনতম হলেও রসের উদ্রেক করে। তবে সর্বদা তিনি আবেগবর্জিত। বুদ্ধিবৃত্তির খোলসে বরং তিনি এই উপন্যাসে অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন :

'মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাব প্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে। ভবিষ্যৎকে–

সোজা ভাষায় বলি। তারকের মত ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা যে রূপ নিয়েছে, *প্রতিবিম্ব* তারই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা।'

কিন্তু উপন্যাসের বিষয়-বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের এই সহজ সরলীকরণ মানা যায় না। যদি মানা হয়, তবে শিল্পরস সীমিত হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সুতীব্র বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে সর্বপ্রথম লিখতে শুরু করেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়নি জীবনের সংজ্ঞায়ন। জীবন এত ব্যাপক, বিস্তৃত, গহিন এবং বহুমাত্রিক। জীবনবহির্ভূত কোন বস্তুনিষ্ঠ সত্তা নেই শিল্পের। ফলে সীমিত ধারণার আবর্তে শিল্পকে বেঁধে দিলে চলে না। তা হোক গল্প, কবিতা বা উপন্যাস। কিন্তু একজন বস্তুনিষ্ঠ লেখক হয়েও মানিক কেন প্রচ্ছদপটের এই লেখায় নৈর্ব্যক্তিকতাকে ব্যাহত করলেন। মানে খুলে দিলেন নিজের লেখা উপন্যাসের? 'লেখকের বক্তব্য' শিরোনামে তার ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি তেরশো পঞ্চাশের *যুগান্তর* পূজা বার্ষিকীতে *প্রতিবিম্ব* প্রকাশিত হবার পর অনেক বিরূপ মন্তব্য এবং অভিযোগ শুনে আহত হয়েছিলেন তিনি। রাজনৈতিক পার্টির বা প্রতিষ্ঠান ও মতবাদের বিরুদ্ধে এই উপন্যাসে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছে কেউ কেউ। এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে আগে থেকেই পাঠককে সজাগ করতে তিনি প্রচ্ছদপটের লেখাটি ছেপেছেন বলে মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে লেখকের তখনকার মানসিক অবস্থা এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। তারক চরিত্রের মধ্যে যে দ্বিধা ও সংশয়ের কথা লেখক বলেছেন তা যেন তার নিজের স্বরূপ। নতুন মতবাদে দীক্ষিত হবার আগে প্রত্যেকের মধ্যে এই দ্বিধার অনুরণন থাকা স্বাভাবিক। কেননা, 'ফ্যাসিজম, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা, পীড়ন, চোরাকারবার, দুর্ভিক্ষ, গ্রো মোর ফুড সব কিছুর মানে আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা যেন শুধু একটা জগাখিচুড়ি।' তারকের এই মনোবৃত্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার দেশের হ-য-ব-র-ল অবস্থা থেকে সৃষ্ট। 'ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন, দায়িত্ব– এসবে তারকের ভয় আছে, বিতৃষ্ণা আছে। একবার দলে ঢুকে পড়লে যদি একই সময়ে তার নিজের সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে দলের কোন নির্দেশের সংঘর্ষ বাধে?' তারকের এই ভয় কেবলই সহজাত? নাকি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আত্মদ্বন্দ্ব, তত্ত্বসর্বস্বতা, নেতৃবৃন্দের দলাদলি ও কলহের জের? আর যাই হোক, তারক কোন পুতুল চরিত্র নয়, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* মানিক যেভাবে দেখিয়েছেন। মানুষগুলো যেন পরাধীন। অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক। সেই শক্তি অবশ্য নিরূপিত নয়। শশী নিজে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ

করেছিল। পারেনি। তার বাবা গোপাল কাশী যাওয়ার নাম করে আর ফেরেননি। সহায়-সম্পত্তি সব রেখে গেলেন ছেলের জন্য। 'কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়।' তাই শশীর গ্রামে থেকে যাওয়া আর তারকের গ্রামে তথা মফস্বলে ফিরে আসার মধ্যে বিস্তর বিরোধ। শশী প্রায় নিয়তিতাড়িত। তারক উজ্জীবিত নিজের ইচ্ছায়। শশী বুঝেছে, 'জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না।' আর তারক আমাদের বোঝায়, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই তার আত্মোপলব্ধি হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যাতে শ্রমিক আরেকটা সামাজিক শ্রেণীর দাসত্ব করে। শ্রমিক ও শ্রম বুর্জোয়াদের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে। তারক দেখেছে শ্রেণী বিলোপের নাম করে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও তত্ত্বের হাতে বন্দি হয়ে আছে। তাদের পুস্তকপ্রিয়তা, পণ্ডিতমন্যতা নীরস বিপর্যয়ের মতো ঠেকে তার কাছে। সে বোঝে, 'ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে কোন দিন এরা ইচ্ছাকৃত সচ্ছলতায় পরিণত করতে পারবে না?' কেননা যাদের জন্য সংগ্রাম করবে তারকরা প্রাণপণ, তাদের সঙ্গে সরাসরি গণসংযোগ নেই এদের। তারক নিজেও সরল স্বীকারোক্তি করে : 'আমি সত্যি ওদের ভালো করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি। একসঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা।' এই ফাঁক তারকের একার নয়। পার্টির প্রায় সবার। তারক সেই ফাঁক রোধ করতে চায়। পার্টির কর্মীদের দরিদ্র জীবন ত্যাগের নামে অদ্ভুত কর্মকাণ্ডে মন বসে না তার। চাকরি করে দলকে টাকা দেওয়ার দলীয় নির্দেশ সে মানতে রাজি নয়। খুব কাছে থেকে পরিচিত চাষী-মজুরদের দেখে তাদের বিশেষভাবে চিনতে চেষ্টা করবে, এই আশায় মফস্বলে ফিরে আসে।

কিন্তু এই সরল পরিণতির মধ্যেই উপন্যাসের সবটুকু নয়। মানিকের উপন্যাসে যা সাধারণত দেখা যায় : যে সমাজে সে বাস করছে সেই সমাজেরই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যক্তির গতিপ্রকৃতি, মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ সমাজের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি প্রস্ফুটিত, কখনো কখনো ঠিক তার প্রতিক্রিয়া প্রতিস্বর হিসেবে। অর্থাৎ ব্যক্তি প্রধান নয়। মুখ্য হল সমাজবাস্তবতা। ব্যক্তির অন্তর্লীন মনস্তত্ত্ব মূলত সমাজেরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। কিন্তু *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে তিনি ব্যক্তি তারকের মধ্য দিয়ে সমাজের একটি খণ্ডিত অংশের অখণ্ড অবস্থার রূপ দিয়েছেন। ঠিক তারকের মধ্য দিয়ে নয়, বরং তারক এখানে দ্রষ্টা। ঠিক দ্রষ্টাও নয়, সে নিজেও সমাজের ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজেরই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কোন সমাজের? সেটা কি যুব সমাজ? যুগ পরিবর্তনের যে কথা মানিক প্রচ্ছদপটে লিখেছেন তার ব্যাপক বিস্তার কিন্তু নেই। দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবার কথা সংলাপের ভিতর দিয়ে দু'একবার আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তার চিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়নি। যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে, সেও সংলাপের ভিতর দিয়ে। যুদ্ধের বিভীষিকা একটি বারের জন্যও চোখে পড়ে না। অর্থাৎ সমাজের বাহ্যিক চিত্র তথা সমাজ নিজে এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। মুখ্য হয়েছে সমাজেরই একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অংশ, রাজনৈতিক দল তথা কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু উপন্যাসটিকে কিছুতেই রাজনৈতিক বলা যাবে না। কেননা এটি রাজনীতি-সম্পর্কিত কিন্তু রাজনীতির কোন বিশেষ মতবাদকে গুলিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা নেই। শিল্পের এটুকু দাবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা মেনে চলেন বলেই বিশেষ মতবাদের হলেও লেখক হিসেবে তিনি বিশেষায়িত অন্য কারণে। নান্দনিক জায়গায় তার অবস্থান অনন্য। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অভিনিবেশ বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়।

মানুষের আন্তঃসম্পর্ক এবং বাস্তবতার টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম এক পর্যবেক্ষণ প্রতিবিম্বিত হয় এই উপন্যাসে। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে কে বেশি ত্বরান্বিত করে জীবন-জটিলতাকে? বৃত্তি ও প্রবৃত্তির যোগসাজশে মানবিকতার বিকাশ। বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে অর্থনীতি। প্রবৃত্তির পরিচালক আমাদের মন। জীবন-জটিলতার জন্য এ দুয়ের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। যদি বলি এ দুয়ের সমন্বিত জটিল আবর্তনই আজকের আধুনিকতা, তবে খুব ভুল হবে না। মানিকের *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসও তাই মার্কস ও ফ্রয়েডের শুশ্রূষা পায়। শ্রেণী সংগ্রামে ব্রতী হলেও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য যতটা সুদৃঢ় সীতানাথের মধ্যে, অন্তর্গত লিবিডোকে স্বাভাবিক পন্থায় দমিয়ে রাখবার জন্য সুপার ইগোর অনুপ্রেরণা ততটা সুদৃঢ় নয়। মনোজিনীকে ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে। ভালোবাসার কথা শোনায়। যেন কিছুক্ষণের জন্য মার্কসকে ডিঙিয়ে প্রধান হয়ে ওঠেন ফ্রয়েড। মনোজিনীর কাণ্ডজ্ঞান অবশ্য এই শরীরসর্বস্ব ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেবার মতো নয়। কিন্তু সীতানাথকে সরিয়ে দেবার আগেই তারক থমকে যায়। 'জেগে থেকে তাকে অভিনয় করতে হবে ঘুমন্তের!' তারক তা পারে নি। কিল, চড়, ঘুসি বসিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করে দিল সে সীতানাথকে। এই আক্রমণ যতটা আকস্মিক এবং অমার্জিত হোক না কেন, নির্বুদ্ধিতার নয়, বিবেকতাড়িত। যদিও মনোজিনীর কাছে ব্যাপারটি 'পেটে খিদেয় কাতর হয়ে, খাবার চাইলে যত তুচ্ছ হতো, প্রায় সে রকম তুচ্ছ।' সে বলে, 'আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে দেওয়া হয়।... কিন্তু সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন-চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি।' যুক্তির মানদণ্ডে মনোজিনীর কথাগুলো সক্ষম। কিন্তু কতদিন এভাবে সামলে চলা যায়? লিবিডোর তাড়নাকে এভাবে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে দমিয়ে রাখতে রাখতে যে অবদমন তৈরি হয়, সেখান থেকেই তো মনোবিকারের শুরু। শ্রেণী দ্বন্দ্বের চাইতে মানবমনের এই অন্তর্গত দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া কম জটিল নয়। ফ্রয়েডের মতে, মানুষ যুক্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। তার বেশির ভাগ চিন্তা ও আচরণ নির্জ্ঞান প্রভাবিত। সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সভ্যতা মানুষকে মনোবিকারগ্রস্ত ও অসুখী করেছে। ফ্রয়েডবাদীরা এ কথা বিশ্বাস করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মনোজিনী যে যুক্তির আবর্তে সীতানাথের সম্ভোগ প্রবৃত্তিকে দমন করতে চায়, সেটা ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ববিরোধী। আবার পাভলভের প্রতিফলন তত্ত্ব অনুসারে সমাজ অভিজ্ঞতার উৎস এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের চৈতন্যের উপাদান মানসিক গুণরাজির উন্মেষ ঘটে। সীতানাথের ব্যাপারে মনোজিনীর যুক্তিময়তা আসলে মানসিক গুণরাজির উন্মেষের লক্ষ্যে সেই অভিজ্ঞতার অপেক্ষা। অথবা ওই অভিজ্ঞতার দিকে তাকে ধাবিত করবার চেষ্টা। সেটাই সে তারককে বলে। তাই ফ্রয়েড নয়, বস্তুবাদী পাভলভের সঙ্গেই কমিউনিস্ট মনোজিনীর মনস্তত্ত্ব বেশি খাপ খায়।

আবার অন্য পার্টি ত্যাগ করে হৃষীকেশ রায় যখন মনোজিনীদের পার্টিতে যোগ দেয়, তখন সীতানাথ আচমকা বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। হৃষীকেশের রিজাইন দেওয়ার কথা সে বিশ্বাস করে না। বলে, 'সমাজবিরোধী কাজের জন্য আপনাকে একস্‌পেল করা হয়েছে।' তখন পার্টির একজন টিপ্পনী কাটে, 'সমাজবিরোধী কাজ সম্পর্কে আমাদের সীতানাথের যে বলার অধিকার আছে তা অবশ্যই আমাদের মানতেই হবে। রাতদুপুরে ঘুমন্ত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে গিয়ে প্রহার খেয়ে চোখ-মুখ ফুলিয়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।' মনোজিনীর পণ্ডিতম্মন্যতা তখন সীতানাথের লিবিডোর

স্বপক্ষে যুক্তির আড়াল তৈরি করতে পারে নি। যেমন সে পেরেছিল তারককে দমিয়ে দেবার বেলায়। ওই টিপ্পনী থেকেই বোঝা যায় সীতানাথের লিবিডোর ব্যাপারে সুশিক্ষিতা মনোজিনীর যে মার্জিত যুক্তিবোধ, তার প্রতি ভাববাদী তারকের যেমন গভীর প্রত্যয় নেই, পার্টির কর্মীদেরও নেই সেই প্রত্যয়। সময়ে টিপ্পনী কাটতেও তাদের দ্বিধা নেই। এমনকি পার্টির স্বার্থে নিরেট সত্যকে দমিয়ে দেবার বেলায়ও। মানসিকভাবে তারা অসংঘবদ্ধ।

বৃত্তির নেশায় কলকাতায় আসা তারক প্রবৃত্তির ওই দ্বন্দ্বকে বড় করে দেখে নি। কনফারেন্স ভেঙে যাওয়া, দলাদলি ও বিবাদের প্রাণকেন্দ্রে বৃত্তিকে জড়িয়ে থাকা অর্থের লগ্নিকে টের পায় সে। সেক্রেটারিকে উদ্দেশ করে তাই তার সরল প্রশ্ন, 'এত টাকা কী হয় আপনাদের? আপনার নিজের পকেটে কত পার্সেন্ট যায়?' কিন্তু এও ঠিক, 'তারকের অনেক রকম আত্মবিরোধিতার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে একটি নির্বিরোধী সহজ-সরল বিশ্বাস টিকে আছে। মানুষের মনুষ্যত্বে তার সন্দেহ নেই।' এ ব্যাপারে মানিক নিজেও ছিলেন নিঃসংশয়। কোন সত্যের ওপর ভিত্তি করে তার এই সংশয়হীনতা? *শিল্পীর রূপান্তর*-এ আবু হেনা মোস্তফা কামাল যেমন মানিক সম্পর্কে বলেছেন, 'শিল্পের চেয়ে জীবনই তাঁর কাছে গভীরতর সত্য।' নিজের ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, 'তারক বদলে যাবে।' আমরাও জানি সে বদলাবে। এ বদলানো মানুষের পক্ষে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যেমন ছিলেন আজীবন মানুষের পক্ষের লোক।

ছোটবড় : বিপন্ন মানুষের বিক্রমের গল্প

গাজী আজিজুর রহমান

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের *অলোক সামান্য* লেখক। রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের পর মানিক আজও অদ্বিতীয়, সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, বিশিষ্ট এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল লেখক। মানিক এজন্যই বিশিষ্ট যে তিনি আগাগোড়া আধুনিক জটিল অথচ জঙ্গম। যুগ ব্যাধি, কালের কালকুট, জ্বলন্ত বাস্তবতা– সে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মানুষ যাই হোক না কেন তাঁর সাহিত্য শরীরে-শিরায়-শোণিতে ছড়িয়ে আছে নানা বৈচিত্র্যে, রঙে-রহস্যে বিপন্ন বিষে ও বিক্রমে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এতটাই জটিল, জনান্তিক, গভীর ও গম্ভীর, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ যে সকলেই সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। তিনি অভাবিত জীবন, অনালোকিত সমাজ, অ-উন্মোচিত মন ও অপরিজ্ঞাত আধির শিল্পী। সে কারণে তাঁর লেখা আজও নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং অনুসন্ধানের ও আবিষ্কারের।

রবির উজ্জ্বলতা নিয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যে জ্বলছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি মাণিক্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে মানিক। তাঁর বিধৃত যুগের সূচনা হয়েছিল একাকিত্বে, আত্মপ্রত্যাহারে, নিরুদ্যম, বিচ্ছেদ, পরবাসী ভাবের মধ্য দিয়ে। ক্রমেই তা হয়ে ওঠে জটিল, বিশৃঙ্খল ও বিরুদ্ধ বাসিত। তারও পর তা সহজ হয়ে আসে, মেঘ কেটে আলো জ্বলে, স্থিতি আসে, জেগে ওঠে বাস্তবের বেলাভূমি, নিত্যদিনের সমাজ-সংসার, শিল্পীর দায় ও দায়িত্ব। এই দায় সমাজ অসঙ্গতির, মানুষের সংকটের, নব উদ্ভাসিত চিন্তার, সমষ্টিজীবনের। এভাবেই মানিকের পাঠ বদলেছে, প্যাটার্ন বদলে উত্তরণ ঘটেছে। মানিকের এই গতিপথের বা বাঁকের অন্তিম অধ্যায় আমাদের অবস্থান।

দীর্ঘ আঠাশ বছরের সৃষ্টিকালে (১৯২৮-১৯৫৬) একজন 'কলম মজুর' হিসেবে মানিকের চল্লিশটি উপন্যাস, দুশো ষাটটির মতো গল্প, পনেরটি গল্পগ্রন্থ, একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, কিছু কবিতা ও চিঠিপত্র প্রমাণ করে তিনি কেবল লিখেছেন আর লিখেছেন। শুধু লেখেন নি লেখার মতো করে লিখেছেন, দায়িত্ব নিয়ে লিখেছেন। তিনি ছিলেন ঝোড়ো যুগের ঝড়ের পাখি। তাঁর সময় অতি দ্রুত সব কিছু বদলে যাচ্ছিল। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিল্প, রাষ্ট্রচিন্তা, দেশ-দুনিয়া সব। জ্ঞান হতেই দেখলেন একটা পরাধীন দেশ। দেখলেন সাত সমুদ্র পারের মানুষ এ দেশের রাজা। দেখলেন ঘরে-বাইরে অভাব-দুঃখ-দারিদ্র কত নির্মম। দেখলেন মানুষ কত অসহায়, পীড়িত, পর্যুদস্ত। আরো দেখলেন অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, কমিউনিস্ট আন্দোলন, জাতি বিদ্বেষ, দেশ বিভাগ, চীনা বিপ্লব, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এমনি কত ঘটনা ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। এ সবের কিছু কিছু তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল, ভাবিয়ে তুলেছিল, ক্ষুব্ধ করেছিল, আবার কিছু কিছু থেকে হয়েছিলেন অনুপ্রাণিত উদ্বোধিত ও উদ্দীপ্ত। তৎকালীন তোলপাড় করা বিশ্ব ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাত তাঁর সৃষ্টিতে এনেছিল নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন চিন্তা, নতুন

রাজনৈতিক বাতাবরণ। তিনি হৃদয় থেকে নেমে এলেন লোকারণ্যে, রাজপথ ছেড়ে মেঠো পথে, গলিতে, বস্তিতে, জীর্ণ কুটিরে। তিনি হয়ে উঠলেন দরিদ্র মানুষের, দুঃখী মানুষের, নিপীড়িত ও প্রতিবাদী মানুষের কবি। জীবন ডুবিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন এই সব মানুষের সংকট কী, সমস্যা কী, আর সমাধানই বা কী! সমাজ, রাজনীতি, সংগ্রাম, অবহেলিত-বঞ্চিত মানুষের সত্তার সাথে তিনি এতটাই জড়িয়ে পড়লেন যে পাঠক পূর্বের স্বপ্নতাড়িত, লিবিডো তাড়িত, শিল্পশাসিত মানিককে মেলাতে পারলেন না বর্তমান অনুষঙ্গে। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাই যথার্থই বলেন, 'মানিক সেই ব্যক্তিত্ব যার মূল্যায়ন সবচেয়ে কঠিন-জটিল-বঙ্কিম এবং দুঃসাধ্য।'

মানিকের মনোভূমি বা বিশ্বে প্রবেশ করতে হলে তাই অনেকটা প্রস্তুতি নিয়েই প্রবেশ করতে হয়। কারণ তিনি সহজ, সরল বা প্রথাগত নন। টেস্টামেন্টীয় সৌন্দর্য, প্লেটোনিক লাভ বা গীতাগত নৈতিকতার শিল্পী বা দার্শনিক তিনি নন। তিনি বিশ শতকের আধুনিক মতবাদের অগ্রসর লেখক। তাঁকে যথার্থ বুঝতে হলে যেমন ফ্রয়েড ও ইয়ুংকে বুঝতে হয়, তেমনি বুঝতে হয় মার্কসবাদকে, আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বকে, তিরিশোত্তর যুগ, কল্লোল যুগ ও যুদ্ধোত্তর যুগকে। বুঝতে হবে গোর্কি, এলিয়ট, এলুয়ার, আরাগঁ, বারবুসে, নেরুদা ও ব্রেখটকেও। কারণ এদের জটিল, বন্ধুর, বিসর্পিল মানবমুক্তির পথ ধরেই মানিকের অগস্ত্যযাত্রা। নইলে মানিকের সাহিত্য-রস থেকে যাবে অনাস্বাদিত।

যে মধুর প্রেম ও প্রণয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে (*'অতসী মামী'* ১৯২৮) মানিকের গল্পযাত্রা, প্রবৃত্তির দাসত্বে যার অদম্য উৎসাহ (*প্রাগৈতিহাসিক*), মন ও অবচেতনের আলো-আঁধারিতে যার পক্ষ সঞ্চালন (*মিহি ও মোটা কাহিনী*), মনস্তত্ত্ব, যৌনতা, তামস ও অর্থনীতি একই সমান্তরালে প্রতিষ্ঠিত (*সরীসৃপ*), মধ্যবিত্তের অপূর্ণ স্বপ্ন, সাধ ও অসংগতির যে গভীর বেদনা (সমুদ্রের স্বাদ), *'ভেজাল'*-এ এসে যা বাঁক নেয় রাজনীতিতে, 'হলুদ পোড়া'য় যা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কুসংস্কার আর কূপমণ্ডুকতায়। তারপরই জীবনের চোরাগলি থেকে, অন্ধকার থেকে, উন্মুখ প্রবৃত্তির অতল থেকে বেরিয়ে আসেন মানিক প্রমিথিয়ুসের বেশে। চোখে তাঁর চৈত্রের আলো, চেতনায় সমাজ সভ্যতার বৈকল্য ও কল্যাণ চিন্তা, ব্যক্তিকে বিনাশ করে সমষ্টিতে সমর্পিত– *আজকাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬) থেকে মূলত এই জীবন চেতনা ও কাল সচেতনার সমুদ্ভব। আর রোমান্স বা রহস্য নয়, জটিলতা নয়, শিল্পের বিলাস নয়, মনোজগতে নির্বাসন নয়– যেন এবার কঠিন কঠোর গদ্যে'র হাতুড়ি হানার পালা। সেই গদ্যগন্ধী সমাজ-মানুষ ও সময়ই এখন তাঁর চেতনার পটভূমি ও প্রকৃতি। এর জন্য একটা মঞ্চ বা প্লাটফর্ম দরকার তাই গ্রাম ও শহর। কিছু কুশীলব প্রয়োজন তাই দরিদ্র ও পীড়িত কিছু মানুষ, একটা উত্তরণ চাই তাই সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অবলম্বন করা, আর স্বপ্নটা শোষণ মুক্তির ও সাম্যের। কিন্তু সবটাই দেখেছেন 'সূক্ষ্ম-পরিসরে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, তীব্র আলোকপাতে, আণুবীক্ষণিক তীক্ষ্ণতায়'– যা ছোটগল্পের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন, মানিকের আছে সেই অসাধারণ শিল্পীকুশলতা এবং জীবন ও সমাজ বিচারের দীপ্তি।

দুই

সংখ্যায় নয়, ওজোগুণেই মানিকের গল্পের বিশিষ্টতা, অনন্যতা। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ফাঁসি', 'ভূমিকম্প', 'হলুদ পোড়া', 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র মতো গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। তাঁর

অসংখ্য গল্পের ভিড়ে আমাদের আলোচিত *'ছোটবড়'* (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের দু একটি গল্প ছাড়া বাকি গল্পগুলো ততটা পরিচিত নয়, আলোচিতও নয়। এটি মানিকের দ্বাদশ সংখ্যক গল্পগ্রন্থ। মূলে এই সংকলনে চৌদ্দটি গল্প থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত *'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র'*র ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে তেরটি গল্প। 'চালক' গল্পটি এই খণ্ডের 'খতিয়ান' (১৯৪৭) গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'ছোটবড়'-তে অনুপস্থিত। লক্ষণীয় মানিকের অনেক গল্পের মতো এই সংকলনের 'তথাকথিত', 'স্টেশন রোড', 'পেরানটা', 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ ও গ্রন্থে প্রকাশিত পাঠ অনেক আলাদা বা ভিন্ন। এমনকি গল্পের নামেরও ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন ১৩৫৪ সালে শারদ সংখ্যা 'যুগান্তর'-এ 'গায়ন' নামে যে গল্পটি প্রকাশিত 'ছোটবড়'-তে এসে তা হয়ে যায় 'গায়েন।' অনুরূপভাবে একই বছর 'স্বরাজ'-এ প্রকাশিত 'ধানের গোলার ধান' সংকলনে এসে নাম ধারণ করে শুধু 'ধান'। এই সংকলনের 'গায়ন', 'তথাকথিত' ও 'ধানের গোলার ধান' নিয়ে বিষ্ণু দে ও নীহার দাশগুপ্তের মধ্যে এক দীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল, শেষে মানিকবাবুও সেই বিতর্কে অংশ নেন। নীহার বাবুর মূল কথা ছিল 'সাধারণ মানুষ গল্পের ভেতর ভিড় করে এলেই গল্প বাস্তব ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতায় ও দরদের অভাবে সে গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়েও পৌঁছাতে পারে।' লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদী দর্শনকে আক্রমণ করা। কিন্তু মানিকতো অত কাঁচা মার্কসিস্ট নন। নীতি নয়, আদর্শ, সততা ও শ্রেণীতত্ত্বের স্বচ্ছতা দিয়েই মানিক সমাজ-ধৃত গণমানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা-সংকট-সংগ্রামকে চিরকালের সমস্যা হিসেবে বিবৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চিন্তার সার্থক লেখক হিসেবে বারবুসে, আরাগঁর মতো মানিকের সৃষ্টিও কম সার্থক নয়।

'সরীসৃপ' গল্পের শুরুতে একটা বাক্য ছিল, 'চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি।' *'ছোটবড়'*র গল্পগুলো যেন প্রতীকার্থে ওরকম। অগণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এই সমাজে তিনতলা বাড়িটার মতো– যারা তথাকথিত অভিজাত, বড় লোক, উঁচু সমাজের মানুষ। বাকিরা ওই বাগানের মতো নিচু তলার মানুষ, অতি সাধারণ, খেটে খাওয়া না খাওয়া মানুষ। এই যে একতলা-তেতলা, উঁচু ও নিচু, ছোট ও বড় এদের ব্যবধান, শ্রেণীগত অবস্থানের পার্থক্যটা মানিককে খুব পীড়া দিয়েছিল, হার্ট করেছিল। এই বেদনা ও ক্ষোভ থেকে মানিক তাঁর পূর্বাবস্থা পরিবর্তন করে মার্কসবাদ বা সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়ে দূর করতে চেয়েছিলেন শ্রেণী ব্যবধান। যুগে যুগে দেখা গেছে এটা এমনি এমনি দূর হয় না, হবার নয়– তাই চেষ্টা করেছিলেন গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে গণমানুষকে সংগঠিত করে, ঐক্য ঘটিয়ে, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণসচেতনা সৃষ্টি করে ধনী-দরিদ্র, শাসক-শোষক, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের পার্থক্য দূর করা যায় কি না। এই আদর্শনিষ্ঠ ভাবনা থেকেই তিনি জীবনের শেষ দশটি বছর (১৯৪৬-১৯৫৬) অবিরাম লিখে গেছেন সাধারণ মানুষের বঞ্চনা, পীড়া, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বাঁচার দুর্মর আকাঙ্ক্ষার গল্প।

সে কারণে এ পর্বের সমস্ত গল্পে দেখি একই সুর, একই ছন্দ, একই সত্য, একই বাস্তবতা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে গল্পে। যেন তাঁর লেখনীর সব পথ, সব চিন্তা, সব ভালোবাসা যেয়ে মিশেছে খেটে খাওয়া, পোড় খাওয়া, কৃষক-শ্রমিক-মজুর, নিরন্ন-নিরক্ষর-নিঃস্ব মানুষের দ্বারে। তাঁর দরদী লেখনীতে আশ্রয় পেলো দরিদ্র জীবন, ব্যাধিগ্রস্ত জীবন, অনিশ্চিত জীবন, বৈষম্য শিকারিত জীবন, উন্মূল উদ্বাস্তু অভাবী জীবন। তিনি কখনো হিন্দু হতে চান নি, মানুষ হতে চেয়েছিলেন, ধার্মিক হতে চান নি

ধর্মনিরপেক্ষ হতে চেয়েছিলেন, নিচুতলা উঁচুতলার মানুষ হতে চান নি, একতলার মানুষ হতে চেয়েছিলেন। প্রয়োজনে প্রতিবাদ করে, সংগ্রাম করে এই আদর্শ ও মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি এ পর্যায় নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, অভাবী, অভাজন, অভাগাদের সাথে। শুধু জড়িত নয়, ছিলেন তাদের সহমর্মী, সহযোদ্ধা, স্বজাতি। এজন্য অভয় দিয়ে, অদম্য বাসনা দিয়ে, উত্তাপ দিয়ে, বিপ্লবের আগুন দিয়ে তিনি সুকান্তের মতো ঝড় তুলেছিলেন গল্পে। যেমন ঝড় তুলেছিলেন হ্যামসুন, গোর্কি, এলুয়ার, আরাগঁ, নাজিম-নজরুল।

'ছোটবড়'-র অধিকাংশ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ক্ষুধা, জোতদার-বর্গাচাষী বিরোধ, দেশ বিভাগজনিত অস্থিরতা, বেকারি ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে বস্তিবাসীর যাপিত জীবনের দুর্দশা, ছোটখাটো ব্যবসায়ীর হালচাল, ছোট চাকুরের দুর্ভোগ, সরকারের দুর্নীতিবাজ নির্যাতনকারী পুলিশ, পুলিশ ও জোতদার-জমিদারের দালাল, শঠ, প্রবঞ্চকসহ প্রতিবাদী মানুষ, বিদ্রোহী নারী। অসংখ্য মানুষের বিষয়-আশয়-বৈচিত্র্য, বিবাদ-বিরোধ-বচসা-বিক্রম নিয়ে গড়ে উঠেছে *'ছোটবড়'*-গল্প ভুবন।

১৯৪৪-এ মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হবার পর তাঁর জীবন সমাজ ও সাহিত্য ভাবনায় যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে কিছু কিছু লেখায় সে মনোভাব স্পষ্ট। ক. সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? খ. শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি– সাহিত্যে কি তা আসবে না? গ. ভাব প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। ঘ. লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। নোবেল বিজয়ী চেসোয়াভ মিউশের মতো মানিকও বুঝেছিলেন, যে সাহিত্য জীবন ও সমাজ, দেশ ও মানুষের কাজে লাগে না সে সাহিত্য সাধনা বিলাস বা বৃথাই। মানিকের এই গণসাহিত্য চেতনাকে যারা মার্কসবাদের কচকচানি বলেন, শিল্পহীন অসার্থক সাহিত্য হিসেবে গণ্য করেন তারা মূলত মার্কসবাদেরই তীব্র সমালোচক এবং প্রগতির পরিপন্থী। মানিক বুঝেছিলেন শিল্পের চেয়ে জীবন বড়, মানবতা বড়, মানব মুক্তি বড়। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর উপলখণ্ড আকীর্ণপথে যাত্রা। যে পথ রক্তের, সংগ্রামের, সত্যের– সেই পথই ডেকে আনবে একদিন অনুকূল দিন, জয়শ্রী জীবন। যে পথ ওডিসিয়সের, টেলিমেকাসের।

রোমান্টিকতার পরিবর্তে জীবনের অপরিবোধ্য বাস্তবতাই যে সবচেয়ে সত্য– এই উপলব্ধি থেকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মড়ার যেমন জাত থাকে না জীবিতেরও জাত থাকা উচিত নয়। জাত থাকা উচিত নয় গরিবের-শ্রমিকের-মজুরের। বাঁচার স্বার্থেই জাত থাকতে নেই নিম্নবিত্তের, নিম্ন বর্ণ বা গোত্রের, শোষিতের শাসিতের। বাঁচা ও বাঁচানোর স্বার্থেই মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে উচ্চবিত্তের লোভ-লালসা, কূটৈষণা, কৃপার কৃপাণ থেকে। ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দের অভিলাষকে পরিত্যাগ করে সমষ্টির স্বার্থে লড়ে লড়ে আনতে হবে সমষ্টির বৃহত্তর মুক্তি, সুখ ও স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনের সূর্যকরোজ্জ্বল সুদিন। ক্ষুদ্রতা, দীনতা, দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে ভাত-কাপড়ের জন্য, মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁইয়ের জন্য, অনাহূত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

ছিনিয়ে নিতে হবে সবগুলোর অধিকার। *'ছোটবড়'*র গল্পগুলোতে ঝলসে উঠতে দেখি সেই জীবনদর্শনের লেলিহান শিখা, রক্ত-রক্তিম পাখা।

*'ছোটবড়'*র পূর্বগ্রন্থ *'খতিয়ান'*-এ 'খতিয়ান' গল্পটিতে লেখক মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সব মানুষকে এক প্রজাতির মানুষ হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন দর্শনের যে বীজ রোপণ করেছিলেন গ্রন্থে শেষ গল্প 'একান্নবর্তী'র শেষ বাক্যে তা হয়ে উঠে আরো সুদৃঢ়, লক্ষ্যভেদী এবং বিশ্বাসে বলীয়ান। 'ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে চেয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জেদ।' এ রকম শত লক্ষ্মি, লক্ষণের জীবন প্রত্যয়ের বিক্রম আমরা দেখবো *'ছোটবড়'*তে। এই প্রত্যয় ধীরে-সুস্থে সঞ্চার করেন মানিক প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের মনে। এই প্রত্যয় ধারণ করেই স্ফীত হয়, অগ্নিগর্ভ হয় *'ছোটবড়'*র গল্পগুলো। কিন্তু নিশ্চিত হয় কি কেউ সুদিন আসবে, মেঘ ভেঙে সূর্য উঠবে, অবসান হবে সব বেদনার বঞ্চনার? এর দার্শনিক ভাব লাস্কির ভাষায় 'অনিশ্চিতিই একমাত্র নিশ্চিতি।' বিজ্ঞানও তাই বলে। তবু নিশ্চিতির জন্য লড়াইতো থেমে নেই। নিশ্চিতির লড়াই আছে বলেই অনিশ্চিতিতে এক ভারসাম্য আছে। শোষক-শাসক উভয় উগ্রভাবে টিকে আছে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে রক্ষিত হচ্ছে ব্যালান্স। দূরত্বটা না কমলেও বাড়ছে না। সেটাই *'ছোটবড়'*র লড়াই, অভিজ্ঞান, আলো ও আশা।

'খতিয়ান' গল্পেই লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রমিক হিসেবে হিন্দু-মুসলমান যখন মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে তখন শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ হয়, ন্যায্য দাবিও আদায় হয়, কিন্তু যেই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে, ঐক্য বিনষ্ট হয়, সেই নির্বিঘ্নে শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং প্রতিবাদ করলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কে ধরে পুলিশ জেলে পোরে। এতে হিন্দু বা মুসলমান পরাজিত হয় না, পরাজিত হয় মানুষ, শ্রমিক, গরিব বা ধর্ম। এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন মানিক এবং উত্তরণের। হয়তো তাতে ভাব ও ভাষাটা একটু খটমটে বা রাগী হয়ে গিয়েছিল– কাব্যিক বা ছান্দিক হয় নি। কিন্তু কে না জানে সত্য বা বাস্তব চিরকালই কঠিন ও রূঢ়। তাইতো রবার্ট ওয়েন, এলিয়ট, জাঁ জীনে, হাক্সলি, এলেক্সেলি, সিনক্লেয়ার লুইস, কার্ল স্যান্ডবার্স, মায়াকোভস্কি, ব্রেখট ইত্যাদি কবি-সাহিত্যিকের হাতেই রচিত হয়েছে বিশ শতকের বাইবেল। সেই পোড়ামাটি, ক্লেদ, খেদ, ক্ষোভ, বিক্রম রচনার বাইবেলে মানিকের অবদানও অনস্বীকার্য।

তিন

তাঁর মৃত্যুর পর গুনে গুনে কেটে গেছে বায়ান্নটি বসন্ত। চলছে জন্মশতবার্ষিকী। অথচ সময় তাঁকে এতটুকু স্থান বা ধূলি-ধূসরিত করে নি, বরং দিনে দিনে হয়ে উঠছেন উজ্জ্বল, অদম্য, প্রাসঙ্গিক। এ তাঁর সুদূর দৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় সৃষ্টির ফল। তাঁর লেখার মূল উপাদান মানুষ– নানা কিসিমের মানুষ– দুর্বল, মলিন, পঙ্গু, ছেঁড়াখোঁড়া, ব্রাত্য, তেজী, তস্কর সবাইকে ভালোবেসে, সম্মান করে দিয়েছেন উচ্চ আসন। আর যারা প্রকৃত ঘৃণার যোগ্য, অনাচারি, অত্যাচারী, বিবেকহীন পশু তাদের বিনাশ চেয়েছেন সমাজ ও সংসার থেকে। যে মানুষেরা প্রতিদিন অভাব-অত্যাচারে ক্ষয় হচ্ছে, ভাঙনে ভেসে যাচ্ছে, উৎখাত হচ্ছে জমি থেকে, কারখানা থেকে, ফসলের অধিকার থেকে তারাতো প্রেমহীন, স্বপ্নহীন হবেই। এ পর্বে তাই প্রেম নেই, স্বপ্ন নেই, প্রকৃতির পুরাণ নেই, রোমান্সের লেশ নেই। যা ছাড়া সাহিত্য শিল্প অচল বলে স্বীকৃত, সেই রূপ-রঙ-রস ছাড়াও যে মহৎ সাহিত্য হয় *'ছোটবড়'*র গল্পগুলোর কলরোল তার প্রমাণ।

আগেই বলেছি মানিকের গল্প মানুষের গল্প। খেটে খাওয়া, মার খাওয়া, পোড় খাওয়া, অন্ধকার গলি, বস্তি, বাগদী পাড়া, স্টেশন, বাজার, নদীর তীর, রাস্তার ধার, বিল-খাল-জঙ্গল, জমি-জিরেতহীন মানুষের গল্প। যারা শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, দিন-মজুর, ছোটখাটো চাকুরে, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, দাঁড় বাওয়া, হাল টানা, ছোট মাপের, ছোট জাতের মানুষ তারাই মানিকের গল্পের নায়ক-নায়িকা। বড়রা প্রতিনায়ক, প্রতিনায়িকা বা ভিলেন। এদের জীবনেও যে গল্প আছে, সংস্কৃতি আছে– মানিক নিজে সেই মানুষদের একজন হয়ে, সাহায্য করে প্রমাণ করেন এরা ছোট হলেও এদের জীবনের গল্প ছোট নয়, সরলও নয়, সহজও নয়। বরং সর্পিল, জটিল, কুটিল, শাণিত, নৃশংস, বুদ্ধিদীপ্ত, তেজদীপ্ত। এরাও জীবনের জন্য যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে, মারে-মরে, মচকায় কিন্তু ভাঙে না। তারাও স্বাধীনতা প্রিয়, অধিকার প্রিয়, হাঙ্গামা প্রিয়, শত্রু হননে প্রিয়। এরা মার্কসবাদ বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু সাম্য-মৈত্রী-ঐক্য বোঝে, ভাত-কাপড়ের লড়াই বোঝে, ছোটবড়র বিভেদ বোঝে, সমশ্রেণীর দরদ বোঝে, মান-ইজ্জত বোঝে, সততা-শান্তি তাও বোঝে। গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক বোঝাটাকে একটু সহজ ও স্বচ্ছ করে দেন মাত্র। মানিক হয়ে ওঠেন তাই গণমানুষের শিল্পী। ভাষাটা হয়ে ওঠে গণমানুষের। গণবিপ্লবের গল্পে মানিক আজও অদ্বিতীয়। যার সূচনা করেছিলেন সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)। তারশঙ্করের গল্পেও সেই আদর্শ ও সংগ্রামের রূপ কমবেশি উদ্ভাসিত।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে *'ছোটবড়'*র গল্পগুলো চিত্রিত এবং বিচার্য। এর অধিকাংশ গল্প যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, সংগ্রাম, সংকট, অত্যাচার, আন্দোলন, শোষণ-পীড়নের পটভূমিতে রচিত। এর চরিত্ররা অনবরত যুদ্ধরত দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ-শাসন, অন্যায়-অবিচার, বেকারি ও বৈকল্যের সাথে। এসবকে পুঁজি করে মানিক এক নতুন তাৎপর্যময় জীবনের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। জাগিয়ে ধরেছিলেন এই নতুন জীবনের শিল্পকে। কালানুক্রমিক বিচার করলে দেখা যায় প্রথমে মানিক মানুষের যৌনজীবন, দাম্পত্য জীবনের সংকট, দুঃখ, দারিদ্র্য, লোভ, মোহ, কুসংস্কার, প্রবৃত্তির প্রেষণা ও প্রেমের পঙ্কজ প্রস্ফুটনে ব্যস্ত। দ্বিতীয় পর্বে মানিক মোকাবিলা করে চলেন সমাজবাসিত মানুষের (বিশেষ করে মধ্যবিত্ত) সংকট, সমস্যা, অস্থিরতা, মানবিক বিপর্যয়, মানসিক যন্ত্রণা, ক্ষয় ও রক্তক্ষরণ এবং ন্যূনতম সামাজিক একটা পরিবর্তনের। আর অন্তিম পর্বে লড়াই করেন ফ্যাসিবাদ, মুনাফাখোর, লুটেরা, ক্ষমতাবান শক্তির বিরুদ্ধে। লড়াই করেছিল দলিত শ্রেণী সমবেতভাবে। *'ছোটবড়'*র গল্পগুলো তার উজ্জ্বল সাক্ষী।

ইত্যাদি প্রেক্ষিত ও জীবনপটের ভিত্তিতে *'ছোটবড়'*র গল্পগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় প্রেক্ষিত ক. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার প্রতিক্রিয়ার 'ভালবাসা', 'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে'। প্রেক্ষিত খ. জমিদারের অত্যাচার ও কৃষক বিদ্রোহের গল্প : 'দিঘি' ও 'পেরানটা'। প্রেক্ষিত গ. যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের গল্প : 'তথাকথিত', 'সাথি' ও 'গায়েন'। প্রেক্ষিত ঘ. মজুতদারির গল্প : 'ধান'। প্রেক্ষিত ঙ. প্রতিবাদী গল্প : 'হারাণের নাতজামাই'। প্রেক্ষিত চ. মিশ্রভাবের গল্প : 'নব আলপনা', 'ব্রিজ', ও 'স্টেশন রোড'। সব মিলে মানিকের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা খেলা করে সাধারণ মানুষ, ছোট-বড় মানুষ, নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। গল্পগুলোর ভেতর দিয়ে তাঁর বিশ্বাসের রাজনীতি সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা হিসেবে স্রোতস্বতী করে তুলতে চেয়েছিলেন বিপ্লবী রাশিয়ার সাহিত্যিকদের মতো।

*'ছোটবড়'*র সব গল্পই খুব ছোট। সহজ-সরল-আটপৌরে-অনাড়ম্বর-গদ্যগন্ধী, কিন্তু চকচকে, চঞ্চল, শাণিত, সমাজ বাস্তব চেতনায় মূল্যবান। এখানে কোনো সস্তা আবেগ নেই, আবার গভীরতর ব্যাপ্তিও নেই। হয়তো 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'হলুদ পোড়া' বা 'আত্মহত্যার অধিকার' পাঠক যে আগ্রহ নিয়ে পড়ে, পড়ে বলে 'বাহ্', 'চমৎকার' সেই আগ্রহ বা তৃপ্তি নিয়ে পড়ে না 'খতিয়ান', 'একান্নবর্তী', 'হারাণের নাত জামাই', 'বাগদিপাড়া দিয়ে' বা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। পাঠক জানে না রেডিয়ামের বর্জ্যটাই আরো মূল্যবান ইউরেনিয়াম। গল্পগুলো আমাদের অভাবিত জনজীবনের, গণচেতনার। ব্যক্তিচেতনা বা আত্মসর্বস্বতার যুগে তার উপর ধুলোর আস্তরণ জমেছে গল্পগুলোর বাতাসে তা একটু নড়ে উঠুক গণস্বার্থে। শুধু সাহিত্যের মানদণ্ড নয়, জীবনের মানদণ্ড নির্ণয়ে গল্পগুলোর মূল্য পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজি অত্যাচারিত মানুষের জন্য অতীব মূল্যবান এবং প্রাসঙ্গিক।

চার

বস্তু ও বাস্তব মানুষের চেতনার ভিত্তি। সাহিত্যের বাস্তব চেতনার উপরিতল, গভীরতলে থাকে বস্তুতীত চেতনা। প্রচলিত সমাজের বাস্তবতা, রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম-সংস্কৃতি, মানুষের সংগ্রাম, লড়াই, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংকট, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র বা বিবরণ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপকরণ। এই জীবন ও বাস্তবের মধ্যে একটা শিল্পের প্যাসেজ আছে। সেটা মুখ্য হয়ে না উঠলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু বাস্তব গৌণ হয়ে গেলে অপূরণীয় ক্ষতি। সত্যকে শিল্পের সত্য দিয়ে ঢেকে দিলে তা জীবন বা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। যে শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্য মানুষের বাঁচার কাজে লাগে না, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনে আসে না তাকে মানুষের প্রয়োজন কি?

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে মানিক সত্যটা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। মধ্য চল্লিশের দশক থেকে এই চেতনা মানিকের জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এ সময় থেকে তিনি ভাবালুতা, রোমান্সকে অপসরণ করে ঢুকে পড়েন সমাজের সরাসরি অভ্যন্তরে। বিশেষত বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাস্তবতা তাঁকে এমন এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যে সত্যের নির্মম শিকার কোটি কোটি মানুষ, যারা আমাদের ভাই-ভগ্নী, পড়শি, স্বজন এবং একই শ্রেণী স্বার্থের সাথী। তিনি হয়ে ওঠেন এই সব নিরন্ন, নিরক্ষর, বিপন্ন-ক্ষয়-ক্ষতির মানুষের কবি। *'খতিয়ান'*, *'মাটির মাশুল'*, *'ছোটবড়'*র প্রতিটি গল্পের মানচিত্রজুড়ে আছে এই সব মানুষের কোলাহল, হানাহানি, যুদ্ধ ও সংঘাত। এ যেন বঞ্চিত মানুষদের এক কুরুক্ষেত্র।

*'ছোটবড়'*র প্রতিটি গল্প শ্রেণী সংঘাতের, ছোট বড়, ধনী-দরিদ্রের চিরপুরাতন এক নতুন গল্প। উপনিবেশি ও নব্য উপনিবেশি শাসন-শোষণের গল্প। সমকালীন সমাজ বাস্তবতার গল্প। সমাজ, ইতিহাস ও সময় সতর্ক মানিক সেই সময় ও জীবনের জীবনীকার এবং শিল্পী। মার্কসের ভাষায় : যেখানে সমাজের শিল্প সমাজের দ্বারা সমাজের জন্যই সৃজিত, সমাজের বৃন্তবন্ধনেই শিল্প-সাহিত্য জীবন্ত। মানিকের এই সব গল্পে তারই চিত্র ও চরিত্র উন্মোচিত, উৎসারিত।

প্রেক্ষিত 'ক' পর্বের প্রথম গল্প 'ভালবাসা'য় কোনো ঘটনার ঘনঘটা, বর্ণনার ছটা নেই, চরিত্রের কোলাহল নেই– এখানে মালতী ও বিপিন (স্বামী-স্ত্রী) অনেক মানুষের হয়ে, অনেক দুঃখ-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে প্রাণিত করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্লেশিত মানুষকে। যে সর্বনাশা দাঙ্গা ছোট্ট চাকুরে বিপিনকে কেড়ে নিয়েছে মালতীর বুক থেকে, সেই দাঙ্গাবিরোধী শান্তিমিছিলে ব্যক্তি দুঃখ ভুলে সমষ্টির মৈত্রীর স্বার্থে যোগ দিয়ে

মালতী যে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কারণ 'মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভাতে' হলে অশ্রু কোনো সমাধান নয়, সমাধান হতে পারে আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম। মালতী বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে এক চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতীক। মালতীরাই আনতে পারে হিংসা বিদ্বেষ বাসিত সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতি। এটি এক শিল্প সফল গল্পরও উদাহরণ।

মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিবাদের মূল চালিকা শক্তি ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্মীয় রাজনীতি, ধর্মীয় ভাবাবেগ। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৌহার্দ্যকে ধর্মবোধ কীভাবে মুহূর্তে কলুষিত করে তোলে, সন্দেহ সংকটে বিষাক্ত করে তোলে তারই এক রসালো গল্প 'ছেলে মানুষি'। রস ও বিষ, প্রীতি ও প্রতিঘ, বৃন্দ-বাস ও বিদ্বেষ এই বৈপরীত্যে নাসিরুদ্দীন ও তারাপদ পাশাপাশি বসবাসকারী দুটি দ্বিজাতি পরিবার একটি হুজুগ ও ছেলেমানুষি সিদ্ধান্তে বহু যুগের সম্প্রীতি কীভাবে নষ্ট করে ফেলে তারই গল্প। এই গল্পে প্রকাশ্য দাঙ্গা নেই, দাঙ্গার উত্তেজনা আছে, আয়োজন আছে, অন্তরে এবং বাইরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারের দুই শিশু হাবিব ও গীতার অহিংস সম্পর্ক দেখে বুড়ো দাঙ্গাকারীরা বেকুব বনে যায়। যে সন্দেহ এক আঁচলে শোয়া ওদের মা ইন্দিরা ও হালিমাকে একটু আগে বিচ্ছিন্ন ও বৈরী করে রেখেছিল এখন তারা কেমন নির্বিকার গায়ে গা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত ভাঙার জন্য যেমন বুড়ো খোকারা দায়ী, শিশুরা নয়, তেমনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণও তারা। চিরকাল অসাম্প্রদায়িক মানিক এই গল্পের ভেতর দিয়ে চেয়েছেন এ দেশের হিন্দু মুসলমান শান্তি ও সম্প্রীতির স্বার্থে হালিমা ইন্দ্রিরার একই আঁচলে শুয়ে থাক, গায়ে গা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, হাবিব-গীতারা ছুরি কাঁচি নিয়ে খেলুক, রক্তারক্তি হোক কিন্তু সে রক্ত যেন ধর্মীয় রক্তে রূপ না নেয়।

রাজনীতি সচেতন মানিক জানেন সব সংঘাত, বিভেদ, বিদ্বেষ, হানাহানিতেই আছে কূট রাজনীতি, রাজনীতির রাশ ধরে স্বার্থসিদ্ধি করা। নিয়তিবাদের মূলে রাজনীতি (নেপোলিয়ান), রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ, ধর্মবাদ, ভাগ করো ও শাসন করো সব কিছুতেই রাজনীতি। রাজনৈতিক স্বার্থেই বঙ্গভঙ্গ হয়, যুদ্ধ হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হয়। একই 'স্থান' স্থান ও স্তানে রূপ নেয়। 'স্থানে ও স্তানে' তারই গল্প।

এই গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক বোঝাতে চেয়েছেন যা কিছু খারাপ, মন্দ বা অমঙ্গলস্বভাবী তার বিক্রমের কোনো বিনাশ নেই, সে সতত প্রবহমান। যেমন সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিষে দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্তেও ৪৬-এ ঘটে যাওয়া দাঙ্গার রেশ বশে নরহরির স্ত্রী, শ্বশুর, শ্যালক, শালিকারা কিছুতেই পূর্ববঙ্গে সুমিত্রাকে (নবহরির স্ত্রী) পাঠাতে রাজি হয় না ওটা মুসলমানের দেশ বলে। অথচ ওটাই নরহরির জন্মভূমি। নরহরি নিঃশঙ্ক চিত্তে ওখানেই চাকরি করতে চায়, থাকতে চায়। এই দোটানার একটি শৈল্পিক সমাপ্তি ঘটান লেখক। কোথায় যেন একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়িতেই বোধ হয়, তার ছেলেটার মতো গলা। নরহরির এই অন্তর যন্ত্রণার কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুপ্রভাব। ড. সরোজ মোহন মিত্রের ভাষায় : 'আশ্চর্যের কথা হোল, রাজনীতি বা বক্তব্য কখনোই মানিকের গল্পের শিল্পরূপকে ব্যহত বা শিথিল করেনি।' বিশেষ করে 'স্থানে ও স্তানে' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রেক্ষিত 'খ' এর দুটো গল্প যেন একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ। জমিদারের অত্যাচার ও কৃষককুলের প্রতিরোধ স্পৃহা গণসচেতনা 'পেরানটা' ও 'দিঘি' গল্প দুটোর মূল

বক্তব্য। লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) প্রায় দুশো বছর দাপটের সঙ্গে চলার পর একটি স্বাধীন দেশে আধুনিক গণতন্ত্রের যুগেও এই অমানবিক ব্যবস্থার দাপট কমলেও যে অবসান হয় নি গল্প দুটিতে সেই বৈষম্যের বাস্তবতা বিরাজমান। এই অবস্থার আজও কি খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? এখনও মহাজনের ক্ষেতে কৃষক বঞ্চিত, মালিকের মিলে শ্রমিক বঞ্চিত। এখনও চলছে ভূমি মালিকদের রাম রাজত্ব। তবে এটুকু বলা যায় যে, কৃষকরা আজ বর্গার ন্যায্য দাবি আদায়ে অনেক সচেতন, সচেষ্ট এবং অগ্রসর।

ফসলের অধিকার নিয়ে গল্প দুটিতে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে টানটান বিরোধ আছে; লাঠিয়াল, দালাল ও অনুগত ভৃত্যদের সাথে দ্বন্দ্ব-ঝগড়া-উত্তেজনা আছে। কিন্তু শক্তির ভারসাম্যে কেউ কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, রক্তারক্তি হয় না, আবার অধিকার আদায়ের আন্দোলনও থামে না। 'পেরানটা'য় জমিদারের মামলার কৃষক পলাতক আসামি সাধু সেখ যেদিন পালিয়ে গ্রামে আসে কৃষকের ধান জমিদারের বাধার মুখে ঘরে তোলার জন্য, খেয়ে বাঁচার জন্য, সেদিন স্বাধীনতার উৎসব চলছে জমিদার বাড়িতে। জ্বলছে হাজারো আলোর ফানুস। আর কৃষকের ঘর ডুবে আছে অন্ধকারে। এই জ্বালা সহ্য হয় না কৃষক নেতা সাধু সেখের। সে তার সংগ্রামের সাথীদের বলে, 'ওই ফানুসটা ভেঙেচুরে দিয়ে আসতে পারো তোমরা কেউ? ও দেখলে পেরানটা বিগড়ে যায়।' এই প্রতীকী ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে মানিক শোষক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন তাঁর ক্ষোভ ও আক্রোশ। লক্ষ্য থাকে শোষণের অবসান ও বিজয়ের।

'দিঘি' গল্পে দেখি জমিদারের পোষা দু পুরুষের লাঠিয়াল হাসিতুল্লাকে জমিদার ডেকে নিয়ে এসেছেন বিদ্রোহী কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু জমিদার এতই হীন চরিত্রের যে, এমন সব চোর, ডাকাত, ধর্ষক দিয়ে কৃষকদের শায়েস্তা করতে আমদানি করেছেন যা দেখে হাসিতুল্লাও বিস্মিত হয়, অপমানবোধ করে, অপমানিত হয়ও কর্তার আদেশে পুলিশের হাতে। তখন 'রুদ্ধঘরের ভিতরে সে চাপা কান্না শোনে মেয়ে মানুষের।' যা হাসিতুল্লাকেও উৎকণ্ঠিত করে তোলে। জমিদার শ্রেণীর মানসিকতা নিয়ে আজও যারা সমাজের উঁচুতলার মানুষ তারাও কি এই একই ধর্মাধর্মজ্ঞানহীনতার পুনরাবৃত্তি করছে না?

প্রেক্ষিত 'গ'তে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অভিশাপের গল্প। সমকাল সচেতন শিল্পী মানিক খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন অভাব, আকাল পীড়িত মানুষকে। যে অভাব, আকালে মানুষের চোখ পড়ে না, যাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় না, যাদের বিদ্রোহ সমাজে ঢেউ তোলে না, তাদের ভালোবাসা দিয়ে, অধিকার চেতনা দিয়ে তুলে আনেন সমাজের প্রচ্ছদে। এমন এক অন্তেবাসী সমাজের মানুষ গগন ও তার স্ত্রী সোহাগী। তাদের সংসারে এতটাই অভাব যে স্বামীর ভাগের ভাতটুকুও চুরি করে খেতে হয় সোহাগীকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জ্বালায়। টের পেয়ে গগন সোহাগীকে মারে আর বলে, 'টের পাইয়ে দেব রোজগেরে স্বামীর কত জোর।' এক সময় অসহ্য হয়ে সোহাগী প্রতিবাদ করে, সাপের মতো ফণা তুলে বলে, 'খামু, ক্যান খামু না? ভাত না পাই দাও দিয়া তোমারে কাইটা ব্যানুন রাইধা খামু।' বিস্মিত হয়ে গগন ক্ষুধা নিয়ে আবার কাজ করতে মাঠে চলে যায়। তখন সোহাগী বলে 'যাও ভাত নিয়া যামুনে'। গগন বলে, 'পাবি কই?' সোহাগীর বিদ্রোহী ঘোষণা 'চুরি কইরা পারি ডাকাতি কইরা পারি চাল জোগাড় করুম। নন্দগো ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল--' গগন বলে 'দিব না'। সোহাগী বলে 'না দিলে খুন

করুম।' সেই থেকে সোহাগীর গায়ে হাত তোলে না গগন। এই হল 'সাথি'র গল্প। ক্ষুধার ও প্রতিবাদের এমন শিল্পিত গল্প বাংলা সাহিত্যে বা মানিকেরও খুব কম আছে।

'গায়েন' গল্পের রাজেন যেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তার শিষ্য নরহরি যেন আরো বড় মুকুন্দ দাস। রাজেন গানের মধ্য দিয়ে শত অভাবের মধ্যেও দুঃখ-দুর্দশা, দেশের গান, বন্যার গান, দুর্ভিক্ষের গান, চাষির কষ্টের গান গেয়ে শ্রোতাদের চোখ-বুক ভিজিয়ে দেয়। নরহরিও একই গান বাঁধে, গান গায়। কিন্তু সে গান রসকষহীন, কঠিন এবং বিদ্রোহের আগুনে ঝলসানো। সময়ের দাবি মেটায় নরহরি। বলে, মন্বন্তরে মোরোনা, 'যার গুদামে চাল আছে তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে' অথবা 'কোমর বাঁধো ভাই' বলে যখন আগুন ধরিয়ে দেয় মনে তখন আক্রোশে ফেটে পড়ে জনতা, 'চোখে চোখে আগুনের ঝিলিক'– এই সব ইঙ্গিতে মানিক বুঝিয়ে দেন 'আসিতেছে শুভ দিন'। 'গায়েন' প্রতিবাদের গল্প, আশার গল্প, বঞ্চিত মানুষের নড়েচড়ে ওঠার গল্প।

প্রেক্ষিত 'ঘ'র গল্প 'ধান'। এই গল্পে মানিক মজুতদারদের মজুতদারি প্রথার মাধ্যমে 'খাদ্যের দুর্মূল্য সৃষ্টির ধারায় মানববিধ্বংসী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সমষ্টির প্রতিবাদের চিত্র' তুলে ধরেছেন। সমাজে জোতদার, মজুতদার, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ প্রশাসন পরস্পর যোগসাজশে শঠতার মাধ্যমে কীভাবে হরণ করে নেয় গরিবের হক, তবু গরিব দুর্বল বলে সংযত আচরণ করে, গল্পটিতে তারই রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে প্রতিবাদী ভাষায়। যারা অন্যায়কারী ও অসৎ স্বার্থানুসন্ধানী ও ন্যায়-নীতিবোধহীন, অশুভ দানবরূপী, তারা চিরকাল ফাঁকিয়ে পার পেয়ে যাবে, অন্যায় অবস্থানকে চিরদিন নির্বিঘ্ন রাখবে এমনটা হতে দেখা যায় না; একটা ধাক্কা একটা শিক্ষা দিতেই হয়। সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিল সংগঠিত গ্রামবাসী, প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে। তাই মজুতদার ভূমি মালিক ও অসৎ ব্যবসায়ী জগৎ কুণ্ডুর ধান মজুদ ও পাচার মেনে নেয় নি গ্রামবাসী। তারা সম্মিলিতভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এদের অসৎ কাজের বিরোধিতা করে, পুলিশে ধরিয়ে দেবার আগে শরৎ হালদারের গৃহে আগুন দেয়, গোমস্তা নারায়ণকে লাঞ্ছিত করে, উল্লাসের টাকায় আগুন দেয় কিন্তু টাকা স্পর্শ করে না। আইন-শৃঙ্খলা মেনে, সংযত আচরণ করে গ্রামবাসী প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে যে ধৈর্যের পরিচয় দেয় গল্পটি তাতেই হয়ে ওঠে সুন্দর শিল্পিত। সাধারণ মানুষেরও যে একটা মান-মাত্রা, বিবেক ও পরিমিতিবোধ আছে, জ্ঞান ও প্রাণ আছে– গল্পটিতে সেই সাধারণ্যের বিবেকেরই ঘোষিত জয় হয়। আর ঘৃণ্য, কুৎসিত, বিবেকবর্জিত মনুষ্যাধম মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয় সমাজের উঁচুতলার মানুষ শরৎ হালদার, নারায়ণ, উল্লাস ও দারোগা বিধুভূষণ।

প্রেক্ষিত 'ঙ'তে রয়েছে মানিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি 'হারাণের নাতজামাই'। গল্পটি বহুমাত্রিক বা মিশ্র রসের জারকে জায়মান। এখানে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতা, খাট্টা-তামাশার সাথে জারিত হয় করুণ রস, রুদ্ররস ও সৌন্দর্য-রসও। গল্পটি ইতিহাস খ্যাত তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও কোথাও সে ইতিহাস নেই, রাজনীতি নেই, মানিকের অধীত বিশ্বাস চাপিয়ে দেবার জবরদস্তিও নেই, আবার সব না থেকেও আছে মালার সুতোর মতো– এখানেই গল্পটির সার্থকতা, শ্রেষ্ঠত্ব।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পে হারাণ বা তার নাতজামাই জগমোহন গৌণ চরিত্র। কাহিনী আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু বা কেন্দ্রগত ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি ময়নার মা অর্থাৎ জগমোহনের শাশুড়ি, হারাণের পুত বৌ। ময়নার মায়ের বুদ্ধিমত্তা, সাহস, রণনৈপুণ্য, স্নেহশীল মাতৃত্ব, কৃষক আন্দোলনের একজন অকুতভয় সৈনিক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

গুণ– সব মিলে বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ নারী চরিত্র। তার রূপটি দেবী চৌধুরাণীর, মাতঙ্গিনী হাজরার বা গোর্কির 'মা' উপন্যাসের মা নিলভনার। সৈয়দ আজিজুল হক তাই যথার্থই বলেন 'লজ্জাকাতর অবলা হিসেবে বাঙালি নারীর যে দুর্নাম, ময়নার মা তা থেকে মুক্ত।' শুধু মুক্তই না তার সংগ্রাম ও সহৃদয় পথ ধরেই বাংলার মা-সমাজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্থান অপেক্ষমাণ।

কৃষক নেতা গগন মণ্ডলকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজ গৃহে স্থান দেয়া, মেয়ের জামাই সাজিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া। পুলিশকে বিভ্রান্ত করা, জামাইকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় এই নাটকের সৃষ্টিটা বোঝানো এবং ময়না ও গগনকে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা পালনে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি দেয়া এবং গ্রামবাসীকে তা বোঝাতে সক্ষম হওয়া – সমগ্র আচরণ ও নৈপুণ্যে ময়নার মায়ের চরিত্রের দীপ্তি ও লাবণ্য প্রকাশিত। কিন্তু বেয়াদব জামাই জগমোহনকে বাস্তব পরিস্থিতিটি বোঝাতে হয় ময়নার মাকে। এতে ময়নার কথা ভেবে মা হিসেবে ময়নার মায়ের বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী ভূমিকা আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ে। এটুকুর জন্যই সে হয়ে ওঠে মহীয়সী মা। অবশেষে শাশুড়ি ও স্ত্রী সম্পর্কে দারোগার কটাক্ষ : 'বাঃ , তোর তো মাগি ভাগ্য ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুড়ি এই বয়সে–' মুহূর্তে বদলে দেয় সমস্ত পরিস্থিতি। জেগে ওঠে জগমোহনের পৌরুষ, 'জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!' তখন হারাণের বাড়ি লোকে লোকারণ্য, গগনকে বাঁচাতে হবে, ধান রক্ষা করতে হবে, চাষি আর হারবে না। জনতার বিক্রম বুঝে দারোগা মন্মথ ভাবে 'মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।' অর্থাৎ গণশক্তির কাছে পরশক্তির পরাজয় অনিবার্য– 'এই সমাজ সত্যই উন্মোচিত হয়েছে গল্পের শেষে।'

প্রেক্ষিত 'চ'-তে আছে মিশ্রভাবের বাকি তিনটি গল্প 'নব আলপনা', 'ব্রিজ' ও 'স্টেশন রোড'। বিষয়ের মধ্য বিষয় বৈচিত্র্য তৈরিতে মানিক যে সিদ্ধহস্ত এ গল্পগুলো তার প্রমাণ। আমরা দেখেছি 'ছোটবড়'র গল্পগুলো মূলত গণমানুষের কোলাহল, শহর ও গ্রাম, সমস্যা ও সংগ্রাম নিয়ে রচিত। এর মধ্যেই যে আবার কত রকম জীবন-জীবিকার মানুষ আছে, সুখ-দুঃখের মানুষ আছে, রঙ-চঙের মানুষ আছে, লোভ-লালসার মানুষ আছে, প্রতিকারহীন অসহায় মানুষ আছে– গল্প তিনটি সেই জীবন-বৈচিত্র্যের সাক্ষী বা প্যারাডিম।

এ পর্যায়ের 'নব আলপনা'তে আমরা প্রথম পেলাম কয়লা কুড়ুনি ও বিক্রেতা চুণোকে। অতি দরিদ্র বলে যে পুরুষের লোভ-লালাসার শিকার। তার প্রতিবন্ধী অসহায় ভাই নটুককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে সেই বড় লোকের গাড়ি। এর কোনো প্রতিকার হয় না। চুণো কাঁদতে পারে না। তার 'রুক্ষ চুল আলগা বাঁধন খুলে এলিয়ে' পড়ে। তখন আকাশ মেঘলা, ম্লান আলো, শুধু চোখ দুটো আক্রোশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। এই বাঁকা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয় অনেক রেশ অবশিষ্ট রেখে।

'ব্রিজ' গল্পে নব সভ্যতার প্রতীক উপনিবেশবাদী শোষণের প্রতীক হিসেবে হাওড়া ব্রিজকে দেখেন লেখক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবেশের এ যেন এক তোরণদ্বার। চরকার সাথে ব্রিজের সম্পর্ক বেমানান, মানায় বেশ সাঁকো। গরিব দেশের বুকে অত বড় ব্রিজ বানিয়েছে কিন্তু বুকে একফোঁটা দুধের ব্যবস্থা করে নি। ব্রিজটার তাই কোনো ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক মূল্য নেই। এ যেন এক স্থবিরতার প্রতীক। এত অর্থের সম্পদ এই ব্রিজ কি দাঙ্গা ও গরিবি হঠাতে পেরেছে? এ এক বাঁকা দেখা মানিকের।

তবে প্রতীকের আড়ালে ছোটবড়'র যে দ্বন্দ্ব তাকে তিনি এখানে আয়রনিক্যালি দেখেছেন মাত্র।

'স্টেশন রোড' কোলাহলের গল্প, জীবন বৈচিত্র্যের গল্প। কত প্রকার ও পেশার মানুষের যে এই গল্পের আখড়ায় আনাগোনা, ছোটগল্পের পরিসরে তা বিস্ময়ের বৈকি। এরা সবাই ছোটখাটো পেশার মানুষ। কেবল সুরেশ ডাক্তার গরিবের ওষুধ বিক্রি করে বড় লোক হয়। সারদা উকিল তাই বলে 'এ যুগে চোরেরই কপাল খোলে।' এখানে নানা রকম মানুষের জমায়েত। বিশেষ করে স্বদেশী গানের আসর হলে লোক আর ধরে না। তখন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু প্রতিবাদী জনতা প্রতিবাদ করে এ অন্যায় হুকুম বা আইন তারা আর মানবে না। এভাবে গল্পটি শেষে এসে একটা প্রতিবাদী গল্পে পরিণত হয়।

গল্পের আর একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৪৬-এর কোলকাতা বা ভারত যে বিপ্লবপূর্ব জার শাসিত রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মতো চরম দুর্দশাগ্রস্ত ছিল, স্থবির ছিল– গল্পের শুরুতে দশ ঘণ্টা ট্রেন লেট করে আসা, পথে হাঙ্গামায় আটকে পড়া, বিলম্বিত গতিতে চলা, মনে কি করিয়ে দেয় না ডা. জিভাগোর ট্রেনের কাহিনী? খুব সুদূর ও সূক্ষ্মভাবে দেখার এই অভিজ্ঞতা মানিকের মতো আধুনিক লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

পাঁচ

যে বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে মানিক সমাজের উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রকে দেখেছিলেন এবং তাদের অধীত জীবনের চিত্র এঁকেছিলেন, তা ছিল সেই সময়েরই ইতিহাস। যে নিচুতলার মানুষদের প্রতি মমতায় তিনি এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন সে পথ তখনও ছিল পথিকশূন্য। যে পথে কেউ পা বাড়ায় না, যে পথ নতুন ও বন্ধুর সেই পথে যে লেখক পা রাখার সাহস দেখান, তিনিই আধুনিকের দাবিদার। যেমন ছিলেন সল বেলো। *'ছোটবড়'* অনেক কারণেই আধুনিক। এর গণচেতনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, নারীকে পুরুষের মতো সাহসী, রণজয়ী করে তোলা, অত্যাচার-শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সাম্যচিন্তা, প্রগতি চিন্তা, নতুন সমাজ বিনির্মাণের চিন্তা– সবই আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ। প্রেম ছাড়া, প্রকৃতি ছাড়াও যে গল্প হয়, শুধু হয় না সার্থক গল্প হয়– 'ছোটবড়' তারও উদাহরণ। সবচেয়ে বড় কথা 'ছোটবড়' মানুষের গল্পগাথা। আধুনিক সাহিত্যের পনের আনাই মানুষের গল্প। কারণ মানুষ আছে বলেই সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের এ তত্ত্বটি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন মানিক। ছোট হোক বড় হোক মানুষ ছাড়া 'ছোটবড়'র আর সব কিছু অস্তিত্বহীন।

একটা স্বচ্ছ, সৎ জীবন দর্শনই একজন লেখকের লেখার সবচেয়ে বড় উপাদান। সেখানে শিল্প দক্ষতার প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় মানিক শিল্পের মানুষ আঁকতে চেষ্টা করেন নি, মানুষ আঁকতে চেষ্টা করেছেন। যে মানুষ 'ছোটবড়'র সম্পদ। এ দিক দিয়ে তাঁকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সলোকভ। যিনি বলেছিলেন, 'জনগণের জন্য লিখতে পারাটাই সবচেয়ে সম্মানের।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুর অঞ্চলের জনজীবনভাষ্য

গিয়াস শামীম

উপন্যাস যেহেতু জীবন ও পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পপ্রয়াস নয়, সেহেতু এ-সাহিত্যিক রূপকল্পে অনিবার্যভাবে প্রদর্শিত হয় বিশেষ স্থানকাল বা অঞ্চলশাসিত মানুষের জীবনকথা। যে-কোনো শিল্পমাধ্যমে তাই অঞ্চলবিশেষের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, এবং সে-অঞ্চল হতে পারে বিশেষ একটি গ্রাম, শহর-নগর-বন্দর, শিল্পকেন্দ্র-কৃষিক্ষেত্র, মাজার-বাজার, সাধু-সন্তের আস্তানা অথবা নদীতীরবর্তী ক্ষুদ্র-বৃহৎ লোকালয়। সুতরাং প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে আঞ্চলিকতাবিষয়ক ধারণাটি সাহিত্যশিল্পে একটি অবাঞ্ছিত ও আরোপিত প্রসঙ্গ। কারণ উপন্যাসে উপস্থাপিত যে-কোনো ঘটনাংশই অঞ্চলনির্ভর। কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চল স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের 'local color and habitations' এ-জাতীয় উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় পরমসূক্ষ্ম পরিচর্যায়। বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই হচ্ছেন আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ-ব্যক্তিত্ব। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে তিনি পদ্মাতীরবর্তী জনাঞ্চলের জীবন-চিত্রাঙ্কনে প্রদর্শন করেছেন অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব।

প্রকাশকালের দিক থেকে *পদ্মানদীর মাঝি* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ মুদ্রিত গ্রন্থ। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসত্রয়ে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ছিল উপন্যাস-অন্তর্গত নর-নারীর মানসলোকের নানামাত্রিক অভিক্ষেপ বিশ্লেষণসূত্রে তাদের জীবনের সংকট ও জটিলতার উন্মোচন। *জননী, দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথায়* চরিত্রচিত্তের মনোজাগতিক অভিপ্রায় এবং পরিণামী রসপ্রতিপত্তি প্রায় অভিন্ন। *পদ্মানদীর মাঝিতে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের পটভূমি ও পরিসরগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেন এবং কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানসদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেন পূর্ববাংলার পদ্মাতীরবর্তী অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-অবজ্ঞাত শ্রমজীবী সংগ্রামশীল ব্রাত্য ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনের পট-পরিসরে। *পদ্মানদীর মাঝি* রচনার প্রাক্-পরিসরে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সজাগতা দুর্লক্ষ হলেও *পদ্মানদীর মাঝিতে* বাংলা উপন্যাসের অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত হয়েছে। উপন্যাসবিধৃত জীবন ও চরিত্রপুঞ্জকে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করার ক্ষেত্রে এ-উপন্যাসে ব্যতিক্রমধর্মী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন লেখক।

বৃহৎবঙ্গের নানাপ্রান্তিক ভূ-অঞ্চল, তৎসন্নিহিত মানুষের যাপিত জীবন, তার অর্থনৈতিক চালচিত্র, পেশা ও নেশা, জীবনধারণ ও জীবনধারণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকর্মের অবলম্বন হলেও প্রকৃতপক্ষে *পদ্মানদীর মাঝিই* তাঁর একমাত্র আঞ্চলিক উপন্যাস। পূর্ববর্তী উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথায়* যে গাওদিয়া গ্রামের জনচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, তা গ্রাম হিসেবে সাধারণ; এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নয়। অথচ আঞ্চলিক উপন্যাসে পট-পরিসরের স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য; যা সুদক্ষ পরিচর্যায় পরিচিহ্নিত হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি*

উপন্যাসে। এ-উপন্যাসে মানিক অবলম্বন করেছেন পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুরের ধীবর শ্রেণীকে; যাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নগরমানসের পরিচয় অতি স্বল্প।

পদ্মানদীর মাঝির ঘটনাংশ পর্যালোচনাসাপেক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় তিনটি সুস্পষ্ট প্রতিপাদ্য : ১. প্রথম প্রতিপাদ্য হিসেবে দেখা যায়, এক থেকে তিন-সংখ্যক পরিচ্ছেদব্যাপী কেতুপুরের পদ্মানির্ভর মানুষের জীবনযাত্রা-জীবনধারণ-জীবনধারণা, ধর্মবিশ্বাস-সংস্কার, নৈতিকতা-নীতিহীনতা, ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষ, গ্লানি ও যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায়। ২. চার-সংখ্যক পরিচ্ছেদে কপিলার আগমনসূত্রে প্রাথমিক প্রতিপাদ্য পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ঔপন্যাসিকের জীবনবিবরণের এপিকধর্মিতা রূপান্তরিত হয়েছে কুবের-কপিলার আখ্যানে। কখনো কখনো কুবের-কপিলার যৌনতাত্ত্বিক জীবনসংকট উপন্যাসের কেবল দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য নয়, প্রথম প্রতিপাদ্য বলে ভ্রমও হতে পারে। এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে *দিবারাত্রির কাব্যের* সুপ্রিয়া-মালতি-আনন্দ-হেরম্বের, এবং *পুতুলনাচের ইতিকথার* মতি-শশী-কুসুমের জীবনসংকটের প্রায় আক্ষরিক মিল বর্তমান। ৩. হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ উপনিবেশ উপন্যাসের তৃতীয় প্রতিপাদ্য। 'হোসেন মিয়া প্রতিপাদ্য' প্রথমে ছিল একটা ক্ষীণ স্রোতমাত্র, কিন্তু শেষাবধি হোসেন মিয়াই হয়ে উঠেছে উপন্যাসের সার্বিক ঘটনাধারার নিয়ন্ত্রকশক্তি। বলা বাহুল্য, এ-তিনটি প্রতিপাদ্যের একটির সঙ্গে আরেকটির মিলের চেয়ে অমিলই প্রকট। সে-জন্যে *পদ্মানদীর মাঝির* মৌল প্রতিপাদ্য মনে হতে পারে অন্তর্বিরোধপূর্ণ, গঠনকলা অসংগতিযুক্ত এবং এটি স্থানৈক্য, ক্রিয়াশীলতা-ঐক্য ও চরিত্র-ঐক্যের বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *পদ্মানদীর মাঝি* হয়ে উঠেছে পদ্মাতীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রামাণ্য দলিল। 'এই গ্রন্থের কোথাও আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জন নেই– দুঃখকে তিনি যেমন অকারণে বাড়িয়ে দেখেননি, সুখকে তেমনি দেননি অপ্রাপ্য মহিমা– শিল্পের চেয়ে জীবনই তাঁর কাছে গভীরতর সত্য। 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কে এই মন্তব্য সর্বদাই প্রযোজ্য বলে মনে করি। সেজন্যেই এই গ্রন্থে শিল্পের কারুকাজের আড়ালে জীবনের এত বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে ওঠে।'[২] বাংলা উপন্যাসের স্মরণীয় পথযাত্রায় জীবনের এ-চলচ্ছবি ছিল অকল্পনীয় স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর।

পদ্মানদীর মাঝির ঘটনাংশ পদ্মাতীরের জনজমিনকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ও বিকশিত। সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত উপন্যাসের ঘটনাংশ হচ্ছে এরকম : পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় পরিবার-পরিজনসহ কুবের মাঝির বসবাস। তার জীবনযাপন হতশ্রীদশাগ্রস্ত। তার স্ত্রী মালা আজন্ম পঙ্গু। পুত্র-কন্যাবেষ্টিত সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কুবের। সে একরোখা, সরল, সাধারণ কিন্তু নিয়তিচালিত। তার নিজের কোনো নৌকা নেই; অন্যের নৌকায় কাজ করে প্রাপ্ত অর্থে নির্বাহ হয় তার জীবনযাত্রা। সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা তার প্রত্যাশিত, অথচ সে নিরুপায়। তার মতই উপদ্রুত জীবনযাপন করে কেতুপুরবাসী গণেশ, নকুল, হীরু জ্যাঠা, আমিনুদ্দি, রাসু, সিধু, মুরারি, অনুকূল এবং আরো অনেকে। এদের নিয়েই কুবেরের জীবন, এবং এদের বাস্তবতা কুবেরেরও জীবনের অচ্ছেদ্য বাস্তবতা। এই গতানুগতিক জীবন-বাস্তবতার সাংবৎসরিক চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর

বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনো দিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়।[৩]

পদ্মাতীরের ধীবর গোষ্ঠীর এই জীবনধারার সঙ্গে মেরুদূর ব্যবধান হোসেন মিয়ার। ভাগ্যান্বেষণে হোসেন মিয়া নোয়াখালী ছেড়ে কেতুপুরে আসে, এবং বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও কূটকৌশল প্রয়োগ করে হয়ে ওঠে দৃঢ়মূল। সে সম্পদশালী, ক্ষমতাবান। তার অর্থাগমের উৎস কেতুপুরবাসীর কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। এক পর্যায়ে সে নোয়াখালীর ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ময়নাদ্বীপ পত্তন করে, এবং 'ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ' স্থাপন করে। দুর্গম এই দ্বীপ আবাদ করার জন্য হোসেন মিয়া দরিদ্র অসহায় মানুষদের প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে। কেতুপুরবাসী যখন শোষণে-পেষণে একেবারেই নিঃস্ব, নিরাশ্রয় ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, তখন হোসেন মিয়াই তাদের সহায়; এবং তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অতঃপর রহস্যজটিল ময়নাদ্বীপ। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, হোসেন মিয়ার লতাতন্তুজালে আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ কুবের মাঝির চূড়ান্ত ঠিকানাও হয়ে উঠেছে ওই ময়নাদ্বীপ।

হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ *পদ্মানদীর মাঝি*-র পরিণামী রসনিষ্পত্তির সহায়ক হলেও এ-উপন্যাসের মূল গল্প কিছুতেই ময়নাদ্বীপকেন্দ্রিক নয়। এর মাধ্যমে 'তখনো পর্যন্ত মার্কসীয় আদর্শে আনুষ্ঠানিকভাবে অদীক্ষিত মানিকের সমাজবাদী মনের এক অস্ফুট স্বপ্ন-কল্পনা'[৪] রূপপ্রাপ্ত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গটির মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ভিন্নতর অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করেছেন, যাকে তাঁর রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রক্ষিপ্ত প্রকাশরূপে চিহ্নিত করা চলে। এমতাবস্থায় বলা যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*-র মূল গল্প কেতুপুরবাসী কুবের-কপিলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কপিলা কুবেরের পঙ্গু স্ত্রী মালার বোন। সে আকুরটাকুরের শ্যামাদাসের স্ত্রী। শ্যামাদাস দ্বিতীয় বিবাহ করায় গৃহত্যাগ করে কপিলা চলে আসে চরডাঙায়, পিত্রালয়ে। অতঃপর বন্যা-আক্রান্ত চরডাঙা থেকে কুবেরের সঙ্গে কেতুপুরে আসে কপিলা। এ-পর্যায়ে কপিলার প্রতি নানা কারণে কৌতূহলী হয়ে ওঠে কুবের। প্রথমত, কপিলা অবাধ্য কঞ্চির মতো দুরন্ত; কুবেরের স্ত্রী মালা পঙ্গু অচঞ্চল স্থবির ও রহস্যহীন; কপিলা রহস্যময়ী চঞ্চল ছলনাময়ী ও অবাধ্য। মালাকে কুবের সহজে আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু কপিলাকে আয়ত্ত করা কঠিন। এসব কারণে আপাত দুর্বোধ্য কপিলার প্রতি কুবেরের মনোজাগতিক আকর্ষণ অন্তহীন। আশ্বিনের ঝড়ে গোপীর পা ভেঙে গেলে কুবের এবং কপিলা তাকে হোসেন মিয়ার পরামর্শে মহকুমা শহর আমিনবাড়ির সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে সুচিকিৎসার জন্যে। এখানে এক হোটেলে রাত্রিযাপন করে কুবের-কপিলা। এরপর নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্ক আরো অগ্রসর হয়। ইতোমধ্যে কুবের হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেয়, এবং তার অর্থোপার্জনের রহস্যময় অথচ গোপন উৎস মাদক-পাচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। হোসেন মিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কুবের নতুন করে গৃহনির্মাণ করে; তার জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে; কিন্তু

ইতোমধ্যে পীতম মাঝির বাড়ি থেকে তার সারাজীবনের সঞ্চয় সাত কুড়ি তের টাকাভর্তি ঘটিটি চুরি হলে জেলেপাড়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রহস্যজনকভাবে পীতমের ঘটিটি কুবেরের 'ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার তল' থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তারা কুবেরকে অভিযুক্ত করে। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারময় পরিবেশে এই সংবাদ নিয়ে পদ্মাতীরে প্রতীক্ষা করে কপিলা। তারপর দুজনেই ঘাটে-বাঁধা হোসেনের নৌকায় গিয়ে ওঠে, এবং রহস্যঘন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করে। স্পষ্টত, *পদ্মানদীর মাঝি*-র মূল আকর্ষণ কুবের-কপিলার আখ্যান। উপন্যাসের এক থেকে তিন-সংখ্যক পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক পদ্মাতীরবর্তী জীবনের প্রতি ছিলেন মনোযোগী; কিন্তু চার-সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে কুবের-কপিলার সম্পর্ক পরিবেশিত হয় অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে। আবার উপন্যাসের সমাপ্তি পর্যায়ের ঘটনাধারার প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে হোসেন মিয়া।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবের-কপিলা আখ্যান অধিকতর গুরুত্ব পাওয়ার কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক অভিপ্রায় এবং ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতাত্ত্বিক সংস্কার। এই সংস্কার যেমন ছিল ইতঃপূর্বে প্রকাশিত *দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথায়*, তেমনি রয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি*-তেও। সুইডিশ মনোবিজ্ঞানী ডক্টর সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিশ্লেষণসূত্রে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসংক্রান্ত যে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করেছেন তা মানববিদ্যার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর এই অভিসন্দর্ভকে নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ও চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) আবিষ্কারের তুল্যমূল্য গণ্য করা হয়। ফ্রয়েডের Psycho-analysis উত্তরকালে কার্ল গুস্তাভ য়ুং (১৮৭৫-১৯৬১)-এর Analytical psychology ও আলফ্রেড এ্যাডলারের (১৮৭০-১৯৩৭) Individual psychology-র মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। ফ্রয়েড মানব-মনের তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন : Id অর্থাৎ ইদম, Ego অর্থাৎ অহং, Super ego অর্থাৎ অধিসত্তা। ইদম হচ্ছে মানব-মনের সহজাত আদিম প্রবৃত্তি, যার প্রবল প্রভাব থাকে শৈশবাবস্থায়। এর লক্ষণ দুটো : ক্ষুধা ও রিরংসা। শিশুর বয়োবৃদ্ধি, পরিবেশ-সচেতনতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উদযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় 'ইগো' বা অহং। 'ইদম' পর্যায়ে মনের প্রবৃত্তি থাকে অনুশাসনমুক্ত; কিন্তু পরিবেশ-সচেতনতার কারণে যে অহং-স্তরের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে 'ইদমে'র ঘটে তীব্র বিরোধ। এই বিরোধ হচ্ছে আদিম সত্তার সঙ্গে নৈতিক সত্তার বিরোধ। মানব-মনের চূড়ান্ত বিকাশকে বলা হয় 'সুপার ইগো'। একে বিবেকের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। এটি হচ্ছে সেই মার্জিত অহং, যা মনোবিবর্তনের সর্বশেষ স্তর, এবং যা শাসন করে ইগো এবং ইদমকে। ত্রিস্তরে বিভক্ত মানব-মনের প্রথম স্তর (ইদম) হচ্ছে দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু মনের এই দুর্জ্ঞেয় নিরালোক নির্জ্ঞান স্তরের শক্তি প্রবল; এবং সে-শক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন যৌনতাত্ত্বিক মূল প্রাণনশক্তি বা লিবিডো। মানব-মনের ইগো-সুপার ইগোর সঙ্গে ইদমের দ্বন্দ্ব সার্বক্ষণিক। এই দ্বন্দ্ব মূলত সচেতন বিবেকাংশের সঙ্গে অবচেতন নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েডের মতে, সচেতন মনের সঙ্গে লিবিডোকেন্দ্রিক ইদমের দ্বন্দ্ব যেমন যাবতীয় বিকারগ্রস্ততা, অস্বভাবী আচরণ, স্নায়ববব্যাধি ও নিউরোসিসের আদি কারণ, তেমনি ইদমস্তরের এই লিবিডোই মানুষের সকল সক্রিয়তা ও উদ্যমের সংগোপন উৎস। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডের লিবিডোকে আরো সম্প্রসারিত করে য়ুং বলেছেন desire, আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) বলেছেন will, হেনরি বের্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১) বলেছেন élan vital (জীবনীশক্তি)[৫]। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসসমূহে, বিশেষত *দিবারাত্রির কাব্য* ও

পুতুলনাচের ইতিকথায় নরনারীর সমস্যা ও সংকট উপস্থাপনায় স্পষ্টত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বে আস্থাবান। কারণ এ-তত্ত্ব-পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত সুপ্রিয়া-মালতী-আনন্দ-হেরম্ব এবং মতি-শশী-কুসুমের জীবনযাপনের বিকার, অসংগতি, সংকট ও সংঘাতের কার্যকারণ থেকে যাবে অস্পষ্ট ও অনির্ণীত। *পদ্মানদীর মাঝি*-র মূল সংকটও যৌনতাত্ত্বিক সংকট। কুবের-কপিলার অবচেতন মন পরস্পরের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত ও উন্মুখ; কিন্তু সামাজিক নিষেধ ও মনের অর্জিত সচেতন বিবেকাংশ উভয়ের মিলনের প্রতিবন্ধক। উপন্যাসের সাত-সংখ্যক পরিচ্ছেদে কুবেরের মনোজাগতিক যে অব্যবস্থা ও বিপর্যয়[৬], তাকে লিবিডোর তাড়নার সঙ্গে সচেতন বিবেকাংশের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য*-এর আনন্দ, *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র কুসুম এবং *পদ্মানদীর মাঝি*-র কপিলা চরিত্রের মনঃস্বভাব অভিন্ন : তিনজনই রহস্যময়ী, সুদূর এবং তীব্রভাবে বাঞ্ছিত, কিন্তু সমাজ-প্রতিবেশ ও বিবেকের অনুশাসনের কারণে হেরম্ব, শশী, কুবেরের সঙ্গে আনন্দ, কুসুম ও কুবেরের মিলন বাধাগ্রস্ত। সুতরাং এ-সত্য স্পষ্ট যে, *পদ্মানদীর মাঝি*-র কুবের-কপিলাকেন্দ্রিক ঘটনাংশ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।

আলোচনার এ-পর্যায়ে এসে বলতে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবের-কপিলার লিবিডো-প্রভাবিত জীবনচিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত বোধ করলেও প্রায় পুরো উপন্যাসে তিনি পদ্মাতীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের রহস্যময় ভূগোলে পরিভ্রমণ করেছেন নৈষ্ঠিক পরিব্রাজকের মতো। তাঁর অসাধারণত্ব এখানে যে, তিনি একবারও পাঠককে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি পদ্মাতীরবর্তী জনজীবন থেকে। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত *দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথার* পট-পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে এ-উপন্যাসের জীবনপট ও পরিবেশ একেবারেই আলাদা। *দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* অধ্যয়নকালে একবারও পাঠকচৈতন্যে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনচিত্র উদ্ভাসিত হয় না। এ দুটো উপন্যাসের সমস্যা ও সংকট অঞ্চল-নিরপেক্ষ। পক্ষান্তরে *পদ্মানদীর মাঝি*-র জীবনসমস্যা পদ্মা এবং পদ্মাবিধৌত প্রকৃতি, নিসর্গ ও মৃত্তিকার সঙ্গে গভীরতর ঐক্যে সম্পর্কিত। বাংলা উপন্যাসের বহমান ধারায় এ-উপন্যাসের অভিনবত্বের একমাত্র কারণ এর পট-পরিপ্রেক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনাভিজ্ঞতা-বহির্ভূত দূরবর্তী অঞ্চলের জনজমিনে প্রসারিত। একজন বিদগ্ধ সমালোচকের মতে :

> ... এই অতি সংকীর্ণ, জীবিকার্জনের ক্ষুদ্র মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, গ্রাম্য জীবনের চারিদিকে এক সুদূর অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত পরিবেষ্টনী প্রসারিত হইয়াছে। যে পদ্মানদী এই ধীবর-সমাজের প্রাণবায়ুসঞ্চালনের প্রণালী-স্বরূপ, তাহাই এই রহস্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে।[৭]

শিক্ষিত শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবনাভিজ্ঞতায় যে-জীবন সুদূরবর্তী ও রহস্যময়, সে-জীবনের সানুপুঙ্খ চিত্রাঙ্কনে সমৃদ্ধ *পদ্মানদীর মাঝি*। পদ্মাবিধৌত জনপদবাসীর যাপিত জীবনের যে চলচ্ছবি এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, তা সুদুর্লভ মহিমায় ভাস্বর। এক-সংখ্যক পরিচ্ছেদে বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে পদ্মানদীতে কেতুপুরবাসী ধীবরদের মৎস্য-শিকারের প্রতিটি ক্রিয়া-অনুক্রিয়ার আনুপুঙ্খিক বর্ণনায় ঔপন্যাসিক যে কৃতিত্ব সম্পাদন করেছেন তা তাঁর প্রাক-পর্যায়ে অথবা সমকালে অন্যত্র দুর্লক্ষ। মধ্যবর্ষার নিস্তব্ধ-নিঝুম নিশীথ রাত্রিতে পদ্মাবক্ষে বিরাজিত ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য, ইলিশ মাছ শিকার ও সংগ্রহ, ইলিশ মাছের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য, জালের আকার-প্রকার, জাল বিছানোর জ্যামিতিক কৌশল প্রভৃতির বর্ণনায় লেখকের শিল্পসৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বাস্তব

অভিজ্ঞতার ঘটেছে অত্যাশ্চর্য সমন্বয়। পদ্মা নদী এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মপ্রবাহের এ-রূপাঙ্কনই স্পষ্ট করে এ-জীবনের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল পরিচিতি। এর কাহিনী 'বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন নিয়ে।'[৮] এই বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে পিতার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে, কৈশোরক পর্যায়ে।[৯] তাই কল্লোল যুগে, সাহিত্যের বাঁকবদলের এক ঐতিহাসিক সময়পর্বে তিনি পদ্মাঞ্চলের বাস্তব জীবন থেকে ছেঁকে আনলেন ব্রাত্য ও বঞ্চিত ধীবরদের জীবনচিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-পর্যায়ের জীবনোপলব্ধি উত্তরকালপর্বে ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

> তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে– সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।[১০]

নিঃসন্দেহে এ-বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রতিফলক *পদ্মানদীর মাঝি*। কুবের-কপিলার সম্পর্ক-সম্বন্ধের রোমান্টিক গ্রন্থন সত্ত্বেও এটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত। আঞ্চলিক উপন্যাসের অনিবার্য শর্ত 'local color and habitations'-এর সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এ-উপন্যাসে; উপস্থাপিত হয়েছে পদ্মাসন্নিহিত কেতুপুরের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার সম্পন্ন বর্ণনা এবং এতদঞ্চলের অবস্থা-অবস্থান এবং প্রাতিবেশিক জীবনবাস্তবতার স্বতন্ত্র চলচ্ছবি :

> পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথমে দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ওদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট। (পৃ. ১৭-১৮)

জেলেপাড়ার এই জমজমাট জীবন-পরিবেশে জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা নিতান্তই অপ্রতুল। এখানে চলাচলের উপযোগী সড়ক নেই, নেই প্রয়োজনীয় যানবাহন। পরিবেশ অমার্জিত ও শ্রীহীন। গ্রামান্তরে যাওয়ার একমাত্র উপায় নৌযান। বর্ষা এবং তৎপরবর্তী সময়ে এখানকার জনজীবনে যে অপদশা তৈরি হয় তা লেখকের বর্ণনায় এরকম :

> এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়ি ঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যে বার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সে বার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এপাড়া হইতে ওপাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও একমাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে এক রকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।
>
> নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল কাটার রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়। (পৃ. ১৮)

কেতুপুরের ধীবরশ্রেণী জীবিকার জন্য পদ্মার ওপর নির্ভরশীল হলেও তাদের প্রত্যেকের জীবিকার্জনের উপায় এক নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারেও তাদের মধ্যে রয়েছে রকমফের। সমপেশাভুক্ত হলেও কুবের-গণেশের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। ধনঞ্জয়ের নৌকা আছে, জাল আছে; অথচ তার তুলনায় কুবের ও গণেশ নিঃস্ব। তাই 'প্রতিরাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে । কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে।' অহোরাত্র পরিশ্রম সত্ত্বেও জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। অনশন, অর্ধাশনই তাদের নিত্যসঙ্গী। পদ্মাবক্ষের প্রবল শীতকম্প অবস্থায়ও তাদের পরণে থাকে এক চিলতে বস্ত্রমাত্র। অনিশ্চয়তাজনিত দুশ্চিন্তাই তাদের জীবনের সার্বক্ষণিক দোসর। ইলিশের মৌসুমে দু-বেলা খাবার জুটলেও মৌসুম-শেষে পরিবার প্রতিপালন তাদের পক্ষে হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। কারণ—

> ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এত বড়ো পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় যা মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারও সংসার চলে না। (পৃ.১৪)

পদ্মাতীরের কেতুপুরবাসীর গৃহের অবস্থাও শ্রীহীন, দারিদ্র্যব্যঞ্জক। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের রয়েছে 'বেড়া দেওয়া ছোটো একটি উঠানের দু'দিকে দু'খানা ঘর'। গৃহাভ্যন্তরের অবস্থা যেমন অস্বাস্থ্যকর, জঞ্জালপূর্ণ ও দৈন্যপীড়িত; গৃহ-প্রাঙ্গণও তেমনি স্যাঁতসেঁতে ও পঙ্ক-কর্দমময়। এ-অস্বাস্থ্যকর জীবন-পরিবেশে চলে নবজাতকের অভ্যর্থনা, তৈরি হয় স্বতন্ত্র আঁতুড়ঘর। কুবেরের পঙ্গু স্ত্রী মালার সন্তান জন্মদানমুহূর্তে গৃহের সংকীর্ণ দাওয়ায় ছিন্ন মাদুর চট প্রভৃতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে আঁতুড়ঘর। কিন্তু অব্যাহত দারিদ্র্য শয়নঘর আর আঁতুড়ঘরের ব্যবধান মুছে দেয় এবং তৈরি করে এক অসংস্কৃত বাস্তু-পরিবেশ :

> ...পিসি দাওয়ার এক পাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কী? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া! বাড়তি ঘর থাকিলেও বরং একটা ঘর অপবিত্র করিয়া ফেলা চলিত। দু'খানা কুঁড়ে যার সম্বল তার স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম দিবে? (পৃ. ২২)

প্রসূতি বিনষ্ট করে গৃহের পবিত্রতা— এ সংস্কার থেকেই এতদঞ্চলের জনমানুষ নির্মাণ করে আঁতুড়ঘর। অবশ্য বিত্তভেদে এ-আঁতুড়ঘরের রয়েছে বিভিন্নতা। কেতুপুরের ভদ্রমানুষেরা যে আঁতুড়ঘর নির্মাণ করে তার আকৃতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র :

> ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরও বেশি ভদ্রলোক তাদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড়ঘর। (পৃ.২২)

এতদঞ্চলের বিত্তহীন সরল মানুষগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত। এখানে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান আন্তরিক প্রীতিকর ও স্নিগ্ধ। নিম্নবর্গীয় সমাজে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ

যে অপ্রাসঙ্গিক তা এদের দৈনন্দিন জীবনাচারের মাধ্যমে প্রমাণিত। কেতুপুরে যে পাঁচ-ছয় ঘর মুসলমান আছে, তাদের জীবনাচার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও পরস্পরের সুখে-দুঃখে তারা সমান অংশীদার। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমবায়ে কেতুপুরে যে সমাজ গড়ে ওঠে, তা বহুলাংশে এক আদর্শ সমাজকাঠামোকেই বিজ্ঞাপিত করে। এতদপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক যে বর্ণনাংশ প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

> এরা (হিন্দু) এবং জেলেপাড়ার অ-মুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড়ো অধর্ম পালন করে— দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সে কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়। (পৃ. ৩১)

কেতুপুরে যে কয়টি মুসলিম পরিবার আছে তাদের আচার-আচরণ অনেকটা স্বতন্ত্র। মুসলিম মেয়েরা অনেকটা রক্ষণশীল। পর্দাপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তা তারা মান্য করে সহনীয় মাত্রায়—

> ধরিতে গেলে ... কেতুপুরের মুসলমান মাঝির... সংখ্যা পাঁচ-ছয়ঘরের বেশি হইবে না। জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক, ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত করিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে তা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়, বাড়ির আনাচে-কানাচে লাউ কুমড়া ফলিলে, মুরগিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরের আর এমন বউ-ঝি বাড়িতে যদি কেহ থাকে যাহার বয়স খুব কাঁচা—তাহার। (পৃ. ৩১)

কেতুপুরবাসী ধীবরশ্রেণীর সংস্কারবুদ্ধি অদ্ভুত রকমের। হিন্দু ও মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যতই অবাধ ও সহজ হোক না কেন, অন্তস্তলে তারা যেন অবচেতনসত্তায় লালন করে নির্দোষ সংস্কারবুদ্ধি। অথচ এতে করে এদের সম্প্রীতিতে ছেদ পড়ে না। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হোসেন মিয়া বৃষ্টিমুখর রাত্রিতে কুবেরের গৃহে আশ্রয় নেয়, রাত্রিযাপন করে; এ-বিষয়টি কারো কাছে আপত্তিকর ঠেকে না। তার উপস্থিতিতে গৃহের আসবাবপত্র যে অশুচি হয়ে গেছে, তাও মনে হয় না কারোই। কিন্তু কুবেরকন্যা গোপির কাছে পানের জন্য জল প্রার্থনা করলে 'গোপি ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল, আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটা গোপি করিয়া লইল শুদ্ধ। (পৃ. ৩৩)

বিত্ত ও বিদ্যাবঞ্চিত এই ধীবর-জনপদে দেব-দেবীর সংখ্যা প্রচুর। 'ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতার পূজা' এখানে কখনো সাঙ্গ হয় না। জীবনের অবিরাম বঞ্চনা থেকেই দিনে দিনে দেবতার সংখ্যা বেড়ে চলে, কিন্তু অপ্রাপ্তি আর বঞ্চনার অবসান হয় না। আশ্বিন মাসে যখন লোকালয়ে প্রবল দাপটে ঝড় আসে তখন প্রলয়ের রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য তারা ঝড়ের দেবতাকে স্মরণ করে। ঝড় শুরু হলে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পেতে দেয়। তাদের বিশ্বাস ঝড়ের দেবতা সেই

পিঁড়িতে বসবেন, শান্ত হবেন। ঘরে ঘরে এ সময় মেয়েরা কপাল কুটে মধুসূদনকে স্মরণ করে পদ্মাবক্ষে ভাসমান ধীবর-পুরুষদের রক্ষা করার জন্য।

সমাজবিবর্তনের স্বাভাবিক সূত্রানুসারে কেতুপুরেও দুই পৃথক শ্রেণী অস্তিত্বমান : শোষক ও শোষিত। যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তারা শোষণের হাত বাড়িয়ে দেয় বিত্তহীন সরল মানুষদের প্রতি। জমিদারের কর্মচারী শীতল সুযোগ পেয়ে যেমন শোষণ করে কুবেরকে, তেমনি ধনঞ্জয়ের মতো মহাজনও তার সুযোগ হাতছাড়া করে না। কুবের-গণেশকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেই তাদের আনন্দ। বঞ্চনাই তাই হয়ে ওঠে কুবেরের বিধিলিপি। কুবেরের আত্মচৈতন্য-উৎসারিত অনুভাবনা এতদপ্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্ম-সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই। (পৃ. ১৭)

কেতুপুরের সমাজে নর-নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে পণ আর যৌতুক পালন করে কার্যকর ভূমিকা। বিবাহের পর মেয়েরা পরিণত হয় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে। ধীবর স্বামীর দৈহিক তৃপ্তি আর মনোতুষ্টি বিধানই হয়ে ওঠে তাদের নিত্য কর্তব্যকর্ম। স্বামীর ভালোবাসা তাদের প্রবল প্রত্যাশিত, কিন্তু স্বামী পরনারীতে আসক্ত হলে অন্তর্দহনই হয় তাদের একমাত্র নিয়তি। স্বামী কুবের কপিলা-ভাবনায় তীব্রভাবে সমর্পিত হলে মালার অসহায়ত্ব তীব্র হয়; তার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় 'কলে পড়া জন্তুর মতো'। বিবাহিত পুরুষের এরকম পরনারী-আসক্তি সে-সমাজে নিন্দনীয় নয় আদৌ। এজন্য বিবেকের দংশনজ্বালাও কেউ অনুভব করে না। কেতুপুরের লোকসমাজে পরনারীগমন নিয়ে রস-রসিকতা, কানাকানি হয় বটে তবে তা তীব্র আন্দোলন তোলে না, হালকা বুদবুদ তৈরি করে মাত্র। তীব্র দারিদ্র্যের কাছে নীতি-নৈতিকতার বোলচাল হয়ে যায় গুরুত্বহীন।

উপন্যাসে কেতুপুরের উৎসব ও পূজা-পার্বণের বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক। রথের মেলা এবং রাস উৎসবের বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতাবোধ বিস্ময়কর। দুঃখ-দৈন্যপীড়িত ধীবরপল্লীতে সোনাখালির রথের মেলা নিয়ে আসে অভাবিত আনন্দ। লেখকের ভাষায় :

> বউরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দ্যাখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোনো না কোনো রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা— এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন, আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরাপুঁটির তেলে ভাজা পুঁটি মাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে— খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কীসের? পৃ. ২৮-২৯)

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মাতীরবর্তী জনাঞ্চলের জীবনান্তর্গত প্রতিটি অভিক্ষেপ (projection) উপস্থাপনে তাঁর শৈল্পিক পরিমিতিবোধ সুরক্ষা করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের মনোজাগতিক সন্তোষ ও দহন-ক্ষরণের বিবরণে প্রায়শ দৃষ্টিকোণ স্থানান্তরিত হলেও তা উপন্যাসের

শিল্পসংহতি ব্যাহত করেনি। ঘটনাংশ বর্ণনায় মানিক পূর্বাপর ছিলেন নিরাসক্ত; ঠিক উদাসী পদ্মার বিরামহীন প্রবাহের মতো। গতিপথের নানা আবর্ত, পঙ্ক-কর্দম ও খানাখন্দে পদ্মার পথচলা যেমন ব্যাহত হয় না, ঠিক তেমনি কেতুপুরবাসীর অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখ-দাহে মানিকের মনঃসংযোগেও ন্যূনতম ছেদ পড়ে না। নির্মোহ শিল্পীর মতো পদ্মাতীরবাসীর জীবনপ্রবাহের প্রতিটি ছন্দকে শিল্পাবয়ব দিয়েছেন তিনি। তাদের জীবননদী থেকে আহরণ করেছেন অজ্ঞাতসুন্দর অভিজ্ঞতা এবং বিছিয়ে দিয়েছেন শিল্পতরীর 'খোলে'; যার সৌন্দর্য 'মৃত সাদা ইলিশ মাছে'র মতো এবং যার প্রতিটি শব্দ ইলিশ মাছের স্বচ্ছ নীলাভ চোখের মণির মতো। বাংলা উপন্যাসে জীবনের এমন নির্মোহ নির্মিতির দ্বিতীয় তুলনা অন্যত্র বিরল।

পদ্মানদীর মাঝি-র চরিত্রসমূহ হয়ে উঠেছে পদ্মা এবং পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের জীবনবৈশিষ্ট্যের ধারক। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। সচরাচর নায়ক চরিত্রের যে কুশলতা ও মনোজাগতিক দৃঢ়তা প্রত্যাশিত, কুবের চরিত্রে রয়েছে তার তীব্র অনুপস্থিতি। যে-পদ্মাকে অবলম্বন করে তার জীবন ও জীবিকা, সেই পদ্মার মতোই জীবন সম্পর্কে সে উদাসীন ও নির্লিপ্ত। সে স্বপ্নবিলাসী, কিন্তু স্বপ্নপূরণের উপায় তার অজানা। সে নিশ্চেষ্ট, অসহায়, অদৃষ্টের নির্জীব ক্রীড়নক। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সে শ্রম দেয়, অথচ শ্রমের ন্যায্য পাওনা থেকে সে বরাবরই হয় বঞ্চিত। ধনঞ্জয় আর শীতলের মতো ভদ্রলোকেরা তাকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে প্রতারিত করেছে, ঠিক তেমনি ভদ্রেতর সিধুও তাকে আরাধ্য ব্যঞ্জনের স্বাদগ্রহণে বঞ্চিত করেছে। সে দুঃখ পায়, বেদনার্ত হয়, রক্তমোক্ষণের যন্ত্রণায় কাতর হয়; অথচ জীবনের এ-জটাজাল থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় জানে না। দারিদ্র্যের যে জগদ্দল কেতুপুরের ধীবর সমাজকে চাপা দিয়ে রেখেছে, তার অপসারণের মন্ত্র কেতুপুরবাসীর মতো তারও অজানা।

গণেশ এবং স্ত্রী মালার প্রতি কুবেরের সার্বিক আধিপত্য। মালার প্রতি তার রয়েছে বিরক্তিমিশ্রিত ভালোবাসা। এই বিরক্তির কারণ মালার প্রতি তার অকারণ সন্দেহ। সদ্য জন্ম নেয়া পুত্রের জন্ম-পরিচয় নিয়েও তার সংশয়। সন্দেহের তীব্র বিষে সে দগ্ধ হয়, মালাকে শাপ-শাপান্ত করে। পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় মালা রাসুকে নিয়ে মেজকর্তা অনন্ত তালুদারের সঙ্গে আমিনবাড়িতে গিয়ে রাত্রিযাপন করলে কুবেরের ক্রোধ চরমে ওঠে। এ-পর্যায়ে মালার সঙ্গে সে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করে, তার গায়ে নিক্ষেপ করে জ্বলন্ত কল্কে। সমগ্র উপন্যাসে মাত্র এই একটিবার কুবের চরিত্রের ঈর্ষাক্ষত পৌরুষের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু জমিদার মেজোকর্তার সামনে তার এই পৌরুষও হয়ে যায় উধাও; সেখানে তার যুক্তকর কখনো মুক্ত হয় না।

কুবের নিয়তি-নির্ভর। নিয়তির প্রতি তার নির্ভরতা অশেষ। তার জীবনে পদ্মার ভূমিকাও নিয়তির মতো। পদ্মারূপ নিয়তির উদার অনুদানের ওপর নির্ভর করেই তার বেঁচে থাকা। কিন্তু এই পদ্মা যখন হাত গুটিয়ে নেয়, হয়ে যায় কৃপণ-স্বভাব, তখন কুবেরের অসহায়তা তীব্রতর হয়; জীবন হয়ে ওঠে বিষাদতিক্ত। তবুও দুর্ভার নিষ্ক্রিয়তাই তার জীবনের নিখাদ অবলম্বন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবের চরিত্রের এই নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনের স্বরূপ চিত্রায়িত করেছেন নিম্নোক্ত উপমা-অলংকার সহযোগে :

> কুবের... যেদিন (বাড়িতে) থাকে সেদিন বড়োলোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মতো উদাস চোখে এসব সে চাহিয়া দ্যাখে, স্নেহ-মমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়োলোকের পোষা কুকুরের মতোই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর। (পৃ. ৪০)

কুবেরের এই অসহায় ও নিষ্ক্রিয় জীবনে সক্রিয়তার আভাস নিয়ে আসে কপিলা। কপিলা যেন রহস্যময় পদ্মারই প্রতীক। 'অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো' কপিলা 'চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে' এক রহস্যময় জগৎপথের সন্ধান দেয়। তার মগ্নচৈতন্যে ঢেউ তোলে। কুবের হয়ে পড়ে অব্যবস্থিতচিত্ত। সংসারবৃত্তে বন্দি পঙ্গু মালার বন্ধনসীমা ছেড়ে সে অসীমার অভিলাষী হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মালার জীবন সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সে আজন্ম পঙ্গু। কুবেরের সংকীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ তার পৃথিবী। পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি চায়; কিন্তু পঙ্গুত্বই শেষাবধি তার অনিবার্য বিধিলিপি। কপিলার সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনায় 'বস্তুত মালা ও কপিলা যেন দুটি প্রতীক চরিত্র। মালা স্থির, অচল, নিশ্চিত। কপিলা অস্থির, জঙ্গম, অনিশ্চিত। মালা ঘর, সত্য, সামাজিক। কপিলা বাহির, সম্ভাবনা, অসামাজিক। এই দুইয়ের মাঝখানে কুবের। সংসার তাকে দিয়েছে সন্তান, আশ্রয় আর দারিদ্র্য। বাহির তাকে আকর্ষণ করে স্বপ্ন, শঙ্কা আর অসম্ভবের পথে। পদ্মানদীর মাঝির জীবনে যেহেতু কোনোটির দাবিই কম নয়— তাই কুবেরকে আমরা দেখি দ্বন্দ্ব-বিক্ষত। কিন্তু পদ্মার বিপুল বিস্তার ও স্রোতের মদির সম্মোহন যার জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করে আছে— তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিতের পক্ষে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।'[১১]

পদ্মানদীর মাঝি-র সর্বাপেক্ষা রূপবান চরিত্র হোসেন মিয়া। এই চরিত্রটি নিয়ে সমালোচকগণ পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করলেও[১২] একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হোসেন মিয়া বাংলা উপন্যাসের ধারায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও কালজয়ী। তার চরিত্রে যুক্ত হয়েছে অন্তহীন রহস্য। সে নিয়তির ক্রীড়নক নয়, বরং নিয়তির প্রতিদ্বন্দ্বী। কেতুপুরের ধীবরপল্লীতে সে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তার চরিত্রে শ্রম, শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের যোগ আছে, কিন্তু লিবিডোর প্রশ্রয় নেই। হোসেন মিয়া অর্থকেই সর্বশক্তির উৎস বলে বিবেচনা করেছে। তার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন— কেবল লিবিডো নয়, ক্যাপিটালও সমাজজীবনের চালিকাশক্তি।

পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুরের প্রাত্যহিক বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনে পরিপ্রেক্ষিত চরিত্রগুলো পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এসব চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালানবাবু কেদারনাথ, অনন্ত তালুকদার, শীতল, ধনঞ্জয়, রাসু, শ্যামাদাস, গোপি, যদু, পাচী, নকুল, সিধু দাস, জহর, বুতীর মা, পীতম মাঝি, লখা, চণ্ডী, উলুপী, কুকী, অধর, বৈকুণ্ঠ, হীরু, যুগী, আমিনুদ্দি, নাসির, মমিন, মুরারি, মাখন, বগলী, বঙ্কু, এনায়েত, বসির, ময়নাদ্বীপের মানুষজন, হোসেন মিয়ার সালিশ বৈঠক, হাসপতালের ডাক্তার, বন্যাপরবর্তী উপদ্রুত মানুষের রোদন ও আর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ, পরিপ্রেক্ষিত ও ঘটনাংশকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে এসব পরিপ্রেক্ষিত-চরিত্র ।

এ-উপন্যাসে লেখক পদ্মানির্ভর মানুষের জীবন ও পরিবেশের উপযোগী করে অলংকার নির্মাণ করেছেন। এমন কিছু উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন, যেগুলো এ-জনপদবাসীর বিশ্বাস, সংস্কার, কেন্দ্রীয় মনস্তত্ত্ব, অনুভব-অভিজ্ঞতা ও আবেগ-সংবেদনার প্রকাশে অব্যর্থ। উপমা যেহেতু শিল্পীচিত্তের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, সেহেতু বলা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপমান-উৎস চেনা বাস্তবেরই প্রতিরূপ। উপন্যাসের এক-সংখ্যক পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই উপমা ব্যবহারে তিনি প্রদর্শন করেছেন তাঁর শৈল্পিক সার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য। এ-অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত একটি উপমায় সংকেতায়িত হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের জীবন-পরিণাম :

সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। (পৃ. ১৩)

কুবেরের দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত রহস্যময় জীবনতরীতে ক্ষণকালের জন্য হলেও ঝলমলে আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে এসেছিল কপিলা, সাময়িক সুখের সওগাত নিয়ে এসেছিল হোসেন মিয়া; কিন্তু পরিশেষে পুরো দৃশ্যপটে নেমে এসেছে দুর্বোধ্য অস্পষ্টতা। জীবনের কোন্ বন্দরে এ-তরী নোঙর ফেলবে তাও কুবেরের অজানা। 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথের ঠাঁই মেলেনি, কিন্তু কুবেরের ঠাঁই মিলেছে হোসেন মিয়ার তরীতে; এবং অবশেষে তার যাত্রা হয়েছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। বস্তুত ময়নাদ্বীপ তো জীবনের নিরুদ্দেশ গন্তব্যেরই নামান্তর।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেতুপুরের 'local color and habitations' উপস্থাপনের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন প্রচুর উপমা। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য উপমা আছে, যেগুলো ওই অঞ্চলের দৈনন্দিনতার স্মরণীয় উদ্ভাসক। যেমন :

১. কুবের এই সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। (পৃ. ১৬-১৭)
২. কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা।' (পৃ. ৪৪)
৩. শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা,... (পৃ. ৬১)
৪. মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারের মতো অতল কুসংস্কার নাড়া খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কুবেরের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। (পৃ. ৬৩)
৫. দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার বর্ষার পদ্মার মতো। (পৃ. ৭৭)
৬. ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপিকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মতো মাঝে মাঝে তারও মনটা কি ছটফট করে না? (পৃ. ৮৭)

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা জীবনের সঙ্গে প্রবলভাবে সম্পর্কিত। এ-ভাষা প্রয়োজনে মৃত্তিকাস্পর্শী, কখনো নাটকীয়, কখনো অন্তরঙ্গ পরিস্থিতির উন্মোচনে অব্যর্থ। এ 'ভাষা একদিকে চলে গেছে লোকজ ধারার ভিতরে, জটিল শিকড়বাকড় মেলেছে মাটির তলায়। সরু মোটা তারে বোনা জালের মতো ছড়িয়ে গেছে অন্ধকারে, নিভৃতিতে, আদিমতায়, রসে-রহস্যে, আবার জীবনের কলরোলে আনন্দে যন্ত্রণায়।[১৩] এ-উপন্যাসের ভাষা অভিধানের বাছাই করা শব্দে তৈরি নয়। এ-ভাষা একটি অঞ্চলের অনির্বচনীয়কে উচ্চারণ করেছে অত্যন্ত ঋজুতার সঙ্গে। যেমন :

কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হে এ এ এ—মাছ কিবা?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর।

জবাবের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যা বেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা যুত নাই। (পৃ. ১৪)

কুবের, যদু এবং ধনঞ্জয়ের সংলাপ-প্রতিসংলাপের মাধ্যমে পদ্মাঞ্চলের মৃত্তিকানির্ভর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পাঠ অত্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংহতি ব্যতীত জীবনের এ রূপাঙ্কন অসম্ভব। পদ্মাবক্ষে ভাসমান নৌকারোহীর সঙ্গে দূরবর্তী নৌযাত্রীর কথোপকথনের ভঙ্গি, তার উত্তাপ ও উত্তেজনা প্রবল বাতাসের আন্দোলনে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে ভিন্নতর আবেষ্টনী তৈরি করতে পারে তা উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে সুপ্রত্যক্ষ।

সাধারণ বর্ণনায় অথবা সংলাপে লোকজীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত করেছেন মানিক। ক্রিয়ার সাধুরূপের সঙ্গে সর্বনামের চলিত রূপ মিশিয়ে তিনি প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অথচ আশ্চর্য, এ-অভিনব পরীক্ষা সত্ত্বেও ভাষা তার প্রাণধর্ম হারায়নি, বরং হয়ে উঠেছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবনধর্মের অন্তরঙ্গ বাহন। যেমন :

পিসি বলিল, শুলি যে ধন? বউ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে দেইখা আয়।

গোপি বলিল, বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। নকুইলার মাইয়া পাঁচি কি কইয়া গেল শুনবা? সায়েব গো এমন হয় না। না পিসি?

কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইলা কী লো হারামজাদি? জ্যাঠা কইবার পার না? (পৃ. ২০)

আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশে উচ্চারিত লোকজ শব্দের পাশাপাশি 'বিয়াইয়া', 'চেঁচাইয়া' প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদ কী অবলীলায় তিনি ব্যবহার করেছেন! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে যথার্থই 'কলম-পেষা মজুর' ছিলেন তা তাঁর এ-প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্পষ্ট।

কখনো কখনো লেখকের দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত ভাষা হয়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের ভাষা। নাটকীয় স্বগতোক্তি অথবা উপর্যুপরি প্রশ্নের মাধ্যমে বর্ণনাকে তিনি করে তুলেছেন প্রাগ্রসর ও চিত্তাকর্ষক। বলা বাহুল্য, এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাভঙ্গির অতি প্রিয় ও পরিচিত কৌশল। একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

...কয়েকদিন আগে কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে, কিছুদিন থাকিবে। বাড়ি ফিরিয়া কুবের সেদিন মালাকে বড়ো দরদ দেখায়। বলে, মালা কতকাল বাপের বাড়ি যায় নাই, ইচ্ছা করে না যাইতে? ইচ্ছা যদি হয় তবে না হয় চলুক মালা কাল, দু-চারদিন থাকিয়া আসিবে। (পৃ. ৮৭)

উপন্যাসে কেতুপুরের ধীবরশ্রেণীর উচ্চারিত সংলাপ একান্তই কৃত্রিম। এ-সংলাপ অঞ্চলবিশেষের মুখের ভাষার হুবহু প্রতিফলন নয়। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বুলি এখানে সরাসরি প্রযুক্ত হয়নি। শব্দের মানরূপকে ভেঙে-গড়ে তিনি এ-ভাষা-শরীরে জড়িয়ে দিয়েছেন এক ধরনের ঔপভাষিক পরিচ্ছদ। কেতুপুরের কুবের কিংবা নোয়াখালী-প্রত্যাগত হোসেন মিয়া, সবারই উচ্চারিত সংলাপের ভাষারূপ প্রায় একই। অবশ্য হোসেন মিয়ার সংলাপে রয়েছে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি; এক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার ধর্ম-পরিচিতি বিস্মৃত হননি। একটি দৃষ্টান্ত :

...মনে মনে লোকটাকে ভয় করিলেও কাছে গিয়া কুবের বলিল, 'ছালাম মিয়া বাই।'

হোসেন বলিল, 'ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি? কাহিল মালুম হয়?

জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আলেন কবে?

আইজ আলাম। আর গণেশ বাই, খবর কী? মেলায় যাবা না?

গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু। পোলাপানেরা মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান?

'গুমটি দিছে, বাদাম চলব না, সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফিরা্যা আইও, আসমান ভালো দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝড় হইবার পারে।' (পৃ. ২৫)

মূলত ক্ষুধানিবৃত্তি এবং যৌনানুভূতি মানবজীবনের দুই প্রবল বৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক এ-দুই বৃত্তি আবহমান মানুষের জীবনগতির সমান্তরাল। ইতঃপূর্বে রচিত *দিবারাত্রির কাব্যে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করেছেন জীবনের একরৈখিক চিত্র। এ-উপন্যাসের চরিত্রসমূহ যৌনাবেগে পরিচালিত। তারা মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন, বায়ুভোজী। *পুতুলনাচের ইতিকথায়* জীবনের পট-পরিপ্রেক্ষিত আরো প্রসারিত হয়েছে। কেবল লিবিডো নয়, যুগধর্মও মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে— এ-বক্তব্যই পরিশেষে প্রতিপাদিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে কুবেরের জীবনপ্যাটার্ন উপস্থাপনসূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুধা ও যৌনানুভূতির আগ্রাসী চিত্র যেমন অঙ্কন করেছেন, ঠিক তেমনি হোসেন মিয়ার মাধ্যমে মানবজীবনে ক্যাপিটালের অনিবার্যতার প্রসঙ্গও ব্যক্ত করেছেন তিনি। *দিবারাত্রির কাব্য* এবং পুতুলনাচের *ইতিকথায়* জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ছিল শিক্ষিত শাহরিক মধ্যবিত্তমানসের অভিজ্ঞতালোকের সঙ্গে সম্পর্কিত; পক্ষান্তরে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত তাদের অভিজ্ঞতালোক-বহির্ভূত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্তাবদ্ধ শিল্পী নন। অবিরাম বৈচিত্র্যসন্ধানী মানিক সমাজ-অন্তর্গত মানুষ, তাদের জীবনযাপন, বিচিত্র বৃত্তি, পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে পরিচালনা করেছেন নিত্যনব নিরীক্ষা। তাঁর সে নিরীক্ষা ও অনুসন্ধিৎসার বিস্ময়কর প্রকাশ *পদ্মানদীর মাঝি*। এ-উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের ধীবর শ্রেণীর বহুলাঙ্গিক জীবনচিত্র শিল্পসমগ্রতায় সমুদ্ভাসিত। কুবেরের যৌনাবেগ, কেতুপুরবাসী ধীবর শ্রেণীর ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, পূজা-পার্বণ, জীবন-জীবিকা, আহার-বিহার অর্থাৎ তাদের যাপিত জীবনের সমগ্র জীবনসত্য উপস্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। এর সমস্ত বর্ণনা-বিবৃতি, প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের ওপর পদ্মা এবং তার তীরবর্তী জনাঞ্চলের একটা নিষ্কম্প অচঞ্চল নির্মল মেঘচ্ছায়া বিরাজিত; প্রতীচ্যের কোনো তত্ত্ববায়ুবেগে যার অপসারণ অসম্ভব। অতঃপর নির্দ্বিধায় বলা যায়, *পদ্মানদীর মাঝি* পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর অঞ্চলের ধীবর জনগোষ্ঠীর মহাকাব্যিক শিল্পরূপ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *পদ্মানদীর মাঝি* সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় : তৃতীয় বর্ষ ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ তিন কিস্তি; আশ্বিন-কার্তিক দুই কিস্তি; পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন তিন কিস্তি; এবং চতুর্থ বর্ষ ১৩৪২ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ এক কিস্তি— সর্বমোট নয় কিস্তিতে। ১৯৩৪ সালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে 'পূর্ব্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে *পদ্মানদীর মাঝির* প্রকাশও স্থগিত হয়ে যায়। অতঃপর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স উপন্যাসটি প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালের ২৮ মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৮, মূল্য ছিল দেড় টাকা। (তথ্যসূত্র : গ্রন্থপরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ৪৮১-৪৮২)

২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ ৯৩

৩. পদ্মানদীর মাঝি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮। বর্তমান আলোচনায় *পদ্মানদীর মাঝির পাঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*

-এর এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। পাঠ উপস্থাপনা শেষে *রচনাসমগ্র*-র খণ্ডসংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৭৪

৫. দ্রষ্টব্য : মনঃসমীক্ষণ, সুনীল কুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃ. ৯৪-১২৯

৬. 'গোপিকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে, হাঁটা পথে বারো তেরো মাইল। ক্ষেতের আল দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে কতবার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুরে পৌঁছিয়া একটা পুকুরে মুখ হাত ধুইতে নামিয়া কতবার সে যে পুকুরঘাট হইতেই সোজা আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তার হিসাব নাই।
তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইল তাহার। (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭)

৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ ৫১৬-৫১৭

৮. এম. কে. প্রোডাকশন নামক চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থার অন্যতম অংশীদার শ্রীমাধব ঘোষালকে লিখিত একটি পত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২ আগস্ট ১৯৫২ তারিখে এ-অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। (তথ্যসূত্র : যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ. ৩০৭)।

৯. '১৪/১৫ বৎসরের ... ছেলে স্কুলের ছাত্র মানিককে দু-তিনদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। যায় কোথায়। জননী কেঁদেকেটে অস্থির, খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টাঙাইলের নদীর ধারে যে নৌকাগুলি নোঙ্গর করা থাকে, তাদের মাঝিমাল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের মধ্যে সে দু'চারদিন থেকে আসে। নৌকার মধ্যে তাদের অন্ন খায় পরম তৃপ্তিতে। এ আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত পাগলামি। (তথ্যসূত্র : ড. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৮)।

১০. যুগান্তর চক্রবর্তী, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮

১১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯

১২. (ক) অরুণ বসু : '...হোসেন মিয়া মানিকের অব্যবস্থিতচিত্ততা মাত্র, চরিত্রটি সম্পর্কে যথার্থই তিনি মনঃস্থির করতে পারেননি। ('পদ্মানদীর মাঝি', নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১১০)
(খ) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ... হোসেন মিয়া এবং পদ্মা পরস্পরের সহযোগী কদাচ নয়। বরঞ্চ হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতায় তার ভূমিকা। পদ্মা-তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের তথা পদ্মার কাছে সমর্পিত ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজ ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির মাঝখানে দ্বীপ রচনায় একাগ্রচিত্ত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ১৯৮০ পৃ. ৩১০)

১৩. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ৯৭

মানিক সাহিত্যে উপভাষা

গৌতম কুমার দাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তাঁর *জননী*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *চিন্তামণি* উপন্যাসে উপভাষার ব্যবহার সর্বাধিক। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের মালপদিয়ায়। পিতার বদলিপ্রবণ চাকরি উপলক্ষে অখণ্ড বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন শহর ও শহরসংলগ্ন গ্রামে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব থেকে কৈশোরকালের দুরন্তচঞ্চল জীবন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির পর থেকে তিনি কলকাতায় বাস করেন স্থায়ীভাবে। *পুতুলনাচের ইতিকথায়* গাওদিয়া গ্রাম, *পদ্মানদীর মাঝিতে* কেতুপুর গ্রাম, *অহিংসায়* রাধানদীর তীরবর্তী নামহীন গ্রাম ও বাগবাদা গ্রাম, *চিন্তামণিতে* মধুবনী গ্রামের মানুষের জীবন ও পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এ গ্রামগুলোর অবস্থান পূর্ববঙ্গে। আর এ দিক থেকে বলা যায় এটা বাংলা উপভাষার অন্তর্ভুক্ত।

যে কোনো কথাসাহিত্যে ভাষার দুটি দিক লক্ষণীয়; এক, বর্ণনার ভাষা, দুই, সংলাপের ভাষা। বর্ণনার ভাষার সঙ্গে সংলাপের ভাষার রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। সাধারণত যে জীবন ও পরিবেশ নিয়ে লেখক সাহিত্য রচনা করেন তার ভাষাও সেই পরিবেশ অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন। বর্ণনার ভাষা অনেকটাই ধারাবাহিক। বাক্য নির্মিতির ক্ষেত্রে লেখক স্বাধীন। বাক্যকে ছোট-বড় করা বা ভাষাকে ভাবগম্ভীর করা– এসব কিছুই নির্ভর করে লেখকের মানসিকতার ওপর। অন্যদিকে সংলাপের ভাষা নির্ভর করে চরিত্রের শিক্ষা, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা ও রুচির ওপর। সংলাপের ক্ষেত্রে চরিত্রানুগ কথ্যভাষার (Dialect) ওপরই লেখককে নির্ভর করতে হয়। মানিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

সাহিত্যের ভাষা গঠনে মানিক সাধু-চলিত এই দুই রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁর সাধুরীতিতে রচিত উপন্যাসগুলোতে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ব্যবহার তেমন নেই বললেই চলে। একমাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘরূপ ছাড়া শব্দচয়ন ও সংযোজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলিত এবং আঞ্চলিক শব্দ থেকেই করা হয়েছে। মানিকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননী* সাধুভাষায় রচিত হলেও তা সংস্কৃত শব্দনির্ভর নয়। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ক্রিয়া আর সর্বনাম পদের দীর্ঘরূপের মধ্যেই এ সাধুভাষা সীমাবদ্ধ। মানিক তাঁর প্রয়োজনেই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মুখে উপভাষার প্রয়োগ করেছেন। তবে সংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি চরিত্রের মুখ দিয়ে কথা বলান নি। এ ক্ষেত্রে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আংশিক বর্ণনা আর আংশিক উপভাষার। শ্যামা আর মন্দাকিনীর কথোপকথনের অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল। মন্দাকিনী শ্যামাকে বলছে :

দেখবি বউ? এই দ্যাখ–

এবার স্বর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল, ঠাকুরঝি?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আর ভাবনা কী বউ? ভালোয় ভালোয় সব উতরে গিয়েছে। খোকা লো, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে তোর।[১]

দিবারাত্রির কাব্যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর বৃত্তি ও পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপের ভাষা নির্মাণ করেছেন তিনি। এতে তাঁর পরিবেশ সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। হেরম্ব আর সুপ্রিয়ার সংলাপ :

বারান্দা থেকেই হেরম্ব বলল, এত গরমে তোর না রাঁধলেও চলবে, সুপ্রিয়া। পাঁড়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়, যা পারে ওই করবে।

সুপ্রিয়া কথা বলল না। আঁচলে মুখ মুছে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হেরম্ব বলল, আমাকে চা দিলি না যে?

এত গরমে একশোবার চা খেতে হবে না।

এক গেলাস জল দে তবে।[২]

পুতুলনাচের ইতিকথা সাধুভাষায় রচিত। তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের ভাষা থেকে এ ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

মানিক সাধু গদ্যের প্রচলিত আবেগ জাগানো রীতি পরিত্যাগ করেছেন, এটি লক্ষণীয়। বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত গদ্যকাররা ঐ ধরনের গদ্যের মধ্যে যে সব শব্দ ব্যবহার করতেন সেগুলো খুব কমই সমকালীন,বরং সেক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ (association) জড়িত রয়েছে। কিন্তু মানিকের সাধু গদ্য সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং অনুচ্ছেদ থেকে অনুচ্ছেদে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। উপন্যাসের কোনো কোন জায়গায়, বিশেষত রচনার মাধ্যম যেখানে সাধুভাষা, সেখানে আবেগধর্মী শব্দ এসেই যায় এবং মানিকেও তা এসেছে।[৩]

গ্রাম্যবধূ কুসুমের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত শশী কথা বলতে গিয়ে শশীর মনের আবেগকে ধরে রাখতে পারেননি ঔপন্যাসিক। কুসুম যখন বলে,

এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।

গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর মনে হয়, এ কথা কুসুমের বানানো। মতিকে পাছে সে আবার নিজে বিবাহ করিয়া কুমুদের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়, তাই কুসুম এই মন-রাখা কথা বলিয়াছে। ...

কুসুম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?

শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?[৪]

যেখানে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে দিকে মানিকের লক্ষ ছিল। গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাস্তবতাকে প্রকাশের জন্য গ্রাম্য নিসর্গকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। গাওদিয়া গ্রামের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা থেকে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

এ গ্রামের রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা। বর্ষাকালে কোথাও এক হাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিছল হইয়া থাকে। গোরুর গাড়ির চাকাতেই রাস্তাটির সর্বনাশ করে সবচেয়ে বেশি। বর্ষার পর কাদা শুকাইলে মনে হয় আগাগোড়া যেন লাঙল দিয়া চষিয়া ফেলা হইয়াছে। শীত পড়িতে পড়িতে পথটি আবার সমতল হইয়া যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষতের উঁচু সীমানাগুলো গুঁড়া হইয়া এত ধুলা হয় যে পায়ের

পাতা ডুবিয়া যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাতাসে ধুলা উড়িয়া দু'পাশের গাছগুলোকে বিবর্ণ করিয়া দেয়। (পুনাই/৩৩৭)

পরস্পর ভাব-সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যকে কমা (,) ব্যবহারের মাধ্যমে একবাক্যে রূপান্তরিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন-

রাগের কারণ দূর হইল, আর তো শশীর রাগ থাকিবে না? সেনদিদির ছেলে পৃথিবীতে আসিয়াছে বলিয়া শশী রাগ করে নাই, তাকে বাড়িতে আনা হইয়াছে বলিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এ অন্যায় আবদার শশীর, অসঙ্গত ব্যবহার, তবু মাথা নিচু করিয়া গোপাল যখন তাহার অভিযোগের প্রতিকার করিল, বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে কি আর শশী পারিবে! (পুনাই/৪৮৭)

শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানিক কোথাও কোথাও ছিলেন অসচেতন। একই শব্দ একই বাক্যে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন– 'ভিনগাঁয়ের লোক অবসন্ন মন্থর পদে ভিনগাঁয়ে ফিরিয়া যায়। (পুনাই/৪৬৩) অথবা 'আহা, তা তো জানি না! তামাশাই করলেন চিরকাল, তাই ডাকলে মনে হয় তামাশা করার জন্যই বুঝি ডেকেছেন।' (পুনাই/৪৭০)

পুতুলনাচের ইতিকথার চরিত্রগুলো গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী, কুসুম, মতি, গোপাল– এদের মুখের ভাষাও বেশ পরিশীলিত হলেও তাতে উপভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যামিনীর স্ত্রীর (শশীর সেনদিদি) মৃত্যু প্রসঙ্গ নিয়ে গোপালের সঙ্গে শশীর সংলাপ :

একদিন আচমকা গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেনদিদি কীসে মরল শশী?

হার্ট খারাপ ছিল।

গোড়ায় বুঝি ধরতে পারনি?

গোড়াতেই ধরেছিলাম।

তবে মরল যে?

এ প্রশ্নে শশী হঠাৎ রাগিয়া গেল। বলিল, গোড়ায় রোগ ধরতে পারলেও মানুষ মরে।

গোপাল বলিল, ইনজেকশন দুটো আগে দাওনি বলে হয়তো– । (পুনাই/৪৭৯)

এ সংলাপে উপভাষার প্রয়োগ সামান্য। শশী ও কুসুমের সংলাপে কুসুমের মুখের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুমি ওখানে কী করছ বউ? সাপে কামড়াবে যে?

কুসুম বলিল, সাপে আমাকে কামড়াবে না ছোটোবাবু, আমার অদেষ্টে মরণ নেই।

শশী হাসিয়া বলিল, কী আবার হল তোমার?

পরানের বউ বলে যে ডাকলেন আজ? পরানের বউ বললে আমার গোসা হয় ছোটোবাবু। পিসি বলত,– বুঁচির ছোটো পিসি, ও বছর যে সগ্যে গেল, এমনি গাল তাকে একদিন দিলাম–

আমাকেও না হয় দাও দুটো গাল।

তাই বললাম? হ্যাঁ ছোটোবাবু, তাই বললাম? পূজ্য মানুষ আপনি, আপনাকে পুজো করে আমাদের পুণ্যি হয়–। (পুনাই/৩৪৪)

তবে গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের সংলাপে উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশি। শশীর নৌকার মাঝি গোবর্ধনের মুখে উপভাষার প্রয়োগ

ঘটেছে। হারুর মৃতদেহকে আবিষ্কার করে শশী, কিন্তু তাকে নৌকায় তোলার ক্ষমতা নেই শশীর।

এ অবস্থায় শ্যাওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।

শশী বলিল, দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।

গোবর্ধন বলিল, ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন? (পুনাই/৩৪৪)

নবীন মাঝির সংগ্রাম জলের সঙ্গে। সে সারাদিন গাওদিয়ার খালের মধ্যে বুক জলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরে জাল পেতে। নিতাইয়ের সঙ্গে তার কথোপকথনে উপভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন-

নিতাই ডাকিয়া বলে, কী মাছ পড়ল মাঝি?

নবীন বলে, মাছ কোথা ঘোষ মশায়? জল বড়ো বেশি গো।

মাগুরটাগুর পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, জলে দেঁড়িয়ে কি মিছে কথা কইছি? এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছনি।

হারুর মরণের খবরটা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে।

বলে, লোক বড়ো ভালো ছিল গো। জগতে শত্তুর নেই।

তারপর বলে, ই বছর, জান ঘোষ মশায়, অদেষ্ট সবার মন্দ। তিন বর্ষা নামল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে। (পুনাই/৩৮৮)

পদ্মানদীর মাঝি মানিকের অন্যতম প্রধান উপন্যাস। পূর্ববঙ্গের পদ্মানদীকেন্দ্রিক জেলেদের জীবন-চিত্র চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে।[৫] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক সর্বপ্রথম বাংলাদেশের নদী-সমুদ্রের সমন্বয় এঁকে তার প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার মানুষ ও তার মনকে স্বভাব-সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন। জীবনে যারা বাঁচার জন্যে তীব্র পাঞ্জা কষে মৃত্যুর সঙ্গে তারা প্রতিদানে দু-মুঠো অন্নও পায় না, পরণবাস যাদের ছিন্ন, ঘরে যাদের আলো জ্বলে না, মাছ ধরা জীবিকা হলেও যাদের ভাগ্যে জোটে না একমুঠো ভাত, যারা অন্ত্যেবাসী– সেই সব মানুষ মানিকের উপন্যাসে মিছিল করে এলো।[৬]

সমালোচকের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে জেলেদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এ উপন্যাসে রয়েছে উপভাষার সর্বাধিক ব্যবহার। *পদ্মানদীর মাঝির* কুবের, মালা, কপিলা, রাসু, গণেশ ও হোসেন মিয়া– এদের প্রত্যেকের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে উপভাষা। তাছাড়া রয়েছে মাঝিদের নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা–যা শুধু মাঝিরাই বুঝতে পারে। দেবীগঞ্জে পৌঁছানোর আগেই কুবের হাঁকিয়া বলে,

যদু হে এ এ এ– মাছ কিবা?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর।

জবাবের পর সে নৌকা হইতে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামব। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।[৭]

কুবেরের আহ্বানের ভাষা খুব সহজেই যদুর মতো মাঝিরা বুঝতে পারে। ধনঞ্জয়ের সংলাপে 'কাইল, চাইরে, ধইরা' অপিনিহিতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিন্দা মাঝির ছেলে রাসু হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ থেকে পালিয়ে আসে। নদীর মধ্যে অনেক দূর থেকে কুবেরকে দেখতে পেয়ে জেলেদের সাংকেতিক ভাষায় সে নিজের উপস্থিতির কথা জানায়। মানিক এ ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন :

হোগলার ছাউনিটা বাতার সঙ্গে বাঁধিতে বাঁধিতে কুবের হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, কে হাঁকে রে গণশা?

বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল মানব-কণ্ঠের একটানা একটা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝিশ্রেণীর লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। (পনমা/২৬)

সারারাত মাছ ধরতে গিয়ে অনেক কষ্টে মাঝিরা ক্লান্ত হয়ে যায়। শরীর খারাপ লাগলে তারা বিশ্রাম করে। কুবেরের শরীর বিশেষ ভালো না থাকায় মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাই গো আজান খুড়া।

জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।

কুবের বলিল, উহুঁ, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভাল নাই।...

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, ইঃ, আজ কি জাড় কুবির। (পনমা/১৪)

এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বেশকিছু উপভাষা। এছাড়া রয়েছে স্বরসঙ্গতি, ঘোষীভবন ও অপিনিহিতির প্রয়োগ। শুধু পদ্মানদীর মাঝিই নয় কেতুপুর গ্রামের সকলেই উপভাষায় কথা বলে। জমিদারের কর্মচারী শীতলের সঙ্গে কুবেরের কথোপকথনেও উপভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয় :

মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।

মাছ ত নাই শেতলবাবু।

নাই কিরে নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় গা যা। বড় দেইখা আনিস।

কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।...

সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই?

তা'লি খানিক খাড়াও শেতলবাবু। (পনমা/১৬)

এরপর কুবের সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনটা ইলিশ মাছ নৌকা থেকে চুরি করে শীতলের হাতে দেয়। শীতল থলির মধ্যে মাছ ভরে কুবেরকে বলে :

পয়সা কাইল দিমু কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেখি।

কাইল দিমু কইলাম যে?

অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই ত দিমু কি? কাইল দিমু, নিয্যস দিমু। (পনমা/১৪)

জেলেদের মধ্যে প্রায় সব সময় চলে হাস্য-রসিকতা। কুবেরের গায়ের রঙ কালো। তার স্ত্রী মালা ফর্সা। মালা পঙ্গু। এক সময় জমিদার মেজকর্তা জেলেপাড়ায় স্কুল খোলার জন্য যখন তখন যাতায়াত করত। কুবেরের স্ত্রীর গর্ভে সুন্দর সন্তান জন্ম নিলে তা নিয়ে কানাকানি হয় গ্রামে। সারারাত মাছ ধরে দেবীগঞ্জে বিক্রি করে গৃহে ফেরার পথে কুবেরকে দেখতে পেয়ে নকুল দাস বলে :

অ কুবির শোন, শুইনা যা।

গণেশ বলিল, কুবির জ্বরে বড় কাতর গো।

নকুল বলিল, জ্বর নাকি? তবে বাড়িত্ যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।...শ্যাষ রাইতে তোর বৌ খালাস হইছে কুবির।

কুবের অবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা? ইটা হইল কিবা?

ক্যান? নয় মাসে খালাস হয় না?

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?

নকুল সায় দিয়া বলিল, হ। আমাগোর পাচী গেছিল, আইসা কয় কি, কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখানা পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রঙ হইছে গোরা।

কুবেরের স্তিমিত চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।

গণেশ রাগিয়া বলিল বৌ গোরা না নকুলদা?

হ, বৌ ত গোরাই, হ। (পনমা/১৮-১৯)

কুবের-নকুল-গণেশের মুখে 'অ, কাতর, বাড়িত, দ্যাখ, শ্যাষ, রাইতে, খালাস, হইছে, ক্যান, ছাওয়াল, আমাগোর, গেছিল, আইসা, কয়, পুত্তুর, আইছে, একরত্তি, পোলা, কমু, কালাকুষ্ঠি, কোয়ান, থেইকা, কওন'– প্রভৃতি উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এ

উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মুখে উপভাষার যথাযথ প্রয়োগের ফলে আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়েছে চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে অরূপকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> এদের মুখের ভাষা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ চরিত্রানুযায়ী লেখক যত্নে গড়ে তুলেছেন। ফলে তা যেমন একদিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেছে তেমনি বৃহত্তর জীবনবোধে সার্থক কালজয়ী রচনা হতে পেরেছে।[৮]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝির* চরিত্রের মুখে উপভাষার সার্থক প্রয়োগের বিষয়ে বলেছেন, 'আঞ্চলিক উপভাষার সংযত ব্যবহারে লেখক একটি বিশ্বাসযোগ্য বাতাবরণ গড়ে তুলতে চেয়েছেন।'[৯] *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে রয়েছে প্রচুর উপমার ব্যবহার। যেমন-

১. গোপী বলিল, বাই উ, ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। (পনমা/২০)
২. শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা, শীর্ণ রোগা মুখখানাতে জ্বলজ্বল করিতেছে দুটো চোখ, একটা খড়ের পুঁটুলির উপর ভাঙা পা-টি রাখিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে বিছানায়। (পনমা/৬১)

চলিতভাষায় রচিত *চিন্তামণি* উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল। *পদ্মানদীর মাঝির* মতোই এ উপন্যাসের চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে উপভাষা। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গৌরাঙ্গের কথোপকথন :

> কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা?
>
> হবে। তাই কী?
>
> আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিয়ো
>
> মোর কাজ নেই কো? আদুলির ভাঙা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।
>
> আদুলির নামা জমি? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ?
>
> কিনতে পারি। পেতে পারি। জুটতেও পারে। তোর কাজ কি অত খপর নিয়ে? তোর বাপের জমি নয়।[১০]

'তুমার, নামলি, মোরে, কুথা, বটেক' প্রভৃতি উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে গৌরাঙ্গ ও চন্দ্রকান্তের সংলাপে।

চিন্তামণি উপন্যাসে রয়েছে প্রচুর উপমার ব্যবহার। যেমন-

১. বুড়ো হারানের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা শক্তির মতো। (চি/২৪৬)
২. ডান হাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মতো হাত। (চি/২৫১)

অহিংসা উপন্যাস সাধুভাষায় রচিত। এ উপন্যাসেও তৎসম তদ্ভব শব্দের ব্যবহার সীমিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু উপভাষা। উপন্যাসের শুরুতেই বলা হয়েছে—

> সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিন দিকটা তপোবনের মতো। বাকি দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মতো নির্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশি নয়।...দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শখানেক বিঘার কাছাকাছি। ...নদী পুবদিকে।... বড়ো আশ্চর্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে।[১১]

এ কথা ঠিক যে, ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি তাঁর ভাষার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের ভাষার মধ্যেই রয়েছে মানিকের জীবনদৃষ্টি। এ সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন :

> আসলে জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে, বিষয়ের বিভিন্নতায় এবং লেখকের বক্তব্যের বৈচিত্র্যে ভাষাও নানান রূপ ধরে। বিষয় ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে ভাষার বদল হয়, কিংবা বলা যায়, বিশিষ্ট ভাষার আধারেই লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টিকে বা জীবনের ব্যক্তিগত তাৎপর্যকে ধরে রাখেন।[১২]

এবার মানিক সাহিত্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপমূলতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপভাষা ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা হল।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ভাষা ও শব্দসমূহের ব্যবহার কৌশল অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সকল ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেগুলোকে নিম্নরূপ সূত্রে বিন্যাস করা যায়।

১. দ্বি-স্বরধ্বনি : মানিকের সাহিত্যে ব্যবহৃত উপভাষায় দ্বি-স্বরধ্বনির উদাহরণ :

অ-য়	কয়	: বিহানে ঘরে ফিরা্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত।(পনমা/২৩)
আ-ই	ছাই	: ওষুদ না ছাই। (পুনাই/৩৭৫)
আ-উ	ফাউ	: সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে। (পনমা/১৭)
ই-ই	দিই	: তোমার রুগি তোমার ওষুদ দিই খাইয়ে। (পুনাই/৩৫৪)
উ-ই	তুই	: তুই যাত্রাদলের সঙ্গে এসেছিলি কুমুদ? (পুনাই/৩৫৯)
ও-ই	কই	: পোলা হইব কই নাই কবিরাজ। (পনমা/১৯)
ও-উ	বউ	: বউ আপনার নামে যা তা বলে। (পুনাই/৩৫৬)

২. আনুনাসিক স্বরধ্বনি : মানিকের সাহিত্যে আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রয়োগ সীমিত। বাংলায় " ঁ " (চন্দ্রবিন্দু) এই চিহ্ন-দ্বারা স্বরধ্বনির আনুনাসিকভাব প্রদর্শিত হয়।[১৩] স্বরধ্বনি মৌখিক বা আনুনাসিক হতে পারে। তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত আনুনাসিক স্বরধ্বনির দৃষ্টান্ত :

মৌখিক স্বরধ্বনি	আনুনাসিক স্বরধ্বনি	উদাহরণ
পাক	পাঁক	: এবার জিগাইলে একদলা পাঁক দিমুনে ছুঁইড়া মুখের মধ্যে। (পনমা/২০)
গায়ে	গাঁয়ে	: বৌরে কইলাম, হীরু জ্যাঠার ঠাঁই দুগা চাল কর্জ আনগা দুপরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। (পনমা/২৩)

৩. অপিনিহিতি : বাংলাদেশের অধিকাংশ উপভাষায় অপিনিহিত /ই/ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১৪] বিশেষ করে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের তথা বাঙালি উপভাষায় অপিনিহিতির পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'অপিনিহিতি এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল, এখন পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় ইহা প্রায় অবিকৃতভাবেই সংরক্ষিত আছে।'[১৫] মানিকের সাহিত্যে প্রচুর অপিনিহিতি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

আচ্ছা>আইচ্ছা : আইচ্ছা, তুই ক দেখি গণেশ হীরু জ্যাঠার ঠাঁই দুগা ছন চামু নাকি? (পনমা/২৩)

এল>আইল : গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা। (পনমা/১৯)

কলকাতা>কইলকাতা : কইলকাতার থনে আলেন কবে। (পনমা/২৫)

করে>কইরা : পরনাম কইরা গেলাম তরে। (পনমা/৭৯)

খুলে>খুইলা : খুইলা পড়ব যে পেরসাদ। (পনমা/৫১)

ডেকে>ডাইকা : আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে। (পনমা/২১)

থুয়ে>থুইয়া : চল কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। (পনমা/২১)

দেখে>দেইখা : বড়ো দেইখা আনিস।(পনমা/১৬)

ধরে>ধইরা : হাল ধইরা যদি বইবার পারস কুবির, খুড়া আর আমি বৈঠা বাই। (পনমা/১৭)

পেতে>পাইতা : গোপির মার বিছানায় পাইতা দিছি। (পনমা/২২)

বসে>বইয়া : আজান খুড়া বইয়া আছে। (পনমা/২৩)

ভেসে>ভাইসা : জিনিসপত্তর সকল ভাইসা যাইত। (পনমা/২২)

মেয়ে>মাইয়া : মাইয়াটারে ব্যানুন রাইধবার কইলাম। (পনমা/৩০)

নিয়ে>লইয়া : মাছ লইয়া আয়। (পনমা/১৬)

লেগে>লাইগা : আসনের লাইগা গোপী কাইন্দা সারা হইছিল। (পনমা/১৬)

শুনে>শুইনা : শুইনা আলাম মাঝি আইজ ক[illegible]বির মদ্যি জবর ঝড় হইবার পারে। (পনমা/২৫)

মানিকের সাহিত্যে এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কোনো কোনো শব্দের মধ্যে /ই/ ধ্বনি লোপ পেয়েছে। যেমন—

মরিস>মরস : জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? (পনমা/১৪)

জানিস>জানস : জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম। (পনমা/১৪)

থাকিস>থাকস : ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু। (পনমা/১৯)

৪. স্বরসঙ্গতি : মানিকের সাহিত্যে রূপমূলের আদি মধ্য বা শেষে এক স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে রূপমূলের অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নিচে মানিকের সাহিত্যে উপভাষায় যে ধরনের স্বরসঙ্গতিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

চলিত রূপমূল	উপভাষায় ব্যবহৃত রূপমূল	পরিবর্তন রীতি	বাক্যে প্রয়োগ
দাঁড়িয়ে	দেঁড়িয়ে	আ-এ	: জলে দেঁড়িয়ে কি মিছে কথা কইছি? (পুনাই/৩৩৮)
তামাক	তামুক	আ-উ	: কুবের বলিল, উহু, তামুক বিনা গায়ে সার লাগে না। (পনমা/১৪)
কবিরাজ	কবরেজ	আ-এ	: তিনটে জেলায় যামিনী কবরেজের নাম জানে না এমন লোক নেই। (পুনাই/৩৫৩)
ছিলে	ছিলা	আ-এ	: কেমন ছিলা মাঝি? (পনমা/২৫)
শিতল	শেতল	ই-এ	: শেতলবাবু এই মাত্তর ঘুরে গেলেন। (পুনাই/৪১৭)

এখন　অখন　এ-অ　: অঁই, অখন দ্যান। (পনমা/১৬)

এলেন　আলেন　এ-আ　: কইলকাতার থনে আলেন কবে? (পনমা/২৫)

এটা　ইটা　এ-ই　: ইটা কি কও খুড়া? (পনমা/১৭)

শেষ　শ্যাষ　এ-এ্যা　: শ্যাষ রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির। (পনমা/১৯)

বাড়িতে　বাড়িত　এ-অ　: বাড়িত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। (পনমা/১৪)

পারলে　পারলা　এ-আ　: ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না। (পনমা/৩৩)

নিলে　নিলি　এ-ই　: ময়নাদ্বীপে জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই। (পনমা /৩৩)

ও পিসি　অ'পিসি　ও-অ　: অ'পিসি আমারে আর গনশারে দুগা মুড়ি দিবাগো? (পনমা/২১)

ওই　উই　ও-উ　: উই দেখ জাহাজ আহে। (পনমা/৫৪)

বৃত্তান্ত　বিত্তান্ত　ঋ- ই　: শুনছ নি বিত্তান্ত? (পনমা/৩৮)

৫. স্বরাগম : মানিকের সাহিত্যে স্বরাগমের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অতিরিক্ত একটা স্বরধ্বনি ব্যবহারের মাধ্যমেই স্বরাগম হয়। যেমন-

স্ত্রী　ইস্তিরি : পরানের পায়ে জুতা নাই, শার্টে ইস্তিরি নাই। (পুনাই/৪৬১)

৬. বিপ্রকর্ষ : রূপমূলের মধ্যে এক স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে যে পরিবর্তন হয় তাকে বিপ্রকর্ষ বলা যায়। যেমন-

শত্রু　শত্তুর　: জগতে শত্তুর নাই। (পুনাই/৩৩৮)

৭. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি : পাশাপাশি অবস্থিত দুটো অসমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হলে তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যায়। যেমন—

স+র　সৃষ্টিছাড়া　ছিষ্টিছাড়া　: মুখপোড়ার যত ছিষ্টিছাড়া কথা। (পুনাই/৩৩৮)

৮. যুগ্মীভবন : পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্পর সংযুক্তিতে যুগ্মীভবন হয়। মানিকের সাহিত্যে প্রচুর যুগ্মীভবন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

ত+ত　পাত্তা　: শহরে ঢের বড়ো বড়ো ডাক্তার আছে, তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী। (পুনাই/৩৯৪)

জ+জ　বজ্জাত :　জ্যাঠা বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না? (পনমা/২০)

৯. সমীভবন : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অসমশ্রেণীর ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে পড়ে সাম্যলাভ করলে সমীভবন হয়। যেমন—

মাত্র　মাত্তর　: এই মাত্তর সাড়া পেলাম যে? (পুনাই/৩৪৩)

ভদ্র　ভদ্দর　: গাওদিয়ার গোপ-সমাজ পরিহাস করিয়া তাহাকে বলিত ভদ্দরলোক। (পুনাই/৩৪৯)

১০. /ল/ এর স্থানে /ন/ উচ্চারণ : মানিকের সাহিত্যে উপভাষায় /ল/ এর স্থানে /ন/ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

লেগেছে　নেগেছে　ল-ন　: তিন বর্ষা নাবল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে। (পুনাই/৩৩৮)

১১. যে কোনো উপভাষার একটা বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল /ন/ এর স্থানে /ল/ উচ্চারণ। পূর্ববঙ্গের মানুষ এ ধরনের উচ্চারণে অভ্যস্ত। মানিকের সাহিত্যে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। যেমন–

নায় লায় : হোসেন বলিল, কাম করবা আমার লায়? (পনমা/৬২)

১২. /শ/ এবং/স/ এর স্থানে /ছ/ এর ব্যবহার :

শ্রীনাথ ছিনাথ শ-ছ : ও ছিনাথ, সাবু দিয়ো দিকি এক পয়সার। (পুনাই/৩৪৭)

সালাম ছালাম স-ছ : কুবের বলিল, ছালাম মিয়া বাই। (পনমা/২০)

১৩. /খ/, /শ/ এবং /স/ এর স্থানে /হ/ এর ব্যবহার :

দেখি দেহি খ-হ : জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি। (পনমা/১৪)

শালা হালা শ-হ : হালা ডাকাইত। (পনমা/১৬)

পয়সা পয়হা স-হ : আগে নি একবার কইলা ! একপয়হার সুই আইনবার কইতাম। (পনমা/২৩)

১৪. /রব/ এর স্থানে /রুম/ এর ব্যবহার :

পারব পারুম রব-রুম : আইজ পারুম না শেতলবাবু। (পনমা/১৬)

১৫. /ভ/ এর স্থানে /ব/ এর ব্যবহার :

ভাই বাই ভ-ব : গণেশ ঢোক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু। (পনমা/২৫)

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. উপসর্গ : মানিকের সাহিত্যে আদি প্রত্যয়যোগে গঠিত রূপমূলের দৃষ্টান্ত :

অপ অপমৃত্যু : এতক্ষণ হারুর অপমৃত্যুকে সে বুঝিতে পারে নাই। (পুনাই/৩৩৭)

অন অনাদর : পঙ্গু বলিয়া মালাকে সে কখনও অনাদর করে নাই। (পনমা/৪২)

২. অনুসর্গ : অন্ত্যপ্রত্যয়যোগে গঠিত রূপমূলের দৃষ্টান্ত :

জমি+দার জমিদার : সোনাখালির জমিদারের রথ এই পথ দিয়া আধমাইলখানেক গিয়া অন্নবাবার মাঠের একপাশে পড়ে থাকে সাতদিন। (পনমা/২১)

৩. বচন : মানিকের সাহিত্যে বহুবচন নির্দেশ পেয়েছে 'রা', 'গুলো', 'গুলি', 'গোর' ইত্যাদি চিহ্নের মাধ্যমে। যেমন–

গোর দের নিজেগোর খাওন জোটে না। (পনমা/১৯)

৪. সর্বনামমূলক রূপমূল :

একবচন	বহুবচন	উদাহরণ
আমি/মুই	আমরা/মোরা	: মোর দুধ ওমনি বাবু। (চি/২৫২)
তুমি/তুই/তু	তোমরা/তুমরা/তোরা/তুরা	: তুমার ঘর কুথা গো? (চি/২৫৪)
সে/তিনি/ও	তারা/ওরা/উয়ার	: উয়ার মুক্তি নাই তো? (পুনাই/৩৫৫)

৫. অন্ত্যপ্রত্যয়যোগে গঠিত সম্প্রসারিত রূপমূল :

অন্ত্যপ্রত্যয় মুক্তরূপমূল সম্প্রসারিত রূপমূল

এর দোকান দোকানের : একটু বেলায় দোকানের লোক আসিয়া মাল লইয়া গেল। (পনমা/৬৫)

৬. আদিপ্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষ্যমূলক সাধিত রূপমূল :

আদিপ্রত্যয় মুক্তরূপমূল সাধিত রূপমূল

অ নিদ্রা অনিদ্রা : অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশি কিছু আসিয়া য়ায় না। (অ/৩০৭)

৭. অন্ত্যপ্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষ্যমূলক রূপমূল :

অন্ত্যপ্রত্যয় মুক্তরূপমূল সাধিত রূপমূল

ই দোকান দোকানি : চাষি মজুর গয়লা কুমোর স্যাকরা জেলে দোকানি। (পুনাই/৪১৩)

গিরি মাঝি মাঝিগিরি : কেহ মাছ ধরে কেহ মাঝিগিরি করে। (পনমা/১৮)

৮. বিশেষণগঠিত রূপমূল :

অন্ত্যপ্রত্যয় মুক্তরূপমূল সাধিত রূপমূল

টে ঘোলা ঘোলাটে : কুবেরের দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া আসে। (পনমা/৩৮)

৯. শব্দদ্বৈত :

শব্দদ্বৈত অর্থ হল একক শব্দের স্থানে জোড়া শব্দের ব্যবহার। কথাসাহিত্যে প্রচুর শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জেনেশুনেই কোনো কথাসাহিত্যিক তাঁদের গল্প-উপন্যাসে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে অনেক শব্দদ্বৈত। যেমন—

আলে আলে : মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়। (পনমা/১৮)

কেরমে কেরমে : কেরমে কেরমে দিমু। (পুনাই/৩৫)

গায়ে গায়ে : জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। (পনমা/১৭)

জোরে জোরে : এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এবার একটু জোরে জোরে পা ফেলিয়াই বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। (পনমা/১৯)

তলে তলে : বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে সেটা তলে তলে দগ্ধাবে কাকে শুনি? (অ/৩০৭)

ধীরে ধীরে : ধীরে ধীরে বিন্দুর মনকে সুস্থ করিয়া তুলিবে। (পুনাই/৪০৬)

পদে পদে : যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে অপমান হতে হয়। (পুনাই/৪২২)

ফিরতে ফিরতে : গাঁ থেকে লোকজন নিয়ে ফিরতে ফিরতে শেয়ালে যদি টানাটানি আরম্ভ করে দেয়। (পুনাই/৩৩৫)

বালতি বালতি : জ্ঞান হতে দেখি পাঁড়ে আর দাই গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছে। (দিরাকা/২৪৩)

ভয়ে ভয়ে : মালা ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে দুগা মুড়ি-চিড়া দিবা গো। (পনমা/৩৪)

মুচকি মুচকি : আগে এসব কথায় কুসুম মুচকি মুচকি হাসিত। (পুনাই/৪৬৪)

শুধু শুধু : শুধু শুধু সে অমন কাজ করতে যাবে কেন? (দিরাকা/২৫৩)

সকাল সকাল : সকাল সকাল পালা শুরু হবে। (পুনাই/৩৬২)

১০. ধ্বন্যাত্মক শব্দ : মানিকের সাহিত্যে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

কুটকুট : সেই পাকের সংস্পর্শে তাহারও পা কুটকুট করে। (পনমা/২৩)

খচখচ : শশীর মনের মধ্যে সন্দেহটা খচখচ করিয়া বেঁধে বইকি। (পুনাই/৩৬৯)

খটখট : যারা আরও বেশি ভদ্রলোক তাদের থাকে শুকনো খটখট স্থায়ী আঁতুড়ঘর। (পনমা/১৮)

গজগজ : গণেশ বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল। (পনমা/৮০)

গদগদ : কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আমি আলাম গো কুবিরদা। (পনমা/২৭)

ঘনঘন : ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া কুবেরের কাছেই অপরাধীর মতো হাসে। (পনমা/৩৬)

চকচক : লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে। (পনমা/১৩)

ছলছল : চোখ দুটি ছলছল করে মাধবীলতার। (অ/২৯৬)

টসটস : মাধবীলতার মুখখানা টসটস করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। (অ/২৯৫)

ঠকঠক : ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। (পনমা/৪৩)

টিপটিপ : মতির বুকের ভিতর টিপটিপ করে। (পুনাই/৩৬৮)

থমথম : সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগৎ। (চি/২৪৮)

দরদর : দু'চোখ দিয়া তাহার দরদর করিয়া জল পড়িতেছে। (পুনাই/৩৪৫)

ফড়ফড় : দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখি ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। (জ/১৯)

বকবক : বুড়া সিধুর বকবক শুনিতে শুনিতে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না। (পনমা/২৯)

ভনভন : কায়েতপাড়ার সংকীর্ণ পথটির দু'দিকে বাঁশঝাড়ে মশা ভনভন করিতেছিল। (পুনাই/৩৩৯)

মড়মড় : বড় বড় গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল। (পনমা/৪৭)

১১. মানিক সাহিত্যে বিশিষ্টার্থে রূপমূলের ব্যবহার :

অক্কা পাওয়া : বারবেলা যখন ছাড়ছে, পায়ে কাঁটাটি ফুটলে দুনিয়ে উঠে অক্কা পাইয়ে দেবে। (পুনাই/৩৪৬)

আকাশ-কুসুম : যার ডগাটি আকাশে ঠেকিয়া প্রায় হইয়াছে আকাশ-কুসুম। (পুনাই/৪৮৯)

আঁকুপাঁকু করা : নেহাত বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিটুকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে। (চি/২৬১)

আগুন হওয়া : কুবের রাগে আগুন হইয়া বলিল, হালা জুয়াচোর। (পনমা/৩৪)

আঙুল ফুলে কলাগাছ : কুসুম হয়তো ভাবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এমনই করে মানুষ। (পুনাই/৩৭৬)

উতরে যাওয়া : ভালোয় ভালোয় সব উতরে গিয়েছে। (জ/১৯)

এক কাঁড়ি	: এককাঁড়ি টাকা নিয়ে তুই আমার খুব উপকারটা করেছিলি গোপাল। (পুনাই/৩৪০)
কথা সরা	: গোবর্ধনের মুখে অনেকক্ষণ কথা সরে নাই। (পুনাই/৩৩৪)
গলায় ছুরি দেওয়া	: গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। (পুনাই/৩৪০)
গোঁ ধরা	: পরানও মাঝে মাঝে গোঁ ধরতে জানে। (পুনাই/৩৬৬)
গোলায় যাওয়া	: এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোলায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না। (অ/৪০২)
চুলোয় যাওয়া	: একটা রাত্রির জন্যে ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক। (জ/১৪)
জাবর কাটা	: কিন্তু চিরজীবন অতীত ঘটনার জাবর কাটিয়া চলিয়া লাভ কী? (পুনাই/৩৮০)
জোঁকের মতো	: এই সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। (পনমা/১৭)
টান পড়ল	: ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। (পনমা/৩৪)
দাঁও মারা হাঁসি	: গরিব চাষীমজুরের মুখে এই দাঁওমারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। (চি/২৬০)
পিত্যয় যাওয়া	: কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বৌরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। (পনমা/২৩)
বুক ঠুকে দাঁড়ানো	: অন্যথা করিবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইলে কার কী লাভ হইবে? (পনমা/২৫)
লক্ষ্মী ছাড়া	: লক্ষ্মী ছাড়া রাসুর পেটে যাওয়ার জন্য। (পনমা/৮২)
যমের অরুচি	: মতি বলে যমের অরুচি, মর তুই মর। (পুনাই/৩৫৭)

১২. রূপমূল ভাণ্ডার :

সাধারণত গ্রামে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষ বেশি বাস করে এবং তারা উপভাষায় কথা বলে। তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায়, দ্বন্দ্ব-কলহে তৎসম শব্দ তেমন ব্যবহৃত হয় না। মানিকের সাহিত্যে কোনো নির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চল বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। তবে *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* ইত্যাদি উপন্যাসের চরিত্রগুলো যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী সে বিষয়ে তেমন সন্দেহ নেই। উপভাষার অঞ্চল হিসেবে একে বাঙালি উপভাষা অঞ্চল বলা যায়। এ অঞ্চলের উপভাষায় অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কিছু কিছু তদ্ভব ও বিদেশী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এ ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মানিকের সাহিত্যে ব্যবহৃত উপভাষার রূপমূলের দৃষ্টান্ত :

উপভাষা	চলিতভাষা	মানিক সাহিত্যে ব্যবহৃত বাক্য
অমর্ত	অমৃত	করুণ নয়নে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, ত্যাল মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব–অমর্ত। (পনমা/৩০)
আইব	আসব	অখনি আইব দেইখো। (পনমা/২৬)
আইছে	এসেছে	কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা। (পনমা/১৯)
আইলে	এলে	গণেশ আইলে জিগাইস। (পনমা/১৭)

আখা	উনন	আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম। (পনমা/৪০)
আগলে	প্রহরায়	আমি অন্ধকারে মড়া আগলে বসে রইলাম। (পুনাই/৩৩৬)
আগাম	অগ্রিম	ভাঁওতা দিয়ে তিন মাসের মাইনে আগাম নিয়ে সরেছে। (পুনাই/৪১০)
আলাম	এলাম	আইজ আলাম। (পনমা/২৫)
আদ্দেক	অর্ধেক	আদ্দেক দুধ আর আদ্দেক জল তো। (চি/২৫৩)
আহে	আসে	রাইত কইরা মাইজ্জা বাবুনি আমাগো বাড়ি আহে তাই জিগায়। (পনমা/২০)
অ্যানে	এখানে	জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, অ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি। (পনমা/৩৩)
ইবার	এবার	ইবার মিয়াবাই টাহা দিলি দিমু পৈছা গড়াইয়া কুকীর মারে। (পনমা/৮৪)
উয়ার	ওর/তার	উয়ার মুক্তি নাই তো? (পুনাই/৩৩৫)
এউক্কা	একটা	মনে এউক্কা সাধ ছিল মাঝি। (পনমা/৮৩)
এক রত্তি	এক টুকরা	একটুকরা চাঁদের কোলে একরত্তি একটা তারা। (পুনাই/৩৬৬)
কচ্ছে	করছে	গা ব্যথা কচ্ছে ছোটোবাবু। (পুনাই/৩৪৪)
কনে	কোথায়	তুই চাল পাবি কনে? (পনমা/২৩)
কাম	কাজ	কাম মিলে নাই কুবের বাই। (পনমা/৬২)
কাবার	শেষ	বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। (পুনাই/৩৩৩)
কুথা	কোথায়	তুমার ঘর কুথা গো। (চি/২৫৪)
খটকা	সন্দেহ	খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। (পুনাই/৩৪৬)
খতম	শেষ	ছেলেটাও পড়েছে– বারবেলাও হয়েছে খতম। (পুনাই/৩৪৬)
খানিক	কিছুক্ষণ	তা'লি খানিক খাড়াও শেতলবাবু। (পনমা/১৬)
খালি	শুধু	খালি নিবার পারে, দিবার পারে না। (পনমা/২৩)
গাহান	গান	কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার? (পনমা/৩৬)
গেঁয়ো	গ্রাম্য	গেঁয়ো মানুষ শহরে মন টিকল না। (পুনাই/৩৪৭)
গোসা	রাগ	পরানের বৌ বললে আমার গোসা হয় ছোটোবাবু। (পুনাই/৩৪৪)
চিকিচ্ছে	চিকিৎসা	তুমি ভালো করে আমার চিকিচ্ছে করো। (পুনাই/৩৫১)
জবর	প্রচুর	তিনজনেই চাষা কিনা, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরই সে কী জবর হাসি। (চি/২৪৬)
জাড়	শীত/ঠাণ্ডা	ইঃ, আজ কি জাড় কুবির। (পনমা/১৪)
জিগান	জিজ্ঞাসা	উদিন আমারে জিগায়, খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়। (পনমা/৩৮)

জিরান	বিশ্রাম	একটু জিরাই গো আজান খুড়ো। (পনমা/১৪)
জুত	আরাম	হালার মাছ ধইরা জুত নাই। (পনমা/১৪)
জোয়ান	যুবতী	জোয়ান মেয়ালোক। (চি/২৪২)
ঠেয়ে	থেকে	লালিকে আমি কিনেছি হারুদার ঠেয়ে, পরান কি জানে? (পুনাই/৩৭৯)
তগর	তোদের	পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই। (পনমা/৩১)
তরে	জন্যে	একদিনের তরে গিয়েছিলাম, মোটে একদিন। (পুনাই/৩৭৯)
তেনারে	তাকে	তেনারে পালি কই কুবির? (পনমা/৩২)
তেষ্টা	তৃষ্ণা	তেষ্টা পেয়েছে। (পুনাই/৩৪৪)
ত্যাল	তেল	কপিলা বলিল আই গো আই ত্যাল ত নাই।(পনমা/৫৯)
থনে	থেকে	কইলকাতার থনে আলেন কবে? (পনমা/২৫)
থেইকা	থেকে	কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে। (পনমা/২৬)
থোও	রাখ	খাওনের কথা থোও কুবির বাই। (পনমা/৩৫)
দুষবে	দোষ দেবে	এখন গেলেই চিরকাল আমায় দুষবে। (অ/৩০৭)
দুক্ষ	দুঃখ	তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমার অন্তরে। (চি/২৪২)
দেওনের	দেওয়ার	রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর। (পনমা/১৬)
ধন্নে	ধর্ণা	এখানে ধন্নে দিয়েছ। (অ/৩০৪)
ধাড়ি	বয়স্ক	বিয়েই যদি করব, ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করব কোন দুঃখে? (পুনাই/৩৯৭)
ধুমসো	মোটা	আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন। (পুনাই/৩৩৪)
নাওয়া	স্নান	আপনি কী আর ছেলে নাওয়াবেন। (জ/২৩)
নাখান	মতো	বাই উ, ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইয়াছে বাবা। (পনমা/২৩)
নিকে	পুনঃবিবাহ	সুদেবের সঙ্গে তোর নিকে হয়ে গেলে ছোটোবাবু তালপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবে। (পুনাই/৩৫৭)
নিজেগোর	নিজেদের	নিজেগোর খাওন জোটে না। (পনমা/১৯)
নিয্যস	নিশ্চয়	কাইল দিমু, নিয্যস দিমু। (পনমা/১৬)
নেমন্তন্ন	নিমন্ত্রণ	নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু। (অ/২৯৫)
পয়	ভালো কিছু	এবার কিছু পয় আছে শ্যামা। (জ/২৩)
পসার	উন্নতি	শশীর বেশ পসার হইয়াছে। (পুনাই/৩৭০)
পাত্তর	পাত্র	সুদেব পাত্তর কী এমন মন্দ? (পুনাই/৩৫১)
পারুম	পারব	আইজ পারুম না শেতলবাবু। (পনমা/১৬)

পিছে	পেছনে	পিছে বইলা ক্যান কুবির বাই? (পনমা/৩২)
পেন্নাম	প্রণাম	মারে পেন্নাম কইরা লই। (পনমা/৫১)
পেরসাদ	প্রসাদ	খুইলা পড়ব যে পেরসাদ। (পনমা/৫১)
ফ্যাকড়া	ঝামেলা	আগেই জানি শেষকালেতে একটা ফ্যাকড়া বাঁধবে। (পুনাই/৩৬২)
ফতুর	নিঃস্ব	মতির জন্য এবার ফতুর হইতে হইবে পরানকে। (পুনাই/৩৮৭)
বন্ননা	বর্ণনা	ওই বন্ননা খাটে না। (চি/২৪২)
বান	বন্যা	শীতকালের বর্ষায় কখনও কি মরা নদীতে বান ডাকে না। (পুনাই/৪৫৭)
বিগড়ে	বেঁকে	এত যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে মন, বাপের বাড়ি গিয়েই থাক। (পুনাই/৪৫৭)
বিষ্টি	বৃষ্টি	বিষ্টি যখন পড়ছে ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কী? (অ/৩০৪)
বিচি	বীজ	মতির পদ্মফুলের বীজ দিয়া রাঁধা হইল তরকারি। (পুনাই/৩৫৪)
বিহান	সকাল	কাল বিহানে আসিস। (পুনাই/৩৩৮)
বিয়ানো	জন্ম দেওয়া	বৌ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়। (পনমা/২০)
বিষ্যুদবার	বৃহস্পতিবার	ভুতো যেদিন পড়ল আছাড় খেয়ে, দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। (পুনাই/৩৪৪)
বেবাক	সব	আহা চুলগুলো বেবাক জ্বলে গেছে গো। (পুনাই/৩৩৪)
বৈন	বোন	বৈন চিন্তামনি, তুমি ২/৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। (চি/২৪১)
মিঠা	মিষ্টি	সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। (পনমা/২৪)
মিছে	মিথ্যা	জলে দাঁড়িয়ে কি মিছে কথা কইছি? (পুনাই/৩৩৮)
মুনিষ	শ্রমিক	শশী উঠিয়া দেখিল মুনিষের মাথায় বাকসো বিছানা চাপাইয়া কোথায় যাইবার জন্য গোপাল প্রস্তুত হইয়া আছে। (পুনাই/৪৮৯)
মোর	আমার	মোর দুধ ওমনি বাবু। (চি/২৫২)
যুগ্যি	যোগ্য	যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল। (চি/২৪৮)
যো	উপায়	একটি পয়সা এদিকে ওদিকে হবার যো নেই। (পুনই/৩৪৫)
রন	দাঁড়ান	রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। (পনমা/১৬)
রাও	কথা	তোমাগো দেইখা রাও সরে না। (পনমা/২৭)
লায়ে	নৌকায়	আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি। (পুনাই/৩৩৪)

সগ্যে	স্বর্গে	ও বছর সে স্বর্গে গেল। (পুনাই/৩৪৪)
সাফ	পরিষ্কার	প্রথমেই বাড়িঘর সাফ হইল। (জ/১৪)
সাঁজের	সন্ধ্যার	ধনঞ্জয় বলে, সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের। (পনমা/১৪)
সিদা	সোজা	আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না। (পনমা/১৬)
সোয়ামি	স্বামী	সে গেছে সোয়ামির সঙ্গে। (পুনাই/৪১২)

ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন পাওয়া যায় উপভাষার মধ্যে। উপভাষার মধ্যে কোনো ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া সম্ভব; কেননা ভাষার প্রাচীন রূপ উপভাষার মধ্যেই অনেকাংশে রক্ষিত। উপভাষা শুধু ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিষয় নয়, সমাজ ভাষাতত্ত্বেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।[১৬] বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য স্ট্যান্ডার্ড চলিতরীতিতে লিখিত হলেও চলিতভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাও তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৭] মানিকের সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মানিকের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর উপভাষা এবং এগুলোকে অশিষ্টভাষার পর্যায়ে ফেলা যায় না; কারণ বাংলা উপভাষাকে যে প্রধান পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের কথ্যরূপের ওপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে শিষ্টচলিতভাষা।[১৮] কাজেই কোনো উপভাষা অশিষ্টভাষা নয়।

উপভাষার শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে মানিক সাহিত্যে ব্যবহৃত উপভাষাকে বাঙালি উপভাষার পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। বাঙালি উপভাষার ভৌগোলিক ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান প্রবন্ধে মানিক সাহিত্যে ব্যবহৃত উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপমূলতাত্ত্বিক, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাগধারা ও কিছু শব্দভাণ্ডারের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। মানিকের সাহিত্যে উপভাষা বেশ সমৃদ্ধ। তিনি সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন অসংখ্য উপভাষা, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বর্ণনামূলক অংশে এবং চরিত্রের মুখে। তিনি উপভাষা প্রয়োগে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন; উপভাষায় কথা বলার কারণে তাঁর চরিত্রগুলো যেমন বাস্তব হয়েছে তেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্য।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জননী', *মানিক রচনাসমগ্র*— প্রথম খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯) পৃ. ১৯
বর্তমান প্রবন্ধে *জননী*র উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং *জননী*র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'জ'

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দিবারাত্রির কাব্য', *মানিক রচনাসমগ্র*-প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২
বর্তমান প্রবন্ধে *দিবারাত্রির কাব্য*র উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং *দিবারাত্রির কাব্য*র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'দিরাকা'

৩. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, সম্পাদক : নারায়ণ চৌধুরী (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১) পৃ. ৬৫

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, মানিক রচনাসমগ্র-প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০
বর্তমান প্রবন্ধে *পুতুলনাচের ইতিকথার* উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'পুনাই'

৫. পূর্ব্বাশায় প্রকাশিত প্রথম কিস্তিতে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে কুবেরের কর্মস্থলের ভৌগোলিক নির্দেশ ছিল : 'গোয়ালন্দের মাইল দেড়েক উজানে'। মুদ্রিত গ্রন্থে সেটি হয়েছে : 'দেবীগঞ্জের

মাইল দেড়েক উজানে'। উপন্যাসের পরবর্তী অংশেও লেখক 'গোয়ালন্দ' সর্বত্র পরিবর্তিত করে 'দেবীগঞ্জ' স্থানের উল্লেখ করেছেন।
দ্র. গ্রন্থ পরিচয়, *মানিক রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৯) পৃ. ৪৮২

৬. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি *মানিক রচনাসমগ্র*-দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
বর্তমান প্রবন্ধে *পদ্মানদীর মাঝির* উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং *পদ্মানদীর মাঝির* পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'পনমা'
৮. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, *আঞ্চলিকতা ও বাঙলা উপন্যাস* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭) পৃ. ৭৩
৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য সন্ধান* (কলকাতা : সাহিত্য বিহার, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮ (প্র.প্র.১৯৭১) পৃ. ১১২
১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিন্তামণি', *মানিক রচনাসমগ্র*-পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯) পৃ. ২৪৫
বর্তমান প্রবন্ধে *চিন্তামণির* উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং *চিন্তামণির* পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'চি'
১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অহিংসা' *মানিক রচনাসমগ্র*-তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮) পৃ. ২৭৭
বর্তমান প্রবন্ধে *অহিংসার* উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে এ গ্রন্থ থেকে এবং *অহিংসার* পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'অ'
১২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প* (কলকাতা : সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ২য় মুদ্রণ ১৩৯২) পৃ. ৬৮
১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯) পৃ. ৩৫
১৪. মুহম্মদ আব্দুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ মুদ্রণ, জুন ১৯৮৫), পৃ. ২৪৬
১৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
১৬. মনিরুজ্জামান, *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ. ৫৪
১৭. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'বাংলাদেশের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার', *একুশের প্রবন্ধ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২) পৃ. ২৩৫
১৮. রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৩৯৯) পৃ. ৬৬২

চতুষ্কোণ : পুনর্বিবেচনা

চঞ্চল আশরাফ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮—১৯৫৬) যে-উপন্যাসটির ওপর অবিচার করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি, সেটি *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮)। এর সঙ্গে রয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ *সরীসৃপ* (১৯৩৯), বস্তুত এ-দুটি গ্রন্থ নিয়েই মানিক সম্পর্কে এই মত প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে— তাঁর কথাসাহিত্যে জীবন কম, যৌনতা বেশি। মতটি নাকচ করতে-করতে একরকম মেনেই নিয়েছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, *চতুষ্কোণ* আর *সরীসৃপের* 'ক্ষণিক পর্যায়' ছাড়া বাকি সব রচনার ক্ষেত্রে ওই কথা খাটে না। এর অর্থ এই যে, *চতুষ্কোণ* ও *সরীসৃপে* জীবন কম, যৌনতা বেশি। উল্লেখ বাহুল্য নয়, আলোচক উপন্যাসটি নিয়ে ব্যাখ্যার কোনও পরিসর রাখেন নি। বা, ধরে নিতে পারি, তাঁর এই বক্তব্যের পক্ষে কোনও যুক্তির প্রয়োজন বোধ করেন নি বলে এমনটি ঘটেছে। সরোজ তবু মানিক সম্পর্কে প্রচলিত মতের বিরোধিতায় কিছুটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু গোপাল হালদার যখন উপন্যাসটিতে 'যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃত বিস্তার' দেখতে পান, তখন অবাক না-হয়ে পারা যায় না। তিনি ধরেছেন প্রচলিত বিভ্রান্তিরই পথ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, হয়েছেন তাঁদেরই অনুগামী। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মানুষের কামপিপাসার জীবন্তমূর্তি এঁকে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন।' অসিত এক্ষেত্রে দুটো যুক্তি দেখিয়েছেন : ১. এ-সময় 'এদেশে ফ্রয়েডপন্থী মনোবিকলন ও মনোবিকারতত্ত্ব সাহিত্যিক মহলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল' ও ২. 'নরনারীর জৈবসত্তা এবং তার বিকারের নানা রেখাচিত্র লেখককে আকৃষ্ট করেছিল'। ফলে, কিছুটা 'বেআব্রু বর্ণনা' মানিকের উপন্যাসে দেখা যায়। তাঁর উপন্যাসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন। *চতুষ্কোণ* সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'লেখকের যৌনব্যাপারসম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার যে প্রবল প্রবণতা আছে (ইহা) তাহারই চূড়ান্ত উদাহরণ।' তিনি উপন্যাসটির প্রশংসা করেছেন : 'যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া উপন্যাসটির উৎকর্ষ বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।' প্রশংসাটি উপন্যাসটির প্রতি আলোচকের কৌতুক ও করুণারই প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হয়। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমারকে তিনি রূপক চরিত্র হিসেবে নিতে চেয়েছেন 'আর্টের সঙ্গতি' ও 'সম্পূর্ণতার দিক' রক্ষার খাতিরে, গ্রন্থে মুদ্রিত লেখকের ভূমিকা-মন্তব্য পাঠ করে উপন্যাসটির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখলে শ্রীকুমারের বক্তব্য মেনে নেয়া কঠিন। মানিক লিখেছেন, 'রাজকুমারকে 'টাইপ' ধরলে ভুল করা হবে।' এটা অবশ্য না-লিখলেও চলত; কেননা, মনস্তত্ত্বপ্রধান চরিত্র, বিশেষত যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আর যা-ই হোক, 'টাইপ' বলা যায় না। তার জীবনযাপন, স্বভাব, চিন্তা ও আচরণগত স্বাতন্ত্র্যই তো সে-বিবেচনার পথটি রুদ্ধ করে দেয়। চরিত্রটি যে অতিরঞ্জিত করে দেখানো বলে মনে হতে পারে, সে-সম্পর্কে লেখক বেশ সচেতন। ভূমিকা-মন্তব্যেই তাঁর কথা— 'রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে যাবে আসবে কি?'

কিছু অবশ্য এসেছে-গেছে, তা নিয়ে বলার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। যা-ই হোক, আলোচকদের যে-মন্তব্যগুলো হাজির করা হয়েছে, সে-সব শেষ পর্যন্ত *চতুষ্কোণ* সম্পর্কে তাদের খণ্ডিত দৃষ্টির ফল বলে মনে করার কারণ যথেষ্ট আছে। এটা বোঝা কঠিন নয়, রাজকুমার চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্য দেখানো লেখকের অভিপ্রায় এবং সেই আয়োজন নেহাৎ কম নয়। যে নারীচরিত্রগুলোর সঙ্গে সে সম্পর্কিত, তাদের লক্ষ করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। রাজকুমারের অভ্যন্তর চিত্রণের দিকে লেখকের প্রবল ঝোঁকের কারণে চরিত্রটির পূর্ণাঙ্গ বাহ্যিক পরিচয় গৌণ হয়ে পড়েছে। অসম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে চরিত্রটির 'ফুলে ফেঁপে' ওঠা কতটা সঙ্গত, তা একটা প্রশ্ন, কিন্তু মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কেমন হতে পারে, তা বিবেচনা করলে প্রশ্নটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

রাজকুমারের যে-পরিচয় আমরা পাই, তা এই : সে অবিবাহিত, সম্ভবত বিত্তবান (কলকাতায় তার একটা বাড়ি আছে, 'হাই সোসাইটি'তে তার মেলামেশার ধরন প্রমাণ করে যে সে ধনীর সন্তান), চাকরি সে করে (সহকর্মির কাছে অনুপস্থিতির খবর জানানোর প্রসঙ্গ তার প্রমাণ; যদিও 'সম্প্রতি মাসচারেক' তার মাদ্রাজে কাটানোর উল্লেখজনিত খটকা একটা আছে, কেন না কোনো বাঁধাধরা কাজে এত দীর্ঘ সময় কোথাও কাটানো যায় কি-না তা আমাদের জানা নেই); সে মালতীর প্রাইভেট টিউটর, যদিও শিক্ষকতা তার পেশা নয়; মেয়েদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট আছে; সে ভালো বক্তা; যুক্তিবোধসম্পন্ন; স্বাধীন ও পিছুটানহীন। তার পরিবার ও নিকটজন সম্পর্কে লেখক আমাদের কিছুই জানান নি, ফলে ধরে নিতে হয় যে, পারিবারিক জীবনে সে নিঃসঙ্গ, কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিত্তবানদের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ধনীর সন্তানদের অধিকাংশই নেয়। রাজকুমার তা নেয় নি। অর্থাৎ সে লম্পট বা কামকাতর নয়; যদি তা হতো, উপন্যাসটি সম্পর্কে যে-মন্তব্যগুলো করা হয়েছে, সে-সব সঠিক হওয়ার পথ আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যেত।

রাজকুমারের মাথা ধরা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝেই তার এমনটি হয়, কিন্তু 'সাধারণ মাথা ধরার সঙ্গে আজকের মাথা ধরার তফাৎটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল।... নদীতে জোয়ার আসার মত মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মত যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না।' যন্ত্রণাটা, বোঝা যায়, মাথায় জন্ম নেয়া নতুন কোনো চিন্তা থেকেই সে অনুভব করছে। এই যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ায় তার যা হয়, তা 'জীবনের এক দুর্বোধ্য রহস্য'। দেখা গেছে, অপ্রস্তুত হওয়ার মত কোনোও ঘটনায় তার এই যন্ত্রণাটা কমে যায়। রাজকুমারের 'জীবনের এক দুর্বোধ্য রহস্য' হিসেবে মাথা ধরার প্রতিক্রিয়াকে যদি আমরা দেখি, তা হলে গিরির সঙ্গে তার আচরণের সূত্রটি খোঁজা সহজ হয়ে যায়। ওই আচরণের প্রতিক্রিয়ায় গিরির মা'র যে-আচরণ, তারই প্রতিক্রিয়ায় সে কালীর প্রতি একই আচরণ করে। উল্লেখ বাহুল্য নয়, প্রতিক্রিয়া থেকে প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসটির বিস্তার ঘটেছে।

কিন্তু কেন একে যৌন বিকারের উপন্যাস মনে করা হল? প্রথমত, হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করে দেখার ছলে গিরির বুকে রাজকুমারের হাত দেওয়া; দ্বিতীয়ত, শিশুসন্তানকে স্তনপান করানোর সময় মনোরমার স্তন স্পর্শ করতে রাজকুমারকে প্রায় বাধ্য করা; তৃতীয়ত, চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় রাজকুমারের মুখের সামনে রিনির মুখ তুলে

ধরা; চতুর্থত, মালতীর চুলে রাজকুমারের মাথা রাখা; পঞ্চমত, গিরির প্রতি রাজকুমারের আচরণের সচেতন পুনরাবৃত্তি কালীর ওপর ঘটানো; ষষ্ঠত, রাজকুমারের অদ্ভুত কিছু ইচ্ছা : নারীতে-নারীতে পার্থক্য কী, তা বোঝার জন্যে রিনি, সরসী আর মালতীর পাশে কালীকে রেখে তাদের দেখা, নারীর শারীরিক গঠনের সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক বুঝতে একসঙ্গে বেশ ক'জন নারীর ছবি তোলা এবং নারীর নগ্ন শরীর দেখতে চাওয়া; স্নানরত অবস্থায় রিনির নগ্ন শরীর দেখতে চাওয়া ইত্যাদি।

এগুলো শূন্য থেকে আসে নি বা কারণহীন কোনোও ব্যাপার নয়। গিরির বুকে হাত দেওয়া প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। এটা ধরে নেয়া যায়, নিতান্ত রসিকতা করেই সে কাজটি করেছিল। কিন্তু যত 'দুর্বোধ্য' হোক, কামচেতনা এতে নেই; কিছু যদি থাকে, তা রাজকুমারের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই। কেন না, দৈহিক অবস্থা যেমনই হোক, ষোল বছরের একটি মেয়ের বুকে হাত দেওয়া, বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছাড়া, সামাজিক শোভনতার পর্যায়ে পড়ে না। 'অসংযমের চেয়ে সংযমই স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না।'—এই বোধ রাজকুমারের আছে; সে 'অনেকবার তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে কিভাবে মানুষের হার্টের কাজ চলে, কিভাবে শিরায় শিরায় মানুষের রক্ত চলাচল করে'— শরীর নিয়ে তার এরকম বিজ্ঞানমনস্ক সক্রিয়তার দিকে তাকালে তাকে সমাজে প্রচলিত কাণ্ডজ্ঞানের ধারণায় বিচার করাও হয়ে পড়ে মুশকিল। অন্যদিকে, মনোরমার আচরণ রাজকুমারের প্রতি যৌন আকর্ষণের পরিচয় যেমন বহন করে না, তেমনি স্তনস্পর্শের ঘটনাটি মনোরমার প্রতি রাজকুমারের যৌন আকর্ষণের প্রমাণ দেয় না। এ হল রাজকুমারের প্রতি ভারতীয় মায়ের নিষ্কলুষতা, সেও তা গ্রহণ করেছে সেভাবেই। চুম্বনের প্রত্যাশায় রাজকুমারের মুখের সামনে রিনির মুখ তুলে ধরা অস্বাভাবিক কোনো আচরণ নয়; যৌন আকর্ষণ এখানে থাকতে পারে, কিন্তু তা মুখ্য নয়। মুখ্য হল আবেগ। রাজকুমার তাতে সাড়া দেয় নি বলে রিনির যে প্রতিক্রিয়া তার আচরণে দেখা যায়, তা ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় সূত্র কাজে লাগতে পারে; কিন্তু এটা অস্বীকার করা কঠিন, রিনির আবেগের একটা শ্রেণীচরিত্র আছে; যে সাড়া এটি দাবি করেছে, তা পূরণ না-হওয়ার প্রতিক্রিয়াটি কেমন হতে পারে তা নির্ভর করে তার শ্রেণীচরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ওপর। এমন একটা পরিবারে বেড়ে উঠেছে সে, যেখানে কোনও আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা অপূরণীয় থাকার কথা নয়। অন্যদিকে, রাজকুমারের সঙ্গে মালতীকে জড়িয়ে তার সন্দেহ ও তার ওপর সম্ভাব্য অধিকার হারানোর শঙ্কাজনিত মানসিক চাপও এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। মালতীর চুলে রাজকুমারের মাথা রাখার ব্যাপারটাও সেরকম বিশেষ কোনও মুহূর্তে খুব স্বাভাবিক, যৌনতার কিছুই এতে নেই। সরসীকে বলা একটা কথায় এটি স্পষ্ট : 'মালতীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জানো? শ্রদ্ধাকে ভালবাসা মনে করার সম্পর্ক।' কালীর ওপর গিরির প্রতি আচরণের পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা উপন্যাসে খুব স্পষ্ট, রাজকুমারের যৌনকামনার কোনও চিহ্ন এতে পাওয়া যায় না। নারীর দৈহিক গঠনের সঙ্গে তার মনের যোগ আর নারীতে-নারীতে পার্থক্য বোঝার চেষ্টায় রাজকুমার যা করতে চেয়েছে, তা তার অনুসন্ধানপ্রবণ বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়ই বহন করে।

আসলে, রাজকুমার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সৎ, আধুনিক এবং শেষ পর্যন্ত মানবিক এক চরিত্র। তাকে আবেগহীন মনে হতে পারে, কিন্তু তার আবেগ আছে এবং তা প্রচলিত বাংলা উপন্যাসের নায়কের মতো নয় মোটেই। এই আবেগ ইচ্ছা, যুক্তি ও লক্ষ্যের সঙ্গে রফা করতে করতে এমন বাস্তবতায় পৌঁছে যেখানে তার

রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অনিবার্যতা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে পর্যন্ত বিস্রস্ত করে দেয়। উন্মাদ অবস্থায় রিনির শুশ্রূষা সে যখন শুরু করেছে, তখন থেকেই কার্যত তার আবেগের রূপান্তর লক্ষ করা যায়; যদিও সরসীর সঙ্গে তার শেষ দিকের কথোপকথনে এটা দুর্লক্ষ্য নয়। মালতীর প্রতিও তার আবেগ রয়েছে; কিন্তু তা একটা সীমা মেনে চলেছে।

যা-ই হোক, রিনির শুশ্রূষা করতে করতেই রাজকুমার সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে। রিনির ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা যখন তাকে করতে হয়, 'লোকে নানা কথা বলবে' বলে সে সমাজ সম্পর্কে স্যার কে এলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর সে রিনিকে বিয়ে করতে চায়। রিনির বাবা এতে আপত্তি জানানোর পর, পাঠক, আমরা এ-দুজনের কথোপকথন লক্ষ করতে পারি :

'আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতই আমাদের দিনরাত একত্র থাকতে হবে— কতকাল ঠিক নেই।

রাজু, স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।

তবু আপনার মনে যদি—

আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিনিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছ। সেদিন বলি নি তোমাকে, রিনিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি? তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্যে তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব?'

রাজকুমার চরিত্রটি বিশ শতকী আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পকলার অবদান। আধুনিক মানুষ কখনও শূন্যবাদের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা করে না; সে তার চিন্তনরাশির মধ্যে এক রকম নৈয়ায়িকতা এবং তার অস্তিত্বের মধ্যে একটি ভিত্তিবিধান গড়ে নিতে চায়। রাজকুমারও চেয়েছে তা-ই। তার চিন্তনরাশির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে আর 'নিজেরই মুদ্রাদোষে' সে 'আলাদা' হয়েও সমাজে নিজের মত করে একটি ভিত্তিবিধান রচনা করতে চেয়েছে। রাজকুমারের আচরণ থেকে তাকে যৌনবিকারগ্রস্ত ভেবে ভুল করার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু তার চিন্তাজগতের দিকে লক্ষ্য রাখলে, এমন-কি নিজের সম্পর্কে যা সে ভেবেছে ও বলেছে তাতে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারা যায়— সে আধুনিক ও সমকালীন। যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ এই চরিত্রের ভিত্তি। গিরির প্রতি তার আচরণ, মেয়েদের একসঙ্গে ছবি তোলা, নগ্ন নারীশরীর দেখতে চাওয়া— এসব তার নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে যেমন ঘটেছে, তেমনি রিনিকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সামাজিক রীতিকে মান্য করেছে। তাতেও কাজ করেছে যুক্তিবোধ। 'লোকে নানা কথা বলবে' উক্তিটি সমাজ সম্পর্কে প্রীতিকর কোনও ধারণা অবশ্য দেয় না। এর পর-পরই দেখা যায়, সমাজ তার কাছে ততটা গুরুত্বের নয়; ব্যক্তির মূল্য সে যতটা স্বীকার করে। রিনির সঙ্গে রাতে এক ঘরে কাটানো নিয়ে তার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে— 'তবু আপনার মনে যদি— ।'

আসলে, রাজকুমার সমাজ-নির্দেশিত পথের মানুষ নয়; ব্যক্তি-নির্দেশিতও নয়; সে নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্যের অনুগামী, নিয়ন্ত্রকও বটে। সামাজিক রীতিনীতি বা সমাজে কেমন করে চলতে হবে, সে বিষয়ে তার সচেতনতার অভাব আছে, কিন্তু উপেক্ষা নেই। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়, সমাজের যে রীতিটি যখন তার জন্যে যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজন, তা তখনই সে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে

সমাজের সম্পর্কের চেহারাটি আসলে কেমন, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। সম্পর্কটি শেষ পর্যন্ত আপোষমূলক; পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তি নির্বাচন করে সমাজের রীতিনীতির কোনটি সে গ্রহণ করবে। সামাজিক বিষয়আশয় নিয়ে ব্যক্তির নির্বাচনমনস্কতাই দেখিয়ে দেয় কোন নৈতিক স্তরে তার অবস্থান। এই অবস্থান থেকে নারী, যৌনতা, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে রাজকুমারের মনোভাব বুঝে ওঠা সম্ভব হলে চরিত্রটি নিয়ে বিভ্রান্তির উপায় থাকে না।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'কিছুটা বেআব্রু' বর্ণনার কথা বলেছেন, তা উপন্যাসটির কোথাও পাওয়া যায় না। রাজকুমারের সঙ্গে গিরি, মনোরমা, সরসী, কালী, রিনি— এই পাঁচটি চরিত্রের বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তের বর্ণনায় এমন একটাও শব্দ ব্যবহার লেখক করেন নি, যা 'ভদ্র সমাজে' উচ্চারণ করা যায় না। একটা স্ল্যাংও নেই উপন্যাসের কোথাও। উল্লেখ প্রয়োজন, জীবনানন্দ দাশ *চতুষ্কোণ* প্রকাশের বেশ আগে থেকেই কবিতায় স্ল্যাং ব্যবহার, বলতে গেলে, শুরু করেছেন। উপন্যাসের সংলাপে স্ল্যাং আসতেই পারে, চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থেই অনেক সময় এটা জরুরি হয়ে পড়ে। যা-ই হোক, *চতুষ্কোণে* বেআব্রু বর্ণনা কোনওভাবে, একটুও নেই। এমন-কি, রাতে সরসী যখন নগ্ন হয়ে রাজকুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনকার বর্ণনাও 'বেআব্রু' নয়। 'লেখকের যৌনব্যাপারসম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার' 'প্রবল প্রবণতা'র 'চূড়ান্ত উদাহরণ' এ-উপন্যাস হতেই পারে না। আর 'যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণ' এতে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। যৌন-মনস্তত্ত্ব এতে মিলতে পারে খানিকটা; তবে সেটি কেবল রিনির আচরণের সূত্রে সন্ধান করা যায়। প্রচলিত সংস্কারের মধ্য থেকে উপন্যাসটি পাঠ করলে এর কোনও-কোনও অংশ 'বেআব্রু' মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রাজকুমার চরিত্রটি 'কিছুটা বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে' ওঠায় তার সম্পর্কে ভুল বোঝার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটিই মূলত উপন্যাসটির ওপর আলোচকদের অবিচারের কারণ হয়েছে। কিন্তু এই 'ফুলে ফেঁপে' ওঠা, আমরা যদি শব্দার্থের দিক থেকেও নিই, বলতে পারি, কিছু অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই চরিত্রটিতে ঘটেছে। প্রথমত, মেয়েদের শরীরের সঙ্গে তাদের মনের যোগ আছে কি-না, তা পরীক্ষা করতে যাওয়া; দ্বিতীয়ত, এক রাতে রাজকুমারের সামনে আবরণহীন অবস্থায় সরসীর হাজির হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যৌনকামনা জেগে না-ওঠা, এমন-কি এই নিরাবরণ সুন্দরী যখন বলছে, 'আমি আরও দাঁড়াতে পারি', তখনও, 'তার দরকার নেই' রাজকুমারের এই উচ্চারণটি চরিত্রটিতে অতিরঞ্জন অবশ্যই ঘটায়, বিশ্বাসযোগ্যতায়ও ফাটল সৃষ্টি করে। কেননা, একজন স্বাভাবিক পুরুষের কাছ থেকে এমনটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এবং তার মনোদৈহিক সুস্থতার পরিচয় এতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার বিজ্ঞানমনস্ক নির্মোহ চরিত্রটি অনুসরণ করলে এ-সব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। মনে হয়, প্রবল অনুসন্ধিৎসার কারণেই রাজকুমারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে নারীর ছোটখাটো ভিড়ের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত মন নিয়ে নিজের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, শরীর-সংক্রান্ত বিদ্যমান সংস্কার ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে। সেজন্যে ব্যক্তির নিজস্ব একটা বৈধতাও লাগে। নারীর দেহকাঠামো ও মনের সম্পর্কের খোঁজ করতে যাওয়াটাই রাজকুমারের সেই নিজস্ব বৈধতা, যা সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তে শরীর নিয়ে বিদ্যমান সংস্কার ভাঙার পথ তৈরি করে দেয়। ভারতীয় সমাজে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ

ব্যক্তিকে কিছু নারী চরিত্রের মধ্যে রাখলে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা দেখানো এবং নারী সম্পর্কে কী মনোভাব সেই ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠতে পারে, তাও *চতুষ্কোণে* বিবেচ্য হতে পারে। রাজকুমারের মত ব্যক্তি, পারিবারিক জীবন বলে কিছু যার নেই, সামাজিক জীবন যার অল্প কয়েকজনে সীমাবদ্ধ— প্রায় পুরোটাই নারীবেষ্টিত, 'চতুষ্কোণ' একটা ঘরে যে একা থাকে, তার পক্ষে নারীশরীর সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার নিয়ে বেড়ে না-ওঠাই স্বাভাবিক। গিরির প্রতি তার আচরণ, ফটো তোলা, রিনিকে অকপটে তার নগ্ন শরীর দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা ইত্যাদি এই স্বাভাবিকতারই ফল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। যদি নারীশরীর নিয়ে প্রচলিত সংস্কার বলে কিছু থাকত, তা হলে গিরির মা-র আচরণে তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠত না; কালীর প্রতি একই আচরণ করা দূরের কথা, সে অপরাধবোধেই ভুগত এবং মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসত।

চতুষ্কোণে লক্ষ করার বিষয় এর নারী চরিত্রগুলো। এদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অবস্থান ও আচরণ নিয়ে আলাদা হয়ে আছে। ব্যাপারটা মনোরমাই প্রথম রাজকুমারকে অংশত বুঝিয়ে দিয়েছে। 'যখন তখন' গিরিদের বাড়িতে যেতে নিষেধ করার পর সে যা বলেছে, তাতেই নারীচরিত্রগুলোর পরিচয় মোটামুটি মিলে যায়। গিরিদের সম্পর্কে মনোরমার উক্তি, '...সব কথার বিচ্ছিরি দিকটা আগে ওদের মনে আসে। বড় হলে ভাই বোন যদি নির্জনে বসে গল্প করে, তাতেও ওরা ভয় পেয়ে যায়।... ওরা তো আর তোমাদের মত মানুষ নয় রাজু ভাই যে ওইটুকু দেখায় বলেই ভাববে আজও মেয়ের ফ্রক পরে থাকার বয়েস আছে। যেমন ধরো ও বাড়ির রিনি, গিরির চেয়ে বয়সেও বড় এমনিও বড় দেখায় ওকে। সেদিন রিনিকে একা নিয়ে তুমি বায়স্কোপ দেখাতে গেলে, একদিন গিরিকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেখো তো ওর বাপ মা কি বলে?... তারপর ধর সরসী। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে আমার ভয় করে, সেদিন তুমি ওর হাত ধরে টানছিলে—... গিরির হাত ধরে টেনো দিকি কি কাণ্ডটা হয়! সরসীর বাপ মা হাসছিল, গিরির বাপ মা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।'

তিন নারী (যদিও রাজকুমারের কাছে গিরি নারী হয়ে ওঠে নি) এবং তাদের পরিবার নিয়ে মনোরমার এ-রকম ধারণাই উপন্যাসে এই তিন চরিত্র সম্পর্কে তথ্য হিসেবে হাজির হয়েছে। এমন-কি, রাজকুমারকে নিয়ে মনোরমার ধারণাও, ('তুমি তো আর সামলে সুমলে চলতে জান না') চরিত্রটি সম্পর্কে উপন্যাসের তথ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সবার ক্ষেত্রেই মনোরমার ধারণা মোটামুটি সত্য হয়েছে। গিরি ও তার পরিবার সম্পর্কে তো বটেই, রাজকুমার যে 'সামলে সুমলে চলতে' জানে না, তার প্রমাণ উপন্যাসে মিলেছে। কিন্তু সমাজই ঠিক করে দিয়েছে মনোরমার ভাষা; সে তাদের দেখেছে সমাজের চোখ দিয়ে; যেভাবে সমাজ ব্যক্তিকে তার অপ্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, রাজকুমারকে মনোরমা করেছে তা-ই।

'সামলে সুমলে চলতে' না-পারা রাজকুমার সরসী, রিনি, মালতী ও কালী— এই চার নারীর 'চতুষ্কোণ' জগতে কীভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং জড়ায়, তাও উপন্যাসটিতে, বোধ করি, দেখবার বিষয়। যে সমস্যা নিয়ে সে তাদের মধ্যে হাজির হয়েছে, তা সাধারণ কোনও সমস্যা তো নয়ই, ব্যক্তির জীবনযন্ত্রণাপ্রধান কিছুও নয়; এটা সমাজের বিশেষ একটা স্তরে বিশেষ এক ব্যক্তির চিন্তা বা আইডিয়া বাস্তবে দেখতে যাওয়ার সমস্যা। আর তাতে কী প্রতিক্রিয়া সেই সমাজে হতে পারে, তাও এতে বিবেচ্য হয়ে ওঠে। যা-ই হোক, চার নারী তার সম্পর্কে চার রকমের প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি নিয়ে

হাজির হয়েছে। রাজকুমার নিজের আইডিয়াকে বাস্তবে দেখতে গিয়ে বা তার অনুসন্ধানকে পরিণতি দিতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছে সমাজে বিদ্যমান শরীর, সম্পর্ক, আবেগ সংক্রান্ত নানা সংস্কার ও জিজ্ঞাসার। এর মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছে রিনির আচরণ ও তার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনা। এখান থেকেই, নিজেকে 'সামলে' রাখতে না-পারা রাজকুমারের উত্তরণ শুরু। এটি মূলত ব্যক্তির খেয়ালখুশির জীবন থেকে দায়িত্বশীল সামাজিক ব্যক্তির জীবনে উত্তরণ। সে অসুস্থ রিনির সেবা করে, তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দেয়।

চতুষ্কোণ কতোটা ফ্রয়েডীয়? এর জবাব দেওয়ার আগে ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে রাজকুমারের চরিত্রটি কেমন বা এই তত্ত্বে সে কতোটা ব্যাখ্যাযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক, দেখা দরকার। প্রথমত, রাজকুমারের যে অস্বস্তি দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে, তা নিরসনে যদি সে গিরির বুকে হাত দেয়, তা হলে কি আমরা একে তার *সুখনীতি* বলব? কেননা, সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬–১৯৩৯) জানিয়েছেন, এই উত্তেজনা বা অস্বস্তি প্রশমনে ব্যক্তি যা করে, তাতে ন্যায়-অন্যায়, বাস্তবতা ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু রাজকুমারের অস্বস্তির ব্যাখ্যা এভাবে সম্ভব নয়; কেননা তার মনোজগত নিয়ন্ত্রণ করেছে বিশেষ এক সৃষ্টিশীল ও অনুসন্ধানী চিত্তবৃত্তি। গিরির বুক স্পর্শ করা সেই চিত্তবৃত্তির বড়জোর অনুঘটক; কেননা, এখান থেকে নারীর শরীর ও মন নিয়ে তার কৌতূহলের শুরু– মেয়েদের ছবি তোলা থেকে আর যা-যা করেছে, সবকিছুর মধ্যে সে একটা সিদ্ধান্ত খুঁজেছে। মালতী, সরসী ও রিনির প্রতি রাজকুমারের আচরণ শেষ পর্যন্ত তার *সুপার ইগো*কেই দেখিয়ে দেয়। রাজকুমারের একটা আইডিয়া আর তার ব্যক্তিচরিত্রের মিলিত শক্তি এই *সুপার ইগোর* মূলে কাজ করেছে। উপন্যাসটির এই একটি জায়গায় ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে খানিকটা; তবে তা স্বস্তিকর নয় এই কারণে যে, এতে উপন্যাসটির পাঠ খণ্ডিত হয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে।

রাজকুমারকে 'খাপছাড়া' বা 'অস্বাভাবিক' হিসেবে দেখলে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হতে পারে। মানুষের অস্বাভাবিকতার মূলে তার যৌন প্রেরণা– ফ্রয়েডের এই মতটির সামনে রাজকুমারকে রেখে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সে স্বভাবত যৌন বিষয়ে একটু বেশিমাত্রায় কৌতূহলী, যৌন অনুভূতি সম্বন্ধে উগ্ররূপে স্পর্শ-সচেতন...।' মন্তব্যটির ভিত্তি কী, জানা মুশকিল যদি আমরা রাজকুমারের স্বভাবের দিকে তাকাই, তার কৌতূহলের প্রতি দৃষ্টি দিই; আর উপন্যাসের কোথাও সে কোনও যৌন-অভিব্যক্তি নিয়ে উপস্থিত নয়। যা নিয়ে সে হাজির হয়েছে, তা একটা আইডিয়া বা চিন্তা– তার মীমাংসায় পৌঁছনোর চেষ্টায় সে যেমন বিচিত্র ঘটনা ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তেমনি উপন্যাসের শুরুতেই স্বতন্ত্র হয়ে থাকা রাজকুমার ক্রমে আরও আলাদা হয়ে গেছে চারপাশের আর সব সামাজিক চরিত্র থেকে। এই আলাদা হয়ে যাওয়ার দিকে লক্ষ করলে তার অস্বাভাবিকতার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাটি নাকচ হয়ে যায়। বস্তুত চরিত্রটির স্বাভাবিকতার যে চেহারা, ভাসা-ভাসাভাবে তা দেখলে ভুল বোঝার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন একটা সময়ে রাজকুমারের সৃষ্টি, যখন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে, নতুন নতুন চিন্তা, তত্ত্ব ও উপলব্ধির তরঙ্গ ব্যক্তির কৌতূহলকে স্পর্শ করছে। ফলত, এই তরঙ্গে জড়িয়ে-পড়া ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য অধিকাংশ মানুষের চেয়ে এগিয়ে থাকেই এবং তা যদি তার আচরণে প্রকাশিত হয়ে যায়– প্রচলিত দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির পৃথকত্বকে অস্বাভাবিকতা বলে মনে হতেই পারে।

একমাত্র রিনির চরিত্র আলোচনায় ফ্রয়েড প্রাসঙ্গিক, তাতেও অবশ্য আংশিকতার ঝুঁকি আছে। কেননা, রিনির উন্মাদদশার উৎস তার শ্রেণীচরিত্র, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রাজকুমারকে হারানোর মানসিক চাপ; তার চুম্বন চেয়ে বিফল হওয়ার ঘটনা যদি রিনির উন্মাদদশার কারণ হতো, তাহলে ফ্রয়েডের তত্ত্ব চেষ্টাহীনভাবেই দাবি করত প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু তার উন্মাদ হওয়ার কারণ অন্যত্র। মালতীর প্রতি তার মনোভাবকে একরকম যৌনঈর্ষা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এই ঈর্ষার কারণ অবশ্যই রাজকুমারের প্রতি তার অধিকারের মনোভাব, যৌনকামনা এতে আংশিক হলেও রয়েছে। অন্যদিকে, রাজকুমার রিনির নগ্নশরীর দেখতে চাওয়ায় তার যে প্রতিক্রিয়া, সেটি একদিকে প্রকাশ করছে অভিজাত নারীর সংরক্ষণকামী মন আর আবেগ; অন্যদিকে সেই আবেগ উপেক্ষিত হওয়ার যন্ত্রণা। একটা বিশেষ অবস্থায় ফ্রয়েডের তত্ত্ব রিনির চরিত্রে খাটে বেশ ভালো করেই। সেটি হল, উন্মাদ হওয়ার পর রাজকুমারকে কাছে পেলে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। রাজকুমারের অভাব মিটে গেলে রিনির অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতার প্রশমন, ফ্রয়েডীয় ভাষায় সত্যিকার অর্থেই তা তার *সুখনীতি*। রিনি তখন সম্পূর্ণ ইড-নিয়ন্ত্রিত এক 'অবিবেচক শিশু।' উপন্যাসের এই অংশ ছাড়া আর কোথাও ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে স্বস্তিকরভাবে হাজির হওয়া যায় না।

বরং আলফ্রেড অ্যাডলারের (১৮৭০-১৯৩৭) তত্ত্ব চতুষ্কোণ সম্পর্কে বেশি খাটে। বিশেষত মনোসমীক্ষণে তাঁর *সৃজনশীল অহমের* ধারণাটি রাজকুমারের ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যায় যুৎসই মনে হয়। ফ্রয়েড-কথিত *ইগো* কিছু মানসিক প্রক্রিয়ার ফল যা সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর উদ্দেশ্য পূরণ করে। অ্যাডলারের *সেলফ* বেশ ব্যক্তিনিষ্ঠ বিমূর্ত ধারণা; এটি ব্যাখ্যা করে মানুষের কাজ ও অভিজ্ঞতার, তাকে করে তোলে অর্থবহ। *সৃজনশীল অহম* ব্যক্তির জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে স্বতন্ত্র ও অনন্য করে তোলে। অ্যাডলারের ব্যক্তির অনন্যতা তত্ত্ব রাজকুমারের ক্ষেত্রে খুব খাটে, যাতে বলা হয়েছে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যধর্মি সামাজিক জীব; তার রুচি, মনোভাব, মূল্যবোধ, স্বার্থ সবই অন্যদের থেকে আলাদা ও অতুলনীয়। মনোসমীক্ষণে অ্যাডলার জোর দিয়েছেন সমাজের ওপর। জানিয়েছেন, যৌনাবেগ বা যৌনস্বার্থ নয়, সামাজিক আবেগ ও স্বার্থ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। তত্ত্বটির এই অংশ অবশ্য রাজকুমারের চরিত্রব্যাখ্যায় সমস্যা সৃষ্টি করে। যৌনাবেগ ও স্বার্থ আর সামাজিক আবেগ ও স্বার্থ এ-দুটোর কোনওটিই রাজকুমারকে নিয়ন্ত্রণ করে নি।

ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বে সচেতনের স্থান নগণ্য। কিন্তু অ্যাডলার মনে করেন মানুষ সচেতন প্রাণী; প্রতিটি কাজেই তার একটা পরিকল্পনা থাকে এবং সজ্ঞানে, সচেতন অবস্থায় সে তা সম্পন্ন করে। গিরির বুকে হাত দেয়া ('তামাশা' জেনেই এটা সে করেছিল) থেকে শুরু করে রাজকুমারের যত কর্মকাণ্ড, সবই তার সজ্ঞানে করা এবং এর পেছনে নীরব ও প্রকাশ্য পরিকল্পনা দুর্লক্ষ্য নয়। অ্যাডলারের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বে যে-ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রত্যয় রয়েছে, তার মোটামুটি তিনটি দিয়ে রাজকুমার চরিত্রের ব্যাখ্যা চলে। প্রত্যয় তিনটি হল : *ফিকশনাল ফাইনালিজম* বা কাল্পনিক চূড়ান্তবাদ, *স্টাইল অব লাইফ* বা জীবনযাত্রার ধরন ও *ক্রিয়েটিভ সেল্‌ফ* বা সৃজনশীল অহম। শেষেরটি নিয়ে একটু আগেই কিঞ্চিৎ বলা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট, রাজকুমার একটি বিমূর্ত ধারণার পূর্ণতা চেয়েছে। চাইতে গিয়ে, সে যেভাবে এগিয়েছে এবং মুখোমুখি হয়েছে সমাজের, তা-ই নির্ধারণ করেছে তার অবস্থান

ও ব্যক্তিত্ব। অ্যাডলারের কথা হল, যে বিমূর্ত আদর্শ বা চিন্তা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে তা-ই তার কাজ ও ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে দেয়। এতে অবশ্য সমাজসংশ্লিষ্ট আদর্শের কথা বলা হয়েছে। তা হোক, একটি বিমূর্ত চিন্তার প্রভাবেই নির্ণীত হয়েছে রাজকুমারের কাজ ও ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তার অবস্থান। তার জীবনযাত্রার ধরনটি কেমন? নিজের দোতলা বাড়ির একটা ঘরে সে একা থাকে। ঘরটির বর্ণনা : '...আসবাব ও জিনিসপত্রে ঠাসা। এই ঘরখানাই রাজকুমারের শোয়ার ঘর, বসিবার ঘর, লাইব্রেরী, গুদাম এবং আরও অনেক কিছু।... বইবোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতোপালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিসে বোঝাই আরেকটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাঙ্ক এবং দুটি বড় ও একটি ছোট চামড়ার সুটকেশ, ছোট একটি আলনা এ সমস্ত কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকী মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।' এখানে রাজকুমারের 'রীতিমত আরাম বোধ হয়।' বসবাসের এই অপরিসর ঘর 'অনেক দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতেও ঠাসা।' বোঝা যায়, রাজকুমার জীবনযাপনের প্রচলিত ছকের বাইরের বাসিন্দা এবং চিন্তাশীল। এটাই তার বাইরের জগত গড়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, চরিত্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ও সমাজে বিদ্যমান সংস্কারের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে। সভাসমিতিতে তার একটা গুরুত্ব আছে, ব্যক্তি হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য এর একটা কারণ; আর একটি হল নিজেকে সে অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারে।

নরনারীর যৌনাবেগ ও বিকার নিয়ে 'বেআব্রু বর্ণনা'য় লেখা উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে আমাদের প্রথমেই যেটির নাম মনে আসে, সেটি ভ্লাদিমির নভোকভ (১৮৯৯–১৯৭৭)-রচিত *লোলিটা* (১৯৫৫)। এরপর ডি এইচ লরেন্স (১৮৮৫–১৯৩০)-রচিত *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* (১৯২৮)। সাম্প্রতিক কালে খুশবন্ত সিং-লিখিত *কম্প্যানি অব উইমেন* (১৯৯৯) আর মোস্তফা মীরের *ঈশ্বরের ঘ্রাণ*ও (১৯৯৭) প্রাসঙ্গিকতা দাবি করে। সমকালীন বাস্তবতার সামনে রেখে, নিবিড় পর্যবেক্ষণে প্রথম দু'টি উপন্যাসকে যৌনবিকারসর্বস্ব বলা যায় না। শেষের দুটি বহুগামিতারই 'ফ্যান্টাসি', বাকি দু'টিতে বহুগামিতা খানিকটা আছে। নরনারীর কামকাতরতা ও যৌনমিলনের বর্ণনা এ-চারটি রচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কেন, কীভাবে এবং এসব কতোটা উপন্যাসোচিত, সে-আলোচনা এখানে নিরর্থক। এ-চারটি রচনা সামনে রেখে, আমাদের লক্ষ করার বিষয় হল, *চতুষ্কোণে* সে-রকম বর্ণনা আছে কি-না। এক কথায় বলে দেয়া যায়, কিঞ্চিৎমাত্রও নেই। রাজকুমারের সঙ্গে সরসী, রিনি, মালতী, কালী— এরা এমনভাবে জড়িয়ে ছিল, দু'তিনটি ও-রকম বর্ণনায় উপন্যাসের ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। কিন্তু 'অসংযমের চেয়ে সংযমই স্বাভাবিক'— এই বোধ যদি কোনও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের থাকে, তা হলে তার প্রতি লেখকেরও একটা দায় এসে পড়ে বৈকি! আর রাজকুমার তো নভোকভ-সৃষ্ট হামবার্ট নয়, মেলর্স তো নয়ই; মোহন কুমার নয় সে; রাসেল, যে কাম দিয়ে শৈশব থেকেই নারীকে চিনেছে এবং বাছবিচারহীনভাবে একের পর এক নারীশরীর ভোগ করেছে— তার সঙ্গে আলোচ্য চরিত্রের মিল কল্পনায়ও অসম্ভব। বহুগামী হওয়ার সুযোগ অবশ্য রাজকুমারের ছিল। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব তা হতে দেয় নি। নারীর প্রতি তার আকর্ষণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার বিজ্ঞানমনস্ক কৌতূহল দিয়ে, এতে যৌনানন্দের আকাঙ্ক্ষা নেই।

সহায়ক বই

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২

২. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৬

৩. সরোজ সন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* : দেজ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৮০

৪. বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, *মানিক বিচিত্রা* : সাহিত্যম, কলকাতা

5. Sigmund Freud, *The Essentials of Psycho-Analysis* : Selected and Introduced by Anna Freud; Hogarth press, London, 1986

6. Alfred adler, *The Practice and Theory of Individual Psychology* : Brace and Company, new York, 1924

7. Hall and Lindzey, John Wiley and sons, *Theories of Personality* : New York, 1957

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : মননের জঙ্গমতার দায়

জাকির তালুকদার

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আপনি বলেন, আমিও বলি,— স্বীকার করি, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের যা গুণ তার সবই আছে তাঁর মধ্যে– বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, অভিনব চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, সবই আছে, কিন্তু পড়াশোনা কম বলে মনে হয়। কল্পনা করা যায়, এই প্রতিভার সঙ্গে বিস্তর পড়াশোনার যোগ থাকলে আরও কত বড় সাহিত্যই না আমরা পেতাম।'

[সোমেন চন্দ। নির্মলকুমার ঘোষকে লেখা চিঠি]

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর লেখায় প্রগতিচিন্তার ছাপ আছে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' পড়ে মনে হল তিনি ভালো লিখবেন। তবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বড় ক্ষীণ, আর পড়ালেখাও কম।'

[সোমেন চন্দ। অমৃতকুমার দত্তকে লেখা চিঠি]

দেখা যাচ্ছে লেখকজীবনের শুরু থেকেই একদিকে যেমন অভিনন্দিত মানিক, অন্যদিকে এলোমেলো মন্তব্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্তও হতে হয়েছে তাঁকে অবিরাম। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁকে না বুঝতে পারলেও প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রবল বলে স্বীকার করে নিয়েছিল অচিরেই। কিন্তু আমাদের তৎকালীন প্রগতিপন্থীরা তুলনামূলকভাবে মানিকের ক্ষতি ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছেন বেশি। বেঁচে থাকলে মানিককে এই একই যন্ত্রণা এখনো হয়তো ভোগ করে চলতে হত। মানিকের মতো শিল্পীদের এ এক অনিবার্য ভবিতব্য। কেননা মৌলিকত্ব যে কোনো একটি তত্ত্ব ও ব্যাকরণের সীমারেখায় ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, তা বুঝে ওঠার মতো মানসিক পরিপূর্ণতা সম্ভবত কোনো কালের কোনো ভাষার তাত্ত্বিকেরা অর্জন করতে পারেন না। বীতশ্রদ্ধ জীবনানন্দ সাহিত্যের সমালোচক-অধ্যাপকদের উদ্দেশে 'বরং তুমি নিজেই লেখ না একটি কবিতা!' বলে নিজের অন্তঃক্ষোভের মোক্ষণ ঘটালেও মানিককে এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করতে দেখা যায় নি। কিন্তু তাই বলে যে তিনি রেহাই পেয়েছেন, এমনকি মৃত্যুর এত বছর পরেও, তা মোটেই বলা যাচ্ছে না। বরং দিন যত গড়াচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সরলীকরণের প্রভাব ও প্রবণতা বেড়েই চলেছে। প্রতিপক্ষ ও কলাকৈবল্যবাদী শিবিরের কথা আমাদের আদৌ বিবেচ্য নয়। কিন্তু আমরা বিবেচনায় নিতে বাধ্য হই প্রগতিশীল মার্কসবাদী শিবিরের যান্ত্রিক শিল্পব্যাখ্যার বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তসমূহকে।

প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত, বলা চলে, অনেক আগেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিল, কেন এই যান্ত্রিকতার প্রবণতা থেকে বেরুতে পারছেন না আমাদের ভাষার সমালোচক-নন্দনতাত্ত্বিকেরা?

উত্তর নিহিত রয়েছে তাদের তত্ত্বচর্চার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই। এদেশে যেমন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাউকে মার্কসের বঙ্গীয় ডিসকোর্স নির্মাণের চেষ্টা করতে দেখা যায়নি, তেমনই কোনো নন্দনতাত্ত্বিককেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি চিরায়ত বাংলা সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে নিয়ে প্রগতিশীল নন্দনতত্ত্বের একটা ভাষ্য নির্মাণে। এখানেই আমাদের মূল ঘাটতি রয়ে গেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর মতো মৌলিক প্রতিভাদের মূল্যায়নে।

তাত্ত্বিকভাবে যা করা সম্ভব হয়নি, সৃজনশীল সাহিত্যে সেটাই করে দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মননের এমন জঙ্গমতা নিয়ে আর কয়জন লেখক বিচরণ করেছেন বাংলাসাহিত্যে! অথচ সেদিকটি উপেক্ষা করে বারবার আলোচনায় এসেছেন ব্যক্তি মানিক, কমিউনিস্ট মানিক, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে নেওয়া মানিক (এটি একটি বানানো উপকথা। স্বেচ্ছায় কেউ কখনো দারিদ্র্য বরণ করে নেয় না), প্রতিনিয়ত জীবনের হলাহল পানকারী মানিক, বিশাল শরীর নিয়ে প্রায় আকাশ ঢেকে ফেলার মতো বাঙালি সমাজে বেমানান উচ্চতার মানিক, এমনকি জীবনের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়া মা কালীর শরণ নেওয়া মানিক। সমকালীন লেখকসঙ্গীরা কেউ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ, কেউ ছিলেন প্রবল বিরোধী। তাই তাঁদের স্মৃতিচারণায়-মূল্যায়নে উচ্ছ্বাস যেমন থাকবে, প্রতিকূল মর্মভেদী মন্তব্যও তেমনই থাকবে বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। সঠিক মানিককে তুলে আনার দায় যাদের ছিল এবং আছে, তাঁরা সেই কাজের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছেন, মানিক-বিষয়ক বড়-ছোট-হাউস-পাতলা নানারকম গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ পাঠের পরে সেই প্রশ্ন তোলাটা এখন শুধু সঙ্গতই নয়, এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব হয়েও দাঁড়িয়েছে।

মানিকের রচনায় অবচেতন ও মনস্তত্ত্ব প্রকট ছাপ ফেলেছে। সেই সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অবধারিতভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয় সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নামটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময়ে বেঁচে ছিলেন, মনোবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণকালে তাঁর পক্ষে ফ্রয়েডীয় স্কুলকে এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। মানিক তা এড়াতে পারেননি স্বাভাবিকভাবেই। আমাদের সমালোচকরা আহ্লাদিতভাবে মানিক এবং ফ্রয়েড ও তাঁর মনঃসমীক্ষণ নিয়ে একের পর এক অভিসন্দর্ভ রচনা করে চলেছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন কি তাঁদের মনে একবারও উঁকি দিয়েছে যে ফ্রয়েডীয় চিন্তাকাঠামো মানিকের যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্পসমূহকে ধারণ ও সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়?

মনস্তত্ত্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়ে থাকে প্রবৃত্তি। ফ্রয়েড যে সব প্রবৃত্তি নিয়ে তাঁর প্রকল্প নির্মাণ করেন, সেগুলোর প্রধান দুইটি প্রবৃত্তি হচ্ছে আদিম। 'আদিম' কেননা তাদের এর চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ করার কোনো অবকাশ নেই। বলা যেতে পারে, ফ্রয়েডের মত হচ্ছে, এই দুটি প্রবৃত্তিকে কোনো বিশ্লেষণই করা যাবে না। এই দু'টিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'কাম প্রবৃত্তি' এবং 'মৃত্যুপ্রবৃত্তি'। যৌনপ্রবৃত্তি সর্বদাই চায় জীবনকে প্রবহমান এবং জাগ্রত রাখতে; অন্যদিকে মৃত্যু প্রবৃত্তি চায় সর্বদা তাকে ধ্বংস করতে। এই দু'টি আদিম প্রবৃত্তির আবাস কিংবা উৎসস্থল নির্ণয় না করেই ফ্রয়েড এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন শুধু জীবনের উৎপত্তি ও সাদৃশ্য থেকে। তিনি ভেবেছিলেন যে জীবন ব্যাপারটিকে যুৎসইভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে যদি এ দু'টি বিপরীত প্রবণতার মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া ও প্রতিকূল ক্রিয়াকে অবধারিত ও নিশ্চিত হিসাবে ধরা হয়। ফ্রয়েড বলেন যে কামপ্রবৃত্তির পরিপ্রকাশ সকলের কাছে স্পষ্ট, কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুপ্রবৃত্তির

কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন দুরূহ। তিনি অবশ্য মৃত্যুপ্রবৃত্তির উপস্থিতির যুক্তি হিসাবে দাবি করেন মানুষের মধ্যেকার আগ্রাসী প্রবণতার অবস্থানকে। ব্যক্তির ধর্ষকাম, মর্ষকাম ও সমাজে হিংসা, হানাহানি ও যুদ্ধের উপস্থিতিকে তিনি মৃত্যুপ্রবৃত্তির পক্ষে অকাট্য যুক্তি বলে মনে করেন। তিনি মনে করতেন যে মানুষ ভালো— এই ধারণাটি সর্বাংশে ভুল। যদি সমাজে কোনো ভালো মানুষ থেকে থাকে, তবে তার উপস্থিতিকে এক ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরে নিতে হবে। 'মানুষ স্বভাবত ভালো'— এই উক্তির বিপক্ষে ফ্রয়েড জোর দিয়ে বলেছিলেন– 'দুর্ভাগ্যবশত ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এই ধারণার সত্যতাকে প্রমাণ করে না, বরং এই অভিমতকেই প্রতিপন্ন করে যে মনুষ্যপ্রকৃতির ভালোত্বে বিশ্বাস হচ্ছে ঐ মোহসমূহের একটি যা থেকে মানুষ তার ভবিতব্যের খানিকটা শোভাবর্ধন কিংবা উন্নতিসাধনের আশা করে। কিন্তু যা বাস্তবে শুধু বিপর্যয়কেই ডেকে আনে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কি ফ্রয়েডকে নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়েছে? মানিক কি ফ্রয়েডের মতোই বিশ্বাস করতেন যে 'মানুষ ভালো' এই ধারণাটিই অসম্ভব? কিংবা 'মানুষ খারাপ' এই ধারণাটিই স্বতঃসিদ্ধ? তাঁর বহুল পঠিত ও আলোচিত 'প্রাগৈতিহাসিক' কিংবা 'সরীসৃপ' গল্পে ফ্রয়েডীয় ঘরানার চিহ্ন খুঁজে পান অনেকেই। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে মোপাসাঁ যেভাবে তাঁর গল্পগুলোকে ফ্রয়েডীয় চিন্তার কাছে উৎসর্গ করেছেন, মানিককে কি সেই একই পাল্লায় বিচার করা যাবে?

'সরীসৃপ' গল্পটির সারাৎসার উপস্থাপনের চেষ্টা করা যাক—

স্বামী ও শ্বশুরের উত্তরাধিকারিণী হিসাবে চারু একটি বিরাট বাগান-বাড়ি লাভ করেছিল। শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পরে সে তার এই বাড়ি বা বাগান কোনোটাই রক্ষা করতে পারেনি। সব চলে গেল মাঝবয়সী ঝানু কারবারি পাটের দালাল বনমালীর দখলে। বনমালীর পিতা ছিল চারুর শ্বশুর রামতারণের মোসাহেব। চারুর স্বামী ছিল পাগল, তার ছেলে ভুবনও মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত, অপরিণত মস্তিষ্ক। প্রথম যৌবনে বনমালী চারুর প্রতি তীব্র অনুরক্ত ছিল; কিন্তু চারু তখন তাকে পাত্তা তো দেয়ই-নি বরং লেখকের ভাষায় 'চারু তখন তাহাকে নিয়া খেলিত'। চারু নিজের স্বাভাবিক যৌনচাহিদাকে সংযত রেখেছিল, 'নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে' লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিধবা ও অসহায় চারু নিজের বাড়ি রক্ষার্থে ও নিজপুত্রের ভবিষ্যৎ-স্বার্থে যখন বনমালীকে তুষ্ট করতে চায় তখন সে 'একজন প্রৌঢ়া নারী'। তার প্রতি বনমালীর সমস্ত আকর্ষণ উবে গেছে। বরং চারুর ছোট বোন পরী তখন বনমালীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পরীর প্রতি বনমালী তখনই আকৃষ্ট হয় যখন সে দেখে 'বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা।' বিধবা পরী ঐ বাড়িতেই আশ্রয় পায় এবং বনমালীর সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বনমালীকে কেন্দ্রে রেখে দুই বোনের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা চরম বিদ্বেষের রূপ নেয়। চারু পরীকে সুকৌশলে হত্যা করতে চায় কলেরার বীজযুক্ত বাটিতে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু কলেরায় প্রাণত্যাগ করে চারু নিজেই। এবার পরীর পালা। সে চারুর জড়বুদ্ধি ছেলে ভুবনকে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করে ফেলে। এদিকে বনমালী যথেচ্ছ সম্ভোগের পরে পরীকে নামিয়ে দেয় 'এ-বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-

চাকরেরও নিচে' তাদের কাতারে। চারুর মৃত্যুর পরে তার ছেলের প্রতি বনমালীর কিছুটা মমত্ব দেখা দিয়েছিল। সেটাও বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তার মা চারুর ছেলের খোঁজ করার কথা বললে বনমালী শুধু উচ্চারণ করে, 'আপদ গেছে, যাক।'

এই গল্প পুরোপুরি কি ফ্রয়েডীয় ঘরানাকে অঙ্গীভূত করে লিখিত হয়েছে? আদপেই তা নয়। এখানে যৌনতার যতটুকু ব্যবহার ঘটেছে, তা নিছক যৌনচেতনাকে ধারণ করে না। বরং চারু ও পরী দুই নারী তাদের রক্ষাকবচ বনমালীকে আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের একমাত্র যা সম্পদ অবশিষ্ট ছিল, সেই যৌবন তথা শরীর দিয়েই আকৃষ্ট করতে চেয়েছে। এখানে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের পেছনে লিবিডো নয়, কাজ করছে নিজেদের স্বার্থ তথা অস্তিত্ব রক্ষার অনুভূতি। এই পর্যায়ের ব্যাখ্যায় এলে দেখা যায় মানিক ফ্রয়েডীয় বৃত্তকে ছাড়িয়ে প্রায় পৌঁছে গেছেন পাভলভের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পরাবর্ত-নির্ভর সামাজিক মনোবিজ্ঞানের চৌকাঠে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাননিক অগ্রযাত্রার এই চিহ্ন বিস্ময়কর। কেননা পশ্চিমা প্রচারণা ও আনুকূল্যে ফ্রয়েডের অবক্ষয়ী চিন্তা যখন প্রায় সারাবিশ্বকে শাসন করছে, তখন মানিক এই মনোজাগতিক উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন কিসের শক্তিতে?

ফ্রয়েড মানুষের মনোজগতকে এক স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র জগৎ বলে দাবি করেছিলেন। তাঁর কাছে এটি ছিল পুরোপুরি বিষয়গত বা সাবজেকটিভ। তাঁর মতে মনুষ্য-মনস্তত্ত্ব শুধু অবচেতনের মাধ্যমেই ব্যাখ্যাযোগ্য, মনুষ্যমন প্রাথমিকভাবে মৃত্যুপ্রবৃত্তির প্রভাবাধীন, মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে চেতনার প্রভাব এতই সামান্য যে তা ধর্তব্য বলেই গণ্য নয়।

অন্যদিকে পাভলভ দেখিয়েছেন, মনস্তত্ত্ব বিষয়গত, অবজেকটিভ ও বস্তুগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মানসিক অবস্থা তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পাভলভেরও আগে সেচেনভ দাবি করেছিলেন, মস্তিষ্ক চেতনার একটি অঙ্গ, অর্থাৎ একটি অবস্থা যা কোনো কারণে কাজে নিয়োজিত হলে চূড়ান্ত ফলাফল হিসাবে একসারি বাহ্যিক ব্যাপার তৈরি করে, আমরা যাকে মনোজাগতিক ব্যাপার বলে নির্দেশ করি।

আপাতদৃষ্টিতে মনের বিভিন্ন জটিল এবং সূক্ষ্ম কর্মকাণ্ডের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি খুঁজে বের করা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেচেনভ এবং পাভলভ একথা মানতে চাননি। কারণ, সরল কিংবা জটিল, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সকল মানসিক ব্যাপারের ভিত্তিতে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সবগুলোই কোনো না কোনো ধরনের মাংসপেশিগত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আমাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ক্রোধের চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে মাংসপেশির নড়াচড়া। মাকে দেখামাত্র শিশুর আনন্দ, শত্রুকে দেখামাত্র একজন সৈনিকের ক্রোধ, প্রথম প্রেম-ভাবনায় তরুণীর শিহরন, কয়েকটি চমৎকার পঙ্ক্তি রচনামাত্র একজন কবির পরম আনন্দ, প্রিয়তমার বিচ্ছেদে কোনো ব্যক্তির দুঃখ— সবকিছুর চূড়ান্ত প্রকাশ মাংসপেশির গতি-সঞ্চালনে। এসবই পরাবর্ত। ফ্রয়েড ও ভাববাদীরা যাকে ধ্যান বলে দাবি করেন, তা আসলে না-বলা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাভলভ-কথিত পরাবর্ত এভাবেই মস্তিষ্কের সাথে মানসিক কার্যাবলির সম্পর্ক বিনির্মাণ করে। মানিকের 'সরীসৃপ' গল্পও এই সত্য নির্দেশ করে যে চারু বা পরী কেউ-ই লিবিডো-তাড়িত হয়ে বনমালীর কাছে শরীর সমর্পণ করেনি। বরং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তাদের মস্তিষ্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছিল যে বনমালীকে কুক্ষিগত করার এ ছাড়া অন্য কোনো পথ তাদের আয়ত্তে নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনন-জঙ্গমতার ব্যাখ্যা আমাদের প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বে নেই। কেননা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যে সঠিক-ভাবে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের বাংলা ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল, সেই খোঁজটি রাখা সম্ভব হয় নি কারও। মানিক নিজেও তা জানিয়ে যেতে পারেন নি। সম্ভবত নিজের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবার অপেক্ষা করছিলেন তিনি। তাঁর স্বল্পায়ু জীবন তথা অকাল মৃত্যু সেই অবসর তাঁকে দেয় নি। এখন এই বিষয়টি পাঠকের গোচরে আনার মাধ্যমে মানিক-রচনার নতুন পাঠ উপস্থাপনের দায়িত্ব তাদের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা সঠিক ও প্রয়োজনীয় লেখক মনে করেন।

২.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন আমাদের প্রয়োজন? তাঁর নাম কি শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালানুক্রম রচনা করার জন্যই প্রয়োজন? তাঁর রচনাবলি কি শুধু আমাদের শিক্ষায়তনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলা সাহিত্যে স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের একাংশ হিসাবেই ব্যবহৃত হবে? তিনি কি শুধু বছরে একবার তাঁর জন্ম বা মৃত্যুদিনেই স্মরণযোগ্য? তাঁর রচনা কি আমাদের কাছে বিগত শতকের রচনার' উদাহরণ হিসাবে শুধু অ্যান্টিক-ভ্যালুই বহন করে? কিংবা তিনি কি শুধু আমাদের নান্দনিক ক্ষুধারই নিবৃত্তকারী? তাঁর রচনা থেকে আমাদের সময়ের মানুষের কি জীবন-প্রশ্নের কোনো উত্তর খোঁজার অবকাশ নেই? তাঁকে কি শুধু মনস্তাত্ত্বিক কিংবা বাস্তববাদী সাহিত্যিকের চৌখুপিতে বন্ধ করে বিচার করা সম্ভব?

তা যদি হয়ে থাকে তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনায় মত্ত হওয়া যথার্থই পণ্ডশ্রম। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর এতদিন বাদেও জীবিত। এত জীবিত যে বর্তমানের অনেক (বলা চলে অধিকাংশ) দেহধারী তথাকথিত বড় লেখককেই তাঁর তুলনায় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। তা নিশ্চয়ই এই কারণে নয় যে, মানিক-সাহিত্য বাঙালি জীবনের নির্ভুল রূপ ধারণ করে আছে। বরং এই কারণে যে বাঙালিকে মানিক যে জায়গাতে দেখতে চেয়েছেন, বাঙালিকে সেই জায়গায় পৌঁছুতে হলে এখনো মানিকের সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তাকে সঙ্গে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। কারণ মানিকের সকল চিন্তা তাঁর সাহিত্যকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়েছে। এ এক অসাধারণ বিবেচ্য বিষয়, যা প্রায় কোনো তাত্ত্বিকেরই নজরে আসেনি যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জাতি ও মানবভাবনাকে প্রায় পুরোপুরিই সৃজনশীল আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন। তার জন্য তাঁকে প্রবন্ধ-বক্তৃতা-আলোচনার দ্বারস্থ হতে হয়নি খুব একটা। মানিকের হ্রস্বায়ু জীবনে গল্প-উপন্যাস-কিশোর উপন্যাসের সংখ্যা এই কারণেই সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক বেশি। খুবই স্বাভাবিক কথা যে লেখক যদি নিজের বলার সমস্ত কথা ও উপলব্ধি গল্প বা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার যোগ্যতা রাখেন, তাহলে কেন তিনি প্রবন্ধ লিখতে যাবেন! বিরল ক্ষমতার অধিকারী মানিক ঠিক তাই-ই করেছেন। বক্তৃতা বা তত্ত্বের কচকচানির ধার না ধেরে তৈরি করে গেছেন শৈল্পিক অবয়ব।

যে সময়ে মানিক বেঁচে ছিলেন, সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সংগঠন করেছিলেন, সেই সময়ে সেই ধারাতে কাজ করা সত্যিই কঠিন ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পরে আজ যেমন আমাদের দেশে প্রগতিশীল বলে পরিচিত লেখকদের প্রতিনিয়ত চরম প্রতিকূলতা, বঞ্চনা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়, তার চেয়েও অনেকগুণ

বেশি প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছে মানিককে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতা এসেছে পার্টিনেতৃত্বের কাছ থেকেই। এখনো তেমনটাই ঘটে থাকে। একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভার সাথে ঠিক কী ধরনের আচরণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো সাংগঠনিক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, তা বুঝতে শেখেননি প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মানিকের প্রতি চিন্মোহন সেহানবিশ বা আরও অনেক সংগঠকের আচরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভূরি ভূরি। বাইরের যুদ্ধে সবসময় লিপ্ত থাকা যায়, কিন্তু নিজেদের সংগঠনের সাথীরা, যারা লেখক-শিল্পীকে সবচেয়ে ভালো বুঝবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়, তাদের বিপরীত আচরণের শিকার হতে হয়েছে মানিককে বারবার। এর একটি কারণ হতে পারে তত্ত্বের যান্ত্রিক সরলীকরণের প্রবণতা। কিন্তু সৃজনক্ষমতাহীন পার্টিনেতৃত্বের ঈর্ষাকাতরতা যে অলক্ষ্যে কাজ করে না, সেটাই বা কীভাবে নিশ্চিত করে বলা যায়? যাঁরা ফ্রয়েডকে গুরু মানেন, তাঁদের নিজেদের প্রতি এই ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে তাকানোর একটি প্রাসঙ্গিকতা বোধ হয় রয়েই গেছে। দাবি করা হয় যে, লেখক হচ্ছেন জাতির মননের সর্বোচ্চ প্রতীক। এ কথা সবার আগে অস্বীকার করতে চান লেখকের সাংগঠনিক বন্ধুরা। মানিকের উপন্যাসের চরিত্র যখন বলে যে, গান্ধীজির অহিংসা জিনিসটিও বাইরে থেকে ধার করা, তখন কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর থেকেই তীব্র প্রতিবাদ এসেছিল। কারণ অনেক ব্যাপারেই বিরোধিতা করলেও গান্ধীর দেবতাসুলভ ভাবমূর্তি ও তাঁর অহিংসাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য মনে মনে পোষণ করতেন প্রত্যেকেই। বিশেষ করে বিদেশী পণ্ডিতরা যখন বললেন যে অহিংসার মাধ্যমে গান্ধী বিশ্ব-রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, তখন তার সেই কৃতিত্বের সাথে ভারতবর্ষীয় হিসাবে নিজেদের সম্পৃক্ততা নিয়ে মনে মনে ও প্রকাশ্যে গর্ববোধ করতেন অনেকেই। পার্টিনেতৃত্বের একটি অংশও এর বাইরে ছিলেন না। কিন্তু মানিক যখন তাঁদের শ্লাঘার বেলুনে পিন ফোটালেন, তা বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল অনেকের পক্ষেই। মানিক এ বিষয়ে কোনো বিসম্বাদে লিপ্ত হননি, আবার নিজের অবস্থান থেকে সরেও আসেননি। অনেক পরে প্রমাণিত হয়েছে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যটি সত্য। মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ রিচার্ড ফক্স জানাচ্ছেন, আপাতবিরোধের মতো শোনালেও একথা সত্য যে গান্ধীজি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রগতির ধারণাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন মূলত রাসকিন ও তলস্তয়ের আদলে তাঁর চিন্তাধারার দেহগঠনের মাধ্যমে। গান্ধীজি ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রকল্প হাতে নিতে পেরেছিলেন প্রধানত প্রাচ্যবাদের সেই বিকল্প চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করেই যেখানে প্রাচ্য চিহ্নিত হয় 'স্বভাবজাতভাবেই আত্মিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও যূথবদ্ধরূপে।' গান্ধীজির তত্ত্ব খাড়া করতে বিপুল সাহায্য করেছেন রাসকিন, যিনি ধনতন্ত্র ও শিল্পায়নের বিপক্ষে অবিরাম লেখনী চালনা করেছেন। আছেন এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, যিনি অক্সফোর্ডে মিলিত হয়েছিলেন গান্ধীর সাথে। আছেন অ্যানি বেসান্তও। সর্বোপরি রয়েছেন থরো। থরোই সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। থরোর প্রবন্ধগুলো গান্ধীজিকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি তাঁর নিজের লেখায় থরোর প্রবন্ধ থেকে সরাসরি তর্জমা তুলে দিতেন। মনে করুন গান্ধীজির সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তির কথা। তিনি বলছেন– 'সরকার যদি কাউকে অহেতুক অন্যায়ভাবে বন্দি করে তখন সত্যিকার মানুষের আসল কাজ নিজেকে নিজে বন্দি করা।' এই বাক্যটি থরোর প্রবন্ধ থেকেই নেওয়া। তার সঙ্গে একথাটিও জানানো দরকার যে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' নামটিও

থরো-প্রদত্ত। তবে এর দ্বারা গান্ধীজির মহত্ত্ব কোনোক্রমেই খাটো করা হয় না। কারণ, মানিকের উপন্যাসের চরিত্র একথাও স্বীকার করছে যে, গান্ধীজি সার্থকভাবে ব্যক্তির প্রতিবাদকে রূপান্তর করতে পেরেছিলেন জাতিগত প্রতিরোধ আন্দোলনে। তবে 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' বলে মাতম তোলা ভারতবর্ষীয় বাঙালি তখন মানিককে ভালোভাবে নেয়নি। সত্যকথনের জন্য ঝুঁকিতে পড়েছিলেন মানিক। কিন্তু এটুকু ঝুঁকি তো লেখককে নিতেই হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন সমাজের সকল অংশের তুলনাতেই অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। তা যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও, এবং দর্শনের ক্ষেত্রেও। আমরা এটিকেই বলেছি মননের জঙ্গমতা। শতাব্দীর পরিবর্তনেও যে মানিকের প্রাসঙ্গিকতা কমেনি, তার প্রধান কারণ সময়ের তুলনায় মানিক-মননের এই এগিয়ে থাকা। যদি ফ্রয়েডেই তিনি আটকে থাকতেন, তাহলে *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে সজনী ও তার স্ত্রী-র চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন না। এখানে এই দম্পতি সন্তানহীন, সজনী পুরোদস্তুর স্ত্রী-র ওপর নির্ভরশীল, স্ত্রী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, স্বামী নার্ভাস। স্বামীকে নগেনের সাথে চেঞ্জে পাঠানোর জন্য স্টেশনে তুলে দিতে আসে স্ত্রী। যাত্রায় স্বামীর অনীহা। স্ত্রী তাকে বোঝায়— 'আজ কত বছর একদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাই তো আমাদের এত ঝগড়া হচ্ছে। একটি মাস তুমি বাইরে থেকে ঘুরে এসো, দেখবে আর হবে না' বলিয়া একটু হাসেন— 'বিরহের অভাবে আমাদের মিলন যে তিতো হয়ে গেল গো।' কিন্তু এত বুঝিয়েও কোনো কাজ হয়নি। যাত্রার শেষ মুহূর্তে ট্রেন চলতে শুরু করামাত্র সজনী ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। কারণ 'শেষ মুহূর্তে সজনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল অত্যাচারী স্ত্রীটি তাহার প্লাটফর্মে পরিত্যক্তা বিপন্নার মতো একাকিনী দাঁড়াইয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। সজনীর মনে হইল ওর দু'চোখ জলে ভর্তি।' এদিকে সজনী নেমে আসায় তার স্ত্রী-র উক্তি হচ্ছে— 'আমার আর মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না।' মুখে একথা বললেও মনে মনে তিনি এতই খুশি হয়েছিলেন যে 'উপভোগে বাধা পড়িবে ভয়ে' আর কোনো দিকে তাকালেন না। *পুতুলনাচের ইতিকথার* বিপরীত। এখানে মানিক এই মনোভঙ্গি দেখালেন যে বিজ্ঞানের পরীক্ষার মতো একই সূত্রের ফলাফল মানুষের ক্ষেত্রে কখনো হুবহু এক হবে না। মানুষকে ও মানুষের মনকে কোনো সংকীর্ণ ছকে বাঁধা যায় না। একই মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট পণ্ডিত হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোপুরিভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না, এটি মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা গোপাল হালদার যখন ভুল করেন তখন আমাদের দুঃখ পাওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। এক *অহিংসা* উপন্যাসটিকে নিয়েই তাঁরা মানিক-মূল্যায়নে যথেষ্ট অবিচার করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন 'পরিচয়' এর পাতায়– 'সজ্ঞানতার প্রয়োজন এ যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মানিকলালের (পাঠক খেয়াল করুন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুচ্ছার্থে বলছেন মানিকলাল) চৈতন্য মার্জিত নয়, নচেৎ বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুড়ি বসত না, যেমন বসেছে অহিংসায়।' কারণ মানিকের কৃতিত্ব নাকি 'অশিক্ষিত পটুতা'। আর গোপাল হালদার তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে বলছেন– 'এ প্রতিভা (মানিক) আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মগঠন ও আত্মবিচার এ প্রতিভার ধর্ম নয়।'

মানিকের অপরাধটা কী?

অহিংসা উপন্যাসে তিনি কাহিনীর অন্তর্বয়নের মধ্যে কয়েকবার 'লেখকের মন্তব্য' বলে একটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আখ্যানের নিটোল স্রোতে যে মায়া সৃষ্টি হয়, তা মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়েছেন 'লেখকের মন্তব্য' দিয়ে। এই ভেঙে দেওয়ার ফলে পাঠককে আখ্যানস্রোত থেকে ধাক্কা খেয়ে মাঝে মাঝে ভাবতে হয় যে শুধু গল্প নয়, গল্পটির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তার মাঝে মাঝে ভাবা উচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই *অহিংসা* উপন্যাসে এক নতুন রীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, যে রীতি পাঠককে আরও সচেতন পাঠক করে তুলবে, যে রীতি পাঠককে শুধু আখ্যানের তৃপ্তিই দেবে না বরং একই সাথে বৌদ্ধিক চেতনারও উন্নয়ন ঘটাবে, বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তব সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। আসলে তৎকালে প্রচলিত ইউরোপীয় আদলের উপন্যাসের সাথে পরিচিত ঔপনিবেশিক বাঙালি মনন বুঝতে পারেনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকতা। আজ এত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে মানুষ যখন বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও ভাবসম্পদের সাথে বেশি বেশি করে পরিচিত হতে চেষ্টা করছে, তখন বুঝতে পারছে যে বাংলার নিজস্ব এক উপন্যাস-কাঠামো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলছিল। তাকে বাধাগ্রস্ত করে দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে লুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল ইউরোপীয় ভাবাদর্শ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের মতো প্রতিভারা নিজেদের অতীত সমৃদ্ধির পুনর্নবায়নের কাজে ঠিকই হাত দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। *অহিংসা* উপন্যাসের যে আঙ্গিক মানিক ব্যবহার করেছিলেন, অর্ধশত বছর পরে তার প্রচলন বাংলা তো বটেই, লাতিন, আফ্রিকান, এমনকি ইউরোপীয় সাহিত্যেও এখন প্রচুর। কিন্তু প্রথম পথ তৈরির কৃতিত্বের সাথে যে হলাহলও পান করতে হয়, তার পুরোটাই পড়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগে।

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা মানেই বিড়ম্বনা। আমাদের মানবজাতির সৌভাগ্য যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই সত্যটি জেনেও মেনে চলেন না!

কোনো মহাকাব্যের নায়ক

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে কিনেছিলাম বইটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *স্বাধীনতার স্বাদ*। প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দশ বছর পরে। তখনও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বিশেষত তাঁর গল্পের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। কিছুকাল পূর্বেই এ. জে. কারদার পরিচালিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র 'জাগো হুয়া সাভেরা' মুক্তিলাভ করেছে। তাই ফুটপাতে প্রায় পৃষ্ঠা না-ওলটানো ঝকঝকে মলাটের নতুন বই মাত্র আট আনায় কিনতে পেরে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলাম নিঃসন্দেহে। কারণ ভেবে দেখার মতো মন তখন ছিল না, তবুও বইটি পড়তে গেলে ঠিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সেটি কি না এমন সংশয় জেগেছিল, মনে পড়ে। তাঁর অনেক গল্প ও *পদ্মানদীর মাঝি* পড়া ছিল বলে অমন চিন্তা মনে আসতেই পারে— ভাষা ব্যবহারে ভিন্নতার জন্যেও।

প্রথম পাঠে এই মনোভাবই সম্ভবত আমাকে তিন-চার দফায়ও উপন্যাসটি পড়ে শেষ না করতে পারায় সাহায্য করে। সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আখ্যানই তখন মনে হয়েছিল সেটিকে এবং ঐ দাঙ্গা ও তার পরের দেশভাগ, স্বাধীনতা, আবার দাঙ্গা ইত্যাদির কারণে নিজের পরিবার ও জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা আবার উপন্যাসে পড়া খুব আকর্ষণীয় মনে হয় নি তখন, এমনও হতে পারে। উপন্যাসটি তাই অনেকাংশেই অপঠিত থেকে যায়।

মানিক জন্মশতবর্ষের এই কালে তাঁর *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পের মঞ্চায়ন দেখতে গিয়ে হঠাৎই *স্বাধীনতার স্বাদ*-এর কথা মনে পড়ে। ভেবে দেখি, একষট্টির পরে চলে যাওয়া সাতচলিশ বছরে *স্বাধীনতার স্বাদ*-এর পরে প্রকাশিত আর মাত্র একটি উপন্যাসই পড়েছি আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের— *ইতিকথার পরের কথা*। এবং সেটিও যে আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল মনে হয় না। বিগত অনেক বছরে তাঁর আরও কিছু পরে রচনা হাতের নাগালে এলেও পড়া হয়ে ওঠে নি— পাঠ্য বস্তুর বিস্তৃতি অনেক বেশি ছিল বলেই সম্ভবত। অথবা, তাই কি? *স্বাধীনতার স্বাদ* কি সামান্য প্রভাবও ফেলে নি আমার মানিক পাঠ্যতালিকায়? এই ভাবনা থেকেই এতকাল পরে *স্বাধীনতার স্বাদ* আবার পড়ব বলে খুঁজতে থাকি।

উনিশশো একান্নর পর এই উপন্যাসের আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বলে তথ্য পাই। কোনোটিই আমার চোখে পড়ে নি। পরিচিত কারো কাছেই, এই দূর দেশে, ঐ উপন্যাসের কোনো কপিও পাই নি। অবশেষে ভিন্ন রাজ্যে বসবাসরত সাহিত্যামোদী দম্পতির সংগ্রহ থেকে ঢাকার 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত *মানিক রচনাবলির* সপ্তম খণ্ড সংগ্রহ করে আনি। নিজ শেল্‌ফ থেকে নামিয়ে আনি হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত অবসর প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* গ্রন্থটিও। দেখি, এই শ্রেষ্ঠ

উপন্যাস সংকলনে *স্বাধীনতার স্বাদ* এর পরে, প্রকাশিত মাত্র একটি উপন্যাস, 'হলুদ নদী, সবুজ বন,'-ই কেবল অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার স্বাদ অবশ্যই নয়।

দুই

আন্‌কোরা ঝকঝকে মলাটের বই ফুটপাতে বিক্রির জন্যে কেন এসেছিল ঐ-সময়ে ভেবে দেখি নি। এমন কতই ঘটে। অসীম রায়ের *গোপালদেব* উপন্যাসটিও আমি ফুটপাত থেকেই কিনেছিলাম যদিও নতুন নয়। এমন কি প্রচ্ছদও ছিল না সেটির। পাতলা কাগজের মলাটে শুধু বইটির নাম লেখা। এমন আরও অনেক বই-ই ফুটপাত থেকে কেনা। নিউইয়র্কের ফুটপাত থেকে চিনুয়া আকের উপন্যাস— প্রায় নতুনই, কেনবার কথাও ভুলি না।

স্বাধীনতার স্বাদ-এর প্রকাশক ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। উপন্যাসটি ছাপানোর পরে তারা খুব খুশি ছিল না। "গুরুদাস *স্বাধীনতার স্বাদ* ছাপিয়ে চটেছে। আগে বইটা পড়ে নি, পরে বোধ হয় বাইরে থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় বইটার মতামত ভালো লাগে নি। জানিয়েছে আমার কোনো বই-এর পুনর্মুদ্রণ ওদের দ্বারা হবে না। *স্বাধীনতার স্বাদের* ছাপা বাঁধা জঘন্য হয়েছে।" একথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন। অন্য কোনো কথা তাঁর মনে আসে নি। বিক্রি না-হওয়ায় গুদামের জায়গা খালি করবার জন্যেও প্রকাশক অনেক বই-ই রাস্তায় নামিয়ে দেন। সব দেশেই। 'বিন'-এ নামিয়ে দেয়া বলে সেটিকে। অর্ধমূল্যে, সিকিমূল্যে বিক্রি করতে না-পারলে অবশেষে রাস্তায় নেমে যেতে হয় অনেক দুর্ধর্ষ লেখককেও। আকসার ঘটে এমন। নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড বুক স্টোরে গেলে খুব সস্তায় অনেক বড় বড় লেখকের বই পাওয়া যায়। *স্বাধীনতার স্বাদ*-এর ক্ষেত্রেও কি এমন ঘটেছিল? এতকাল পরে সে-কথা ভেবে কোনো লাভ নেই স্পষ্টই বোঝা যায়। বিশেষত ঐ গ্রন্থের আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে জানবার পরে। যদিও দ্বিতীয় সংস্করণ কুড়ি বছর পরে ও তৃতীয় সংস্করণ আরো কুড়ি বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে— পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে পুনরাসক্তি জন্মাবার সূত্রেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এবং ঐ রচনার প্রতি পাঠকের আগ্রহে যে একান্ত ভাষাটির টান পড়েছিল এ-সম্পর্কে নানা তথ্য আছে। সেটি ঘটে *স্বাধীনতার স্বাদ* গ্রন্থাদি প্রকাশের কালেই। জানা যায়, *সমুদ্রের স্বাদ* গল্পগ্রন্থটি নিয়েও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স তাঁর প্রতি বিরূপ হয়। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস *সহরতলী*-র (দ্বিতীয় পর্ব) পাণ্ডুলিপি গুরুদাস-এর কাছে থেকে ফিরিয়ে এনে ডি. এম. লাইব্রেরিকে দেন। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই একদিন তিনি 'বসুমতী' অফিসে গিয়ে শোনেন তাঁর আর তারাশঙ্করের লেখার কোনো চাহিদা পাঠকের কাছে নেই। এমন কি বেঙ্গল পাবলিশার্স *চিহ্ন* উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ করতে রাজি হয় নি। *চিহ্ন*-র প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪৭ এবং সেটিকে মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের মধ্যে ধরা হয়। তবুও সেটি-র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণে প্রকাশকের অনীহার কারণ অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশেষত এই সময়েই তাঁর দারিদ্র্যও চরম পর্যায়ে ওঠে বলে জানা যায়। তাই দর কষাকষির জন্যে প্রকাশকের সঙ্গে মতান্তর ঘটে এমন ভাববার কোনো ভালো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থের প্রয়োজন তাঁর ছিল— যে কোনো পরিমাণ।

পরবর্তী কয়েক বছরে মানিকের ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্য, দুর্দশা, বিপর্যয় ইত্যাদি সত্ত্বেও অনেক কটি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। একান্ন থেকে ছাপ্পান্ন এই সময়পর্বে অন্তত

আরও কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তার প্রায় কোনোটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলির মধ্যে পড়ে না। এক *হলুদ নদী সবুজ বন*— তাঁর জীবনের শেষ বছরে প্রকাশিত উপন্যাস, কিছু ভিন্ন ধরনের এবং সেটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হলেও সেখানে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস তথা শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেতনা এত স্পষ্ট যে শিল্প চেতনাকে ছাড়িয়ে যায়।

চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭-এর মাসিক 'বসুমতী'তে *স্বাধীনতার স্বাদ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার কালে। যদি ধরা যায় আগ্রহী পাঠকের অভাবেই *চিহ্ন*-র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণে প্রকাশকের অনীহা যথার্থ, তাহলে *স্বাধীনতার স্বাদ* প্রকাশের কয়েক বছর পরে সেটির ফুটপাতে নেমে আসার কারণ বোঝা যাবে। যদিও যুক্তিটিকে খুব শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করানো যায় না। তবুও এমন প্রশ্ন করাই চলে— মানিকের সাতচল্লিশ-পরবর্তী রচনা অনেকাংশেই পাঠকমন্দিত হয়নি সে কি পাঠতৃপ্তি দিতে না-পারার কারণে? কোনো কোনো সমালোচক সেটাকে শিল্পমানের সঙ্গেও মেলাত পারে নি। অনেকে এমন করেনও। তাঁরা মানিকের উত্তরকালের রচনায় অবিন্যস্ত চিন্তা পারম্পর্যহীন ঘটনা ও চরিত্রবিন্যাস, সব কিছু ছাপিয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাসই প্রকট হয়ে ওঠা ইত্যাকার নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

উত্তরকালের এ সব রচনা যথেষ্ট পরিমাণে পাঠকনন্দিত না-হলেও তাঁর রচনার দৃশ্যমান স্বীকৃতি এই কালেই মিলতে থাকে। উনপঞ্চাশে *পুতুলনাচের ইতিকথা* চলচ্চিত্রে রূপ পায়, সাতচল্লিশের শেষে প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের গণসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করার জন্য মুম্বাইয়ে যান; উনপঞ্চাশের বছরে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অনেক সম্মেলন ইত্যাদিতে সভাপতিত্ব করেন। তার কয়েক বছরের মধ্যেই *চিহ্ন* উপন্যাসের চেক ভাষার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় *পদ্মানদীর মাঝির* সুইডিশ ও চেক অনুবাদও। এমন কি নানা সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে আমন্ত্রিত হন, সংবর্ধিত হন। কিন্তু এ সবই দেখা যায় তাঁর পূর্বকালের রচনার ফসল। যদিও উত্তরকালের রচনা তাঁর পরিচিতির বিস্তৃতিতে সহায়তা করেছে নিঃসন্দেহে।

'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' সংকলনে গ্রন্থিত আটটি উপন্যাসের মধ্যে *চিহ্ন* ও *হলুদ নদী সবুজ বন* এই দুটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটি উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশকালের তফাৎ প্রায় দশ বছর। *স্বাধীনতার স্বাদ* প্রকাশিত হয় *চিহ্ন* প্রকাশের চার বছর পরে। যদিও সেটির রচনাকাল *চিহ্ন*-র সময়েই। স্পষ্টতই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাসের কী পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন তাঁর এ দুটি উপন্যাসে। পরবর্তী দশ বছরের রচনাও তাঁর ঐ বিশ্বাসেই নিষিক্ত। নদী ও অরণ্যের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস *হলুদ নদী সবুজ বন*— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ সাহিত্য নিরীক্ষা— ভিন্ন আবহ ও নিসর্গের জন্যেই বেশি পরিমাণে নন্দিত হয়। রাজনৈতিক বক্তব্য কি বিশ্বাস কি চেতনা সেই পরিমাণ বিবেচনায় আসে না। তবুও বলা যায় যে, আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যপথে তিনি যে ফ্রয়েড ছেড়ে মার্কস-এর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সেটি শেষতক অমনি ফেরানোই ছিল এবং লক্ষ করা যায় যে, এই দ্বিতীয় পর্বের উৎকর্ষ বিচারে সাহিত্যচেতা সমালোচককুল যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করেন না। তাহলে কি বলি যে, ঐ-সব মার্কসীয় রচনাও তাই পাঠকের হাতে হাতে ফিরত না? ঐ-সব রচনা ঐ কালে কী পরিমাণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল জানা যায় না, জানলে হয়তো পাঠকের আগ্রহের ব্যাপারটি বোঝা যেত। অবশ্য তাঁর শেষকালের চরম দারিদ্র্য

প্রকাশক সম্প্রদায়ের আনুকূল্য কি সততার অভাবই বরং স্পষ্ট করে। শোনা যায়, এই কালে প্রকাশকের 'ধাপ্পাবাজি'র মোকাবেলাও তাঁকে করতে হয়েছে অনেক।

তিন

চিহ্ন প্রকাশের পূর্বকালীন অনেক রচনায়ই সমাজচেতনা কি ধনী-দরিদ্রের *চিরবৈষম্য*, মুমূর্ষু সমাজের অজানা ইত্যাকার প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির উপাত্ত হলেও *চিহ্ন* উপন্যাসেই তাঁর মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রবল বেগ লক্ষ করা যায়। মাত্র কয়েক বছর আগেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসীয় চিন্তার দীক্ষা গ্রহণ করেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও হন। নানা সাহিত্যিক সমালোচকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে কখনো দেখা গেছে তিনি মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্র মনে চলেছেন, কখনো ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে আছেন, কখনো সংঘ অফিসে বসে শিল্প সাহিত্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন, কখনো পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করছেন, কখনো বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা সংবাদ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের জীবন দিয়ে পাওয়া এই সব অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছে *চিহ্ন* উপন্যাসে।

চিহ্ন উপন্যাসের কাঠামোনির্মাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু নতুন আঙ্গিকের ব্যবহার করেন। বিভিন্ন দিক থেকে ঘটনাতাড়িত নানা চরিত্র একটি কেন্দ্রে এসে স্থির হয় চরম মুহূর্তের জন্যে। সৃষ্টি হয় মিছিল ও গণসংগ্রামের জোয়ার। রাজনৈতিক দালালদের মুখোশ খুলে দেয়া কি অভিজাত সমাজের নোংরামি তুলে ধরার পাশাপাশি মানিক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেন, বলেন নতুন সূর্য ওঠা দিনের কথা : 'চারিদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোনো অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদিঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড় পতাকা উত্তরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।' কী অপার বিশ্বাস লেখকের।

চার বছর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও *স্বাধীনতার স্বাদ*, *চিহ্ন* রচনার সমকালীন। *চিহ্ন*-তে তাঁর বিশ্বাসের যে সব কথা বলা হয় নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে সেই সব কথা, বিশ্বাস, তত্ত্ব আলোচনা বিনা দ্বিধায়, বিনা বাধায় বলেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্যতা নয়, চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলা, কী তার মুখ দিয়ে বলা কথাই আসল, এটিকে যদি রচনাকৌশল ধরা যায়, তাহলে *স্বাধীনতার স্বাদ* তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। 'রাষ্ট্রের, সমাজের সমাজ-অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এবং সমসাময়িক সময়ের সামাজিক দলিল হিসেবে' উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করা হলেও এটি নিতান্তই এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। সব চরিত্র ও ঘটনাই তাই একমুখী একদর্শী। শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীবৈষম্য ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মূলে বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত, ব্রিটিশরাজ্যের সৃষ্টি হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ, সকল সংগ্রামের জন্যে ত্যাগের প্রেরণা, নারীকে গৃহের বাইরে নিয়ে এসে মুক্ত সংগ্রামী করে তোলা ইত্যাকার সমস্ত চিন্তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *স্বাধীনতার স্বাদ*-এ একত্র করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে।

এই উপন্যাসটির কাঠামোও মানিক গড়েছেন এক রকম নতুন পথ ধরেই। পরবর্তী কালের নানা উপন্যাস, গল্প ইত্যাদিতে, বিশেষত চলচ্চিত্রে, এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা

গেলেও বাংলা উপন্যাসে ত্রিশ-চল্লিশের কালে এটির ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না। এক ক্রান্তিকালে বিপন্ন, সামাজিক বিপর্যয়ে অস্থির বিভিন্ন পেশা ও চিন্তার নানা নারীপুরুষকে এক ছাদের নিচে এনে তাদের পারস্পরিক আচরণ, চিন্তা, বোধ ইত্যাদির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটানো, লক্ষ করা এবং শেষে এক বিশেষ সমাজ কি রাজনৈতিক বিশ্বাসে তাদের বলীয়ান করে তোলা— এই মানিকের লক্ষ্য। পাঠযোগ্যতা কি পাঠতৃপ্তির কথা একবারও মনে আসে না তাঁর, পাঠককে তিনি মনে করেন তাঁরই ধারণায় দীক্ষিত, তাঁরই চিন্তার শরিক।

সাতচল্লিশের আগস্টে এসে উপন্যাসটি শেষ হলেও আগত স্বাধীনতা সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উচ্ছ্বাস নেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন বিশ্বাস 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হয়' এই উপন্যাসের হৃদয়ে আছে। স্পষ্টতই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ ভাগের বিপক্ষে ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশভাগের অসারতা, সেটি যে কারো জন্যেই মঙ্গলকর হয় নি, এবং উদ্বাস্তু সহস্র মানুষের শত ক্লেশ ও যন্ত্রণা তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় উঠে আসে।

'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর তেমন কোনো গুণান্বিত রচনা দেখা যায় না। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন এই দশ বছরে মানিক অন্তত আরো কুড়িটি উপন্যাস লিখলেও কোনো রচনাই তাঁর প্রথম পর্বের রচনার সমান গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে নি। যেমন, *ইতিকথার পরের কথা* উপন্যাসটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রচিত হলেও 'সাহিত্যমূল্যের বিচারে উপন্যাসটি অকিঞ্চিৎকর।' এক মানিকবেত্তার মন্তব্য। তাঁরই কথা : *আরোগ্য* এগারোটি অধ্যায়ে লেখা এবং এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে তাঁর চিন্তার অসংলগ্নতার সুস্পষ্ট ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। *তেইশ বছর আগে পরের* উপন্যাসটির আখ্যান নিতান্ত মামুলি ও শরৎচন্দ্র প্রভাবিত, *নাগপাশ* উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য— এ রকম নানা মন্তব্যও শোনা যায়। এমন কি *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাস সম্পর্কেও সমালোচক বলেন 'দক্ষিণ বাংলার নদীমাতৃক পরিমণ্ডলে পুষ্ট এই কাহিনীতে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির ধারা নিয়ে লেখক চিন্তা করেন নি। পড়ন্ত শ্রেণী-সংঘাত এই উপন্যাসেও ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও তা স্পষ্টভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। ...উপন্যাসটির গঠন দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, কতকগুলি খণ্ড চরিত্রের সমষ্টি বলে মনে হয়।' মানিক রচনা সম্ভার এর দ্বিতীয় পর্বের সৃষ্টির অনেক রচনা সম্পর্কেই এমন কথা বলা চলে।

তাই *স্বাধীনতার স্বাদ* যে আমার আগ্রহ মনোযোগ আর্কষণ করতে পারে নি তার *একটি গ্রহণ*যোগ্য কারণ খুঁজে পাই। ভাবি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিভুবনে এমন ঘটার কারণ কী? নানা মত আছে এ-বিষয়ে। দারিদ্র্য, আসক্তি ও অসুখ। এমন কথা বলেন মানিক গবেষককুল।

দারিদ্র্য-র ব্যাপারটি বোঝা যায়। কোনো নির্দিষ্ট, নিয়মিত উপার্জনমুখী কর্ম তাঁর ছিল না। কলম পেষা'র মজুর তিনি, সেটিই তাঁর জীবিকা যদিও আটাশ বছরে ঐ কালে উনচল্লিশটি উপন্যাস, আড়াই শতাধিক গল্প, একটি নাটক এবং কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার পারিশ্রমিক এমন কিছু তুচ্ছ হওয়ার কথা নয়— যদি জানা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনা বা ঐ জাতীয় কর্মের জন্যে সম্মানী চাইতে দ্বিধা করতেন না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন কি নানা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের কারণে কিছু প্রাপ্তিও তাঁর ঘটেছিল। তাঁর পিতা যখন নিজ বাসগৃহ বিক্রয় করে সর্বাপেক্ষা

অস্বচ্ছল পুত্রটির কাছে চলে আসেন তখন কি শূন্যহাতে এসেছিলেন? বাড়ির বিক্রয়লব্ধ সব অর্থই কি তিনি তাঁর অতি সচ্ছল, সাংসারিক অর্থে কৃতী, সন্তানদের দিয়ে এসেছিলেন? সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন, 'মানিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-বরণ করিয়াছিলেন।' 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস'-এর সম্পাদক হায়াৎ মামুদ লেখেন, "স্বেচ্ছায়, অর্থাৎ তাঁর যাপিত জীবন ছিল স্বনির্বাচিত। সংঘে বিশ্বাস এবং একটি বিশেষ রাজনীতিতে মনপ্রাণ-সমর্পণ তাঁর এই জীবনমথিত সারাৎসার। তিনি সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির;" তিনি ঠিকই লেখেন। তবুও কিছু কথা থাকেই। এক বিশেষ রাজনীতিতে মনপ্রাণ-সমর্পণ ও তজ্জনিত দারিদ্র্য বরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থির চিন্তার ফল? অন্য কোনো বহির্জাগতিক ঘটনাই কি সেখানে ছায়া ফেলে নি?

পানাসক্তি ও অসুস্থতা তাঁকে অতি দ্রুত জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে দিয়েছিল। শোনা যায়, অসুস্থতা প্রশমনের জন্য সুরাসক্ত হয়ে পড়েন এবং সেটিই কালে তাঁর চূড়ান্ত স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়। এমন কি এই নিষাদচক্র তাঁকে মনোবিকলনের পথেও নিয়ে যায়। সাহিত্য জগতে মহীরূহ এমন অনেক স্রষ্টা সম্বন্ধেই এমন কথা শোনা যায়। নিয়তিকে তাঁরা বশ করতে পারেন না। আমরা জানি, মহাকাব্যের নায়কের চরিত্রে এমন কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে যা তার বিনাশের কারণ হয় কালে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। শুধু স্পষ্ট বোঝা যায় না, কোন পথে সেটি এসেছিল— সে কি তাঁর জীবনের প্রতি আসক্তিহীনতার? মার্কসীয় চিন্তার জগতে আত্মবিসর্জনে? অশক্ত শরীর কোনো মতে তাঁকে দাঁড়াতে দেয় না বলে? না কি এমন অজ্ঞেয় চারিত্রিক দুর্বলতা যা তাঁকে কোনো মতে সুরাসক্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে না?

নানা মহাজন নানা বিশ্লেষণ করেন এই সব ছড়ানো সত্যের। উৎসাহী জ্ঞানপিপাসু সে-সব খুঁজে নিতে পারেন সামান্য ক্লেশের বিনিময়ে। এবং ঐ-রকম খোঁজাখুঁজি ও জ্ঞানসঞ্চয়ের কালে এমন কথাও কখনো তার মনে হতে পারে যে মার্কসীয় সমুদ্রে পরিপূর্ণ নিমজ্জন হয়তো সবটাই নিয়তির খেলা নয়? অন্য কোনো কার্যকারণ সম্পর্কও হয়তো তার পেছনে থাকতে পারে। হয়তো ঐ নিমজ্জনই নিয়তির সব কটি কূট চালকে একত্র করে তাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে যায়।

চার

মানিক-গবেষক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি' রচনায় মানিকের তিন শত্রু অসুখ, আসক্তি আর দারিদ্র্যকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। বিস্তৃত আলোচনা আছে এ বিষয়ে তাঁর রচনায়। বিজ্ঞ পাঠক সে-সবই জানেন। যেমন মানিকের সাহিত্যজীবনকে মোটামুটি দুই পর্বে ভাগ করার ব্যাপারটি— *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) থেকে *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) পর্যন্ত এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— অ-কমিউনিস্ট। আর *দর্পণ* (১৯৪৫) থেকে *মৃত্যুকাল* (১৯৫৬) পর্যন্ত আর এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— কমিউনিস্ট। তিনি লেখেন, "প্রায় সকলেই একমত যে প্রথম পর্বের রচনায় যে অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভার দীপ্তি ও শিল্পগত সার্থকতা লক্ষ করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের রচনায়, কমিউনিস্ট হওয়ার পর থেকে শেষ বারো বছরের রচনায় তার অনেকটাই অনুপস্থিত।" *স্বাধীনতার স্বাদ* এই দ্বিতীয় পর্বের গোড়ায় দেখে আমি পুনরায় নিজ ধারণাকে যাচাই করে নিতে পারি।

মানিকের তিন শত্রু অসুখ, আসক্তি আর দারিদ্র্য তাঁর জীবনে যে নিয়তির কাজ করে তার বিস্তৃত আলোচনা শেষে সিকদার জানান এই তিন শত্রুর কেউই মানিকের সাহিত্যিক অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। "স্ত্রী পুত্র কন্যার মতো অসুখ, আসক্তি ও অভাব যেন তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। তাদের অচ্ছেদ্য সাহচর্য বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্যই তিনি রচনা করেন নি— উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। হতে পারে সীমাবদ্ধ সময় ধরে যাদের ক্ষয়কারী সাহচর্যকে উপেক্ষা করা যায়, তারাই দীর্ঘকালীন সান্নিধ্যের সুযোগে করতে পারে স্বাস্থ্যের হানি, প্রতিভার বিনাশ। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক অকাল মৃত্যুর জন্য এরাই মাত্র দায়ী নয়। এই কথার শেষে প্রাবন্ধিক লেখেন : 'এই অকাল মৃত্যুর আর একটি কারণের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর জীবনের রাজনীতি ও সাহিত্যাদর্শের প্রতি যাঁরা অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভার অকাল মৃত্যুর জন্যে তাঁরা দায়ী করেন মানিকের ধর্মান্তরকে।'

সিকদার অবশ্য এই মতকে গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন, "আসলে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা বা কমিউনিস্ট দলে যোগদান থেকে মানিকের সাহিত্য জীবনের অবক্ষয় শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে আরো পরে।...কমিউনিজমের মতাদর্শে দীক্ষার মধ্যে নয়, একটা বিশেষ সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পদ্ধতিকৌশল ও পার্টির সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক ব্যবহারের মধ্যে হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।"

তাঁর প্রতিপাদ্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী চিন্তায় সর্বাশ্রিত হয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করলেও সঙ্গে সঙ্গেই পার্টির পক্ষ থেকে তাঁর রচনায় পার্টির প্রাণ প্রতিষ্ঠার কোনো আহ্বান আসে নি। সেটা আসে আরো পরে— ১৯৪৬-এর আগস্টে *স্টালিনীয়*-সাহিত্যনীতি বিধৃত হবার পরে। যদিও সেই নীতি নানা বিশ্লেষণ, আলোচনা, আত্মসমালোচনা ইত্যাদি পর্ব পার হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম পর্যন্ত পৌঁছুতে আরো কিছু দিন লাগে। ততদিনে *চিহ্ন* রচনা সমাপ্ত, এবং *স্বাধীনতার স্বাদ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে তিনি পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী রচনার গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলে অনুমান করা অযথার্থ মনে হয় না।

ছয়চল্লিশ-পরবর্তী কয়েক বছরে পার্টির সংস্কৃতিশাসন এমন চেহারা নেয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অতুলনীয় উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথা* কি *পদ্মানদীর মাঝি* রচনার জন্যেও নিন্দিত হন। কমিউনিস্ট সাহিত্যসৃষ্টির দিকপাল অসাহিত্যিক নানা সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানাভাবে আক্রমণ করে চলে এবং মানিক এই সব তর্ক-বিতর্কে অংশ নিয়ে নিজেকে পার্টির বিশ্বস্ত অনুসারী প্রমাণ করতে গিয়ে বরং আরো আক্রান্ত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত নিজস্ব সাহিত্য ভাবনা সঞ্জাত 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করে নেন। অনেক আগে শুরু হওয়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক অকালমৃত্যু সমাপ্ত হয়। তার কয়েক বছর পরেই, তাঁর জাগতিক মৃত্যুও।

অশ্রুকুমার সিকদার শেষে লেখেন : "দারিদ্র্য, আসক্তি, রোগ— এই তিন দুরন্ত শত্রুর সঙ্গে কোনো দিনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনাক্রমণচুক্তি হয় নি; এই তিন

শত্রুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই তাঁর প্রতিভা বারবার জয়ী হয়েছিল। শেষ জীবনে বয়োবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যভঙ্গের সুযোগে এই তিন শত্রু তাঁকে খানিকটা কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাস্ত হলেন, যাঁদের তিনি সহকর্মী ও সহযোদ্ধা বলে জেনেছিলেন তাঁদের প্রতিআক্রমণে জর্জরিত হয়ে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার এই দুই স্রোত নিয়ে আরও অনেক আলোচনা আছে। উৎসাহী পাঠক খুঁজে নিয়ে পড়তে পারেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর রচনার ছড়ানো ছিটানো আলোচনার মনোযোগী পাঠ সম্ভবত তাঁকে এই প্রশ্নটি করবে : মানিকের সময়ে প্রগতিবাদী, বামপন্থী সৃষ্টিশীল লেখক যাঁরা ছিলেন— বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক প্রমুখ যদি পার্টির আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও নিজ শিল্পস্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারেন নি কেন? সেটি কি মহাকাব্যের নায়কগুণান্বিত চরিত্রের এক মাত্র দুর্বলতা— নিষ্ঠাবান, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, বলা যাক, অন্ধ আনুগত্যই।

‘জননী’র ভাষা

তারিক মনজুর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননী* (মার্চ ১৯৩৫)। *দিবারাত্রির কাব্য* এর আগে রচিত হলেও, আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে– একটি গল্প থেকেই তা পূর্ণ উপন্যাসের অবয়ব পেয়েছে।[১] সুতরাং পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের পূর্বপরিকল্পনা থেকে *জননী*কেই প্রথম বলা যায়। ঔপন্যাসিক মানিকের ভাষাশৈলী বিচারের ক্ষেত্রে *জননী* তাই বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে সমগ্র মানিকের ভাষাগুণ বিচার বা তাঁর অপর কোনো উপন্যাসের সঙ্গে এর ভাষাবৈশিষ্ট্যের তুলনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। এখানে কেবল উদ্দেশ্য থাকবে– *জননী*র ভাষা-বয়ন কৌশল উপস্থাপন করা।

১

কাহিনীকে অগ্রসর করে নিতে ঔপন্যাসিক *জননী*কে দশটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন। পর্ব ১-এ জননী-রূপী শ্যামার প্রথম সন্তান জন্মের কথা রয়েছে। এ সন্তানটি ১২ দিন মাত্র বেঁচে ছিল এবং লেখক তা কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। পর্ব ২-এ দেখা যায়, দু'বছরের ব্যবধানে শ্যামার কোলে আবার ছেলে এসেছে। এই ছেলেকে নিয়েই দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী পরিব্যাপ্ত। পর্ব ৩ কয়েক বছর পরের ঘটনা : লেখক সচেতনভাবেই কাহিনীকে কয়েক বছর পরে নিয়ে গেছেন এবং পর্বের শুরুতেই লেখক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—

> শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড় খোকার দুবছর বয়সের সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তার তিন বছর পরে আর একটি ছেলে। নামকরণ হইয়াছে তিনজনেরই– বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমানবিহারী।[২]

পর্ব ৪-এর শুরুতে নাটকীয়ভাবে আগমন ঘটে মামার— এ সংসারে যে ছিল শ্যামার একমাত্র রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং শ্যামার বিয়ের পর একা থাকতে থাকতে মাথার কী এক ‘গোলমালে’ নিজের যা-কিছু ছিল ‘চুপিচুপি’ জলের দামে সমস্ত বিক্রি করে একদিন ‘উধাও’ হয়ে গিয়েছিল। পর্ব ৪ শেষ হয়েছে মেয়ে বকুলকে নিয়ে শ্যামার স্বামী শীতলের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে।

পর্ব ৫ স্বামী-ছাড়া শ্যামার কঠিন দিনগুলোর বর্ণনা। এই পর্ব শেষ হয়েছে শীতলের পুনরাগমন এবং তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। পর্ব ৬-এ শ্যামার জীবনসংগ্রামে অংশ নিয়েছে মামা তারাশঙ্কর। পর্ব ৭-এ জননী শ্যামা একরকম বাধ্য হয়ে কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে বনগাঁতে তার ননদের সংসারে আশ্রয় নেয়। এ পর্বের শেষে দেখা যায়, শীতল জেল থেকে ফিরে এসেছে, তবে সে ভয়ানকরকম অসুস্থ। এ পর্যায়ে পর্ব ৮-এ শ্যামা কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দেয়। মেয়ে বকুলের বিয়ে এ পর্বের মূল ঘটনা। পর্ব ৯-এর ঘটনা : বড় ছেলে বিধানের চাকরি এবং পর্ব ১০-এর ঘটনা : বিধানের বিয়ে।

জননীর এই সংক্ষিপ্ত ঘটনা-পরম্পরায় মনে হতে পারে, মানিকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট গতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মানিক কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্ণনা করেন না : তিনি বর্ণনা করে চলেন কোনো ঘটনার, একটি বিষয়ের, কোনো চরিত্রের, কিংবা পরিপার্শ্বের। এতে কাহিনী বিশেষ অগ্রসর হয় না। *জননীর* দীর্ঘ কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেখক তাই ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি পর্বান্তরে যাওয়ার আগে-পরে দু-চারটি বাক্যের ভেতর দিয়ে নতুন ঘটনাপ্রবাহে প্রবেশ করেন। এই আকস্মিক উল্লম্ফনের (jumping) কারণে *জননীর* পর্বগুলোর মধ্যে গতিময়তা এসেছে, সংযোগসাধিত হয়েছে এবং নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, এই গতি ও নাটকীয়তা পুরো পর্ব জুড়ে নয়; কেবল এক পর্বের অন্তে ও পরবর্তী পর্বের প্রারম্ভের সংযোগ-সময়ে।

২

চরিত্র যদি উপন্যাসে পাঠককে ধরে রাখার একটি অবলম্বন হয়, তবে জননীর শ্যামা তা করতে পেরেছে। উপন্যাসের পুরোটা জুড়েই তার সংগ্রাম চলেছে। অন্য সব চরিত্রও আবর্তিত হয়েছে শ্যামাকে ঘিরে। শ্যামা পরিশ্রমী, হিসেবি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন; তার মানসিক শক্তি বিস্ময়কর এবং সর্বোপরি সে একজন জননী। এই শেষের পরিচয়টিই মানিক বারবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। একই সঙ্গে স্বামী শীতলের সংসার-বিচ্ছিন্নতায় সে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সংসারের :

> ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মতো, জীবিকার উপায়ের মতো শুধু একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।[৩]

এভাবে সংসার সামাল দিতে গিয়ে শ্যামা স্বামীকে পাশে না পেলেও উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সে তিনজনকে অবলম্বন হিসেবে পায়।

প্রথম অবলম্বন হিসেবে আসে রাখাল– শ্যামার ননদ মন্দাকিনীর স্বামী :

> এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইত, জানিবার উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি।[৪]

সংসার-জীবনের শুরুতে রাখালের এটুকু ভূমিকা শ্যামার জন্য কম ছিল না। কিন্তু জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে– যখন স্বামী শীতলের জেল হয়ে গেল– শ্যামার জীবন-সংগ্রামের সঙ্গী হল তার মামা। যদিও লেখক জানিয়ে দেন : 'সেও আবার খাঁটি একটি রহস্য ধরাছোঁয়া দেয় না' (পৃ. ৫৫); কিন্তু প্রকৃত 'রহস্য' তৈরি করে মামা নয়, হারান ডাক্তার– শ্যামার জীবনের তৃতীয় অবলম্বন। রাখাল বা মামার রহস্য শেষতক উন্মোচিত হলেও হারানের রহস্যময়তা একরকম দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যায় :

> শ্যামার জীবনে রহস্যময় দুর্বোধ্য মানুষের পদার্পণ আরো ঘটিয়াছে বৈকি, গোড়ায় ছিল রাখাল, তারপর আসিয়াছে মামা তারাশঙ্কর, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না, একে একে তাদের রহস্যের আবরণ খসিয়া গিয়াছে, হারান শুধু চিরকাল যবনিকার আড়ালে রহিয়া গেল।[৫]

চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য তার আচার-আচরণ ও অভিব্যক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু *জননী*তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অতিরিক্ত কিছু বিবরণ দিয়ে যান। এরপর সেই বিবরণের সত্যতা প্রমাণের জন্য চরিত্রের আচার-আচরণ ও সংলাপ-বিনিময়ে অগ্রসর হন।

৩

সংলাপ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর পরিচয়ে এবং কাহিনী-সূত্র গ্রন্থনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে *জননী*র সংলাপও তা করে। এমনকি কখনো কখনো সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক ঘটে-যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিয়ে দেন আকস্মিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে :

> শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ, শঙ্কর। আমাদের বাড়ির দিকে কখনো যাও-টাও বাবা? হারান ডাক্তার ভাড়াটে এনে দিলেন, তার নামটাও জানি নে।'
>
> শঙ্কর বলে, 'ভাড়াটে কই, কেউ আসে নি তো? সদর দরজায় তালা বন্ধ।'
>
> শ্যামা হাসিল, 'তুমি জান না শঙ্কর-এক মাসের ওপর ভাড়াটে এসেছে, পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়েছে, ওদিকে তুমি যাও নি কখনো।'
>
> শঙ্কর বলে, 'না মাসিমা, আপনাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, কেউ নেই বাড়িতে। জানালা কপাট বন্ধ, সামনে বাড়ি ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে– আমি কদ্দিন দেখেছি।'[৬]

পুরো ব্যাপারটা শ্যামার কাছে কেবল আকস্মিক নয়, বিস্ময়কর এবং অভিভূত হওয়ার মতো। কেননা, হারান ডাক্তার তার কেউ নয়; এদিকে বাড়িতেও কোনো ভাড়াটিয়া ওঠেনি; অথচ শ্যামার দুর্দিনে ঠিকই মাসে মাসে পঁচিশ টাকা হিসেবে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে!

সংলাপের মধ্য দিয়ে *জননী*তে আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখক তা গ্রহণ করেননি। তবে অনিয়মিতভাবে হলেও কিছু শব্দের প্রয়োগ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার পাঠকের নজর কাড়ে :

— দাইমাগীও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ি হল? (পৃ. ৫)

— একটি মেয়ে বিইয়েই সন্ন্যেসিনী হয়ে গেলেন? (পৃ. ১১)

— ওদের হল ফর্সার গুষ্টি, তাদের মধ্যে ওনার রং সবচেয়ে মাজা (পৃ. ১১)

— ছেলেপিলের এমন জ্বরজ্বালা হয়, ভেব নি। (পৃ. ১৭)

সংলাপে আরও লক্ষ করা যাবে, নবজাতকের জন্য নতুন মা-হওয়া শ্যামার সতর্কতা : 'জল বেশি গরম নয় তো ঠাকুরঝি?' (পৃ. ৮)

কিংবা পুত্রতুল্য শঙ্করের জন্য শ্যামার আশীর্বাদ বচনটিও লক্ষযোগ্য : 'ষাট ষাট, বেঁচে থাক বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও। (পৃ. ৬৬)

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, মা শ্যামা ও ছেলে বিধানের কথোপকথনগুলো। বিধান দিনে দিনে বড় হয়েছে, তার সঙ্গে শ্যামার বাক্যালাপের ভঙ্গিটিও বদলেছে। অন্য সন্তানদের সঙ্গে শ্যামার সংলাপ ও সম্পর্ক এত নিবিড়ভাবে লেখক তৈরি করেননি। অবশ্য পর্ব ৯-এ এসে– বকুলের বিয়ের পর– মেয়ের সঙ্গে মায়ের আলাপচারিতায় পরিবর্তন এসেছে : বকুল যেন আরেকটি শ্যামা হয়ে উঠেছে। আকস্মিক এই পরিবর্তনের কারণও দর্শিয়েছেন ঔপন্যাসিক : 'শ্বশুরবাড়ির' লোকেরা গড়িয়া পিটিয়া

বকুলকে মানুষ করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। (পৃ. ৮৮) শ্বশুরবাড়িতে কর্ত্রী হয়ে ওঠা বকুল এ-বাড়িতেও কর্তৃত্ব ফলায়। বলে,

'কি করছ মা তুমি? চাকরি বাকরি করছে, এবার দাদার বিয়ে দিয়ে দাও? শামুর সঙ্গে দাদার অত মাখামাখি দেখে ভয়ও কি হয় না তোমার?'

'কিসের মাখামাখি লো?' শ্যামা সভয়ে বলে।

'নয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, ও কেন রোজ পড়া জানতে আসবে দাদার কাছে? পড়া জানবার দরকার হয় মাস্টার রাখুক না। না মা, দাদার তুমি বিয়ে দাও এবার।'[৭]

উক্তির মাধ্যমে ব্যঙ্গরসাত্মক বাক্য তৈরিতেও মানিকের জুড়ি নেই : "স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাউডার মাখাইতে দেয় না। বলে, 'তুমি কিচ্ছু জান না মা, পাউডার দেখলে ওরা সবাই হাসে, স্যারসুদ্ধ। কি বলে জান?– বলে চুন তো মেখেই এসেছিস, এবার একটু কালি মাখ, বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।'" (পৃ. ৮৮)

স্রেফ হাস্যরস তৈরির জন্যও লেখক সংলাপের আশ্রয় নেন :

শীতল কোনোদিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পুরুষমানুষ এবং বাড়ির কর্তা, এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মুখে বলে, 'এখানে জানালা হবে বুঝি, দেয়ালের যেখানে ফাঁক রাখছ?'

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে, 'জানালা হবে না তো কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে?'[৮]

জীবনের ব্যস্ততায় যে-শ্যামা কথার চেয়ে কাজেই বেশি মনোযোগী থেকেছে, কথা বলার লোক পেলে সে-ও যে কম যায় না, লেখক তার প্রমাণ রেখেছেন পর্ব ৪-এ একটি দীর্ঘ সংলাপে :

শ্যামা বলে, ওমনি মানুষ মামা, ওমনি গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। কি এল, কি গেল, কোথায় কি হচ্ছে, কিচ্ছু তাকিয়ে দেখে না, খেয়াল নিয়েই আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে– না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওয়া ! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম, দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই– যে মানুষ ওর ভগ্নীপতি ও টাকা ফিরে পাওয়ার আশা নিমাই— কি আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টাকা ছিল, কি কষ্টে যে টাকা ক'টা জমিয়েছিলাম মামা, ভাবলে গা এলিয়ে আসে– দিলাম একদিন সবগুলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শুধে এস, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সাদ্দিন পরে। ধারের মনে ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সাদ্দিন ফুর্তি করে এলেন। সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা, কোনোদিকে উৎসাহ পাইনে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে করি আমি, কি দাম তার, কেন মিথ্যে মরছি খেটে খেটে– সুখ কোথা অদেষ্টে?[৯]

এখানে শ্যামার পুঞ্জীভূত বেদনা প্রকাশের পথ পেয়েছে। পুরো উপন্যাসে এ রকম সুযোগ সে আর পায়নি। দীর্ঘ সংলাপ *জননী*তে আর মাত্র একটি আছে : সেটি নিঃসৃত হয়েছে শীতলের মুখ থেকে– পর্ব ৪-এই– শ্যামার ওই সংলাপের অনতিকাল পরে। শীতল সে-সময় ছিল উত্তেজিত এবং এই অনর্গল বাক্‌স্ফুরণ তার মানসিক প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দীর্ঘ সংলাপ কদাচ বিনিময় হয়; লেখক সচেতন থেকেই তাই সংলাপে ছোট ছোট বাক্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

৪

কুসংস্কার জীবনকে কীভাবে ঘিরে রাখে, *জননী*তে তার নিদর্শন রয়েছে। এগুলো প্রায়ই প্রথা বা রীতিতে পরিণত হয়। শ্যামার মা হওয়াকে কেন্দ্র করেই এসবের অবতারণা ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন ঔপন্যাসিক :

ক. ঘরের একদিকে বুড়ি দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবে, জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গা-নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গা-নামের রক্ষকবচ লিখিয়া রাখিবে, আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ! এমনি কত তাহার প্রতিবিধান। (পৃ. ৬)

খ. [নবজাতকের] স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। (পৃ. ৮)

গ. [প্রথম সন্তান অল্প দিনের মাথায় মারা যাওয়ায়] নৈসর্গিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটাপাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পূজা। মাদুলিগুলির মধ্যে তিনটি বড় দুর্লভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটি প্রসাদী ফুল, একটিতে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ভস্ম ও অপরটিতে স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে। শ্যামার নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি করিয়া মাদুলিগুলি ছেলের কপালে ছোঁয়ায়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্য সত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। (পৃ. ৯)

এই ছেলের জন্মের পরপরই শীতল কমল প্রেসের চাকরি পায়। এর সঙ্গে 'পয়মন্তে'র যোগ খুঁজে পায় সে। আবার শ্যামার শেষ কন্যাটি জন্মান্ধ হয়ে জন্ম নেয়। এর পিছনে তার দৃষ্টিভঙ্গিটি লক্ষ করুন :

> জন্মান্ধ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসলি খুকি! দৃষ্টি তোর হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগাঁয় একদিন সন্ধ্যার সময় কলাবাগানে ছায়ার মতো কি যেন দেখিয়া তার গা ছমছম করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখিবার সময় আর একদিন পাগলা হাবুর বুড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাতসারে আরো কবে কি ঘটিয়াছিল কে জানে![১০]

৫

মনঃসমীক্ষা এবং মন-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ *জননী*র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে সবকিছু খোলসা করে বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। যেমন, মন্দার স্বামী রাখাল দ্বিতীয় বিয়ে করলে শ্যামার মধ্যে এই উপলব্ধি আসে : "মন্দা জননী বলিয়াই হয়তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল, স্ত্রী বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল, হয়তো তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?" (পৃ. ১৫) শ্যামা এই উপলব্ধি থেকে জননীর অতিরিক্ত স্ত্রী-পরিচয় দিতে চেয়েছিল শীতলের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এই শিক্ষা হয়েছে– 'স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুটিবে গালাগালি।' (পৃ.১৫)

পর্ব ২ থেকে পর্ব ৭-এ নিয়ে গিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠকদের দেখিয়ে দেন, রাখালের দ্বিতীয় স্ত্রী সুপ্রভাকে নিয়ে মন্দা বেশ ভালোই আছে; এমনকি 'সুপ্রভার শয্যা রচনা করিয়া দেয়, সতীনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালোবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।' (পৃ. ৬২) সতীনের সংসারে এই কলহ-বিবাদ মান-অভিমান না-থাকার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন লেখক : 'মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধূ। এই মূল্য দিয়া সে হইয়াছে গৃহিণী!' (পৃ. ৬২)

মনঃসমীক্ষণ কখনো মনস্তত্ত্বে পর্যবসিত হয় : 'একটা অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে [শীতল] মা ও ছেলের আলাপ শোনে।' (পৃ. ২৩) মা ও ছেলের এই সম্পর্ক এবং পিতার বিচ্ছিন্নতা লেখক কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। বিপরীতভাবে, বাবা-মেয়ের সম্পর্ক এবং মায়ের বিচ্ছিন্নতাও লেখক দেখিয়েছেন– কিন্তু এবার একটা কাহিনী তৈরি করে নিয়ে। পর্ব ৪-এর শেষে দেখা যায়, মেয়ে বকুল পায়েস একা খাবে না, সে তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে। এখান থেকে সৃষ্ট ঘটনার পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো লক্ষ করা যাক :

— শ্যামা গুড়ের পায়েস করেছে; সবাই 'পরিতোষ' করে খেল।

— বকুল একা খাবে না; বাবার জন্য অপেক্ষা।

— শ্যামা জিদ করে বকুলকে চড় মারল; মেয়ের মুখেও 'এক খাবলা' পায়েস গুঁজে দিতে গেল, সে দাঁত কামড়িয়ে রইল।

— বকুলের জবানি-মতো শীতল ঠিক দুটোর সময় ফিরে এল!

— বাপ-বেটিতে গোপন আলাপ এবং পায়েস না খেয়ে উভয়ের বেরিয়ে যাওয়া।

— রাত প্রায় নয়টার সময় দুজনের ফিরে আসা : বকুলের গায়ে নতুন জামা, দু হাত বোঝাই খেলনা।

পরদিন শীতল ছড়ি দিয়ে মারাত্মকভাবে শ্যামাকে মারল এবং মার শেষে বলল, 'বজ্জাত মাগী, তোকে আমি কী শাস্তি দিই দেখ্। এই গেল এক নম্বর। দু নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।' (পৃ. ৩৯) শীতলের এই উন্মত্ত আচরণের পিছনে কারণ সামান্য : শ্যামা শীতলকে না জানিয়ে বকুলকে বনগাঁয়ে পাঠিয়েছে। কেবল বনগাঁয়ে পাঠানোর ঘটনায় শীতলের এত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কারণ নেই; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আগের দিনের পায়েস খাওয়ার ঘটনা। এই দুই দিনের ঘটনা থেকে শীতল সত্য সত্য জন্মে না-ভোলার মতো ঘটনার জন্ম দেয় : বকুলকে সঙ্গে করে সে পালিয়ে যায়।

বাস্তবিকই মানিকের মন-পর্যবেক্ষণের এবং তা উপস্থাপনের কৌশল জানা ছিল। তাই স্ত্রী শ্যামাকে চড় মারার পরও– অন্য আর এক পর্বে, অন্য আর এক ঘটনার সূত্র ধরে– শীতলের অনুভূতিটা তিনি নিখুঁতভাবে আঁকতে পেরেছেন : 'অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল, তারপর সে-ই যেন মার খাইয়াছে এমনি মুখ করিয়া শ্যামার আশপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল!' (পৃ. ২৫)

স্বামী-স্ত্রী ও পুত্রের আন্তঃসম্পর্কের উপস্থাপনাতেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দেন : 'রঙিন কাপড়খানা পরিয়া শ্যামা ছাদে যায়। বড় লজ্জা করে শ্যামার– শীতলকে নয়, বিধানকে।" (পৃ. ৩০) কিন্তু স্বামীর সঙ্গে শ্যামার এরকম একান্ত সময় নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। এমনকি শীতল জেলে গেলে দীর্ঘসময় তাকে একাকী থাকতে হয়েছে। তখন তার দেহে জ্বালা এবং মনে ঈর্ষা যে জন্মাত না, তা নয়। নিচতলার ভাড়াটিয়া কনকলতা ও

তার স্বামীর আচরণ তার মনকে দ্রবীভূত করে ফেলত :'চৌবাচ্চার ধারে ওরা যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত, কনকের স্বামী যাখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া, আবার বুকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিক পরে শুকনো কাপড় পরিয়া আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত, তখন শ্যামার— কে জানে কি হইত শ্যামার, চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মুখের হাসিতে গড়াইয়া আসিত।" (পৃ.৬০)

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে শ্যামার একাকিত্বের বেদনা ও শূন্যতার হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার-সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত শ্যামাকে আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, সে-ও জৈবিক তাড়নামুক্ত নয়। স্বামী-সঙ্গহীন শ্যামার অনুভূতির দুর্দান্ত বর্ণনা পাওয়া যায় পর্ব ৭- এ:

> বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার স্বামীর সঙ্গে ফিসফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকায় চাকরি করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিসফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই। আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।[১১]

শ্যামার মানসিক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি, এখানে, পরিবেশ-চিত্রণের বর্ণনা-অংশটিও বিশেষভাবে দেখার মতো। তবে তুলির আঁচড়ে পরিবেশকে দৃশ্যযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে মানিকের প্রয়াস— যত নিপুণই হোক না— *জননীতে* দুর্লক্ষ্য।

৬

ভাষা মানিকের উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট উপাদান। প্রচুর উপমা পাওয়া যায় *জননীতে*। এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখক প্রায়শই 'মতো' শব্দটি যোগ করে দিয়েছেন:

সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারি থাকার মতো চলনসই [জীবন] (৪), শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মতো (৪), বেদানার জমানো রসের মতো [*ঠোঁট*] (৫), পুলিশের মতো [নবজাতককে সতর্ক পাহারা দেয় শ্যামা] (১৩), চোরের মতো [সেই নবজাতককে তুলে নেয় শীতল] (১৩), জেলে না গিয়াও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় মানুষের কয়েদির মতো [স্বভাব (২৪), বাঘিনীর মতো (২৫), লোহার মতো [শরীর] (৩১), বাউল সন্ন্যাসীর মতো [ঘুরে বেড়ানো] (৩৪), স্বাধীনতাবিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মতো (৩৪), কলের [যন্ত্রের] মতো (৩৪), মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মতো (৩৬), মেঘের মতো অন্ধকার [মুখ] (৩৭), পুতুলের মতো (৬২) ইত্যাদি।

চিত্রকল্পের ব্যবহারও ঘটেছে পরিমিতভাবে :

ক. বড় বড় কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইয়া আসিতে দেখিতে পায়। (পৃ.৯৬)

খ. আর একটা সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মুখে, আলো নিভিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রমেই চালক মেয়েটা ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেলে। (পৃ.৯৮)

গ. বাহিরে দুরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। (পৃ. ৯৯)

ঘ. মৃত্যু কিন্তু দুটি একটি অঙ্গ গ্রাস করিয়া, সর্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শুষিয়া তৃপ্ত হইয়া আছে, হঠাৎ করে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনো কেহ তাহা বলিতে পারে না।(পৃ. ৯৯)

বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ ঘটেছে যথেষ্ট পরিমাণে :
চোখের মণি (১০), পুতুলনাচ নাচা (১১), আকাশ-পাতাল [পার্থক্য] (১১,৮০), সোনার চামচ মুখে বড় হওয়া (১১), উপরি আয় (২১), গলগ্রহ (২৩), চালচুলো (২৪), সুদে-আসলে (৩২), ফোঁপরদালালি (৩৭), বিনামেঘে বজ্রাঘাত (৪২), আকাশের চাঁদ (৫৪), মাটির মানুষ (৬২), রক্ত জল করা [টাকা] (৬৪), ছা পোষা (৭৯), সাতেও নেই পাঁচেও নেই (৮১), মাছিমারা কেরানি (৮৭), তেলে-বেগুনে [জ্বলা] (৯৯) ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দের বারংবার প্রয়োগ মানিকের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। *জননী*তে প্রচুর পরিমাণে শব্দ-দ্বিরুক্তির প্রয়োগ যে-কোনো পাঠকমাত্রেরই নজরে পড়বে। অনেকগুলো দ্বিরুক্তি তো দশবারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে নজরকাড়ার মতো কিছু নমুনা দেয়া হল :

সত্যি সত্যি, বাড়াবাড়ি, গুনগুনানো, লম্বা লম্বা, বকর বকর, পীড়াপীড়ি, টিমটিমে, উসখুস, গড়গড়, বিড়বিড়, ক্রমে ক্রমে, ভাঙা ভাঙা, নড়বড়ে, মোটা মোটা, ফোলা ফোলা, প্রশ্নে প্রশ্নে, সকাল সকাল, খুঁত খুঁত, মিষ্টি মিষ্টি, প্রথম প্রথম, বড় বড়, অল্প অল্প, উদাস উদাস, খান খান, টানাটানি, মিনিটে মিনিটে, খুকুর খুকুর [কাশি], তামাক-টামাক, ছুটিছাটা, গা-ছাড়া গা-ছাড়া, উড়ু উড়ু, আথালিপাথালি, মৃদু মৃদু, ছেড়েছুড়ে, ছাড়া ছাড়া [আলাপ], টায় টায়, জানালায় জানালায়, হাউ হাউ, থাপরে-থুপরে, টিপ টিপ, ফ্যাল ফ্যাল, প্যান প্যান, টাবু টুবু ইত্যাদি।

ক্রিয়া-দ্বিরুক্তিরও বহুল ব্যবহার লক্ষণীয় :
কাঁদিতে কাঁদিতে, হতে হতে, বলিতে বলিতে, ভাবিয়া ভাবিয়া, বাঁধিয়া ছাঁদিয়া, চিবাইতে চিবাইতে, থাকিতে থাকিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, টানিতে টানিতে, মুছিতে মুছিতে, নাড়াচাড়া, বাঁধিতে বাঁধিতে, ভাবিতে ভাবিতে, ঝুলিতে ঝুলিতে, পড়িয়া পড়িয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ডাকলে ডুকলে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস-সাধিত এবং জোড়া শব্দও কম নয় :
জীবন-মৃত্যু/জীবনমরণ, দিবারাত্রি, কারণে-অকারণে, বিপদে-আপদে, চাল-চলন, হাত-পা, স্বামী-স্ত্রী, ভয়ে-ভাবনায়, সুখ-দুঃখ, আজকাল, ছেলেমেয়ে, আবোল-তাবোল, স্থানে অস্থানে, আমোদ-আহ্লাদ, রাগে-দুঃখে, হাসি গল্পে, কাপড় জামা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, হাসি-তামাশা, অসুখ বিসুখ/অসুখে-বিসুখে, বাপ-ব্যাটা, পথে-ঘাটে, ভদ্র-অভদ্র, দেনা-পাওনা, জল্পনা-কল্পনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঠিক-ঠিকানা ইত্যাদি।

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন কিছু শব্দ পাওয়া যায় :
রেষারেষি, হাসাহাসি, রাগারাগি, গালাগালি, মারামারি, চোখাচোখি, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি।

জোড়া শব্দ তৈরির জন্য লেখক কখনও বা বিশেষ্য থেকে বিশেষণ বা ক্রিয়া বানিয়ে সংযোজিত করেছেন : বিষে বিষাক্ত (বিশেষ্য+বিশেষণ), ফল ফলিল (বিশেষ্য+ক্রিয়া), পাতা পাতিয়া (বিশেষ+ক্রিয়া) ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ খুব বেশি নেই; তবে বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো কিছু শব্দ :
হিস্টিরিয়া, বাথ, সেকেন্ড ক্লাস, পোস্টকার্ড, হ্যাফপ্যান্ট, শার্ট, স্কুল, ক্লাসমাস্টার, সাবইন্সপেক্টর, মার্চেন্ট ইত্যাদি।

একই শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে বাক্যের আবেদন পাঠকের কাছে অনেক সময় বেড়ে গেছে :

ক. আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে এই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখি দুটির জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন। (পৃ. ৮৯)

খ. একটা কুকুরও কুকুরের মতো পোষ মানিলে মানুষের তাতে কত গর্ব কত আনন্দ, এতো একটা মানুষ। (পৃ. ৯৪)

গ. বড় সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রং তেমনি নিখুঁত মুখ চোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। (পৃ.৯৪)

ছন্দোময় বাক্যও কখনো কখনো চোখে ধরা পড়ে :

ক. শীতের হ্রস্ব দিনগুলি শ্যামার কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রাত্রিগুলি হইয়াছে অন্তহীন। (পৃ. ৪৫)

খ. কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। (পৃ. ৯৯)

গ. মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। (পৃ. ৯৯)

ঘুম পাড়ানো ছড়াও আছে একটি দ্বিতীয় পর্বে। শ্যামা তার কচি খোকাকে বুকের কাছে ধরে রেখে, নিজে সামনে পিছনে দুলে দুলে, মৃদু গুনগুনানো সুরে এই ছড়াটি কাটে :

"আয়রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরিতে যাই, মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই।" (পৃ. ১৩)

সুভাষিত উক্তিও প্রয়োগ করেছেন স্থানে স্থানে :

ক. মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙিয়া পড়িবে ! (পৃ. ৯)

খ. জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সে-ই তো ডাক্তার (পৃ. ৫৫)

গ. জীবন তো জুয়াখেলা (পৃ. ৫৫)

ঘ. ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসির জল একদিন শেষ হইয়া যায়। (পৃ. ৭৮)

ব্যঙ্গরসাত্মক বাক্য তৈরিতেও মানিক যে পটু, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এসব নমুনায় :

ক. মন্দার পান হইতে চুনাটি শ্যামা কখনো খসাইতনা বটে– পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না– (পৃ. ৩)

খ. ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলের মুখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল, 'যমজ নাকি, এ্যাঁ?'
নেশার সময় মাঝে মাঝে শীতলের চোখের সামনে একটা জিনিস দুটা হইয়া যাইত। (পৃ. ৭)

গ. দিন সাতেক পরে মন্দার চিঠি আসিল, অশ্রুসজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বুঝি ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িত। (পৃ. ৪৪)

৭.

এবার *জননী*তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা-বয়নের মূল প্রবণতাগুলো লক্ষ করা যাক। প্রথমত, দীর্ঘ বয়ানের ধৈর্য তাঁর পুরোদস্তুর রয়েছে। যেমন, পর্ব ১-এর পুরোটাই শ্যামার মা হবার বর্ণনা। অন্য পর্বগুলোতেও এই লক্ষণটি প্রধান হয়ে উঠেছে : লেখক তাঁর ভাষাকে শ্লথ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যান; এতে ভাষার বুনন শিথিল হয়ে যায় না। এ ধরনের বাক্যজালে পাঠকের বাঁধা পড়ে যাওয়ার মধ্যে লেখকের শক্তিমত্তা নিহিত। মানিকের ভাষাভঙ্গিতে সেই শক্তি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাহিনী বা ঘটনাকে তিনি আগে উল্লেখ করে নেন, পরে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। ফলে পাঠকের কাছে *জননী*র কাহিনীকে পর্বান্তরে যাওয়ার আগে-পরে নাটকীয় বলে বোধ হয়। তৃতীয়ত, চরিত্রের বর্ণনার চাইতে তিনি চরিত্রের মন-পর্যবেক্ষণেই অধিকতর মনোযোগী। ফলে ঘটনা সংঘটনের বা সংলাপ প্রক্ষেপণের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে যা ধরা পড়তে পারত, তিনি নিজের লেখনীতেই তা স্পষ্ট করেন। মানিকের ভাষার চতুর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি লক্ষণ হয়ে উঠেছে– বিপুল পরিমাণ দ্বিরুক্ত ও জোড়া শব্দের ব্যবহার। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর ভাষা নির্ভার ও গতিময় হয়েছে। উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনীকে ধরে রাখার জন্য যে মধুর, তির্যক ও ব্যঙ্গরসাত্মক বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল, লেখক তাঁরও যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

*জননী*র কাহিনীতে যতুটুকু না অভিনবত্ব, তার চাইতে বেশি চিত্তাকর্ষক মানিকের গল্প বলার কৌশল এবং তাঁর ভাষা। প্রথম (প্রকাশিত) উপন্যাসেই তিনি ভাষার যে লক্ষণ নিয়ে হাজির হয়েছেন, কালক্রমে সেই ভাষাগুণই তাঁকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকে পরিণত করেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সজনীকান্ত দাস বলেন : "[...] মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি [অর্থাৎ 'দিবারত্রির কাব্য'] উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটি উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিনে'র উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'তে গড়াইল এবং আরো দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি'– 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল।"
দ্র. হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ৭৪৪
২. 'জননী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, ১৯৯৫, পৃ. ১৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৭০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

বাংলাদেশে মানিক-চর্চা

তাশরিক-ই-হাবিব

ভূমিকা

বাংলা বাস্তববাদী কথাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাতিস্বিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। জীবন সম্পর্কে নির্মোহ, নিরাসক্ত ও সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, অবিরাম অনুসন্ধিৎসা, পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে লব্ধ সংবেদনশীল অভিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের স্বভাবজাত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাসুলভ মনোভঙ্গির অকৃত্রিম শিল্পবিন্যাস তাঁর কথাসাহিত্যে। সৃষ্টিশীলতার অন্যতম শর্ত অর্থাৎ সচেতন কালজ্ঞান-সমকালীন সমাজজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার পরিশীলিত গ্রন্থনার সমবায়ে তিনি অর্জন করেছেন কালজয়ী সাহিত্যিকের উচ্চাসন। বাংলা কথাসাহিত্যে সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই অন্যতম লেখক, জীবনোপলব্ধি ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মানদণ্ডে যাঁর প্রতিটি রচনাই অন্যগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) পর তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে যে জগৎ নির্মাণ করেছিলেন, সে অবস্থানে তিনি এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথে যাত্রার পরিবর্তে জীবনের রুক্ষ-বন্ধুর পথ-পরিক্রমায় ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানিক আত্মোপলব্ধির নির্যাস ও বৃহত্তর সমাজসত্যকে করেছিলেন সাহিত্য সৃষ্টির অবলম্বন। ভাবের তন্ময় ভুবনে নয়, বরং মাটির পৃথিবীর রক্ত-মাংসের নিরন্ন মানুষের কঠোর জীবনবাস্তবতা ও অস্তিত্বের সংগ্রামে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হওয়ার নিষ্ঠুর উপলব্ধিই তাঁর কথাসাহিত্যিক হওয়ার মৌল প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের যৌক্তিক বিবেচনা :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি; বিশ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি; বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়; বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে, দূরে সরে যেতে হয়নি; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয়নি অতীতের কোন নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে; বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পীমানসের ক্রমবিভাজিত স্তরবিন্যাসের সতর্ক পর্যবেক্ষণে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই প্রতীয়মান হয়। জীবনের প্রতি সুনিবিড় আগ্রহ, সতর্ক অভিনিবেশ ও সদাজাগ্রত চেতনালোকে পুঞ্জীভূত সংবেদনারাশির মিথস্ক্রিয়ায় তিনি যে শিল্পসত্য উচ্চারণ করেন, তা প্রকৃত অর্থেই বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মানসের আত্মোপলব্ধি ও আত্মানুসন্ধানের বিশ্বস্ত শব্দচিত্র।

বাংলা সাহিত্যে মানিকচর্চার সূত্রপাত ঘটে কলকাতায়। জীবদ্দশাতেই তাঁর কথাসাহিত্য সাহিত্যানুরাগী পাঠককে বিপুলভাবে আকৃষ্ট-আলোড়িত করতে সক্ষম হয়। সে কারণেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের অসামান্য আবেদন শুধু কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সম্প্রসারিত হয়েছে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশেও। এখানে পঞ্চাশের দশকে রণেশ দাশগুপ্ত মানিকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। তবে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মানিকসাহিত্য নতুনভাবে বিবেচিত ও মূল্যায়িত হতে থাকে বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংকলন ও গবেষণা-সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে আমরা প্রথম পর্যায়ে মানিক বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধ, অতঃপর তাঁর সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থ, পরিশেষে মানিকসাহিত্য-সম্পাদনা সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হব।

১. প্রবন্ধ সংকলন

১.১ পূর্ণাঙ্গ সংকলন

বাংলাদেশে মানিকচর্চার চারিত্র্য নির্ধারণে মানিক সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলনগুলোই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে মানিকচর্চার ক্ষেত্রে গতিশীলতার সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে। পাকিস্তান আমলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বামপন্থী প্রগতিশীল সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচনাপূর্বক তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে সরকারের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় মানিকের সাহিত্যানুরাগী পাঠকের নিকট অবিদিত নয়।[২]

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৭৫) শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনটি। সম্পাদক জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে মানিকসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার অভাববোধ থেকে এ সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়। গ্রন্থভুক্ত তেরটি প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর জীবন ও গ্রন্থপঞ্জিবিষয়ক একটি ও তাঁর সাহিত্যকর্মবিষয়ক অবশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে তাঁকে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওই সংকলনে মানিক যত না সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার চেয়ে বহুলাংশেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী ও বুদ্ধিজীবীমানসের মানিককেন্দ্রিক ভাবনাসমূহের প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রন্থান্তর্গত একটি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের লেখকের। এ সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ আবুল ফজল রচিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এটি সাহিত্য বিবেচনায় তেমন শিল্পোত্তীর্ণ নয়। তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে চট্টগ্রাম বেতার থেকে পঠিত কথিকা হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সরদার ফজলুল করিমের 'চেতনায় অনন্য শিল্পী' প্রবন্ধটিতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে মানিককে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'পুতুল নাচ' ও 'পদ্মানদী' প্রবন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি-শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানিকের ভাববাদী ও রোম্যান্টিক চেতনা প্রত্যাখ্যান করে নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিকসুলভ বাস্তববাদী জীবনভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণে আগ্রহী। মাহমুদ শাহ কোরেশীর 'অহিংসা : অস্তিত্বের সমস্যা' প্রবন্ধে মানিক-সমালোচকদের পূর্বোক্ত ধারণাকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত উপন্যাসকে বিবেচনার সচেতন ও যৌক্তিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। 'উত্তরকালের গল্প' প্রবন্ধে বশীর আল হেলাল মানিকের উত্তরপর্বে রচিত গল্পসমূহের চারিত্র্য নির্দেশ করবেন, এমনটাই ছিল পাঠকের প্রত্যাশা। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি জানিয়েছেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণের তেমন চেষ্টা আমি এখানে করছি না।[৩]

আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি' প্রবন্ধে লেখকের বিবেচনা যথেষ্ট পরিণত, পক্ষপাতহীন, বিষয়নিষ্ঠ। এ উপন্যাসের প্রতিটি শিল্পউপকরণের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্বানুমানের পরিবর্তে তথ্য ও যুক্তির কষ্টিপাথরে নিজ সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করতে উৎসাহী। এমনকি পদ্মানদীকে অবলম্বনপূর্বক বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের প্রাতিস্বিকতা নির্দেশের ক্ষেত্রেও তাঁর পরিশীলিত মনন ও বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনার পরিচয় প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত হল : গীতিকবির সংবেদনশীল রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যেখানে রচনা করে মুহূর্তের বৃত্তান্ত; সেখানে মানিকের নির্মোহ-ভাবাবেগশূন্য অন্তর্দৃষ্টি এ উপন্যাস পাঠের পর পাঠকমনে জাগিয়ে তোলে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা ও জীবনের সুবিস্তৃত আহ্বান। তবে এ প্রবন্ধের একটি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা যায় না। তিনি লিখেছেন : 'প্রথম বিশ পৃষ্ঠায় কোনো উপমা ব্যবহৃত হয়নি।... আরো বিশ পৃষ্ঠা পরে একচল্লিশতম পৃষ্ঠায় দেখি দ্বিতীয় উপমার আবির্ভাব।'[৪] কিন্তু *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমরা একাধিক উপমার ব্যবহার লক্ষ করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'শব্দ-মদের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি এ সংকলনের একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। মানিকচর্চার একটি নতুন দিক নির্দেশিত হয়েছে এ প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মানিকের কবিসত্তা আবিষ্কারে অনুধ্যানী। লেখকের আলোচনা যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন। বিষয়ের আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণে তিনি সর্বদা মনোযোগী, যুক্তি ও তথ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁর আলোচনা যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি পরিশীলিত।

গ্রন্থটির ২০০১ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে নতুনভাবে বাংলাদেশী লেখকদের চারটি ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের তেরটি প্রবন্ধ সংযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে স্বরোচিষ সরকারের 'মানিকের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র' প্রবন্ধে লেখক মানিকের উপন্যাস ও গল্পে সৃষ্ট নিম্নশ্রেণীর চরিত্রসমূহের স্বরূপ নির্ণয়ের পাশাপাশি এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টির পেছনে সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধানে যথাসম্ভব তথ্য ও যুক্তি আশ্রয়ী। তবে কখনো কখনো একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি প্রবন্ধটির দুর্বলতার পরিচায়কও বটে। সৈয়দ আজিজুল হকের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস' প্রবন্ধের বিশিষ্টতা হল, তিনি সূক্ষ্ম ও পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে মানিকের বিভিন্ন উপন্যাসে প্রতিপাদ্য চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক ও রণোন্মত্ত রূপের সামগ্রিকতা নিরীক্ষণে অনুসন্ধিৎসু। বিস্তৃত পরিসরে নয়টি পর্বে বিন্যস্ত আলোচনা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানিকের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত। শুধু মানিক-সাহিত্যের মূল্যায়ন নয়, বরং কখনো কখনো তিনি মানিকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষ সমালোচকও।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে* (১৯৮৭) শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলন মার্কসীয় চেতনায় স্থিত মানিককে আবিষ্কারের সচেতন ও সচেষ্ট প্রয়াস। গ্রন্থ-অন্তর্গত সাতটি প্রবন্ধই রাজনীতিসচেতন সাহিত্যিক মানিকের সাহিত্যভাবনা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান, তাঁর কথাসাহিত্যে উপজীব্য রাজনৈতিক আদর্শ ও সচেতনতা প্রভৃতি ভাবনার অন্বেষণে যুক্তি ও বিশ্লেষণের পারম্পর্যে সুবিন্যস্ত। বক্তব্যকে যথাযথভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে লেখকের সচেতনতা ও একনিষ্ঠা এ গ্রন্থে লক্ষণীয়। গ্রন্থটির 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মানিকের শিল্পীসত্তার অন্তর্গত মেজাজ ও মনোবীজ শনাক্তকরণে সচেষ্ট।

রাজনীতি ও সাহিত্য যে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তারই দুটি সম্পূরক ক্ষেত্র, সে প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ :

> সাহিত্য হচ্ছে কমিটমেন্ট এবং সাহিত্যিক কমিটেড। সেজন্য তাঁর নির্মম উচ্চারণ : লেখক কলমপেষা মজুর। এই মজুর শোষিত, সেজন্য সে এই ব্যবস্থার বিরোধী। এই উচ্চারণের মধ্য-দিয়ে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন জনসাধারণ এবং নির্যাতিত শ্রেণীর সঙ্গে এবং এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অস্বীকার করেছেন ভদ্রলোকের সমাজ।[৫]

'মতাদর্শ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে লেখক সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবে মানিকের ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির গুরুত্ব কীভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এছাড়া সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন পর্বে মানিকের সাহিত্যবোধের পরিবর্তন ও রূপ-রূপান্তরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টাও এ প্রবন্ধে লক্ষণীয়। অন্যদিকে 'সমাজগঠন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সাহিত্য ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে সমাজের গঠনগত পারম্পর্য নির্ণয়ে আগ্রহী। যেহেতু মার্কসীয় চেতনায় সাহিত্যই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার, সেহেতু আদর্শ সমাজ গঠনের আবশ্যিক শর্তসমূহ ও এর বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা, ভগ্ন-বিধ্বস্ত সমাজকাঠামোর পতন, সামাজিক মানুষের চেতনালোকে রাজনৈতিক বোধের উজ্জীবন ঘটানো প্রভৃতি গুরুদায়িত্ব পালনে মানিক কীভাবে সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন, সেসব প্রসঙ্গের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা এ প্রবন্ধের প্রাণ।

কায়েস আহমেদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৪) সংকলনের এগারটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি বাংলাদেশী লেখকদের রচনা, তিনটি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। রণেশ দাশগুপ্তের 'সাথী : সামাজিকতায় ও রাজনৈতিকতায়' শীর্ষক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষ হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করার প্রবণতা সুস্পষ্ট। হাসান আজিজুল হকের 'ভাষারীতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ। সাহিত্যে ভাষারীতির ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধের প্রারম্ভে তাঁর যে অভিমত, তা তাঁর স্বকীয় ও মৌলিক ভাবনার নির্দেশক। বক্তব্যকে অনুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্তকরণ, সাহিত্য-সমালোচনায় প্রচলিত আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাহুল্য তাঁর আলোচনায় অনুপস্থিত। মানিকের ভাষারীতির প্রাতিস্বিকতা সম্পর্কে লেখকের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ : 'আমার ধারণা একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সাধু চলিতের বিতর্কটাকে চিরকালের জন্য পুঁতে ফেলতে পেরেছেন, তাঁর ভাষা একদিকে চলে গেছে লোকজ ধারার ভিতরে,... অন্ধকারে, নিভৃতিতে, আদিমতায়, রসের রহস্যে, আবার জীবনের কলরোল আনন্দ যন্ত্রণায়– অন্যদিকে তাঁর ভাষা গেছে যুক্তির দার্ঢ্যের দিকে, বিজ্ঞান আর ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন কঠোর শৃঙ্খলার দিকে, বিশ্লেষণ আর ইস্পাতকঠিন পথে...'[৬]

হায়দার আকবর খান রনো 'বিপ্লবী ও শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে মানিককে মহৎ সাহিত্যিক হিসেবে মূল্যায়ন করলেও মানিকের মার্কসীয় সাহিত্যভাবনার প্রতি তিনি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। আলী আনোয়ারের 'ছন্দ পতন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দনিক জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির বিশেষত্ব হল, মানিকের কবিসত্তার যে পরিচয় 'ছন্দপতন' উপন্যাসে সংগুপ্ত, তার উন্মোচনে লেখক যথেষ্ট আন্তরিক, পরিশ্রমী এবং যত্নশীল। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধে কথাসাহিত্যিক মানিকের বেড়ে ওঠার

সামগ্রিক পরিবেশ ও যুগ প্রবণতার স্বরূপ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত অসুস্থ-বিকৃত-অপূর্ণাঙ্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মানিকের সাহিত্যিক অবস্থানকে সুচিহ্নিত করেছেন। লেখকের মতে, স্বীয় সম্প্রদায়ের দৈন্য, কদর্যতা ও আত্মবিনাশের ভয়াবহ রূপটি দেখিয়ে পাঠককে সতর্ক করতে মানিক বরাবরই সচেষ্ট, উদ্যোগী। লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ বক্রোক্তি, শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের গতানুগতিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁর তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশে সচেতন। এ প্রবন্ধে তাঁর মনোভাবনার দৃষ্টান্ত : মার্কসবাদকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে নিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চার বিষয় নয়, এটি তাঁর কাছে মানুষের দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার হাতিয়ার।[৭]

রহমান হাবিব *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য* (২০০৭) শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠককে অবহিত করেছেন যে, মানবসম্পর্কের সঙ্গে জ্ঞানের বিচিত্র-বহুকৌণিক সম্পর্কসূত্রের আলোকে এ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধসমূহ রচিত। এছাড়া, এ ধরনের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য বিষয়ক কোনো সাহিত্যসমালোচনাকর্ম ইতঃপূর্বে রচিত হয়নি বলেই লেখক ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর উক্ত গ্রন্থের আলোচনা বিশ্লেষণ করে লেখকের অভিমতের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ গ্রন্থের আলোচনা বিশ্লেষণহীন, নিতান্তই বিবরণধর্মী। যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের মাধ্যমে বক্তব্যকে উপস্থাপনের দায়িত্ববোধ এতে অনুপস্থিত। গ্রন্থটির ভাষাগত মানও সন্তোষজনক নয়।

ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ* (২০০৮) শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলনটি মানিকের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের স্মারক হিসেবে প্রকাশিত। এটি বাংলাদেশে মানিকচর্চার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ প্রবন্ধ-সংকলন। উক্ত সংকলনে সম্পাদকীয় ভূমিকা, মানিকের চারটি প্রতিকৃতি চিত্র ও জীবনপঞ্জি, রচনাপঞ্জি, মানিকবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি ব্যতীত আটাশজন লেখকের আটাশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত। এঁদের মধ্যে সাতজন লেখক পশ্চিমবঙ্গের। মানিকসাহিত্যকে স্বতন্ত্র ও নবতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভিন্নার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা রচনাগুলোর মধ্যে সহজেই লক্ষণীয়। বাংলাদেশী একুশজন লেখকের রচনা তালিকায় মানিকসাহিত্য সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ও নবীন-তরুণ সমালোচকের সম্মিলন ঘটেছে এ সংকলনে। বলা বাহুল্য, সংকলনভুক্ত প্রতিটি রচনাই এ গ্রন্থের জন্য নতুনভাবে রচিত।

হায়াৎ মামুদ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা : যাপিত জীবন* প্রবন্ধে মানিকের কবিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনে সচেতন এবং এক্ষেত্রে মানিকের কবিতার বিশ্লেষণ ও সতর্ক-পর্যবেক্ষণপূর্বক তিনি এ সিদ্ধান্তে স্থিত হয়েছেন যে, কবিখ্যাতি মানিকের ঈপ্সিত ছিল না; বরং গদ্যই তাঁর প্রাতিস্বিকতা ও মননের উপযুক্ত বাহন– যার প্রমাণ তাঁর কথাসাহিত্য। হায়দার আকবর খান রনো 'উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে মার্কসীয় চেতনায় আস্থাশীল মানিকের উত্তরকালের গল্প-উপন্যাসের চারিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করলেও, মানিকসাহিত্যের প্রবণতাসমূহও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। বেগম আকতার কামালের 'দিবারাত্রির কাব্য : মানিক মানসের আলোছায়া' প্রবন্ধে লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, *দিবারাত্রির কাব্য* মানিকের

আদি উপন্যাস হলেও এটি প্রকৃতঅর্থে বাংলা রোমান্স রসাশ্রয়ী উপন্যাসের অন্ত্যপর্ব। সিদ্দিকা মাহমুদার 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যামাচরিত' প্রবন্ধে বিশ শতকের ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত নারীসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় শ্যামার কঠোর জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে মাতৃত্বের মহিমায় উত্তীর্ণ হওয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। ভীষ্মদেব চৌধুরীর 'নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ অথবা পুতুল ও মানুষের দ্বৈরথ' প্রবন্ধে লেখক মানিক-সাহিত্যে নিয়তিতাড়িত মানুষের নবমূল্যায়নে উৎসাহী। বিশ্বজিৎ ঘোষ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ' : সামাজিক অভিমুখ ও বিপ্রতীপ মনস্তত্ত্ব' প্রবন্ধে সমাজের বিচিত্র পেশা ও শ্রেণীর স্ত্রীদের মনস্তত্ত্বের সমান্তরালে মানিকের সামাজিক সচেতনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। সৈয়দ আজিজুল হকের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পশৈলী : *বিন্দু থেকে বৃত্ত*' প্রবন্ধে মানিকের কথাসাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও অন্তর্বাস্তবতা বিশ্লেষণের সচেতন আগ্রহ, সংযমী শিল্পীর নিরাসক্তি ও পক্ষপাতহীন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি কীভাবে তাঁর গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বিষয়ে পরিশ্রমী মূল্যায়ন রয়েছে। সুশান্ত মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সৃষ্টির দূরত্ব' প্রবন্ধে উভয় কথাশিল্পীর একের প্রতি অন্যের মনোভাবনার তথ্যসূত্র ও ধারণা আবিষ্কারে প্রয়াসী। ইমতিয়ার শামীম 'মানিকের মন' প্রবন্ধে মানিকের মন ও মনস্তত্ত্বকে শ্রেণীমনের সঙ্গে সমন্বিত করে যে বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন, সেখানে রয়েছে তাঁর চেতনালোক ও সাহিত্যভুবন সম্পর্কিত স্বতন্ত্র পর্যালোচনা। জাকির তালুকদারের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : বিবর্তনের দ্বন্দ্বপথ' প্রবন্ধটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীবলয়ে শৃঙ্খলিত মানুষের চারিত্র্য ও স্বরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিকের সাযুজ্যবোধ ও অসামান্যতা নির্দেশক। গিয়াস শামীমের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য' প্রবন্ধে লেখক অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে কেতুপুরবাসীর সামগ্রিক মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ ও আন্তরিক। সিরাজ সালেকীনের '*দায়/বিদায়ের মধ্যবিত্ত*' প্রবন্ধে মানিকের কথাসাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার স্বরূপ ও এর অন্তর্গত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। সৌমিত্র শেখরের 'উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে মানিকের উপন্যাসে রূপায়িত মানবজীবন-সমাজ-সংসার ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কিত নির্মোহ বৈজ্ঞানিক সচেতনতাবোধের বিশ্লেষণ রয়েছে। বায়তুল্লাহ কাদেরীর 'মানিক উপন্যাসে উপমা চিত্রকল্প' প্রবন্ধে মানিকের উপন্যাসের দেহকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগের পশ্চাতে তাঁর শিল্পীমানসের স্বভাব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সৌভিক রেজার 'জীবনের জটিলতা : মানুষ হয়ে ওঠার কথন-ক্রিয়া' প্রবন্ধে লেখক উক্ত উপন্যাস অবলম্বনে মানুষের অযৌক্তিক-বাহুল্য ভাবনা ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গে তার যৌক্তিক-সুশৃঙ্খল চিন্তন ও পরিকল্পনাগত পারম্পর্যের সমন্বয়ে মানবজীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। চঞ্চল কুমার বোসের 'মানিক সাহিত্যে মাতাল চরিত্র' প্রবন্ধে ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ-স্বপ্নভঙ্গের অন্তর্যন্ত্রণা ও সম্ভাবনাহীনতার সমান্তরালে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশের অভিঘাত ও ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশিত। সাজেদুল আউয়াল 'পদ্মানদীর মাঝির চলচ্চিত্ররূপ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে মানিকের *পদ্মানদীর মাঝি* অবলম্বনে দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণের শৈল্পিক ও নান্দনিক মূল্য, সর্বোপরি উভয় চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে নিজস্ব মূল্যায়নকে উপস্থাপন করেছেন। মোহাম্মদ আজমের 'কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র' প্রবন্ধে লেখক 'নিয়তি' বলতে মধ্যযুগীয় অদৃষ্টবাদকে প্রত্যাখ্যানপূর্বক পুঁজিবাদী সমাজে শোষকের শোষণের শৃঙ্খলে বিপর্যস্ত শোষিতের

নিষ্পেষণের কার্য-কারণ সূত্র উন্মোচন করেছেন। তারিক মনজুরের 'অহিংসার ভাষা' প্রবন্ধে *অহিংসা* উপন্যাসের ভাষারীতির ব্যবচ্ছেদ লেখকের অভীষ্ট। সৈয়দ শাহরিয়ার রহমানের 'নদীজীবনের সংহিতা : পদ্মানদীর মাঝি এবং গঙ্গা' প্রবন্ধে উক্ত উপন্যাসদ্বয় অবলম্বনে মানবজীবনের বিচিত্রমনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অভিজ্ঞানের সমান্তরালে প্রকৃতিরূপী নদীর অনিবার্য-অপ্রতিরোধ্য প্রবহমানতা ও অভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে অবিরাম লক্ষ্যহীন যাত্রার স্বরূপ নির্দেশিত। হামীম কামরুল হক 'লেখালেখির শিক্ষক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে *লেখকের কথা* অবলম্বনে মানিকের সাহিত্যভাবনার স্বরূপ ও কালজয়ী সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কার্য-কারণ সূত্রসমূহ নির্ণয় করেছেন।

১.২ অন্যান্য সংকলন

বিভাগোত্তরকালে মানিকচর্চার প্রথম প্রয়াস হিসেবে রণেশ দাশগুপ্তের *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯) গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ গ্রন্থের বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (৫)' শিরোনামে লেখক মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানিকের সাহিত্য মূল্যায়নে সচেষ্ট। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পাঠককে অবহিত করেছেন যে, দুজন শ্রেষ্ঠ মার্কসীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকের (রালফ ফকস ও ক্রিস্টোফার কডওয়েল) নির্দেশিত শিল্পানুধ্যানের পাশাপাশি সমকালীন শিল্পতত্ত্ববিষয়ক বিচারসূত্রসমূহের সমন্বিত বিবেচনাই তাঁর এ রচনার মানদণ্ড। উক্ত প্রবন্ধে তিনি মানিকের মার্কসীয় ভাবাদর্শপুষ্ট উপন্যাস বিশ্লেষণে অভিনিবেশী। বিশেষত তাঁর *দর্পণ* উপন্যাসকে লেখক বিবেচনা করেছেন 'চল্লিশের দশকের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মহাকাব্যিক ফলশ্রুতি'[৮] হিসেবে। এ উপন্যাসে তিনি ফ্রয়েডিজমের সমান্তরালে মার্কসবাদের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। তাঁর বিবেচনায়, বাংলা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী উপন্যাসের ধারায় মানিক যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনভাবনায় মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেছেন, সে ভূমিকায় তিনি অনন্য। রণেশ দাশগুপ্তের আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বিবেচনাপ্রসূত। তবে, যেহেতু তিনি মার্কসীয় চেতনায় আস্থাশীল, সে কারণেই মানিকের উপন্যাসে তিনি ফ্রয়েডীয় ভাবাদর্শের সফল রূপায়ণের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক চেতনার মূল্যায়নে আগ্রহী। মূলত *দর্পণ* উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই মানিকের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার মূল্যায়ন এ রচনায় লেখকের অভীষ্ট।

রণেশ দাশগুপ্তের *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ* (১৯৮৬) গ্রন্থান্তর্গত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে লেখক মার্কসীয় চেতনায় স্থিত মানিকের সাহিত্যিক প্রবণতা ও স্যাহিত্যকীর্তির নিরপেক্ষ মূল্যায়নে উৎসাহী। তাঁর বিবেচনায়, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের অসামান্য শিল্পী মানিক অতি আধুনিক বাস্তববাদী রীতির গণকথাশিল্পী ও বামপন্থী সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত, মূল্যায়িত ও বিতর্কিত। এ বিতর্কের অবসানকল্পেই প্রবন্ধটি রচিত। প্রকৃত অর্থেই, গণমানুষের জীবনভাবনার সাহিত্যিক রূপায়ণ প্রসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে যে আদর্শ ও নীতি চর্চিত, এর ধারাবাহিকতায় বাংলা কথাসাহিত্যে মানিকের বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র পথযাত্রার মূলে সক্রিয় ছিল বিশেষ সমাজচেতনার নিগূঢ় উপলব্ধি, সংবেদনশীল সৃষ্টিসত্তার দায়িত্ববোধ।[৯]

আহমদ ছফার প্রবন্ধ (১৯৯৩) গ্রন্থের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের অন্তর্গত হোসেন মিয়া চরিত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা একান্তই বিবরণধর্মী, সাদামাটা ও গতানুগতিক। যুক্তি-

তর্ক-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপন্যাসে হোসেন মিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে মানিকের শিল্পীমানসের স্বভাব উন্মোচনের কোনো প্রচেষ্টা এ আলোচনায় লক্ষণীয় নয়। এছাড়া তাঁর সিদ্ধান্তও সর্বদা বস্তুনিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ নয় :

> হোসেন মিয়া চরিত্রের কোনো বাস্তবতা নেই। এ সম্পূর্ণভাবেই লেখকের মায়া সৃষ্টি। এই 'হোসেন'কেই জামাকাপড় পাল্টে ভিন্নতরো পরিবেশে অনায়াসে সায়েন্স ফিকশনের নায়ক করে দেয়া খুবই সহজ।[১০]

বশীর আল হেলালের *তাদের সৃষ্টির পথ* (১৯৯৩) গ্রন্থান্তর্গত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক কবি হিসেবে মানিকের মূল্যায়নে যথাসম্ভব ভাবোচ্ছ্বাসহীন, নিরপেক্ষ ও যুক্তিচালিত। এ প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বাংলা কবিতার ধারায় মানিক নতুনত্ব বা ব্যতিক্রমধর্মিতার সন্ধান প্রদানে অপারগ। তবুও তাঁর কবিতা বৈশিষ্ট্যহীন নয়। তাঁর কবিতার প্রধান দিক হল উপমা ও চিত্রকল্পের রূপবিন্যাসের অসামান্যতা।

আবদুল হালিম *মানিক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর* (১৯৯৪) শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠককে অবহিত করেছেন যে, এ গ্রন্থের অন্তর্গত 'মানিকসাহিত্যের অনন্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধে মানিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ বক্তব্য উক্ত প্রবন্ধে যে প্রতিফলিত হয়নি, তার একটি উদাহরণ :

> মানিক যদি জানতে পারতেন যে মার্কসবাদ প্রকৃতপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না, তাহলে তিনি অবশ্যই মার্কসবাদকে বর্জন করে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বা বিশুদ্ধ বাস্তবতাকে আশ্রয় করেই সাহিত্য রচনা করতেন।... নরনারীর যৌন সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দরুনই তিনি লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমগ্র মানিক সাহিত্যে এমন একটি বাক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না যা থেকে বোঝা যায় যে বহু নারী সম্ভোগের বা পরনারী সম্ভোগের কোন অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল।[১১]

লেখকের সৃষ্টিশীল চিন্তার দৈন্য, যুক্তিহীন অপ্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত ও অশোভন-বিভ্রান্তিকর মন্তব্য উক্ত প্রবন্ধকে করেছে মূল্যহীন ও অসার। সাহিত্য সমালোচনায় যে সততা, একনিষ্ঠা, স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্যকে বিন্যাসের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমী মনোভাবনা একান্ত কাম্য, তা উক্ত প্রবন্ধে অনুপস্থিত।

আবু জাফরের *অন্বিষ্টজীবন* (১৯৯৯) শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'কল্লোলীয় ভাবাদর্শের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের স্বতন্ত্রতা' প্রবন্ধে লেখক 'কল্লোল যুগে'র উত্তরসূরি গল্পকার হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যে মানিকের বিশিষ্টতা ও স্বাজাত্যবোধ নিরূপণে আগ্রহী। তবে তাঁর আলোচনা যতটা বিবরণধর্মী–তথ্যনির্ভর, ততটা বিশ্লেষণধর্মী নয়। এছাড়া মানিক সম্পর্কে কোনো নতুন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এ প্রবন্ধে ঘটেনি।

সৈয়দ আজিজুল হকের *জীবনানন্দের শুভ অশুভর দ্বন্দ্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ* (২০০৬) সংকলনের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ হল "'চিহ্ন' এবং 'ঝড় ও ঝরাপাতা'।" সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা ও জনমানসের সংগ্রামী উদ্দীপনাকে বাস্তবের অভিঘাত ও সচেতন কথাশিল্পীর নিগূঢ় সংবেদনায় শিল্পায়নের যে অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা এ উপন্যাসে (*চিহ্ন*) লক্ষণীয়, তা বিশ্লেষণে লেখক মনোযোগী।

সরকার আবদুল মান্নানের *বাংলা কথাসাহিত্য : আধুনিকতার কুশীলব* (২০০৭) শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনে মানিকবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট জগৎ : প্রতিভার অন্তরালে নিরাময়হীন ব্যাধি' প্রবন্ধে লেখক

মানিকের ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টিশীলতা, অবিশ্বাস্য ধরনের মানসিক শক্তি ও জগৎ-জীবন-সমাজসম্পর্কিত আত্মবিশ্লেষণের প্রবণতাকে তাঁর অসুস্থ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। এ ক্ষেত্রে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 'জন্মসূত্রেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যে ব্যক্তিসত্তা তাঁর যাপিত জীবনের সব অভিজ্ঞতাসমেত তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল অন্তর্মুখীনতার দিকে'[১২]—এর যৌক্তিক বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে অনুপস্থিত। তাঁর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : বিকৃতির স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি মানিকের ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বনির্ভর কয়েকটি গল্পের যে আলোচনা করেছেন, তাতে নেই নতুন কোনো বক্তব্য বা স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এসব গল্পকে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা।

সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপ জীবন* (২০০৮) শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত সৈয়দ আজিজুল হকের 'পদ্মা, ময়নাদ্বীপ এবং কুবের-কপিলা' প্রবন্ধে লেখক *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের নবতর মূল্যায়নে সচেষ্ট। পদ্মা কীভাবে ধীবর জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চা, তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় দুর্বার সংগ্রাম ও জীবনালেখ্য রচনার অমোঘ ভূমিকায় হয়ে ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী– সে সত্য নিরূপণে লেখক এ প্রবন্ধে উদ্যোগী।

বাংলা একাডেমী পত্রিকার ৪১ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যায় আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহিংসা' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে গ্রহণ-বর্জনের প্রচেষ্টা আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ও বক্তব্য তখনই সিদ্ধান্তরূপে বিবেচিত হয়, যখন তিনি প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। *অহিংসা* উপন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণের অন্তরালে লেখকের বিশেষ সচেতন অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল ছিল। যেহেতু মানিকসাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক উক্ত উপন্যাসটিকে যৌনাশ্রিত উপন্যাস হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন, সেহেতু অনুপুঙ্খভাবে উপন্যাসটির ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধান্তে স্থিত হয়েছেন যে, জীবনবোধ ও শিল্প জিজ্ঞাসার অনন্যতায় *অহিংসা* একটি মহৎ উপন্যাস।

উক্ত পত্রিকার ৪২ বর্ষ; ১ম সংখ্যায় লেখকের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। *চতুষ্কোণ* সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল, মানিকের এ উপন্যাসে যৌনতার ব্যবহার অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত হলেও এর অন্তরালে মানিকের বিশেষ অভিপ্রায় কার্যকর ছিল। তাঁর মতে, মানিক ব্যক্তিক ও সামাজিক অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গেই উক্ত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটি হল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার সাযুজ্য ও সাদৃশ্য। তাঁর বিবেচনায় 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রবণতা ও যৌনতার ব্যবহার এই দুই কথাশিল্পীর প্রধান মিলনসূত্র।'[১৩] এ প্রবন্ধে তাঁর যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত—*চতুষ্কোণ* উপন্যাস যৌনতাময়, তবে কখনোই যৌনসর্বস্ব নয়; বরং মনস্তত্ত্বনির্ভর ও সমাজসম্মত—নিঃসন্দেহে বিবেচনাপূর্ণ।

২. মানিকসাহিত্য-গবেষণা

২.১ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

বাংলাদেশে মূলত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়ে মানিকসাহিত্য বিভিন্ন গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে একাধিক গবেষণা কর্মকাণ্ড সুসম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপন্যাস নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় আবুল খায়ের মোঃ আশরাফউদ্দিনের *মানিকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও মানুষ* (১৯৯০) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে। অন্যদিকে সৈয়দ আজিজুল হক *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* (১৯৯৮) শীর্ষক গবেষণাকর্মে পিএইচডি পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। মোছাম্মৎ মাহফুজা সুলতানা হিলালীর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাস : জীবন ও সমাজ' শীর্ষক গবেষণাকর্ম এম.ফিল পর্যায়ে সম্পন্ন হলেও এটি গ্রন্থাকারে এখনো অপ্রকাশিত। এছাড়াও অন্য গবেষকগণ পিএইচডি পর্যায়ে বাংলা কথাসাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন, যেখানে মানিকসাহিত্যও আংশিক বা খণ্ডিতভাবে তাঁদের গবেষণাপরিধির অন্তর্গত হয়েছে।

সৈয়দ আজিজুল হকের *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* বাংলাদেশে মানিকচর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা গ্রন্থ। মানিকের ছোটগল্পের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এটিই একমাত্র গ্রন্থ। লেখক বাংলা সাহিত্যে মানিকের ছোটগল্প বিবেচনার পরিমণ্ডলে যে প্রাতিস্বিক মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী, তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোপরি মানিকচর্চার ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় উত্তীর্ণ। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল। এটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ গ্রন্থে সুবিস্তৃত পরিসরে মানিক রচিত ছোটগল্পের আলোকে তাঁর শিল্পীমানসের চারিত্র্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লেখকের গভীর অধ্যয়ন, যুক্তি-বিশ্লেষণে আস্থা ও নিরপেক্ষ বিবেচনার প্রতি যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তা একজন দায়িত্বশীল গবেষকের গবেষণাকর্মে অখণ্ড আন্তরিকতা, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশীলনের পরিচায়ক। তিনি গবেষণাক্ষেত্রে মানিককে কোনো বিশেষ সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক আদর্শ ও পরিমণ্ডলের অন্তর্গত হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নে সচেষ্ট। লেখকের সততা, স্পষ্টবাদিতা ও বক্তব্য প্রকাশের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত সচেতনতার আভাস নির্দেশিত গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে :

> আমরা জানি, মানবজীবনে লিবিডোর প্রভাবসহ মানবমনের গহন-গভীর রহস্য উন্মোচনই মানিকের প্রথম পর্বের রচনাসমূহের মূল প্রবণতা। অন্যদিকে ১৯৪৪-পরবর্তী পর্বে সমাজচেতনা ও রাজনীতিরই প্রাধান্য। কিন্তু দুই পর্বের এই বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা অকস্মাৎ সূচিত হয়নি। ১৯৪৪ সালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন—এর অর্থ এই নয় যে, ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনায় সমাজবাস্তবতা মুখ্য হয়ে ওঠে। বরং মানিক-সাহিত্য বিশ্লেষণে এ সত্যই মূর্ত হয়, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার সমন্বয় সাধনে তিনি সর্বদাই ছিলেন সচেষ্ট। অন্তর্জাগতিক সত্য-উন্মোচনের প্রাধান্য পরিহার করে তিনি যে মূলত সমাজসত্য উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন, তা একটা দীর্ঘ পরিবর্তন প্রক্রিয়ারই ফল। মানবজীবন ও সমাজ-সম্পর্কিত শুভবোধ ও কণ্যাণচিন্তার ক্ষেত্রে মানিকের ক্রমশুদ্ধতা-অভিসারী যাত্রার ফলেই এ উত্তরণ সম্ভব হয়।[১৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার সংগঠন, ক্রমবিকাশ ও নির্দিষ্ট পরিকাঠামোতে বিন্যস্ত হওয়ার শৈল্পিক সূত্রসমূহ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে লেখক তাঁর ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন প্রবণতা, স্বজন-পরিজন ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ধারা, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহের অভিঘাত প্রভৃতির ধারাবাহিক নির্দেশনা প্রদানে সর্বদাই নিবিষ্টচিত্ত। যেহেতু ব্যক্তিমাত্রই

সামাজিক প্রতিবেশ-সমকাল-ঐতিহ্যিক আবহ থেকে বিচ্যুত হয়ে সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদানে অক্ষম, সে কারণেই লেখক এ পর্যায়ে ব্যক্তি মানিকের কালজয়ী-যুগন্ধর শিল্পী মানিকে রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচনে আগ্রহী। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার স্বরূপ' শীর্ষক আলোচ্য পরিচ্ছেদের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের অন্তিমপর্যায়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেখানে রয়েছে যুক্তি-তর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার মাধ্যমে বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য ভঙ্গিতে পাঠকের নিকট উপস্থাপনের দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অকপট অনুরাগ।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, মানিকচর্চার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে কখনো কখনো যে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়, তা অস্বীকারের পাশাপাশি যথাযথ যুক্তি-নির্দেশ ও বিবেচনার মাধ্যমে মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে তিনি আগ্রহী। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বা একগুঁয়েমি তাঁর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রন্থবদ্ধ আলোচনাকে মূলত তিনটি পর্বে (উন্মেষপর্ব, ক্রান্তিপর্ব, অন্ত্যপর্ব) এ গ্রন্থে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একজন সংবেদনশীল শিল্পীর দেশ-কাল ও প্রতিবেশ, বস্তুজগৎ থেকে আহরিত মানুষ ও জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার নির্যাস, সর্বোপরি মনোভঙ্গির সঙ্গে শিল্পভাবনার সমন্বয়সাধনের যে আন্তরিক-ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, উক্ত তিনটি অধ্যায়ে বিশ্লেষিত গল্পসমূহে লেখক তা আবিষ্কারে সতত উদ্যোগী। ছোটগল্পের আবশ্যকীয় শর্তসমূহকে যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে কীভাবে জগৎ-জীবন-মানবসংসারের রূঢ় ও কঠোর সত্যকে মানিক উপলব্ধির মাধ্যমে শিল্পিত অবয়ব প্রদান করেছেন, এর স্বরূপই উন্মোচিত হয়েছে তিনটি অধ্যায়ের সুদীর্ঘ আলোচনায়।

'উপসংহার' অংশে লেখক মানিক-সাহিত্যের সুদীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টি, জীবন ও আদর্শ, তাঁর শিল্পভাবনার মৌলিক প্রবণতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজেয় সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন ও অনুশীলনে, তাঁর সৃষ্টিধর্মের বিচিত্র চারিত্র্য উন্মোচনের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াস এ অংশটি। বলা বাহুল্য, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মানিকচর্চার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থটি সবিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২.২ অন্যান্য গবেষণা

মুহম্মদ রেজাউল হকের *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (১৯৪৫-১৯৬০) (১৯৮৯) শীর্ষক গ্রন্থ তাঁর পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের এক সংখ্যক পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত পরিসরে (গ্রন্থে নির্দিষ্ট কালপরিসরে) মানিকের কয়েকটি উপন্যাস মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তবে এক্ষেত্রে লেখক তাঁর আলোচনায় মানিকের শিল্পীমানস বা তাঁর সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার কোনো নতুন প্রান্ত নির্দেশে সক্ষম হননি। তাঁর বক্তব্য মূলত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সমালোচকের অভিমতেরই প্রতিধ্বনিতুল্য।

আকিমুন রহমানের *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (১৯৯৩) তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। গ্রন্থটির পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে মানিকের বিভিন্ন উপন্যাস মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষণীয়। তবে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়েই লেখক এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অনুপুঙ্খ

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপন্যাসসমূহ বিশ্লেষণের উদ্যম ও প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়নি।

সরকার আবদুল মান্নানের *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)* (২০০৩) তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্গত দুটি বিস্তৃত পরিচ্ছেদে তিনি মানিকের বিভিন্ন পর্বের উপন্যাসকে আলোচনার উপজীব্য করেছেন। এসব উপন্যাস মূলত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রিত এবং মার্কসীয় চেতনাবহির্ভূত। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও মানসলোকের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সংক্ষিপ্ত পরিসরে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন উপন্যাসকে কাহিনী ও চরিত্রগত শিরোনামে বিন্যাসপূর্বক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্যকে ব্যবচ্ছেদের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের মাধ্যমে স্বীয় অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে সাধারণভাবে বিবরণধর্মিতার প্রতি লেখকের পক্ষপাত এ গ্রন্থে লক্ষণীয়। এছাড়াও কখনো কখনো লেখক একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বোক্ত ধারণা পোষণপূর্বক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়কে উপস্থাপনে আগ্রহী। এর ফলে পাঠকের মনে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি। মানিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝির* আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার এ প্রবণতা লক্ষণীয়। এ উপন্যাসে লেখকের বিভ্রান্তিসূচক বিবেচনা সর্বাধিক প্রকটিত ময়নাদ্বীপ ও হোসেন মিয়ার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে। একটি দৃষ্টান্ত :

> মনে হয়, ময়নাদ্বীপ যেন তার প্রতিপত্তির সাম্রাজ্য নয়—অবাধ যৌন-জীবনের প্রত্যক্ষ লীলাভূমি। হোসেন মিয়া কি প্রজা-প্রতিপত্তির সাম্রাজ্যনির্মাণ করতে চায়, নাকি তার জন্য তৃপ্তিদায়ক একটি উন্মুক্ত যৌন আবাসভূমি তৈরি করার কোনো গোপন ইচ্ছার রূপায়ণই এই প্রচেষ্টার মূল, সে ব্যাপারটি নতুন করে মূল্যায়ন করা দরকার।[১৫]

৩. সাহিত্য-সম্পাদনা

বাংলাদেশে মানিকচর্চার ক্ষেত্রে মানিকসাহিত্য-সম্পাদনার ধারাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে মানিক রচনাবলির পাশাপাশি তাঁর কালজয়ী অসামান্য বিভিন্ন উপন্যাস কখনো সমষ্টিগত রূপে, কখনো পৃথকভাবে যেমন সম্পাদিত হয়েছে, তেমনিভাবে সম্পাদিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহও। এসব সম্পাদিত গ্রন্থেও মানিককে নবরূপে অনুধাবন ও মূল্যায়নের সতর্ক আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্মের দিগন্তপ্রসারী ক্ষেত্র সম্পর্কে পাঠকমনের দুর্নিবার জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে পরিতৃপ্তি দানের অভিপ্রায়ও এসব গ্রন্থ সম্পাদনার অন্তরালে ক্রিয়াশীল। ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত *মানিক রচনাবলির* ঐতিহ্য সংস্করণ, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ গল্প* এ ধারার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এসব গ্রন্থে রয়েছে সুপরিকল্পনা, সুগ্রন্থনা ও সুসম্পাদনার স্বাক্ষর।

ঐতিহ্য সম্পাদিত *মানিক রচনাবলির* প্রথম–দশম খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্রের* পাঠ ও গ্রন্থ-পরিচয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। *মানিক রচনাবলির* ঐতিহ্য সংস্করণে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। তবে ঐতিহ্য উক্ত সংস্করণে মানিকের উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ ও চরিত্রনামের আদি বানান অপরিবর্তিত

রেখেছে। সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পরবর্তী পর্যায়ে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলির একাদশ খণ্ড* ইতোমধ্যে প্রকাশ করলেও ঐতিহ্য থেকে এ খণ্ডটি এখনো অপ্রকাশিত।

হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৫) শীর্ষক সংকলনে মানিকের *জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংসা, চিহ্ন, চতুষ্কোণ, হলুদ নদী সবুজ বন* প্রভৃতি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে 'ভূমিকা' ব্যতীত দুটি পরিশিষ্টও সংযুক্ত হয়েছে। এক সংখ্যক পরিশিষ্টের রচয়িতা হায়াৎ মামুদ। এখানে গ্রন্থভুক্ত উপন্যাসসমূহের পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি নির্দেশিত। দুই সংখ্যক পরিশিষ্টে আবদুল মান্নান সৈয়দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি রচনা করেছেন। হায়াৎ মামুদ গ্রন্থটির ভূমিকায় যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তাতে রয়েছে পরিশীলন, সুতীক্ষ্ণ বিবেচনা ও পরিমার্জিত মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরেই তিনি মানিকের ব্যক্তি ও সাহিত্যজীবনের মৌল প্রবণতা ও চিন্তাসূত্র নির্দেশ করেছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। এর পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে যে শ্রমসাধ্য, একনিষ্ঠ, সতর্ক গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে মানিকসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ। এ গ্রন্থ সম্পাদনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

> আমাদের হতাশাজনক অভিজ্ঞতা এরকম যে, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদি বিচার করে ভাষাশৈলী সংক্রান্ত তাঁর অভ্যাস ও প্রবণতা কিছুই বোঝা সম্ভব নয়; এবং আমাদের আশঙ্কা এই যে, এদিকে নজর না দিলে তাঁর রচনাবিকৃতি রোধ করা যাবে না, আর তা হলে, অচিরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার যে তাঁর তির্যক সঙ্কেতময় প্রতীকী ভাষাশৈলী, তার যাবতীয় ধার ও তীক্ষ্ণতা ক্রমশ প্রজন্ম-পরম্পরায় লুপ্ত হয়ে যাবে।[১৬]

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৯৮)-এর ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও গল্পসম্পর্কিত বিভিন্ন অজানা তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পের শিল্পোৎকর্ষের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লেখকের বস্তুনিষ্ঠ-পরিশ্রমলব্ধ প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। এ সংকলনভুক্ত গল্প ব্যতীত মানিকের অন্যান্য গল্পের শিল্পসাফল্য বিচারের ক্ষেত্রেও লেখকের বিবেচনা গুরুত্ববহ। এছাড়া এ সংকলনে তিনি যে জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করেছেন, তাতে মানিকসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পাঠককে অবহিত করার দিকে তাঁর প্রগাঢ় আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়।

হুমায়ূন আজাদ সম্পাদিত *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৯৯) গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক এ উপন্যাসকেই মানিকের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর লেখনী যথেষ্ট পরিণত, মননশীল, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিগূঢ় বক্তব্যকে উপস্থাপনে সক্ষম। তাঁর ভাষা সাবলীল, গতিময় ও উপমাশ্রিত। সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে করে তোলেন স্পষ্ট, সংহত। এ উপন্যাসে তিনি ফরাসি প্রাকৃতবাদের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর বিবেচনা :

> পদ্মানদীর মাঝি একটি বঙ্গীয় প্রাকৃতবাদী উপন্যাস, যেখানে মানুষ তার বহুকথিত মহিমা হারিয়ে পরিণত হয়েছে আদিম জৈব সত্তায় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে তার দেহ ও প্রতিবেশ দিয়ে। দেহ তাকে দিয়েছে ক্ষুধা ও কাম, প্রতিবেশ দিয়েছে পাশবিকতা, তাকে করে রেখেছে অসহায়।[১৭]

সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত *পদ্মানদীর মাঝির* জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে (২০০৮) সম্পাদকের ভূমিকায় সৈয়দ আজিজুল হক সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির সামগ্রিক মূল্যায়নে অনুধ্যানী।

উপসংহার

বাংলাদেশে মানিকচর্চার পরিসর ও সুযোগ বিশেষভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালেই ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার পাশাপাশি প্রবন্ধ সংকলন ও পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমেও মানিকচর্চা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্বকালে মানিক সাহিত্যের মূল্যায়নে যে অনীহা ও বিরূপ মনোবৃত্তি বিশেষ গোষ্ঠীমহলে প্রবল ছিল, তা বর্তমানে দূরীভূত। সাম্প্রতিককালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিশ্রমনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত গবেষক ও সমালোচকদের কঠোর অনুধ্যান—পর্যবেক্ষণের উপকরণে পরিণত হয়েছে। এর পশ্চাতে বাংলা সাহিত্যের পাঠকশ্রেণীর মানিকের প্রতি দুর্বার অনুরাগ ও প্রীতিমুগ্ধতার দিকটিও বিশেষভাবে বিবেচনাধীন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণ গবেষক ও সমালোচকদের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের অধ্যবসায়ী, শ্রমনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও বিবেচনার আশাবাদই এক্ষেত্রে আমাদের পরম প্রত্যাশা।

তথ্যনির্দেশ

১ বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, পৌষ সংখ্যা ১৩৬৩। উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে নিতাই বসুর *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩ (প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ১১১-১১২ থেকে

২ ভূঁইয়া ইকবাল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মানিক-চর্চা, ভূমিকা—২ মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০১

৩ বশীল আল হেলাল, 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ', ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯

৪ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি', ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

৫ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১০

৬ হাসান আজিজুল হক, 'ভাষারীতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', কায়েস আহমেদ (সম্পাদিত) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা. এ. পোস্ট বক্স ২৬১১, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৮৬

৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগীর চোখের স্বপ্ন', কায়েস আহমেদ (সম্পাদিত) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮

৮ রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৩, (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯) পৃষ্ঠা ১৯৩

৯ রণেশ দাশগুপ্ত, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১৭৯

১০ আহমদ ছফা, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র', *আহমদ ছফার প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৪

১১ আবদুল হালিম, 'মানিক সাহিত্যের অনন্যতা', *মানিক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর*, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৫৩

১২ সরকার আবদুল মান্নান, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট জগৎ : প্রতিভার অন্তরালে নিরাময়হীন ব্যাধি', *বাংলা কথাসাহিত্য: আধুনিকতার কুশীলব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা ৫০

১৩ আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৫, পৃষ্ঠা ১২

১৪ সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা (প্রসঙ্গ কথা) সাত-আট

১৫ সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৮৪

১৬ হায়াৎ মামুদ, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ (প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫), পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, ভূমিকার পৃষ্ঠা অনির্দেশিত

১৭ হুমায়ুন আজাদ, *পদ্মানদীর মাঝি*, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৫

গ্রন্থপঞ্জি

১ প্রবন্ধ-সংকলন

১.১ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদক), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, (প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০১

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ডানা প্রকাশনী, গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

কায়েস আহমেদ (সম্পাদক), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, পোস্ট বক্স ২৬১১, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

রহমান হাবিব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদক), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ১৯ মে ২০০৮

১.২ অন্যান্য সংকলন

রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৩

রণেশ দাশগুপ্ত, *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬

আহমদ ছফা, *আহমদ ছফার প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩

বশীর আল হেলাল, *তাঁদের সৃষ্টির পথ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩

আবদুল হালিম, *মানিক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর*, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

আবু জাফর; *অন্বিষ্টজীবন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯

সৈয়দ আজিজুল হক; *জীবনানন্দের শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ*, ঐতিহ্য, রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

সরকার আবদুল মান্নান; *বাংলা কথাসাহিত্য : আধুনিকতার কুশীলব*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭

সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদক), *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন*, জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ৪/৫ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

২ মানিক সাহিত্য-গবেষণা

২.১ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

আবুল খায়ের মোঃ আশরাফউদ্দিন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও মানুষ*, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০

সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮

মোছাম্মৎ মাহফুজা সুলতানা হিলালী; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাস : জীবন ও সমাজ, এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত)

২.২ অন্যান্য গবেষণা

মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (১৯৪৫-৬০), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

আকিমুন রহমান; আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩

সরকার আব্দুল মান্নান; *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৩

৩ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

৩.১ বাংলা একাডেমী পত্রিকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৪

সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নারীমন বিশ্লেষণ; ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৪

আবদুল মান সৈয়দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিকোণ', ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৫

মোঃ সাহেব আলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নারীচৈতন্য, ৪৭ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা এবং ৪৮ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, জুলাই ২০০৩ থেকে জুন ২০০৪, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মোঃ সাহেব আলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নৃবিজ্ঞান ভাবনা, ৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৫–জুন ২০০৫, প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৫

৩.২ সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস', ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৮

সৈয়দ আজিজুল হক, 'চিহ্ন' এবং 'ঝড় ও ঝরাপাতা' ৩৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০০

সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব', ৪০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক', ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-কার্তিক ১৪১২

৩.৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ', (যুক্ত সংখ্যা, ৫৯, ৬০, ৬১) অক্টোবর ১৯৯৭ থেকে জুন ১৯৯৮

৩.৪ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

সৈয়দ আজিজুল হক, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প', পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭

সৈয়দ আজিজুল হক, 'জননী : চিরায়ত মাতৃত্বের জীবনালেখ্য', ষষ্ঠদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৮

৩.৫ কালি ও কলম

বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'মানিকের মাঝির ছেলে : কৈশোরক স্বপ্ন ও সংগ্রাম', পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০০৮

ফেরদৌস আরা আলীম, 'জননীত্বের বৃত্তে জীবনের গল্প', পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০০৮

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, 'মানিকের উপন্যাস : জীবনভাবনার প্রাথমিক পাঠ', পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০০৮

হাসান আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা—গদ্য বাস্তবের ভিতর-পিঠ', পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮

হায়াৎ মামুদ, 'মানিকের অন্যমনস্ক ব্রতযাপন', পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন যে-রকম জীবন যে-রকম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের লেখা', পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮

কুমার দীপ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি চরিত্র চৈতন্যের সিদ্ধান্তহীন অসুখ', পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮

৩.৬ উলুখাগড়া

সৈয়দ আজিজুল হক, 'পদ্মা, ময়নাদ্বীপ ও কুবের-কপিলা', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫

৪ সাহিত্য-সম্পাদনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

চতুষ্কোণ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

পদ্মানদীর মাঝি, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রাগৈতিহাসিক, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম আজকাল প্রকাশ : আগস্ট ২০০৩, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলি, (প্রথম থেকে দশম খণ্ড) ঐতিহ্য সংস্করণ, রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৫

পদ্মানদীর মাঝি (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

সরীসৃপ : মানিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশ

পাপড়ি রহমান

'লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না— সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।'

এই অসামান্য বাক্যটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যতদূর জানা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাপার হরফে দেখা দিতে থাকে তাঁর ২০/২১ বছর বয়সে। ১৯২৮ সালে লিখতে শুরু করেন গল্প— প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অতসীমামী'। *অতসীমামী* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। মানিকের জীবদ্দশায় তাঁর ১৬টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে 'নতুন সাহিত্যে' অমলেন্দু চক্রবর্তীর নেয়া এক সাক্ষাৎকারে মানিক নিজেই গল্প সম্পর্কে বলেছেন—

'... ছোটগল্প রচনায় রোমাঞ্চ আছে। এতে গভীর মনঃসংযোগ করতে হয়। এত দ্রুত তালের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলতে হয় বলেই মন কখনো বিশ্রাম পায় না। ছোটগল্প লেখার সময়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ বোধ করি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসমূহকে প্রধানত দুটি পর্বে ভাগ করা যায়— ১৯৪৪ পূর্ববর্তীকালের মনোবিশ্লেষণমূলক পর্ব এবং ১৯৪৪-পরবর্তীকালের রাজনীতি সংযোগ পর্ব।

মানবজীবনের লিবিডোর প্রভাবসহ মানবমনের গহিন গভীর রহস্য উন্মোচনই মানিকের প্রথম পর্বের রচনাসমূহের মূল প্রবণতা। অন্যদিকে ১৯৪৪-পরবর্তী পর্বে সমাজচেতনা ও রাজনীতিরই প্রাধান্য। অবশ্য এই দুই পর্বের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা অকস্মাৎ সূচিত হয়নি। ১৯৪৪ সালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন— এর অর্থ এই নয় যে ওই ঘটনার তাঁর রচনার সমাজবাস্তবতা মুখ্য হয়ে ওঠে। বরং অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার সমন্বয় সাধনে তিনি সর্বদাই ছিলেন সচেষ্ট।

স্মরণীয় যে, ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে প্রথম গল্প প্রকাশের পরবর্তী আট-দশ বছর মানিকের লেখকজীবনের এক অখণ্ড মনোযোগপূর্ণ শিল্পসাধনার কাল। মানিক তখন বিশ থেকে ত্রিশ বছরের বয়স সীমায়; অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও মেধাশক্তি প্রয়োগেরও এ এক চমৎকার সুযোগ্য সময়। কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন গ্রামঘেঁষা অঞ্চলে বসবাসসূত্রে, বিশ-পূর্ববর্তী জীবনে, যে বিপুল বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন তার থেকে স্থান ও কালগত ব্যবধানও তখন প্রচুর। এ তথ্যটি স্মরণযোগ্য; কারণ অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সফল শিল্পরূপদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়গত দূরত্ব আবশ্যক— এ রকম একটি ধারণা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। জীবনাভিজ্ঞতাকে গ্রন্থবিদ্যাসহযোগে এবং নিজ জীবনবোধের আলোকে যাচাই করে নিয়ে সাহিত্যে রূপময় করে তোলার জন্য যে রকম নির্জন চিন্তার অবকাশ প্রয়োজন, মানিকের ক্ষেত্রে তখনো তার অভাব ঘটেনি। কেননা

জীবিকার জন্য মানিকের সৃষ্টি প্রাচুর্যের অন্তর্তাগিদময় জীবন তখন অনেক দূরে। ফলে প্রারম্ভ পর্বটি মানিকের শিল্পীজীবনের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সময়। এ পর্যায়ে তার ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে প্রাধান্য অর্জন করেছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন, মানব মনস্তত্ত্বের নানা অনুন্মোচিত প্রান্ত, রোমান্টিক ভাবাবেগ, মনোবিকার ও বিকারের উৎস হিসাবে আর্থিক দৈন্য, অর্থ লালসা, নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্কজনক স্মৃতি, ইন্দ্রিয় তাড়না, অশিক্ষিত মানস, অস্বাভাবিক দেহ বৈশিষ্ট্য, সমাজশাসন, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি।

সরীসৃপ মানিকের প্রথম পর্বের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। গ্রন্থে মোট গল্পসংখ্যা ১২। গল্পগুলো—মহাজন, বন্যা, মমতাদি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, প্যাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিক পরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অবলার ইতিকথা, দুটি ছোটগল্প ও সরীসৃপ। ১২টি গল্পই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপস্থাপিত। ফলে গল্পগুলোতে মানিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। সে অর্থে গল্পগুলোকে কোনো পর্বান্তরে ভাগ করা যায় না। তবুও মোটামুটিভাবে সাজিয়ে নিলে 'সরীসৃপের' গল্পগুলোকে নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে ফেলা যেতে পারে—

১. মানুষের ঈর্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা ও জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প : গুপ্তধন, মহাকালের জটার জট, প্যাঁক ও বিষাক্ত প্রেম

২. নির্জলা দাম্পত্য প্রেমের গল্প : মহাজন, বন্যা ও মমতাদি

৩. বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদের গল্প : দিক পরিবর্তন ও সরীসৃপ

এ ধরনের অতিসরলীকৃত পর্ববিভাগও আদৌ হয়তো যথার্থ নয়—বিশেষত মানিকের মতো লেখকের গল্পের—জীবনের জটিল বিমিশ্র বিন্যাস যার অন্বিষ্ট।

তাঁর সময়ে কথাসাহিত্যে যে ভাঙনের ছবি ছিল মানিক তাতে আরও জটিল ও কৌণিক মাত্রা যোগ করলেন। ফলে, এই ছবিগুলোতে দেখা দিল নতুন আয়তন। পাঠকের দৃষ্টি ছবির দ্বিমাত্রিকতা পেরিয়ে অন্তর্গত চেতনার, বলতে পারি অবচেতনার তৃতীয় এক 'ডাইমেনশন'-এর সন্ধান পেল।

মানুষের ঈর্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা ও জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প

সরীসৃপ গ্রন্থের সবচেয়ে জটিল মনস্তত্ত্বের গল্পটির নাম *মহাকালের জটার জট*। এই গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনী বিন্যাসের জটিলতা; চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল ফ্রয়েডীয় মনোবিন্যাস। গল্পের নামকরণে পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত হওয়াতে পাঠক মুহূর্তে হয়ে ওঠে নিঃসংশয়। দুই প্রতিবেশী গৃহের— প্রায় সবকয়টি চরিত্র, এ গল্পে মনোবিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের পোষক।

যুবতীর বালকপ্রণয়, যুবকের মাতৃপ্রণয়, তরুণীবধূর পিতৃপ্রণয়, শ্বশুরের পুত্রবধূপ্রণয়, সন্তানহারা মাতার পুত্রপ্রণয় প্রভৃতি এ গল্পের অসুস্থ মনোভূমিকে কলুষতাযুক্ত করেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের ভাষায় মাতার প্রতি পুত্রের এবং পিতার প্রতি কন্যার পক্ষপাতমূলক যে আকর্ষণ তা সর্বাংশে যৌনতামণ্ডিত। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন ইডিপাস ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স। অন্যদিকে মনোবিকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) ও প্রত্যাবৃত্তির (Regression) কথা বলেছেন। শৈশবকাল থেকে লিবিডো তার ক্রমবিকাশের কোনো স্তরে এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যে, তার স্বাভাবিক বিকাশ আর সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই আবেগ

কেন্দ্র থেকে লিবিডোর মুক্তি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এইরূপ সংবন্ধনের ফলে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে লিবিডো স্থবিরতা প্রাপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে, এছাড়া সংবন্ধন ঘটতে পারে আরেকভাবে—সেক্ষেত্রে লিবিডো স্বাভাবিকভাবে বিকাশিত হয়। কিন্তু একটি স্তরে পৌঁছে ওই স্তরের কোনো বস্তু আকর্ষণে সমর্থ না হয়ে লিবিডো তার সম্মুখগতি উপেক্ষা করে পশ্চাদগতি অর্জন করে। এরই নাম প্রত্যাবৃত্তি। লিবিডোর ক্রমবিকাশের সময় শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রগুলো যদি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয় তাহলে লিবিডো ওইসব ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। 'মহাকালের জটার জট' গল্পের চরিত্রগুলোর অস্বাভাবিক অসুস্থ আচরণসমূহের মধ্যে ইডিপাস ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স এবং লিবিডোর সংবন্ধন ও প্রত্যাবৃত্তি সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের সব ব্যাখ্যাই অনুসন্ধানযোগ্য। মানবমনে লিবিডোর এই রহস্য জটিলতার বৈচিত্র্যই প্রজনন ও সংহারশক্তির আধার মহাকালের জটার জটরূপে প্রতীকায়িত হয়েছে এ গল্পে। এ গল্পের 'আধবোবা, আধকালা, আধপাগলা যুবতী'—সুচিত্রার গভীরতর অনুজ মমতাই তার লিবিডো সংবন্ধনের মূলে। অনুজের মৃত্যুর পর ওই সংবন্ধনই সমবয়সী প্রতিবেশী বালক পঞ্চু তার উগ্র প্রণয় কল্পনায় রূপান্তরিত হয়।

'খাওয়া-দাওয়ার পর এগারটা কি বারোটার সময় সলজ্জভাবে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়ান মাত্র তাহাকে ভিতরে নিয়া গিয়া সুচিত্রা ঘরে দুয়ার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।'

সুলতার স্বামী হেমন্তের লিবিডো-সংবন্ধনও ঘটে বাল্যবয়সে। ফলে বিবাহিত জীবনেও সে আচার-আচরণ ও প্রকৃতিতে নিতান্ত বালকের পরিচয় দেয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন, নির্বোধ স্বামীকে নিয়ে সুলতার লজ্জা, সংকোচ ও কলঙ্ক তাই সীমাহীন। সুলতার বঞ্চনাকাতর জীবন ভাবনা :

'শিশু তার কর্তা, শিশু তার ভর্তা, শিশুর সে অঙ্কশায়িনী।'

স্বামীর ছেলেমানুষী আচরণ সুলতার লিবিডো প্রত্যাবর্তনে সহায়ক হয়। লিবিডো প্রত্যাবর্তন এবং বাল্যে তার সংবন্ধনের ফলে সুলতার মধ্যে পিতৃ আকর্ষণ তীব্রতা লাভ করে।

সুলতার লিবিডো বয়সের সমান্তরালে উপযুক্ত বিষয়াকর্ষণে সমর্থ না হয়ে যখন প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়, মনের মধ্যে সুপ্ত ইলেকট্রা কমপ্লেক্স তখন তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু পিতার মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতির ফলে বিবাহিত জীবনে এই পিতৃ আকর্ষণই পল্লবিত হয় শ্বশুর প্রতিম যাদবকে আশ্রয় করে।

অন্যদিকে যাদবের আচরণ ব্যাখ্যায়ও লিবিডো-সংবন্ধনের প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে পড়ে। তেইশ বছর পূর্বে স্ত্রী শান্তির মৃত্যু হলেও তার প্রতিকৃতি আজও যাদবের নিত্যসঙ্গী। দীর্ঘ দু-যুগের ব্যবধান সত্ত্বেও যাদবের কল্পনারাজ্যে আজও সে তরুণ বধূ। যুবতী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের তীব্রতা যাদবের লিবিডো-সংবন্ধনের কারণ। এ সম্পর্কে যাদবের উক্তি—'মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোট-বৌ। শান্তির সঙ্গে সুখ-দুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায় না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি।'

এই সংবন্ধনের ফলে প্রথম স্ত্রীর অবর্তমানে যাদবের লিবিডো তাড়না পুত্রবধূসম সুলতার মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজে। সুলতার উদ্দেশে যাদবের স্পষ্ট উচ্চারণ :

'আমার বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হত। তিন কাল অশান্তিতে কাটল, শেষের এই মহাকালটাও কি আমার তেমনি অশান্তিতে কাটবে? জীবনে একবার জট পাকালে আর ইতি নেই, ক্ষমা নেই।'

সুচিত্রা, সুলতা, যাদব, মনোরমা ও সতীশ প্রমুখ চরিত্রের মনোজাগতিক উন্মোচনে জীবন রহস্যের যে জটিল রূপ প্রকাশ পায় তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য—ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানই কেবল আমাদের সঠিক পথের সন্ধানে দিতে সক্ষম। অস্তিত্ব রক্ষার অন্তর্তাগিদে মানবমনে যে জীবন-উদ্যম তার মূলে সক্রিয় রয়েছে, ফ্রয়েডের মতে লিবিডো বা যৌনপ্রবৃত্তি। জন্মের পর থেকেই শিশুর দেহে এই লিবিডোর অস্তিত্ব অনুভব করা হয়। মানবমনে লিবিডোর প্রভাব, কার্যক্রম ও গতিপ্রকৃতি এক নিগূঢ় দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন; অন্যদিকে ধর্ম-শাস্ত্র-সমাজ শাসন ও পারিবারিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষভাবে লিবিডো স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে অভ্যস্ত। এ গল্পের চরিত্রসমূহের মনোভূমিতে প্রবৃত্তির যে কদর্য প্রকাশ লক্ষ করা যায়—তা ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দান করে। মানিক এতটাই সাহসী লেখক যে, মানবমনের চোরাগলিতে দৃষ্টি ফেলে উন্মোচিত করেছেন নিষিদ্ধ কামনা ও তার জটিলতাসমূহ।

'গুপ্তধন'—মানুষের ঈর্ষা ও প্রতিশোধপরায়ণতার গল্প। শোষিতের ওপর শোষকের নিপীড়নই সমাজের শেষ সত্য নয়, বরং প্রতিটি ক্রিয়ারই যে রয়েছে সমমানের প্রতিক্রিয়া—সে সম্পর্কেও মানিক ছিলেন সচেতন। নির্যাতিত ব্যক্তি যত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হোক তার বিক্ষোভ প্রতিবাদ বা প্রতিশোধপরায়ণতাও অত্যাচারীর অস্তিত্বে অব্যর্থ আঘাত হানতে সক্ষম—মানিকের এ গল্প সেই সত্য নির্মাণে সার্থক। 'গুপ্তধন' মানুষের পশুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার গল্প। জমিদারের নিষ্পেষণের শিকার ভীমের চরিত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে তার দোষগুণ কিংবা তার নীতিহীনতা ও নীতিনিষ্ঠার সমাহারসহ। লাঠিখেলায় পারদর্শী বেঁটে-শীর্ণকায়-অকালবৃদ্ধ গোবেচারী ভীম গরু-ছাগলের দুধ-বিক্রির মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ভদ্র উপায়ে জীবিকার্জন করলেও গ্রামবাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর ছিল না। এর কারণ সাহায্যপ্রত্যাশীদের হতাশ করা, প্রতারকদের উল্টো ঠকানো প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাঁদরের মতো তার মুখ ভেংচানো স্বভাব সবার গায়ে জ্বালা ধরাত। সবার সঙ্গে হালকা হাসি-তামাশা কিংবা ছেলেমানুষী কৌতুকপ্রিয়তা—এসবও ছিল সবার অপছন্দ। অনেকগুলো খাপছাড়া শখের মধ্যে বাগদি নারী কুকির প্রতি তার আকর্ষণ ছিল অন্যতম। সে কারণে গ্রামবাসীর সাহায্যে উদারহস্ত না হলেও বাগদিপাড়ার অস্পৃশ্য জনসমষ্টির কল্যাণে ভীম ছিল নিবেদিতপ্রাণ। তার কূটবুদ্ধির সহায়তা বাগদিসমাজকে নানা সময় প্রকট সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরলপ্রকৃতির এই মানুষটির কাছে জীবনের বঙ্কিমতা ধরা পড়ায় তার আচরণে স্ব-সমাজবিদ্বেষ প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল। আর তাতেই সবার মন গিয়েছিল বিষিয়ে। একদিকে অস্পৃশ্য অথচ সরল মানুষের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে কুটিল স্বসমাজের প্রতি বিরাগ, একদিকে সততাপূর্ণ জীবনধারণ, অপরদিকে প্রবৃত্তি বশ্যতা এরই যুক্তবিন্যাস—ভীম চরিত্র হয়ে উঠেছে তাৎপর্যময়। নিরক্ষর কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ শুধু কাউকে ভালোবেসেই ঘটিয়ে দিতে পারে সর্বনাশ—এমনকি নিজেদেরও সর্বনাশ—একথা প্রতীয়মান হয়েছে গুপ্তধনে। সমাজের বঙ্কিম কুটিলতা হিংসাবিদ্বেষ প্রভৃতি যে বিষবাষ্প সৃষ্টি করে তা ব্যক্তি মনকেও অনিবার্যভাবে আচ্ছন্ন করে কলুষতায়। ভীম বন্যাবিরোধী গ্রামরক্ষা বাঁধ ধ্বংসের মাধ্যমে সবাইকে প্লাবিত করে

তার ক্রুদ্ধ ও অভিমানহত মনের পরিতৃপ্তি ঘটায়। আর ভীমের আহ্বানে অর্থলোভী, অসেচতন, নিরক্ষর মানুষেরা ঘটায় নিজেদেরই সর্বনাশ!

'বিষাক্ত প্রেম' ও 'প্যাঁক' গল্পের প্রধান উপজীব্য প্রেম হলেও এখানেও জটিল মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যবিত্তজীবনে ভদ্রলোকি আবরণের যে অন্তসারশূন্যতা—বারবার মানিক তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মধ্যবিত্ত হল সেই শ্রেণী যারা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়িষ্ণু, ভঙ্গুর, শ্রীহীন হলেও উপরের আলগা চটক ছাড়তে নারাজ। 'প্যাঁক' গল্পটিতে এই মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীকে আমরা সমান্তরালভাবে পাই। এই দুই শ্রেণী একই বাড়ির উপর ও নিচতলার বাসিন্দা। গল্পের নায়ক মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুশান্ত—যাকে নিয়ে অনাথবন্ধুর ভাবনা—

'ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর ড্রাইভিং শিখিবার কি দরকার, রিকশা টানুক না সুশান্ত? একই কথা তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন।'

অবশেষে উপরতলার সুশান্ত নিচতলায় নামে এবং মোটর চালনাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। আলগা চটক ভুলে মধ্যবিত্তকে আমরা শ্রমজীবী মানুষের কাতারে দেখি! এবং জীবন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মধ্যবিত্তের মনোজগত বদলের সঙ্গে সঙ্গে কলমের ভাষাও আমূল বদলে যায়!

'বিষাক্ত প্রেম' নামকরণ হলেও এই গল্পে শেষমেশ বিষ নয়, প্রেমই জয় লাভ করেছে। যদিও পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির গোপন অভিলাষে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্ক! সত্য ও সরলা—এই দুই নরনারীর একজন চোর, অন্যজন বারবণিতা। এই দুই জনের যে চিত্তসংকট—অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত মানবেতর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, নরনারীর ক্ষেত্রেই কেবল সত্য নয়, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বেশেষে স্বার্থতাড়িত, প্রলোভনে পরাজিত, আত্মসুখবিভোর সব মানুষই এর অপ্রতিরোধ্য শিকার। জীবনের যে গৌরবদীপ্ত মহিমা—পরার্থপর জীবন বৈশিষ্ট্য—অঙ্গীকারের মধ্য দিয়েই তার সাক্ষাৎ মেলে। ফলে চোরের মাঝেও আমরা মানবীয় সংবেদনার স্ফুরণ লক্ষ করি এবং শেষমেশ জয় হয় মনুষত্বের।

নির্জলা দাম্পত্য প্রেমের গল্প

'মহাজন' গল্পে দাম্পত্য প্রেম এসেছে ঠিক বজ্রপাতের মতো হঠাৎ করে! গল্পের শুরুতে বোঝার উপায় নেই বাঙ্গার মনোজগত। এমনকি বিধু শেখের চরিত্রও রহস্যঘেরা। গল্পের শেষে একের প্রতি অন্যের আকুতির প্রকাশ দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যেতে হয়। গ্রাম্য পরিবেশ ভিত্তি করে এমন মার্জিত দাম্পত্য প্রেমের গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল বলা চলে।

'মমতাদি' গল্পটিও প্রায় একই ছকে লেখা। কিন্তু এই গল্পে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে আরো বিস্ময়করভাবে। মমতাদি নামের নারীটির রহস্যময় চরিত্র, তুখোড় ব্যক্তিত্ব আর অনিঃশেষ ভালমানুষীর আড়ালে হঠাৎ প্রেমকাতর হৃদয় উন্মোচনে হোঁচট না খেয়ে উপায় থাকে না। অত্যাচারী স্বামীর প্রতি মমতার কাম নাকি প্রেম যখন সাপের মতো ফণা উঁচিয়ে দাঁড়ায় পাঠকের চক্ষু তখন কপালে উঠে যায় মহাবিস্ময়ে। ওই ফণা তোলা সাপই মমতার হাত হয়ে নগেনের কণ্ঠ পেঁচিয়ে দাম্পত্য প্রেমের রহস্য ঘোষণা করে! গল্পের উত্তম পুরুষটির মতো পাঠকও যা দেখে পালিয়ে বাঁচে। এ এক বিস্ময়কর গল্প!

'বন্যা' গল্পটিতেও দাম্পত্য প্রেম প্রকাশ পেয়েছে তীব্রভাবে। 'বন্যা' বাঙালিজীবনে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়—। স্বভাবসিদ্ধ আচরণে প্রকৃতি অত্যন্ত নিরাসক্ত ও নির্বিকার; ফলে মানবজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমন কিছু ক্ষত বা আঘাত সৃষ্টি করে, রূপগতভাবে যা অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়। 'বন্যা' গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে মানিক প্রকৃতির এই মমতাহীন ক্রূর স্বভাবকেই পরিস্ফুটিত করেছেন। প্রকৃতির ভয়ানক রূপচিত্রণের পরিবর্তে মানিক মানবজীবনে তার দয়াহীন প্রভাবের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। আলতামনির জীবনে দাম্পত্যপ্রণয় অনুরাগে দীপ্ত ও তাৎপর্যময়। গৃহকে প্রজ্বলিত করতে সক্ষম পরপুরুষের এমন কামনার অগ্নি কিংবা বন্যার মধ্যেও স্বামীর মদসেবন—এর কোনটাই আলতামনির অনুরাগকে এতটুকু স্তিমিত হতে দেয় না। যুগযুগের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি নারীর পতিভক্তি বা পতিপরায়ণতায় চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ গল্পে প্রেম-চিত্রের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে প্রকৃতির দয়াহীন ছোবল। যা থেকে কোনো মানুষের নিস্তার নেই!

বুর্জোয়াশ্রেণীর নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদের গল্প

দিক পরিবর্তন-এ ঝি সখি কম বয়সী ও বিধবা! মালিক মনোহর ডাক্তারের চরিত্র ভালো। এই ভালো চরিত্র একদিন স্ত্রী ও সন্তানদের সিনেমায় পাঠিয়ে সখিকে ভোগ করে। সখির আবার নীতিজ্ঞান প্রখর। মালিকের আগে কোনো দেবতার পায়েই সে নিজেকে উৎসর্গ করেনি!

'সকলেই প্রলোভন দেখায় কিন্তু মনোহরকে সখি এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে তার মাইনে করা চাকরের প্রলোভন সে অনায়াসেই জয় করে চলে। কম্পাউন্ডার একদিন একটি পাঁচ টাকার নোট সখির আঁচলে বেঁধে দিতে গিয়েছিল পারেনি।

অথচ, পাঁচটা টাকা সখির এক মাসের উপার্জন।'

তা ডাক্তার মনোহরের জল তেষ্টা পায়!

'জল? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে?'

ফলে মনোহরের আসলে সখিতেষ্টা পায়। এবং সে তেষ্টা মিটেও যায় অনায়াসে।

তাছাড়া টাকায় কিনা হয়?

সখি মনোহরের ছেলের মা হলেও তা ধামাচাপা পড়ে যায়! আর সখি তার মনের দিক পরিবর্তন করে!

'সরীসৃপ' মানিকের প্রতিনিধিত্বশীল ও বহুল আলোচিত একটি গল্প। এই গল্পে অনেকগুলো চরিত্র। চারু, পরী, বনমালী, রাম তারণ, ভুবন, খোকা, কনক, কেষ্ট, পদ্ম। সব চরিত্রকেই যথাযথ রূপ দেয়া হয়েছে—হয়তো দু'একটি বাক্যে বা তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপে, তাতেই তারা জীবন্ত।

দুইবোন—চারু ও পরীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও ভালোবাসার টানাপড়েন পুরো গল্পে বিবৃত। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার অবলেশমাত্র আর থাকেনি! ঈর্ষা এমন প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, চারু পরীকে হত্যার মতলব এঁটে কলেরা রোগীর ব্যবহৃত পাথরের বাটিতে প্রসাদ খেতে দেয়; আর পরী তো বোধহীন ভুবনকে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার বুদ্ধিই দিয়ে দেয়। এসব হত্যা ও হত্যার চেষ্টার তুলনায় বনমালীর আচরণের নির্মমতা ও ভয়াবহতা কোনো অংশেই কম নয়। বরং বেশি। কিন্তু তারপরও কোনোরকম শাস্তি পাওয়া দূরে থাক সামান্য অনুতাপও তার মাঝে দেখা যায়

নি! এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়—বনমালী ধনিক শ্রেণীর। এ গল্পে যাদেরকে আমরা নানাভাবে শাস্তি পেতে দেখি তারা সকলেই বনমালীর আশ্রিত। বনমালী রাজা, ধনী, ক্ষমতাবান! এসব কারণে খোদ ঈশ্বরের চোখেও তিনি ধুলা দেন নাকি ঈশ্বর নিজেই অন্ধ বোঝা মুস্কিল। নইলে চারুর প্ল্যান বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে—চারু নিজেই কলেরায় মারা যায়! ওদিকে পরীর ঠাঁই হয় ঝি-চাকরদেরও নিচে যাদের অবস্থান তাদের সঙ্গে। অথচ বনমালীর কিচ্ছু হয় না!

'সরীসৃপ' গল্পে মনুষত্বের লেশমাত্র কোথাও পাওয়া যায় না! এমনই জটিল তামসী গল্প। যে গল্পকে নর-নারীর কদর্য মন, লোভ, লালসা, কাম, ক্লেদ আর বিবেকহীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যা পড়া মাত্রই পাঠক শিউরে ওঠে! কিন্তু লেখক কেমন নির্বিকার! ধনিক শ্রেণীর প্রতি তার এই পক্ষপাত প্রমাণ করে যে উঁচু ও নিচুতলার ব্যবধান তিনি ঢের আগেই উপলব্ধি করেছিলেন! বনমালীর বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে থাকাতে ঈশ্বরও যে ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের 'নদীর বিদ্রোহ' একেবারেই ভাবালুতা ভরা একটি গল্প। আর গল্পগুলোকে মিনি গল্পই বলা চলে।

সেল্‌ফ অ্যাপিয়ারেন্স

কোনো কোনো গল্পের উপসংহারে মানিক নিজেই হাজির হয়েছেন! আলোচিত গ্রন্থের তিনটি গল্পে মানিকের এই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়—

ক. মহাজন খ. বন্যা গ. সরীসৃপ

'কয়েকজন কবি পৃথিবীর মানুষের জন্য কাব্য-রস পরিবশেন করিয়া গিয়াছেন এবং কাব্যরসটা সব রসের সেরা রস, এইজন্য পুরুষ মানুষের পক্ষে কবিত্ব করা আত্মহত্যার শামিল। বিধুশেখর কাব্যরস উপভোগ করিয়াছিল, ভালই করিয়াছিল—সকলেরই করা উচিত। কবি না হইয়া কবিত্ব করিতে গেল কোন হিসাবে? কে আজ ত্রিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করিবে? কোন মহাজনের এত ক্ষতি সহ্য হয়?

(মহাজন)

'বন্যা মানুষকে রেহাই দেয় না। সাবিত্রী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে পর্যন্ত বন্যা সাবিত্রীর স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইরে পারে, সাবিত্রী বিধবা হইয়া যায়।'

(বন্যা)

'ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

(সরীসৃপ)

লেখকের এই উপস্থিতিকে অনেকে বলেছেন 'সিনিক' দৃষ্টির কঠিনতম ব্যঞ্জনা! কিন্তু মানিকের গল্প এতটাই শক্তিশালী যে যাত্রাপালার বিবেকের মতো এই 'সেল্‌ফ অ্যাপিয়ারেন্সের' দরকার পড়ে না। 'মহাজন' গল্পের ক্ষতি পাঠক পূর্বেই অনুধাবন করে। 'বন্যা' গল্পেও তাই। সাবিত্রীরাও প্রকৃতির ছোবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না! 'সরীসৃপে' মানুষের মনের ক্লেদ-কদর্যতা এতটাই প্রকটভাবে দৃশ্যমান যে, পশুরাও তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বনে আশ্রয় নিবে, এই ইঙ্গিত না দিলেও চলে।

কিন্তু মানিক এতকিছু স্পষ্ট বলেও যেন ঠিক আশ্বস্ত হতে পারেননি! ফলে নিজেই হাজির হয়েছেন এবং এটাই এখন ঐতিহাসিক সত্য। প্রয়োজন পড়ুক বা না পড়ুক লেখকের এই 'উপস্থিতি' এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য আর আমাদের নেই...!

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা : ভূইয়া ইকবাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, ফেব্রুয়ারি, প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২. মানিক গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, জুন, প্রকাশক : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি., কলকাতা।

৩. শ্রেষ্ঠ গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা : আব্দুল মান্নান সৈয়দ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, ফেব্রুয়ারি, প্রকাশক : অবসর, ঢাকা।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, এপ্রিল, বাঃ এ, ঢাকা।

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, জানুয়ারি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিকী স্মরণ, সম্পাদনা : ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, মে, অবসর, ঢাকা।

৭. কালি ও কলম, সম্পাদনা : আবুল হাসানাত, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা প্রকাশকাল :।

সোনার চেয়ে দামী : বদলে যাওয়া জীবনের গান

পারভেজ হোসেন

দেশভাগ মানে এক সামাজিক-এর মৃত্যু, পরিভাষায় 'দি ডেথ অব দি সোশ্যাল'। সে মৃত্যু ঘটে গেছে। পিতৃপুরুষের শেকড় পোঁতা বাস্তুভিটা ছেড়ে আর এক দেশে এসে পানার মতো ভেসে বেড়ানো অথবা খুঁটি গেড়ে নতুন ভিটা খাড়া করার মতো ঘটনাও কম ঘটেনি। মধ্যবিত্তের মেট্রোপলিটন বিকাশ ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিক্ষায়। পুঁজির গগনবিদারী চিৎকারে দিশেহারা মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিক। চারদিকে ছেলেমানুষি সব ফাঁকির খেলা— ভোগের অনর্থক আমোদ।

এমনি এক সময়ে চাকরি খোয়ানো বেকার কলেজ শিক্ষক রাখাল, বৌ সাধনা আর একরত্তি ছেলে নিয়ে গুটিকয়েক টিউশনি ঠুকে কলকাতা শহরে কোনোমতে জীবন ধরে আছে। তেলের অভাবে বেগুন-পোড়া দিয়ে দুটি খুদ মেশানো চালের ভাত খেয়ে উপার্জনের ফিকির খুঁজতে বের হতে হয় রাখালকে। মধ্যবিত্তের বিপদে পড়া এমনই সংসার তাদের। 'নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলোও তাদের মেটে না।' আর বৌ সাধনা গায়ে কষ্ট না মেখে মুখ বুজে সামলে যাচ্ছে সব, কেননা সে জানে 'গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা'। তবুও কথা যে বলতে হয়, কারণ একমাত্র সম্বল সোনার হারটা ছিঁড়ে পড়ে আছে। তার গলার হার না থাকায় কেউ কিছু না বললেও সে যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছে। সে যে অভাবে পড়ে হারটা বেচেনি, খুলে রেখেছে এ কথাটা চারপাশের লোকদের বলার জন্য তার মন আকুপাকু করে। সেকেলে মধ্যবিত্ত মনের কাছে সোনার যে মূল্য তাতে গয়নার অভাব যেন তার মনুষ্যত্বেরই অভাব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে তুমুল সংঘাত আরও ঘনিয়ে ওঠে একদিন, খালি গলায় রাখালের ভাগ্নি রেবার বিয়েতে যাওয়া না যাওয়াকে কেন্দ্র করে। নতুন কিনতে হবে না, ছেঁড়া হারটা বদলিয়ে আর একটা আনলেই হয়। কিন্তু তাতেও তো কিছু টাকা লাগে। সে সামর্থ্য রাখালের কই? শেষে সিদ্ধান্ত হয় ওজন কমিয়ে একটা আনলেই চলবে, গলাটা তো আর খালি রাখা যায় না। কিন্তু রাখালের না হয় টাকা হয় না কিন্তু তার যে সময়ও হয় না। ক্রমে ক্রমে দু'জনের ভাবনার অনৈক্য এবং বিবাদ ঘনিয়ে ওঠার এও অন্যতম কারণ।

রাখাল নিজে শিক্ষিত বিবেচনাসম্পন্ন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যুঝা মানুষ কিন্তু সাধনা তো তাও নয়। ঘরই তার পৃথিবী। মধ্যবিত্তের প্রচলিত প্রথায় আবদ্ধ তার জীবন। গলায় একরত্তি সোনা নেই বলে তাই তার সামাজিক মূল্যবোধ হুমকির সম্মুখীন। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে চারপাশের সবার নজর যেন তার খালি গলায়— যেন সবাই বলতে চাইছে, অভাবে পড়ে গলার সোনাটুকুও বেচে খেয়েছে স্বামী রাখাল। বিস্তর ভাবনা নানা অলিগলি ঘুরে হীনম্মন্যতায় কুঁচকে আনে সাধনার মনোজগৎ। আর রাখালও তো বেকারত্বের ঘানি টেনে টেনে অস্থির। স্ত্রীর সাথে অবস্থান্তরিত সম্পর্কের যে উতল হাওয়া খেলছে তা যে বিষিয়ে তুলেছে তার মন। দারিদ্র্যই এর মূল। কারণ,

'দারিদ্র্য রসকষ শুয়ে নেয় জীবনের; জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে।' তবুও রাখাল তার চরিত্র ধরে রাখে। মনোবল দমে এলেও মনুষ্যত্ব হারায় না। ছাত্রদের পড়ালেখায় ফাঁকি দিতে ভাবনা হয়। বেকার জীবন ঘোচাতে পড়শি রাজীবের দেয়া চাকরিকে জালিয়াতি জেনে প্রত্যাখ্যান করে সে। কিন্তু রাখাল কি শুধু এটুকুই জানে? রাখালের বুঝ কি শুধু এই-ই যে, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকাই মনুষ্যধর্ম? না, রাখাল আরও অনেক কিছু বোঝে, সে একটু ভাবপ্রবণও বটে। তার মন আগের দিনের ফুরিয়ে আসা জীবনধারার রসে মজে থাকলেও সে জানে জগতের মাঝে এক বিরাট পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে পৃথিবীতে যে পুঁজির রাজ্য কায়েম হয়েছে সে রাজ্যে পুরনো ধ্যান-ধারণার আর ঠাঁই নেই। মানুষের ঘর-সংসার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে সেই ঝড়ে। পুরনো ধাঁচের জীবন আজ অচল। তবুও মন মানে না। অভ্যাস পরিবর্তনের আদলে বদলে যেতে চায় না। একটি চাকরি, সীমাবদ্ধ জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে ছোট্ট সংসারে নিশ্চিন্ত জীবনের মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একদিকে পরিবর্তনের অনিবার্য আগ্রাসন, অন্যদিকে অভ্যস্ত জীবনের নৈমিত্তিক প্রশান্তির ভেতরকার দ্বন্দ্ব, মনোজাগতিক পীড়ন রাখালের প্রত্যাহিকতাকে তছনছ করে ফেলে। মরিয়া হয়ে ওঠে রাখাল। এখানে এসে ঔপন্যাসিক বলেন, 'ভাঙন ধরলে এমনি তির্যক গতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই শুরু হয় তার এঁকেবেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ নয় নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না।' এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কি-না জানি না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখাল সময় আর সুযোগ বুঝে এমন এক কাণ্ড করে বসে। গল্পের মোড় ঘুরে যায় লেখকের। পাঠকের চোখও ছানাবড়া হয়। অভ্যস্ত ভাবনায় যেন বোমা ফোটে। শেষ পর্যন্ত রাখাল দারিদ্র্যের সাথে লড়াইরত স্ত্রী সাধনার মনোবল ভেঙে পড়ার ভয়ে, একটুখানি সুখকে প্রশ্রয় দিতে, জীবনটাকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে নিস্তার দিতে ছাত্র বিশু'র মার বাক্স থেকে পর্যাপ্ত গহনার একটা অংশ চুরি করল?

তবে রাখাল চোর নয়। 'এ জগতে কারো কোনো ক্ষতি না করে একজনের লোক ঠকানো এক স্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগও সে গ্রহণ করেছে। তবে সে স্বীকার করে, নিজের হিসেবে যা-ই হোক, দশজনের হিসেবে তাকে চোরই বলা হবে। আসলে সাধনার স্বামী হয়ে থাকবার জন্য তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই করেছে।' নিজের পক্ষে এ রকম একটা যুক্তি খাড়া করেই ক্ষান্ত হয়নি রাখাল। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে পড়শি রাজীবের সাথে স্বর্ণ বিক্রির দু'হাজার টাকায় বিড়ির ব্যবসা ফেঁদে সংসারে একটা স্থিতি আনার প্রাণান্ত চেষ্টা চালায় সে। কিন্তু জীবন কখনোই কোনো অবস্থাতেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সংসারে একটুখানি সুখ এলেও রাখালের মনে নতুন নতুন অসুখ মাথাচাড়া দিয়ে খাড়া হতে খুব একটা সময় নেয় না।

অসম্ভব দক্ষতায় অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তির অনমনীয় ঋজু গদ্যের তীব্র তেজে মানিক, পাঠকের মধ্যে যে চাঞ্চল্য তৈরি হয় তাকে বাগে আনেন। উপন্যাসের গতিকে ব্যাহত হতে দেন না বরং উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'বেকার' এর সাথে দ্বিতীয় পর্ব 'আপস' এর একটা রফা করেন। প্রথম পর্বের এ পর্যায়ে সাধনার জীবনদৃষ্টিরও যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, জীবনযাপনের গৃহকোণটির ব্যাসার্ধও যে খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ না করলেই নয়।

সাধনা তার হারখানা রাজীবের স্ত্রী বাসন্তীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রির টাকায় নিজেই একগাছা কিনত কিন্তু প্রথাবদ্ধ বিশুদ্ধ গৃহিণী বাসন্তীর কথায় সংসার ধর্মের নানা তকমা তাকেও যে ভাবায় না তা নয়— সাধনা বলে, 'এ আমার জিনিস—

হোকনা তোমার জিনিস। এ তো শুধু তোমার সোনার জিনিস। তুমি নিজে কার জিনিস? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে? যতক্ষণ বাঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো?

সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ!

বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝানু হবে, পনেরো বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায়? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ!

এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে?

আরে কপাল! এ নাকি ফন্দি আঁটা? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে এটা। ব্যাটাছেলেদের মতো ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মতো মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আঁটার কী আছে? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ? ছেলেমানুষের মতো ঝোঁকের মাথায় চলবে? সাধ করে জেনেশুনে সুখশান্তি নষ্ট করবে? না ভাই, ওটা মোটেও কাজের কথা নয়।'

'রাখালের এনে দেয়া নতুন হার পরে সাধনা বেলার বিয়েতে যাবে। যাবে কী যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না? আবার ভাবে, কী লাভ হবে গিয়ে?' সত্যিই যাওয়া হয় না ওদের। সাধনা যেতে রাজি হয় না। 'হারটার জন্য অস্বস্তি বোধ হয়। নতুন হার বাক্সে তুলে রেখে সাধনা গলাটা আবার খালি করে ফেলে।'

সাধনার পৃথিবীতে এমন পরিবর্তন কী করে এল? আসবে না-ইবা কেন? সাধনা যে এখন পাড়া বেড়ায়। বাড়ির কাছের কলোনিটা ঘুরে এসে চোখ খুলে গেছে তার—'এত অসহায়, এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুনভাবে ভিত গাঁথে।' ছেলেবেলার বন্ধু বেলা'র স্বামী ধীরেনের জীবন, পূর্ববঙ্গ থেকে ভেসে আসা ভোলা'র বাপ-মায়ের বেঁচে থাকার লড়াই শিখিয়ে দেয় সাধনাকে, মনুষ্যত্বহীনতার আড়তেও জীবন খেলনা নয় মানুষের।

আবার নতুন এক প্রশ্ন জাগে সাধনার মনে, বিরোধ আর অশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকার কীইবা অর্থ থাকতে পারে? কিন্তু চাইলেই তো সব মিটে যায় না তবুও আকণ্ঠ সাধ জাগে তার সকলের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। শুধু তাই-ই নয় তার চারপাশে যাদের আপাত সুখী এবং ধনী জ্ঞান করত সে, যেমন আশা বা বাসন্তী তাদের জীবনের মেকি এবং ফাঁকিও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে সাধনা আর রাখালের কাছে।

আশার স্বামী সঞ্জীব আশাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে প্রচুর দেনা করে। আর এই দেনার দায়েই তাকে ঘরছাড়া হতে হয়, মাল ক্রোকে আসে আদালত। ধনী বলে আশা এতকাল যে সাধনা আর রাখালকে অবজ্ঞা করত সেই রাখালের কাছেই তাদের ছুটে আসতে হয়। বাসন্তীর স্বামী রাজীব ব্যবসা করে বেশ অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল কিন্তু একদিন

তার অংশীদারের চক্রান্তে সব নষ্ট হয়ে গেল। গায়ের গয়না বেচে এখন তাদের সামলাতে হচ্ছে সব। কাছ থেকে দেখা এদের দারিদ্র্যে সাধনার যেন মোহমুক্তি ঘটে। তার মনে হয় সংসারের সুখ, ভালোবাসা, স্বাচ্ছন্দ্যের মূল্য অনেক, এমনকি তা মহামূল্যের সোনার চেয়েও দামি। শুধু এ দিয়েই দীর্ঘকালের ঘেরাটোপে বদ্ধ প্রথাশ্রয়ী, সংসারব্রতী, স্বামী-সন্তান-সর্বস্ব এক নারীর আত্মউন্মোচনের ছবি আঁকেননি বাংলাভাষার এই অসামান্য কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বরং এই সাধনা যে উত্তরকালে শুধুমাত্র নারী নয় মানুষ পরিচয়ে পুরুষের পাশাপাশি নিজের অবস্থানকে দৃঢ়ই করবে না, দুর্বলের পাশে দাঁড়িয়ে সংগঠিত হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের যত অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে লড়বে, মানুষের ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করবে। এর শিকড় তিনি প্রোথিত করেছেন— উপন্যাসের প্রথম খণ্ডেই আমরা পেয়েছি, সাধনাদের সাবলেট আশার স্বামী সঞ্জীবের সাথে গায়ে পড়ে কথা বলা প্রসঙ্গে সাধনার অভিব্যক্তিতে— 'মনে হয় গায়ের জোরে সে যেন সঞ্জীবের কাছে সার্টিফিকেট আদায় করেছে যে সেও একটা মানুষ, একজন বেকার মানুষের বউ হলেও। এরকম সার্টিফিকেটের দরকারও তার হচ্ছে?

ছি ছি!'

এই ধিক্কারের মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয় যে, লেখক এই নারীর মধ্যে গোড়া থেকেই এমন একটা প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে কিনা অন্তত এটুকু বোঝে যে, মানুষ হয়ে জন্ম নিলেই হয় না, মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়।

রাখালের মনে ধারণা জন্মেছিল যে সংসারে দারিদ্র্যই সব অশান্তির মূল। এই অভাবের যন্ত্রণাই তাকে চুরি পর্যন্ত করতে হল। কিন্তু চুরির টাকায় ব্যবসা করে অভাবের অশান্তি থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলেও পরবর্তীকালে সঞ্জীব আর সজীবের পরিণতি দেখে তার মধ্যে বিপরীত ক্রিয়া শুরু হয়। হাতে টাকা পেয়েও সে তার টিউশনি ছাড়ে না। বিশু'র মার গয়না চুরি সে করেছে বটে কিন্তু বিশুকে সে নিয়মিত পড়িয়েই চলে। পূর্ববঙ্গের জমিদারি ছেড়ে এই বিশুদের পরিবার এখানে যেভাবে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছে মাটিতে নতুন করে শেকড় গাড়বার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার সাথে যেন একাত্ম হতে চায় রাখাল। প্রায় প্রতিটি প্যারায় লেখক রাখালের চোখ দিয়ে দেখা প্রতিটি প্রাত্যহিকতা তন্নতন্ন করে খুঁজে বিশ্লেষণের কাঠগড়ায় তুলে পাঠকের সামনে হাজির করছেন আর এর মধ্যে দিয়েই রাখালের চরিত্রটি ক্রমশ স্পষ্ট এবং পরিণত করে তুলছেন। উপন্যাসের গল্পটিকেও প্রয়োজনীয় বিস্তৃতি দানের পর তার ধারাবাহিকতায় অনড় রেখে এবার গুটিয়ে আনতে চাইছেন যেন।

রাখাল জানে, 'অবস্থার ফেরে সোনা যখন চাপ দেবার সুযোগ পায় মানুষের বিবেক, তখন বিবেকে চাপানো সেই সোনার চেয়ে ভারী আর কিছুই থাকে না এ জগতে।' রাখাল নিজেকে চোর ভাবে, বিবেক তাকে কামড়ায়। আর বুদ্ধি দিয়ে সে সেই বিবেককে বোঝায়— বিশুর মার গয়না সে চুরি করেনি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। একেবারে উপায়হীনের মতো নিয়েছে। তবুও বিশুদের বাড়িতে ঘটা নানা ঘটনায় তার মনে নানা চিন্তা চড়চড়িয়ে ওঠে। নিজের বাড়িতেও প্রসঙ্গক্রমে এ নিয়ে ভাবনা এলে বুকের ওপর রেখে বউকে আদর করতে করতে সে ঝিমিয়ে পড়ে। এও এক দুর্বোধ্য নতুন অভিজ্ঞতা রাখালের।

এরকম নানা দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতায় পড়ে রাখাল একেবারেই একলা হয়ে পড়ছিল যেন। কেননা সাধনাও আজ আর ঘরের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ কোনটিতে নেই। সাধনা বেরিয়ে পড়েছে সাধারণের জীবনে। মেয়েদের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে সাধনাও তার অংশীদার। মেয়েরা এখন সংগঠন করে; আন্দোলন করে, সভায় বক্তৃতা দেয়। সাধনাও সভায় যায়। নিজের মতামত রাখে।

পাশের দারিদ্র্য আর ক্লেশদীর্ণ কলোনিতে যাতায়াতটাও বেশ বেড়ে যায় সাধনার। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে এসে যারা নতুন দেশে তাদের শিকড় গাড়ার কোনো উপায় করতে পারেনি সেই ভোলা'র মাদের ডিম আর সবজি বেচে ভেসে বেড়ানো জীবনের সান্নিধ্যে এসে সাধনা তার নিজের মধ্যে আর এক জীবন আবিষ্কার করে, যে জীবন দোয়েলের শালিখের নয়, নিপীড়িত-নির্যাতিত, অবহেলিত, দুর্বল, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার মতো দৃঢ়, সাহসী, সপ্রাণ মানুষের জীবন। কিন্তু উপন্যাসে ব্যাপারটা যেভাবে এগোয়, যে প্রক্রিয়ায় ঔপন্যাসিক তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ প্রান্তে এসে, তাতে সন্দেহ জাগে, উত্তরকালের লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি তার গভীর দায়িত্ববোধ থেকে ইচ্ছাপূরণের পথে এক স্বপ্নযাত্রায় নেমেছেন? কেননা, সাধনার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলে বিভিন্ন পাবলিক মিটিং থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসে। দস্তুর মতো নেত্রী সে। আর একই আসরে স্বামী রাখালের সাথে মতান্তর হলে গোঁয়ারের মতো নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেও কোনো দ্বিধা হয় না তার। রাখাল এতে ভয়ানক বিব্রত হয় কেননা রাখাল বুঝতে পারে চারদিক থেকে তাদের জীবনে ভাঙন যেন এগিয়ে আসছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চিরায়ত নিয়ম এই যে, তাদের স্বার্থ হবে অভিন্ন। কিন্তু সাধনা যে কেবলই রাখালের বিরোধিতা করে চলেছে। রাখালের একাকিত্বের সাথে চাপা যন্ত্রণাটা বেগ পায়। তার মনে হয় সাধনার মন বিগড়ে গেছে, সংসারে বিতৃষ্ণা এসেছে। কিন্তু 'প্রাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয়?' রাখাল সাধনাকে বলে, 'আমি সন্ন্যাসী নই, আদর্শ নিয়ে আমার দিন কাটে না, জীবনটা আমি ভোগ করতে চাই। কিন্তু এ জীবনটার উপরে আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রাণ দিয়ে এত চেষ্টা করলাম— সব গেল ভেস্তে। মনের দুঃখে অবশ্য মদ খাচ্ছি না— ক'দিন থেকে ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব! কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলাম না। এ ভাবে চলে না, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে— তবু মনটা ঠিক করতে পারছিলাম না। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। রাজীবের সঙ্গে একদিন খানিকটা গিলে দেখলাম— প্রাণটা ঠাণ্ডা করা যায়। রাত্রে তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমানো যায়।'

সাধনা এখন আর কোনো বিষয়ে অত সোজা সিদ্ধান্ত করে না। তলিয়ে বুঝতে চায়। জানার উদগ্র আগ্রহে কাতর সে জানে, 'এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিত বিড়ম্বনা! দেশজুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বৈকি!'

*সোনার চেয়ে দামী*তে সংসার জীবনের ব্যক্তিজীবনের এহেন টানাপড়েন যখন চরমে উঠেছে, যখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটা সুরাহার কিংবা বলতে পারি উপন্যাসের একটা সার্বিক রূপ তৈরির দায় যখন লেখক উপলব্ধি করলেন তখন তার অসাধারণ দুই সৃষ্টি রাখাল আর সাধনাও যেন নিজেদের মতো(?) ধাতস্থ হতে চাইল। আর এর সূচনা হয় তখন যখন পাশের কলোনির মালিক প্রভাত বাবু কলোনিটা তুলে কারখানা স্থাপনের মতলব আঁটেন। ভয় দেখিয়ে না পেরে অবলম্বন করেন এক অভিনব

কৌশল। তার নতুন সেই কারখানায় কলোনির মানুষগুলোকেই কাজ দেবেন। সেজন্য তিনি দূরে তারই এক জলা জমিতে নতুন ঘর তুলে ওদের উঠিয়ে দিতে চান। মিটিংয়ে বসে রাখাল প্রভাত বাবুর চালাকি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। সাধনার সন্দেহ হয়েছিল গোড়াতেই। শেষে সাধনার আপত্তিতেই প্রভাতবাবু লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ নিয়েও রাখাল আর সাধনার মধ্যে একটা ব্যবধান খাড়া হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পড়ে প্রভাতের সব চাতুরী যখন ধরা পড়ে, প্রভাতের প্রতিশ্রুতি যখন মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন রাখাল স্বীকার করে যে তার ভুল হয়েছে। অনুশোচনা হয় রাখালের আর সাধনার ওপর গড়ে ওঠা সব রাগ-অভিমান, হয়তো কিছুটা ঈর্ষাও একেবারে নিভে আসে।

তাদের নতুন ভাড়াটে সুমতি আর অশোক যাদের উচ্ছ্বাসহীন, গদগদভাবহীন হাসিখুশি, নববিবাহিত সতেজ জীবন যা প্রায় আদর্শ হয়ে উঠেছিল রাখাল-সাধনার— তাও যেন রাখালের কাছে সাধনার স্বামীভক্তির জন্য, স্বামী সেবার জন্য অস্থিরতা, মিথ্যা প্রতীত করল। রাখাল অনুভব করল, সাধনার ঘরের কোণের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা বদলানোই দরকার, আগের দিনের সহজ শোকের কাতরতা এখন অচল। আরও কিছুদিন পর এও ভাবল, আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে ওরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতায় ভেতর দিয়ে পার করেছে সময় তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে, স্বামী ভক্তিটক্তি অনেক কিছু।

সাধনা এখন বলতে ভোলে না, 'আগের মতো ভাবতে পারি না তোমাকে। তুমি আদর করবে আর আমি আহ্লাদি খুকির মতো গলে গলে যাব ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে।'

এক পর্যায়ে রাখালও বলে, 'বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে তার কোনরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসার মূল কথা যে, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ, এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এ সব ফাঁকি আর চলবে না।'

বহুদিনের বহু অস্থিরতা, অদূরদর্শিতা কূপমণ্ডূকতা পেরিয়ে তারা যেন এক নতুন জীবনের পথে পা ফেলতে শিখেছে। পুরনো ভাবধারা পুরনো সংস্কার মাড়িয়ে সমাজে যে পরিবর্তনের আলোর আভা দেখা দিয়েছে তারাও তার সমান অংশীদার।

অসামান্য বিশ্লেষণী দক্ষতা, অবিশ্বাস্য সংযমী কলম মানিকের। একটিও বাড়তি কথা তিনি বলছেন না, বলাতেও চাইছেন না। মাঝে মাঝে বিষমাখা ছুরি চালিয়ে দেন নিপুণ হাতে— সম্পর্কের উপাদানগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিতে। যেন আমরা তলিয়ে দেখার সুযোগ পাই। মিথ্যা ধ্যান-ধারণায় ডুবে থাকা জীবনের গায়ে বিষক্রিয়া শুরু হলে পুরনো মূল্যবোধের মহামিনার ভেঙে পড়ে। দারিদ্র্যে, ক্লেশে, নির্জীবতায় আচ্ছন্ন জীবনের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও ছুড়ে দেন মানিক। ধোপা যেমন ধূলিমলিন কাপড় শানের ওপর কাচেন তেমনভাবে আছড়িয়ে আছড়িয়ে কেচে চলেন যাপিত-জীবনের, সংসার ধর্মের চিরাচরিত আখ্যানকে। পাঠকের মন বিষাদে ভরে ওঠে— তরতর করে কাহিনীর রস শুষে এগোবার কোনো উপায় থাকে না। স্তবকে স্তবকে মন কষে ধীরে সুস্থে এগোতে হয় জীবন ক্ষয় করা অভিজ্ঞতা-অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে আঁকা নিত্যদিনের নিষ্ঠুর বাস্তবের ছবিতে কী বলছেন কেমন করে বলছেন/ তা অন্বেষণের তাগিদে।

বন পেরোনোর পথ

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

ক. শশী ডাক্তারের গল্প

'পুতুল নাচের ইতিকথা' আদ্যোপান্তই শশী ডাক্তারের গল্প। তবে দশম এবং একাদশ দুটি পরিচ্ছেদে ব্যাপ্ত মতি ও কুমুদের গল্পটির স্বাবলম্বিতা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। গাওদিয়া গ্রামে বিনোদিনী অপেরা পার্টির আগমনসূত্রে শশীর বন্ধু কুমুদের আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এতে খেয়ালি স্বভাবের কুমুদের সঙ্গে শৃঙ্খলাপরায়ণ শশীর একটি তুলনার অবকাশও তৈরি হয়েছিল। অপরদিকে যাত্রার প্রবীর তথা কুমুদের প্রতি কিশোরী মতির মোহ জন্মানোরও প্রয়োজন ছিল যাতে শশী-কুসুমের চৌহদ্দীতে অন্য কোন নারীর রমণীয় উপস্থিতি না-থাকে। বস্তুত মতির সঙ্গে বিয়ে পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল কুমুদের উপস্থিতি, কিন্তু পরবর্তীতে কুমুদ ও মতির বিশদ দাম্পত্য উপাখ্যান এ উপন্যাসের মূল কাঠামোর অন্তর্সঙ্গতি ক্ষুণ্ন করেছে।

এ কথা বলার তাৎপর্য আদৌ এই নয় যে উপন্যাসের আখ্যানে এককেন্দ্রিকতা আদর্শস্থানীয় কোন কৌশল। বস্তুত আখ্যানের কেন্দ্রে একজন নায়কের আধিপত্য বজায় রেখেও অনেকগুলো চরিত্র সমতালে বিরাজমান থাকতে পারে, হয়তোবা এরূপ ক্ষেত্রে বিষয়গত ঐকতানের প্রয়োজন হবে যার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হবে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্লগ্নতা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'যাও পাখি' উপন্যাসে এরকম বহুকেন্দ্রিক একটি আখ্যান পরিলক্ষিত হয়।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রধানত শশী ডাক্তারের গল্প হলেও অনেক মানুষের সমাবেশে সমাজের একটি অখণ্ড চিত্র আভাসিত হয়ে উঠেছে। যাদের আমরা দেখি যেমন উপন্যাসের শুরুতেই বজ্রপাতে নিহত হারু ঘোষ, হারুর পুত্র পরান ও পরানের বৌ কুসুম, যাদব পণ্ডিত ও স্ত্রী পাগলদিদি, বৃদ্ধ যামিনী কবিরাজ ও যুবতী স্ত্রী সেনদিদি, শশীর পিতা গোপাল দাস ও অনুজা বিন্দু, বিন্দুর বর কলকাতাবাসী নন্দ, মতি ও কুমুদ, এরা সবাই একটি দৃঢ় সংহত প্রেক্ষাভূমি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমনকি মুদি দোকানি শ্রীনাথ, জমিদার শীতল বাবু, ভূতোর বাবা বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, নৌকার মাঝি গোবর্ধন, কুসুমের বাবা অনন্ত, যাদের উপস্থিতি নেহায়েৎই আপতিক, প্রায় গুরুত্ববিহীন, এদের ভূমিকাও ঔপচারিক। গাওদিয়াকেন্দ্রিক এই পটভূমিতে নানা ঘটনা ও অঘটনের মধ্য দিয়ে শশী চরিত্রটি ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত এ চরিত্রটি একদিকে কাহিনীর বুনটকে দিয়েছে মেরুদণ্ডের দার্ঢ্যতা, অন্যদিকে অন্ধকারে জোনাকীর মতো একটি গতিসূত্র জ্বেলে দিয়েছে।

২.
উপন্যাসের দ্বিতীয় পাতায় হারু ঘোষের নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধারের লক্ষ্যে পাড়ে নৌকা ভেড়ানো হলে মাঝি গোবর্ধন বলে, 'আপনি লায়ে বসবে এস বাবু, আমি লাবাচ্ছি'। এ প্রস্তাবে শশীর উত্তর 'দুর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই' এর মধ্য দিয়ে শশীর চরিত্র নির্মাণ শুরু হয়। সংস্কারমনস্কতার অব্যবহিত পরেই যুক্তিশীলতার লক্ষণ গেঁথে দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যুত্তরে গোবর্ধন যখন বলে 'ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?' তখন শশীর যুক্তিশীলতা প্রাধান্য লাভ করে; সে বলে, 'আয় তবে, দুজনে ধরেই নামাই।' উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে 'জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে' অবধি চরিত্র নির্মাণের পালা অব্যাহত থেকেছে।

লক্ষ্য হয়, মড়া ছোঁয়ার প্রশ্নে সংস্কারের ওপর যুক্তির প্রাধান্য দিতে বিলম্ব করেনি শশী, যা বাস্তবমনস্কতার পরিচায়ক; একই সঙ্গে তার চরিত্রের স্থিতিস্থাপকতারও অভিজ্ঞান। এই স্থিতিস্থাপকতার উৎস কী তা মনোযোগী পাঠকের পক্ষে ন্যায্য কৌতূহলের বিষয়। গ্রামের সন্তান শশী শহরের মেডিকেল কলেজে পড়ে ডাক্তার হয়েছে। বন্ধু কুমুদের সাহচর্যে সে পৃথিবীর সুপ্রসার ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। শাহরিক জীবন এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন তার গ্রাম্যতা ঘুচিয়েছে যদিও তবু আশৈশব আহৃত নানা দুর্মর গ্রামীণ সংস্কার রয়ে গেছে তার চরিত্রের গহনে যা উপেক্ষা করে সে কখনই নিজের মতো হয়ে উঠতে পারে না। শশীর মানসিক দোদুল্যমানতা আখ্যানের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিলক্ষ্য।

অন্যদিকে একেবারেই গ্রাম্য মেয়ে কুসুম শশীর তুলনায় অনেক স্থিতধী। সে স্বীয় উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী, নিঃসংকোচ। তবু কুসুম নয়, শশী ডাক্তারই এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, আপাতদৃষ্টিতে প্রোটাগোনিস্ট। কুসুমের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ চরিত্রটি পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়ে তোলেন নি। শশী ডাক্তারের নীরব প্রেমিক হিসেবে কুসুম যথাযথ অবয়ব লাভ করেছে মাত্র, সে মুখ্য কোন চরিত্র হয়ে ওঠেনি। যেমন পিতা গোপাল দাস, সাধক ব্রহ্মচারী যাদব পণ্ডিত, যামিনী কবিরাজ এবং বন্ধু কুমুদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ও ডাক্তার শশীর নানা চারিত্রিক মাত্রা রেখায়িত হয়েছে তেমনি কুসুমের অনতিঘন সাহচর্যের মধ্য দিয়ে পুরুষ শশীর আরেকটি দিক চিত্রায়িত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীচরিত্রের ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। তাদের হাতেই সৃষ্ট রোহিণী ('কৃষ্ণকান্তের উইল'), কুমুদিনী ('যোগাযোগ') আর রাজলক্ষ্মী ('শ্রীকান্ত')। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুসুম এই তিন চরিত্র থেকেই লেখক-আরোপিত ভূমিকার বিবেচনায় পৃথক। বাল্যবিধবা রোহিণী গোবিন্দলালের হাত ধরে গৃহত্যাগ করে মৃত্যুর পথে পা বাড়ায়; দুশ্চরিত্র স্বামী মধুসূদনকে শ্রদ্ধা করতে ব্যর্থ হয়ে কুমুদিনী দৃঢ় সংকল্পে তাকে পরিত্যাগ করে; অন্যদিকে সমাজচ্যুত রাজলক্ষ্মী পেশাদার বাঈজীর জীবন বেছে নেয়। এরকম বিদ্রোহী কোন সমাজসম্পৃক্ত কি আদর্শনিষিক্ত ভূমিকায় অধিষ্ঠিত নয় কুসুম। পূর্বসূরিদের ধারাবাহিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুমকে কোনরূপ প্রোটাগনিস্টের মর্যাদায় উত্তীর্ণ

করেন নি। তবে তিন অগ্রজের রচনায় যে আপ্ত উদ্দেশ্যমুখীনতা প্রত্যক্ষ হয়, প্রতীয়মান হয় 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র লেখক তা সযত্নে বর্জন করেছেন।

৩.

শশী-কুসুম সম্পর্কের বিবেচনায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' একটি বিয়োগান্তক উপাখ্যান। শুরুতে হেঁয়ালি দিয়ে শুরু হলেও শশী ডাক্তারের প্রতি পরানের বৌ কুসুমের প্রগাঢ় অনুরক্তি ক্রমশ নিরাবরণ হয়েছে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশী ডাক্তার এবং পরানের স্ত্রী কুসুমের অনতিপ্রকাশ সম্পর্কটি শেষাবধি লালন করেছেন অতি সতর্কতার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিমিতিবোধ অনন্যসাধারণ;- ফলশ্রুতিতে শশীকে মনে হয় নিরাবেগ, অসংবেদী, অতিসংযত। উপন্যাসের নিতান্ত শেষ পরিচ্ছেদে গাওদিয়ার পাট গুটিয়ে বাপের গ্রামে চলে যেতে উদ্যত কুসুমকে ফেরাতে গিয়েই শশী প্রথম তার অন্তর্গত অনুরাগ ব্যক্ত করে স্পষ্ট কণ্ঠে। উত্তরে কুসুমও নিরাবরণ করে দীর্ঘকাল আগেই অঙ্কুরিত কামনা-বাসনা।

শশী তালবনে কুসুমকে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে : 'কুসুমের যে শরীর আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল'। কিন্তু এটুকুতেই শশীর সমস্ত আবেগ সীমাবদ্ধ থাকে, সে কুসুমকে আলিঙ্গন করে উঠতে পারে না। শুভবোধ, নৈতিক বিবেচনা, সমাজানুগত্য অথবা ভীরুতা– ঠিক কী কারণে শশী ডাক্তারের দ্বিধা তা অবশ্য কখনোই স্পষ্ট হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর চরিত্র-পরিকল্পনায় একটি মুক্ত অভিমুখ সংরক্ষণ করেছেন।

কারণ যাই হোক কার্যত দৈহিক সংযম এবং সুনীতিবোধ উভয়েরই আনুগত্য করেছে শশী। যদি তা না হতো তবে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হতে পারতো। কুসুম ধরা দিয়েই ছিল। সে নিঃসংকোচে বলেছিল, 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' অতঃপর অন্তত দুটি খাতে প্রবাহিত হতে পারতো কাহিনী। প্রথমত, জৈবিক তাড়না প্রবল হয়ে দুজনের মধ্যে দ্রুত গড়ে উঠতে পারতো দৈহিক সম্পর্ক; গ্রামের আদর্শস্থানীয় যুবক শশী বহিরাঙ্গিক জীবনের সমান্তরালে সঙ্গোপনে বন্ধুস্ত্রী কুসুমের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারতো অবৈধ প্রণয়। এতে হয়তো বিবেকের দংশনে সে ক্ষত-বিক্ষত হতো, তবু এড়াতে পারতো না শরীরের দাবি, সুযোগের প্রশ্রয়। পাঠক এরকম 'অবৈধ' প্রণয়ের কাহিনী সফোক্লিসের যুগ থেকে পড়ে অভ্যস্ত।

শরীরী প্রণয়ের কাছে সুনীতি, শুভবোধ ও সামাজিক অনুশাসনের পরাজয়ের গাথা বহু লেখকের প্রিয় বিষয়। বাঁধ না-মানা অবৈধ প্রণয় বহুবিধ সামাজিক-মানসিক সমস্যার জন্ম দেয় যার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্র, সমাজব্যবস্থা এবং নর-নারী সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরার প্রশস্থ অবকাশ রয়েছে। এমিল যোলা তাঁর প্রথম জীবনের 'তেড়েস রাকেঁ' (১৮৬৭) উপন্যাসে মানুষের উদগ্র জৈবিক তাড়না ও এর নির্মম পরিণতির যে রেখাচিত্র অংকনের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন বিশ্ব কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে আজো তার তুলনা পাওয়া যায় না। আপাত দৃষ্টিতে ত্রিভুজ প্রেম মনে হলেও বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভরে বৃষ্টি' উপন্যাসটি শুভবোধের ওপর মানুষের শারীরিক আকর্ষণের বিজয়েরই গল্প যার মধ্য দিয়ে মালতী, তাঁর স্বামী নয়নাংশু এবং মালতীর প্রেমিক জয়ন্ত– এই তিনটি মানুষের অনুপুঙ্খ মানসপ্রক্রিয়া অনবদ্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

৪.

গৌরকিশোর ঘোষের 'এই দাহ' উপন্যাসে গোলক বলে, 'আমি তোমার সব চাই। শুধু স্থুল শরীরটাই নয়, তোমার মনটাও চাই।' উত্তরে চারুলতা হেসে স্পষ্ট করে বলে, 'কিন্তু মনের সঙ্গে তো শোয়া যায় না গোলকবাবু।' বিপরীতে '*পুতুল নাচের ইতিকথা*'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে কুসুম বলে, 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?'

শরীর! শরীর!

'তোমার মন নাই কুসুম।'

হয়তো শশীর দৈহিক শুচিতাবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপের অভিপ্রায়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংযোজন করেছেন এই বাক্য। 'শরীর! শরীর!' অংশটি শশীর স্বগতোক্তি, সে তা প্রকাশ করে না,। মুখে সে উচ্চারণ করে, 'তোমার মন নাই কুসুম।' শশীর প্রশ্নোক্তি, ক্ষেদোক্তি কিংবা বিস্ময়োক্তি 'তোমার মন নাই কুসুম' বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সংলাপ। বিকল্পে, কুসুমের অকপট প্রশ্নটির সঙ্গে-সঙ্গে পরিচ্ছেদটি শেষ হয়ে যেতে পারতো পাঠকের মনে তীব্র কৌতূহলের জন্ম দিয়ে। শশী ডাক্তারের সান্নিধ্যে পরানের যুবতী স্ত্রী কুসুমের শরীর কেমন যেন করে~ কুসুমের এমত নিঃসংকোচ নিবেদনে শশীর কী প্রতিক্রিয়া হয় তা জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতো পাঠক; আর উপন্যাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে লেখকের পক্ষে এই কৌতূহলের জবাব দেয়া সম্ভব ছিল কাহিনীকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে।

৫.

কুসুমের প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে পরিচ্ছেদ শেষ হতো কিন্তু প্রশ্নটি ছোটবাবু তথা শশী ডাক্তারের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকতো অবিরাম। পরবর্তী তথা সপ্তম পরিচ্ছেদে অবিকল থাকতে পারতো বিন্দু ও নন্দর কাহিনী এবং মতি ও কুসুমের খোঁজে শশীর কলকাতা গমন। হয়তো অষ্টম পরিচ্ছেদে কুসুমের প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে-ভাবতে একদিন অন্ধকার কি আড়ালে কুসুমকে একান্ত করে পেতে পারতো শশী। তারপর, যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রমশ গোপন অভিসার, সংশ্লিষ্ট সমস্যা, জটিলতা ও উপসংহারিক পরিত্রাণ কিংবা সমাধান, এই সব আনুপূর্বিক গল্পের মধ্য দিয়ে কাহিনী তিক্ত কি মধুর যে কোন একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারতো। লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লীয় লাভার' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে এরকমই একটি প্ররোচনা ও মিলনের দ্বন্দ্বান্তিক কাহিনী।

কিংবা আরেকটু পরিচ্ছন্ন হতে পারতো ঘটনাক্রম : যদি পরানের গলার 'ঘাটি হতো ক্যান্সার আর এই ক্যান্সারের কারণে মৃত্যু হতো পরানের, তবে অন্তত পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া যেত শশীকে। বিপরীতে নারকীয়ও হতে পারতো শশী ও কুসুমের মিলন। শেক্সপিয়রীয় কায়দায় শশী ডাক্তার চিকিৎসার পরিবর্তে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারতো পরানকে, দূর হতো পথের কাঁটা।

এমনকি সর্বশেষ পরিচ্ছদেও মিলনাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল অতি সহজে : গাওদিয়ার পাট চুকিয়ে বাপের গ্রামে চলে যাবে কুসুম; এই আকস্মিক বিচ্ছেদের মুখোমুখি হয়ে শশী হঠাৎ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করে, কুসুমের প্রতি তার আকর্ষণ হঠাৎ দুর্নিবার হয়ে জেগে ওঠে। অতঃপর লেখক জানাচ্ছেন : 'ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস শশীর কোনোদিন ছিল না। মনের হঠাৎ-জাগা ইচ্ছাগুলিকে

চিরদিন সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। তবে এমন কতকগুলি অসাধারণ জোরালো হঠাৎ-জাগা ইচ্ছা মানুষের মধ্যে মাঝে-মাঝে জাগিয়া উঠে যে সে সব দমন করার ক্ষমতা কারো হয় না। সকালে উঠিয়া কিছুই সে যেন ভাবিল না, কোনো কথা বিবেচনা করিল না, সোজা পরানের বাড়ি গিয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, 'একবার তালবনে আসবে বৌ?' তালবনে কথার পিঠে কথা ওঠে। শশী একপর্যায়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কুসুমকে বলে :

'... আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ?'

'চলে যাব? কোথায়?'

'যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই, চল আজ রাত্রে।'

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'না।'

শশী ব্যাকুলভাবে কহিল, 'কেন? যাবে না কেন?'

হ্যাঁ, একদিন যেত কুসুম– লেখক ব্যাখ্যা করেছেন– স্পষ্ট করে ডাকা কেন, কেবল ইশারা করে ডাকলেই ছুটে যেত। কিন্তু চিরদিন একরকম যায় না– মানুষ তো লোহায় গড়া নয় যে চিরকাল একরকম থাকবে, বদলাবে না। আজ হাত ধরে টানলেও কুসুম যাবে না। ইত্যবসরে তার উন্মাদ ভালবাসা নির্জীব হয়ে পড়েছে। কাকে ডাকছে শশী? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে। চপল রহস্যময়ী, আধো-বালিকা আধো রমণী জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম মরে গেছে। কেন মরে গেছে কুসুম তার বিশদ কোন ব্যাখ্যা নেই, তবে শশী ডাক্তারের ডাকে সাড়া দিতে কুসুম আজ নিঃসন্দেহে অপারগ। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে আবারো কুসুমকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে শশী। বলে, 'নাই-বা গেলে।' কুসুমের উত্তর, 'থেকে কি করবো ছোটবাবু? তাতে আপনার কষ্ট, আমারও কষ্ট। এ বয়সে আর কি কষ্ট সইতে পারবো। গলায় দড়ি-টড়ি দিয়ে বসবো হয়তো।'

কিন্তু লেখক সার্বভৌম। তাঁর অভিপ্রায় হলে 'না' 'না' করেও শেষপর্যন্ত গাওদিয়ায় থেকে যেতে পারতো কুসুম। কিংবা বাপের বাড়ি চলে গিয়েও শেষপর্যন্ত মত বদলাতে পারতো সে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে শশীর হাত ধরে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারতো দূর কোন শহরে। সুতরাং, দ্বিতীয়ত, যে পর্যায়েই হোক, শশী ও কুসুম পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাততে পারতো। এতে গাওদিয়ার মানুষ ছি ছি করে উঠতো বটে, হয়তো লোকসমাজে কুসুমের বাবার মাথা কাটা যেত, কিন্তু তার স্পর্শ হয়তো দূরে শহরে পৌঁছাতো না। সামাজিক প্রভেদ সত্ত্বেও কুসুম শশীকে নিজের করে পেয়ে সুখী হতে চেয়েছিল, সে সুখী হতো। শশী গ্রামের শেকড় ছিঁড়ে শহরের বৃহত্তর জগতে অভিবাসী হতে চেয়েছিল, সে সুযোগও জুটে যেত একই সঙ্গে। কিন্তু নিজ ইচ্ছায় নিঃশর্ত বিবেচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সফলভাবে বাস্তবায়নের কাহিনী '*পুতুল নাচের ইতিকথা*' নয়।

খ. কেবলই শশী ডাক্তারের গল্প নয়

তবে শুরু থেকে শেষাবধি *পুতুল নাচের ইতিকথা* শশী ডাক্তারের গল্প হলেও এর ভাঁজে-ভাঁজে বিবিধ মানুষের বিচিত্র মনোজগতের সন্ধান করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজিতপুর শহরের সন্নিকটে গাওদিয়া বাংলাদেশের যে কোন একটি গ্রাম। এরকম গ্রামের যে ভূগোল তা বাঙালি পাঠকমাত্রের জানা; দরিদ্র মানুষের

জীবনসংগ্রাম ও সরল জীবন-যাপন এবং সেই সঙ্গে কিছু মানুষের লোভ, লালসা আর তঞ্চকতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতার অনধিগত নয়। যা অভিনব তা হলো লেখকের অন্তর্দৃষ্টিতে মানবচরিত্র অবলোকন। প্রকৃতপক্ষে এখানেই কাহিনীর শিল্পোত্তীর্ণতার সম্ভাবনা নিহিত। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল অন্ধকার মানবমনের মানচিত্র অঙ্কনের মধ্যেই লেখকের মননশীলতার অভিজ্ঞান। লেখকের এই উদ্দেশ্যের স্বার্থেই প্রত্যক্ষ হয় কী ভাবে আখ্যানভাগ থেকে-থেকে নতুন বা অপ্রত্যাশিত গতিপথ লাভ করেছে উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে।

যাদব পণ্ডিতের ইচ্ছা-মৃত্যু এবং তাঁর দান করা অর্থে তাঁরই অভিপ্রায়ে শশীর নেতৃত্বে গ্রামে একটি হাতপাতাল নির্মাণ এ উপন্যাসের প্রধান একটি গল্প। যাদব পণ্ডিত সংসারী সাধক হিসাবে পরিচিত। গ্রামের ভক্তিপ্রবণ মানুষ তাঁকে দেবতুল্য জ্ঞানে ভক্তি করে। তাঁর প্রতি বয়সানুগ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শশীর কার্পণ্য নেই, তবে এর অতিরিক্ত কিছু নয়। যাদব পণ্ডিত তা বোঝেন, তিনি উপলব্ধি করেন তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জনশ্রুতিতে শশীর আদৌ বিশ্বাস নেই। শশীকে অভিভূত করার জন্য তিনি মরিয়া। আলাপচারিতার একপর্যায়ে তিনি দাবি করে বলেন সকল বিদ্যার আদিবিদ্যা সূর্যবিদ্যা তাঁর আয়ত্ত আর এরই বলে তিনি দেহ রাখবেন স্বনির্ধারিত দিন-ক্ষণে। ঘটনাক্রমে এই কথা গ্রামব্যাপী প্রচার হয়ে যায়। এই দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যাদব পণ্ডিত আফিম খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তার উইল পাওয়া যায় যাতে তিনি তার সব সম্পত্তি, অর্থকড়ি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য দান করেন। এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের ভার, আর কেউ নয়, শশীর ওপর চাপিয়ে গেছেন। তারপর প্রয়োজনীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে শশীর উদ্যোগে হাসপাতাল নির্মিত হলো। শশীর জীবনযাপন হয়ে উঠলো হাসপাতালকেন্দ্রিক। অষ্টম পরিচ্ছেদ জুড়ে বিবৃত এই ঘটনা গাওদিয়ার মানুষ তথা শশীর জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই হাসপাতালটি শশীকে গাওদিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলে।

এরকম আরেকটি গল্প শশীর বোন বিন্দুর গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। পিতা গোপাল দাস উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী মানুষ। তিনি সুকৌশলে কলকাতাবাসী সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী নন্দকে বাধ্য করেছিলেন বিন্দুকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণে। নন্দ এর শোধ তুলেছিল কলকাতায় নিয়ে বিন্দুকে রক্ষিতার জীবনে আবদ্ধ করে। শশী বিন্দুকে গ্রামে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু যে অস্বাভাবিক জীবনে নন্দ তাকে অভ্যস্ত করে তুলেছে তার বাইরে বিন্দু প্রকৃতিস্থ থাকতে পারেনি। এমনকি শেষাবধি নন্দ বিন্দুকে স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে সংসারে গ্রহণ করতে চাইলেও বিপ্রলব্ধ বিন্দু অসম্মতি জানিয়ে দেয়। কেন বিন্দুর এমত সিদ্ধান্ত? নন্দ আরোপিত জীবনে সে অভ্যস্ত? এ জীবনেই সে সুখী, সন্তুষ্ট?

সেনদিদির বসন্ত হলে বৃদ্ধ স্বামী যামিনী কবিরাজ চিকিৎসা থেকে বিরত থাকে; এমনকি ঘটনানুক্রমে শশী চিকিৎসার দায়িত্ব নিলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। শেষপর্যন্ত শশীর প্রাণপণ দিনাতিপাত সেবা ও চিকিৎসায় সেনদিদি যদিবা বেঁচে ওঠেন তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে যামিনী কবিরাজ ভুল ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল : ভাল হলেও সারা মুখে ছড়িয়ে থাকে বসন্তের গভীর দাগ। যামিনী কবিরাজের মৃত্যু হয় হঠাৎ, তখন সেনদিদি সন্তানসম্ভবা। সন্তান প্রসবের সময় সেনদিদির মৃত্যু হয়। অনাথ শিশুটির সুব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে ওঠে শশীর বাবা গোপাল। এটি 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র আরেক গল্প।

শশীর বাবা গোপাল দাস– সে আরেক কাহিনী। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অন্যদিকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হেন কাজ নেই যা তার অসাধ্য। ফলে তার কুখ্যাতির অভাব নেই কোন, নীতিবোধ বলে কিছু নেই তার। লোকে বলে অন্যের গলায় ছুরি দিয়ে গোপাল দাস পয়সা করেছে। তিনজন বৃদ্ধকে সে তরুণী স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে দুরভিসন্ধির চূড়ান্ত দেখিয়েছে। পিতার ঠিক বিপরীত চরিত্র পরিগ্রহ করেছে শশী। সে বিষয়ী নয়, অর্থ-সম্পত্তির বিষয়ে সে উদাসীন। বাবাকে সে অসম্মান করে না, সম্মানও করে না। শশীর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে গোপাল দাসকে অবজ্ঞা করে। গ্রামীণ জীবনের গ্রাম্যতা তাকে পীড়া দেয়। অন্তর্সত্তায় সে অনুভব করে বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান ও প্রতিশ্রুতি। গাওদিয়ার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে সে শহরের বৃহত্তর পরিমণ্ডলের অধিবাসী হতে চায়। শশীকে ভয় পায় গোপাল দাস। শশী চলে গেলে কে দেখবে গোপাল দাসের রক্ত-পানি-করা সম্পত্তি? গাওদিয়া ছেড়ে শশীর নির্বাসন ঠেকাতে গোপাল দাস নিজেই নির্বাসন বেছে নেয়। সে কাশী চলে যায়। ফলে শশীর আর শহরবাসী হওয়া হয় না। শশী ডাক্তার পুরোপুরি গ্রামীণ গৃহস্থ বনে যেতে বাধ্য হয়। পিতার শেষ চালে শশীর সব স্বপ্ন-কল্পনা চিরতরে ভূপতিত হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ হয়েছে কাহিনী কেননা এরপর জীবনের কাছে প্রত্যাশার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

এরকম অনেক ছোট-বড় গল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের আখ্যানভাগ। কী সেই সূত্র যা এই গল্পগুলোকে সহঅবস্থানে ন্যায্যতা দিয়েছে? কুমুদ ও মতির গল্পটির কথাই বা কেন বাদ যায় : কুমুদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে মতির নিরালম্ব আত্মাহুতি। এ গল্পও কি অন্যান্য গল্পগুলোর সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা নয়?

যেমন শুরুতেই বলা হয়েছে *পুতুল নাচের ইতিকথা* আনুপূর্ব শশী ডাক্তারের গল্প, তেমনি একই সঙ্গে গাওদিয়ার বিভিন্ন মানুষের কাহিনীও বটে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার তাগিদে নয়, শশী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে কোন বক্তব্যও প্রচারিত হয়নি। হঠাৎ মনে হতে পারে শশী নব্যশিক্ষিত শহরমুখী গ্রামীণ মানুষের প্রতিনিধি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ানের মধ্যে এরকম একটি উদ্দেশ্য স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বস্তুত শশী কোন 'শ্রেণী চরিত্র' নয়। বরং এরকম একটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য যে শশী চরিত্রটিকে অবলম্বন করে গাওদিয়ার মানুষের ছবি তুলে ধরা হয়েছে বড় একটি ক্যানভাসে যার একেকটি অংশে ক্রমশ আলোকপাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি অগ্রসর হয়েছে। যে অর্থে নায়ক বা প্রোটাগনিস্ট শব্দটি উপন্যাসের সচরাচর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা যেন শশীর ক্ষেত্রে ঠিক খাটে না। বরং প্রোটাগনিস্ট-স্থানীয় চরিত্রের যথেষ্ট উপাদান রয়েছে যাদব পণ্ডিত, যামিনী কবিরাজ, বিন্দু, মতি এবং শশীর পিতা গোপাল দাসের চরিত্র চিত্রণে। এদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা কৌতূহলোদ্দীপক, পর্যালোচনা ও ভাবনার খোরাক।

২.

পৃথিবীতে যূথবদ্ধ মানুষের অভ্যুদয়ের কাল থেকেই গল্প বলা প্রচলিত। গল্প মানুষের জীবনেরই অংশ : মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে, গল্প বলতে ভালবাসে মানুষ। এ তার স্বভাবী প্রবণতা। সুতরাং গল্প রচনা বিশেষ নতুন ঘটনা নয় কোন। পক্ষান্তরে শিল্প হিসাবে উপন্যাস অভিনব কেননা সাহিত্যের এই আধুনিক শাখাটি গল্পকে ছাড়িয়ে অবলম্বন করেছে অনুগল্পের মিছিল, ধারণ করেছে ঘটনা-অনুঘটনার বুনট, জগৎ-ব্যাপ্ত মানবজীবন ছেঁকে সংগ্রহ করেছে সমরূপ কাহিনীর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত। গল্পের আকর্ষণের

পরানের স্ত্রী হিসাবে চৌদ্দ বছর বয়সে গাওদিয়ায় এসেছিল কুসুম, তারপর শশীর সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয় কোন এক পর্যায়ে অন্তরঙ্গতায় উত্তীর্ণ হয়েছে দৈনন্দিন মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু শশীর প্রতি গভীর অনুরক্তির কথা মুখে উচ্চারণ করেনি কখনো কুসুম। তার রমণীসুলভ আচার-আচরণে সেই নীরব প্রণয় বারবার আভাসিত হয়েছে যদিও, তবু শশী তা সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি যেন; ফলে কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কটি দশ বছরেও ক্রীড়া-কৌতুকের মাত্রা ছাড়িয়ে ঘনীভূত হতে পারে নি। উপন্যাসটির নিতান্ত সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লেখক কুসুম-শশীর সুপ্ত প্রণয়কে পারস্পরিক স্বীকৃতির স্তরে নিয়ে গেছেন দুজনের উপান্তিক বাক্যবিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাতে অনিবার্য বিচ্ছেদের নিশ্চায়ন ভিন্ন অন্য কোন প্রতিশ্রুতির জন্ম হয় নি।

যে গ্রন্থগুলোকে আমরা মহৎ উপন্যাস বলে জানি, সেগুলোতে প্রায়ই সম্পর্ক বা সমস্যাকে ধারাবাহিকভাবে বিকশিত করে একটি আত্যন্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সৃষ্টি হয় নাটকীয় পরিণতির অবকাশ। পাঠকের জানা আছে প্রাচীন ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একে বলা হয়েছে 'ক্যাথারসিস' যা বাৎসায়ন কথিত যৌনসঙ্গম কালে নারীর 'রাগমোচন' সদৃশ একটি চূড়ান্ত পরিণতি। এর জন্য প্রয়োজন সম্পর্ক বা সমস্যার ঘনীভবন। প্রত্যক্ষ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনীভবনের পরিবর্তে তরলীকরণ করেছেন, নানা ঘটনার অন্তর্বয়নের কৌশল এতে সহায়তা দিয়েছে। ফলে তাঁর রচনায় 'ক্লাইম্যাক্স' নেই, 'ক্যাথারসিস' নেই, উচ্চকিত কোন পরিণতি নেই। কুসুম ও শশীর কাহিনী তাই প্রকটিত হয়ে ওঠেনি; প্রকটিত হয়ে ওঠেনি পিতা গোপাল দাস ও পুত্র শশীর দ্বন্দ্ব, উন্মোচিত হয়নি স্ত্রী সেনদিদির চিকিৎসায় যামিনী কবিরাজের অনীহার কারণ, রহস্যমণ্ডিত থেকে গেছে রক্ষিতার জীবন পরিত্যাগে বিন্দুর দৃঢ় অসম্মতির কারণ।

গ. বন পেরোনোর পথ

নায়কের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই সঙ্গে দুটি বয়ানকৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রথমত, শশীর আচার-আচরণ ও সংলাপে তার চারিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লেখক সবজান্তা কথকের দায়িত্ব নিয়ে তথ্য দিয়েছেন, জুড়েছেন টীকা-টিপ্পনী। কথকের অবস্থান সন্নিকট। যেমন সে জানায়, 'হারুর মরণের সংস্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই; কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা।' কারণ ...'জীবনটা তাহার কাছে অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়' অথচ অন্যমনস্কতার কারণে মানুষ জীবনের অনেকাংশ অপচয় করে ফেলে। পরানের বোন মতির প্রসঙ্গে এরকম শোনা যায় : 'সংসারের কাজ না করিলে কুসুম তাহাকে বকে। তালপুকুরের ধারে কাজ-ফাঁকি দেওয়া আলস্যটুকু মতি ভোগ করে ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে করিতে। সুদেবকে মনে মনে মরিবার আশীর্বাদ করিয়া আরম্ভ না করিলে ভাবনাটা তাহার যেন ভালো খোলে না। মতির ভারি ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মতো বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হাসে, তাস-পাশা খেলে, কলের গান বাজায়, আর–আর বাড়ির বৌকে খালি আদর করে। চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া বলে লক্ষ্মী বৌ, সোনা বৌ, এমন না হলে বৌ?'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশী ডাক্তারের গল্প শোনাতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মূল অভীষ্ট তো গল্প ফাঁদা নয়, বরং গল্পের ছলে বিভিন্ন মানব চরিত্রের অজানা চরিত্র ও

চেতনার ওপর আলোকপাত করা; এই আলোকপাত কখনো লেখকের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে, কখনো-বা পাত্র-পাত্রীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। কখনো লেখক আর নায়কের সত্তা মিশে একাকার হয়ে যায়। বিন্দুর খোঁজ নিতে কলকাতা থেকে গাওদিয়া প্রত্যাবর্তনের আগে নন্দ'র বাসায় গেল শশী। না, নন্দর ছোট বউ হয়ে বাড়িতে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি বিন্দু, আসেনি সে শত অনুরোধেও। 'শশীর মনে কি এ আশা ছিল গাওদিয়ার বাড়িতে টিকিতে না পারিলেও নন্দর গৃহে গৃহিণী হইয়া বিন্দু থাকিতে পারিবে? বিন্দু আসে নাই শুনিয়া সে যেন বড় দমিয়া গেল। নন্দর বাড়িঘর দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। ... অন্দর বোধহয় বেশি তফাতে নয়– কোমল গলার কথা ও হাসি শশীর কানে আসিতেছিল– সে অনুভব করিতেছিল অন্তরালে একটি বৃহৎ সুখী পরিবারের অস্তিত্ব। তারপর একসময় সাত-আট বছর বয়সের একটি সুশ্রী ছেলে কি বলিতে আসিয়া শশীকে দেখিয়া নন্দর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ... 'গরমে যে ঘেমে উঠেছিস?' বলিয়া নন্দ নিজে ছেলের জামা খুলিয়া দিতে শশী যেন অবাক হইয়া গেল। একি অসঙ্গতি নন্দ ও নন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে? তার এই পুরুষানুক্রমিক নীড়ে শান্তি আছে নাকি? এই গৃহের সীমাবদ্ধ জগতে সুখ ও আনন্দের তরঙ্গ ওঠে আর পড়ে?'

পুতুল নাচের ইতিকথার শুরু থেকে শেষ অবধি এমনি অনেক মানুষ চেনার গল্প। বন পেরুলে মামার বাড়ি। বন পেরিয়ে মামা বাড়ি যাওয়ার দুটি পথ আছে। বনের ভেতর দুসারি গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে, ঘাস আর পাতা মাড়ানো সরু পথে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, সরাসরি মামার বাড়ি। এ পথ হ্রস্ব ও সহজ, সময়ও বেঁচে যাবে হয়তো। কিন্তু যার বনটি দেখে নেবার বাসনা রয়েছে সে যাবে ঘুরে ফিরে, হয়তো বামের জলাশয়টি ছুঁয়ে, ডানে— অনতিদূরে— বজ্রাহত মরা গাছটিরও খানিকটা ওপাশে ঘাসে ঢাকা খানিকটা ফাঁকা জায়গা ঘেঁষে, যেখানে খেলা করে কাঠবেড়ালির বাদামি ছানাপোনা, অদূরেই জারুলের ডাল ছেড়ে হঠাৎ উড়ে যায় একঝাঁক সবুজ টিয়া। এই ঘুরপথে পুরো বনটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার জন্ম হয়। সমাজ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এই সূত্র প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের চরিত্র তার সমগ্র প্রতিবেশে প্রোথিত। প্রতিবেশের আয়নায় মানুষ স্বচ্ছতর হয়ে ধরা পড়ে। তার চেয়েও বড় কথা নানা মানুষের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমাজের গহনে বহমান প্রধান অন্তঃস্রোতগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লেখক কেবল আনন্দসঞ্চারী গল্প রচনা করেন না; একজন সমাবিজ্ঞানীর মতোই মানুষের জীবনের প্রধান নিয়ামকগুলোকে সমাজের ঘন ক্বাথ থেকে পৃথক করে দৃশ্যমান করে তোলেন।

২.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পুতুল নাচের ইতিকথা* লিখতে গেয়ে ঘুরপথটিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর গতি ছিল ধীর, অথচ সুবিন্যস্ত। তাঁর গদ্যের বুনট নিপাট। কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়, হৃদয়ের জটিল অনুভূতিটুকু প্রকাশে এই গদ্য সক্ষম। এই যে ঘুরপথে বন পেরোনো এর চমৎকার উদাহরণ প্রথম পরিচ্ছদে বিবৃত হারু ঘোষের মৃতদেহ তার বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি। '*পুতুল নাচের ইতিকথা*'র প্রথম পরিচ্ছদ খুব দীর্ঘ নয়, মাত্র সাত পাতায় লেখা। পঞ্চম পৃষ্ঠার শুরুতে হারুর মরদেহ বহনের জন্য গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে আসে মাঝি গোবর্ধন, তারপর হারু ঘোষের বাড়ি পৌঁছাতে তিন পাতা লেগে গেল কেননা হারু ঘোষকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার আগে গাঁয়ের লোকেরা উবু হয়ে বসে জটলা পাকিয়ে গল্প করে; শশী তাগাদা দিলে তবেই

রসিক বাবুর বাগান থেকে বাঁশ কেটে এনে মাচা বাঁধে; হারুর মরদেহ সরাসরি শ্মশানে না-নিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হয় কারণ হারু ঘোষের মেয়ে মতি খুব অসুস্থ, শ্মশানে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

গাওদিয়া যাওয়ার রাস্তাটি চওড়া কিন্তু কাঁচা। রাস্তার বর্ণনায় গ্রামীণ পরিবেশের কিছু আভাস ফুটে ওঠে। গাওদিয়া গ্রামে প্রবেশের আগে খালের সঙ্গে সংযুক্ত নালার ওপর পুল। তার নিচে স্রোতের মুখে বিকেল থেকে জাল পেতে বুকজলে দাঁড়িয়ে আছে নবীন মাঝি। নিতাই ঘোষ রুগ্‌ণ ছেলের জন্য মাগুর মাছ ধরা পড়েছে কি-না জানতে চায়। অকপটে নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। হারু ঘোষের অপমৃত্যুর খবর সে গ্রহণ করে শান্ত মনে। এসূত্রে লেখক তাঁর মন্তব্য গুঁজে দেন : 'দিন নাই রাত্রি নাই, জলে-স্থলে নবীনের কঠোর সংগ্রাম। দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুর মৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার সময় নাই।'

পুল পার হয়ে সড়কের ডানে সাত ঘর বাগদীর বাস। লেখক জানাচ্ছেন, 'দিনে ওরা যে গৃহস্থের চাল মেরামত করে, রাত্রে সুযোগ পাইলে তাহারই ভিটায় সিঁধ দেয়।' ধরা পড়ে জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে বলে, 'শ্বশুর-ঘর থে ফিরলুম দাদা। বেশ ছিলাম গো।' বাগদি পাড়া ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলে অবস্থাপন্ন লোকদের বাস। লেখক জানাচ্ছেন, 'মাঝে মাঝে কলাবাগান, সুপারিবাগান ও ছোট ছোট বাঁশঝাড় ... কোনো কোনো বাড়ির সামনে কামিনী, গন্ধরাজ ও জবাফুলের বাগান করিবার ক্ষীণ চেষ্টা চোখে পড়ে।'

ঘনায়মান অন্ধকারে আলো হাতে সর্বাগ্রে শশী চলেছে; সর্বত্র নীরবতার মধ্যে কেবল শববাহকদের আলাপচারিতা ঘোষণা করে চলেছে জীবনের অস্তিত্ব। আরো খানিকটা পথ এগিয়ে বাজার। বাদলার দিনে আগেভাগেই প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। একটি চালার নিচে এক সন্ন্যাসী ধুনির আগুনে মোটা মোটা রুটি সেঁকে। লেখকের কিংবা শশীর চোখে পড়ে, 'ওদিকের চালাটায় লোমওঠা শীর্ণ কুকুরটা থাবায় মুখ রাখিয়া তাহাই দেখিতেছে।'

কায়েত পাড়ার পথ শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের পাশ ঘেঁষে। এ পথের একেবারে শেষে হারু ঘোষের বাড়ি। তারপর বিস্তীর্ণ মাঠ। পথের মোড়ে বাঁধানো বকুল তলা সরকারি আড্ডার জায়গা। এখানে পৌঁছে শশী বিড়ি ধরায়। সে লক্ষ করে শ্রীনাথের মেয়েটি বিকেলে বাবার দোকানের কাছে খেলতে এসে ন্যাকড়া-জড়ানো মাটির পুতুলটি ফেলে গেছে। সেভাবে, যামিনী কবিরাজের বৌ ভোরবেলা বকুলতলা ঝাঁট দিতে এসে ভক্তি ভরে পুতুলটি তুলে নিয়ে যাবে।

গ্রামের কাদামাখা পায়ে-হাঁটা রাস্তা। এগিয়ে যেতে যেতে শশী শববাহকদের সতর্ক করে বলে, 'সাবধানে পা ফেলে চল নিতাই, আস্তে পা ফেলে চল। ফেলে দিয়ে হারুকে কাদা মাখিয়ো না যেন।' এ উক্তিতে কেবল মৃতের প্রতি মমতা নয়, বাস্তববোধও গ্রথিত।

পুতুল নাচের ইতিকথার গল্প এমনি ধীরলয়, বিরতিঘন; যেন দেয়ালে পরিব্যাপ্ত সুপ্রশস্ত একটি ক্যানভাসের ওপর ধীর পদক্ষেপে আলো ফেলে চলেছেন লেখক; কোন ত্বরা নেই; কেন্দ্রবিচ্যুত মূল ঘটনার অন্বেষণে এমন সন্ধানী পরিক্রমার বিকল্প নেই। বরং নানা ঘটনাপুঞ্জ ছুঁয়ে এগোতে-এগোতে একটি সর্বজনীন জীবনসূত্র আবিষ্কারই যেন লেখকের অভীষ্ট।

৩.

মহৎ শ্রেণীর কথাসাহিত্যের বড় একটি অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি নায়ক বা নায়িকার নোঙর ছিঁড়ে জীবনের নৌকাটি টালমাটাল বেসামাল হয়ে পড়েছে। এটি জমিদারের জন্য যেমন সত্য, ডোম-চাড়ালের ক্ষেত্রেও সমধিক সত্য। নায়ক একদিকে, পৃথিবী আরেক দিকে— এরকম একটি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া গল্প জমে ওঠে। কখনও এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়, কখনও থাকে অমীমাংসিত। কিন্তু এরকম গল্পের কাঠামো একরৈখিক না-হয়ে উপায় নেই; কেননা একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, বা একটি বক্তব্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকে বলে লেখককে এগোতে হয় নির্ধারিত লক্ষ্যভেদী পথরেখার সংলগ্ন থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় উদ্দেশ্যমনস্কতা প্রকট, তাঁর উপন্যাসের আখ্যানভাগ স্বীয় মতবাদের ছাঁচে ঢালাই করা; শরৎচন্দ্রের প্রায় সমগ্র রচনার প্রণোদনায় রয়েছে তীব্র সমাজসচেতনতা; রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাসে গভীর শুভবোধের নিবিড় নিয়ন্ত্রণ। তাঁরা বন পেরিয়েছেন সোজা পথে, নিবিষ্ট মনে, গভীর চিহ্ন রেখে রেখে। মানিকে উদ্দেশ্যহীনতা নেই, তবে অন্ততঃ '*পুতুল নাচের ইতিকথা*'য় কোনরূপ উদ্দেশ্যমুখীনতাও প্রত্যক্ষ হয় না। তিনি এগিয়েছেন ঘুরপথে, থেমে থেমে, চারপাশে দৃষ্টি ফেলে। কোন বিশেষ পটভূমির নেই, কোন বিশেষ মতবাদ নেই, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কোন আদর্শ কি চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গিকে, বিন্যাসে এবং বর্ণনাকৌশলে শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতা স্পষ্ট। তবে নানা সচেতন কৌশল প্রত্যক্ষ হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাভঙ্গিতে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শশীর বাবা গোপাল দাসের কীর্তিকাহিনী ওপর আলোকপাত করে, এই সূত্রে শশীর ডাক্তারি পড়ার জন্য শশীর কলকাতায় গমন এবং সেখানে কুমুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা। এই দুটি অনুকাহিনী ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত; তারপর আবার বর্তমানে ফিরে আসা। হারু ঘোষের মৃত্যুর পর দিন সাতেক পার হয়েছে, মেয়ে মতির জ্বর এখনো কমেনি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, পরানের মুখে তলব পেয়ে মতিকে দেখতে যাচ্ছে শশী। শশী যখন পথিমধ্যে তখন উপক্রমণিকা হিসেবেই যেন মতিদের বাড়ির ভেতর আলোকসম্পাত। এতে কুসুমদের বাড়ির আবহ উঠে আসে, কুসুমের মেজাজ-মর্জ্জিরও কিছু আলামত পাওয়া যায়। এ অংশটি যেন অনেকটা ফ্ল্যাশফরওয়ার্ড। বস্তুত মানুষের সক্রিয়তা বর্তমানে, কিন্তু তাকে প্রভাবান্বিত করে তার অতীত, অন্যদিকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। '*পুতুর নাচের ইতিকথা*' লিখতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লাগসই ভাবে ফ্ল্যাশব্যাক আর ফ্ল্যাশফরওয়ার্ড দিয়ে বর্তমানকে সংগ্রন্থিত করেছেন অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে। এ যেন বনের ভেতর কোথাও মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগের সঙ্গে-সঙ্গে একবার স্মৃতি রোমন্থন, আরেকবার ভবিষ্যতের কোন স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাওয়া।

সঙ্গীতের আস্বাদন যেমন শ্রবণসাপেক্ষ, ছবি যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য, সাহিত্য তেমনি পাঠের মাধ্যমে অধিগম্য। তবু বর্ণনাই কেবল লেখকের সম্বল নয়। কথাসাহিত্যে সংলাপ যেন ছবিকে ধ্বনিময় করে তোলে। সংলাপ গল্প পরিবেশনার লয় দ্রুততর করে। সংলাপের ওপর জোর নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদিও অনবদ্য সংলাপ রচনার স্বাক্ষর আছে ঢের এ উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সংলাপকে টানা গদ্যে বর্ণনারও ঝোঁক লক্ষ হয়। শশীর প্ররোচনায় স্বামীকে না বলে কলকাতা থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে বিন্দু। কারণ শুনে শশীর সঙ্গে কলহ করলো গোপাল দাস : 'চেঁচামেচি করিয়া সে বলিতে লাগিল যে এমন কাণ্ড জীবনে সে কখনো দ্যাখে নাই।

স্ত্রীকে মানুষ নিজে খুশিমতো অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই। যা সে করিয়াছে বিন্দুর বরং তাতে খুশি হওয়াই উচিত ছিল। স্ত্রীকে ভিন্ন বাড়িতে হীরা-জহরত দিয়া মুড়িয়া রাখিয়া চাকর-দারোয়ান রাখিয়া দিয়া কেহ যদি নিজের একটা খাপছাড়া খেয়াল মিটাইতে চায়, স্ত্রীর সেটা ভাগ্যই বলিতে হইবে। স্বামীর সে অধিকার থাকিবে বৈকি। মদ খায় নন্দ? সংসারে কোন্ বড়লোকটা নেশা করে না শুনি? তখন বলিলেই হইত, অত কষ্টে বড়লোক জামাই জোগাড় না করিয়া একটা হা-ঘরের হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিত গোপাল– টের পাইত মজাটা!'

সংলাপের এমনরূপ পরোক্ষ বিবরণ (বলা যায়, 'সংলাপের বর্ণনাকরণ') অন্য কোন লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। এই বর্ণনাংশের ঠিক পরই এসেছে প্রত্যেক্ষ সংলাপ । গোপাল বলে :

'কেন ওকে তুই নিয়ে এলি শশী! তোর কর্তালি করা কেন! ছেলেখেলা নাকি এসব, আঁ? রেখে আয়গে, আজকেই চলে যা।'

'তা হয় না বাবা। আপনি সব জানেন না–জানলে বুঝতেন ওখানে বিন্দু থাকতে পারে না।'

'এতকাল ছিল কি করে?'

এ প্রশ্নের জবাব ব্যতিরেকেই পিতা-পুত্রের কলহ শেষ হয়। কিন্তু এই অংশটিও কি সংলাপের পরোক্ষ বিবরণে পুরে দেয়া যেত না? না, যেত না, কারণ গোপালের প্রশ্ন 'এতকাল ছিল কি করে?' এ উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বাণীর বিবেচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাই সংলাপের মধ্য দিয়ে গোপালের মুখে এই প্রশ্নটি জুড়ে দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই যে গোপালের প্রশ্ন 'এতকাল ছিল কি করে?', বিন্দু কে নিয়ে গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল শশীও। প্রশ্নের উত্তরে পথের পাশে সাজানো দোকানের দিকে চোখ রেখে বিন্দু বলেছিল, 'ভেবেছিলাম ক্ষমা করবে।' এই উত্তর অপ্রত্যাশিত। নিজের কষ্টের কথা ভাবেনি বিন্দু, তাকে নন্দর হাতে গছাতে গিয়ে পিতা গোপাল দাস যে অন্যায় কারচুপি করেছিল তারই ক্ষমার প্রত্যাশায় এতদিন বিন্দু নন্দর ঠাঁই থেকে পালিয়ে আসে নি।

৪.

বিয়ের পর বিন্দুকে নিজ পৈতৃক সংসারে তোলেনি নন্দ, পৃথক রেখেছিল রক্ষিতার মতো, দীর্ঘ সাতটি বছর। সব জেনেও গোপাল দাস বিন্দুর পিত্রালয়ে পালিয়ে আসাকে বলেছে 'ছেলেখেলা'। 'খেলা' শব্দটি এ উপন্যাসটির প্রচ্ছদনামের মধ্যেও রয়েছে। প্রচ্ছদনাম কখনো কখনো উপন্যাসের নিহিতার্থ সন্ধানে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ উপন্যাসটি পড়ে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন ওঠা ন্যায্য এর নাম 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কেন। মানুষের জীবন কখনো নিছকই পুতুল নাচের পুতুলের মতো; নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে না মানুষ, সে চলে সুতোর টানে। জগৎ-সংসারে মানুষই তবে পুতুল? মানুষ নাচছে ঈশ্বরেরই সুতোর টানে?– এভাবেই জীবনের, সমাজের, জগতের সব কিছুকে সব ঘটনাকে ন্যায্যতা দেয়া সম্ভব। যে নাস্তিক সে একটু ঘুরিয়ে হয়তো বলবে 'সবই অদৃষ্টের খেলা'। কিন্তু ঈশ্বর বা অদৃষ্ট কাউকেই নিয়ামক মেনে নেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *পুতুল নাচের ইতিকথার* গল্পগুলোতে আমরা দেখি, ঈশ্বর নয়, ভবিতব্য

নয়, মানুষ নাচছে মানুষেরই সুতোর টানে । মানুষেরই প্রভাবে মানুষের জীবন খেলায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

মানুষ মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে চায়, চায় অনুশাসনের শৃঙ্খলে বাঁধতে। মানুষের এই প্রবণতা মজ্জাগত। নানা প্রণোদনা কাজ করে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার পশ্চাতে। মানুষের জীবন নিয়তি নির্দিষ্ট নয়, তা আন্দোলিত হয় অন্য মানুষেরই হাতে। মানুষ পরিণত হয় অন্যের ক্রীড়নকে। একজনের খেয়াল মেটাতে আরেকজনের জীবন আমূল ধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা। এই উপলব্ধিটিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে অংশীদার করতে চেয়েছেন এ উপন্যাসের নানা ঘটনা-অনুঘটনার মধ্য দিয়ে ।

হারু ঘোষ বজ্রাহত হয়ে প্রাণ দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু শশীর পাগলদিদিকে সহমরণ বেছে নিতে হয়েছে যাদব পণ্ডিতের অহং সিদ্ধির স্বার্থে। শহরের লেখাপড়া করা ছেলে কুমুদ কিশোরী মতিকে বিয়ে করতে আগ্রহী কেননা এই কোমলমতি, অবোধ, অশিক্ষিত গ্রাম্য কিশোরী তাকে 'মনের মতো' করে গড়ে তোলা সম্ভব। কলকাতার নন্দ গাওদিয়ায় এসে বিন্দুকে বিয়ে করে চাপে পড়ে, কিন্তু কলকাতায় ফিরে তাড়িয়ে দেয় না; সে বিন্দুকে রক্ষিতার মতো রেখে মজা লুটতে চায়। বসন্তে আক্রান্ত সেনদিদির চিকিৎসা হয় না স্বামী যামিনী কবিরাজ অনিচ্ছুক বলে। শশী ডাক্তার শহরে গিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর স্বাদ নিতে ব্যর্থ হয় কারণ গোপল দাস স্বীয় সম্পত্তি রক্ষার প্রয়াসে শশীকে গ্রামে বেঁধে রাখতে চায়। এভাবেই ঈশ্বর নয়, মানুষই মানুষের জীবনধারা ওলোটপালট করে দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাত্র-পাত্রীরা সমাজের কেউকেটা নয় কোন, অতি সাধারণ মানুষ। গাওদিয়ার এই সাধারণ মানুষের জীবনের ওপরই আলো ফেলতে চেয়েছেন লেখক, এই সাধারণ মানুষগুলোর জীবনকেই সাহিত্যে ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে। তাঁর পর্যবেক্ষণে নিরাবরণ হয়েছে মানুষ কেমন করে মানুষের জীবন নিয়ে খেলে। ঈশ্বর নয়, ভবিতব্য নয়, মানুষই মানুষের খেলার পুতুল।

ঘ. উপসংহার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্থপতি। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের যে যুগস্রষ্টার অবদান, মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে সমতুল্য কীর্তি রেখে গেছেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ব্যাধি ও দারিদ্র্য তাঁকে যুগপৎ ছেঁকে ধরেছে, উভয়ের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাঁকে আমৃত্যু; তবে সকল প্রতিকূলতার ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তিনি চল্লিশটি উপন্যাস এবং দুই শত গল্পের বিশাল বিচিত্র ভাণ্ডার রেখে গেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় ১৯৩৫-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* এবং পরবর্তী বছর প্রকাশিত *পদ্মা নদীর মাঝি* ও *পুতুল নাচের ইতিকথা* বাদ দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

তাঁর আলোচনা সূত্রে সাধারণত যে প্রসঙ্গটি প্রায়োবধারিতভাবে উত্থাপিত হয়ে থাকে তা হলো তাঁর বিশিষ্ট গদ্যরীতি। এ কথা অনস্বীকার্য যে তিনিই সর্বপ্রথম মুখের ভাষাকে সাহিত্যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সেই থেকে কথ্যরীতির ভাষা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু ভাষাকেন্দ্রিক আলোচনার অবকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আড়ালে পড়ে যায় তা হলো মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসে এমন সব বিষয় ও অনুষঙ্গ, ঘটনা ও দুর্ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

কী অতীত কী বর্তমান সর্বত্র সাহিত্যের উপচার বিরাজমান। তা সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখক বহুবর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে যাচ্ছেন। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া অবিশ্রান্ত। এই অর্থে সাহিত্য সদা জায়মান যা নতুন লেখকের নব অবদানে সমৃদ্ধ হওয়ার আশায় নিয়ত অপেক্ষমাণ। বস্তুত সাহিত্যের বেলাভূমিতে দৃঢ়মূল গোড়া পত্তনের স্বার্থে লেখককে 'অকথিত বাণী'র পসরা নিয়ে উপস্থিত হতে হয়। জগৎ-সংসারে প্রতিনিয়ত কত না কিছু ঘটে চলেছে যা সচরাচর সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে, অনুধাবনের ঊর্ধ্বে থেকে যায়। লেখক তা আবিষ্কার করবেন, অতঃপর কল্পনার ময়ান দিয়ে তাকে রসসমৃদ্ধ করে পরিবেশন করবেন যাতে পাঠকের চিত্ত আন্দোলিত হয়, মননে আলোড়ন ওঠে। এটি কথাসাহিত্যিকের প্রধান দুটি দায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দায় মেটাতে আপ্রাণ খেটেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নশ্রেণীর খেটে খাওয়া, দরিদ্রপীড়িত, অশিক্ষিত, অসহায় মানুষের জীবনকে তাঁর রচনার উপজীব্য করেছিলেন অন্তর্দৃষ্টির তাগিদে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো ওই মুখগুলো মৃন্ময় অনুভূতি হয়ে চেঁচাতো 'ভাষা দাও', 'ভাষা দাও'।' এই দাবির উত্তর তিনি আমৃত্যু দিয়ে গেছেন বিচিত্র সব রূপবন্ধ অবলম্বনে।

টীকা

(১) *পুতুল নাচের ইতিকথা* সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষে' পত্রিকায়, ধারাবাহিক পর্বে। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত প্রথম হয় ১৯৩৬-এ; প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

(২) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পুতুল নাচের ইতিকথার* একটি দ্বিতীয় পর্ব লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন বলে জানা যায়। হয়তো কুমুদ-মতির উপাখ্যান সে দ্বিতীয় পর্ব থেকেই তুলে আনা একটি অংশ।

(৩) 'অন্তর্বয়ন' বা ইন্টারউইভিং; 'অন্তর্বয়ন' বা ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি নয়।

(৪) বাংলাদেশের অবসর প্রকাশনী প্রকাশিত '*পুতুল নাচের ইতিকথা*'। প্রথম অবসর প্রকাশ ২০০৪। পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-উপন্যাস

বিশ্বজিৎ ঘোষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়োজমি'তে 'ফাঁপা মানুষে'র বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্র আবির্ভাব । তিনি লিখেছেন অনেক— কখনো তাঁকে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন ফ্রয়েড-এলিস; কখনো-বা তিনি জেগে উঠেছেন মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকউৎসে। তিনি লিখেছেন প্রধানত বয়স্ক পাঠকের জন্য, তবে এদেশের শিশু-কিশোররা তাঁর মনোযোগ যে আকর্ষণ করেননি, এমন নয়। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর রচনার সংখ্যা খুব বেশি না হলেও গুণগত মাত্রায় তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কিশোরদের জন্য তিনি যে ভেবেছেন, তাদের মনকেও যে জাগাতে চেয়েছেন তিনি, নিচের বক্তব্য থেকেই তা অনুধাবন করা যায়—

> বড়দের জন্য লেখা এমন গল্প যদি বেধে নেওয়া যায় যাতে কিশোর মনকে বিগড়ে দেবার মতো কিছুই নেই, বরং গল্প পড়ে বড়দের জীবন-সংঘাতের কমবেশি পরিচয় পেয়ে কিশোর মন নাড়া খাবে, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগবে, সেরকম গল্প কিশোরদের পড়তে দিলে দোষ কী?

কিশোর-মনকে নাড়া দেওয়া, তাদের জাগিয়ে তোলাই যে কিশোর-সাহিত্যের প্রধান কাজ— মানিকের উপর্যুক্ত মন্তব্যে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কিশোরচিত্তের কথা মনে রেখেই তিনি লিখেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ— লিখেছেন স্মৃতিকথা। কিশোরদের জন্য লেখা রচনাগুচ্ছে আমরা ভিন্ন এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পাবো। কিশোরচিত্তকে স্বপ্নমুখী সূর্যমুখী করার পাশাপাশি তাদের চেতনায় সংগ্রামের চেতনা জাগ্রত করাও মানিকের কিশোর-সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-রচনাসম্ভারের আলোকে দেখতে চাইবো তাঁর মানস-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ, দেখতে চাইবো কিশোরদের জন্য মানিকের অন্তর্গত ভালোবাসার টান আর রূপ-রূপান্তরের ব্যঞ্জনা।

কিশোরদের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লিখেছেন চারটি— *মাঝির ছেলে*, *মাটির কাছের কিশোর কবি*, *মশাল* এবং *রাজীবের লম্বা ছুটি*। এর মধ্যে *মাঝির ছেলে* নানা বিচারেই মানিকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। *মাঝির ছেলে* উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় মৌচাক (১৯২০) পত্রিকায়। 'মৌচাক'-এর ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ-১৩৪৯) থেকে ২৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫০) এবং ৮ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৫০) পর্যন্ত মোট ষোল কিস্তিতে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সময়মতো লেখা না পাওয়ায় ২৪ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়েছে বর্ণনার নানা কলাকৌশল; বর্ণনার ব্যাপ্তিতে গৃহীত হয়েছে মানুষের চিন্তা এবং চেতনার অনুসৃতি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের দর্শনসিক্ত কথকতা, জীবনবোধের অনুদ্ঘাটন ও মৃত্যুচিন্তা; চিহ্নিত হয়েছে সমাজপ্রবাহের চালিকাশক্তি। লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিউন্মোচনী বিশ্লেষণ, দিকনির্দেশী মন্তব্য উপন্যাসকে করেছে মননশীল। এসব নানাবিধ উপচার পরিবেশনের জন্য উপন্যাসের প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত স্থাপত্যের : প্রথমত একটি কাঠামো এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ঘটনা ও গল্পের যথাযথ বিন্যাস। মাত্র দুই শত বছরে কত না অভিনব কাঠামো উদ্ভাবন করেছেন মনস্বী ঔপন্যাসিকেরা। অন্যদিকে ঘটনা, মন্তব্য আর চিন্তা-চেতনার বিচিত্র-বিচিত্রতর বিন্যাস এক ঔপন্যাসিককে আরেকজন থেকে অবিস্মরণীয়ভাবে বিশিষ্ট ও পৃথক করে দিয়েছে। উপন্যাসের ইতিহাস তাই গদ্যকৌশলের ইতিহাস, বর্ণনাভঙ্গির (বয়ান) ইতিহাস।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে আমরা বিভিন্ন কাহিনী-অনুকাহিনী, ঘটনা-অনুঘটনার অন্তর্বয়ন লক্ষ করি। কখনো নতুন পরিচ্ছেদে নতুন কাহিনীর সূত্রপাত, প্রায়ই একই পরিচ্ছেদের নানা কাহিনীর উল্লেখ। কুসুমের সঙ্গে শশীর সম্পর্কের সূত্রপাত প্রথম পরিচ্ছেদেই কিন্তু এর ওপর আলোকপাত অধারাবাহিক কেননা মানুষের বাস্তব জীবনে যেমন ঘটে তেমনি শশীর জীবনের ব্যস্ততাবিস্তারী নানা ঘটনার ওপর পর্যায়ক্রমে আলো ফেলেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী একরৈখিকতার পরিবর্তে পরিগ্রহ করেছে জালিকাবিন্যাস। এমত অন্তর্বয়ন উপন্যাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই কৌশলটি দক্ষতার সঙ্গে অবলম্বন করেছেন যদিও মতি ও কুমুদের গল্পটির ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। দশম এবং একাদশ দুটি পরিচ্ছেদে মতি ও কুমুদের বিয়ে-পরবর্তী কলকাতা বাসের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত যে বিষয়ে শুরুতেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শশীর বাবা গোপাল দাসের কীর্তিকাহিনী ওপর আলোকপাত করে, এই সূত্রে ডাক্তারি পড়ার জন্য শশীর কলকাতায় গমন এবং সেখানে কুমুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা সন্নিবেশিত। অতঃপর লেখকের ক্যামেরার প্রবেশ হারু ঘোষের বাড়িতে– লেখকের বয়ানের সেখানে অতীত থেকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন : হারু ঘোষের মৃত্যুর পর দিন সাতেক পার হয়েছে। মেয়ে মতির জ্বর এখনো কমেনি। পরানের মুখে তলব পেয়ে মতিকে দেখতে যাচ্ছে শশী। তখন সন্ধ্যেবেলা, শশী যখন পথে তখন উপক্রমণিকা হিসেবেই যেন মতিদের বাড়ি দৃশ্যপটে উঠে আসে। মতির মা মোক্ষদা আর পরানের বৌ কুসুমের সাংসারিক ঝগড়াঝাটির কৌতুকাবহ বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুজনারই চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। কুসুমের চলন-বলন-মেজাজের কিছুটা হদিস হয়। দেরিতে হলেও ঘরে ঢুকে প্রদীপ জ্বালিয়ে গাল ফুলিয়ে কুসুম তিনবার শাঁখে ফুঁ দেয়ার অব্যবহিত পরেই শশীর প্রবেশ। কুসুম হারু ঘোষের পুত্র পরানের স্ত্রী আর সেই সুবাদে শশী তাকে স্থানীয় রীতিমাফিক কখনো 'বৌ', কখনো 'পরানের বৌ' সম্বোধন করে। ম্যালেরিয়ার রোগী মতিকে সযত্নে পরীক্ষা করে শশী, মোক্ষদার সঙ্গে কথা বলে, চলে আসার সময় কুসুমের সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা, তারপর শশীর ঘরে ফেরার পালা।

ফেরার পথে ভূতোর বাবা বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় শশীকে ডেকে বাড়ি নি[illegible] গেলেন। কয়েকদিন আগে গাছের মগডাল থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙেছে ভূ[illegible] যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ায় তার অবস্থা সংকটাপন্ন। শশীর পরামর্শ সত্ত্বেও

হাসপাতালে দিতে রাজি হয়নি তার স্বজনেরা। মরণাপন্ন ভূতোকে শশী পরীক্ষা করে, একটি ইনজেকশান দেয়। ঠিক এ সময়েই ভূতো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, বাড়িতে মড়া-কান্নার রোল ওঠে। এ হেন পরিস্থিতিতে ডাক্তারের করণীয় থাকে না কিছু; শশী নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ফের বাড়ির পথে ওঠে—অদূরে পথের ধারে শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকান।

শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের সামনে যথারীতি অলস জটলা। শ্রীনাথ তাকে সাদরে বসে যেতে বলে। শশী বসে; তারপর ভূতোর সদ্য অকালমৃত্যুর খবরটি দেয়। পঞ্চানন চক্রবর্তী জানায় ভূতো যে মারা যাবে হিসাব করে আগেই হদিস পেয়েছিল সে। এরকম নানা গাল-গল্প চলতে থাকে। শান্ত অবহেলার সঙ্গে শশী সব শুনে যায়। উঠি-উঠি করছিল শশী এমন সময় উপস্থিত হলেন সংসারী সাধক যাদব পণ্ডিত। যাদব পণ্ডিত ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ হলেও শক্ত মানুষ। তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন কী এক কাজে। শশীকে তিনি বাড়ি নিয়ে গেলেন। যাদব পণ্ডিত শশীর ডাক্তারি বিদ্যাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তাঁর মতে সূর্যবিজ্ঞানই আদি বিজ্ঞান; আর সেই বিদ্যাই যাদের নেই তাদের সব বিদ্যে ফাঁকা হতে বাধ্য। শশীর চিবুক ধরে যাদব পণ্ডিতের বৃদ্ধা স্ত্রী পাগলদিদি রঙ্গ করে বলেন, 'বড়কর্তা বাড়ি ছিল না জানতে না বুঝি ছোটকর্তা? এলে না কেন গো? ডুরে শাড়িটি পরে, চুলটি বেঁধে কনে বৌটি সেজে বসেছিলাম তোমার জন্যে?' শশীর অনুভব করে, এ বাড়িতে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা আছে যা মনের জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। অথচ এ বাড়িতে যেচে আসার তাগিদ অনুভব করে না সে।

৩.

নানা গল্প-অনুগল্পের সমন্বয়ে স্বল্প পরিসরেই কী নিখুঁতভাবে পরিব্যাপ্ত একটি রেখাচিত্র তৈরি করা সম্ভব তার আদর্শ প্রমাণ এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। লক্ষ করা যেতে পারে উপন্যাসটির কাঠামোর সঙ্গে এই পরিচ্ছেদের প্রত্যক্ষ সংযোগ কেবল শশীর ডাক্তারের মৃত হারু ঘোষের কন্যা অসুস্থ মতিকে দেখতে যাওয়ার মধ্যে। আর এই সূত্রেই শশী ডাক্তারের সঙ্গে পরানের বৌ কুসুমের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটির অবতারণা, অন্তত শশীর প্রতি কুসুমের অনুরাগের কথাটি পাঠককে জানিয়ে দেয়া। মতিকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে হয়, সেখানে হাজির হয় কুসুম। শশী বলে, 'কি আবার ...মার?' কুসুমের জবাব, 'পরানের বৌ বলে যে ডাকলেন আজ? পরানের বৌ ...ার গোসা হয় ছোটবাবু ...।' এই অংশটি পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি; আগে- ...দাস, কুমুদ, ভূতোর মৃত্যু, শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের জটলায় শশীর ... সবশেষে যাদব পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর গৃহে ...হিনীর পরম্পরায় পরিচ্ছেদটির বিন্যাস।

...ত বিন্যাসের? প্রতীয়মান হয় গাওদিয়া গ্রামের নানা ঘটনাবলির ...শশী-কুসুমের কাহিনী মিশিয়ে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ ...ক বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে ওঠা থেকে রক্ষা করেছেন। ফলে ...লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ ছাঁচে শশী-কুসুমের কাহিনীতে ...সর এই কৌশলটি সচরাচর দেখা যায় না। এখানে ...গ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র থেকে পৃথক।

(কার্তিক ১৩৫০) বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। মাঝির ছেলে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তিন বছর পরে, ১৯৫৯ সালে।

বাংলা কিশোরসাহিত্যের ধারায় মাঝির ছেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক রচনা। সেভাবে আলোচিত না হলেও এ উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যের ধারায় দাবি করতে পারে বিশেষ মর্যাদা। নিটোল সংগঠনের এই উপন্যাসে নাগা নামের এক স্বপ্নমুখী কিশোরের স্বপ্ন ও সংগ্রামের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা কিশোরসাহিত্য যেখানে রূপকথা-উপকথাতেই ভরপুর, বাস্তবতার পরিবর্তে যেখানে আছে কল্পনার অবাধ বিচরণ, অলৌকিকতা আর অতিপ্রকৃত উপাদান যেখানে হাজির হয় অনিবার্যভাবে, সে-ধারায় 'মাঝির ছেলে' নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী নির্মাণ, মহার্ঘ্য সম্পদ। কিশোরসেব্য সাহিত্যের পরিচিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে 'মাঝির ছেলে' বাঙালি পাঠকের কাছে, বিশেষত কিশোরচিত্তের কাছে সঞ্চার করেছে ভিন্ন এক স্বাদ, ছড়িয়ে দিয়েছে স্বতন্ত্র এক সৌরভ।

পূর্ব বাংলার পদ্মা-তীরবর্তী জীবন ও জনপদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল নিবিড় সংযোগ। *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসে যেমন এই অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে আলোচ্য *মাঝির ছেলে* উপন্যাসেও। *মাঝির ছেলে* উপন্যাসের নায়ক নাগা— সত্যের-আঠারো বছরের এক দুরন্ত তরুণ। আটখামার নামের এক স্টিমারঘাটকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নাগার সংগ্রামী জীবন। হারুমাঝির ভাইপো নাগার পৃথিবীতে আপন বলে কেউ নেই, এক হারুমাঝি ছাড়া। তাই হারুর আশ্রয়েই তার মাঝিবৃত্তিতে অনুপ্রবেশ। হারু তাকে ঠকায়, খাটিয়ে মারে, ঠিকমতো খেতে দেয় না— নাগার উপার্জনের সবটাই সে আত্মসাৎ করে। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই বলে নাগাও সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে। হঠাৎ একদিন করমতলার তালুকদার যাদববাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে নাগার— নাগার চাঞ্চল্য ও সামর্থ্য যাদববাবুকে আকৃষ্ট করে— তিনি তাঁর নৌকার মাঝি হিসেবে নাগাকে নিয়োগ দেন। শুরু হয় নাগার জীবনের ভিন্ন এক সংগ্রাম, শুরু হয় নতুন স্বপ্নেরও— নাগার এই স্বপ্ন আর সংগ্রাম, ভালোবাসা আর দ্রোহ নিয়ে গড়ে উঠেছে বক্ষ্যমাণ উপন্যাস।

নদীতে নদীতেই কাটে নাগার জীবন, নদীতে ভাসতে পারলেই নাগা পেয়ে যায় আনন্দের আস্বাদ। কিন্তু হারুমাঝির শোষণ আর খবরদারিতে প্রায় মরতে বসেছিল নাগার স্বপ্নবিলাসী মন। যাদববাবুর বাড়িতে এসে নাগা পেয়ে যায় মুক্তির অধরা আনন্দ, বদলে যায় তার জগৎ ও জীবন। প্রসঙ্গত ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন— 'যাদববাবুর বাড়ি এসে নাগার জগৎটাই বদলে গেল। পেটের ভাবনা তো এখন আর তাকে ভাবতে হয় না। 'কি খাব, কি খাব' এই চিন্তার জেলখানায় সে যেন এতদিন কয়েদি হয়ে ছিল, এখন ছাড়া পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। মানুষ থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট, নদী সব যেন খোলস ছেড়ে নতুন হয়ে উঠেছে তার কাছে। নতুন, কিন্তু অচেনা নয়।'

নাগা এক স্বপ্নবিলাসী কিশোর— মাঝিবৃত্তির চেয়েও রোমাঞ্চপ্রিয় স্বাপ্নিক সত্তাই নাগা-চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। নদীতে নৌকা চালিয়ে সে আনন্দ পেত, আনন্দ পেত এক স্থান থেকে নৌকা চালিয়ে অন্য স্থানে যেতে। কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল সমুদ্র-ভ্রমণ। যাদববাবুর লঞ্চে যখন সমুদ্র যাত্রার সুযোগ এলো, তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবেনি

নাগা। তাই রূপার প্রেমও সে উপেক্ষা করে যেতে চায় সমুদ্রে, বিয়ে বাধা হয়ে উঠুক তার স্বপ্নযাত্রায়— একথা কল্পনাও করতে পারে না নাগা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় রূপার সঙ্গে নাগার কথোপকথন ও নাগার নিম্নোক্ত ভাবনা—

নাগা চিন্তিত হয়ে বলে, 'কী করন যায় ক' দেখি রূপা?'

'বাবারে কও।'

'কী কমু?'

রূপা লজ্জার সঙ্গে একুট হাসে।—

'সেই কথা কইবা, আমারে যা কইছিলা।'

কিন্তু আজ কী নকুলকে বলা চলে রূপাকে সে বিয়ে করবে? বলতে কোনো বাধা নেই, তবু নাগা কেমন একটা বাধা অনুভব করে। সমুদ্র যখন সে চোখে দেখেনি, সমুদ্রযাত্রার অনুপযোগী লঞ্চে সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা-নামা করেনি, তখন রাম-লক্ষণের শোকে রূপাকে কাতর দেখে অনায়াসে যা বলা গিয়েছিল, একটুখানি স্বাদ পেতেই সমুদ্রের টান যখন তার মধ্যে দুরন্ত হয়ে উঠেছে তখন কী আর সহজে রূপার বাবাকে বলে কথাটা পাকা করে ফেলা যায়। রূপা খুব ভালো মেয়ে, রূপাকে তার ভালো লাগে, কিন্তু রক্ত-মাংসের একটা মেয়ের জন্য কী সমুদ্রকে ছেঁটে ফেলা যায় জীবন থেকে? সে-সমুদ্রের এক প্রান্তের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত পাড়ি দিলে রোমাঞ্চকর উল্লাসের সঙ্গে মনে হয় এই সমুদ্রই হাজার হাজার মাইল দূরে অজানা-অচেনা রহস্যময় দেশের প্রান্ত স্পর্শ করে আছে।

—নাগার এই ভাবনার মধ্যেই আছে সুদূরের প্রতি তার সুতীব্র তৃষ্ণার কথা, আছে রোমাঞ্চকর উল্লাসের প্রতি তার অপার কৌতূহল ও ভালোবাসার কথা।

নাগা কর্মনিপুণ নিষ্ঠ কিশোর— যে কোনো কাজেই তার জুড়িমেলা ভার। কাজ না থাকলেই মন খারাপ হয়ে যায় নাগার— কাজের পেছনে সারাবেলা ব্যস্ত থাকতেই তার পরম আনন্দ। কাজ যদি তার কল্পনাবিলাসী মনকে উস্‌কে দেয়, তাহলে নাগার আনন্দ দেখে কে? যাদববাবুর স্ত্রীর মনোভাবনায় নাগার এই কর্মনৈপুণ্যের ছবি প্রকাশিত হয়েছে এভাবে— 'মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা তার (যাদববাবুর স্ত্রী) আছে। নাগাও তার অনেক ফরমাশ খাটে। কাঠের সিন্দুক এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবে, আম কাঠের প্রকাণ্ড গুঁড়ি থেকে তাড়াতাড়ি কয়েকটা কাঠ চ্যালা করে নিতে হবে, দুরন্ত গাইটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে, তাকে বেঁধে আনতে হবে, নাগা ছাড়া এসব করবে কে?'

নাগা ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান কিশোর— মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসা তার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাগাকে এক ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ কিশোর হিসেবে নির্মাণ করেছেন। 'গরিব মানুষের সরম কি রে, খাওয়ান জোটে না, সরম?'— হারুমাঝির এই কথা নাগা মেনে নিতে পারে না। তীব্র আত্মসম্মানবোধ ও কৃতজ্ঞতাচেতনা তাকে মহৎ কিশোর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যাদববাবুর প্রস্তাবে সাড়া দিলে হারুমাঝিকে ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু এতকাল হারুমাঝির আশ্রয়ে ছিল নাগা— তাই তার মনটা কৃতজ্ঞতাবোধে যেন কেমন হয়ে ওঠে— 'নাগা বড় ভাবনায় পড়ে গেল। সে এখানে কাজ নিলে হারুমাঝি মুশকিলে পড়বে, অন্য একজন লোক তাকে রাখতে হবে এবং হয় লোকটিকে দিতে হবে বেতন, নয় দিতে হবে নৌকার আয়ের ভাগ। কিন্তু এদিকে হারুমাঝির কাছে থাকতে নাগার বড় কষ্ট। পেটভরে খেতে দেয় না, কাপড় ছিঁড়লে কিনে দিতে চায় না, একটা পয়সা চাইলে পর্যন্ত মেজাজ তার গরম

হয়ে ওঠে। খেতে পাবে, পরতে পাবে, বেতন পাবে। এ কাজ কি ছাড়া যায়? এদিকে যেভাবেই হোক খাইয়ে পরিয়ে হারুমাঝি তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, স্বার্থপরের মতো তাকেই বা হঠাৎ ত্যাগ করা যায় কী করে? কিন্তু একসময় সবকিছু পেছনে ফেলে নাগা চলে যায় যাদববাবুর আশ্রয়ে। হারুমাঝির জন্যে নাগার এই ভাবনাই তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাকে করে তুলেছে রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষ।

মানুষের নিষ্ঠুর নির্মম স্বভাব নাগাকে প্রবলভাবে কষ্ট দেয়। সে ভেবে পায় না, মানুষ কেন অকারণে অন্য মানুষকে কষ্ট দেয়। নাগার মাঝে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চার করেছেন মানবিক চেতনা। তাই হারুমাঝির অমানবিক আচরণে সে কষ্ট পায়; মনে মনে ভাবে এইকথা— 'মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে নাগার। কী বোকা গরিব মানুষেরা! জীবনে দুঃখ-কষ্ট তো হাজার রকম আছেই, তার ওপর অকারণে ঝগড়া বিবাদ করে সর্বদাই কত অশান্তি টেনে আনে। দুটি মিষ্টি কথা আর একটু ভালো ব্যবহার দিয়ে মানুষকে কত সুখী করা যায়, তাতে পয়সাও লাগে না। অথচ সবাই যেন পাগলা কুকুরের মতো একজন আরেকজনের টুঁটি কামড়ে ধরবার জন্য সবসময় তৈরি হয়ে আছে।' নতুনের প্রতি আগ্রহ নাগা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কেবল সমুদ্রযাত্রা বা দূরের প্রতি আকর্ষণেই নয়, অতি সাধারণ ঘটনা থেকেও তার চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। যাদববাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার সময় নাগার মনে ছিল নতুনকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তার সামনে ছিল নবজীবনের হাতছানি। এ অবস্থায় হারুমাঝির বাড়িতে নিজের সামান্য জিনিসপত্র নাগার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। নতুন জীবনের সঙ্গে পুরোনো স্মৃতি সে জড়াতে চায়নি, তাই তার মনোভাবনা হয় এরকম—

> মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছিল নাগার। কিছুই সঙ্গে নেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, কিছু না নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করলেই যেন ভালো হয়। ময়লা হাতে ধরলে যেমন পরিষ্কার চকচকে জিনিসে ময়লা লাগে, এখানকার কিছু নিয়ে গেলে তেমনি তার নতুন জীবনে দাগ ধরে যাবে।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগ নাগাকে স্বকীয়তা দান করেছে। মানুষের অন্যায় আচরণকে সে সহ্য করতে পারে না— আবার মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে শাসন করতেও তার বুক কাঁপে। নাগা এক দ্রোহী কিশোর, মনুষ্যত্ববোধই তার দ্রোহীচেতনার প্রধান লক্ষণ। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা নাগার দ্রোহী-মানসতার পরিচয় পাবো, পাবো তার মানবতাবাদী চেতনার পরিচয়— 'চোর দুজন চেনা লোক, আর চেনা লোক বলেই যাদববাবুর রাগ যেন হয় বেশি। আগুন জ্বেলে তিনি একটা লোহার শিক টকটকে লাল করে গরম করবার হুকুম দিলেন। আম চুরি করাটা নাগার কাছে এমন কিছু অপরাধ নয়, পালাবার চেষ্টা করায় দুজনকে যে ঘা কতক দিতে হয়েছে তাতেই তার মনটা খুঁতখুঁত করছিল। যাদববাবুর হুকুম শুনে সে প্রায় চোর দুটির মতোই ঘাবড়ে গেল। মিনতি করে বললো, 'মাপ করেন কর্তা, ছাইড়া দ্যান। আর করব না কইছে।' যাদববাবু বললেন, 'তুই থাম। আইজ ব্যাটাগো মুখে লোহার ছ্যাঁকা দিয়া ছাড়ুম।' যাদববাবুর জবাব শুনে নাগার বিনয়ের ভাবটা হঠাৎ যেন উঠে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'মাপ করেন কর্তা অন্যেরে দিয়া চোর ধরাইয়া যত খুশি ছ্যাঁকা দ্যান, আমি যাগো ধইরা আনছি তাগো ছ্যাঁকা দ্যাওন চলব না।'

শেষ পর্যন্ত এই দ্রোহী জেদি মানবদরদি কিশোর সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যায়। সমুদ্রের প্রতি দুর্নিবার এক ভালোবাসাই অন্তিমে নাগার জীবনে সত্য হয়ে রইলো— সমুদ্রের টান থেকে তাকে রক্ষা করতে পারলো না রূপা। নাগা-চরিত্রের অন্তর্গত সমুদ্রপিপাসা এবং অন্তিম পরিণতি তাকে আরো কাছে নিয়ে আসে পাঠকের। এলোমেলো ঝড়ে যাদববাবুর চোরাকারবারের নৌকা ডুবে গেলে সমুদ্রের সঙ্গে চিরকালের মতো একাত্ম হয়ে যায় সমুদ্রবিলাসী নাগা। নাগার এই পরিণতি বড়ই মর্মস্পর্শী। সমুদ্রের অতলে নাগার হারিয়ে যাওয়া মানিকের শব্দস্রোতে উঠে আসে এভাবে— 'বড় একটা ঢেউ এসে লাইফ বেল্ট আঁটা নাগাকে লঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। নাগার মনে হলো, এতক্ষণে সে কী আসল সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছে, একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে?' বেদনাবিধুর এই পরিণতিই পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসে নাগাকে। যাদববাবুর অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে গেছে নাগা। তার জীবনের এই পর্বটুকু বাদ দিলে নাগাকে অনায়াসে এক আদর্শবাদী কিশোর হিসেবে শনাক্ত করতে পাঠকের বেগ পেতে হয় না। অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নাগার প্রতি কিশোরমন কখনো বিরূপ হয় না। নাগার অন্তিম অসহায়তা পাঠকের চিত্তলোকে সংবেদনা সৃষ্টি করে, তার জন্য জাগ্রত হয় ভালোবাসা আর সহানুভূতি। নাগার কৌতূহল ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানসতা কিশোরপাঠককে গভীরভাবে টানে— নাগার সমুদ্রযাত্রায় কিশোরমন খুঁজে পায় স্বপ্ন ও সংগ্রামের চিরায়ত এক আনন্দ।

মানিকের *মাঝির ছেলে* উপন্যাসের গোটা কাহিনীই দেখা হয়েছে নাগার চোখ দিয়ে— নাগাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাগা-চরিত্র নির্মাণ করতেই মানিক তাঁর সর্বোচ্চ মনোযোগ ঢেলে দিয়েছেন। ফলে উপন্যাসে সে-ই একমাত্র পূর্ণ বিকশিত চরিত্র, বাকিদের মধ্যে আছে অপূর্ণতার ছাপ। তবু হারুমাঝি, যাদববাবু, রূপা— এসব চরিত্র মানিকের চরিত্রসৃজন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে।

মাঝির ছেলে উপন্যাস কিশোরমনের দিকে লক্ষ রেখে রচিত হলেও, এখানে পাওয়া যায় সমাজবাদী মানিকের চিন্তার পরোক্ষ প্রকাশ। নাগার জীবন ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক এই উপন্যাস মূলত নিম্নবর্গের জীবন-বাস্তবতারই শৈল্পিক প্রকাশ। এ উপন্যাসে নাগার অবয়বে ভেসে ওঠে পরিশ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও পেশীর লাবণ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরম মমতায় শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে জেলে ও মাঝিজীবনের ছবি এঁকেছেন। এই ছবির অন্তরালে, লক্ষ করলেই শোনা যাবে, নিম্নবর্গের মানুষের অসহায়তা ও কান্নার সুর, স্বপ্ন ও সংগ্রামের বিমিশ্র অভিব্যক্তি।

মাঝির ছেলে উপন্যাসে মূলত চিত্রিত হয়েছে দুই মাঝির জীবনকাহিনী— একদিকে নাগা, অন্যদিকে যাদববাবু। যাদববাবু *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের হোসেন মিয়ার অস্পষ্ট আভাস। যাদববাবুর চোরাচালান ব্যবসাও উপন্যাসে সৃষ্টি করেছে এক রহস্যজট, যেমন রহস্য আছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে। যাদববাবুর মাঝে যেমন উঁকি দেয় হোসেন মিয়া, তেমনি নাগার মাঝে কুবের মাঝি। উভয় উপন্যাসেই আছে চোরাচালানের অনুষঙ্গ। সে-বিবেচনায় *মাঝির ছেলে* উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি*-র মতোই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক তাৎপর্যবহ নির্মাণ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মাঝির ছেলে* নিটোল সংগঠনের উপন্যাস। অত্যন্ত সংহত এর কাঠামো। এমন শিল্পনিপুণ কিশোর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। এ উপন্যাসের ভাষায় আছে কিশোর-মনকে ধরে রাখার অপূর্ব এক জাদুকরি শক্তি। উপন্যাসের অন্তিমে সংযোজিত কাহিনীতে আছে অ্যাডভেঞ্চার চারিত্র্য। উপন্যাসের

ভাষা বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক; তবু কখনো কখনো রোমান্টিক ভাষারীতি ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য *মাঝির ছেলে* উপন্যাসকে অভিষিক্ত করেছে। যেমন—

> তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। নদীতে সন্ধ্যা হয় মহাসমারোহে, নিঃশব্দ রঙিন সমারোহে। অস্ত যাবার সময় সূর্য যে রঙ ছড়িয়ে দেয়, ডাঙার মানুষের কাছে সে রঙ থাকে শুধু আকাশে। নদীর মানুষ নদীতেও রঙ দেখতে পায়। আকাশের রঙ নিয়ে নদী যেন আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে রাঙিয়েছে।

কিশোরসাহিত্য যে কেবল সহজপাচ্য লঘু চটুল কাহিনী নয়, সেখানেও যে সমাজসত্যকে তুলে ধরা যায়, মানিকের *মাঝির ছেলে* তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা মানিকসাহিত্যে যে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, *মাঝির ছেলে* পাঠ করলে তা যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের কাহিনী-স্রোতে কিশোরমন সহজেই একাত্ম হয়ে যায়। কেবল মানিক-সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা কিশোর-সাহিত্যের ধারাতেই *মাঝির ছেলে* এক অসামান্য নির্মাণ, কালোত্তীর্ণ এক সৃষ্টি।

মাঝির ছেলে ছাড়াও, পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে, কিশোরদের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো তিনটি উপন্যাস লিখেছেন, তবে সবগুলোই অসম্পূর্ণ। নানা কারণেই উপন্যাসত্রয় শেষ করতে পারেন নি তিনি। কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসত্রয় হচ্ছে— *মাটির কাছের কিশোর কবি*, *মশাল* এবং *রাজীবের লম্বা ছুটি*। অসম্পূর্ণ হলেও, এগুলোর মাঝেও পাওয়া যায় পূর্ণতার ব্যঞ্জনা, বোঝা যায় মানিক-প্রতিভার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কিশোর-উপন্যাস *মাটির কাছের কিশোর কবি*। প্রসূন বসু-সম্পাদিত 'আগামী' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ৬-৭ যুগ্ম সংখ্যা (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৯) থেকে ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (মাঘ ১৩৬০) উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মোট সাত কিস্তিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উপন্যাস প্রকাশিত হলেও, কিস্তি প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্তও করতে পারেন নি। ২য় বর্ষ ১১-১২ (যুগ্ম) সংখ্যায় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬০) এ রকম ঘোষণা প্রকাশিত হয়— 'অনিবার্যকারণে এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস *মাটির কাছের কিশোর কবি* প্রকাশ করা গেল না। সামনের মাস থেকেই আবার সঠিকভাবে প্রকাশিত হবে।' কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি আর সমাপ্ত করতে পারেন নি। তার মৃত্যুর পর বিখ্যাত সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন, যা ১৩৬৫-র শারদীয় 'আগামী'তে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসটির শেষে পত্রিকায় লেখা ছিল— 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করলেন : খগেন্দ্রনাথ মিত্র।'

মাঝির ছেলে উপন্যাসের মতো *মাটির কাছের কিশোর কবি* উপন্যাসেও পাওয়া যায় জীবনের উত্তাপ, বাস্তবতার স্পর্শ। কিশোরসাহিত্য মানেই যে আজগুবি গল্প-কাহিনী নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্ষ্যমাণ উপন্যাস পাঠ করলে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অপরদিকে গ্রন্থনৈপুণ্য ও চরিত্র রূপায়ণের বিশিষ্টতার কারণে বাস্তব জীবনাশ্রয়ী হয়েও এ উপন্যাস কিশোরমানসের কাছে হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। উপন্যাসটির শিরোনাম দেখে প্রথমেই মনে পড়তে পারে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা। জীবনবোধ, বিশ্ববীক্ষা এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণে মানিক ও সুকান্তের মধ্যে রয়েছে গভীর ঘনিষ্ঠতা। তাই পাঠকের মনে হতেই পারে যে, এ

উপন্যাস বুঝি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। তাই উপন্যাসের শিরোনামহীন 'মুখবন্ধে' কিশোর-পাঠকদের উদ্দেশ্যে মানিক লিখেছেন— 'গোড়ায় তোমাদের বলে রাখাই ভালো যে এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তার জীবন-কাহিনী ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ উপন্যাস— চরিত্রই বলো আর কাহিনীই বলে সব আমার মগজের কারখানায় তৈরি। সুকান্ত অবশ্য এদেশে পুষে রাখা যক্ষ্মার অভিশাপে অল্প বয়সে প্রাণ দিয়েও কবি হিসাবে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমার উপন্যাসের কবিকে কাহিনীর শেষে কবি আর রক্ত-মাংসের মানুষ দুরকম হিসাবেই জীবন্ত দেখতে পারে।' এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, *মাটির কাছের কিশোর কবি* উপন্যাস রচনার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় সর্বদা ছায়া বিস্তার করেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বোধ করি এ কারণেই উপন্যাসের মুখবন্ধে মানিক লিখেছেন— 'সুকান্ত সম্ভব না হলে, মাটির কাছের আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হলে, তোমাদের জন্য আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হত না। যতই রঙ চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই মাটির মানুষকে আর মাটির মানুষের জীবনকে অন্তত ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না, লিখব কী!' স্পষ্টত বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় শিল্প-উপাদান হিসেবে বক্ষ্যমাণ উপন্যাসে সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন গৃহীত না হলেও, মানিকের অবচেতন মনে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছেন কবি সুকান্ত।

মাটির কাছের কিশোর কবি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিশোর, যে ছিল স্বপ্নমুখী জীবনমুখী এক বালক। আর দশজন সমবয়সী বালক থেকে কিশোর ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্যের দুঃখে সে কাতর হতো, অন্যের কষ্টকে সে নিজের কষ্ট বলে মনে করতো। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে বাঁচাতে চাইতো অন্যের জীবন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ তার প্রশংসা করলে তার কাছে তা অর্থহীন অতিরঞ্জন বলে মনে হতো। কেননা, অন্যকে সাহায্য করাই তার মানবিক দায়িত্ব বলে সে মনে করতো। তাই ছোট মেয়ে পাঁচীকে কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর পর পিতা মনোহরবাবু যখন কিশোরকে বাহবা দেন, তখন তার মনোভাব হয় এরকম—

> মনোহরবাবু বলেছিলেন, কুকুরটা তবে সত্যি মেয়েটাকে কামড়ে দিত, তুই ওকে বাঁচিয়েছিস।
>
> কিশোর টের পেয়েছিল তার সাহস আর বীরত্বের পরিচয় পেয়ে বাবা যেন খুশি হয়েছেন, কিন্তু সাহস বা বীরত্বের কী প্রমাণ যে সে দেখিয়েছে নিজে, কিশোর সেটা বুঝে উঠতে পারে নি।....কুকুরটা তেড়ে এসেছিল পাঁচীকে কাজেই তাকে আড়াল করতে হবে, এটুকুর বেশি সে তো আর কিছুই ভাবেনি, টেরও পায়নি বেশ একটা বাহাদুরি দেখাচ্ছে পাঁচীকে বাঁচাতে চেয়ে।
>
> যা করতেই হবে, যেটা সাধারণ স্বাভাবিক হিসাবে করণীয়, সেটা করার মধ্যে বাহাদুরি কী আছে?

শৈশব থেকেই কিশোর অন্যায়-অত্যাচার-শোষণকে নিজের মতো করে বুঝবার চেষ্টা করেছে। সব বিষয়েই তার মন ছিলো জিজ্ঞাসু। অন্যায়-অত্যাচার সে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সামাজিক শোষণের মূল কারণ খোঁজায় তার কিশোরমন ছিল সর্বদা ব্যাকুল। তার চিত্তলোকের এই প্রবণতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেন এভাবে— 'জিজ্ঞাসু মন। শৈশবের এলোমেলো অন্তহীন জিজ্ঞাসাগুলো বয়সের চালুনিতে ছাঁকা হয়ে এসেছে। অনেক অর্থহীন জিজ্ঞাসা করে গেছে, কোনো

কোনো জিজ্ঞাসা স্পষ্টতর হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে জোরালো জিজ্ঞাসা চারিদিকে এত অন্যায়-অবিচার দুঃখ-দুর্দশা হীনতা-নীচতা কেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে দিন দিন বেড়ে চলেছে এই জিজ্ঞাসার পীড়ন।' এই জিজ্ঞাসার কারণেই গরিব মানুষকে ছোটলোক বললে মার কথার প্রতিবাদ করে সে। অভিন্ন কারণে তাকে ভালো ভালো খাবার দেওয়া হয়, অথচ পিসিমার ছেলেটাকে তা দেওয়া হয় না কেন? পিসিমা দরিদ্র ও তাদের আশ্রয়ে আছে বলেই কি এমন হচ্ছে? কিশোরের মনোভাব লেখক জানাচ্ছেন এভাবে—

> বাড়ি ফিরেই মায়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্য কিশোর মনে মনে পাঁয়তারা কষে। সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তাকে মাছ দুধ সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াতে সব সময় এমন ব্যগ্র হয়ে থাকে, অথচ পিসিমার ছেলেটাকে একটু দুধ দিতে তার মন চায় না কেন?

—কিশোরের এই প্রশ্নের উত্তর নেই সমাজ-সংসারে। উত্তর না পেয়ে তার মন বিষিয়ে ওঠে। সামাজিক অসমতা বোঝার বয়স হয়নি কিশোরের, কিন্তু অন্তর্গত উপলব্ধিতে সে যেন বুঝতে পারে সবই। তাই দরিদ্র মানুষকে কেউ খেতে দেয় না, অথচ তাকে খাওয়ানোর জন্য সবার ব্যস্ততা দেখে তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ক্ষুব্ধ মনের পরিচয় ধরা পড়ে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে—

> সবাই খাবে বারান্দায়। আরেকটু দাও, আরেকটু বলে সবাই করবে চেঁচামেচি। সে একলা খাবে শোয়ার ঘরে। আরেকটু খা, আরেকটু খা বলে তার ওপর চলবে পীড়াপীড়ি। এমন লজ্জা করত কিশোরের।
>
> এমন অপরাধী, এমন পাপী মনে হত নিজেকে। পাড়াতেই কত ছেলেমেয়ের ম্লান শুকনো রুক্ষ মুখ, মলিন শীর্ণ চেহারা— খিদের জ্বালায় আমসিপনা চেহারা।
>
> বেশি বেশি খাইয়ে তার পেটের অসুখ ঘটাতে সবাই কোমর বেঁধে ব্যতিব্যস্ত!
>
> কেন?
>
> কেন তাকে নিয়ে এমন অসভ্যতা, এমন ছোটলোকামি?

পিতা মনোহরবাবু ষড়যন্ত্রের ফলে চাকরি ও অর্থ হারিয়ে বিপন্নতায় নিপতিত হন। তখন দেখা গেছে কিশোরের ভিন্ন এক রূপ। সংসারের সব নির্যাতনকে সে নীরবে সহ্য করেছে, দারিদ্র্য যে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করেছে। এ সময় মায়ের প্রতি, বাবার প্রতি কিশোরের ভালোবাসা প্রবল হয়ে ওঠে। নিজে দুধ না খাইয়ে ছল করে মাকে দুধ খাওয়াতে চায় কিশোর। এ অবস্থায় মা ও ছেলের মাঝে অভিনয়টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন এভাবে—

> মার চেহারা দেখে বুক ফেটে কান্না আসে কিশোরের। তবু সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে চরমে তোলা আবদারের সুরে বলে, আজ একটা মজা করব। পেট খারাপ তো— দুধটা তোমায় খাইয়ে দেব।
>
> - পেট খারাপ? আমি টের পেলাম না? কখন তুই-
>
> - তোমায় ঠকিয়েছি—জানতে দিইনি।
>
> - সত্যি তো কিশোর? মিছে বলছিস না তো?
>
> - তোমায় কখনও মিছে কথা বলি?
>
> কিশোর মায়ের মুখের কাছে চুরি করা দুধের কাপ ধরে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর মা যেন শুষে নেয় দুধটুকু।

শৈশব-কৈশোরে এইসব পরোপকারী মানসিকতা কিশোরকে ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কিশোরের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন একজন আদর্শ মানুষের সামূহিক গুণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই স্বপ্নের আদর্শ নায়ককে কীভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে তিনি পাঠককে জানাচ্ছেন এই কথা— 'ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কিশোর কেমন ছিল তার খানিকটা নমুনা দেখিয়েছি। গরিবের কালো একটা মেয়েকে বাঁচাতে সে হাত দিয়ে পাগলা-কুকুরকে ঠেলে দিয়ে ভয় পায় না, কুকুর কামড়ানোর চিকিৎসা করতে সে বাবার সঙ্গে কলকাতা গিয়ে সন্ধ্যাবেলা হোটেলের ঘরে মায়ের জন্য মন কেমন করায় ছড়ার বই সামনে ধরে সুর করে পড়ার ছলে কেঁদে নেয়, চোখের জলে লেখা ঝাপসা হয়ে গেলে নিজেই ছড়া বানিয়ে কাঁদে। রাস্তায় 'ছোটোলোকদের' ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে সে ওস্তাদ— এদিকে আবার নতুন মুনসেফবাবু এসে কীর্তনে শহরকে মাতিয়ে দিলে সেও কৃষ্ণের জন্য পাগল হয়। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ডালে কৃষ্ণকে সে নিজের চোখে দেখতে পর্যন্ত পায়।'

কিশোর স্বপ্নবিলাসী কবি, কিশোর মাটির সমীপবর্তী জীবনবাদী কবি। সূচনাসূত্রেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কিশোর-চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় ক্রিয়াশীল থেকেছে এক কিশোর-কবি সুকান্ত। আনন্দ কিংবা বেদনা প্রকাশে কিশোর লেখে কবিতা লেখে ছড়া। এইসব ছড়ায় কিশোরের অন্তর্গত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেমন, আপন সহোদরকে নিয়ে সে লেখে তার প্রথম কবিতা— 'টুকটুকে ভাই, কোথায় তুমি ছিলে? / বেছে বেছে কেন আমার ভাইটি হয়ে এলে? / ছিলে আমার আর জন্মের ভাই? / এজন্মেও ভাই হয়েছে তাই? / এসে আমারই আদর নিলে কেড়ে, / ঠান্ডা বরফ ভাত রেখেছে বেড়ে! / গরম করে খাইয়ে দেবার কেউ তো আমার নাই! / তা হোক, তুমি যখন আমার চিরজন্মের ভাই, / আমার আদর তুমি পাবে তাই তো আমি চাই!' মানুষের দুঃখ-কষ্ট আনন্দ বেদনা কিশোরের অন্তর্গত কবিসত্তাকে উদ্দীপিত করে। তাই কালীর মৃত্যুতে বেদনাবিদ্ধ হয়ে সে লেখে তার দ্বিতীয় কবিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

কেন এমন হয়?
কালী কেন এমনভাবে মরে?
কটা দিন আনমনে ছটফট করে কাটে। কালীর জন্য কী রকম কষ্ট হচ্ছে কিশোর ঠিক বুঝতে পারে না। বেদনার চেয়ে জ্বালাই যেন বেশি।
তারপর কবিতা লেখে—
এ তো দুর্ঘটনা নয় প্রতিকারহীন,
তুমি তো মর না একা শুধু একদিন।
যে আগুনে জীবনের একান্ত নির্ভর,
চিতাতেও যে আগুন সার্থক সুন্দর।
একান্ত নিয়ম-নিষ্ঠ মানুষের দান
সে আগুন তোমারে তো করে নাই গ্রাস।
তোমারে করেছে হত্যা মানুষ খুনিরা,
দারিদ্র্যের দাবানল জ্বেলে রাখে যারা।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, *মাটির কাছের কিশোর-কবি* উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে খগেন্দ্রনাথ কিশোরচরিত্রটি নির্মাণে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোরও সামাজিক অসমতা দেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে— উচ্চারণ করে এই কথা— 'আমার এক সময় কী মনে হয় জান মা? সব ভেঙে চুরে ফেলে— ।' সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়-অত্যাচার এবং পারিবারিক বিপর্যয় কিশোরকে ক্রমশই অঙ্গীকারাবদ্ধ করে, মানুষের মুক্তির জন্য সে তার মাকে শোনায় এই সংকল্পের কথা—

> কিশোর বলে, তোমার মতো হাজার হাজার মা তাদের রোজগেরে ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখে ওই কথাই বলছে— এই কী চাকরির বয়স? একথাও আজ তোমায় বলছি, এ অবস্থা ঘোচাবই।
>
> কে, তুই একা?
>
> আমার মতো সকলে।
>
> তাই হোক! মায়েদের আশীর্বাদ তোমার মাথায় পড়ুক। মা চোখ মোছেন।
>
> কিশোর মনোহরের পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে নিজেরই লেখা সেই কবিতাটা আবৃত্তি করতে মনে বল পায়—
>
> জোর কদমে চলব সোজা লক্ষ্যে,
>
> অফুরন্ত সাহস নিয়ে বক্ষে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মশাল* এবং *রাজীবের লম্বা ছুটি* উপন্যাসদ্বয় অসম্পূর্ণ রচনা। *মশাল* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'রংমশাল' পত্রিকায়। 'রংমশাল'-এর ১৩৫১-র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে পৌষ সংখ্যা— এই ছয় কিস্তিতে *মশাল* ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু এরপর আর কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। ১৩৫২-র ভাদ্র সংখ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রকাশিত হয় 'রংমশাল' পত্রিকায়— 'অসুখ, হাঙ্গামা, দাঁতের শত্রুতা এইসব অনেক কিছু আমায় সাময়িকভাবে কাবু করেছে।— সুস্থ হলেই *মশাল* লেখবার চেষ্টা করব।' কিন্তু সদিচ্ছা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *মশাল* উপন্যাসটি শেষ করতে পারেননি।

মশাল উপন্যাসের যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজসচেতন একটি কিশোর উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। *মশাল* সমাপ্ত হলে বাংলা সাহিত্যে সমাজসচেতন কিশোর উপন্যাসের ধারায় একটি উজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো। একই কথা প্রযোজ্য তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা *রাজীবের লম্বা ছুটি* প্রসঙ্গেও। এ উপন্যাসটিও কোন এক অজ্ঞাত কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ করেননি। *রাজীবের লম্বা ছুটি* রহস্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি শেষ হলে ভিন্ন স্বাদের এক রহস্যকাহিনীর সন্ধান পেত বাঙালি কিশোর-পাঠকেরা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেমানুষি ন্যাকামি আর অলৌকিক কল্প-কাহিনী নিয়ে কিশোর-উপন্যাস লিখতে চাননি। তাঁর কিশোর উপন্যাসে পাওয়া যায় মাটি ও মানুষের কথা, জীবনের উত্তাপ— শোনা যায় সামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার উচ্চারণ। সাহিত্যের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরদের করতে চেয়েছেন সমাজমুখী জীবনমুখী। তাঁর *মাঝির ছেলে*, *মাটির কাছের কিশোর কবি*, *মশাল* এবং *রাজীবের লম্বা ছুটি* রচনাগুলো সে-সত্যই প্রকাশ করে।

সহরবাসের ইতিকথা ও ইতিকথার পরের কথা : মানিকের কমপঠিত দুটি উপন্যাস

মজিদ মাহমুদ

'সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪২) এবং 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২) উপন্যাস দুটির রচনাকালের পার্থক্য ছিল বছর দশেকের কাছাকাছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাসের সংখ্যা হিসেবে এ দুটির ক্রমিক যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও ত্রয়োবিংশ। অর্থাৎ এ দুটি রচনার মাঝখানে আরো গোটা আষ্টেক উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছিলেন এই রূপদক্ষ কথাশিল্পী। সে যা-ই হোক, বর্তমান আলোচনাটি উপর্যুক্ত দুটি উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তার মানে এই নয়, এ রচনায় কেবল এ দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। তুলনা যতটুকু আসবে, সময় ও ঘটনার প্রয়োজনে– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহকে কীভাবে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তার আলোকে। সমকালে আর পাঁচজন ঔপন্যাসিক থেকে মানিকের আলাদা হবার অন্যতম কারণ, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা। রাজনীতি ও মানবপ্রবৃত্তিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মানিক তাঁর চরিত্রসমূহকে বিন্যাস করতে সচেষ্ট ছিলেন। শিল্পের এসথেটিকস বিচারে এটি ভালো না মন্দ সে হিসেব আলাদা। কিন্তু মানিক তাঁর ইচ্ছের ওপর ষোলআনা প্রভুত্ব করে চিন্তাশীল পাঠকের সহমর্মিতা আদায় করতে পেরেছিলেন। তবে এ রচনার ক্ষেত্রে একটি কৈফিয়ত থেকে যায়, মানিক-মূল্যায়নের পক্ষে আমি কেন এ উপন্যাসদ্বয়কে বেছে নিলাম? কারণ, এ দাবি করা ঠিক হবে না যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র রচয়িতার জন্য এ দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু সমগ্র মানিক-মূল্যায়নে তার যে কোনো তুচ্ছ রচনাও উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া এ উপন্যাস দুটি তাঁর লেখক জীবনের পরিণতপর্বে যেমন লিখিত তেমন ভারত-বিভাগের আগে এবং পরে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাও এতে সম্যকভাবে প্রতিফলিত। এ দুটি উপন্যাস মানিক-মানস পুনর্গঠনে সহায়ক বলে বিবেচনা করা যায়। তাছাড়া মানিকের শিল্পরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে এ দুটি উপন্যাস উপেক্ষিত থেকেছে বরাবর।

শুরুতে উপন্যাস দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া যাক। 'সহরবাসের ইতিকথা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ শারদীয় আনন্দ বাজার পত্রিকায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। এর প্রায় বছর চারেক পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ডিএম লাইব্রেরি এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে মানিক 'লেখকের কথা' নামে একটি লম্বা ভূমিকা জুড়ে দেন এতে। কয়েকটি চরিত্র কিছুটা সংশোধন করেন। তাঁর বিবেচনায় সংশোধিত চরিত্রগুলোর বিকাশ প্রথম সংস্করণে যথাযথ ছিল না। সংশোধনের পরেও চরিত্র-বিকাশ যথাযথ হয়েছিল কিনা প্রসঙ্গান্তরে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে।

এ উপন্যাসের বিষয় হিসেবে এসেছে গ্রামীণ ও শহর-জীবনের দ্বন্দ্ব– যা মানিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ইতিকথার পরের কথা'তেও আমরা এই সংঘাত দেখতে পাব। তার আগে 'সহরবাসের ইতিকথা'র কাহিনী-সংক্ষেপ বলে নেয়া ভালো।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোমোহন। প্রায় সর্বত্র মোহন বলে পরিচিত। তাকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসের আখ্যান রচিত। গ্রামীণ উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা মারা যাওয়ার পর সপরিবারে শহরে চলে আসে। শহর মানে কলকাতা। স্ত্রী লাবণ্য, মা ও ভাই নগেনকে নিয়ে সে শহরের একটি দামি বাসায় ওঠে। তার সঙ্গে আসে গ্রাম সম্পর্কের পালিত কর্মকার শ্রীহরি আর ব্রাহ্মণ পরজীবী পীতাম্বর। পড়াশুনা সুবাদে কলকাতায় আগেই কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল মনোমোহনের। তাদের মধ্যে চিন্ময় ও তার স্ত্রী সন্ধ্যা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তার বাড়িওয়ালা জগন্ময়, চিন্ময়ের বোন ঝরনা, বারবণিতা দুর্গা, চম্পা ও বাড়ির চাকর জ্যোতিকে নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত। জটিল কোনো ক্লাইমেক্স এ উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেনি। গ্রামীণ পুঁজির শহুরে প্রকাশ, গ্রাম শহরের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, মা ছেলের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, শহুরে প্রেম ও যৌনতা এ উপন্যাসের কাহিনীকে গতি দিয়েছে।

'ইতিকথার পরের কথা' লেখকের তেইশতম উপন্যাস। 'নতুন সাহিত্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে– মানিকের মৃত্যুর মাত্র বছর চারেক আগে।

জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও বহুমুখী চরিত্র ও সম্পর্কের দ্বারা এ উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রিত। উচ্চশিক্ষায় বিলাত ফেরত শুভময় ওরফে শুভ দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পকারখানা করতে চায়। তার বিশ্বাস সদ্য-স্বাধীন দেশের উন্নয়নের অর্থ দেশকে উত্তম ও টেকসই শিল্প-কারখানায় সমৃদ্ধ করে তোলা। কারখানা গড়ে তোলা ছাড়া ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই। কিন্তু কারখানার ধরন কি হবে শুভ তা জানে না। দেশী মিশেল ছাড়া বিলাতি বিদ্যা কাজে আসে না। তাই চিন্তা ও কর্মসহায়ক হিসেবে সে গ্রামের ডাক্তার নন্দ কর্মকারকে বেছে নেয়। আর আসে কৈলাস। শুভ, নন্দ ও কৈলাস এই ত্রিবেণী সংগমে এ উপন্যাসের কাহিনী ঘনীভূত হয়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় লক্ষ্মী, গাঁদা ও মায়ার মতো বীর্যবতী নারী।

এ উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্ততান্ত্রিক রক্তের উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে শুভময়ের আস্থা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। অত্যাচারী জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় কি করে অত্যাচারিত গরিব-দুঃখীর কথা ভাবতে পারে– এটি গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। আর শুভর পিতাই বা কেন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জমিদারির অহংকার ছেড়ে শুভর খামখেয়ালি মেনে নেবে? এছাড়া নারী-পুরুষের যৌনতাবাহিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এ উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে গতি এনেছে। শেষ পর্যন্ত শুভময়ের পিতার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-কোনো উপন্যাসের মূল্য নির্ধারণে একটি প্রধান সমস্যা– তাঁর সম্বন্ধে কর্তৃত্বশীল প্রচল ধারণা। ধরে নেয়া হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক জীবনের শুরুতে মানবজীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে দেখেছেন নারী-পুরুষের সম্পর্কজনিত মিলনাকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের প্রকল্প অনুযায়ী অবচেতন মনের কারসাজি তার উপন্যসের চরিত্রসমূহকে ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিল। আর মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পরে সামাজিক স্তরসমূহকে তিনি দেখেছেন শোষক আর

শোষিতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এ ধরনের হাইপোথিসিস সত্য হলেও লেখক সম্বন্ধে প্রাক-ধারণা শিল্পবিচারে অন্তরায়। মার্কস ও ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান বিকাশের ফলে মানুষের আচরণ ও সমাজ কাঠামোর এমন অনেক রসায়ন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যা আগে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মার্কসীয়-ফ্রয়েডীয় চেতনা বিকাশের আগে কিংবা পরে যেসব লেখক এ ধরনের সূত্রে দীক্ষিত না হয়েও শিল্পসৃষ্টি করেছেন– তাদের রচনায়ও উপর্যুক্ত আচরণ ও সমাজবিদ্যা দুর্লক্ষ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন আরো দুই বন্দ্যোপাধ্যায়– বিভূতি ও তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও কি একই ধরনের পাঠ নির্ণয় সম্ভব নয়? অথচ বিষয়ে-বর্ণনায় তারা কতই না আলাদা।

আসলে 'সহরবাসের ইতিকথা' এবং 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসদ্বয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রচলপাঠকে মান্য রেখে উপনিবেশিক তথা সমকালীন ব্রিটিশ পুঁজির সম্পর্কের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া এ রচনার লক্ষ্য হতে পারে। কারণ লিবিডো এবং ধনাকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিম এবং অকৃত্রিম প্রবৃত্তি। কিন্তু ইতিহাসের কালে এ দুটি মহাস্ত্র বিভিন্ন রূপ ও মর্যাদায় ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা দুটি উপন্যাসেই লক্ষ করেছি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী, স্থান-কাল যা-ই হোক না কেন ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে। যে টাইম-স্পেসের উপরে এর কুশীলবগণ সঞ্চালয়নমান তা মূলত ব্রিটিশের তৈরি। এর পাত্রপাত্রীগণের ক্রিয়াকলাপ রোগের প্রতিক্রিয়া বই কিছু নয়।

'সহরবাসের ইতিকথা'র নায়ক মনোমোহন কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কলকতা শহরে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে চায়। যদিও শহরে আয়-রোজগার ভালো বলে সে নিজেকে একটা বুঝ দেয়; তবু গ্রাম থেকে অর্থ এনে শহরে ভোগবাসনাপূর্ণ জীবনযাপনই তার অবচেতন মনে সক্রিয়। 'ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে ধনতন্ত্রের অতি অসম বিকাশের অর্ধস্ফুট কিন্তু বর্ণবাহারের ফুল কলকাতা।' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর)। গ্রামীণ পুঁজিকে পুঁজি করে ইংরেজের হাতে গড়ে ওঠে কলকাতা শহর। ইঙ্গ-শাসনের প্রয়োজনে দ্রুত মধ্যস্বত্বভোগীদের ভিড় জমে ওঠে এখানে। আধুনিক অর্থে শিক্ষা শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় কলকাতা। গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক (উপনিবেশিক) বাজার ব্যবস্থা। আমদানি হয় প্রযুক্তিনির্ভর ভোগ্যপণ্য। কায়িক পরিশ্রমের জায়গা দখল করে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল। আমার মনে হয় 'সহরবাসের ইতিকথা' রচনায় মানিক এমন কোনো মহৎ চিন্তার কথা ভাবেননি– যা তার মার্কসবাদী চেতনায় সক্রিয় ছিল কিংবা ফ্রয়েডীয় হাইপোথিসিস। তাঁর এ উপন্যাসের নায়ক উচ্চশিক্ষিত হলেও শিশ্নোদরপরায়ণ। শহরবাস এবং আয়বৃদ্ধি ছাড়া এমন কোনো মহৎচিন্তা প্রাথমিকভাবে সে করেনি। এই উপন্যাসের কাহিনী এমন নিস্পৃহভাবে মানিক বর্ণনা করেছেন যে লেখকের মোটিভ নির্ণয় দুরূহ। তবে চরিত্র-সৃষ্টি ও কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে সম্ভবত মানিকপ্রতিভা এই পর্বে কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে কিনা তা চট করে বলা সম্ভব নয় । এই উপন্যাসের কাহিনীর ভিতর দিয়ে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে চাই :

'পিতা স্বর্গে গেলেন। মনোমোহন ভাবিল, এবার তবে সহরে গিয়াই বাস করা যাক।' যেই সিদ্ধান্ত ওমনি হুট করে দীর্ঘদিনের গ্রামীণ সম্পর্ক নাড়ির টান উপেক্ষা করে সপরিবারে কলকাতায় আগমন। যদিও কলকাতা শহর তার নতুন নয়। শিক্ষাসুবাদে কলকাতা জীবনের সঙ্গে আগেই তার পরিচয়। এই উপন্যাসে আমরা শ্রম ও

সারপ্লাসভ্যালুর একটি সম্পর্ক দেখতে পাই। যখন গ্রামনির্ভর কৃষিই একমাত্র উৎপাদন ছিল তখন জমিদার ও মহাজন শ্রেণী গ্রামে অবস্থান করতেন। আবার যখন প্রযুক্তিনির্ভর শ্রমের বিকাশ ঘটছে তখন সেই ধনিক শ্রেণী তাদের পুঁজিপাট্টা নিয়ে শহরমুখী হচ্ছে।

'সহরবাসের ইতিকথা' নামকরণের মধ্যে সম্ভবত লেখকের একটি নেতিবাচক ধারণা কাজ করে থাকতে পারে। ব্রিটিশ পুঁজির ফলে যে শহর গড়ে ওঠে সে শহর জনবান্ধব নয়। পুঁজির অসম বিকাশ বহুমুখী অন্যায় ও অসামজিক কাজের জন্ম হয় শহরে। অবশ্য গ্রামে তা বহুকাল ধরে চলে আসছে বলে সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, বহুকাল ধরে চলে আসছে বলেই তাকে ভালো বলা চলে না। শহর ভালো না গ্রাম ভালো– এমন নীতিশিক্ষামূলক বর্ণনা এ উপন্যাসে প্রশ্রয় না পেলেও খুব সহজেই লক্ষ করা যায় গ্রামীণ অর্থনীতিক কাঠামোর পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেশ টান ধরেছে। এমনকি উপন্যাসের শেষে মনোমোহনের পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাবলয় রীতিমত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। যদিও ভেঙে যাওয়ার আগে সে নতুন করে চেষ্টা করতে চায়। সে অন্য রকম মানুষ হতে চায়। কিন্তু হোসেন মিয়ার রহস্য যেমন পাঠকের কাছে অনাবিষ্কৃত থাকে তেমন ভালোমন্দের দোলাচল এখানে নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। জানি না শেষ পর্যন্ত মানিকের চরিত্রগুলো টিপিক্যাল কিনা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীর মধ্যেও উপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়; 'সহরবাসের ইতিকথা'র মোহনের মধ্যে তা আরো উৎকট আকার ধারণ করে। 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভও তার বাইরে নয়। আসলে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক যে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে তারই প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাস। সেটি যেমন আলালের ঘরের মতিলালের জন্য সত্য তেমন শশী, মোহন, শুভর জন্যও সত্য। শশীকে বলা হয় বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক– যার গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে কোনো আবেগ নেই। সেদিক দিয়ে বলা চলে মনোমোহন শশীর সম্প্রসারণ– গ্রামে থাকার যার আদৌ ইচ্ছে নেই। কিন্তু শশীর মনোজগৎ যে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। এমনকি কুসুমের সঙ্গে তার যে অসম প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার লাভ করেছিল– মোহনে আমরা তার দেখা পাই না। বরং শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলে পক্ষান্তরে গ্রামের উন্নতি। কারণ গ্রামে শিক্ষিতরা বেকার বসে থাকে আর ধনীরা টাকা খরচের জায়গা না পেয়ে টাকা আটকে রাখে। এ ধরনের কথা মোহনের বাড়িওয়ালা জগানন্দের মুখ দিয়ে লেখক বলেছিলেন। সেও এক রহস্যময় চরিত্র। যিনি নিজে পুঁজিপতি। অথচ বই লিখছেন : ভারতবর্ষে সাম্যবাদ, ভারতের সংস্কার আন্দোলনের রূপ, বাংলার শিল্পোন্নতির পথ। পাশাপাশি তার ভাই শ্রীশ্রীপরমানন্দ ঠাকুর হিন্দু অন্ধ গুরুবাদী প্রচারক। সে মোহনের মায়ের পূজ্য। এমনকি মোহনের মা যখন জানল জগানন্দ তার গুরু পরমানন্দের ভাই তখন সে তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে, তার জুতা মাথায় তুলে জিভে ঠেকাল। মোহনের মা পরমানন্দকে জানাল, 'আপনাদের বংশের ছোট ছেলেটিও আমাদের নমস্য। আপনাদের পায়ের ধুলো ছাড়া তো আমাদের গতি নেই। অনেক জন্মের পুণ্য ছিল, না ডাকতে নিজে বাড়িতে পা দিয়েছেন।' মোহনের মা চায়, তার ছেলের স্ত্রী লাবণ্যও তার মতো গুরুদেবের ভাইকে ভক্তিশ্রদ্ধা করুক। কিন্তু মোহনের আধুনিক শিক্ষা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চশিক্ষিত হলেও সন্তান না হওয়ার কষ্টে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে লাবণ্য। সংস্কারের বাড়াবাড়ি যে কেবল গ্রামীণ জীবনের মধ্যেই তা নয়; শহরজীবনে তার রূপ নিয়েছে ভিন্ন মাত্রায়। মোহনের বন্ধু চিন্ময় ও স্ত্রী সন্ধ্যার চরিত্রে মানিক তা দেখাতে চেয়েছেন। চিন্ময় সন্ধ্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে

বটে; কিন্তু একত্রে থাকার চিরাচরিত পদ্ধতি মানতে সন্ধ্যা নারাজ। এমনকি চিন্ময় চাইলেও সন্ধ্যা চায় না সন্তান ধারণ করতে। একদিকে সন্তান ধারণের জন্য আকুতি অন্যদিকে প্রতিরোধের যাবতীয় চেষ্টা।

শহরের শিল্প-কারখানা, শহরের গণিকালয়, নতুন ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্বার্থপরতা ও সম্ভাবনা সবটাই মানিক এ উপন্যাসে আঁকতে চেয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিকসুলভ তাঁর এটিচিউড স্পষ্ট হয়নি এ উপন্যাসে। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটি উপন্যাসোচিত বৃহৎ সম্ভাবনা কাজ করলেও দ্রুত লেখনের ছাপ এর সর্বত্র বিরাজমান। যেমন পীতাম্বর চরিত্রের কথায় আসা যাক। পীতাম্বর হতে পারত 'ইছামতী'র লালু ওরফে লালমোহন পাল। কিন্তু হয়ে ওঠার মাঝপথে লেখক তাকে সময় দিতে রাজি হননি। মানিক এ উপন্যাসের ভূমিকাতেও অবশ্য এ কথা বলেছেন। হয়তো তিনি নিজেও এ উপন্যাসে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বই আকারে বের করার সময় বেশ ঘষামাজা করেছেন। কিন্তু ঘষামাজার ছাপ রয়ে গেছে– নিরপেক্ষ বেড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। বিভিন্ন কারণে হয়তো মানিকের মধ্যে একটি তাড়া কাজ করে থাকবে। কারণ 'সহরবাসের ইতিকথা' লেখার সময়ে তিনি সরাসরি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। প্রগতি লেখকসংঘে যোগ দেন। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপ সমাজ জীবনের সর্বত্র দেখা দেয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতেও একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার ওপর শুরু হয় ভয়াবহ মন্বন্তর। এটি অশনিসংকেত লেখার কাল। উপনিবেশিক শাসন সুবাদে ইউরোপের বাধানো যুদ্ধের ফলে এদেশের মানুষকেও কম মূল্য দিতে হয়নি। বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে দলে দলে শ্রমিক শহরে আসছিল। ভেঙে পড়ছিল ভারতের শ্রেণীভিত্তিক আদি পেশা। কামার শ্রীপতি, ভূপাল তাদেরই একজন। যে আশা নিয়ে শ্রীপতি পিতৃপুরুষের আদি ব্যবসা ছেড়ে মোহনের সঙ্গে কলকাতা আসা তা পূরণ হয়নি। যুবতী স্ত্রী কদমকে ফেলে আসতে হয় শ্রীপতিকে। আর মন না চাইলেও তাকে যেতে হয় গণিকা দুর্গার কাছে। কিন্তু এর জন্য কে দায়ী? এমন কোনো নীতিশিক্ষা শিল্পের উদ্দেশ্য থাকে না বটে। কিংবা এর পক্ষে যুক্তি তৈরিও তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু মানিক ঠিকই এর গভীর অসুখ চিহ্নিত করেন। শ্রমের ন্যায্যমূল্য পায় না বলেই তো শ্রীপতি স্ত্রীকে নিজের কাছে আনতে পারে না, গ্রামে কাজ নেই বলেই তো বৌ রেখে শহরে আসতে হয়। বারবণিতা দুর্গা চম্পারাও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। এ কাজ তো তারা স্বেচ্ছায় বেছে নেয় না। নারীর প্রতি সহিংসতা, পুঁজির বাজার চাঙ্গা রাখতে, অল্পমূল্যে শ্রম পাওয়ার ফিকির হিসেবেই তো অল্পমূল্যে দেহ ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হয়। বারবণিতার সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে পুঁজির ইতিহাস জড়িত।

এ উপন্যাসের পুরোটা মনোমোহন দখল করে থাকলেও ইতিকথার পরের কথার শুভময়ের মতো চেতনায় সমৃদ্ধি ঘটেনি তার। সুতরাং, তার যে সংঘাত পিতৃতান্ত্রিক ফিউডাল সংঘাত। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করায় মায়ের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নিজের ভাইও তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ, পরিবারের অন্যদের কাছে প্রতিভাত হয়– শুভ কেবল পরিবারের বড় ছেলে হওয়ার সুবাদে অন্যদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখছে। তাই মোহনের একক খামখেয়ালির ওপর কেউ আর ভরসা করতে চায় না। আশ্রিত পীতাম্বর ও শ্রীহরি পর্যন্ত। শহর তাদের নতুন সম্পর্ক বিন্যাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি মোহনও 'সহরের জীবন-স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করে স্মরণ ছিল না।'

যদিও উপন্যাসের শেষাংশে লেখক নায়ক জীবনের পরিবর্তনের ইংগিত দিয়েছেন কিন্তু সে ইংগিতের গতি প্রকৃতি রহস্যময় রয়ে গেছে। হয়তো শহর মোহনকেও স্বজন বর্জিত স্বার্থসর্বস্ব মানুষে পরিণত করবে।

এ পর্যায়ে মানিকের শৈল্পিক সামর্থ্য কমে আসছিল– তা কিন্তু মোটেও প্রমাণিত নয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'চিহ্ন', 'চতুষ্কোণে'র মতো উপন্যাস তিনি আর লিখতে পারেননি– এ অভিযোগও ঠিক নয়। 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটি তার প্রমাণ। সত্যিই যেন শেষ হয়েও হইল না শেষ। ঔপনিবেশিক ভারতের শেষপাদে যে এটিচিউড নিয়ে তিনি শিল্পীজীবন বেছে নিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে তার নতুন রূপদানে মোটেও বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। একটি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে এর কাহিনীবয়ন করেছেন তিনি। যদিও এ পর্যায়ে মানিক ব্যক্তিগত খারাপ সময় পার করছিলেন। লেখার কাটতি ছিল না মোটেও। দুঃসহ আর্থিক অনটন চলছিল। শরীর আগের মতো ভারবহ ছিল না। তদুপরি মদের নেশা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছিল। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য, এতে তাঁর সহজাত শিল্প প্রতিভা খুব একটা বধাগ্রস্ত হয়নি– তার প্রমাণ ইতিকথার পরের কথা।

এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে ভারত বিভাগের বছর চারেক পরে। আমরা জানি, মার্কসবাদী বীক্ষণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খণ্ডিত ভারত-বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। তাই বলে উপনিবেশিক শাসনের পরিপুষ্টতাও তিনি চাননি। চিন্তার স্বাধীনতা ও শ্রমবান্ধব একটি দেশ গড়ে উঠুক মানিকের স্বপ্নে তা ছিল ষোলআনা। কিন্তু এর কোনো প্রস্তুতি না থাকায় অচিরেই সে অসারতা ধরা পড়ে। নানামুখী পীড়নের মধ্যে থাকলেও এসময়ে মানিকের সৃষ্টিশীলতা বেশ তুঙ্গে অবস্থান করে। একই বছরে তার চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়– দুই খণ্ডে 'সোনার চেয়ে দামী' 'পাশাপাশি', 'সার্বজনীন' আর আলোচ্য উপন্যাসটি তো রয়েছেই। এছাড়া খতিয়ান গল্পগ্রন্থটিও এ সময় প্রকাশিত হয়।

আমার মনে হয়, ভারত-বিভাগের পরে মানিক উপন্যাস লেখার নতুন কিছু প্লট পেয়েছিলেন। অথবা সময়ের প্রেক্ষাপট থেকে পুরনো প্লটগুলো নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তাই দুটি ভিন্ন পরিবেশে রচিত হলেও শশী আর শুভকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু 'ইতিকথার পরের কথা'র কাহিনী শুরু হচ্ছে পুরনো বিপ্লবী জীবনবাবুকে দিয়ে। যৌবনে হয়তো এসব বিপ্লবী স্বাধীনতার জন্য কিছুটা সেক্রিফাইজ করেছিলেন। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে ত্যাগ ও প্রাপ্তিকে মেলাতে পারেননি। দেশ স্বাধীনের পরে তাই তাদের অনেকেরই হয়েছে অধঃপতন। বেঁচে থাকার দায় মেটাতেই তাদের ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে হয়েছে। জীবনবাবুর নাটকীয় ঘটনার রাতে পুলিশের দারোগা বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষ্মীকে ধর্ষণ করে। লক্ষ্মী এ উপন্যাসের কুসুম। নিম্নবর্ণের কর্মকার শ্রেণী। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বগুণে এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের কর্মসহায়ক হিসেবে কাহিনীর গতিশীলতা ও নাটকীয়তা দান করেছে। নারী চরিত্র নির্মাণে মানিকের শৈল্পিক চূড়া স্পর্শ করেছে লক্ষ্মী চরিত্র। মনের দোলাচল, দ্বিচারিণীক বৈশিষ্ট্য ছাড়াই সে শুভ ও কৈলাসের কর্ম অনুপ্রেরণার সঙ্গী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ সে না কুমারী, না বিধবা– তার স্বামী দীর্ঘকাল ধরে পলাতক। সে তার হদিস জানে না। নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের অবচেতন বিষয়গুলো এখানে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন মানিক। নারী পুরুষের সম্পর্কের ধরন, মিলিত হবার উপায় যেসব সমাজে সবকালে একমাত্রায়

প্রবাহিত নয়– লক্ষ্মী ও কৈলাসের সম্পর্কের সূত্র ধরে লেখক তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বহুদিন আগে সাপের কামড়ে কৈলাসের স্ত্রী বিগত হয়েছে; বহু বছর ধরে লক্ষ্মীর স্বামীর কোনো পাত্তা নেই। কিন্তু কৈলাস এবং লক্ষ্মীর মিলিত হবার সুযোগ সমাজ রাখেনি। এমনকি বিয়ের মাধ্যমেও নয়। এ উপন্যাস রচনার শতবছর আগে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ চালু হলে সমাজ বাস্তবতা তাকে মেনে নেয়নি। অথচ ঘরে রাস্তায় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বিধবা ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। কৈলাস লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য মুসলমান হওয়ার কথাও ভেবেছিল। কারণ মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত। কিন্তু বুঝেছিল কেবল বিয়ের জন্য মুসলমান হওয়ার হাঙ্গামা কম নয়। কারণ, ধর্ম জিনিসটাও যে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা যায় না; সমাজ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সামাজিক অনুশাসনের কাছে ব্যক্তিজীবন উপেক্ষিত থেকে যায়– তার খোঁজ কেউ রাখে না।

ইতিকথার পরের কথা উপন্যাসে মানিক গাওদিয়ার মতো বারতলা গ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। ছোট-বড় মিলে প্রায় অর্ধশত চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। যদিও 'চিহ্নে'র মতো তা খেই হারিয়ে ফেলেনি। গ্রামের ডাক্তার নন্দ কর্মকার, জমিদার জগদীশ, সুদখোর মহাজন ধরণী, পুলিশের দারোগা ভুবন মোহন, কালিপূজারী ত্রিভুবন, শুভর হবু শ্বশুর ভুদেব, শুভর মা সাবিত্রী, বাগদত্তা মায়া, কৃষক ভূষণ, রসিক তোরাব আলী, ঘনরাম, বিপিন, ফজলু, নবমন্দিরং কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী, জমিদারের নায়েব, লেঠেল– বহুমুখী চরিত্রের সমাহার ঘটেছে এখানে। ব্রিটিশোত্তর এদেশের একটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন মানিক। বোধহয় সফলতার সঙ্গেই তিনি এ কাজটি করতে পেরেছেন। বিলাত ফেরত শুভময় স্বাধীন দেশের জন্য কিছু একটা করতে চায়। ফিউডাল রক্তের উত্তরাধিকার তাকে টানে না। কিন্তু জানে না কীভাবে তার মুক্তি। গড়ে তোলেন নবশিল্প কারখানা। পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র। কিন্তু কারখানা শুরু করতে টের পায়– কাজটি এত সহজ নয়। বৃহদাকারের শিল্পকারখানা যে দেশের কুঠিরশিল্পকে ধ্বংস করে দেবে সেটিও সে অনুভব করে। কিন্তু উপায় নেই। প্রযুক্তির আগ্রাসন থেমে থাকবে না। কীভাবে যেন শুভ স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করে, সে আসলে তাদের পর নয়। তার বাবা যদি অন্যায় করে থাকে তার জন্য সে দায়ী নয়। এভাবে বাবার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল খুব সাময়িক। কিন্তু শুভ স্বাধীন দেশের নতুন পথে তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে ফেলে। সে তার শিক্ষা ও শ্রম দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে অর্থনীতিক মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে চায়।

আমরা শুরু থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ইতিকথাধর্মী রচনার প্রবণতা লক্ষ করি। এর অর্থ কি মানিক কল্পনানির্ভর রূপকথার গল্প রচনার চেয়ে সমকালীন সমাজের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন? যার মধ্যে শোনা যাবে সব মানুষের– বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষের হৃদস্পন্দন– যাদের ইতিহাস মূলত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। তাদের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার লড়াই, রাজা বদলের কাহিনী আর তাদের নারী-পুরুষের মিলিত হবার অদম্য সব কাহিনী। মানিক জন্মের শতবর্ষ পরে– তাঁর এসব রচনার সমাজ-বাস্তবতা অবিকৃত নেই বটে; কিন্তু মানিকের সমকাল নির্মাণ, মানিকের শুভ ও সংগ্রাম মানব প্রজন্মকে মানুষ হিসেবে সব সময় কিছুটা এগিয়ে নিতে সক্ষম।

বই তৈরির জটিলতা ও আমাদের ধরাবাঁধা জীবন : একটি মানিক বাড়ুয্যে প্রয়োজনা

মামুন হুসাইন

যার নামের ঠিক নেই, তার গুণ থাকে? যারা মানুষ করবে তারাই তার নাম দেবে? ছেলের ভালো একটা নাম যারা ধার দিতে পারবে না তারা কোন্ গুণে গুণী করতে পারবে ছেলেটাকে? যেমন ধরো, খুব একজন নামকরা লোকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটার কোনো মানে হয়? নামটা আর উপাধিটা জগতের কোনো ভাষার ব্যাকরণে টিকতে পারে না।

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

শতবর্ষ আগে, দুমকা শহর থেকে বেরিয়ে আসা শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার, একদা ডিসেম্বরে যখন তাঁর শরীরে রক্তপতাকা, ফুল এবং আগুন জড়িয়ে শ্মশান ঘাটে ঘুমিয়ে গেলেন, তখন *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* নামক একটি 'গ্রন্থ' রচিত হয় বাংলা ভাষায়। দু'একজন দয়ার্দ্র মাস্টার মশাই গ্রন্থটির খবর এক-আধবার দিলেও, আমরা ' মোটিভেটেড ফরগেটিং' এর কল্যাণে, গ্রন্থটিকে আর্কাইভে আটকে রেখে, ধীরে ধীরে মাংস, চর্বি এবং ত্বকে বলবান হতে শুরু করি। মোটর থামিয়ে আমরা এ বেলা কতিপয় সেল-ফোন অ্যাডিকশন-আক্রান্ত মানুষ হ্যারি পটারের ছবি কিনি, টানা ছাপ্পান্ন ঘণ্টা ইন্টারনেটে নির্ঘুম ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পড়ি, শিশু সন্তানদের মেলামাইন মেশানো দুধ খাওয়াই মুনাফার লোভে আর যোগাযোগ-সড়কে হাঁটার আনন্দে সমস্ত পুস্তকাদি পিরানহা মাছের জন্য জলের ভেতর উৎসর্গ করি। ফলে গ্রন্থহীনতার কালে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* নামক গ্রন্থটি হাতে এলে আমরা পাঠের অনভ্যস্ততায় আতান্তরে পড়ি। আমাদের ডিলেইভ মাইলস্টোন্স অফ ডেভেলপমেন্ট, আমাদের পাঠ প্রক্রিয়াকে তখন করে তোলে সদ্য-হামাগুড়ির মতো। এই বিশৃঙ্খল-অন্যমনস্ক অমনোযোগী প্রেষণার সুযোগে *মানিক* নামক গ্রন্থের নানান পৃষ্ঠায় পেজ-মার্কার যুক্ত হয়, অথবা পাড়ার একমাত্র তেলাপোকা-শাসিত গ্রন্থাগারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যত্রতত্র পৃষ্ঠা 'মুড়াইতে থাকি', কিম্বা 'ভাঁজ' করতে শুরু করি। এবার চিহ্নিত অংশগুলো, কখনও গুরুত্বপূর্ণ লেখার কাজে ব্যবহার করা যাবে, এই ভরসায় নোটস্-বুকে টুকতে শুরু করি, অথবা নেহায়েৎ সমন্বয়হীন অলস-একঘেঁয়ে এক রিডিং-সেশন শুরু হয়; কবে পড়েছিলাম, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যামিনী কবিরাজের বাহিরের ঘরে হামান দিস্তার ঠকঠক শব্দ শশী আজও শুনিতে পায়। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না ...অথচ শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনো দিন বন্ধ হয় না। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব,

বিষন্ন। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। লালটকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না? আমাদের কেউ তখন কুসুমকে খুঁজতে বের হয়। কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে? লক্ষ্য করি, শশী আর আগের মত হাঁটে না। মন্থর পদে তখন হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করেন একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়ত সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকায় অমর অলিখিত কাব্যে। কেউ যমকে তাকায়, কবিতা লিখিস, অ্যাঁ? না ঠিকমতো বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব? লিখতে লজ্জা করে। আসলে জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। অনুভব করি, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে। যেজন্য এ আঘাত না দিয়ে তার উপায় ছিল না। আনন্দের কাছে সত্য গোপন করার ক্ষমতা তার নেই। তার কাছে জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে আনন্দ ইচ্ছুক নয়। অনুভূতির সমন্বয় করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না। সুপ্রিয়া ভাবে, যে জীবনকে সে মহাকাব্য বলে জেনে রেখেছিল, সে একটা সাধারণ কবিতাও নয়। সাধ করলে কবি হয়ত আমিও হতে পারি। কেউ আমাদের বুদ্ধি যোগায়— ধরতে গেলে আজ তুই রোগী, অসুস্থ মানুষ। আজ তুই যা চাইবি তাই কি তোকে দেওয়া যায়? আচ্ছা, তুমি তো কবি, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না? আমি কবি নই, আনন্দ। আমি সাধারণ মানুষ। তুমি আমার কবি। কবি না হলে কেউ এমন ঠান্ডা হয়? প্রসববেদনা কেমন জানো? হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, জানি। জানো ! পাগল নাকি, তুমি কি করে জানবে ! আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী বৌদি। কবি না হলে কেউ এমন ঠান্ডা হয়? এ রকম বাক-বিতণ্ডার কালে খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হারুঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য, অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন। কুসুম জিজ্ঞাস্য হয়— কাকে ডাকছেন ছোটবাবু। কে যাবে আপনার সাথে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে। শশী অন্যমনস্ক হয়। কুসুমকে দেখে, হয়ত দেখে না। জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না। কাব্যের যে প্রেরণা তার মদের নেশার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল আবার তাকে পৃথক করে আয়ত্ত করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠল। জগতের সমস্ত কবির দুয়ারে সে স্মরণ নিল, কবিতার পর কবিতা পাঠ করল। কিন্তু এক লাইন সে লিখতে পারল না, কলম হাতে করে যতক্ষণ সে ঈষৎ নীলাভ কাগজের দিকে চেয়ে রইল তার সময় ব্যেপে তার মনে জেগে রইল এই কথাটা যে, চারণীকে অমরতা দেবার জন্য সে কবিতা লিখতে বসেছে। ভয়ে সে যেন মরার মতো হয়ে গেল। এ কোন অদৃশ্য দুর্বোধ্য শক্তি তার প্রকাশের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার কাব্যের উৎস মুখে শিলার মতো চেপে বসেছে? তার আত্মাকে অবরোধ করেছে কিসে? বেঁচে থাকবে সে কিসের জন্য? কিন্তু লিখবার সময় ওকে দেখলে আমাদের এমন ভয় করে। চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটি শিরা দপদপ করছে। তবে কী জানো, শশীর গলায় কেউ কথা বলে— মেয়েরা কখনো কবি হয় না।

পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্মী। জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্যচর্চা করি নি। আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাব? শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। শশীকে দেখতে-দেখতে একদিন অনেক ভেবে বয়সের সীমা ঠিক করলাম। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলব। তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি— বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন, নতুন যুগের সত্যকে আমি জেনেছি। আমি কবি, শুঁড়ি নই, শব্দ–মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ–লেখা পড়ো না। আই এ্যাম নট আ ঘোষ্ট অফ পাষ্ট। লাভ? সাইনটিস্ট ক্যান'নট এক্সপ্লেইন লাভ। ভালোবাসার ক্লাস থেকে ড্রপআউট-শশী বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শশী তাই প্রাণপনে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সংকীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন, সমস্ত জীবনকে। নিজের জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশি। এরপরেও মাঝেমাঝে আমি কেন অজ্ঞান হয়ে যাই, তার কারণ আজও চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি। প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল। এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালোবাসে না। আমি বলি, লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।...

কিন্তু হঠাৎ এই সময় আমাদের পাঠ-প্রক্রিয়া থমকে যায়, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, খবর আসে, মেলামাইন মেশানো দুধ পানের পর সারা হাসপাতাল দখল করে নিয়েছে রোগাক্রান্ত শিশুর দঙ্গল। শিশুদের মৃত্যু-গানের ভেতর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* নামক গ্রন্থ থেকে শেষের বাক্যটি চৈনিক টেকস্ট-মার্কার এর ফ্লুরোসেন্ট আলো ছুঁয়ে এবার চিহ্নিত করি— লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কবে একবার মানিক বাড়ুয্যে, গ্রন্থে রূপান্তরিত হওয়ার আগে হাতলওয়ালা চেয়ারে পা ভাঁজ করে বসেছিলেন সেই ফোটোগ্রাফ খুঁজে বের করি। হয়ত শীত, মানিক চাদর গায়ে। ধূসর ফোটোগ্রাফে হাতে ধরা কাগজটি হয়ত কোন দৈনিক, আর তিনি দুই ফিতার সান্ডেল পায়ে। দৈনিকের পাতায় মানিক কী সেদিন দুমকা শহরের খবর একটু বাড়তি মনোযোগে পড়তে শুরু করেছিলেন? নাকি মফস্বলের পাতায় বিক্রমপুর, সিমুলিয়া, মালপদিয়া, গাওদিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল, বারাসত, বাঁকুড়া, কাঁথি এসবের দূর্ঘটনা, মৃত্যু সংবাদ এবং হত্যাকাণ্ড সেদিন তাঁকে বাড়তি বিচলিত করেছিল? কিম্বা ১৬ বছর বয়সে মায়ের মুখাগ্নির পর শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমারের টাঙ্গাইল শহর শ্মশানের ছাইয়ে, সেই-যে ডুবে গিয়েছিল একদা? মানিক বাড়ুয্যেকে সরাসরি জিজ্ঞেস না করে, এ-সবের জবাব আমি মনে মনে রচনা করি; হয়ত গভীর কোন সারবস্তু দাঁড়ায় না। কিন্তু পুরো আয়োজন হয়ে যায় একান্ত ব্যক্তিগত পরিভ্রমণ ও অনুধ্যানের অংশ। অন্যমনস্ক হেঁটে বেড়ানোর সূত্রে, শহরের একজন প্রবোধকুমার চায়ের নেমন্তন্ন দিলে তখন বন্ধুত্ব বাড়তে থাকে। চায়ের সুমিষ্ট ঘোলা জল দেখতে দেখতে প্রবোধকুমার ওর 'কেন রোগ' ওর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে শুরু করে। বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং সাহিত্য ভাল বুঝতে পারেন, ও বললো, ওর এক মামী আছেন, ...আমরা ডাকি, অতসীমামী। একবার মায়ের মৃত্যু-শহরে, ভদ্রলোকের গায়ে, পটকা বনানোর সময় কাঁচ ঢুকে গেল। তখন মায়ের মৃত্যু হয় নি, আমরা সবাই টাঙ্গাইলে। অতসীমামীর স্পর্শে কাঁচ বের করার ব্যথা ভুলে গেল

প্রবোধ। ধীরে ধীরে পাঠ্যপুস্তক দেয়াল–আলমারিতে আটক হয়ে গেলে গণিত শাস্ত্র অভিমানে ওকে ছেড়ে যায়। অঙ্ক ভুলে লোকটি এবার বই তৈরির কারখানায় নাম লেখায়। লোকটি কলম পেষা মজুর হয়। লোকটির কিঞ্চিৎ সুনাম হয় এবং সে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অধিক সংখ্যক পুস্তক তৈরিতে নিবিষ্ট হয়। লোকটি বিবাহ করে, সিগারেট খায়, অ্যালকোহল খায়, পত্রিকা অফিসে ঝগড়া করে, ভুলক্রমে শীতের মূল্যবান ফুলকপি ফেলে আসে প্রকাশকের ঘরে, স্ত্রীর মৃত সন্তান প্রসবে উল্লসিত হয়, মুমূর্ষু হয়, একা হয়, হাসপাতালে ভর্তি হয়, রেস খেলে, এপিলেপ্টিক হয় আর ডাইরির পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে লেনিনের উদ্ধৃতি জমা করে "লার্ন ফ্রম মাসেস, ট্রাই টু কমপ্রিহেন্ড দেয়ার অ্যাকশান; কেয়ারফুলি স্টাডি দা প্র্যাকটিকাল এক্সপেরিয়ান্সেস অফ দা স্ট্রাগল অফ দা মাসেস।" তারপর একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে লোকটি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। লোকটি দলছুট হয় এবং ধীরে ধীরে গভীর গভীরতর অসুখে পতিত হয়, লোকটির স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করে, কিন্তু সে স্বস্তি অনুভব করে। পাঁচ আনা পয়সার অভাবে স্ত্রীর প্রসব-বিভ্রাট কবি-বন্ধুকে ফোনে জানাতে পারে না। হয়ত তখন সে অশীতিপর বাবাকে স্বস্তিতে রাখার জন্য দুই কামরার ঘরের ভেতর ক্যানভাসের পার্টিশন নামক একটি সৃজনশীলতায় মগ্ন হয়েছিল। হয়ত মনে হয়েছিল, কতকাল ডাল খাই নি। আর এ রকম এক বেদনার কালে, বন্ধুরা তাকে ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়; হাসপাতালের বিছানায় ঘন ডাল খেয়ে তার আনন্দ হয়। হাসপাতালের আশ্রয় এবং খাদ্য সম্ভার প্রবোধবাবুকে উদ্বেলিত করে। ফলে সে আরো দু'বার হাসপাতালের আতিথেয়তা গ্রহণে উন্মুখ হয়— প্রথমবার লুম্বিনী পার্ক এবং শেষবার নীলরতন সরকারি হাসপাতালে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের তিন তারিখ প্রবোধকুমার মৃত্যু বরণ করেন; লক্ষ্য করি, পালঙ্ক সুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয়, তখন একটি চোখ খোলা, একটা বন্ধ। শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দু'পাশে। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা, সাহিত্যিক। সামনে, পেছনে, দু'পাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না। কিছু ছিল না। জীবনে এত ফুলও তিনি পান নি।

প্রবোধবাবু নিজের মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণনা করে চোখের ভেতর মজা ছড়িয়ে, আমাদের এই মনোটোনাস শহরে আয়েশী ভঙ্গীতে চা খায়। মৃত্যুর পর লোকটির খনিকটা নাম-ডাক হবে, বিশ্বাস হয় কী? হয়ত প্রবোধকুমারের সমাজ ভাবনা, শিল্পরীতি, জীবনদৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব, শিল্পরূপ অথবা নিছক জীবন ও সাহিত্য— শিরোনামে একগুচ্ছ পুস্তক আসবে মুক্ত-বাজারে। হয়ত একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার তড়ি-ঘড়ি ছাপানো হবে; কেউ 'প্রবোধকে যেমন দেখেছি'— এই শিরোনামে লিখবেন; লিখবেন, প্রবোধকুমার ভূমিকম্পে নিহত ভাইজিকে গঙ্গায় ভাসানোর জন্য একদিন রাঁচির মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন। ওর দাদা বলবেন, প্রবোধ কুমার একবার নাম বদল করে মানিক বাড়ুয্যে হয়, এবং তার বেশির ভাগ লেখা সোয়ান ফাউন্টেন পেনে। সে 'জীবন চরিত' লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে একবার এবং তরুণ লেখকদের প্রতি একটি উপদেশ বাণীর খসড়া আঁকে— সাহিত্য সাধনা বড় কঠিন সাধনা। এজন্যে একনিষ্ঠ হতে হবে। মানুষকে দেখা, সমাজকে চেনা, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। একাত্ম হয়ে যেতে হবে জনজীবনের সঙ্গে। তাদের সাংসারিক সুখে-দুঃখে, বহির্জগতের নানা

সমস্যায়, নানা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে। কখনও ভুলেও একথা মনে আনলে চলবে না যে, সব জানা হয়ে গেছে। সব জানা যায় না, যেতে পারে না। এজন্যেই তরুণ লেখকদের অকৃত্রিম নিষ্ঠা আর প্রচুর অধ্যবসায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

তরুণ লেখকেরা উপদেশ বাণী পড়তে-পড়তে মূর্খের সংজ্ঞা শেখে— যে জেনেছে বুঝেছে যে তার জানার বোঝার কিছু বাকি নেই সে মূর্খ। যতটুকু যে জানে সেটুকু আয়ত্ত না করে আরও জানা, এই হল মূর্খ। মূর্খতা এড়াতে, এবার প্রবোধকুমার ওরফে মানিক বাড়ুয্যে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের শিরোনাম তৈরি হয় তরুণ লেখক-প্রকল্পের যাদুঘরে— আমরা হেঁটে হেঁটে পুতুল নাচ দেখি। আমরা ধন্দে পড়ি, ওর ব্যাধিই প্রতিভা, না প্রতিভা-ই ব্যাধি? দস্তয়ভস্কির মৃগীরোগের সঙ্গে ওর মৃগীরোগ মিলিয়ে বন্ধুরা আলোচনা করে। ওর অ্যালকোহল প্রশস্তি পড়ি : খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে, হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি? বিষ্ণু দে বনাম মানিক বাবু— প্রগতি সাহিত্যের এই আত্মসমালোচনা কেউ চিৎকার করে পাঠ করে। কোথাও আত্মহত্যার অধিকার নিয়ে থ্যানাটোলজির সিম্পোজিয়াম শুরু হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্করের তুলনামূলক আলোচনা পাঠ করে, তরুণ অধ্যাপক। তখন ধরা যাক *দিবারাত্রির কাব্য* অনুদিত হয় ইড্ডিস ভাষায়। হয়ত একজন শ্যামা, শেষ বয়সের অন্ধ মেয়ে নিয়ে, তখন জননী হয়ে ওঠার কৈফিয়ত দিচ্ছিল মহিলা-সমিতির ভরা সভায়। দেখি বৃষ্টির ভেতর শ্রীনাথের মেয়ে পুতুল ফেলে গেছে। পুতুল হাতে প্লেগতাড়িত রিউ এবং গাওদিয়ার শশী, টেলি-কন্‌ফারেন্স করে পাঠকের জবাব দিয়ে চলেছে— বেশির ভাগ মানুষের এটা বুঝবারও ক্ষমতা থাকে না। সারাজীবনে ভুলও কখনো ভাঙে না। কেমন একটি অভিমান হয়। (তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা। পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন?) বন্ধুবর্গ কেতুপুর ও ময়নাদ্বীপের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া হোসেনের 'ম্যাডনেস' আবিষ্কারের জন্য মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করে। তুলনামুলক সাহিত্যের ছাত্ররা গঙ্গা, তিস্তা ও পদ্মা নদীর বিষয়-আশয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়াল জমা দেয় কবি শঙ্খ ঘোষের ঘরে অথবা হিংসা-অহিংসা সম্পর্কে আখ্যান লিখতে শুরু করে। আমাদের ইনোসেন্ট ফিল্ম-বোদ্ধারা, ওর 'বই' নিয়ে তৈরি সিনেমার গঠন প্রণালী ও বিস্তার নিয়ে আলোচনা করার সময় দেবেশ রায়, আলমগীর কবির, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং গাস্তঁ রোবের্জকে নেমন্তন্ন দেয়। আমরা, নেমন্তন্নের অভাবে 'ফিল্মসেন্স'-এর তীব্র ঘাটতি নিয়ে, বারান্দা থেকে সভাকক্ষের ছবি দেখি— নোকিয়া ফোনের বিলবোর্ড মানিকের দীর্ঘতম শরীরকেও ছাড়িয়ে গেছে মাথায়, আর দেবেশ বাবু ডায়েট-কোকে চুমুক দিতে দিতে হারানের নাতজামাই সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করে চলেছেন। হারান এই তীব্র বক্তৃতায় নাকাল হয়ে ছোট বকুলপুরের কাউকে খুঁজছিল বাড়ি ফেরার জন্য। ছোট বকুলপুর, গাওদিয়া এবং টাঙ্গাইলের কতিপয় লোক তখন অবাক হয়ে বহুদিন পর আবিষ্কার করে— মানিক বাড়ুয্যের মত দীর্ঘকায়া এক অচীন মানুষ চশমা চোখে একটি হলুদ নদী ও সবুজবন পেরিয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে সহরতলীর যশোদা। দূর থেকে অস্পষ্ট স্বর ভাসে, মালতি বৌদি কথা বলছিল— সুখ তো শুটকি মাছ, জিভকে ছোটলোক না-করলে স্বাদ মেলে না। সবার সঙ্গে পাঁচীও বন-নদী পেরুনোর আয়োজন করে— কী কী নিবি পুটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নবমীর চান্দ উঠব, আলোতে পথটুকু পার হমু। ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া

একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। লোকগুলি এবার যুগপৎ সমুদ্র ও স্বাধীনতার স্বাদ পরখ করার জন্য আকাশে এরোপ্লেন খোঁজে। আমাদের কেউ কেরানীর বউ সাজে , অথবা হয় সর্ববিদ্যাবিশারদদের বউ। আমাদের তখন তীব্র দুঃশাসন; প্রাগৈতিহাসিক ভিটেমাটি বিসর্জন দিয়ে আমরা তখন এক মিহি ও মোটা কাহিনীর ভিতর নিখোঁজ হয়ে যাই। কিন্ত গাওদিয়ার মানুষ, হাতিপুরের উলঙ্গিনী ছায়ামূর্তি, এবং ছোটবকুলপুরের যাত্রীরা অনেকদিন বাদে গোপন এক তথ্য আবিষ্কার করে— গল্প-উপন্যাসের মানিক, আসলে ছিল অন্য এক মানুষ; তার সঠিক নাম প্রবোধকুমার অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধবাবু মূলত কবিতা লিখে গেছেন সারাজীবন, সকাল-সন্ধ্যা বাঁশি বাজিয়েছেন, এবং সঙ্গীত বিষয়ে দীর্ঘ বেতার-ভাষণ দিয়েছেন। আর গোপনে অনেকগুলো ডাইরি রেখে গেছেন। 'গ্রেট ক্যালকাটা-কিলিং'-এর শহরে তিনচারটি তোরঙ্গের ভেতর প্রবোধ বাবুর ডাইরি আবিষ্কৃত হয়, এক সকালে। নিকট আত্মীয়রা আক্ষেপ করে— এমনি কত কাগজ আমরা ঝাঁট দিয়ে ফেলেছি। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি থেকে কুড়িয়ে উনুন ধরানো হয়েছে। কে একজন বলল, টলস্টয়ের সাহিত্যকর্ম শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড এক ডাইরি। তরুণ মেধাবী-সাহিত্যবোদ্ধারা লেখার ভিতর লুকানো রক্তপাত, উন্মাদনা, দ্রোহ, স্পিরিচুয়ালিটি এবং ঈশ্বর-বিভ্রম নিয়ে তর্কের উত্তাপ ছড়িয়ে দিলে, আমরা কেউ-কেউ গাউদিয়া গ্রামের ছায়াছন্ন বৃক্ষের নিচে ছড়িয়ে থাকা ডাইরির জরাজীর্ণ পাতা কুড়োতে নামি, অস্পষ্ট কুয়াশা-ঢাকা অক্ষয়ের শরীরে শতবর্ষের নির্জনতা তখন দৌড়ে চলেছে, ভেজা বাতাসে; আর ডাইরির ভেতর লুকানো খাদ্যের সন্ধানে সাহায্য-সংস্থার হাইব্রিড মুরগীর দঙ্গল ডাইরির চলমান-পৃষ্ঠা খুবলে চলেছে চিৎকার করতে-করতে। হলুদ-মুমূর্ষু পৃষ্ঠা ছুঁয়ে, হোঁচট খেতে খেতে আমরা প্রাচীন সময়-যানে চড়ে বসি; আর মনে হয় একটি গোপন অসুখ যেন ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। কাগজের ভিড়ে আমরা এবার অসুখের দিন যাপন পড়তে শুরু করি : ....আমি প্রায় দুই বৎসর হইল মাথার অসুখে ভুগিতেছি, মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই। প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল। নিজেকে রোগী না ভেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছিলাম। আমরা পৃষ্ঠা উল্টাতে-উল্টতে, একটি ডাইরির নীচে, জীবনানন্দের বরিশাল লেখা দেখি— টিচার্স বুকস্টল, সদররোড, বরিশাল। সদররোডে, বিবির পুস্কুরুনির পাড়ে কবে আমরা জলখাবার খেয়েছিলাম, তা মনে করার চেষ্টা করি। জীবনানন্দের বাড়ি-খোঁজার মতো, আমাদের দিন-ক্ষণ বার-বার ভুল হয়ে যায়। সেরা কম্পোজারদের নাম শিখি— *মানিক বাড়ুয্যে* রেডিও বক্তৃতায় একচল্লিশ-জনের নাম সাজিয়েছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায় নি কেন, এ-কথা ভেবে একবার প্রবোধবাবু বাঁশি বাজানোর কালে সামান্য সময়ের জন্য বেসুরো হয়ে পড়েন। মনে হল, সুর সম্বন্ধে বই কিনতে হবে। সেই ভোরে উঠে শুনলাম, রাত্রে রান্নাঘর থেকে সব চুরি হয়ে গেছে। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। টুবলুর বাঁ পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পুড়ে গেল। কেউ গালি দেয়, শালা কম্যুনিস্ট! মুসলমানদের দালাল। নতুন করে শুরু হল বাড়ির সমস্যা! ওরা আমায় বাড়ি দিয়ে কিছু বাগাবার ফিকিরে ছিল। কাগজে পড়ছি— আজ পুলিশের সাহায্যে মিলিটারি আমদানি। বাড়ি বিক্রির মানসিক ধাক্কা— কে জানে কী হয়। বাবা বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ির বারান্দায় থমকে বসে আছে। দাদা চিরদিন অকৃতজ্ঞ অর্থপিশাচ। বাবা ব্যাস্ত হয়ে বলছেন, তোরা যে যার ভাগ নে। হঠাৎ

চশমার কাঁচ পড়ে ভাঙল। এক পুলিশ নামতে গিয়ে চশমায় কনুয়ের গুঁতো দিয়েছিল। স্বপ্নই বটে! বেশ মতলবযুক্ত স্বপ্ন। বাঁশি বাজালাম। নিজে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাঁশির সুরে। হাসপাতালে গিয়ে শুনি ডলি মরা বাচ্চা বিইয়ে ঘুমোচ্ছে। যাই হোক, অত সস্তায় অপমানিত হই না। তারাশঙ্কর আর আমার বই নিয়ে পরীক্ষা নাকি ব্যর্থ হয়েছে— বসুমতীর পাঠকের বাজারে আমাদের চাহিদা নেই! বাংলার পাঠক সমাজ স্পষ্ট তিন ভাগে ভাগ করা : উচ্চশিক্ষিত বিদেশি প্রভাবপুষ্ট একভাগ, যারা 'কালচার' 'কালচার' করে, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ আর নিচের তলার অল্পশিক্ষিত রক্ষণশীল সমাজ। রাত্রে উপোষ। উই সর্বনাশ করেছে বইয়ের। সামনের বছর ইলিশের দুর্ভিক্ষ। পার্টি অফিসে আমার ঘাড়ে দায় দিয়ে গোপাল ননীরা সরে পড়ল। স্বাধীনতা দিবস— সবাই নিঝুম। কেন? কুমড়োর দাম স্থির কেন; বড় ফুলকপিটা বেঙ্গলে ফেলে এসেছি। এ-সব ভাবছি, আর ভেঙে যাচ্ছি কোথাও। পুরো কোলকাতা শহরে, ক্রমাগত মূর্চ্ছা যেতে-যেতে আমি একা হয়ে যাচ্ছি। কোথাও একটু ছায়া আর অবলম্বন দরকার, জীবন নামক মহাশয়কে একটু সহনীয় করার জন্য। মা-র কাছে সরলভাবে ক্ষমা ও দয়া চাইলে পাওয়া যায়— মাকে খুশি করার দুর্ভাবনা মনেরই দুর্বলতা। মা কি ভয় ভক্তির ঘুষ চান? শরীরের বিষম অবস্থা, বারবার ফিট হয়ে পড়ার উপক্রম ঘটছে। মার দয়ার মানে কি? হাসপাতালের বিছানায় আথাল-পাথাল হতে হতে একবার মনে হল, মুখে অ্যালকোহালের গন্ধ পেয়ে নার্সরা ভয় পাচ্ছে। বিনয় শিখতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দা সিপিআই ডাজ নট আণ্ডারস্ট্যান্ড দা মাইন্ড অফ ইন্ডিয়া। জনসাধারণ পার্টিকে ত্যাগী এবং লড়ায়ে বলে জানে কিন্তু গভর্নমেন্ট চালাবার মত ধীরতা, স্থিরতা, বুদ্ধি-কৌশল অভিজ্ঞতা আছে বলে বিশ্বাস করে না। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে— গনো, সিফি দুটোই নেগেটিভ। খবরের কাগজে জড়িয়ে ডি নিয়ে এলাম। ডি কমাতে হবে-সিও। আর যখন ঠেকনো দিয়ে পারি না, মার কাছে বড় দয়া চাই। ....

মানিক বাড়ুয্যে দয়া ভিক্ষে করেছেন মায়ের কাছে— আমরা দৃশ্যটি এবার কল্পনা করার প্রয়াস পাই। ক্ষ্যাপাটে মানুষ, রাগী মানুষ, অ্যাথিষ্ট মানুষ কেন ব্যক্তিগত-ঈশ্বর খোঁজার জন্য শেষ পর্যন্ত হাঁটুমুড়ে আকাশ দেখে কে জানে? শ্রী অরবিন্দ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পুস্তক খুলে, হয়ত ইতোমধ্যে বিপুল এক মেধাবী জবাব তৈরি করে ফেলেছেন পণ্ডিচেরীর পঞ্চভূতে লীন হতে-হতে। কেউ মৃদু ভৎসর্না করে— মানিকের রচনায় ধৃতি নাই এবং তার কৃতিত্ব অশিক্ষিত পটুতা। মানিক তখন সাধারণ হাসপাতালের শুশ্রূষা উপোভাগের পর বিশেষায়িত এক মানসিক হাসপাতালের বিছানায় সদ্য শায়িত। ফলে তীব্র ভর্ৎসনা আর সমালোচনার জবাব গুছিয়ে উঠতে পারেন না। লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের জানালা গলিয়ে আকাশের উড়োজাহাজ দেখতে-দেখতে মানিক, ১৯৫৫-এর আগষ্ট-অক্টোবরে কী ভেবেছিলেন— আমাদের এতকাল বাদে জানতে ইচ্ছে করে একবার। আমাদের ভাবনা সকল হয়ত তখন বিস্তার লাভ করে— অনুভব করি, অসুখ তার শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, অথবা শরীর অসুখে রূপান্তরিত হচ্ছিল। তীব্র এপিলেপ্টিক অরার ভেতর একসময় তার মনে হয়, সে ভেসে গেছে মায়ের মৃত্যু-শহরে— শহর জুড়ে মায়ের মৃত ছাইভস্ম, আর তার অনুভব হয়, ...অ্যাজ ইফ আই অ্যাম ব্যাক এ্যাট টাঙ্গাইল! চেনা শহরের উনুন থেকে কয়লা দিয়ে সে নিজের মাংস পোড়ানো গন্ধ আবিষ্কার করার প্রয়াস পায়। কাফকা বলেন, লেখক

দুই প্রকার— যারা সাদা কাগজের ওপর লেখেন, আর আছেন, যারা নিজের চামড়ার ওপর লেখেন। ব্যক্তিগত পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে, আমাদের বিপুল জনপদে এবেলা কোন পথচারীকে সহসা চোখে পড়ে না। 'দিবারাত্রির' সুপ্রিয়া, আমাদের বাক্যবাগীশতায় বিরক্ত হয়— কথা, কথা, কথা। শুধু কথা পাকানো, কথা মোচড়ানো, কথা নিয়ে লড়াই করা ! আমরা অগত্যা সকল কথামালার রাজনীতিতে ইস্তফা দেই— বিপুল মহীরুহের মত মানিক বাড়ুয্যের কাছে আমরা শেষ পর্যন্ত যাই ছায়ার জন্য। একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার যাপিত জীবনের সূত্রে, যে বিপুল প্রাণশক্তির উদ্বোধন করে গেছেন, তার ছিটেফোটা উদ্ধারের জন্য, একবার নদীতে ভাসি, একবার গাওদিয়া যাই, একবার মালপদিয়া, একবার ছোটবকুলপুর, অথবা বহুদুরের এক অচীন ময়না-দ্বীপে— যেন এবেলা খানিকটা আরোগ্য আসে শরীরের গোপন অসুখে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জীবন ও নন্দনতত্ত্ব

মাসুদুল হক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধ ও অস্তিত্বের যে চরম সংকট দেখা দিয়েছিল, তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে আমূল পরিবর্তনের এক ধারা সূচিত হয়েছিল। যে কয়েকজন লেখকের হাতে কথাসাহিত্যের এ বৈপ্লবিক ধারার সূচনা হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম সার্থক জীবনবাদী শিল্পী। কারণ, সমসাময়িককালের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের ট্র্যাজেডি, এত শিল্পকুশলতা আর কোনো লেখক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি, মনুষ্যত্বের অপচয়, ক্লেদ-হতাশা ও দুঃখবেদনা তাঁর লেখনীতে শিল্পসফল নান্দনিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও আদর্শ বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ধারায় চিরভাস্বর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক সাহসী লেখক যিনি জীবনকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে তাঁর উপন্যাসের নান্দনিক সাফল্য নির্মাণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন : "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখী আর সাহসী লেখক যিনি জীবনকে বাস্তব ভূমিতে দেখেছেন, বাস্তবের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার শৃঙ্খলের মধ্যে নয়, দুর্দমনীয় জীবন-প্রবাহের মধ্যে তিনি জীবনের রহস্যসন্ধান করেছেন, যেখানে মানুষ জীবন-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে পুরনো বিশ্বাস ও আশ্রয়কে ফেলে যায়। তিনি দুঃসাহসী লেখক, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সদা তৎপর। আর সে কারণেই আপাত-সিদ্ধিকে পিছনে ফেলে সত্যকে জানার ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলেন, উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নিয়ে বারবার দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেন। বাস্তবজীবনকে তার পরিবেশসমেত তুলে ধরতে চেয়েছেন বলেই রোম্যান্টিকতা পরিত্যাগ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুবাদকে, বিজ্ঞানদৃষ্টিকে, মানবজীবনে আর্থনীতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে– মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন। একটা প্রকাণ্ড জড়প্রকৃতি, যার নাম বিশ্ব, মানুষের জীবনকে চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতে চেয়েছেন। জড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে চৈতন্য, মানুষের মধ্যে সে চৈতন্যের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন, অনুভব করেছেন এই জড়প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ হেরে যায়। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখী লেখক, যিনি নৈর্ব্যক্তিকভাবে মৃত্যুকে উপন্যাসে রূপ দিতে চান।"[১]

কালের বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের বাংলা ঔপন্যাসিকদের অন্যতম প্রধান পুরুষ। এই ত্রিশের কল্লোল যুগেই বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসে চিন্তাচেতনাকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়; তার একদিকে যেমন রয়েছে বিশ্ববীক্ষা– স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসেবে উপলব্ধি করা, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে মানুষের পরিবেশ ও মনোজগত সম্পর্কে নানা প্রশ্নে ক্রিয়াশীল ভূমিকা। সেই কারণেই ত্রিশের উপন্যাসে জীবনের সার্বিক সংকটের স্বীকৃতি

যেমন স্পষ্ট, তেমনি সেই সংকটকে শিল্প সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ় প্রবণতাও লক্ষণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিশের প্রজন্ম হিসেবে বাস্তববাদী চেতনা আর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবনকে তুলে ধরেছেন, যেখানে নান্দনিক চেতনা ও চিন্তাশীল দার্শনিকতার সমন্বয় লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে ফরাসি নাট্যকার পিয়ের ফাঁলো এস.জে.-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। *তিনি লেখেন* : "প্রায় কুড়ি বছর আগে আমি যখন বাংলা শিখতে চেষ্টা করি, তখন স্বভাবত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও আমি তখন পড়েছিলাম। এঁদের সকলের রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এঁদের কবিত্বময় আদর্শবাদিতায় ও রোম্যান্টিক ভাবধারা আমার মনকে বিশেষ নাড়াও দিয়েছিল। তবুও আমার মনের কি একটা অভাব ও কৌতূহল তখনও পূর্ণ হয় নি। এই সময় একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আমার হাতে পড়ে। আজও মনে আছে সেদিন প্রাণে একটা রূঢ় আঘাত পেয়েছিলাম। পল্লীজীবনের সেই মাধুর্যপূর্ণ ও ভাবমণ্ডিত চিত্র আর নয়– এখানে পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের কাছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। ... কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কন বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয়। পূর্ববঙ্গে সেই ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরস কথ্যভাষার অতি সার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টনিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়-বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ *পদ্মানদীর মাঝি* বইখানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে। ... বিদেশী সাহিত্যে যদি এই উপন্যাসের সমতুল্য ও সমজাতীয় কোনো সার্থক উপন্যাসের সন্ধান করতে হয়, তা হলে কেবল মোপাসাঁ কিংবা গোর্কি নয়, হয়ত ফ্লোবের কিংবা বালজ্যাক-এর নাম উল্লেখ করতে হবে। মানিকের পরবর্তী কতকগুলো উপন্যাস ও গল্পের পাঠেই এমিল জোলা ও গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর শিল্পগত সহধর্মিতার কথা ভাবতে হয়েছে, কিন্তু *পুতুলনাচের ইতিকথা* বইখানিতে বাস্তবতার সঙ্গে চিন্তাশীল দার্শনিকতার সমন্বয় স্থাপন এবং গ্রাম্য জীবনযাত্রার ধূসর সঙ্কীর্ণতার বর্ণনার সঙ্গেই শিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি মানুষের মানসিক অস্থিরতার রূপায়ণ যেভাবে সাধিত হয়েছে উচ্চ শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউ সেইভাবে তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।"[২]

মাত্র আটাশ বছরের শিল্পজীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম সংখ্যায় বিপুল : উপন্যাস উনচল্লিশটি, গল্প দু'শ তেইশটি, একটি নাটক এবং কিছু কবিতা ও কিছু প্রবন্ধ।[৩] তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য*। প্রকাশকাল-১৯৩৫। প্রকাশের দিক থেকে এটি দ্বিতীয়। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননী*। সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস *মুশল*। প্রকাশকাল-১৯৫৬।

বিষয়বস্তু ও মনোদৃষ্টির ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) এবং *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)। দ্বিতীয় ভাগে, *অহিংসা* (১৯৪১),

চতুষ্কোণ (১৯৪২), প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে *সহরতলী* (১৯৪১), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'আরোগ্য' (১৯৫৩) ইত্যাদি। এই তিনভাগের রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন, তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি ও জীবন গ্রহণের পদ্ধতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের শিল্প-সংকটের যে অভিযোগ আনা হয়, সে সংকট তাঁর পক্ষে মূলত মতবাদেরই সংকট। এই সংকটের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলোর বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা থেকে একটি বিষয়ই উঠে আসে, সেটা হল *চতুষ্কোণ* এবং *অহিংসা* পর্যায়ের রচনাগুলো ব্যতীত *পদ্মানদীর মাঝি*'তে, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* অথবা *সহরতলী*তে কিংবা *চিহ্নে*, যৌনতাকে মুখ্য বিষয় কোথাও করা হয় নি। সহরতলী *চিহ্ন*, *জননী*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* মুখ্য বিষয় মানুষ ও জীবন। যদিও তাঁর প্রথম পর্যায়ের এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিস্তর পার্থক্য, তথাপি এই দুই পর্যায়ে মানুষেরই জীবন ও অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি।[৪] এ বিষয়টির কথা স্মরণ রেখেই আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রধান উপন্যাসে বিধৃত জীবন ও নন্দনতত্ত্ব পর্যালোচনা করব।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নন্দনতত্ত্ব পর্যালোচনার জন্য তাঁর *লেখকের কথা* গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মসন্ধানী এ-গ্রন্থে তাঁর শিল্পদর্শন, দার্শনিক উপলব্ধি ও জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের নন্দনতত্ত্ব তাঁর উপন্যাসেই বিধৃত। তবে লেখক মনের দলিল হিসেবে যদি কোনো আত্মসন্ধানী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে সে-গ্রন্থে লেখক বা শিল্পীর নন্দনচিন্তা সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বোধের উৎস-সন্ধান সহজ হয়ে উঠে। বিশ বছরে উনচল্লিশটি উপন্যাস লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, একথা মনে রেখে তাঁর প্রধান উপন্যাসে বিধৃত জীবন ও নন্দনতত্ত্ব আলোচনায় তাঁরই আত্মসন্ধানী দু'একটি স্মরণীয় ঘোষণা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

১. জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না। (লেখকের কথা)

২. নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর শুধু বসে বসে লেখার বা প্রুফ সংশোধন করার শ্রম নয়– সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমও তাঁকে চালাতে হবে।

৩. আমার লেখায় যে অনেক ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয় নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতে আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে যে আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও। (সাহিত্য করার আগে)

৪. জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে

পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। জীবনকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।– আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলো মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে– তাকে আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারি যা কোনদিন পেত না।

৫. আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠেছিল, সাহিত্য নিয়ে ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।... ভদ্র জীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, বাহ্যিকতা, প্রকাশ্যে ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোট লোক চাষাভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি। (সাহিত্য করার আগে)

৬. লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক। কলম পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনও মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপসোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হব। (কেন লিখি)

৭. স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ যাকে সহজে কাবু করবে নীতি ও আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না।... সাধারণ ও পিছানো মানুষের জন্য লেখা পড়ে সমালোচক, বন্ধুবান্ধব ও বিদগ্ধ পাঠক শোরগোল তুলবেন : তুমি বাজে লেখা লিখছ। কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হলে বস্তুবাদী সাহিত্যিকের চলবে কেন? (লেখকের সমস্যা)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জীবন ও নন্দনতত্ত্ব আলোচনার পটভূমিতে তাঁর এসব বক্তব্য তীব্র সচেতন শিল্পীর নন্দনচিন্তা ও সৎ নিঃসঙ্গ নির্ভীক ঔপন্যাসিকের স্বরূপটি স্পষ্ট করে তোলে।[৫]

তিন

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বক্তব্য ও প্রকরণে মানবজীবনের অন্তর্গত এবং বহির্গত বিষয়ের উন্মোচনে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার সীমানাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি উপন্যাস-শিল্পে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে মানুষের মনোবিশ্ব ও বহির্বাস্তবতার সঙ্গে নিজস্ব জীবনাবেগ ও তত্ত্বাবেগের সুষম সমন্বয় সাধনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসে বিন্যস্ত মানবজীবনের মনোবিশ্ব যেমনি স্বতন্ত্র ও নিগূঢ়; তেমনি অভিনিবেশ্য ও বিশেষত্বপূর্ণ। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* তাঁরই শিল্পচেতনার নান্দনিক স্বাতন্ত্র্যময় সম্ভাবনাকেই ধারণ করেছে। বিষয় ও প্রকরণে এই উপন্যাসে তিনি নিরীক্ষাধর্মী ও ব্যতিক্রম। সমালোচক এই উপন্যাসকে বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক-কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] অবশ্য এ মতের সঙ্গে ঔপন্যাসিক জীবনকে সংশ্লিষ্ট করে তাঁর মত প্রকাশ করেন : "রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলো অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলোকেই মানুষের রূপ দেওয়া

হয়েছে। চরিত্রগুলো কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection- মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

এ উপন্যাসের প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা'য় হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। সুপ্রিয়া হেরম্বকে ভালবাসে, কিন্তু অভিভাবকের শাসনে পুলিশ-দারোগা অশোককে বিয়ে করেছে। পাঁচ বছর বিবাহিত জীবনের পর তার ধৈর্য নিঃশেষিত এবং সে অকুণ্ঠিতভাবে হেরম্বের সঙ্গে গৃহত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করে :

'আপনি আমাকে ডাকলেই পারেন। আপনি বললেই বিছানায় উঠে বসতে পারি।'

হেরম্ব তবু চুপ করে থাকে। কথা বলবার আগে সুপ্রিয়া এবার অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ।

'আজ টের পেলাম, বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে। কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বলে বিছানায় উঠে বসতে দিচ্ছেন না। আমি দাঁড়াতে পারছি না, তবু!'

হেরম্ব বলে, 'শোন সুপ্রিয়া। আজ তোর শরীর ভাল নেই, তাছাড়া নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে আছিস। ধরতে গেলে আজ তুই রোগী, অসুস্থ মানুষ। আজ তুই যা চাইবি তা কি তোকে দেওয়া যায়? তবে আর জ্বরের সময় রোগীকে কুপথ্য দিলে দোষ কি ছিল? বেশি ঝাল হয়েছিল বলে আশোককে তুই আজ মাছের ঝোল খেতে দিসনি মনে আছে? তুই আজ ঘুমিয়ে থাকবি যা সুপ্রিয়া। ছ'মাসের মধ্যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে যা হয় করব।'

হেরম্ব সুপ্রিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রণয় নিবেদনে কিছুমাত্র সাড়া দেয় না এবং ছয় মাসের পরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা'য় হেরম্ব আনন্দের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। উল্লেখ্য, আনন্দের মা মালতীর প্রতি হেরম্ব কৈশোরাচ্ছন্ন প্রেমে মুগ্ধ ছিল। আর আনন্দের বাবা অনাথ হেরম্বের শিক্ষক। পরবর্তীকালে অনাথ আর মালতীর কলঙ্কিত প্রণয়েতিহাস ও ব্যর্থ সংসার যাপন এবং মালতীর নিদারুণ মনোবিকৃতির প্রতিবেশের মধ্যেই আনন্দ ধীরে ধীরে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মতো ম্লান, অপার্থিব সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। হেরম্বের সঙ্গে আনন্দের আলাপের পর আনন্দের হিমসংকুচিত, সংশয়দষ্ট, মুহূর্তের জন্য রক্তিম সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত প্রণয়-বিকাশ মূলত এই প্রতিবেশ প্রভাবেরই ফল। কাব্যিক ঢঙে ঔপন্যাসিক হেরম্ব আর আনন্দের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে জীবনের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটান এই উপন্যাসে। যেমন :

১. নিষ্ঠুর আনন্দের সঙ্গে হেরম্ব লজ্জাতুর অপ্রতিভ আনন্দের আত্মসংবরণের ব্যাকুল প্রয়াসকে উৎসারিত করে বলে, 'বলো বলো, থেমো না আনন্দ।'

   'না বলব না। কেন বলব!'

   হেরম্ব আরও নির্মম হয়ে বলে, 'তুমি তাহলে বুড়ি নও আনন্দ? মিছামিছি তোমার তাহলে রাগ হয়? এতক্ষণ আমাকে তুমি ঠকাচ্ছিলে?'

   'আপনি চলে যান। আপনাকে আমি নাচ দেখাব না।'

   'দেখিও না। আমি ঢের নাচ দেখেছি।'

   'তাহলে অনর্থক বসে আছেন কেন? রাত হল, বাড়ি যান না।'

   'বেশ। তোমার মাকে ডাকো। বলে যাই।'

   আনন্দ চুপ করে বসে রইল। হেরম্ব বুঝতে পারে, সে কি ভাবছে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিষ্ঠুরতা করেছে বলে নয়, নিজেকে সে সত্য সত্যই সম্পূর্ণ অকারণে ছেলেমানুষ

করে ফেলেছে বলে। এ ব্যাপার আনন্দ বুঝতে পারছে না। নৃত্য করে সে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও অবসাদ পায়, এই কথাটি সে এত বেশি লজ্জাকর মনে করে না যে হেরম্বকে শোনানো যায় না। হেরম্বকে অবাধে একথা বলতে পারার বয়স তার হয়েছে বলেই আনন্দ মনে করে। তাই অসঙ্গত লজ্জার বশে বিচলিত হয়ে ব্যাপারটাকে এভাবে তাল পাকিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের উপর সে রেগে উঠেছে। লজ্জা পেয়েও চুপ করে থাকলে অথবা পাকা মেয়ের মতো হাসি-তামাশার একটা অভিনয় বজায় রাখতে পারলে হেরম্বের কাছ থেকে লজ্জাটা লুকানো যেত ভেবে আর আপসোসের সীমা নেই। আঠার বছর বয়সে হেরম্বের কাছে আটাশ বছরের ধীর, সপ্রতিভ ও পূর্ণ পরিণত নারী হতে চেয়ে একেবারে তেরো বছরের মেয়ে হয়ে বসার জন্য নিজেকে আনন্দ কোন মতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

২. আনন্দ বলল, 'প্রেম কতদিন বাঁচে?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'কি করে বলব আনন্দ! দিন গুণে বলা যায় না। তবে বেশিদিন নয়। একদিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস।'

শুনে আনন্দ যেন ভীত হয়ে উঠল।

'মোটে'।

হেরম্ব আবার হেসে বলল, 'মোটে হল? একমাসের বেশি প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ– এক মাসের বেশি হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দুদিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তাই– প্রেম এত তেজি নেশা।'

আনন্দ হঠাৎ কথা খুঁজে পেল না। মুখ থেকে সে চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিল। ডান হাতের ছোট আঙুলটির ডগা দাঁতে কামড়ে ধরে এক পায়ের আঙুল দিয়ে অন্য পায়ের নখ থেকে ধুলো মুছে দিতে লাগল। তার মনে প্রবল আঘাত লেগেছে বুঝে দুঃখবোধ করল। কিন্তু এ আঘাত না দিয়ে তার উপায় ছিল না। আনন্দের কাছে সত্য গোপন করার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া, প্রেম চিরকাল বাঁচে কোনদিন কোন অবস্থাতে কোন মানুষকেই এ শিক্ষা দিতে নেই। হেরম্ব বিশ্বাস করে পৃথিবী থেকে যত তাড়াতাড়ি এ বিশ্বাস দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেম মরে গেলে কি থাকে?'

'প্রেম ছাড়া আর সব থাকে। সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করবার জন্য যা যা দরকার। তাছাড়া খোকা অথবা খুকী থাকে– আরও একটা প্রেমের সম্ভাবনা। ওরা তুচ্ছ নয়।'

উপন্যাসের তৃতীয় ভাগ 'দিবা-রাত্রির কাব্য' পর্বে হেরম্ব আর আনন্দের উত্তুঙ্গ প্রেমের মধ্যে সুপ্রিয়ার আর্বিভাব হেরম্বের মনে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সুপ্রিয়া আর আনন্দের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক হেরম্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের শূন্যতাবোধ আর আত্মচেতনার রূপক-প্রতিভাস নির্মাণ করেছেন। একদিকে সুপ্রিয়ার স্নেহ-মমতা-বেদনা ও নীড় রচনার অনিবার্য প্রয়োজন যা সাধারণ সুস্থ মানবপ্রেমের প্রতীক; আর অন্যদিকে আনন্দের বিহ্বল, স্পর্শভীরু, সাংসারিক লেশহীন শিল্পীসুলভ মানসগঠন– যা আধুনিক মানুষের ইতিনেতির মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিঃসঙ্গতা, মূল্যহীনতা আর শূন্যতার উদ্ভট প্রতীককে উন্মোচিত করে। হেরম্ব, সুপ্রিয়া আর আনন্দের চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, অন্তর্নিহিত টানাপড়েন ও বিকাশের উদ্ভট সমস্যাকে উল্লেখ করে অনেক সমালোচক একে কাম্যুর The Outsider উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮] প্রকৃতপক্ষে নান্দনিক বিবেচনায় *দিবারাত্রির কাব্য* সমকালীন পশ্চাত্য দর্শনের অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ডিটির সংশ্লেষে

বাংলা উপন্যাসে একটা ভিন্নমাত্রা সংযুক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : "এই শিথিল, মন্থর, আত্মবিশ্লেষণের স্বপ্নাবিষ্ট, অর্ধ-সাংকেতিকতার গোধূলিচ্ছায়াতলে অভিনীত জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে দুই-একটি তীব্র, অমার্জিত পাশবিকতার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। দুঃস্বপ্নের পিছনে মগ্নচৈতন্যলীন বিভীষিকার ন্যায় এই অন্তরালবর্তী ঈষৎ-প্রকাশিত নৃশংসতা আমাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ সম্ভবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। হেরম্বের স্ত্রীর আত্মহত্যা, অশোক ও সুপ্রিয়ার ভীতিব্যঞ্জনাপূর্ণ দাম্পত্য-জীবন, পুরীতে অপ্রকৃতিস্থ উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যে অশোকের সুপ্রিয়াকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলার চেষ্টা– এই সমস্ত দৃশ্যে স্বাস্থ্য ও বিকার, জীবন ও মৃত্যু, প্রণয় ও ঈর্ষা– ইহাদের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধতার চিত্র আমাদের উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। উপন্যাসের গঠন ও উপজীব্য বিষয় (form and content) লইয়া আধুনিক যুগে যে বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে, বর্তমান উপন্যাস সেই পরীক্ষাকার্যেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।"[৯]

বিষয় ও প্রকরণে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নিরীক্ষাধর্মী ও ব্যতিক্রম, তেমনি আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতার নিয়তিকে স্মরণে রেখেও তিনি জীবনকে বিবেচনা করেছেন দার্শনিক-নান্দনিক চেতনার গভীর আস্থা দিয়ে। তার এই গভীর আস্থা ও মমত্ববোধ পরবর্তী পর্যায়ে অন্যতর জীবনান্বেষণে গতিশীল।

নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় *জননী* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তববাদী। এখানে ঘটনা আবর্তিত হয় শ্যামা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। "তার সারা জীবনটাই কেটেছে দারিদ্র্যের উদ্বেগে আশঙ্কায়। স্ত্রী হিসেবে শ্যামার ভাগ্য ঈর্ষণীয় নয়, দোজবরে স্বামী শীতল চোর, মাতাল, মিথ্যাবাদী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। স্ত্রী বা প্রণয়িনীর ভূমিকায় শ্যামা অসার্থক। কিন্তু শ্যামা জীবনের সার্থকতা পেয়েছে জননীর ভূমিকায়। দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর সংস্পর্শে এসে তার প্রণয়ের ঘোর কেটে গিয়েছে। সুস্থ মধুর আস্বাদভরা দাম্পত্যজীবন সে কোনোদিন ভোগ করে নি। সংসারের সমস্ত ঝামেলা আর ঝঞ্ঝাট শ্যামাকে একা বহন করতে হয়েছে। স্বামী শীতলের সঙ্গে তার গোড়া থেকেই ছাড়া-ছাড়া সম্পর্ক। শ্যামার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে শীতল হঠে গিয়েছে। অনেকদিন নিঃসন্তান জীবন-যাপনের পর যেদিন শ্যামা জননী-পদে অভিষিক্ত হল সেদিন থেকে শ্যামার কাছে শীতলের দাম কমে যেতে থাকে। সংসারের জননীরূপে শ্যামার প্রতিষ্ঠা : কোনো চমক ছড়াই লেখক এই বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব।"[১০] লেখকের বর্ণনা লক্ষ করা যাক :

> কয়েক বৎসর কাটিয়াছে।
>
> শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড় খোকার দু'বছর বয়সের সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তার তিন বছর পরে আর একটি ছেলে। নামকরণ হইয়াছে তিনজনেরই– বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমান বিহারী। এগুলো পোশাকি নাম। এছাড়া তিনজনের ডাকনামও আছে, খোকা, বুকু ও মণি।
>
> ওদের মধ্যে বকুলের স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভালো। জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই, মোটা মোটা হাত-পা, ফোলা ফোলা গাল, দুরন্তের একশেষ। শ্যামা তাহার মাথার চুলগুলো বাবরি করিয়া দিয়াছে। খাটো জাঙ্গিয়া-পরা মেয়েটা যখন এক

মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়া মিটমিট করিয়া তাকায়, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। বুকুর রংও হইয়াছে বেশ মাজা। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তাহার মুখখানা জ্বলজ্বল করে, ধূসর সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া আসে— সারাদিন বিনিদ্র দুরন্তপনার পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবার কেহ থাকে না। শ্যামা রান্না করে, শ্যামার কোল জুড়িয়া থাকে ছোট খোকামণি। বুকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মার কাঁধের উপর দিয়া ডিবরির শিখাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে তাহার চোখ বুজিয়া যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডাকে 'খোকা ও খোকা।'

বিধান আসিলে বলে, 'ভাইকে কোলে নিয়ে বোসো তো বাবা, বুকুকে শুইয়ে দিয়ে আসি।'

বিধানের হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথমভাগের পাঠক। ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মুখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মতো কোমল। শরীর ভালো না হোক, ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ।

মায়ের চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসে অতিভাবের যে প্রবণতা লক্ষ করা গেছে, সেই বিষয়টি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মমভাবে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন *জননী* উপন্যাসে। এ-ছাড়াও *শ্যামা* চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের বহিরাশ্রয়ী বৈচিত্র্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জীবনের অতলাশ্রয়ী অভিব্যক্তির নান্দনিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন।[১১] এই যেমন উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে পলাতক মামা তারাশঙ্কর ফিরে এলে মামাকে কেন্দ্র করে শ্যামার ভাবনা লেখক বর্ণনা করেন এভাবে :

> রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কি যে ভাবিতে লাগিল। সঙ্গিনীটির কি হইয়াছে? হয়তো মরিয়া গিয়াছে, নয়তো মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ওসব সম্পর্ক আর কতকাল টেকে? মরুক, ওসব দিয়ে তার কি দরকার? কেলেঙ্কারি ব্যাপার চুকাইয়া দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই তার ঢের। আচ্ছা, এতকাল মামা কি করিতেছিল? টাকা-পয়সা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে নাকি? তা যদি করিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড় লাগিয়াছিল, মামা হয়তো এবার সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইয়া দিবে? পুরুষ মানুষের ভাগ্য, বিদেশে ধূলিমুঠা ধরিয়া মামার হয়তো সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়-জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামার তো আর কেউ নেই। যদি কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বয়সে আর একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না!

এই উপন্যাসে আদর্শবাদের আতিশয্য নেই কেবল বাস্তববাদী চেতনা দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু করে শেষপর্যন্ত প্রকৃতিবাদী চেতনালোকে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটান। এই যেমন, "স্বামীর বিষয়ে হতাশ হয়ে শ্যামা ভেঙে পড়ে নি। আপন উদ্যমে সংসার চালিয়েছে। নতুন ঘর তুলেছে, ছেলে বিধানকে পড়িয়েছে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে। সংসারে সে যা পায় নি বা পেয়ে হারিয়েছে তা অন্য কাউকে ভোগ করতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছে। সাত বছর দাম্পত্য জীবনের পর প্রথম সন্তানকে হারিয়ে শ্যামা পেয়েছিল বিধানকে। বিধান তার নয়নমণি। সেই বিধানের বৌ এলো— সুবর্ণ, লাজুক নম্র সেবাপরায়ণা। তবু শ্যামা তাকে সহ্য করতে পারে না। সুবর্ণ শ্যামা যা পায় নি তারই প্রতীক— এক সুখী দাম্পত্য জীবনের অংশীদার। আরো ভয় ছিল। এই সংসারে শ্যামার একচ্ছত্র আধিপত্যে সম্ভাব্য ভাগীদার সুবর্ণকে সে সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু শ্যামা যেদিন জানল সুবর্ণ সন্তান-সম্ভবা সেদিন সব প্রতিবাদ

ঈর্ষাবিদ্বেষের অবসান হল, সুবর্ণকে শ্যামা বুকে টেনে নিল।"[১২] এই যে উপন্যাসে ধারাবাহিকতা, পুরুষানুক্রম, পরিবেশ, জৈব তাড়না, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ এবং অপ্রতিরোধ্য নিয়তি– ঔপন্যাসিক শ্যামা চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন, তা শেষ পর্যন্ত বাস্তববাদকে অতিক্রম করে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটান এভাবে :

> একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা। সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

বাস্তব জীবনে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই স্ত্রী থেকে জননীর বিকাশ খুবই স্বাভাবিক একটি পরিণতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরনো ধরনের বাস্তবধর্মী বিষয়টিকে 'ভাবালুতাবর্জিত নির্মম দৃষ্টি ও আদর্শায়িত না করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে'[১৩] এবং আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার 'প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিবরণের মধ্য দিয়ে'[১৪] আধুনিকতার নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রকে উন্মোচিত করেছেন *জননী* উপন্যাসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের শুরু হয়েছে একটি মৃত্যু-দৃশ্য দিয়ে :

> খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুখ অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্ম-মমতায় গড়িয়া তোলা জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।
>
> কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।
>
> বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃত্যু-দৃশ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা বাংলা সাহিত্যে যেমন অভিনব, তেমনি এর বর্ণনায় লেখক মৃত হারুর মধ্যে যেভাবে চেতনা আরোপ করেছেন; প্রকৃতির বর্ণনায় যেভাবে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবনা, অনুভূতি ও অনুষঙ্গ– বর্ণনার চেতনশীল অন্তঃপ্রবাহে প্রবাহিত করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এ বর্ণনা আমাদের পাশ্চাত্যের নান্দনিক সূত্র চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ (Stream of Consciousness)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সূত্রের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের সামনে নিয়তিচেতনাকে আরো স্পষ্ট করে

তোলেন। নিয়তি এই উপন্যাসের একটি নিয়ামকশক্তি। নিয়তি ও দায়িত্বের পরস্পর টানাপড়েন এই উপন্যাসের একটি মহত্ত্বের দিকচিহ্ন। এই বিষয়টিকে বাদ দিলে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৫] কুসুমের বাবার উক্তি, 'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর এক, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' শ্রীনাথের মেয়ের ভুল করে ফেলে যাওয়া পুতুল, যামিনী কবিরাজের নিঃসন্তান বৌ দৈব ইঙ্গিত মনে করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও নিয়তিচেতনাই প্রকাশ পায় :

> রাত্রে পুতুলের শোকে মেয়েটা কাঁদিবে। সকালে বকুলতলায় খুঁজিতে আসিয়া দেখিবে পুতুল নাই। পুতুল কে লইয়াছে মেয়েটা তাহা জানিতে পারিবে না।
>
> শশী কেবল অনুমান করিতে পারিবে যামিনী কবিরাজের বৌ ভোর ভোর বকুলতলা ঝাঁট দিতে আসিয়া দেখিতে পাইয়া লইয়া গিয়াছে।

মানুষ যে নিয়তি বা অদৃষ্টের হাতের পুতুল সে বিষয়টিই ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পুতুলনাচের ইতিকথায়* বোঝাতে চেয়েছেন, তাই উপন্যাসের মধ্যে বারে বারে উঠে এসেছে পুতুলের কথা। এই যেমন শশীর ছোট বোন সিন্ধু বড় হয়ে কি করবে? এর উত্তর শুনে শশী তার মনের এক বিরাট জটিলতার যেন সহজ সমাধান করে ফেলে এভাবে :

> নিচে সিন্ধু পুতুল খেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দেখে।
>
> খুকী, বড় হলে তুই কি করবি?
>
> পুতুল খেলব।
>
> এই একটি জবাবে ক্ষণিকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়।

এই উপন্যাসে প্রায় সব চরিত্রের পরিণতি কেমন যেন এক অদৃশ্য নিয়তিতে বাঁধা; চরিত্রগুলোও যেন এক অলক্ষ্য হাতের খেলায় চালিত। মৃত্যুকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও যে নান্দনিক চেতনা আর দার্শনিক তাৎপর্য থাকতে পারে, তা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেখিয়েছেন *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে। এই উপন্যাসে তিনি চারটি অস্বাভাবিক শারীরিক মৃত্যু দেখিয়েছেন। মৃত্যুগুলো হচ্ছে, হারু ঘোষ, সেনদিদি, যাদব ও পাগলাদিদির মৃত্যু। এই মৃত্যুর পরেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র কুসুম যে-কথা বলেছে, তা কি কখনো অনুভব করেছি আমরা?[১৬]– যখন সে বলছে, 'যেতাম ছোটবাবু। স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি এরকম যায়। মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।' কিংবা আর একটু পরে যখন সে শশীকে বলেছে, '... সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি? কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' এই অসাধারণ বর্ণনা; যার মধ্যে দার্শনিক তাৎপর্য আর গদ্যের টানটান অপরূপ বুনন; বাংলা উপন্যাসে নান্দনিক চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ রচনা করেছে। এরপর লেখক আবার বলেন, 'একদিন দুদিন নয়, অনেকগুলি সুদীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তার [শশী] জন্য কুসুম পাগল হইয়াছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে তার সে উন্মাদ ভালবাসা

নির্জীব হইয়া আসিয়াছে। হয়তো মারিয়াই গিয়াছে।' সত্যিই এই অদ্ভুত মনের মৃত্যু বাংলা সাহিত্য আগে কখনো দেখি নি আর।[১৭]

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে নায়ক শশী ডাক্তারকে কেন্দ্র করে বাস্তবতার প্রসার দিয়ে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাউদিয়া গ্রামের যে জীবনযাত্রা-প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি এঁকেছেন– তাকে একেবারে পল্লীর সমাজচিত্র বলা যায় না। এখানে লেখকের মন্তব্য ও জীবন সমালোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক মানসের পরিচয় ঘটে। শশী ডাক্তারের জীবন, সে জীবনের প্রধান সমস্যা তার এক প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তার প্রতি এক প্রকারের অবর্ণনীয়, দুর্বোধ্য আকর্ষণ। দীর্ঘকাল তার এই অনুচ্চারিত ভালোবাসা নিয়ে একরকম খেলাই করেছে, তার ডাকে কোনো সাড়া দেয় নি, বরং শশী ডাক্তার এমনই বলেছে : 'শরীর, শরীর, তোমার কি মন নাই কুসুম'। আমাদের বিতিকিচ্ছিরি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নগর আর গ্রামের মানুষের মানসগঠনে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের জটিলতা আর রহস্যের উন্মোচন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কুসুমের মনের মৃত্যু দিয়েই শরীরেও এক ধরনের মৃত্যু রচনা করেন।

উপন্যাসের মধ্যে বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের ভয়াবহ অস্বাভাবিকতা এবং কুসুম ও মতির পূর্বরাগ ও দাম্পত্য-জীবন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের তত্ত্ব প্রয়োগের কারণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উপন্যাসে কুসুম ও মতি এক কথায় বোহেমীয় মনোবিকলনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, আর তাদেরও হার মানায় বিন্দু– নন্দলাল উপকাহিনীর বিন্দু– স্বভাব-সুন্দর বিন্দুকে তার অসংযমী বিকারগ্রস্ত স্বামী মদ খাইয়েছে এক সময় সাঁড়াশি দিয়ে জোর করে; পরে সে মদের দ্বারা এত বশীভূত যে গাঁওদিয়ায় এসে ভাইয়ের ওষুধের ভাণ্ডার থেকে অ্যালকোহল চুরি করে খেতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের অস্বাভাবিতার এই ইঙ্গিত আমাদের মনকে বিচলিত করে তোলে। জীবন জটিলতার বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে নান্দনিক তাৎপর্য নিয়ে করতে সক্ষম হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন : "মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে অন্তর্গম, তার মনের গতি অসরল কুটিল, তার বিচরণ ক্ষেত্র জৈবিক কামনা-বাসনার দুর্ভেদ্য অরণ্য, তার অভীপ্সা বৃহত্তর-জীবনসন্ধান : এসবই এই উপন্যাসে দেখা দিয়াছে। বিশ্লেষণ ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাই পদে পদে; সেই সঙ্গে আছে অসাধারণ শিল্পসংযম; যে সংযমের প্রকাশ নিরাবেগ ভাষায় ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে।"[১৮]

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় নেহাৎ-বস্তুবাদী শিল্পী নন– অনেকখানি অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী। এর প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মনোবাস্তবতায় যেমন রয়েছে, তেমনি উপন্যাসে রহস্যময়তা ব্যবহারের মধ্যেও লক্ষণীয়। এ উপন্যাসে তিনি "সব সময় 'বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ' দ্বারাই পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এবং তাঁর ভাষা ব্যবহারেও কাজ করেছে ঐ বৈজ্ঞানিক পরিমাণ-জ্ঞান। অলৌকিকতার ষোলো-আনা সুযোগ থাকলেও এক মুহূর্তও তিনি তাকে প্রশ্রয় দেন নি– বরং তাঁর দৃষ্টি সবসময় বিজ্ঞানস্বচ্ছ, বাক্য যুক্তিজালশৃংখলিত।"[১৯] উদাহরণ :

১. গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাতে সন্দেহ নাই।

২. ভাবিতে ভাবিতে রীতিমতো বিহ্বল হইয়া যায় বইকি শশী। সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় : রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান– রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে। রহস্যানুভূতির এ প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয়; সব মানুষের মধ্যে একটি খোকা থাকে *যে* মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে-অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে।

এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব সংরক্ষণে জীবনমমতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয়ে এ উপন্যাসটি অস্তিত্ববাদী চেতনাকে ধারণ করে। কেননা অস্তিত্ববাদ অনুযায়ী মানুষের জন্ম এক ধরনের শূন্যতা ও কাদামাটির মধ্যে। সে [মানুষ] ইচ্ছা করলে তার মধ্যে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে, সব কিছু মেনে নেয়, জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অপর দিকে, সে ইচ্ছা করলে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থেকে উঠে এসে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমেই অধিকতর সচেতন হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য সে এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে, কিন্তু এক ধরনের শক্তিও সে নিজের মধ্যে অনুভব করবে এবং তার সাহায্যে সে সব যন্ত্রণার পরেও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথার্থ সচেতন হয়ে উঠবে। ঠিক এমনই প্রয়াস আমরা *পুতুলনাচের ইতিকথায়* শেষ পর্যন্ত শশী চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করি। উপন্যাসের শেষ হয় এভাবে :

গাছপালা বাড়িঘর ডোবা পুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যার ছিল। শ্রীনাথের দোকানের সামনে বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েতপাড়ার পথে। যামিনী কবিরাজের বাহিরের ঘরে হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দ শশী আজও শুনিতে পায়, এ বাড়ির মানুষের ফাঁক মানুষ পূর্ণ করিয়াছে। যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরাণের বাড়িতেও এখনো লোক আসে নাই। তার ওপাশে তালবন। তালবনে শশী আর কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।

আঞ্চলিক রোমান্টিক উপন্যাসের অনন্য দলিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*। এ উপন্যাসে 'বাংলা কথ্যবাচনের এমন এক গতিময়তা আবিষ্কৃত হয়েছে যা উপন্যাসের এক ভিন্নতর আধুনিক নিরিখকে' বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত করেছে। এ-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় লেখেন : "পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষা সেখানে উচ্চারিত হয়েছিল বাংলার এক নিজস্ব ল্যান্ডস্কেপে। মানিকের পদ্মা ঠিক কোন জেলার পাশ দিয়ে তা খুব নির্দিষ্ট করা যায় না, এই উপন্যাসটির বাচনেও ঠিক অতটা নির্দিষ্টতা নেই যাকে বলা যায় দলিলি তথ্য। কিন্তু নেই বলেই, বা না-থাকা সত্ত্বেও মানিক বাংলাদেশের ঐ নিজস্ব ল্যান্ডস্কেপ ও নিজস্ব উপভাষার এক এমন ভূমি রচনা করেন যে সেই ভূমিতে হোসেন মিয়া আর পাশ্চাত্য উপন্যাসের তুলনীয় প্রসপেকটর থাকে না– বাধ্যতই হয়ে পড়ে কুবের-কপিলার স্বস্থানবাসী।"[১৯]

আঞ্চলিক এ উপন্যাসের নান্দনিক ভিত্তি হচ্ছে বাস্তবতা। উপন্যাসে বাস্তবতার প্রয়োগ ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *লেখকের কথা* গ্রন্থে লেখেন : "উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত– অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশসমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়।" ঠিক এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে 'অনেক রকম মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশসমেত টেনে এনে' কাহিনীর বাতাবরণ নির্মাণ করেছেন। এই

উপন্যাসে জীবন দুইভাবে প্রকাশিত। একটি পদ্মাপাড়ের মানুষের সামষ্টিক জীবন; অন্যটি কুবের মাঝির ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত; প্রেম-কাম।

সামষ্টিক জীবনের চিত্র নিয়ে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসেই প্রথম শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা সবাই পদ্মাতীরের মাঝি সম্প্রদায় ও সমস্ত ঘটনাই তাদের জীবননির্ভর। পদ্মাতীরবর্তী একটি গ্রাম কেতুপুর। সেখানে মাঝিদের বাস। তাদের জীবিকা মাছধরা ও মাঝিগিরি করা। সমস্ত বর্ষাকালটা তারা পদ্মার বুকে ইলিশ মাছ ধরে বেড়ায়, শীতে খেয়া পারাপার ও মাল বহনের কাজ করে পদ্মারই বুকে। পদ্মানদীই তাদের ধাত্রী ও মাতৃ-স্বরূপা। উচ্চ সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। রহস্যময়ী পদ্মার তীর তাদের জীবনরহস্যকে একটি স্বতন্ত্ররূপেই গড়ে তুলেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষায়, হতাশা-নৈরাশ্যে, ক্ষুধায়-কামনায়, দুঃখে-দুর্দশায় তাদের জীবন নিজস্ব ছন্দেই আবর্তিত হয়ে চলে। তাদের বিশিষ্ট মৌখিক ভাষা, আচার-সংস্কার, মান-অভিমান, ঈর্ষা-দ্বেষ– সবকিছুই যেন এই বিশেষ ভৌগোলিক ক্ষেত্রের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশমাত্র। তাদের জীবনপ্রবৃত্তির মূল প্রেরণা অনেকটাই আদিম। সমস্ত পারিপার্শ্বিকই যেন এক অমোঘ নিয়তির মতো তাদের জীবনের পরিচালক। পদ্মা যেমন তার এক তীর ভাঙে আর অন্য তীর গড়ে তোলে, এদের জীবনেও তেমনি ভাঙাগড়ার নিত্য লীলা। কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ– এই ভাঙাগড়ার লীলারঙ্গভূমি। কুবের, কপিলা, মালা, রাসু, গণেশ, নকুল, বুড়া পীতম মাঝি, আমিনুদ্দি– এরা সবাই এই জীবননাট্যের কুশীলব। রহস্যময়ী পদ্মার মতোই রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া যেন এদের নিয়তিসদৃশ নিয়ামক। ভাষায়, মনোভাবে, আবেগে, জীবিকায় এই মানুষগুলোর মধ্যে যেন এক অখণ্ড ঐক্য দেখা যায় আর তার পেছনে পদ্মানদীর ভূমিকাটি কোথাও অস্পষ্ট থাকে না। এই উপন্যাসে নদীর প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ, শোষিত ধীবর শ্রেণীর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের যেমন শিল্পিত দলিল প্রকাশিত হয়েছে; তেমন কুবের-কপিলার ভালোবাসা দিয়ে উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে কবিত্বময় নান্দনিক সৌন্দর্য।[২০]

কুবের পদ্মানদীর দক্ষ জেলে। তার স্ত্রী মালা, শারীরিক পঙ্গু। তারপরেও মালার ত্বকের মসৃণতা কুবেরকে আকৃষ্ট করে। কুবের মাঝি ভাবে : 'মালার রং কালো নয়, তামাটে– ... জেলেপাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নেই। একটা পা যদি হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না।' পঙ্গু মালার প্রতি কুবেরের এক রকম মমতা ও নিষ্ঠাও আছে, যে কারণে তার শাশুড়ির প্রশংসা পায় :'–মালার লাইগা ভাবুম কেরে? সোনার জামাই তুমি, খোঁড়া মাইয়ারে আমার মাথায় কইরা থুইছ–।' সত্যিই কেউ মালাকে অসম্মান করবে তা কুবের সহ্য করতে পারে না। তবু মালার শারীরিক পঙ্গুতার মধ্যেই নিহিত ছিল কুবের-কপিলার সমাজ-অবৈধ ভালোবাসা।[২১] বড় বর্ষায় চরডাঙায় শ্বশুবাড়ির খবর নিতে গিয়ে কুবেরের জীবনে নতুন করে কপিলার আবির্ভাব ঘটে। স্ত্রী মালার ছোটবোন হিসেবে যে চঞ্চল কিশোরী কপিলার সঙ্গে কুবেরের পরিচয় ছিল সে এখন যুবতী, বিবাহিত ও স্বামী পরিত্যক্ত। এই শ্যালিকার দুরন্তপনার স্মৃতি এখনো কুবের ধরে রেখেছে :

> আর কি কোনোদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটাকে ঘাটের উপর হইতে ছুড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা একা পালাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনো হয়তো সে কুবেরকে চ্যালাকাঠ ছুড়িয়া মারিবে না। না মারুক। একজন চ্যালাকাঠ

ছুড়িয়া মারিবে না বলিয়া আপসোস করিবার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দু'চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। হ, সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া আছে কুবেরের মনে।

বন্যাপীড়িত ভাইবোনদের নিয়ে কপিলা কুবের মাঝির সঙ্গে কেতুপুরে চলে আসে। তারপর থেকে নানারূপ অনুরাগের প্রকাশে কপিলা কুবেরের মনকে চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু কপিলার মনোভূমির রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয় না কুবের। কপিলা সব সময় 'আরে পুরুষ' বলে কুবেরের পৌরুষকে যেন চ্যালেঞ্জ করে :

কপিলা বলে, 'তামুক ফেইল্যা আইছ মাঝি।'

কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে।

বলে, 'খাটাসের মতো হাসিস্ ক্যান কপিলা, আঁই?'

কপিলা বলে, 'ডরাইছিলা, হ, আরে পুরুষ।'

তারপর বলে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'

বলে আর কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা? হ। কুবের তাহার দুই কাধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা।'

কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপর বসিয়া পড়ে,

হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে পুরুষ।'

তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস– সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য।

উপন্যাসে প্রয়োজন, অপ্রয়োজন নানা খুনসুটির মধ্য দিয়েই কুবের-কপিলার সান্নিধ্য বেড়েই চলে। কুবেরের মেয়ে গোপীকে হাসপাতালে রাখার পর রাত হয়ে এলে কুবের কপিলা হোটেলে রাত কাটায়। চমৎকারভাবে ঔপন্যাসিক দুজনের অপরাধ বোধ তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। বাড়ির ঘাটে নেমে কপিলাকে আগে বাড়ি যেতে বলে কুবের; কিন্তু একা যেতে রাজি হয় না কপিলা, বলে 'আরে পুরুষ'। কপিলার সব কিছুর মধ্যেই কুবের এক রহস্যের সন্ধান পায়। স্ত্রী মালার সঙ্গে কপিলার তুলনা করে কুবের বুঝতে পারে : "উচ্ছ্বাসও বেশি কপিলার, উচ্ছ্বাসের প্রকাশও বেশি। আবার কুবেরের ভাবাবেগকে সে হেসে উড়িয়ে দিতেও পারে। পূজাবাড়ি যাওয়া উপলক্ষে দু'জনে একলা হলে কপিলার আঁচল টেনে ধরে কুবের, কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে কপিলা বলে, 'মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা বড় কাতর।' কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে স্বামীর জন্য সে কাতর। এভাবে কথা ঘোরালে রেগে গিয়ে কুবের বলে ফিরে যাক না সে স্বামীর কাছে। 'তাই যামু'— জবাব দেয় কপিলা, পদে-পদে অপদস্থ করে কুবেরকে। ... কপিলার মনের হদিস পায় না সে, বড় দুর্বোধ্য রহস্যময় তার ব্যবহার।"[২২] কুবের-কপিলার সম্পর্কের টানাপড়েন এবং বিরহ মুহূর্তে কুবেরের চিত্তচাঞ্চল্যের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পদ্মার ব্যঞ্জনাময় অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এই ব্যঞ্জনা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের নন্দনতাত্ত্বিক চেতনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের শেষ প্রান্তে "গোপীর বিয়ে উপলক্ষে কেতুপুরে-আসা কপিলাকে আমরা নতুনরূপে দেখতে পাই। তার হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক মিশ্রিত চপল ভঙ্গির পরিবর্তে সেখানে

কী এক গাম্ভীর্য, চিন্তামগ্নতা লক্ষ করি। নির্জন পদ্মাতীরে আগের মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা আর লক্ষণীয় নয়। ... তবে এবারেও কপিলা কুবেরের জন্য নদীতীরে গভীর রাতে অপেক্ষা করে, কিন্তু তা এক দুঃসংবাদ নিয়ে, যে দুঃসংবাদ কুবেরকে ময়নাদ্বীপে যেতে বাধ্য করে। সন্দেহ নেই, কুবেরের ময়নাদ্বীপ যাত্রা হোসেন মিয়ার একটি দীর্ঘ শোষণ-পরিকল্পনার অংশ। এ থেকে কুবেরের কোনো পরিত্রাণ নেই। কুবেরের ভাষায়, একবার জেল খাটলেই সে এই নিয়তিকে এড়াতে পারবে না। হোসেন মিয়া তাকে বাধ্য করবে ময়নাদ্বীপে যেতে। এই পরিণতির আরেকটি দিক হল, এমন কষ্টকর জীবনযাত্রায় কপিলা স্বেচ্ছায় এবং কুবেরের সম্মতিতে তার অনুগামী হয়। এ আরেক নিয়তি। কুবের-কপিলার প্রণয় চরিতার্থ হওয়ার পথে যে-সামাজিক বাধা বিদ্যমান তার পটভূমিতে বিচার করলে ময়নাদ্বীপ হয়ে উঠেছে তাদের প্রণয়মুক্তির অনিবার্য উপায়। সেই সঙ্গে যেন জীবনমুক্তিরও। পদ্মার জলপথ বেয়েই তারা এই মুক্তির সোপান অতিক্রম করে। একদিকে শোষণের শৃঙ্খল, আরেকদিকে মুক্তির অনুভূতি– এই দুয়ে মিলে উপন্যাসের শেষ দৃশ্যটি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে":[২৩]

হোসেনকে কিছু বলিতে হইল না; খবর সে আগেই শুনিয়াছে। লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ময়নাদ্বীপ যাবা কুবের? চুরি আমি সামাল দিমু।'

'আমি চুরি করি নাই মিয়া।'

'তা কি হোসেন মিয়া জানে না? কিন্তু চোরাই মাল এখন বাহির হইয়াছে কুবেরের ঘরে, চোরকে সেখানে মাল রাখিয়া আসিতে কেহ যখন দেখে নাই, কে বিশ্বাস করিবে কুবেরের কথা? বাহিরের কেহ শত্রুতা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে এমন কোনো স্থানে মাল বাহির হয় নাই, একেবারে ঘরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মাল পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া গরিব নয় কুবের।'

বিবর্ণ মুখে কুবের মাথা হেঁট করিয়া থাকে।

ঘোমটার ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তার দিকে তাকায়।

একজন মুনীষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, 'যাবা ময়নাদ্বীপে?'

ঘাড় নাড়িয়া কুবের সায় দেয়।

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপী আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের? ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কী আছে?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাইরের একটা ঘরে সাতজন মুসলমান মাঝি ঘুমাইয়া ছিল, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া সকলে নদীঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপিচুপি বলে, 'না গেলা মাঝি, জেল খাট।'

কুবের বলে, 'হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।'

কপিলা আর কথা বলে না।

ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারব না।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে গোষ্ঠীভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের দার্শনিক ও নান্দনিক গুণকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। হোসেন মিয়া চরিত্রের রহস্যময়তার ভেতর দিয়ে লেখক ধীরে ধীরে কেতুপুরের মানুষ-জনের ওপর নিয়তির এক অনিবার্য কালো ছায়ার বিস্তার ঘটান। শিল্পের অনিবার্য নন্দনতাত্ত্বিক কৌশল হিসাবে রহস্যময়তা আর নিয়তি অন্যতম উপকরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী হিসাবে এই দুই উপাদান দিয়ে পদ্মানদীর মাঝিকে নিয়ে গেছেন চমৎকার পরিণতির দিকে। যেখানে কুবেরের ব্যক্তি অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। নিয়তি-নিয়ন্ত্রক হিসেবে হোসেন মিয়ার শক্তি আর কুবেরের ব্যক্তি-অস্তিত্ব উপলব্ধির কারণেই উপন্যাসের শেষে কুবের বলে 'হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফির আবার জেল খাটাইব।' এ তো গেল নিয়তি আর অস্তিত্ব চেতনার বিষয়। পদ্মার জলপথ ধরে বৈধ-অবৈধ নানা ব্যবসায়িক কর্মোদ্যমে অতি-দ্রুত-স্ফীত পুঁজির অধিকারী হোসেন মিয়ার রহস্যময়তা আর কুবেরের চরিত্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে তার (হোসেন মিয়ার) প্রতিষ্ঠা আভাসকে মার্কসবাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করেন এভাবে :

> হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় কুবের প্রতিনিয়তই পায়। বিস্তৃত তাহার কর্মক্ষেত্র, এখানে ওখানে ছড়ানো তাহার জীবন, এলোমেলো তাহার চলাফেরা, তবু চারিদিকে সামঞ্জস্য, সব নিয়মে বাঁধা। একটা জটিল বিশৃঙ্খলায় সে সব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।
>
> চাঁদপুরে হোসেন মিয়া নৌকায় যোগ দিল। ময়নাদ্বীপের পথেই এবারো নৌকা চলিল, নোয়াখালীর উপকূলে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের কাছে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় বোঝাই দেওয়া হইল নারিকেল। বোঝাই শেষ হইল কিন্তু নৌকা খুলিবার হুকুম হোসেন দিল না। দু'দিন সেইখানে নিষ্কর্মা হইয়া তাহারা বসিয়া রহিল।
>
> তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নদীর মোহনার দিক হইতে মসুরি বোঝাই প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী বোট আসিয়া ভিড়িল পাশে, চট্টগ্রামবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমান নামিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ হোসেনের সঙ্গে করিল পরামর্শ। বোট হইতে তারপর ত্রিপলমোড়া কী যেন আসিল এই নৌকায়, ছইয়ের মধ্যে পাটাতনের তলে হোসেন তাহা লুকাইয়া ফেলিল। তারপর হোসেন ও বৃদ্ধ মুসলমানটি নামিয়া গেল তীরে, গুনিয়া গুনিয়া হোসেন কতকগুলো নোট তাহার হাতে দিল, নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'নাও খোলো কুবির বাই।'
>
> বড় কৌতূহল হইতেছিল কুবেরের। পাটাতনের নিচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে হোসেন? হোসেনকে প্রশ্ন করিবার সাহস কুবেরের হইল না।

উল্লেখ্য, এই রহস্যময়তা *পুতুলনাচের ইতিকাথার* মতো প্রাকৃতিক নয়; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝিতে* এভাবেই ব্যক্তি-রহস্যময়তার নন্দনতাত্ত্বিক সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচন করেছেন।

কাম-চেতনাকেও এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার নান্দনিক শৈলী দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য, এই কাম-চেতনা অন্ত্যজ শ্রেণীর একদম মৌলিক

ভাবনা-প্রসূত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সার্থকভাবে বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর কাম-চেতনাকে এমনভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণ :

কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপিলা বুঝি টের পাইয়াছিল। খানিক পরে সেও পুকুরঘাটে আসিয়া হাজির।

'আমারে রং দিলা না মাঝি?'

'পাঁক দিমু কপিলা? রং ত নাই!'

'দুর অ! রং নাই, পাঁক দিবার চায়! দিও না মাঝি পাঁক, দিও না কইলাম!'

পাঁক দিতে বারণ করে কপিলা, কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে। হাতের ঠেলায় কলসি ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে, 'ধর মাঝি, কলস ধর।'

বলে, 'আমারে ধর ক্যান? কলস ধর।'

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতোই আলগোছে ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, 'কথা যে কও না মাঝি?'

কুবের বলে, 'তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।'

কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, 'ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামির ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি– পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমরে। ছাড়, মানুষ আহে।'

কুবের-কপিলার সমাজ-অবৈধ ভালোবাসার 'কার্যকারণ' উন্মোচনে 'লিবিডো' তাড়না দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে বাস্তববাদের ভিত্তিকে আরো বেশি সংহত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক হলেও শিল্পীর কল্পনার রঙে-রসে 'লিবিডো চেতনা'কে নন্দনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে উপন্যাসে 'রোমান্টিকতা'কে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। যে-কারণে *পদ্মানদীর মাঝি* হয়ে উঠেছে সফল 'আঞ্চলিক রোমান্টিক' উপন্যাস।

চার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথাসাহিত্যের পরিধিতে যোগ করেছেন এক অচেনা ও অবহেলিত জনপদের জীবনকথা। তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাসে যৌন-জীবন ও অন্তর্জীবন একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক এতদিন নিষেধ বা রোমান্সের ঘেরাটোপে ঢাকা ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সেখানে নির্ভীকচিত্তে তির্যক সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেন। প্রেম ও যৌনতাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নন্দনতাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে অস্তিত্ববাদী এবং চৈতন্য প্রবাহের লক্ষণযুক্ত চরিত্রের তিনিই প্রথম স্রষ্টা। মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের তাঁর হাতেই প্রথম সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সংশোধিত ও পরিশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৮১

২. উদ্ধৃত, *মানিক গ্রন্থাবলী* : ত্রয়োদশ খণ্ড, সম্পাদক : ড. সরোজমোহন মিত্র, শ্রী নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রী যুগান্তর চক্রবর্তী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন, ১৯৭৬, পৃ. ৬১২-৬১৩

৩. হায়াৎ মামুদ, ভূমিকা, দ্র. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ভূমিকা : ২

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিশোধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ২৭৩

৫. *কালের প্রতিমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৬. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫১৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩

৮. অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ. ২০৬

৯. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪

১০. *কালের প্রতিমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১১. *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

১২. *কালের প্রতিমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১৩. *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪

১৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪, পৃ-২৪২

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৮. *কালের প্রতিমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১৯. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৩৪

২০. *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. [illegible]

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

২৩. সৈয়দ আজিজুল হক, 'পদ্মা, ময়নাদ্বীপ এবং কুবের-কপিলা', দ্র. 'উলুখাগড়া', সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৫, পৃ. ১৭৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী'

মাহফুজা হিলালী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) শেকড় সন্ধানী লেখক। তিনি যেমন মানুষের মনের একান্ত গহনে লালিত বোধকে সনাক্ত করেছেন, তেমনি সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের তৃণপর্যায় পর্যন্ত সামষ্টিক বোধকে উপস্থাপন করেছেন। *জননী* (১৯৩৫) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তিনি জীবনের বাইরের স্রোতের চেয়ে অন্তর্জগতের স্রোতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই সমাজের মূল স্রোতের অন্তরালে যে প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা বয়ে চলে–তাকে চিত্রিত করেছেন। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক। তাই তাঁর লেখায় জীবনের ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ছিল–অভিযোগ ছিল। তিনি বলেছেন :

ক. বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন?[1]

খ. মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন?[2]

গ. ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা–যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে–সাহিত্যে স্থান পায় না?[3]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর দেখা সমাজজীবন এবং সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে যে ফাঁকি, তাই তাঁকে সাহিত্য লেখার, বিশেষত উপন্যাস লেখার দিকে চালিত করেছে। মূলত তিনি শোষিত মানুষের চিত্র চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন। শৈলজানন্দর সাহিত্যে বস্তির বাস্তবতা আসে নি বলে আক্ষেপ করেছেন। এই বাস্তব জীবনকে ধরতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যে তিনি শোষিত মানুষের ভেতরেও যে শোষক এবং শোষিত রয়েছে, তা উন্মোচন করেছেন। এবং সবচেয়ে নিরুপায় শোষিতকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ *জননী*তে নিম্নবিত্ত সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে–এই সমাজের একজন শীতল–সে আবার শোষণ করেছে শ্যামাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য তাই শীতল নয়, শ্যামা। এই শ্যামাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে *জননী* উপন্যাসের কাহিনী। এ উপন্যাসে শুধু জননীই চিত্রিত হন নি, জননীর চারপাশের বিভিন্ন চরিত্র, সংসার এবং পরিবেশ পরিস্থিতিও অঙ্কিত হয়েছে নিপুণভাবে। উপন্যাসে শ্যামা, মন্দাকিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যভামা, রানী, বকুলমালা, সুপ্রভা, রাজবালা, সরযূ, বিভা, শামু, সুবর্ণলতা–১৩টি নারী চরিত্র ; শীতল, রাখাল, হারাণ, বিধান, বিমানবিহারী, কমল বাবু, শঙ্কর, তারাশঙ্কর, কনকের স্বামী, মোহিনী, বনবিহারী–১১টি পুরুষ চরিত্র এবং বিধান, বকুল, কানু, কালু, রাণী, শঙ্কর, শামু–৭ জনের শিশুজীবন অঙ্কিত হয়েছে। এখানে অনেকগুলো সংসারের চিত্র আছে। শ্যামা এবং শীতলের সংসার, মন্দা, সুপ্রভা এবং রাখালের সংসার, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার, কনকের সংসার, বকুল এবং মোহিনীর সংসার, সরযূর সংসার। আবার সংসারবিবাগি তারাশঙ্করের জীবনও এখানে অঙ্কিত

হয়েছে। এতোগুলো সংসারকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে লেখক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বোধ, মানসবৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, সংস্কার, উৎসব-পার্বণ, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, পেশা, অর্থনৈতিক হালচাল, বিনোদন, ফ্রয়েডীয় প্রভাব ইত্যাদি চিত্রিত করেছেন।

প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে নারী 'মা' হন। কিন্তু এই 'মাতৃত্ব' অধ্যায়টি খুব সহজ নয়। সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং ভূমিষ্ঠের পর তাকে লালন-পালন এবং প্রতিষ্ঠিত করা– পুরোটিই এক দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ। এই পথে 'মা' অবতীর্ণ হন মুখ্য ভূমিকায়। সাহিত্যে 'মা' ধারণাটি অনেক আবেগে অংকিত হয়। মা-কে অতিমানব করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু *জননী*র 'মা' বাস্তবজীবনের প্রতিকৃতি। *জননী* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রচ্ছদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> জননী দেবী নন– মানবী। ['ভাল ও মন্দ মহত্ত্ব ও হীনতা' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে] সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এক জননীর চিত্র আঁকিতে গিয়া তাকে দেবী করিতে চাহিয়া মিথ্যা করিয়া দিব কেন?[৪]

তাই মানিকের জননী ধরণীর মানুষ– অপার্থিব জগতের কেউ নয়। উপন্যাসের শুরুতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামার নির্ঝঞ্ঝাট জননী-জীবনে পদার্পণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। পিতৃকূলে এবং শ্বশুরকূলে তার প্রায় কেউ-ই নেই। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পিতাকে হারিয়েছে, এগার বছর বয়সে হারিয়েছে মাকে, ছিল এক মামা। বিয়ের এক বছরের মধ্যে সেও সম্পত্তি বিক্রি করে, গ্রামের এক বিধবাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। অন্যদিকে, শ্বশুরবাড়িতে শুধু একমাত্র বিবাহিত ননদ মন্দাকিনী আর স্বামী নেশাগ্রস্ত-বদরাগী-বহির্মুখী মানুষ। তাই শ্যামার জীবনে বাইরের প্রভাব ক্ষীণ– ঘরই তার পৃথিবী। শ্যামা সাত বছর বধূজীবনযাপনের পর প্রথমবার মা হয়। লেখক জননীর জীবন অঙ্কনে শ্যামার প্রসবযন্ত্রণা থেকে শুরু করেছেন। শ্যামা দুই দিনের বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে এবং এই দুই দিন বারবার মূর্ছা যায়। শেষবার মূর্ছা ভাঙার পর সে মহামুক্তির স্বাদ পায়। পরদিন প্রথম দেখেই ছেলেকে সে ভালোবেসে ফেলে। নতুন মায়ের অনুভূতি লেখক শ্যামার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন :

> কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভুরুতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মতো টুলটুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়িসংযোগ বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কী কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দু'দিন দু'রাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।[৫]

জননীর এ প্রথম অভিজ্ঞতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আরো ঋদ্ধ হয়। চোখ-মুখ-গাল-ঠোঁট-বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সে সন্তানের হাত-পা ছোঁড়া, তাকানো, হাসি-কান্নার অর্থও বুঝতে পারে। ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁভাবে শুরু করতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। শুয়ে শুয়ে সে খুঁত খুঁত করতো–এটা হলো না, ওটা হলো না। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসলে সে তাগিদ দিয়ে গরম তেল ছেলের বুকে

মালিশ করায়, পাশ ফিরেই ছেলেকে পিষে ফেলেছে আশংকা করে চমকে ওঠে, কখনো তার মনে হয় ছেলের যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না—সে নাকের নিচে গাল পেতে নিঃশ্বাস অনুভব করে, ছেলের বুকে হাত রেখে স্পন্দন গোনে, আবার স্নানের জল বেশি গরম কি-না তা নিয়ে ননদ মন্দার সঙ্গে খুনসুটি করে। শ্যামার এই প্রথম সন্তান বেঁচেছিল মাত্র বার দিন। তার মায়ের মন তাকে ক্ষমা করতে পারে নি—তার ধারণা সন্তান পালনে সে আনাড়ি বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।—এও মায়ের এক রূপ। সন্তানের জন্য তার চিরন্তন মমতা। সন্তান না বাঁচলেও সন্তান পালনের সমস্ত কৌশল শ্যামা এ সময়ই শিখেছিল। এর দু'বছরের মাথায় তার আরেকটি সন্তান হয়, তার নাম বিধান, এরপর ছেলেমেয়ে দিয়ে তার ঘর ভরে যায়। মেয়ে বকুল, ছেলে মণি, ফণি এবং শেষ বয়সে অন্ধ মেয়ে। কিন্তু প্রথম সন্তানকে সে ভোলে না। সেই অভিজ্ঞতায়ই অন্য সন্তানদের লালন-পালন করে। বিধানের জন্মের পর সে কোনো উচ্ছ্বাস দেখায় না, যদি এবারও দেবতার পরিহাসে পড়ে সেই ভয়ে। শীতল যখন বলে এটার পয় আছে—তখনও শ্যামার ভয় হয়, সে উচ্ছ্বসিত না হয়ে ছেলেকে বাঁচার কথা বলে। তার নিজের মনেও চিন্তা আসে বিধান পয়মন্ত ছেলে, কিন্তু ভয়ে উচ্ছ্বসিত হয় না। আশাতে তাঁর আশঙ্কা বাড়ে। তবু কখনো কখনো সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—ছেলের হাসি দেখে উত্তেজিত হয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার দেয়া আলখেল্লা পরিয়ে তোয়াল জড়িয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে, হাত-পা নেড়ে খেলার সময় মনে দোলা লাগে। আবার রাখাল এসে ছেলেকে একটু গাল টিপে আদর করলে তার মনে হয় ছেলেকে রাখাল অপমান করেছে—তার অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এখানেই মায়ের আবেগাপ্লুত মন দেখা যায়। এখানে লেখক দেখিয়েছেন, সন্তানের যে কোনো পরাজয়ে মায়ের মনে ক্ষুব্ধ বেদনার সঞ্চার হয়। সন্তানের প্রথম পরাজয়ে তাই শ্যামার ক্ষোভ বাস্তবের চিরন্তন রূপ। মায়ের মন সব সময়ই কোমল। সন্তান বিষয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত অনুভূতিই তাকে দ্যোতিত করে। ধর্মীয়-সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার শ্যামাকে বারবার আশঙ্কিত করে। প্রথম সন্তান জন্মের পর প্রতিবেশীরা দেখতে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে তার গর্বের সঙ্গে ভয়ও হয়। দেবতারা শুনে যদি কোনো অমঙ্গল করে। তাই সে বিনয়ের সঙ্গে কানা-খোঁড়া যে হয় নি সে কথা বলে। আসলে সে দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দেয়ার জন্যই তার প্রচেষ্টা। এছাড়া আঁতুড় ঘরের রক্ষাকবচ হিসেবে ঘরের এক কোণে এগারো দিনরাত্রি ধরে প্রদীপ্ত প্রহরী রূপে জ্বালায় অনির্বাণ প্রদীপ, শিওরের কাছে খড়ি দিয়ে লেখে দুর্গা নাম।—এসবই সন্তানের কল্যাণের জন্য যুগ যুগ ধরে মায়েদের প্রথা—তারা যে কোনো প্রকারে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। শ্যামা দ্বিতীয় সন্তানকে বাঁচাবার জন্য কালীঘাট ও তারকেশ্বরে পূজা মানত করে, নিজে গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করে। প্রত্যেকদিন মাদুলি ধোয়া জল খায়, একটি একটি করে মাদুলি ছেলের কপালে ছোঁয়ায় এবং কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। শিশু বিধানের জ্বর হলে সে দিশেহারা হয়ে ওঠে। শীতল তখন মন্দাকে রাখতে বনগাঁ গেছে। বিধানের জ্বর বেড়ে চলে। ঠিকে ঝি সত্যভামাকে থাকতে বললে, সে নিজে না থেকে তার দশ বছরের মেয়ে রানীকে শ্যামার কাছে রেখে যায়। রানীর একটা চোখে আঞ্জনি হয়েছিল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—শ্যামার কাছে মনে হয় এইটি অমঙ্গলের চিহ্ন। সন্তান হারানোর আশঙ্কায় সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তবে বিধান বেঁচে যায়। বিধান একটু বড় হলে তার মধ্যে বিভিন্ন অসংলগ্ন আচরণ দেখে শ্যামা আতঙ্কিত হয়। বিধান দিনের কয়েকটি প্রহরে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, তাকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, পোষা পাখিকে গলা টিপে মেরে ফেলে নিজেই আবার কাঁদতে থাকে, বিড়ালের

গলায় দড়ি বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে—এ স্বভাব তার বার-তের বছর পর্যন্ত ছিল। এ আচরণ দেখে শ্যামার সন্তানের জন্য চিন্তার অন্ত ছিল না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু একটু করে শ্যামার মাধ্যমে জননীর চিত্র তুলে ধরেছেন। বিধানের জন্ম থেকে বিধানের পিতা হওয়া পর্যন্ত এক দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় শ্যামার মাতৃত্বের বিভিন্ন বাঁক দেখা যায়। বিধান একটু বড় হলে মায়ে-ছেলেতে রাজ্যের গল্প হয়—এরপর ছেলেকে সে নিজের উদ্যোগে ভালো স্কুলে ভর্তি করে। স্কুলে ভর্তির পর বিধান বাইরের পরিবেশের সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। শ্যামার ভাবনা হয়, মনে মনে খুঁতখুঁত করে। ছেলেকে বাইরের অনাচার থেকে বাঁচাতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লেখক বলেছেন :

> ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনও কোরো না বাবা, কখনও নয়।[৬]

মাতৃহৃদয়ের এ অতি সাধারণ চিত্র। 'মা' সকল সময় সন্তানকে আগলে রাখতে চান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনা চিত্রণে তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। বিধানের স্কুলে ছেলেরা 'মাইরি' বলে জেনেও তার চিন্তার শেষ নেই— ছেলে তার খারাপ না হয়ে যায়। এমনি চিন্তা করতে দেখা যায় ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের পাভেলের মাকে। সেও শ্যামার মতো স্বামীনির্যাতিত নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর পাভেল একরাতে মদ খেয়ে ঘরে ফিরলে সে আতংকিত হয় এবং সন্তানকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সে মাতৃত্বসুলভ কোমল পথ বেছে নেয় : ছেলেকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, সস্নেহে বেদনার্ত স্বরে কথা বলে, ভালোবাসা দিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে চায়। লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> মা ওর ঘামে ভেজা আলুথালু চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে বলল, 'ছি, এ কি করেছিস, বাবা!'[৭]

এই ছেলেই পরবর্তীতে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে— এখানেই মায়ের সার্থকতা। দেখা যায় দেশ-জাতি ভেদে মায়েদের স্বরূপ প্রায় এক। শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসে দেখি বিধবা দরিয়াবিবি অন্তঃসত্ত্বা হলে সে সমাজকে আড়াল করে সেই সন্তানকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে এবং সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে রেখে সে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা সে সমাজের ভয়েই করে। আবার তার অন্য সন্তানদের সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্যও নিজের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার মাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য কাঁদলেও তার কোনো পথ খোলা নেই। লেখক বর্ণনা করেছেন :

> দরিয়াবিবির চোখে আর কোনো প্রশ্ন নাই। ত্বরান্বিত হোক, হে আদিম শিশু তোমার আগমন। এত যন্ত্রণার মধ্যে জননী তোমার পথই তো চেয়ে থাকে। কত লজ্জা, কত অপমান ধিক্কার বাহিরের জগতে প্রতীক্ষমাণ, আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। [... ... ...] কি মোটাতাজা গৌর রঙ শিশু! দরিয়াবিবি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কয়েকবিন্দু অশ্রু পড়িল অলক্ষিতে।[৮]

এই তিনজন মা-ই সন্তানের জন্য নিজেদের নিঃশেষ করেছে। দরিয়াবিবি টিকে থাকতে পারে নি। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যামা টিকে থেকেছে। শীতল টাকা

চুরি করে জেলে গেলে, শ্যামার মামা টাকা আত্মসাৎ করে চলে গেলে শ্যামার আকাশ সমান বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না। প্রথমে নিজে ছাদের রুমে উঠে গিয়ে নিচের তলা ভাড়া দেয়, তারপরও সংকুলান না হলে পুরো বাড়ি ভাড়া দিয়ে মন্দার আশ্রয়ে যায়, সেখানে সে দাসীর মতো খেটে সন্তানদের মানুষ করে। আবার বিধান রাত জেগে পড়ে বলে ঘি-দুধ-সন্দেশ চুরি করে বিধানকে খাওয়াতেও দ্বিধা করে না। এখানে মাতৃত্বের কাছে নৈতিকতা হার মানে। মন্দার কথায় সে শহরতলীর বাড়ি শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। তবু তার সংগ্রাম শেষ হয় না। বকুল বড় হয়ে উঠলে শঙ্করকে নিয়ে বকুলের আবেগেকে সে ভয় পায়, কেননা ধনীর ছেলে শঙ্করের সঙ্গে কখনো বকুলের বিয়ে হবে না, বকুলকে শুধু কষ্টই পেতে হবে। আবার মোহিনীর সঙ্গে বকুলকে বিয়ে দিয়ে সে চিন্তিত হয়– বকুল সুখে আছে তো! সে লুকিয়ে বকুলকে লেখা মোহিনীর চিঠি পড়ে, কিন্তু সে চিঠির মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারে না। তারপর একদিন ভোরে মোহিনী আর বকুলকে বাইরে থেকে আসতে দেখে এবং বকুলের লজ্জায় লাল হওয়া দেখে নিশ্চিন্ত হয়–মেয়ে তার সুখী হয়েছে। বিধান চাকরি পেলে শ্যামার সুখী জীবন শুরু হয়। তারা কলকাতায় ঘর ভাড়া নেয়। আবার শ্যামার নিজের সংসার শুরু হয়। এরপর বিধান বিয়ে করলে। ছেলেবউ সুবর্ণকে শ্যামা সহ্য করতে পারে না। বাঙালি বেশিরভাগ পরিবারের এ এক চেনা চিত্র। শাশুড়ি ছেলের বউকে সহজভাবে মেনে নেয় না। শ্যামাও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। যৌবনবতী বউকে সে হিংসাও করে–নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অকারণে সুবর্ণকে গাল-মন্দ করে। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যতা। তিনি শ্যামাকে সমাজজীবনের রক্তমাংসের মানুষে আবদ্ধ রেখেছেন, 'মা'য়ের প্রতি কোনো আবেগ দ্বারা পরিচালিত হন নি। তবে শেষ পর্যন্ত শ্যামা সুবর্ণকে মেনে নেয়, যখন সুবর্ণ 'মা' হয়। অর্থাৎ মায়ের জন্য মায়ের হৃদয়াবেগকে লেখক দেখিয়েছেন। এর দ্বারা শ্যামার পরিপূর্ণ মাতৃত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে জননীর জন্য জননীর উদ্বেলিত হৃদয়কে অনেকবার তুলে ধরেছেন। রাখাল দ্বিতীয় বিয়ে করলে শ্যামা মন্দার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আহত, উত্তেজিত এবং বিষণ্ন হয়ে পড়ে। মন্দার জন্য তার চোখ ছলছল করে। শ্যামার ব্যথিত হৃদয়কে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড়ো বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্বেষ বোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদস্থ হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সবদিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?[৯]

এখানে শুধু শ্যামার জননী হৃদয়ই নয়, নারী হৃদয়ের ক্ষোভও প্রকাশ পায়। আবার শীতল শ্যামার টাকা চুরি করে বকুলকে নিয়ে পালিয়ে গেলে যখন শ্যামা দিশেহারা তখন সে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া বিরক্ত হলেও সে শ্যামাকে ফিরিয়ে দেয় না। জননীর উদারতা ধরা পড়ে এখানে :

> বিষ্ণুপ্রিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়াছে ভ্রু কুঁচকাইয়া একটু যেন বিরক্ত এবং রুষ্টও হইয়াছে, শেষে উঠিয়া গিয়া হাতের মুঠায় কী যেন আনিয়া শ্যামার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছে। কী লজ্জা তখন এ দুটি জননীর। চোখ তুলিয়া কেহ আর কারও মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই।[১০]

শ্যামা যখন মন্দার বাড়িতে আশ্রিত তখন সন্দেশ চুরির অভিযোগে মন্দা শ্যামাকে গাল-মন্দ করলে সুপ্রভা শ্যামার জন্য কষ্ট পায়। সে মন্দাকে বলে :

> অমন করে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী,–যে নিয়েছে, খাবার জিনিস নিয়েছে তো, বড়ো লজ্জা পাবে দিদি।[১১]

এখানে সুপ্রভার কোমল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দাও মা, কিন্তু সে গৃহিণী হয়ে মাতৃত্বকে উপেক্ষা করেছে। তাই শ্যামার অসহায় মাতৃত্ব তার সহানুভূতি পায় নি, কিন্তু সুপ্রভা শ্যামার মাতৃত্বের প্রতি মমতা প্রদর্শন করে। মা সন্তানের জন্য মঙ্গল কামনা করছেন, এবং এতে অনেক সময় নৈতিক অধঃপতন ঘটছে, সামাজিক মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হচ্ছে, স্বার্থপরতা হচ্ছে, এমনকি বিবেকহীনতাও হচ্ছে। তবু সন্তানের ভালোর জন্য মা উপায় খুঁজছেন। লেখক খুব সচেতনভাবেই দেখিয়েছেন মানবিক দোষ-গুণ মিলেই একজন 'মা'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *জননী* উপন্যাসে অনেকগুলো মা-কে দেখিয়েছেন। শ্যামা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মন্দা, সত্যভামা, সুপ্রভা, বকুল, সুবর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্যামার যখন প্রথম সন্তান হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া তখন গর্ভবতী। সে এসেছিল শ্যামার সন্তানকে দেখতে। তার প্রায় আগত মাতৃমন শ্যামাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হয়েছিল, তবে সে পিতার পাপের ছাপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েকে একমাত্র বাড়ির পুরনো ঝি ছাড়া আর কারো কোলে দেয় না, নিজেও নিয়ে কোথাও বের হয় না, ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃত্ব তাই অপূর্ণ থাকে। সে সাজগোজ করা বাদ দেয়, সন্তানের জন্য কষ্ট পেয়ে নিজেকেও বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হীরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলংকার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিন্যস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোনো সুগন্ধির ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।[১২]

লেখক স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন মাতৃত্ব কত প্রবল হতে পারে। সন্তানের জন্য শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে 'মা' ত্যাগ স্বীকার করে। বিষ্ণুপ্রিয়া বিত্তের অহংকারে সন্তানের খুঁত অস্বীকার করতে পারে নি। তাই বিসর্জন দিয়েছে আত্মসুখ। শ্যামার দ্বিতীয় পুত্র বিধান জন্মালে বিষ্ণুপ্রিয়া বিধারে জন্য জামা, তোয়ালে, পুরু ও নরম ফ্ল্যানেলের কাঁথা পাঠায়। সে শ্যামাকে আশ্বাস দেয়–তার মেয়ের কাপড়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না। অন্যদিকে শ্যামাও মা, সে বিষ্ণুপ্রিয়ার কষ্ট বুঝতে পারে, তাই মাতৃত্বের উদারতায় বলে :

> হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?[১৩]

বিষ্ণুপ্রিয়া ছোঁয়াছুঁয়ি না করেই বিধানের জন্য উপহার পাঠায়। বিধানের অসুখ হলে শ্যামার জন্য অনেক ব্যঞ্জন দিয়ে খাবার পাঠায়। দেখা যায় বিধানের প্রতিও সে মাতৃত্ব অনুভব করে। আস্তে আস্তে তার মেয়ে বড় হয়, সে স্কুলে যায়, তার পাপের ছাপের কথা ঢাকা পড়ে যায়। এর মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার আরেকটি মেয়ে হয়। সে আবার সাজগোজ করে, আবার আগের মতো সাবলীল হয়। শ্যামার সঙ্গে সে আর সখ্য রাখে না, করে অনুগ্রহ। তারপরও সে শ্যামার উপকার করে। নিজের খুড়তুতো বোনের ছেলে শঙ্করের

সঙ্গে এক স্কুলে বিধান ভর্তি করে দেয়, শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে করে বিধান স্কুলে যায়। তবে শীতলের টাকা চুরি করে জেলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া আর শ্যামার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। তাই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি হয়েই থাকে। মানিকের শ্রেণীবৈষম্য চিত্রায়নের সার্থকতা এখানেই। আবার, লেখক খুব নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন নিম্নবিত্ত সত্যভামার চিত্রও। সে শ্যামার বাড়ির ঠিকা ঝি। তার স্বামী নেই, তিন বাড়ি কাজ করে চারটি ছেলেমেয়ের আহার জোগায়। বিধানের অসুখ হলে ভীত শ্যামা তাকে থাকতে বলে, কিন্তু সত্যভামা থাকতে পারে না, মেয়েকে রেখে যায়। কারণ অন্য বাড়িতে কাজ না করলে তার ঘরে খাদ্য জুটবে না। মানুষ তার ভাগ্যের কাছে অসহায়। ইচ্ছে করলেই সে মানুষের উপকার করতে পারে না, অন্যের উপকারের চেয়ে নিজের সন্তানের মুখে খাদ্য জোগানো অনেক বড়, এমনকি অন্যের মৃত্যুতেও সে নির্লিপ্ত থাকতে পারে নিজের সন্তানের জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যভামার মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত মায়ের বোধকে তুলে ধরেছেন। লেখক এও দেখিয়েছেন যে তাদের মন উপকার করতে চায়, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে পারে না। তাই নিজে না থাকলেও মেয়েকে শ্যামার কাছে দিয়ে যায়। লেখকের আরেক সৃষ্টি মন্দা চরিত্রটি। সে তিন সন্তানের জননী। কিন্তু তার ছেলেদেরকে তার শাশুড়ি অধিকার করে রেখেছে, তার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বিধান হওয়ার সময় মন্দা তার ছেলেদের চুরি করে শ্যামার বাড়িতে নিয়ে আসে। যদিও সে শ্যামার সেবা করতে আসে, তবু ছেলেদের সেবা করেই তার দিন যায়। এ সম্পর্কে সে শ্যামাকে বলে :

> একটু চেনা হয়ে রইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবার ডাকলে-টাকলে একবার দুবার আসবে।[১৪]

বোঝা যায় সন্তানের জন্য মায়ের বুভুক্ষু হৃদয়। ছেলেদেরকে ভালোবেসে, আদরযত্ন করে সে সুখ অনুভব করে। মন্দার স্বামী রাখাল দ্বিতীয় বিয়ে করলে মন্দা সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে সতীনকে মেনে নেয়। শাশুড়ি থাকতে সে সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকে, আর শাশুড়ি মারা গেলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে স্বামী থেকে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিত মন্দা তাই সংসারের সুখ-দুঃখে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। শ্যামা যখন তার আশ্রয়ে যায়, তখন শ্যামার ছেলেমেয়েদেরকে সে সহ্য করতে পারে না। শ্যামাকে সে ছেলেমেয়েদের জন্য বারবার অপমান করে। শ্যামা বিধানের জন্য একটু সন্দেশ নিলে সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলেছে :

> সন্দেশ করে পাথরের বাটি ভরে রাখলাম বাটি অর্ধেক হল কী করে? এ কাজ মানুষের, বড়ো মানুষের,[১৫]

শুধু তাই নয়, শ্যামাকে শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয় এবং নানা উপলক্ষে মন্দা সে টাকা নিয়ে নিয়ে শ্যামাকে নিঃস্ব করে ফেলে। মন্দা সংসারে বঞ্চিত নারী, তাই ভাইয়ের সন্তানদেরও সে আপন করতে পারে না। সামাজিক বঞ্চনাই তাকে এরূপ বিকৃতিতে নিয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মাতৃত্বের অন্য রূপটি স্পষ্ট করেছেন। দেখিয়েছেন, 'মা' কোনো ঐশ্বরিক বিষয় নয়, ভালো-মন্দ মিলিয়ে জাগতিক মানুষ। জগতের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-প্রেম-বিরহ-মান-অভিমান-হীনতা-নীচুতা সকল কিছুই তার মধ্যে প্রতীয়মান। তাই শ্যামা চুরি করতে দ্বিধা করে না, আবার মন্দা তা নিয়ে কটূক্তি করতেও দ্বিধা করে না। আবার শীতলের দোষে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্যামাকে অপমান করে, তার মাতৃহৃদয় বিধানের জন্য স্নেহপ্রবণ হয় না। লেখক দেখিয়েছেন 'মা'

মানেই স্নেহময়ী-মমতাময়ী নয়–সংসারের যে কোনো মানুষের মতো সেও রূঢ় আচরণ করতে পারে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই 'মা' সমাজে প্রতীয়মান হয়। মন্দার সতিন সুপ্রভা। সেও একজন 'মা'। মন্দার বিপরীত চরিত্র সে। সংসারের কোনো কর্তৃত্ব তার নেই বলে শ্যামা এবং তার সন্তানদের যতটা পারে সাহায্য করে, ভালোবেসে নিজের সত্তা বজায় রাখে। শ্যামার মেয়ে বকুলও মা হয়, তবে সে শ্যামারই দ্বিতীয় সংস্করণ। উপন্যাস শেষ হয়েছে বিধানের স্ত্রী সুবর্ণের 'মা' হওয়ার মধ্য দিয়ে। লেখক এতোগুলো 'মা'কে উপস্থাপন করে 'জননী'–বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন :

> ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।[১৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে সমাজের সামগ্রিকবোধকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। *জননী* উপন্যাসের প্রথম লাইন এরকম :

> সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রথমবার মা হইল।[১৭]

এখানে পুরুষের বহু বিবাহের কথা স্পষ্ট হয়েছে এবং অনেক নারীই যে বিলম্বে মাতৃত্বপ্রাপ্ত হয় তা-ও প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামা এবং শীতল নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক শীতলের দ্বারা শ্যামার নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, শ্যামার মামার সম্পত্তির লোভেই শীতল শ্যামাকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরই শ্যামা বুঝতে পারে– শীতল ছিটগ্রস্ত। শীতলের নেশারও কোনো সময়-অসময় নেই, তার কাছে শ্যামার ত্রুটিরও মার্জনা নেই। বোঝা যায় শ্যামার অসহায়তা। শীতল পুরুষ বলেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে এবং নারীর মূল্য এতোই কম যে সম্পত্তির কারণেই শীতল তাকে বিয়ে করে, সম্পত্তি না থাকলে শ্যামাকে সে বিয়ে করতো না। অথচ, শ্যামারই শীতলকে বিয়ে না করা উচিত কারণ, শীতল একবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু নারী নিজের মতানুযায়ী জীবনযাপন করতে অক্ষম। সমাজব্যবস্থার এ অসংলগ্নতা মানিককে পীড়া দিয়েছে, সঙ্গত কারণেই তিনি উপন্যাসে এ ঘটনার অবতারণা করেছেন। যদিও উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে শীতলের দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টির কোনো সংযোগ নেই– শ্যামা প্রথম স্ত্রী হলেও কাহিনীর কোনো হেরফের ঘটতো না। এরপর রাখালের চরিত্রও সমাজে পুরুষ চরিত্রের অনন্য উদাহরণ। লেখক জানিয়েছেন :

> যতই আপনার হইয়া উঠুক, রাখালকে শ্যামা একফোঁটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শরীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না শয়তানের কোনোদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা রাখে না।[১৮]

বিয়ের পর শ্যামা বাড়িতে এসে অসুস্থ ননদ মন্দাকে পায়। মন্দার স্বামী রাখাল। এই রাখালের সাহায্যেই শ্যামা নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল এবং মন্দা পাঁচ-ছয় মাস শীতলের শহরতলীর বাড়িতে ছিল। এ সময় শ্যামা রাখালের সাহায্য-সহানুভূতিতে সুখের দিন অতিবাহিত করে। সে সময়মত স্নানাহার করে কি-না রাখাল সে লক্ষ রাখতো, হাসি-তামাশায় তার বিষণ্নতা দূর করতো, তার বয়সোচিত ছেলেমানুষীকে সমর্থন করতো, তার কোনো ত্রুটি শীতলের

কাছে ধরা পড়লে রাখাল সে ত্রুটির দায় নিজের কাঁধে নিতো। আবার শীতল যেন রাখালকে নিয়ে শ্যামাকে সন্দেহ না করে, তার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতো। তবে শ্যামার ইচ্ছে থাকলেও রাখাল শ্যামাকে স্নেহের প্রত্যাশা মেটাতো না। এখানে রাখাল সততার পরিচয় দেয়, কিন্তু সে দ্বিতীয় বিয়ে করে মন্দার কাছে সৎ থাকতে পারে না, বরং স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আবার শীতল জেলে গেলে শ্যামার বিপদের সময়, শ্যামার সঙ্গে যে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল সে কথা ভুলে যায়। শ্যামার পাওনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে, তার পয়সা নেই বলে দাবি করে। একেবারে নিরুপায় হয়ে শ্যামা যখন রাখালের বাড়ি আশ্রয় নিতে যায়, তখন সে বুঝতে পারে রাখাল দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত নয়, সে ধনী। শ্যামার চিন্তায় রাখালের স্বরূপ এবং নারীর অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> অনেক অভিজ্ঞতা দিয়া শ্যামা এখন বুঝিতে পারিয়াছে রাখাল একা নয়, এমনই জগৎ। এমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না জানিলে, ছল ও প্রবঞ্চনায় এমন দক্ষতা না জন্মিলে, সকালে উঠিয়া দশ-বিশটি খাতকের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের হয় না। রাখালের দোষ নাই। মানুষের মাঝে মানুষের মতো মাথা উঁচু করিবার একটিমাত্র যে পন্থা আছে তাই সে বাছিয়া নিয়াছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নয়, বিবাগি সন্ন্যাসী নয়, সে সংসারী মানুষ, সংসারে দশজনে যেভাবে আত্মোন্নতি করে সেও তেমনিভাবে অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছে।

শ্যামা সব জানে। বড়োলোক হইবার সমস্ত কলাকৌশল, কেবল স্ত্রীলোক করিয়া ভগবান তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে।[১১]

রাখাল জানে যে শ্যামা তার বাড়িতে দাসীর মতো খাটছে, কিন্তু সে উদার হতে পারে না, তাই শ্যামাকে বন্ধু বা আত্মীয়ের কোনো মর্যাদাই দেয় না। সমাজে উচ্চবিত্ত শ্রেণী আত্মীয়-বন্ধু সকলকে অস্বীকার করেই বিত্তবান হয়। আবার এদের সংসার জীবনও খুব সুখের হয় না। দেখা যায় মন্দা বধূজীবন ভুলে গৃহিণী হয়, অন্যদিকে সুপ্রভার কোনো কর্তৃত্ব নেই–শুধু বধূজীবন নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এবং সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে রাখাল দুপক্ষকেই বাঁচিয়ে জীবনযাপন করে। এ সংসারে অনেক দাস-দাসী, অনেক আত্মীয়-অনাত্মীয় আশ্রিত আছে, কিন্তু কেউ সন্তুষ্ট নয়। গ্রামের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে লেখক এই সংসারের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শহরতলীর উচ্চবিত্ত সংসার বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মহিম তালুকদারের। এ সংসারেও দাস-দাসী আছে, কিন্তু তদের প্রথম সন্তান পাপের ছাপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। উপন্যাসে শহরতলীতে কনকের সংসারের চিত্র পাওয়া যায়–মধ্যবিত্ত কেরানির সংসার। কনক অনেক গুছিয়ে, হিসাব করে সংসার চালায়। তাদের স্বামী-স্ত্রীতে হৃদ্যতা আছে, আবার সংসারও সচ্ছল। কলকাতা শহরে নার্স সরযূর সংসার একটি সাংস্কৃতিক পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। সরযূর বড় মেয়ে বিভা স্কুলে গানের শিক্ষক। তারা বাড়িতে মা-বাবা-মেয়ে মিলে আনন্দ করে, তাস খেলে, গান গায় আবার সপ্তাহান্তে সিনেমায় যায়। বকুল এবং মোহিনীর সংসারের চিত্র আবার অন্যরকম। কষ্টকে আড়াল করে বকুলের সংসার করা বাঙালি পরিবারগুলোর প্রায় প্রতি ঘরের কাহিনী। বকুলের ভালোবাসা এবং আগ্রহ ছিল শঙ্করের প্রতি। কিন্তু উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মিলন হয় না। তাই শ্যামা তাকে বিয়ে দিলো পোস্টঅফিসের চাকুরে মোহিনীর সঙ্গে, সে বেতন পায় পঞ্চাশ টাকা। বকুলকে মোহিনী গ্রামে রাখে আর নিজে কলকাতার মেসে থাকে। মোহিনীর পিসি

অনেক টাকা এবং বিষয়সম্পত্তির মালিক, তাই তাদের সংসারের সমস্ত আচার-আচরণ পিসির কথামত চলে। তাই ইচ্ছে করলেই বকুল মায়ের কাছে এসে থাকতে পারে না, এমনকি মোহিনীর গতিবিধিও এই পিসি নিয়ন্ত্রণ করে। এতোগুলো সংসারের চালচিত্র পর্যালোচনা করে বলা যায়, এ দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা, আচার-আচরণ, সূক্ষ্মবোধ, সংস্কার-বিশ্বাস কোনো কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। লেখক শ্যামার মামা তারাশঙ্করের চিত্র এঁকে সমাজের সন্ন্যাসবোধ এবং ফ্রয়েডীয় যৌনবোধকে তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্কর বিয়ে না করে সন্ন্যাস জীবনযাপন করতো। শ্যামার বিয়ের পরপরই তার মাথায় কী গোলমাল দেখা দিলো, সে জলের দামে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গ্রামের এক বনেদি ঘরের বিধবা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। এরপর শ্যামা যখন চার সন্তানের জননী, তখন সে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে এলো শ্যামার বাড়িতে। শ্যামা এবং শীতলের ধারণা ছিল তারাশঙ্কর অনেক টাকা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে কিছুই আনে নি, বরং শ্যামার হাজার টাকা নষ্ট করে সে শ্যামার কাছে বিদায় নিলো। যাওয়ার সময় শ্যামাকে বললো :

> কিছু মনে করিস নে শ্যামা, তোর সেই হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলেছি,–শ দেড়েক মোটে আছে, নে। বুড়ো মামাকে শাপ দিসনে মা, একটি টাকা মোটে আমি সঙ্গে নিলাম।[২০]

এই হলো তারাশঙ্করের পরিচয়। সে সন্ন্যাসীও থাকতে পারে নি, আবার গৃহীও হতে পারে নি। সমাজে কিছু মানুষ এমন স্ববিরোধী, নানা কর্মে ব্যাপ্ত থাকে, একটি রহস্যের আবরণে তাদের জীবন ঢাকা থাকে। তাও ঠিক স্বাভাবিক নয়। *জননী*তে তাই তারাশঙ্করের চরিত্র আনয়ন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজজীবনের পূর্ণাঙ্গতা এনেছেন। আরো একটি চরিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন–হারান ডাক্তারের চরিত্র। বাস্তবজীবনে এরূপ চরিত্রও কিছু কিছু পাওয়া যায়। হারান ডাক্তারও রহস্যে ঘেরা– সে গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী। পেশা যেহেতু ডাক্তারি তাই মানুষের সেবা সে অনায়াসে করতে পারে। শিশু বিধান অসুস্থ হলে শ্যামা হারান ডাক্তারকে ডাকে। এ সময়ই প্রথম তার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার হিসেবে তার সার্থকতার প্রমাণ মেলে নিচের উদ্ধৃতিতে :

> জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার, – মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুশিই হয়।[২১]

এর পর থেকে শ্যামার বাড়ির স্থায়ী ডাক্তার হয় হারান। কখনও শ্যামা তাকে ভিজিট দিতে পারে, কখনও পারে না। হারানের একে কোনো ভাবান্তর ঘটে না। শ্যামার ভেতরে সে তার মেয়ে সুখময়ীকে খুঁজে পায় আর বকুলের ভেতরে সুখময়ীর মেয়েকে। তাই সে শ্যামার বাড়িতে আসার জন্য ছটফট করে, কারণে-অকারণে আসেও। কিন্তু সে তাদের ভালো বাসে কি-না বোঝা যায় না। লেখক বলেছেন :

> ওরা তুচ্ছ, ওরা হারানের কেউ নয়, হারান পুলকিত হয় শ্যামার কণ্ঠ ও কথা বলার ভঙ্গিতে,– শ্যামার চলন দেখিয়া, বকুলের দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হারানের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি,– শ্যামার উচ্চারিত শব্দ ও কয়েকটি ভঙ্গিমায় এবং বকুলের প্রাণের প্রাচুর্যে,–মানুষ দুটিকে হারান কখনও ভালোবাসে নাই; শোকে যে এমন জীর্ণ হইয়াছে সে কবে রক্তমাংসের মানুষকে ভালোবাসিতে পারিয়াছে?[২২]

শ্যামা তাই হারানের কাছে কোনো দাবি করতে পারে না, ভিজিট দিতে না পারলে কেঁদে ফেলে। তবে হারান তাদের উপকার করে, হয়তো নিজের খেয়ালেই করে।

শীতল জেলে গেলে বারো টাকা ভাড়ায় শ্যামার একতলায় ভাড়াটে এনে দেয়, শ্যামারা বনগাঁ চলে গেলে শ্যামার বাড়িতে ভাড়াটে না থাকলেও হারান ভাড়ার টাকার ছুতায় মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠায়। আবার শীতল জেল থেকে ছাড়া পেলে অসুস্থ শীতলের সঙ্গে বনগাঁ আসে। বকুলের সঙ্গে সে ঢেঁকিঘরে বসে গল্প করে। কিন্তু হারানের দুর্বলতা কখনও ধরা পড়ে না। সে অনুগ্রহ করে, সাহায্য করে, কিন্তু তার মুখে কোনো আবেগ ধরা পড়ে না। শ্যামা তাকে আবেগাপ্লুতভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেও সে কোনো জবাব দেয় না। হারান নিঃস্বার্থ পরোপকারী হিসেবেই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত প্রতীয়মান হয়। শীতল চরিত্রটি সমাজে পুরুষ প্রতিনিধির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেখা যায়, শ্যামাকে বিয়ে করার পর সে স্ত্রীর প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করে না। সে বহির্মুখী, মদ এবং নারীর নেশায় মত্ত থাকে। বিধানের জন্মের পর বাইরের নারী আসক্তি কমে ঠিকই কিন্তু শ্যামার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এমনকি বিধানও তাকে নিয়ে উপহাস করে। শীতলের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বকুলের সঙ্গে। বকুল পিতাকে ভালোবাসে। শীতল জেলে গেলে একমাত্র বকুলই তার জন্য কাঁদে। জেল থেকে বের হলে শীতল অনেক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার ভেতরের পৌরুষের উগ্র স্বভাব যায় না। তাই শ্যামা যখন তাকে উপার্জনের কথা বলে তখন সে নির্দ্বিধায় বাড়ির কথা বলে : বাড়ি বিক্রির টাকায় এতোদিন সংসার চলেছে, বাড়িটি শীতলের, তার মানে পরোক্ষভাবে শীতলই সংসার চালিয়েছে। শ্যামার হাড়ভাঙা খাটুনির কোনো মূল্য শীতলের কাছে নেই। পুরুষ চরিত্রের স্বার্থপরতা মানিক খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে শিশু চরিত্রগুলোও লেখকের দক্ষতা প্রমাণ করে। শিশুবিধান মা-বাবাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তোলে। আবার তার মধ্যে উদ্ভট কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সে যেমন পোষা প্রাণীকে ভালোবাসে তেমন নিষ্ঠুর আচরণও করে। এছাড়া শিশু অবস্থায়ই তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ দেখা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়ার আচরণে সে অপমানিত বোধ করে, তাই শঙ্করের সঙ্গে দার্জেলিং যায় না, লেখাপড়া করে বড় হয়ে শঙ্করদের মতো গাড়ি কেনার ইচ্ছে পোষণ করে। বকুলের শিশুকালও অদ্ভুত রকমের। সে জেদি এবং একরোখা। সে তার বাবাকে ভালোবাসে, কিন্তু শীতল যখন জেল থেকে ছাড়া পায়, তখন আর বাবার কাছে ঘেঁষে না।–এ তার অভিমান। শিশু বকুল আরেকজনের সঙ্গে অভিমান করেছিল, সে শঙ্কর। তার শিশু মন বোঝে না যে উচ্চবিত্ত শঙ্করের সঙ্গে তার অভিমান চলে না। শিশু শঙ্করকেও মানিক চিত্রায়িত করেছেন শিশুসুলভভাবে। বড়দের মান-সম্মান বা অভিযোগ-অপমান সে বোঝে না। তাই সে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও বিধানদের বাড়ি আসে, শ্যামাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের সমালোচনা :

> *জননীতে* এমন একটি সংসারের আলেখ্য পাই যার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকমনে কোন সংশয় দেখা দেয় না।[২৩]

বাড়ি এবং তার পরিবেশের বর্ণনায় মানুষের জীবনধারার প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়। *জননী* উপন্যাসে শহর, শহরতলী এবং গ্রাম তিনটি পরিবেশের বর্ণনা আছে। বিয়ে হয়ে শ্যামা এসেছিল শীতলের শহরতলীর বাড়ি। শহরের মতো অতটা ঘিঞ্জি নয় ইটের অরণ্যের মধ্যে দু'একটি গাছ, যেন ছেলেভোলানো পার্ক। প্রতিবেশী থেকেও নেই। সবাই ঘরের কোণে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। শীতল জেলে যাওয়ার পর শ্যামার সংসার সংকীর্ণ হয়ে আসে। একতলাটা সে ভাড়া দেয়। শ্যামার সংগ্রাম সকল অবস্থায় :

> দোতলার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ, জিনিসপত্রসহ সে বাস করিত ঘরে, রাঁধিত ছাদে, একখানা করোগেটেড টিনের নিচে।[২৪]

মন্দার বাড়িটি গ্রামে। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় মেশামেশি। প্রকাণ্ড অঙ্গন, বাগান, পুকুর, ধুলাবালি, খেলার সাথী, প্রতিবেশী সব মিলে জীবনের জয়জয়কার। মন্দার বাড়ির বর্ণনায় ধরা পরে তারা গ্রাম্য ধনী পরিবার :

> বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘাপরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দু'হাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত টিনের দেয়াল ও শনের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোশ একত্র করিয়া তার উপরে শতরঞ্জি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। [... ... ...] অনেকটা উকিল-মোক্তারের কাছারি ঘরের মতো তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পরেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটো বড়ো বড়ো ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আট-দশটি ছোটবড়ো টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়।[২৫]

বিধানের ভাড়া করা বাড়িটি ছিল কলকাতায়। ঘিঞ্জি এলাকা। মানুষের গাদাগাদি, একজনের সঙ্গে অন্যের হিংসা-দ্বেষ, ভদ্রতার খোলস, সরযূর পরিবার দেখিয়ে লেখক এখানে একটি সাংস্কৃতিক পরিবারও এঁকেছেন। এ পরিবারে বাবা-মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু। আনন্দ-উল্লাসে ওদের দিন কাটে, সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, চারজন মিলে তাস খেলে, একসঙ্গে সিনেমায় যায়। এই হলো শহরের চিত্র। এই বাড়িটি দোতলা :

> দোতলার মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান, প্রত্যেক ভাগে দুখানা ঘর। রান্নার জন্য ছাদে দুটি ছোট ছোট টিনের চালা। শ্যামারা থাকে দোতলার সামনের অংশটাতে, রাস্তার উপর ছোট একটু বারান্দা আছে।[২৬]

সমাজের সমগ্রতাকে আঁকতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন পেশা দেখিয়েছেন। যেমন, শীতল প্রথমে প্রেসের মালিক থাকে, তারপর প্রেস বিক্রি করে দিয়ে অন্যের প্রেসের ম্যানেজার হয়, রাখাল চাকরি করে, হারান ডাক্তারি করে, বিধান ব্যাংকে চাকরি নেয়, সরযূ নার্স, বিভা স্কুলের শিক্ষক, কনকের স্বামী কেরানি, শামু ছাত্রী, শ্যামা-মন্দা-বিষ্ণুপ্রিয়া-কনক গৃহিণী। উপন্যাসে আমরা বিনোদনের বিভিন্ন দিক দেখি। শীতল বন্ধুদের নিয়ে থিয়েটার দেখতো, মন্দারা বেড়াতে আসলে তারা দুই পরিবার মিলে থিয়েটার দেখতে যায়, সরযূর পরিবার গানবাজনা দিয়ে ব্যস্ত থাকে, উচ্চবিত্ত বিষ্ণুপ্রিয়ারা চেঞ্জে যায়। ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবও জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উপন্যাসে বড়দিন, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। সামাজিক উৎসব হিসেবে উল্লেখ আছে বিধানের বিয়ের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। বলা চলে উপন্যাসের পরিপূর্ণতার যুগেই মানিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন। উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো :

> নিত্যনতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।[২৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ঘোষণা দিয়েছেন নতুন চেতনায় উপন্যাস লেখার, তাঁর লেখায় তা প্রতিফলিতও হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক লেখকরা সমাজে

এবং সাহিত্যে নারীর অবদানের কথা বলেছেন, কিন্তু নারীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখতে কুণ্ঠিত ছিলেন, যদিও *শেষের কবিতায়* লাবণ্য মুখ্য কিন্তু অমিতই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ধরা দিয়েছে। অন্যদিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাসেই নারীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখেছেন। তাই শ্যামার ভেতরে ফুটে উঠেছে বাঙালি সমাজের চিরন্তন মাতৃরূপ। উপন্যাস সামগ্রিকতার প্রকাশ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

জীবনের গোটা রূপ উপন্যাসকারের ধ্যেয়।[২৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। পিতার বদলির চাকরির কারণে শিশুবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আবার নিজে ছিলেন ডানপিটে, নিজেদের বৃত্তের বাইরে সকল শ্রেণীর সঙ্গে তিনি মিশতেন, সঙ্গত কারণে সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা জন্মে যায়। পরবর্তীতে তিনি তা তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস বাস্তবের দর্পণ – এখানে আবেগের স্থান নেই। তিনি নির্লিপ্তভাবে জীবনকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য :

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সবকিছুকে, সকল মূল্যবোধকে যাচাই করে দেখার সূচনা হল মানিকের উপন্যাস।[২৯]

বিষয়ের ক্ষেত্রে *জননী* যেমন অভিনব, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তেমনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর বর্ণনারীতি উপন্যাসকে সুখপাঠ্য করেছে, ভাষা ব্যবহার সুনিপুণ, রচনাভঙ্গি ব্যঙ্গাত্মক। শ্যামার বধূজীবনের বিষাদময় পরিস্থিতি লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন–

যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ি একটু আপসোস করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল ওটা ফোড়ার দাগ, ছড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাতির ডগাতেও নয়। ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারি।

তরকারি সে আজও কোটে। সুখে-দুঃখে জীবনটা অমনই হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারি থাকার মতো চলনসই।[৩০]

এই বর্ণনা পড়ে পাঠক ক্লান্ত হয় না, বরং শব্দের দোলায় দুলতে থাকে এবং তার চোখের সামনে দৃশ্যকল্প ফুটে ওঠে। এখানে শীতলকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে সমাজের কাপুরুষোচিত সকলকেই লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। আবার বকুল এবং শঙ্করের বিয়ের বিষয়ে শ্রেণীবৈষম্যকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন এভাবে :

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।[৩১]

এখানে বর্ণনাটি নাটকীয় এবং মূল কথা ব্যঙ্গাত্মক। লেখক প্রতিটি শব্দ অতি সতর্কতায় নির্বাচন করেছেন। তাঁর বর্ণনা বা সংলাপ কোনোটাই তাই বাহুল্য মনে হয় না। এখানে কোনো আবেগ বা ভাবালুতা নেই। সমাজকে প্রকাশ করেছেন সহজ-সাবলীলভাবে। সৈয়দ আজিজুল হক মানিকের রচনা সম্পর্কে বলেছেন :

বিজ্ঞানমনস্কতা, বস্তুবাদী স্বচ্ছদৃষ্টি, ভাবালুতামুক্ত মনোভঙ্গি ও সমাজসতর্কতা প্রভৃতির নিবিড় সহযোগেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও জীবনাচরণে ছিলেন

সর্বাংশে আধুনিক। সাহিত্যের বিষয়চিন্তা, উপকরণ-আহরণ, গঠনশৈলী ও অলংকারসজ্জা– সর্বত্রই তাঁর এই আধুনিকচেতনার পরিচয় স্পষ্ট।[৩২]

বস্তুত, উপন্যাসের বিষয় এবং আঙ্গিক বিশ্লেষণে মানিকের এই আধুনিক চেতনা অন্য লেখকদের তুলনায় স্বতন্ত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞাননির্ভর লেখক, প্রতিটি শ্রেণীর সূক্ষ্ম রূপকার, তবে অসহায়-বিপন্ন মানুষের প্রতি দরদী। তাঁর প্রতিটি লেখা সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। *জননী*তে দেখা যায় প্রতিটি শ্রেণীকে তিনি স্ববৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্যামা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। লেখক দেখিয়েছেন, সে একা তার সংসার টিকিয়ে রেখেছে। মানিকের লেখার মূল কথা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা। চলার পথে যত বাধা-বিপত্তি আসুক মানুষ সংগ্রাম করছে, টিকে থাকছে। জীবনের একটি পথ বন্ধ হলে, মানুষ আরেকটি পথের সন্ধান করছে। জীবনে টিকে থাকাই তাঁর কাছে বড় কথা। এবং সমাজজীবনে মানুষ প্রকৃতির কাছে বড় অসহায়, তাই হার না মেনে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর আরাধ্য। শ্যামা এগিয়েছে। এবং সে সংসারে থেকেই, বিরুদ্ধ পরিবেশে জীবনযাপন করেই পথ চলেছে। আবার তার মাতৃত্বে নারী জীবনও বিলীন হয় নি। তাই শেষ বয়সে সে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শ্যামা তাই একাধারে জননী এবং নারী। মানিক প্রথমেই বলেছেন, জননীর জীবন মিথ্যে করে দেবেন না। শ্যামার জীবন মিথ্যে হয়ে যায় নি। মানিক উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রকে তাদের স্বস্থানে স্ব-স্বভাবে অঙ্কন করেছেন, চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছেন। সঙ্গত কারণে *জননী*তে সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা অঙ্কিত হয়েছে। তাই *জননী*র কাহিনী বাঙালি পরিবারের একান্ত নিজের-চেনা কাহিনী।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, *লেখকের কথা*, ১৯৯৪, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪
৩. প্রাগুক্ত
৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থ পরিচয়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৯৩
৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *জননী*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩
৭. ম্যাক্সিম গোর্কি, *মা*, ১৯৯৬, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা–৩৬
৮. শওকত ওসমান, *জননী*, ২০০৩, সময় প্রকাশন, ঢাকা,পৃষ্ঠা-২০৫
৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০
১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১
১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭
১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০
১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩
১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭
১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮১

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩
২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬
২৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭*, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৮
২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০
২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮১
২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪
২৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের ধারা, লেখকের কথা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭
২৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*,২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩
২৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪
৩০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮
৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪
৩২. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৯

বাংলাদেশে মানিক-বিবেচনা

মাহবুবুল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে প্রথম সাড়া জাগান *বিচিত্রা* পত্রিকায় 'অতসীমামী' গল্প প্রকাশিত হলে (১৯২৮)। সাতাশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৬)। বাংলা সাহিত্যের সেরা উপন্যাসের তালিকায় স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু পদ্মানদীর তীরবর্তী জেলেজীবন। এই উপন্যাসেই প্রথম সংলাপ রচনায় পূর্ব বাংলার উপভাষার আদ্যন্ত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির ভাঙা-গড়ার খেলায় পর্যুদস্ত এবং সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের শোষণ-বঞ্চনার শিকার জেলে সম্প্রদায়ের সংগ্রামশীল জীবনের বিশদ ছবি ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। সেই সঙ্গে তাদের অসহায়তা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস, তাদের ভালোবাসা ও রিরংসার অসাধারণ রূপায়ণও এখানে লক্ষণীয়।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তরুণ ডাক্তার শশীর একক সংগ্রামের কাহিনী। আপাত-বাস্তবতার আড়ালে এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার, চিন্তার সঙ্গে আচরণের অসামঞ্জস্যকে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায় তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। উপন্যাসে প্রেম ও যৌনতা এবং ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বিষয়ে মননশীল জিজ্ঞাসু মনের সন্ধানী আলো ফেলা হয়েছে। আর এসব অবলোকন করা হয়েছে রোমান্টিক আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প– দু-ধরনের লেখাতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সমকালীন বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর রয়েছে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। মানবমনের গভীর তলের বিচিত্র নানা অনুভব, গূঢ় ও জটিল যৌন-প্রবৃত্তি, আদিম জৈবিক তাড়না ইত্যাদির অভিব্যক্তিময় রূপায়ণ তাঁর কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। সেই সঙ্গে আছে অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত মার্কসীয় সাহিত্যবোধে প্রাণিত শৈল্পিক চেতনায় সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের টানাপড়েনের কুশল রূপায়ণ। এ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের দোলাচল জীবনের কৃত্রিমতা পরিহার করে শ্রমজীবী ও নিম্নবর্গের মানুষের মুক্ত জীবনের প্রতি এক ধরনের নস্টালজিক আকর্ষণও সেখানে লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, মানব-মনের জটিল ক্রিয়াকলাপ ও মানব-ভাগ্যের কঠিন বেড়াজালের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে অবলোকন করেছেন তিনি।

দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানি আমলে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় এই অসাধারণ কথাসাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়ের গণ্ডি ছিল অত্যন্ত সীমিত। বস্তুত, তখন কেবল মার্কসীয় মতাদর্শের অনুসারী ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মহলের মধ্যেই

প্রধানত মানিকের পাঠককুল সীমিত ছিল এবং এঁদের কাছেই মূলত তাঁর গল্প-উপন্যাস সমাদৃত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তখন লেখালেখিও হয়েছে খুবই সামান্য। সে সময়ে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মানিকের লেখা পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের মানিক-চর্চার এই নিষ্ফলা পটভূমিতে স্বাধীন বাংলাদেশে মানিক-চর্চার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সচেতন ও অগ্রসর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন ভূইয়া ইকবাল। ১৯৭৫-এ তিনি *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বারোটি প্রবন্ধ সংবলিত এই উল্লেখযোগ্য সংকলন বর্ণমিছিল থেকে প্রকাশ করেছিলেন তাজুল ইসলাম। সংকলিত বারোটি লেখাই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-রচয়িতাদের মধ্যে এগারোজনই ছিলেন বাংলাদেশের।

সংকলিত বারোটি প্রবন্ধের মধ্যে আবুল ফজলের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লেখাটি ছিল একটি বেতার কথিকা। পাকিস্তান আমলে রেডিও পাকিস্তানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে চট্টগ্রাম বেতার থেকে আবুল ফজলের কথিকাটি প্রচারিত হয়। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ভূইয়া ইকবাল লেখাটি সংকলন করেন বলে জানিয়েছেন। এ প্রবন্ধে আবুল ফজল *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে মানিককে মানব বাস্তবতাবাদের সফল শিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি' প্রবন্ধটি ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় পঠিত হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রথম মাঝি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে এবং দ্বিতীয় মাঝি হিসেবে মানিককে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে অবলোকন করেছেন প্রকৃতির পটভূমিতে আর মানিক মানুষের প্রবৃত্তিকে সন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয়তার মতো করেই। বশীর আল হেলাল 'উত্তরকালের গল্প' প্রবন্ধে মানিকের ছোটগল্পের কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 'মানিক উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র' প্রবন্ধে আহমদ রফিক এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মানিকের উপন্যাসে কেবল গ্রামজীবনের স্থানিক বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরা হয় নি, গ্রামজীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে মুক্ত করে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'পুতুলনাচ ও পদ্মানদী' প্রবন্ধে অধ্যাত্মবাদে পরিপোষকতার পরিবর্তে মানিকের বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টির স্বরূপকে প্রতিভাত করেছেন। সরদার ফজলুল করিমের 'চেতনায় অনন্য শিল্পী' প্রবন্ধে মানিকের মধ্যে দেখা হয়েছে চিন্তা ও কর্মে শ্রেণিসচেতন, আত্মবিশ্লেষণপ্রবণ ও দায়িত্বশীল এক স্বতন্ত্র শিল্পীকে। মনসুর মুসা তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ঘটনা ও চরিত্রের দ্বন্দ্বের সঙ্গে বক্র বক্তব্যের দ্বন্দ্ব মানিকের উপন্যাসের আকর্ষণীয় গুণ। আহমেদ হুমায়ুনের লেখাটি এ গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'অবিস্মরণীয় আগন্তুক' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে মানিকের স্বতন্ত্র, অভিনব ও অনন্য অবস্থানকে তুলে ধরে তাঁকে 'চিরকালের আগন্তুক' সাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছেন। মাহমুদ শাহ কোরেশী তাঁর '*অহিংসা* : অস্তিত্বের সমস্যা' প্রবন্ধে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, *অহিংসা* উপন্যাসে মানিকের জীবন-জিজ্ঞাসা নব-আবিষ্কৃত মানবসত্যের আলোকাভাস-মণ্ডিত। আবুল মোমেনের 'তাঁর সিসিফাসদ্বয়' শীর্ষক আলোচনায় মানিকের অঙ্কিত চরিত্রে সিসিফাসের পরিণতিকে লক্ষ করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'শব্দমদের বিরুদ্ধে' প্রবন্ধে মানিকের কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, কবিতার ভাব

ও রূপ নির্মাণে সমকালীন শব্দবিলাসীদের শব্দমদের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা এক সাহসী অভিযাত্রা। বারোজন প্রবন্ধকারের মধ্যে কেবল সরোজমোহন মিত্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত গবেষণা করে প্রথম পিএইচ. ডি. উপাধি পান। সম্পাদক ভূইয়া ইকবালের অনুরোধে তিনি আলাদাভাবে ঐ সংকলনের জন্য 'জীবন ও সাহিত্যকৃতি' শিরোনামের প্রবন্ধটি রচনা করে দিয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলন গ্রন্থটির শেষ প্রচ্ছদের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্কেচ আঁকার কথা ছিল শিল্পী রশিদ চৌধুরীর। স্কেচ-শিল্পী হিসেবে তাঁর নামও মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রশীদ চৌধুরী স্কেচ আঁকার জন্য সময় দিতে পারেন নি বলে তাঁর বদলে প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তাঁর ফরাসি স্ত্রী আন। সংকলনটি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের হুমায়ূন কবির স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে।

১৯৯১ সালে এ বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় মুক্তধারা, ঢাকা থেকে। তখন বইটি কোনোরকম সংযোজন-সংশোধন ছাড়াই হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* সংকলনটির দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে ২০০১ সালে। পরিবর্ধিত এই সংস্করণে আগের বারোটি লেখা ছাড়াও আরও ষোলোটি রচনা সংযোজিত হয়। নতুন সংযোজিত এই ষোলোটি প্রবন্ধের মধ্যে বারোটি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের এবং সেগুলো সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে : নবনীতা দেবসেনের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ', সুমিতা চক্রবর্তীর 'গাওদিয়া গ্রামের শশী ডাক্তার', এবং 'হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত', যুগান্তর চক্রবর্তীর '*দিবারাত্রির কাব্য* : একটি উপন্যাসের জন্ম', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনের সাংকেতিকতা ও অদ্ভুত সমস্যার আরোপ', কার্তিক লাহিড়ীর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস', অচ্যুত গোস্বামীর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', অশ্রুকুমার সিকদারের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি', জগদীশ ভট্টাচার্যের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : গল্প', সুবীর রায়চৌধুরীর 'ধরাবাঁধা জীবনে আত্মহত্যার অধিকার', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে শিল্পকর্ম', মালিনী ভট্টাচার্যের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অপ্রকাশিত'। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে প্রকাশিত নতুন মাত্র চারটি লেখা বাংলাদেশের লেখকদের। আহমেদ মাওলা মানিকের *জননী* উপন্যাসের সঙ্গে শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। স্বরোচিষ সরকার নিম্নবর্গের চরিত্রসৃষ্টিতে মানিকের দক্ষতা নিরূপণ করেছেন। সৈয়দ আজিজুল হক মানিকের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মাহবুবুল হক মানিকের জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধায়কে নিয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সংকলনটি হচ্ছে কায়েস আহমেদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। কায়েস আহমেদ অকাল প্রয়াত হওয়ায় নিজের জীবদ্দশায় এ সংকলনটির সম্পাদনার কাজ শেষ করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯৪ সালে এটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের দুটি প্রবন্ধ স্থান পায়। সেগুলো হল : সুবীর রায়চৌধুরীর 'ধরাবাঁধা জীবনে আত্মহত্যার অধিকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস' ও দেবেশ রায় রচিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বান্তর'। এ সংস্করণে বাংলাদেশের নয়জন লেখকের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। সুশান্ত মজুমদার মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনাপঞ্জি সংকলন করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার রূপায়ণে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য ভূমিকায় মানিককে উপস্থাপন করেছেন। হাসান আজিজুল হক মানিকের ভাষারীতিতে নিহিত দেখেছেন বাস্তবকে শাণ দেওয়ার মতো প্রচ্ছন্ন শক্তি। আলী আনোয়ার *ছন্দপতন* উপন্যাসে মানিকের নান্দনিক জিজ্ঞাসার প্রকৃতি নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শিল্পী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, তাঁর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সামাজিক স্বপ্ন হয়ে ফোটে নি। রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ব্যক্তিগত স্মৃতির অনুষঙ্গে মানিকের 'নেতা' গল্পের জন্মকথা বিবৃত করেছেন। হায়দার আকবর খান তুলে ধরেছেন বিপ্লবী ও শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়। জুলফিকার মতিন *দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে শৈল্পিক ন্যায় তথা বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতা সৃজনে মানিকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মামুন হুসাইন আলোকপাত করেছেন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানিকের নিজস্ব কলাকৌশল সম্পর্কে।

যতদূর জানা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে মানিককে নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ১৯৮৭ সালে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে* শিরোনামে তাঁর গ্রন্থটি ডানা প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন লেখক হিসেবে মানিকের প্রগতিশীল ও দায়বদ্ধ ভূমিকার প্রতি বাংলাদেশের লেখক ও পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সম্প্রতি মানিকের জন্মশতবার্ষিকের প্রাক্কালে প্রকাশিত হয়েছে রহমান হাবিবের লেখা *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য* গ্রন্থটি। ২০০৭ সালে এটি প্রকাশ করেছেন নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা। এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে মানিকের ছোটগল্পের আলোচনা। এখানে লেখক মানব জীবনবোধের স্বরূপ-সন্ধানী মানিককে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মানবজীবনের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার যে প্রতিফলন মানিকের ছোটগল্পে পরিস্ফুট তার পরিচয় তুলে ধরায় লেখক সচেষ্ট। এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় মানিকের উপন্যাস। এ ক্ষেত্রে আলোচক গুরুত্ব দিয়েছেন মানবমনের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে মানিকের শিল্পদৃষ্টির ওপর। তিনি তাঁর আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ-সম্পর্ক-নির্ভর উপন্যাসের আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অর্থনীতি-রাজনীতি-আশ্রয়ী উপন্যাসের আলোচনা। বাংলাদেশে কেবল মানিককে নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা হাতেগোনা। তবে কয়েকটি গ্রন্থে অন্য বিষয়ের সঙ্গে মানিককে নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : আবদুল হালিম রচিত *মানিক, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর* (১৯৯৪); সরকার আবদুল মান্নান রচিত *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (২০০৩)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মানিককে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সূচনা হয় উনিশ শ আশির দশকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম এ বিষয়ে গবেষণা করেন আবুল খায়ের মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন। তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঐ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আশরাফউদ্দিনের গবেষণা অভিসন্দর্ভ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও মানুষ* শিরোনামে ১৯৯০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শ নব্বইয়ের

দশকের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প; সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হন সৈয়দ আজিজুল হক। এ গবেষণাকাজেও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। ১৯৯৫ সালে অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করে সৈয়দ আজিজুল হক পি-এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভটি বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। এ গ্রন্থে সৈয়দ আজিজুল হক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিশদ আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে আধুনিক মনোভঙ্গি ও বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োগে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত গল্পকে তিনি উন্মেষ পর্ব, ক্রান্তি পর্ব ও অন্ত্য পর্ব– এই তিনটি পর্বে বিভক্ত করে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি মানিকের সমস্ত গল্পকে ভাগ করেছেন দুভাগে। উন্মেষ ও ক্রান্তি পর্বের গল্পগুলোতে মনঃসমীক্ষণের প্রাধান্য এবং অন্ত্য পর্বের গল্পগুলোতে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার প্রাধান্য লক্ষ করেছেন তিনি। বিশদ আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, সাহিত্য-শিল্পী হিসেবে মানিক একদিকে মানবমনের গূঢ় অন্তর্বাস্তবতা অন্যদিকে মানবজীবনের বহির্বাস্তবতা ও সমাজসত্যকে উদ্‌ঘাটন করায় প্রয়াসী। অবশ্য এ গ্রন্থে মানিকের শিল্পশৈলী আলোচনার চেয়ে বিষয়গত আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে মানিক-চর্চায় নতুন আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর মধ্যেই ২০০৮-এর মে মাসে অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*। এতে মানিক বন্দ্যোপাধায়ের জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক রচনাপঞ্জি ছাড়াও আটাশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে সাতটি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। সেগুলো হল : আনন্দ ঘোষ হাজরার 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান', ধ্রুবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা' : আত্মদর্পণ না আত্মদর্শন', পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীক্ষাভূমি', মালিনী ভট্টাচার্যের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যের বিবাদী চেতনা', সরোজমোহন মিত্রের 'পদ্মানদীর জেলে জীবন ও ময়না দ্বীপ', সুতপা ভট্টাচার্যের 'মানিক বন্দ্যোপাধায়ের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক : প্রথম পর্যায়', সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চল্লিশের দশকে বাংলা মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা'।

এ স্মারক গ্রন্থে সন্নিবেশিত একুশটি প্রবন্ধ বাংলাদেশের লেখকদের। এসব প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টির বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা, অলোকপাত, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানিক-মানস বিশ্লেষণ করেছেন ইমতিয়ার শামীম ও হায়দার আকবর খান রনো। ভীষ্মদেব চৌধুরী, মোহাম্মদ আজম ও সৌভিক রেজা তুলে ধরেছেন মানিকের জীবন-জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্য। মানিকের উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন গিয়াস শামীম, বেগম আকতার কামাল, সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ও সৌমিত্র শেখর। মানিকের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন জাকির তালুকদার ও সৈয়দ আজিজুল হক। মানিকের কথাসাহিত্যের শ্রেণীচেতনার রূপায়ণ নিয়ে লিখেছেন সিরাজ সালেকিন এবং চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর কুশলতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন চঞ্চল কুমার বোস, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিদ্দিকা মাহমুদা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানিকের সৃজনশীলতার দূরত্বের ব্যাপার নিয়ে তুলনামূলক

আলোচনা করেছেন সুশান্ত মজুমদার। মানিক-সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা লিখেছেন সাজেদুল আউয়াল। স্মারক গ্রন্থটিতে প্রকরণবিষয়ক প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হয়েছে। তারিক মনজুর লিখেছেন মানিকের ভাষা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে, আর বায়তুল্লাহ কাদেরী আলোচনা করেছেন উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে মানিকের কুশলতা সম্পর্কে। লেখালেখি সম্পর্কে মানিকের নিজস্ব ধারণা ও অভিমত ছিল। সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন হামিম কামরুল হক। স্মারক গ্রন্থে মানিকের কবিতার মূল্যায়নও রয়েছে। সেটি লিখেছেন হায়াৎ মামুদ। এ স্মারক গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি লেখাই নতুনভাবে লেখা। এ সংকলনের পরিশিষ্ট ১-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি সংকলিত হয়েছে। সরোজমোহন মিত্র, বিশ্বনাথ দে, যুগান্তর চক্রবর্তী, সুশান্ত মজুমদার, মাহবুবুল হক প্রমুখ সম্পাদিত অথবা রচিত গ্রন্থ, জীবনপঞ্জি বা রচনাপঞ্জি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* থেকে গৃহীত তথ্য অবলম্বনে রচিত হওয়ায় এটি অনেক বেশি গোছালো ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে মানিকের কোনো কোনো রচনা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। এর ফলে মানিকের সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* সহপাঠ হিসেবে পঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের পঠন-পাঠন চলছে। স্নাতক সম্মান শ্রেণী পর্যায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছে *অহিংসা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *পদ্মানদীর মাঝি*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে *পুতুলনাচের ইতিকথা*, এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গল্পগ্রন্থ *প্রাগৈতিহাসিক*। এ ছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্প বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিয়ে এমফিল ও পিএইচ ডি পর্যায়ের গবেষণাতেও কেউ কেউ কর্মরত আছেন।

যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশে মানিক-চর্চার ক্ষেত্র ও পরিসর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে এ বছর (২০০৮) মানিকের জন্মশতবর্ষ উদযাপন মানিক-চর্চায় নতুন প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে। তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছে ও হচ্ছে।

এখানে বাংলাদেশে প্রকাশিত মানিক-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ, গ্রন্থ, সংকলনগ্রন্থ, স্মারকগ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদির একটি তালিকা দেওয়া হল :

গবেষণাগ্রন্থ

১. আবুল খায়ের মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও মানুষ*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ১৯৯০;

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

গ্রন্থ

১. আবদুল হালিম, *মানিক, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪;

২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭;

৩. রহমান হাবিব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭;
৪. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩।

সংকলনগ্রন্থ

১. ভূইয়া ইকবাল (সম্পা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫ (দ্বিতীয় মুদ্রণ : মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১);
২. কায়েস আহমেদ (সম্পা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪।

স্মারকগ্রন্থ

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮।

প্রবন্ধ

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'শব্দমদের বিরুদ্ধে', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প', *উত্তরাধিকার*, ২৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭;
৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ;
৫. আবুল খায়ের মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন, 'উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৮৫;
৬. আবুল ফজল, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৭. আবুল মোমেন, 'তাঁর সিসিফাসদ্বয়' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৮. আবুল হাসানাত, 'মানিক বন্দ্যোপাধায়ের ছোটগল্প', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৩৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০০ বঙ্গাব্দ;
৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
১০. আলী আনোয়ার, 'ছন্দপতন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দনিক জিজ্ঞাসা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
১১. আহমদ রফিক, 'সাহিত্য জীবিকা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *উত্তরাধিকার*, ৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫;
১২. আহমদ রফিক, 'মানিক উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
১৩. আহমেদ মাওলা, '*জননী* : মানিক ও শওকত ওসমান', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১;
১৪. আহমেদ হুমায়ুন, 'অবিস্মরণীয় আগন্তুক', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
১৫. ইফতেখারুল ইসলাম, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *গণসাহিত্য* (সম্পাদক : আবুল হাসনাত), ৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬;
১৬. ইমতিয়ার শামীম, 'মানিকের মন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

১৭. গীতারাণী কর্মকার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নারী', *সাহিত্য পত্রিকা*, আষাঢ় ১৪০০;
১৮. গিয়াস শামীম, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* : কেতুপুরের মহাকাব্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
১৯. চঞ্চল কুমার বোস, 'মানিক সাহিত্যে মাতাল চরিত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২০. জাকির তালুকদার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : বিবর্তনের দ্বন্দ্বপথ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২১. জুলফিকার মতিন, '*দিবারাত্রির কাব্য* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* : একটি বিবেচনা', *সাহিত্যিকী*, অষ্টবিংশ খণ্ড, চৈত্র ১৩৯৯; পুনর্মুদ্রণ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
২২. তারিক মনজুর, '*অহিংসার* ভাষা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২৩. নাসিম মাহমুদ, 'মানিক ও তাঁর খণ্ড বিখণ্ড মানুষ', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৬ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৮;
২৪. বশীর আল হেলাল, 'উত্তরকালের গল্প', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫; পুনর্মুদ্রণ : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প', *তাঁদের সৃষ্টির পথ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩;
২৫. বশীর আল হেলাল, 'মানিক বন্দ্যোপাধায়ের কবিতা', *তাঁদের সৃষ্টির পথ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩;
২৬. বায়তুল্লাহ কাদেরী, 'মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ' : সামাজিক অভিমুখ ও বিপ্রতীপ মনস্তত্ত্ব', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২৮. বেগম আকতার কামাল, '*দিবারাত্রির কাব্য* : মানিক মানসের আলোছায়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
২৯. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'সমাজগঠন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *সাহিত্যপত্র*, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৫;
৩০. ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ অথবা পুতুল ও মানুষের দ্বৈরথ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
৩১. মনসুর মুসা, 'দিবারাত্রির কাব্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৩২. মহীবুল আজিজ, 'পদ্মানদীর মাঝি ও তার ময়নাদ্বীপ যাত্রা', *সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত*, চট্টগ্রাম ২০০৩;
৩৩. মামুন হুসাইন, 'গল্প লেখার গল্প', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
৩৪. মাহমুদ শাহ কোরেশী, 'অহিংসা : অস্তিত্বের সমস্যা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৩৫. মোহাম্মদ আজম, 'কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৩৬. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ';
৩৭. রণেশ দাশগুপ্ত, 'সাথী : সামাজিকতায় রাজনৈতিকতায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
৩৮. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, 'একটি গল্পের জন্মকথা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;
৩৯. শহীদ ইকবাল, '*জননী* : একই শিরোনামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শওকত ওসমানের উপন্যাস', *গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কলা অনুষদ, সপ্তম সংখ্যা, রাজশাহী ; পুনর্মুদ্রণ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শওকত ওসমানের *জননী*', *কালান্তরের উক্তি ও উপলব্ধি*, রাজশাহী, ২০০৩;
৪০. শহীদ ইকবাল, 'শশী ও কুবেরের গল্পগাথা', *কালান্তরের উক্তি ও উপলব্ধি*, রাজশাহী, ২০০৩;
৪১. শান্তনু কায়সার, 'মানিকের স্বর্ণবর্ণ', *বাংলা কথাসাহিত্য; ভিন্নমাত্রা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১;
৪২. শেখ রফিকুল ইসলাম, 'পদ্মানদীর মাঝি ও তিতাস একটি নদীর নাম : জীবন-ভাবনার বৈচিত্র্য ও ঐক্য', *উত্তরাধিকার*, ২৯-৩০ বর্ষ ১-৮ সংখ্যা, ২০০২;
৪৩. সরকার সুজিত কুমার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা', *আই বি এস জার্নাল*, রাজশাহী, ১১ সংখ্যা, ২০০৩;
৪৪. সরকার সুজিত কুমার, 'মনোবিকলনের পটভূমি : প্রেক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস', *সাহিত্যিকী*, ৩৫ সংখ্যা, ২০০৮;
৪৫. সরকার সুজিত কুমার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ : একটি স্বতন্ত্র শৈলী', *ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, কলা অনুষদ, কুষ্টিয়া, ২০০৮;
৪৬. সরদার ফজলুল করিম, 'চেতনায় অনন্য শিল্পী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৪৭. সাজেদুল আউয়াল, '*পদ্মানদীর মাঝির* চলচ্চিত্র রূপ প্রসঙ্গে', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
৪৮. সিদ্দিকা মাহমুদা, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যামাচরিত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
৪৯. সিরাজ সালেকিন, 'দায়/বিদায়ের মধ্যবিত্ত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
৫০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'পুতুল নাচ ও পদ্মা নদী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫;
৫১. সুশান্ত মজুমদার, 'রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;
৫২. সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯১; পুনর্মুদ্রণ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১;
৫৩. সৈয়দ আজিজুল হক, 'চিহ্ন, ঝড় ও ঝরাপাতা', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৯৯২;
৫৪. সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৪০ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭;
৫৫. সৈয়দ আজিজুল হক, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, জুন ১৯৯৭;
৫৬. সৈয়দ আজিজুল হক, '*জননী* : চিরায়ত মাতৃত্বের জীবনালেখ্য', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, জুন ১৯৯৮;
৫৭. সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিকের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৫৯-৬১ সংখ্যা, ১৯৯৮;

৫৮. সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিকের গল্পে নারীমন বিশ্লেষণ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৯৯৮;

৫৯. সৈয়দ আজিজুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পশৈলী : বিন্দু থেকে বৃত্ত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬০. সৈয়দ আজিজুল হক, 'পদ্মা, ময়নাদ্বীপ ও কুবের-কপিলা, *উলুখাগড়া*, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫;

৬১. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, 'নদীজীবনের সংহিতা : *পদ্মানদীর মাঝি* এবং গঙ্গা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬২. সৌভিক রেজা, 'জীবনের জটিলতা : মানুষের হয়ে-ওঠার কথন-ক্রিয়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬৩. সৌমিত্র শেখর, 'উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬৪. স্বরোচিষ সরকার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৩০ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ : 'মানিকের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১;

৬৫. হামিম কামরুল হক, 'লেখালেখির শিক্ষক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬৬. হায়দার আকবর খান রনো, 'বিপ্লবী ও শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪;

৬৭. হায়দার আকবর খান রনো, 'উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬৮. হায়াৎ মামুদ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা : যাপিত জীবন', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮;

৬৯. হাসান আজিজুল হক, 'ভাষারীতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪।

জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি

১. মাহবুবুল হক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও রচনাপঞ্জি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত), দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১;

২. সুশান্ত মজুমদার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনাপঞ্জি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কায়েস আহমেদ সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪।

৩. [নামহীন], 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৮।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

মাহমুদ উল আলম

১

'সাহিত্য জীবনদর্পণ' এই সুপ্রাচীন ও বৈশ্বিক প্রবচনের পরিপ্রেক্ষিতে কথাসাহিত্যও জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে বিবেচ্য। এ জীবন মানুষের এবং এই মানুষ বিশেষ সমাজ ও সময়ের। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পীর মানস রূপান্তরের নেপথ্যে বস্তুত সমাজ, সময় ও সভ্যতার বিচিত্র জটিল অভিঘাতই সক্রিয়। সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা সে রূপান্তরজাত। শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা চিরকালই বহমান ও সমকালীন জীবনধারার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিপুষ্ট। তাই, তাঁর মানস পটভূমিতে অন্যান্য অভিঘাতের মতো যুদ্ধবিগ্রহও সমান প্রভাব বিস্তার ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। এজন্যই দেখা যায়, সভ্যতার সকল কালেই বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ হয়ে উঠেছে অন্যতম সাহিত্যিক উপজীব্য। কারণ, শিল্পীচৈতন্যে যে কোনো অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ আশঙ্কার ছায়াপাত করে। সমাজ ও মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতায় সে যুদ্ধের রুদ্র ও বিনাশী স্পর্শে সেই আশঙ্কার ছায়া বাস্তব হয়ে ওঠে। ফলে মূর্ত হয়ে ওঠে যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, পরিবেশ, প্রাসঙ্গিক বিপর্যয় ও সংকটচিত্র। সুতরাং এ কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য,

> যে কোন যুদ্ধ–মানবতা-বিনাশী, যে কোনো হিংস্রতার উল্লাসই যে পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীর মননে ও কল্পনায় কী সঙ্কট ঘনিয়ে আনে– সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। দার্শনিক এবং সাহিত্যিকদের ওপরেই এর আঘাত সবচাইতে বেশি করে পড়ে [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬৪ : ১৭৬-৭৭]।

২

বাংলা কথাসাহিত্যের যুদ্ধজীবনের বিচিত্র প্রকাশ প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। অবশ্য তৎকালীন ভারতবর্ষের বাংলাদেশ এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিল না। বরং যুদ্ধের অন্যতম পক্ষ ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে এর সুধা বা বিষ বা দুটোরই ভাগ সে পেয়েছে। এতে দেশের মানুষের জীবনপট ও জীবনবৃত্তের ক্রমিক এবং ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ভেঙে পড়ে সমাজজীবন কাঠামো। সে সঙ্গে দেখা দেয় বাঙালির মানবীয় সত্তার বিপর্যয়। প্রকট হয়ে ওঠে সামগ্রিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা। শিথিল হয়ে পড়ে নৈতিক বন্ধন। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এ রকম যুদ্ধসৃষ্ট অবক্ষয় ও বিপর্যয়, বিকৃতি ও ভাঙনকে সমকালীন কথাসাহিত্যকরাও উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের রচনায়। প্রথম মহাযুদ্ধের এই প্রচণ্ড ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র আঘাত এসে লাগে। এবার ভারত বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন হয়। বিশেষ করে প্রাচ্য রণাঙ্গনের অন্যতম হয়ে ওঠে পূর্বভারত তথা বাংলাদেশ। সৈন্য, অস্ত্র, যুদ্ধবিমান, বোমা

ইত্যাদি মিলে এ এলাকার জীবনাচরণে ভিন্ন ও নতুন এক আবহ তৈরি হয়। এছাড়া পুনরায় যুদ্ধজাত বেকার সমস্যা, শিল্প-সমস্যা, বিনিয়োগ সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে বাংলাদেশের মানুষ জর্জরিত হতে থাকে। অন্ন-বস্ত্র-অর্থ-জ্বালানি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সীমাহীন দুর্ভোগ। এতে বাংলাদেশের জনগণের ওপর নেমে আসে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়। এরকম আবহে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনাস্রোতে রচিত যুগ-পরিবেশের ভেতরেই সমকালীন নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকগণ সৃষ্টিশীল ছিলেন।

সুতরাং তাঁদের রচনায় পটভূমি হিসেবে চিত্রিত যুদ্ধের বিভিন্ন উপাদান স্বকীয় অভিজ্ঞতাজাত। এঁদের লেখায় ঘটেছে সমকালীন যুদ্ধজীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এজন্য তাঁদের ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয় নি। কারণ, 'বারুদের গন্ধ, ফ্যানের গন্ধ, মড়ার গন্ধ, রক্তের গন্ধ-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা; এরই মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন এই তরুণ উপন্যাস লেখকগণ' [অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯১ : ১৩৫] তবে প্রথম মহাযুদ্ধের চাইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ স্পর্শে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে স্পন্দিত হয়েছিলেন বেশি। রমাপদ চৌধুরীর ভাষায়,

> সেসব দিনের কথা ভোলা যায় না। তখনকার জীবন তো গল্পের মত ছিল না...। খবরের কাগজে তখন বড় বড় হরফে যুদ্ধের খবর, বোমা, ইভাকুয়েশন, বিয়াল্লিশ, মন্বন্তর : একটার পর একটা। সারা কলকাতার বুকে মার্কিন সৈনিকের বঙ্কিম উল্লাস, ব্রিটিশ টমিদের হঠকারিতা [রমাপদ চৌধুরী ১৩৮২ : ১৬১]

সেই সময়ের বৈশিষ্ট্যেই ছিল মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, ধর্ম, সংস্কার ও পারিবারিক জীবনবোধ ফাটল ও [illegible], পুঞ্জীভূত গ্লানি, দুর্ভিক্ষজনিত অসুস্থ পরিবেশ, অনৈতিক মনোভাব, কালোবাজারির করাল থাবা; সাইরেন, যুদ্ধবিমান, বোমা আর ইভাকুয়েশনের সংমিশ্রণে এক শঙ্কাতাড়িত ভয়াল পরিবেশ। এ জন্যই বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী কথাসাহিত্যে ভিন্নতর এক যুদ্ধজীবনের পরিচয় মেলে। প্রধানত যুদ্ধজনিত সর্বাত্মক বিপর্যয়, উৎকণ্ঠা, টানাপড়েনের চিত্রঋদ্ধ কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ হয়েছে এ কালপর্বটি। সাধারণ মানুষ এবং যুদ্ধক্লিষ্ট তাদের জীবনই হয়ে ওঠে একমাত্র উপজীব্য। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য যুদ্ধজীবনের এক অন্যতম সফল রূপকার। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর বিশাল সৃষ্টি থেকে মাত্র কিছু উদাহরণ চয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হবে।

৩.

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিচিত্রিত যুদ্ধ প্রতিবেশে বিমান আক্রমণ প্রসঙ্গই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। সাইরেন, নিষ্প্রদীপ, প্রতিনিয়ত আকাশে বিমান উড্ডয়ন, বিমান আক্রমণ, বোমাবর্ষণ, বিমান হামলা প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ARP)-এর কার্যক্রম ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের বর্ণনা এ প্রতিবেশ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি জাপানি বিমান আক্রমণকে কেন্দ্র করে কলকাতা এমনকি গ্রামজীবনের ভয়চকিত, উদ্বেগতাড়িত ও দুর্ভোগলাঞ্ছিত অবস্থার এবং পরিবেশ ও মানসিক অবস্থার সম্যক পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তেমনি মানসিক অবস্থার চমৎকার পরিচয় রয়েছে মানিক বন্দ্যোপ্যাধায়ের *পরিস্থিতি* গ্রন্থের 'প্যানিক' গল্পে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে কলকাতা

থেকে দলে দলে মানুষ পালাচ্ছিল। চারদিকে আতঙ্ক বিরাজমান। সে আতঙ্ককে খবরের কাগজের হকারের চিৎকার আরো বাড়িয়ে দেয়। তখন হকারের সে চিৎকারের জোর নিয়েও মানসিক গবেষণা চলে। কারণ, যুদ্ধকালীন ভীতিপ্রদ এ সময়ে–

> খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মত এমনিতেই টন টন করিতেছে। ফিস ফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝন ঝন করিয়া ওঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোন প্রয়োজন নাই [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ : ৩৪১]।

সুতরাং খবর জানার তীব্র আগ্রহেই ধনেশ জগদীশের কাছে ধরনা দেয়। জগদীশ কোন খবর নাই জানিয়েও 'কিন্তু' বলে থেমে যায়। তার কাছে একটা ব্যাপার ভালো ঠেকছে না জানিয়ে ধনেশকে বলে,

> এ আর পির একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেন বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপেনি। আজকালের মধ্যে কিছু একটা হবে বোধ হয় ... [প্রাগুক্ত : ৩৪২]।

নইলে হঠাৎ বিজ্ঞাপনটি এভাবে আজ না ছাপার কারণ কি– এই প্রশ্ন রেখে সে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করে এভাবে,

> ...সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাতেই হয়তো কিছু একটা হয়ে যাবে। এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছে। ভেবেছে রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজর পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হতো তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে [প্রাগুক্ত]।

জগদীশের এই ব্যাখ্যা আতঙ্কিত ধনেশকে আরো সন্ত্রস্ত করে তোলে। ফলে অনেক লোকের মধ্যে থেকেও ভয়ার্ত ধনেশ নিজেকে একা ও অসহায় বলে ভাবতে থাকে। যুদ্ধকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনার এই বিশ্লেষণ তাকে আরো 'প্যানিকি' করে তোলে।

৪

প্রত্যন্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন সৈনাছাউনি স্থাপনের ফলে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জেও বিদেশী সৈনিক ছড়িয়ে পড়েছিল। গোরা অর্থাৎ বিদেশী সৈনিক কর্তৃক গ্রামের পথচলতি বাসে মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ এবং পরবর্তীকালে পথিমধ্যে নেমে ধর্ষণ চেষ্টার রেখাচিত্র আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আজ কাল পরশুর গল্প* গ্রন্থের 'শত্রুমিত্র' গল্পে। সে সময়ে বিদেশী সৈন্যরাই সমাজের শত্রু—এ বিষয়টি দেখাতে গিয়ে গোরা সৈনিকের আচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক গ্রাম্যশত্রুতাদুষ্ট মানুষদেরও একাত্মতার চিত্রায়ণ করা হয়েছে। আদালতে মামলাসূত্রে দামোদর-হলধর এবং রসুল-আজিজরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে ফেরার পথে একত্রে প্রতাপগড়ের বাসে ওঠে। সঙ্গে তাদের মামলার অন্যতম সাক্ষী চাঁপা। সেই বাসেই 'তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে' বসেছিল। পথিমধ্যে আরো দুজন সৈন্যও বাসে ওঠে। শুরু থেকেই তারা চাঁপার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি মেলে রাখে। 'হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে।' গাড়ির লোক কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। কেবল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অবশ্য আজিজ-রসুলরা একটু উল্লসিতই হয় প্রতিপক্ষের সাক্ষী মেয়েটির এমন অপমানে। তাদের গন্তব্য শা'পুর এসে গেলে সবাই বাস থেকে নামে। কিন্তু 'চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নিচে

গড়িয়ে পড়ে।' বাস ছেড়ে দিলে 'সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে *পাঁচজন গোরা।*' আর চাঁপাদের পেছন পেছন তারাও অনুসরণ করতে থাকে। বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে রসুল ও তার সঙ্গীরা 'চাঁপার আর্তনাদ' শুনতে পায়। কিন্তু 'কি হয়েছে তাদের বলে দিতে হয়না।' তখন গোরা সৈনিকদের বন্দুকের ভয়ে ভীত না হয়ে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে হলধরদের সাথে একত্র হয়ে লাঠি হাতে ছুটে যায় 'আর্তচিৎকার'রতা চাঁপাকে উদ্ধার করতে [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ : ৩১৮]। প্রসঙ্গত, এ সময়ে বিদেশী সৈনিক কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের নারীধর্ষণ ও উৎপীড়নের ব্যাপারে অনেক ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রয়েছে তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর *আগস্ট বিপ্লব ১৯৪২* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ডেও এ বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সন্নিবেশিত [রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৮২ : ৩৬৮-৭০]।

৫

যুদ্ধবিগ্রহের মতো বিশাল একটি রাষ্ট্রিক বিষয় সমাজদেহে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ এবং সুদূরপ্রসারী পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রভাব অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত নেতিবাচক। দ্বিতীয়ত, এতে সমাজে ঘটে বিচিত্র ও ব্যাপক পরিবর্তন; সৃষ্টি হয় বিবিধ পারিবারিক-সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধির। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায়ও মহাযুদ্ধজনিত নানা প্রভাব-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটেছে; উদ্ভূত হয়েছে অনেক সমস্যা ও ব্যাধির। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সে পরিচয় বিধৃত।

কালোবাজারি : যুদ্ধের সুযোগে অর্থ লুটপাট করে ধনী হওয়ার অন্যতম পন্থা ছিল কালোবাজারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে শহর-গঞ্জ-গ্রাম সর্বত্রই এই ব্যাধিটির কালো-করাল থাবা বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি সমকালীন বাংলাদেশের খাদ্য ও বস্ত্র দুর্ভিক্ষেরও নেপথ্যে কালোবাজারিদের ভূমিকা ছিল অন্যতম। সমকালীন সমাজে কালোবাজারি বা ব্ল্যাকমার্কেট শব্দটি এত প্রচলিত হয়েছিল যে 'প্রেমের মূল্যহীনতা' বোঝাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্পের নাম রেখেছিলেন 'কালোবাজারের প্রেমের দর' [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭২ : ৩৯১]। এই গল্প ধনঞ্জয় ও লীলার মধ্যেকার সুদৃঢ় প্রণয়সম্পর্ক কালোবাজারিসূত্রে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্নপূরণের সুযোগপ্রাপ্তির কাছে কীভাবে বিচূর্ণ হয়ে পড়ে তার বিশদ বৃত্তান্ত।

মজুতদারি : কালোবাজারিরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনন্দে কালোবাজারে অধিক লাভে বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্যশস্যের বিশাল মজুত গড়ে তোলে। এ বিষয়টি সমকালের মন্বন্তর সৃষ্টিতে আবশ্যিক সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পরিস্থিতি* গল্পগ্রন্থের 'প্রাণের গুদাম' গল্পে এই মজুতদারির মর্মান্তিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত। গল্পটি অর্থলোলুপ মানবতাহীন একশ্রেণীর মজুতদারের নিকৃষ্ট-বিকৃত মনের পরিচয়বাহী।

চোরাচালানি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মুনাফালোভীদের কারণে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এর নেপথ্যে আবশ্যিকভাবে জড়িত ছিল কালোবাজারি ও মজুতদাররা। কারণ, যুদ্ধকালীন অঢেল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কৃত আর্থিক দুষ্ক্রিয়ায় এরা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। গোপন মজুত থেকে কালোবাজারে সরবরাহের মাধ্যমই হল চোরাপথে চালান দেওয়া। তাদের নেপথ্যে সহযোগিতা থাকে প্রশাসনেরও।

সেজন্যই যুদ্ধকালে দুর্মূল্যের সময় এ ব্যাধিটির বিস্তার ছিল অব্যাহত। সমকালীন বস্ত্রসংকটের গুরুতর অবস্থার সময়েও কী করে বাঁকা পথে কাপড় চোরাচালান হত জীর্ণবস্ত্র গরিব মানুষদেরই হাতে তার প্রাণবন্ত বর্ণনা আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আজ কাল পরশুর গল্প* গ্রন্থের 'রাঘব মালাকার' গল্পে। অবশ্য এ গল্পে বস্ত্রের প্রয়োজনেই বস্ত্রহীনদের আকস্মিক বিদ্রোহের পরিচয়ও রয়েছে। ফুলবাড়ী-মালতিয়া রুটে চোরাচালানদার গৌতমের নেতৃত্বে স্থানীয় পত্তু গ্রামের রাঘব মালাকার বিরাট এক বোঁচকা মাথায় মালদিয়ার দিকে চলছিল। সে বোঁচকায় ছিল কাপড়; গৌতমের ভাষায় তা 'বস্তা'। প্রায়ই রাঘবকে এ কাজ করতে হয়। কিন্তু এবার পথিমধ্যে সে গৌতমকে জানিয়ে দেয় যে সে জানে এর মধ্যে কাপড় যাচ্ছে চোরাই হয়ে। গৌতম প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে নেয় এবং রাঘবকে ডবল মজুরি দিয়ে হাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাঘবেরই আহ্বানে গৌতমকেই বেঁধে কাপড় লুট করে গ্রামের বস্ত্রহীন মানুষেরা [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ : ৩১৯-২৪]।

তেমনি তাঁর *ছোটবড়* গল্পগ্রন্থের 'ধান' গল্পে বিধৃত হয়েছে প্রশাসনিক সম্পৃক্তিতে খাদ্যমজুত, কালোবাজারি ব্যবসার ও সেই আকালে মজুত করা খাদ্যবিনষ্টির নিরেট বিবরণ। [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৪খ : ৬৩৬-৪৫]।

ভেজাল : সমকালীন বাংলাদেশে মহাযুদ্ধলালিত একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। অতি মুনাফলোভী মানসিকতায় ব্যবসায়ীরা খাদ্যে তো ভেজাল দিতই; অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। *পরিস্থিতি* গল্পগ্রন্থের 'কংক্রীট' গল্পে যুদ্ধকালীন নির্মাণসামগ্রীতে ভেজাল প্রদানের চিত্র রয়েছে। যুদ্ধের সময় সিমেন্টের চাহিদা বেড়ে যায়। দাম হয়ে ওঠে স্বর্ণের দামের মতো। ফলে মুনাফালোভীরা এতে মাটি ভেজাল দিয়ে অনিস্থ করে। গল্পের রঘু যে কারখানায় কাজ করে তার মালিকেরা এ কাজে লিপ্ত। বিষয়টি রঘুর জানা। রঘু এও জানে, এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে দুই একজন প্রতিবাদী শ্রমিককে প্রয়োজনে সুযোগমতো তারা কারখানার রোলারে ফেলে হত্যা করে। এমনি একটা ঘটনার কথা রঘুও জানে। কারণ, যে টাকার বিনিময়ে এ কাজটা ঘটেছে তাতে রঘুরও ভাগ আছে।

দুর্ভিক্ষ : সবচেয়ে যে সামাজিক সমস্যাটি বাংলাদেশকে সে সময় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত এবং সর্বব্যাপী ধ্বংসের মুখোমুখি করেছিল তা 'দুর্ভিক্ষ'। এ দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সৃষ্টি। এ সময়কার বাংলা সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সরকারি বিবৃতিতে এই দুর্ভিক্ষের মূল প্রধানত সামরিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। একে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সমকালীন শাসনকর্তাদের অকর্মণ্যতার পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে গণ্য করেছেন [রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৮২ : ৩৮৩]। এটিই বাংলাদেশে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে সুপরিচিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিন্তামণি* উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত পল্লির বিবিধ বিপর্যস্ততার এক দ্রুতগতি প্রতিচ্ছবি। মধুবনী একটি গ্রাম্য শহর। একে কেন্দ্র করে চারপাশের পল্লীজীবনযাত্রা ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ। তখন একদিন, 'পৃথিবীর বড় একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই' [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ : ৪২]। তবে যুদ্ধের খবর তাদের মনকে আলোড়িত করে না। তাদের এই মনোভাব রঘুর রসিকতায় মূর্ত। সে বলে, 'কোথায়

যুদ্ধ কোথায় কি, মোর পান্তায় নেইকো ঘি' [প্রাগুক্ত : ৪৪] কারণ, তাদের কাছে এ যুদ্ধ 'লালমুখো' জাতের যুদ্ধ। 'গরু, শুয়োর, মদ খাওয়া ম্লেচ্ছজাত, রক্ত গরম মাথা গরম, ওরাতো যুদ্ধ করবেই যখন তখন।' ওদের স্বভাবই 'হানাহানি কাটাকাটি' করা। তাই যুদ্ধ বাধলে তাদের কিছু আসে যায় না। উপন্যাসের ভাষায় :

> বিদেশের বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ; মধুবনীর চাষীদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে? জাপান যুদ্ধে নেমেছে? জাপানও তো বিদেশী। বিলিতী মাল আসে মধুবনীতে, জাপানি মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই [প্রাগুক্ত : ৪৩]।

কিন্তু যুদ্ধ-অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচ বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের। তাই এক পর্যায়ে,

> সুদূর বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরেসুস্থে। কোনমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে, কোনদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশেহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রি বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগতভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা [প্রাগুক্ত : ৪৩]।

অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাইতে চালের দাম বাড়া, সেজন্য লোভে পড়ে চাষীদের সমস্ত ধান বিক্রি করা এবং ক্রমে বাজার থেকে ধান-চাল উধাও হওয়ার মধ্য দিয়ে মধুবনীতে জীবনযাত্রা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দেখা দেয় আকাল। অনাহারে মধুবনীর অর্ধেক গৃহস্থ মারা যায়; অধিকাংশ পালায়। সে সাথে গৌরকে নিয়ে চিন্তামণিও চলে যায় বড়নিছিপুর– বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে। প্রকৃতপক্ষে *চিন্তামণি* উপন্যাস যুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষে পল্লির সাধারণ গৃহস্থজীবন বিশৃঙ্খল, বিপন্ন, বিনষ্ট এমনকি উন্মুল হওয়ার বাস্তব প্রতিচিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পরিস্থিতি* গল্পগ্রন্থের 'অমানুষিক' গল্পটির ছিদাম ও কুজার জীবনকে যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ তছনছ করে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের শুরুতে আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে বা কখনো উপোস দিয়ে কোনমতে দুর্গতি কাটিয়ে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী রাক্ষসগুলো দুর্ভিক্ষকে চরমে তুলে দেয়। ক্রমে তাদের তৈজসপত্র, পোষা গাই, কুজার রুপার পৈঁছে, কানের মাকড়ি, জমি এবং সবশেষে ভিটে বন্ধক দিতে হয়। ইতোমধ্যে তাদের ছেলেটা মরে যায়। তাই একদিন ছিদাম বুড়ি মা, জোয়ান বৌ ও কচি মেয়ে রেখে বাঁচবার কোন উপায় পাওয়া যায় কিনা তার তল্লাশিতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে জীবজন্তুর মতো নারকীয় জীবনযাপন করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শেষে এই প্রবাসজীবন ছেড়ে সে ফিরে আসে গ্রামে। এসে দেখে তার কুজা তারই ভিটে বন্ধক রাখাকারী ললিতবাবুর রক্ষিতা। তার একদার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো; ঝকঝকে, তকতকে আর কঙ্কালসার বৌটি হৃষ্টপুষ্ট যুবতী। এমনকি কুজার ব্যবহারেও শৈত্য অনুভব করে সে। শেষে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। ছিদামের এই উন্মুলন এবং কুজার পরিবর্তনের পেছনে ছিল যুদ্ধের অনিবার্য ভূমিকা—একথাই কাহিনীতে পরিস্ফুট।

দুর্ভিক্ষের সে রকমই ভয়াবহ পরিণামচিত্র আমরা পাই এই গ্রন্থেরই 'সাড়ে সাত সের' গল্পটিতেও।

বস্ত্রসঙ্কট : খাদ্যদুর্ভিক্ষের পাশাপাশি বস্ত্রসঙ্কট এবং পরিণতিতে মানুষের অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাও যুদ্ধসৃষ্ট। দু'দুটো মহাযুদ্ধের প্রভাবে বাংলায় এই সুতীব্র বস্ত্রসঙ্কটের উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল বস্ত্রদুর্ভিক্ষ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আজ কাল পরশুর গল্প* গ্রন্থের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে রয়েছে কাপড় সঙ্কটের প্রকট স্বরূপ এবং লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আত্মহত্যার কথকতা। হাতীপুর নামে একটি গ্রাম। কিছুকাল আগেও তাতে 'লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়' ছিল। আজ, এই যুদ্ধদিনে তা বদলে গেছে। বিশেষ করে রাতে। সন্ধ্যা হলেই শুরু হয় ছায়ামূর্তির ভৌতিক সঞ্চরণ। এরা এই গ্রামের নারী। কাপড়ের অভাবে সবাই প্রায় বিবস্ত্রা। তাই দিনের বেলায় থাকে ঘরের গোপনে। নারীসুলভ লজ্জায় ঘরের পুরুষদের সম্মুখে বের হতে তারা পারে না। সন্ধ্যা হতেই তাই তারা ছায়ামূর্তিরূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় 'জীবিতের জগৎ'-এর পরিবর্তে 'ছায়ামূর্তির জগৎ'। বস্ত্রসঙ্কটের সেই দিনে নতুন কেউ বাংলাদেশের কোনো গ্রামে এলে এই অবস্থারই মুখোমুখি হতে পারত। গল্পকারের বর্ণনায় সে পরিবেশ প্রমূর্ত :

> বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতকগুলো গাছের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে।... কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮২ : ২৭৪]।

বিবিধ সম্পর্কের সে ছায়াগুলো পালাক্রমে বাইরে বেরোয়—কারণ আবরণ তাদের একখানিই। ভোলানন্দী বা বৈকুণ্ঠ মাঝিদের সকলের বৌ, মেয়েরই এই অবস্থা। কেউ কেউ 'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা? আর সয় না।'–বলে মাথা কুটে মরে। গড়াগড়ি খায় ধুলোয়-কাদায় এবং তা দিয়েই ঢেকে নেয় তাদের সোমত্ত শরীর। ভূতির বারো বছরের ছেলে কানু খিদেয় কাতর হয়ে মায়ের কাছে খেতে চাইলেও নগ্নদেহে ছেলের সামনে গিয়ে খাদ্য দিতে পারে না সে। কারণ, 'সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হিহি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমন করে হাসে?'–এই দ্বিধা ও লজ্জা কাটাতে না পেরে দিশেহারা হয়ে ভূতি মা কালীর কাছে এর উপায় প্রার্থনা করে।

সমকালীন এই হৃদয়বিদারক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সন্ধ্যার পরও লজ্জাবশত স্বামীর জন্যেও দরজা খুলে দিতে চায় না কেউ কেউ। আবার গোকুলের বোন মালতী বা দাসু কামারের মেয়ে বিন্দী বিপিন সামন্তের মতো কারো কাছে দেহের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করে 'ছায়া' থেকে 'কায়া' হয়ে যায়। অন্যদিকে আনোয়ারকে তার স্ত্রী রাবেয়া চূড়ান্ত জানিয়ে দেয় সেদিনই যদি কাপড় জোগাড় করতে সে ব্যর্থ হয় তবে '...তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম' [প্রাগুক্ত : ২৭৬]। কারণ, খেতে দিতে না পারা সইতে পারলেও তার কাছে বস্ত্রহীনতা অসহনীয়। এদিকে আনোয়ার এবং তার মত অনেকেই আশায় থাকে গ্রামের নামে ঘোষ আর আজিজের পাওয়া পারমিটের কাপড় আসবে। কিন্তু অপেক্ষমাণ সকলকে বোকা বানিয়ে তারা লরিভর্তি কাপড় পাঠিয়ে দেয় চোরাবাজারের কালো গর্ভে। রাবেয়ার মতো বস্ত্রাভাবে লজ্জাক্রান্ত অনেক নারী এই অপমানের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহননের পথকেই শ্রেয় মনে করেছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থেরই বস্ত্রসঙ্কটকেন্দ্রিক 'রাঘব মালাকার' গল্পের রাঘবকে একবার 'ভীম' হয়ে দুঃশাসনের প্রতীক বস্ত্র চোরাচালানকারী গৌতমের রক্তপানে উদ্যত হতে দেখা যায় [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৮২ : ৩২২-২৩]। এ ছিল ক্রমিক যুদ্ধদুর্ভোগ প্রপীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে নিঃসঙ্গ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠা বিদ্রোহ-বিক্ষোভের প্রতিভাস।

জীবনধারায় পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া : যুদ্ধবিগ্রহ উপর্যুক্ত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি এবং সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি বহমান জীবনধারাতেও সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এর নেপথ্যে যুদ্ধজনিত আর্থিক প্রভাবও কাজ করে। এতে সুস্থ ও স্বস্থ জীবনে সৃষ্টি হয় নানা অভিঘাত। এসব বাহ্য ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়ার আবর্তে ও সংঘাতে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক জীবনধারায় মূর্ত হয়ে ওঠে নানাবিধ পরিবর্তন। জীবনদৃষ্টি, জীবিকা, জীবনাচরণ ইত্যাদিতে সে পরিবর্তন ধরা পড়ে। সমাজের রীতিনীতি, বন্ধন, অন্তরের সম্পদ, মহৎ মূল্যবোধ, আদর্শায়িত চিন্তা ইত্যাদিতে ভাঙন ধরে। এ দেশে মহাযুদ্ধসমূহ এ ভাঙনকে আরো বিস্তৃত করে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ, দাম্পত্য সম্পর্কে নিষ্ঠ মনোভাব ইত্যাদিতেও চিড় ধরে। সার্বিকভাবে সমগ্র সমাজ-জীবনে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে এর প্রতিফলন বিস্তর।

খতিয়ান গল্পগ্রন্থের 'কানাই তাঁতী' গল্পে ফুটে উঠেছে যুদ্ধজনিত সুতোসংকটে বিধ্বস্ত তাঁতিজীবন। তাঁতি কানাই-এর বিয়ের সুখস্বপ্নও সে সঙ্গে চূর্ণ হয়েছিল। সে বিয়ের জন্য অনেকদিন ধরে কষ্টেসৃষ্টে টাকা জমাচ্ছিল। ইতোমধ্যে দেশে যুদ্ধের ধাক্কা লেগেছে। এতে কাপড়ের দাম চড়ায় কানাই খুশি হয়। কারণ, তাতে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জমতে বেশিদিন লাগবে না। তার ভাবী বধূ 'মাতি' তাকে পরামর্শ দেয় এই যুদ্ধের সময় সুতো কিনে কাপড় বানালে লাভ বেশি হবে। ইতস্তত করতে করতে কানাই যখন সুতো কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তখন দাম উঠেছে আকাশে। এমনকি মহিমগঞ্জ বাজারে আর সুতোই মেলে না। তার 'সব স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে গেল কাচের টুকরোর মত মহাকালের বুট পরা পায়ের চাপে।' শুধু তারই নয় যুদ্ধদানব 'মৃত্যু'কেও সাথে করে বয়ে নিয়ে আসে–

> ...দুর্ভিক্ষের রূপে চাষী, তাঁতি, কামার কুমার তেলি জেলের ঘরে। সব বেচে দিয়ে অসহায় মানুষ বাঁচবার চেষ্টায়, দলে দলে দিশেহারা মানুষ পালিয়ে গেল গাঁ ছেড়ে [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৪ ক : ৬০৪]।

ফলে কানাই বসে বসে ঝিমোয় দাওয়ায়। বাত ধরে যায় তার শরীরে তাঁত না চালিয়ে। পেটেও প্রচণ্ড খিদে। তবে জমানো টাকায় সহজে হাত দেয় না। তখনো তার মাতিকে বিয়ের স্বপ্ন বর্তমান। তাই মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সুপ্রাচীন জীবিকার উপকরণ তাঁতটাই বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধদিনের এ দুঃসময়ে কোনোমতে টিকে থাকার জন্য। এই যুদ্ধ কানাইয়ের জীবিকানির্বাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং লালিত স্বপ্নকেও বিচূর্ণ করে।

পরিস্থিতি গল্পগ্রন্থের 'শিল্পী' গল্পের তাঁতি মদন যুদ্ধের জন্য সৃষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্ভোগ পোহায়। কারণ, যুদ্ধের বাজারে অন্যান্য দ্রব্যের মতো সুতোও উধাও হয়ে যায়। যা আছে তা কালোবাজারে চড়াদামে বিনিময়যোগ্য। সাধারণ তাঁতিদের অবস্থা হয় শোচনীয়। ক্রমে তাঁতও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। সুতোর চোরাকারবারি ভুবন তাঁতিদের এই দারিদ্র্যজনিত দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তাদের

দাদন কর্জ দিয়ে সস্তায় গামছা বুনিয়ে নিত। মদন তাঁতি বেনারসি বোনে গত সাত পুরুষ ধরে। তবু ভুবনের প্ররোচনায় সেও এক পর্যায়ে সুতো নেয় গামছা বোনার জন্য। ফলে তার বনেদি ঐতিহ্যের ওপর আঘাত আসার উপক্রম ঘটে। এদিকে তাঁতিপাড়ার সবার শ্রদ্ধেয় মদন অন্তর্গতভাবে তার জাত শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্বে আপতিত হয়। সে ভাবে, বনেদি শিল্পকর্ম ছেড়ে সস্তা গামছা বুনবে? তাছাড়া তাঁতিপাড়ার অনেকেই মদন তাঁতির দিকে তাকিয়ে আছে। সে গামছা বোনা শুরু করলে তারাও তা করবে। একদিকে অভাবের তাড়না আর একদিকে শিল্পীসত্তা এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত তার শিল্প সত্তারই বিজয় ঘটে। সে ভুবনকে সুতো ফিরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে শহরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় নারীদের ঘরের বাইরে এসে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে মহাযুদ্ধ। প্রচলিত সমাজে প্রথাগত জীবনযাত্রায় এটি দৃশ্যমান এক পরিবর্তন। ফলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও বিদ্যমান। এজন্য দেখা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *খতিয়ান* গল্পগ্রন্থের 'চক্রান্ত' গল্পে প্রতিমার দেড়শো টাকা মাইনেয় 'যুদ্ধের অস্থায়ী চাকরি' পাওয়ার খবরে মা খুশি হন নি মোটেও। এটা তাঁর কাছ অসম্ভব এবং অধর্ম বলে মনে হয়েছে। তাঁর মাথা চাপড়ে হাহাকার ধ্বনির মতো উচ্চারণে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়ায় সে মনোভাব ব্যক্ত। '...চাকরি করবে? খেঁদি চাকরি করবে? ও মধুসূদন! ওগো মাগো! হায় গো ভগবান।' [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৪ক : ৫৭৩]। পক্ষান্তরে, প্রতিমার পিতার প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। তাঁর মতে, আজকাল অনেক মেয়ে চাকরি করছে। সুতরাং এতে দোষের কিছু নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি এও অভিমত প্রকাশ করেন যে যুদ্ধদিনের এই অসম্ভব সময়ে বড় ছেলে রাখালের চাইতে যদি তাঁর আরেকটা মেয়ে থাকত তাহলেই ভাল হত। মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীনতা : মানবপ্রকৃতির সবচেয়ে মূল্যবান দিক হচ্ছে নৈতিকতাবোধ। চরিত্রবান হওয়ার নেপথ্য প্রেরণা নৈতিকতা। তবে কোনো মানুষই নীতিবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বয়সের সাথে তার অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে ভালোমন্দের ধারণা গড়ে ওঠে। এর সাথে পরিবেশ ও সুস্থ শিক্ষাও যুক্ত হয়ে এ ধারণাকে বাস্তব রূপ দেয়। ব্যাপারটির সাথে মনের সম্পর্ক ওতপ্রোত। আর সেই মন সবসময় পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্রাসঙ্গিক দুর্দশা-দুর্বিপাকেও মনুষ্যচিত্ত জটিলতাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তখন শঙ্কার তাড়না এবং বেঁচে থাকার আদিম প্রণোদনায় অনেকেরই হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হয়। বাংলাদেশে মহাযুদ্ধের প্রভাবের ফলে শুধু আর্থিক বিপর্যয়ই সংঘটিত হয় নি; মানুষের মন থেকে নৈতিকতাবোধ আর মূল্যবোধও প্রায় অপসৃত।

বিশ্বযুদ্ধের এক বিষময় ফল নারীপাচারে প্রকোপ এবং দেহব্যবসায়ের প্রসার। এর পেছনে কার্যকারণসূত্র ছিল আর্থিক সঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষ। সেজন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মালতী, বিন্দীদের বস্ত্রের বিনিময়ে বিত্তবান বিপিন সামন্তের কাছে দেহ বাঁধা দিতে হয় [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৮২ : ২৭৫]। ক্ষুধাতাড়িত নারীদের কাজের জন্য কারখানায় এসেও পুরুষদের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। *চিন্তামণি* উপন্যাসে চিন্তামণির বোনের জবানিতে তা স্পষ্ট :

> কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। ...ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা।...আমার মত শতাবধি পোড়া-কপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে। কাহারো ধর্ম

এই গ্রন্থের 'চক্রান্ত' গল্পেও যুদ্ধশেষের ছাঁটাই, ফলে বেকারত্বের অভিশাপের পরিচয় রয়েছে-বিশেষ করে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণীর। তার প্রতীকী চরিত্র প্রতিমা, মহেশ, ধীরেন, মাখন প্রমুখ। গল্পের মহেশ ও প্রতিমা প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা দু'জন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাতে বিঘ্নস্বরূপ। তদুপরি এক পর্যায়ে দেখা যায় মহেশ চাকরিচ্যুত হয়েছে। সুতরাং তাদের সুখস্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এই গল্পেই অন্যত্র দেখা যায়; প্রতিমা মিনতিদের বাড়ি গিয়ে তার ভাই মাখনকে দেখে যা বলে তাতেও ফুটে ওঠে যুদ্ধোত্তর চাকরিচ্যুতির তথ্য–

> আফিস যাননি?
>
> আফিস? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আর আফিস কিসের?
>
> কেন? আপনার তো যুদ্ধের চাকরি ছিল না?
>
> সোজাসুজি না হোক, তাই ছিল বৈকি। যুদ্ধের জন্য কাজ বেড়েছিল, বেশি লোক নিয়েছিল। এখন কাজ কমেছে, ছাড়িয়ে দিয়েছে [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৪ক : ৫৮৪]।

এর ফলে অনেকেরই পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মিনতিদের জীবনও এই হুমকির সম্মুখীন। এজন্যই, এই দুর্ভাবনা ও অর্থনৈতিক চাপের ফলেই সুধার স্বামী ধীরেন সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। পাশাপাশি ছিল স্বীয় চাকরির অনিশ্চয়তাও। তার বক্তব্যেই সে পরিচয় মেলে; প্রতিমাকে এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে সে বলেছিল,

> ব্যাপার হল কি, একটা বড় বিপদে পড়ে গেলাম। আফিসে হঠাৎ ডিগ্রেড করে দিলে, মাইনে অর্ধেক হয়ে গেল। আমার কাজের দোষ দেখালে কতকগুলি, কিন্তু আসল কথা হল লড়াই থেমে গেছে, একটা ছুতো করে মাইনে কমিয়ে দিল [প্রাগুক্ত : ৫৮৫]।

এমন অবস্থায় চাকরিতে রিজাইন দিতে চাইলে কোম্পানিরও আপত্তি হয় না। কারণ অতি অল্প মাইনেতেও লোক পাওয়া ছিল সহজ সেই বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধোত্তর এই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই বিধৃত করেছেন তাঁর রচনায়।

৬.

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই সমসময়ের বিশ্বযুদ্ধের বিবিধ চিত্রায়ণ করেছেন। বিশ্বব্যাপী তো বটেই সে সময়কার পটভূমিতে প্রত্যন্ত অঞ্চল বাংলাদেশেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী, অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রবল প্রভাব আর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সচেতনতা এবং শৈল্পিক দক্ষতায় তাঁর কথাসাহিত্যে প্রমূর্ত। উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ প্রসঙ্গটির স্বরূপ সন্ধানের প্রচেষ্টা গৃহীত। এতদ্‌বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের অবকাশ এখনো সপ্রচুর।

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর : ১৯২৩-১৯৮২*, সংশোধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা : ১৯৯১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — *উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — *মানিক গ্রন্থাবলী (আজ কাল পরশুর গল্প, পরিস্থিতি এবং চিন্তামণি)*, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — *মানিক গ্রন্থাবলী (খতিয়ান)*, অষ্টম খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৪ক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — *মানিক গ্রন্থাবলী (ছোটবড়)*, দশম খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪খ

মাহমুদ উল আলম — *বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধজীবন*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০

রমাপদ চৌধুরী — "ঋষি, দস্যু; এক কিশোর বালক", 'দেশ' : সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮২

রমেশচন্দ্র মজুমদার — *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২

সরোজমোহন মিত্র (ড.) — *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৪

শোষিতের দ্বান্দ্বিক সংগ্রাম : ছোট বকুলপুরের যাত্রী

মিহির মুসাকী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস দিয়ে বিশ্লেষণ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। একথা অনেক সমালোচক এবং গবেষকও বলেছেন যে, মানিক-রচনাবলির প্রথম অধ্যায় জুড়ে রয়েছে নর-নারীর মানবীয় সম্পর্কের ভাষ্য তথা ফ্রয়েডীয় লিবিডো আর শেষ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে মার্কসীয় চেতনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শিক ও চেতনাগতভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। একারণে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সেই মতাদর্শের প্রতিফলন সহজেই চোখে পড়ে। *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* বইয়ের প্রতিটি গল্পেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের কৌশলগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পটি টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ। গল্পের শুরু এবং শেষ দুটোই ছোটগল্পের আকস্মিক প্রারম্ভ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসংহার-সূচক। এ গল্পকে স্পষ্টত তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে দেখা যায় ছোট বকুলপুর যাওয়ার জন্য ছোট একটা রেল স্টেশন। ঐ স্টেশনের একটা থমথমে চিত্র। এ থমথমে আতঙ্কজনক পরিবেশের কারণ শ্রমিক-অসন্তোষ ও শ্রমিক-গ্রেফতার। আর এ শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে মজুরদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, পরিণামে রক্তপাত। মানিক চরম রাজনৈতিক বর্ণনা দেওয়ার সময়ও যে শিল্পমনস্ক তার পরিচয় গল্পের একটা লাইনেই পাওয়া যায় :

> ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কাব্যিক এ বর্ণনায় কারখানার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলো শ্রমিকের জীবনের নিঃসঙ্গতা আর অন্ধকার আকাশ তাদের ভাগ্যের, জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতার প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বর্ণনা পড়লে শ্রমিকের কারখানা জীবনের সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, রিক্ত-বিরিক্ত, ঘাম-ঝরানো নিয়তির কথা মনে পড়ে।

এ গল্পের দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ছোট রেলস্টেশন থেকে আন্না-দিবাকরের ছোট বকুলপুর যাত্রা। তৃতীয় বা শেষ পর্বে দেখা যায় ছোট বকুলপুরে পৌছানোর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে আন্না-দিবাকরকে বিপ্লবী সন্দেহে পাকড়াও করা। এ গল্পে দিবাকর সমাজের কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। গল্পের বর্ণনায় রয়েছে, দিবাকর ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানার মজুর। মূলত ছোট বকুলপুর তার শ্বশুরবাড়ি। সে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ছোট বকুলপুর রওনা হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের খবর জানার জন্য। কেননা ছোট বকুলপুরে গ্রামের কৃষকদের আন্দোলন-প্রতিবাদের মুখে জোতদার-মজুতদার মিলিতভাবে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে। তবে আমাদের সমাজে যারা কারখানার শ্রমিক তারা মূলত কৃষিজীবী পরিবার থেকেই আগত। একারণে তাদের

মনোজগতে কৃষক ও শ্রমিক দুয়েরই সহাবস্থান রয়েছে। মানিকের বর্ণনায় চমৎকারভাবে এটি উঠে এসেছে :

> তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালার দেবার সময় কয়েক শো মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধাচাষি, আধামজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

এখানে আধাচাষি আধামজুর কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজ মূলত আধাসামন্ত আধা বুর্জোয়া এভাবেই বিন্যস্ত। মনের গভীরে এই যে দুটো সত্তার টানাপড়েন তা আমাদের জীবনকে প্রায়শই দ্বান্দ্বিকতায় ফেলে দেয়। এ গল্পে ছোট বকুলপুর সন্নিহিত ছোট্ট রেলস্টেশনের দমবন্ধ আতঙ্কিত থমথমে পরিবেশের জন্য দায়ী কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট, ধর্মঘটী তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান, শ্রমিক-প্রতিবাদ এবং তাদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে রক্তপাত। অন্যদিকে ছোট বকুলপুর গ্রামের অবরুদ্ধ আতঙ্কিত ও উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহ এবং তা দমনে জোতদার-মজুতদার এবং শোষক শ্রেণীর সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ। এর ফলে ছোট বকুলপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে হয়তো তৈরি হয়েছে এক ধরনের অস্তিত্ব সংকট। যদিও মানিক এখানে রাজনৈতিক সংকটকে যতটা প্রকটভাবে চিত্রিত করেছেন, ছোট বকুলপুরের অবরুদ্ধ মানুষদের, কৃষক হতদরিদ্রদের ও অস্তিত্বসংকটকে সেভাবে বিবৃত করেন নি। তবে এক্ষেত্রেও মানিক বাস্তবতাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। কারণ যে কোন ঘটনা দূর থেকে শুনলে এক রকম ধারণা পাওয়া যায়, যা বাস্তবে হয়তো সেরকম নয়। ছোট বকুলপুর যে শুধুই একটা অবরুদ্ধ জনপদ তা নয়, ঐ কৃষক অধ্যুষিত ছোট জনপদের অভ্যন্তরে যে-প্রতিরোধ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে, যাত্রাপথে গাড়োয়ান গগনের মুখ থেকে তা জানা যায় :

> দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোট বকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্ত জীবন তছনছ ছারখার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু গাঁয়ের লোক এমন আঁটসাঁট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষদের কোনো লোক অন্তত দুডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না।

এতকিছুর পরও যেন নিয়তির কাছে পরাজয় মানতে হয় দিবাকরকে। কেননা, ছোট বকুলপুরে যাত্রার পূর্বে রেলস্টেশনে দিবাকর পান কেনার সময় যে কাগজে মুড়িয়ে পান বিক্রেতা তাকে পান দিয়েছিল ঐ ছেঁড়া কাগজটি ছিল একটা ইশতেহার। ঐ ইশতেহারে লেখা ছিল 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'। শোষক শ্রেণীর কাছে নিরেট প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না; কেবল অজুহাত হলেই হল। একারণে সশস্ত্র পাহারাদারদের দল দিবাকরকে বিপ্লবী সন্দেহ করে। গল্পে শেষের কথোপকথন তাই গুরুত্বপূর্ণ। দিবাকর বলে :

> ইশতেহার? ইশতেহারের তো কিছু জানি না। চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

অন্যদিকে তাকে অবরোধকারীদের পাল্টা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন : 'পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে-চিন্তে পান কিনে ইশতেহারটাতে জড়িয়ে নিলে?'

গল্পের শেষে স্পষ্ট করে এর পরিণতি টের পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু সংকেত পাওয়া যায় যে দিবাকর-আন্না ছোট বকুলপুর পৌঁছার পূর্বেই অন্যায়ভাবে ধরা পড়ে।

নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড।... না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি [প্রাগুক্ত : ৪৯-৫০]।

আজ কাল পরশুর গল্প গ্রন্থের 'নমুনা' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ক্লিষ্ট এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের তাৎক্ষণিক অর্থ ও খাদ্যলোভের কাছে ধর্মবুদ্ধির পরাজয় প্রকাশিত– সাথে মনুষ্যত্বেরও পরাজয়। কেশবের বিদ্যমান দরিদ্র অবস্থা যুদ্ধকালে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্ন ও অর্থ তার ঘরে নেই। সুতরাং সত্বর তাদেরই পাড়ার নারী ব্যবসায়ী কালাচাঁদের আবির্ভাব ঘটে। এক সময় দেখা যায়, কেশবের অন্নহীন ঘরে,

...অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিনগুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়া খান কয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে [প্রাগুক্ত : ২৭৯]।

সুতরাং কেশবের বিয়ে দিতে না পারা মেয়ে শৈলকে কালাচাঁদ কিনে নেয়। ছয়জন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য নিয়ে কালাচাঁদ এসেছিল গভীর রাতে। অর্থলোভের কাছে পরাজিত হলেও অন্তর্জাত ধর্মবোধ ও সহজাত পিতৃহৃদয় কালাচাঁদের কাছে এমনিই মেয়েকে তুলে দিতে সায় দিচ্ছিল না। এ ব্যাপারে কালাচাঁদ প্রথমে ওজর আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত সে ব্যবসাবুদ্ধির কল্যাণে রাজি হয়। আর কেশবও বলেছে, এ শুধু ধর্ম রাখার ব্যাপার। নারায়ণ সাক্ষী রেখে বিয়ে হওয়ার পর 'ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, সে তোমার ধর্ম।'–কেশব বলেছিল। এ বিয়ে করা নিয়ে তার মধ্যে হঠাৎ ধর্মবোধ জেগে ওঠে। তাই সে শৈলকে দেহব্যবসায় নিয়োজিত না করে বাড়িতে নিয়ে তোলার পরিকল্পনা করে। তার দেহব্যবসা কেন্দ্রের কর্ত্রী মন্দোদরীর কাছে তা ভালো লাগে না। সুতরাং কালাচাঁদ শৈলকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে বাড়ি থেকে ফিরলে দেখে মন্দোদরী শৈলর ঘরে লোক দিয়েছে। দেখে তার মাথায় আগুন ধরে যায়। কিন্তু মন্দোদরী তার সামনে একতাড়া নোট ধরলে 'সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা, কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ' হয়ে যায়। এ গল্পে দেখা যায়, মহাযুদ্ধকালে অর্থলোভের কাছে কেশবের আজন্ম সংস্কার ও ধর্মবোধ এবং কালাচাঁদের হঠাৎ জেগে ওঠা ধর্মবোধ পরাজিত হয়। কেশবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন হয়েছিল যে, শৈলর বিনিময়ে অন্ন ও অর্থ পাওয়ার পর তার ছোট মৃত মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় এবং সে ভেবে বসে,

তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়েও অন্ন মিলিতে পারিত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ [প্রাগুক্ত : ২৮০]।

যুদ্ধসৃষ্ট ক্লিন্ন পরিবেশে নৈতিক অবক্ষয়ের এটি একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

উক্ত গল্পকারের একই গ্রন্থের 'তারপর?' গল্পটিও সমকালে দারিদ্র্যের সুযোগে মেয়ে কেনাবেচার করুণ বীভৎস কাহিনী। এ কাজে যারা নিয়োজিত তারা বালক ও কিশোর। এগারো থেকে পনের বছর বয়স তাদের। তার মধ্যে গজেন আবার বিকলাঙ্গ। সামাজিক শৃঙ্খলা কোন স্তরে নামলে এ রকম বয়সের ছেলেরা নারী সরবরাহের মতো জঘন্য অনৈতিক কাজে নিয়োজিত হতে পারে– সমকালের এ গল্পটি তারই প্রমাণবহ। এ বয়সেই গজেনের মানসিক বিকার এমন হয়েছে যে সে তার আপন বিধবা ভাগ্নিকে দেখেও 'কটি বাজারে' হারাধনের আস্তানায় পৌঁছে দেয়ার চিন্তায় বিভোর হয়। ফলে 'তাকে দেখলেই মন তার দাম কষা শুরু করে' [প্রাগুক্ত : ৩০৫]। তাদেরকে এ কাজে নামিয়েছে হারাধন। তার বুদ্ধিমতে, এতে সুবিধে আছে অনেক।

কারণ, 'এগার বছরের ছেলে যে মেয়ে ভজানোর কাজে লেগেছে লোকের এ ধারণা সহজে হয় না।' [প্রাগুক্ত : ৩০৬]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের এ ঘটনায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ধ্বস্ত সমাজজীবনের শৃঙ্খলা ও নৈতিক শৈথিল্য প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

উপর্যুক্ত গল্পগ্রন্থের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে স্বার্থ চরিতার্থে স্বীয় স্ত্রীকেও উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে ঘুষ হিসেবে পাঠাতে দ্বিধাহীনচিত্ত এক মানুষের কথা বলেছেন। দাস সাহেবকে নানা সময়ে ঘুষ দিয়ে মাখন যুদ্ধের সময়ে দ্রুত বিত্তবান হয়ে উঠেছে। এদিকে দাস সাহেবেরও নজর পড়েছে মাখনের স্ত্রী সুশীলার প্রতি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সোয়া লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট পাওয়ার প্রলোভনে সুশীলাকেও দাস সাহেবের কাছে ঘুষ হিসেবে দিতে মাখন দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। অর্থগৃধ্নুতাই তাকে এই অনৈতিক কাজে প্রণোদিত করেছে। আর তখন ছিল যুদ্ধের সময় এবং অর্থ অর্জনের অঢেল দুষ্ট সুযোগ।

তাঁর *চিন্তামণি* উপন্যাসেও দেখা যায়, যুদ্ধের সময় রুপোর দাম খুব বেড়ে গেলে চাঁদ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে জানে তারই বাড়ির ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে একঘটি পুরানো টাকা। সে টাকা তার বুড়ি শাশুড়ির। পোঁতা জায়গার ওপরেই শাশুড়ি চাটাই কাঁথা বিছিয়ে শোয়। চাঁদ নগদ টাকার লোভ-স্বপ্নে সারাদিন চঞ্চল হয়ে থাকে। কিন্তু দেখে বুড়ির টাকার ঘটিটি চুরি করা মোটেও সহজ নয়। শেষে সে তাকে ফন্দি করে চণ্ডীতলায় পূজো দিতে নিজ খরচে ডুলি ভাড়া করে পাঠায়। কিন্তু বুড়ি যাবার সময় এমনভাবে ঘরের দরোজা বন্ধ করে যে চাঁদের চুরির সুবিধে হয় না। সে রাতেই বুড়ি মারা যায়। চাঁদ মধুবনীর এক দরিদ্র চাষা। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক চাপে সমগ্র মধুবনী পিষ্ট। তখন নগদ টাকার অনেক দাম। সে সময় নগদ টাকার লোভ সামলে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। চাঁদেরও তাই হয়েছে। ফলে সে যে মানসিক অবস্থায় উপনীত হয় তাতে শাশুড়ির টাকা চুরির চিন্তা এবং এজন্য ফন্দিফিকির করতেও দ্বিধা করে না।

যুদ্ধোত্তর চাকরি—সংকট ও প্রতিক্রিয়া : মহাযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চাকরির ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা উদ্ভূত হয়। যুদ্ধ-প্রয়োজনে গজিয়ে ওঠা অথবা বৃদ্ধি পাওয়া শিল্প কারখানায় উৎপাদন মাত্রা হ্রাস পাওয়াতে কর্মচারী ছাঁটাই একটি বিশেষ ব্যাপার হয়ে ওঠে। যুদ্ধের শেষের দিকে বিষয়টি প্রকট হতে থাকে। অক্ষম অসহায়তার পাশাপাশি এজন্য প্রতিবাদ, ধর্মঘটও মানুষের মধ্যে এ সময় দেখা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে যুদ্ধোত্তর এই সমস্যাও চিত্রায়িত।

খতিয়ান গল্পগ্রন্থ থেকে এর পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। এ গ্রন্থের 'ছাঁটাই রহস্য' গল্পে যুদ্ধকালীন নিয়োগ এবং যুদ্ধশেষে ছাঁটাই সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। পাশাপাশি অভিনব পদ্ধতিতে এই অন্যায়ের প্রতিবাদের চিত্রও সেখানে মেলে। গিধর এন্ড বাঙনা কোম্পানি যুদ্ধের বাজারে স্থায়ী চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়োগ দিয়ে কর্মচারীদের কম বেতনে খাটিয়ে নেয়। আর যুদ্ধের পর বেশি বেশি অফিস কামাই করা, অকর্মণ্যতা, চুরি ইত্যাদি বিবিধ মিথ্যা অভিযোগে কর্মচারীদের বরখাস্ত করে। তবু বলে না ছাঁটাই করা হয়েছে। একে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস জমতে থাকে। এক পর্যায়ে গল্পের প্রধান পাত্র রণধীর তাদের ক্রোধ, ঘৃণা এবং কোম্পানির কূটবুদ্ধির স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় বাথরুমের দেওয়ালে ব্যঙ্গাত্মকভাবে গিরি, বাঙনা ও জীবনের ছবি এঁকে এবং মন্তব্য লিখে।

আর সশস্ত্র পাহারাদারদের কাছে সংগ্রামী-বিপ্লবী সন্দেহে ধরা পড়ার পরিণতি যে ভয়ানক তা কল্পনা করা যায়।

উত্তরকালে দাঁড়িয়ে এ গল্পকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানিক যদিও শ্রমিক-আন্দোলন কিংবা তেভাগা-আন্দোলনের পটভূমিতে এ গল্প রচনা করেছেন, তবু গল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি বাদ দিলে এর একটি সর্বকালিক ও সার্বজনীন রূপ চোখে পড়ে। এ গল্পের নাম *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* না হয়ে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রা'ও হতে পারত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দিনমজুর দিবাকর স্ত্রী-সন্তানসহ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য ছোট বকুলপুরে যাত্রা করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। এ যাত্রা নির্দোষ যাত্রা। সে দিনমজুর শ্রেণীর প্রতিনিধি হলেও এ গল্পে কোথাও তাকে প্রতিবাদী বা সংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করা হয় নি। দিবাকরের নির্দোষ যাত্রা গন্তব্য পৌছুতে পারে নি। তার আগেই তাকে সন্দেহের বশে ধরা হয়েছে। আমাদের শ্রমিক-মজুরদের অনেক সংগ্রাম-বিপ্লব গন্তব্যে পৌছার আগেই কিংবা বলা যায় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পূর্বেই অংকুরে নষ্ট হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে নি। দিবাকরের এ যাত্রাকে বলা যেতে পারে ছোট বকুলপুরের রূপকে স্বাধীনতার পথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটি যাত্রা যা সার্থকতা পায় নি। এ গল্পটি উপন্যাস হলে মানিক আরো বিস্তৃত কাজ করতে পারতেন। কিন্তু ছোটগল্প হওয়াতে কয়েকটি তুলির টানে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে গল্পটি ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর গ্রামের চোরাচালানি অত্যাচারী শোষক বনমালী পাষণ্ড বাহিনী কর্তৃক নিরীহ চাষা ভৈরবের স্ত্রীকে গণধর্ষণ এবং তার শিশুসন্তানকে হত্যা করা এবং পরিশেষে লাঞ্ছিত নিপীড়িত ভৈরব কর্তৃক ভিন্নধর্মী প্রতিশোধ গ্রহণের এক অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে 'মেজাজ' গল্প। লক্ষ্মীপুর গ্রামের হতদরিদ্র চাষী ভৈরবের অদ্ভুত মেজাজের জন্য দারোগার গালে চড় বসিয়ে এ অপরাধে জেল হাজত খাটারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথচ এ প্রচণ্ড মেজাজি ভৈরব একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে যায় যখন চোরাচালানি রাখালের গুণ্ডাবাহিনী রাতের আঁধারে 'সকলের অলক্ষ্যে' তাকে এবং তার ছেলেকে খুঁটির সাথে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে তারই চোখের সামনে তার স্ত্রী কালীকে পাশবিক অত্যাচার করে। এ অত্যাচারকে মানিক তুলনা করেছেন মার্কিন সোলজারদের অত্যাচারের সঙ্গে। মানিকের বর্ণনায় অত্যাচারের অন্তর্গত দর্শন এভাবে ফুটে উঠেছে :

> অত্যাচার মানেই বিকার। অত্যাচারীর মনে দারুণ আতঙ্ক থাকে। নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কার, নিজের নিয়ম-কানুন পর্যন্ত সে ভাঙছে– নিজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সকলকে পায়ের নিচে পিষে রাখবার জন্য ওরা নিজেরাই নীতি ধর্ম আইন-কানুন আদর্শ খাড়া করে– নিজেরাই—আবার তা ভাঙে।

অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথরের মতো ভৈরব তার স্ত্রীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার এবং দড়ির বাঁধনে তার শিশুসন্তানের মৃত্যুকে ঠাণ্ডা মাথায় আত্মস্থ করলেও ভেতরে ভেতরে সে তার ক্রোধকে লালন করেছে। এ ক্রোধের বিস্ফোরণ সে ঘটায় গ্রামরক্ষী দলের সদস্য হিসেবে লোচনদাসের ঘরে পুনরায় হামলাকারী একই গুণ্ডাবাহিনীকে আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। গল্পকারের বর্ণনায় :

> সাত দিন পরে সেই গুণ্ডার দল যখন মাঝরাত্রে লোচনদাসের ঘরে হানা দিয়ে তাকে আর তার বাপকে বেঁধে বাড়ির বউ আর মেয়েকে নিয়ে আরেকটা উৎসবের আয়োজন করে তখন তিনশো লোক নিয়ে ভৈরব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কজন এসেছিল প্রায় সকলকেই বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।

প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও নীতি-আদর্শকে বিসর্জন না দিয়ে বরং শির উঁচু করে সমস্যাকে মোকাবিলা করার গল্প মানিকের 'প্রাণাধিক'। এ গল্পে অবনী একজন কেরানি হয়েও তার ধনী বন্ধু জ্যোতির্ময়ের ফাঁদে প্রলুব্ধ হয়ে পা দেয় নি। অবনীর বৃদ্ধ পিতা সরোজ একবার জ্যোতির্ময়ের মিথ্যে আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়েছে; কিন্তু অবনীর আদর্শের ভিত এতটাই শক্ত যে অবনী ক্ষণিকের জন্যও তার বিশ্বাস থেকে একবিন্দুও টলে নি।

অবনীর স্ত্রী বাণীও তাকেই নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। জ্যোতির্ময়ের হট চাল এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত বিবেকের কাছে হয়েছে পরাস্ত। এ গল্পে সমাজের দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে মানিক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে কেরানির দৃষ্টিকোণে সমাজের ধনিক শ্রেণীকে যেমন দেখা হয়েছে, আবার ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে চিত্রিত করা হয়েছে। 'জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচুস্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।' জ্যোতির্ময়ের কুৎসিত ইচ্ছের কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

> সরোজের ছেলেকে চাকরি ছাড়িয়ে চোরা-কারবারে নামাতে হবে। তার জীবনে, তার পরিবারে এটা প্রায় বিপ্লবের সমান! সেটা ঠিক করে সরল সহজ হাসিখুশি হয়ে জ্যোতির্ময় বারান্দায় জেঁকে বসে। দূরে একহাত কারবাইডের লাইটের আলোয় মজুরদের গানের আসরের দিকে চেয়ে বলে, ও ব্যাটাদের আজকাল ফুর্তি! স্ট্রাইক করে মোটা মজুরি কামাচ্ছে, সস্তায় ফুর্তি করছে। লোকে আমাদের প্রফিটটাই দেখে। একখানা গান শুনতে আমাদেরও যে হাজার টাকা খরচ সেটা কেউ হিসাব করে না।

বিদ্রোহ–বিপ্লব–সংগ্রাম সবকিছুর পেছনে ব্যক্তির নিঃসঙ্গ লড়াই সাফল্য আনতে পারে না, যদি না তাতে পারিবারিক সমর্থন না থাকে। 'ঘর করলাম বাহির' গল্পের পটভূমিতেও রয়েছে অফিসের ধর্মঘট। পশুপতি একজন কেরানি। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সে অংশ নেয় ধর্মঘটে; কিন্তু প্রথমত তার পরিবারের বিশেষ করে প্রথমে পশুপতি তার পিতার সমর্থন পায় না। কারণ পশুপতির চাকরিটা উমেশবাবুর বদান্যতায় প্রাপ্ত। একটু চেষ্টা করলে সে পেটি অফিসার হতে পারবে। অন্যদিকে যে উমেশবাবুর বদান্যতায় সে চাকরি পেয়েছে তার বিপক্ষে ধর্মঘট অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। পশুপতির জীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যখন তার স্ত্রীও তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ-কারণে পশুপতি প্রথমবারের মতো ঘর থেকে বের হয়ে সস্তা হোটেলে খাবার খেতে আসে। মানিক এ গল্পে কেরানির জীবন-সংগ্রাম ও জীবন-সংকট চিত্রিত করতে গিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ-অচরিতার্থতা ও স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পশুপতির উক্তিতে মধ্যবিত্তের এ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সুস্পষ্ট :

> আমি চিরদিন স্বাধীনতা চেয়েছি, চিরটা কাল আমি কলেজে পড়াবার সময় ভেবেছিলাম ডাক্তার হব, শেষ পর্যন্ত হলাম কেরানি। তাও আবার চেষ্টায়, আমার নিজের গুণে নয়। জানোই তো কী অবস্থা হয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন না ছাই, যেমন তেমন একটা উপার্জনের ব্যবস্থার জন্য পাগল হয়ে উঠতে হয়।

এ গল্পের নাটকীয় পরিণতি উল্লেখযোগ্য। পশুপতির পরিবার এক পর্যায়ে নমনীয় হয়। নৈতিক সমর্থন দিতে একসময় বাধ্য হয় পশুপতির পরিবার। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তির সংগ্রামে পরিবারের সমর্থনের মাধ্যমে এ সংগ্রামকে আরো সংহত রূপ দিতে চেয়েছেন। কেন না এ সমর্থন-উৎসাহ না পেলে ব্যক্তি হয়ে পড়বে নিঃসঙ্গ। এ কারণে এ সমর্থন জরুরি।

বাংলাদেশে শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর মানুষের জীবনে সমস্যা অন্তহীন ও বহুবিচিত্র। একে তো তারা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র, অন্যদিকে তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ–প্রতিরোধ অনেক ক্ষেত্রে জীবনকে করে তোলে আরো দুর্বিষহ। এ সকল মানুষ শ্রেণীশত্রু খতম করার জন্য জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করে, স্বপ্ন দেখে সুদিনের; কিন্তু এ স্বপ্নপূরণের পথে প্রতি পদে পদে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নিয়তি। এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে 'নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা' গল্পে। এ গল্পটি নোটন মিস্ত্রির, তার কিশোরী কন্যা দুর্গার এবং দারিদ্র্যের কশাঘাতে পোড় খাওয়া স্ত্রীর। এ গল্পে প্রথমে নোটনকে দেখা যায় একজন রাগী, কন্যার প্রতি দায়িত্ববান এবং স্নেহশীল পিতা হিসেবে। সে দুর্গাকে বস্তির আর দশটা মেয়ের মত উঠতি বয়সে নষ্ট হতে দিতে নারাজ, কিন্তু দুর্গার মায়ের মনস্তত্ত্ব এক্ষেত্রে কিছুটা আপাসকামী। এ-কারণে নোটন তাড়াতাড়ি বিনোদের সাথে দুর্গার বিয়ে ঠিক করলেও তার মায়ের মত হল, 'মেয়েটা ভালো থাক সে তা ভালো কথাই। একটু-আধটু নষ্ট হলে কী আর করা যাবে? একেবারে বিগড়ে খারাপ না হয়ে গেলেই হল। এমন করে আগলে রেখে কি স্বর্গ লাভ হবে?'

বস্তির মেয়ে হলেও দুর্গা দেখতে সুন্দরী। তবে পরিচর্যাবিহীন সৌন্দর্য যে দীর্ঘস্থায়ী নয় তার অনুপম বর্ণনা রয়েছে এ গল্পে। পাশাপাশি বস্তির জীবনের বাস্তবধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় :

> বস্তিতে পাপপুণ্যের, আত্মরক্ষা আর ধ্বংস হওয়ার সীমানা বড়ো সংকীর্ণ। বড়ো অস্থায়ী বস্তির মেয়ের এই পরম লোভনীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থাটি, যৌবনের প্রথম জোয়ারে থইথই করা দেখতে দেখতে দুদিনে শেষ হয়ে ভাটার টানে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে, এমনই ভয়ানক সেখানে খেয়ে পড়ে বাঁচার লড়াই। বাবুদের মতো তো নয় যে সামলে সুমলে ডাক্তার দেখিয়ে টনিক খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে হাসি তামাশা খেলাধুলো সিনেমা থিয়েটারে মন ভুলিয়ে বিশ ত্রিশ-বছর পর্যন্ত পুষে রাখা চলবে। বস্তির গরিব উপোসি ঘরে রূপ যৌবন স্রেফ প্রকৃতির খেলা, শুধু একবার দুদিনের জন্য, কুমারী মেয়ের মা হবার জন্য খাঁটি সাজসরঞ্জাম, সেইখানেই খতম। তারপর শুধু কপালের জের টানা। অরাজক লুটের রাজ্যে তাই জগতের সমস্ত লোভ, মালিকবাবুর লোভ পর্যন্ত, বস্তির মেয়ের দামি দুদিনকে লুট করতে ওঁৎ পেতে থাকে।

দারিদ্র্যের যে দুষ্টচক্র ও নিয়তির কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে তার কারণেই সম্ভবত নোটন মিস্ত্রির নৈতিক পরাজয় ঘটে। নোটন এক দুর্ঘটনায় জখম হলে কারখানা তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ না করে উল্টো তার ঘাড়েই দোষ চাপায়। আয় রোজগার বন্ধ হলে নোটনের মানসিক ও নৈতিক পরাজয় ঘটে। যে নোটন তার মেয়ে দুর্গাকে মানুষের বাড়িতে কাজ করতে পাঠাতে চাইত না সেই নোটন মিত্রদের বাড়িতে দুর্গাকে পাঠাতে চায় একথা জেনেও যে মিত্রের নজর দুর্গার দিকে। এক পর্যায়ে দুর্গাও আপস করে, যখন তার প্রেমিক বিনোদ পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়ে আহত হয়ে শয্যাশায়ী হয়। বিনোদের কাছে দুর্গার প্রশ্ন : 'তুমি ধর্মঘট চাও না মোকে চাও?' কিন্তু পরক্ষণেই দুর্গা সিদ্ধান্ত নেয় বিনোদকে তার সংগ্রাম থেকে পিছু না হঠানোর। দুর্গা আপস করে সুখলালের সঙ্গে, অন্তত গল্পের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে রকম ইঙ্গিতই দেন। এ গল্পে শ্রমিক সংগ্রামের এক করুণ পারিবারিক পরিণতি আমরা দেখি। অথচ বিজয়ের কোনো ইঙ্গিত পাই না। আসলে যে সময়-পরিসরে মানিক গল্পগুলো রচনা করেছেন

সেই সময়ের সীমাবদ্ধতাগুলোও গল্পে রয়েছে। আরোপিতভাবে সময়-অতিক্রমণের প্রচেষ্টা এখানে দুর্লক্ষ্য।

বাংলাদেশে শিল্পায়ন এখনো সে স্তরে পৌঁছেনি যেখানে একটি জাতীয় বুর্জোয়া সংহত রূপ পাবে। এ সমাজ এখনো ভূমি-নির্ভর কৃষি-মুখ্য। গার্মেন্টস কিংবা চামড়া কোনো শিল্পই Backward Linkage দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী পরিপূর্ণ শিল্প নয়। উপরন্তু অসরকারি উন্নয়ন তৎপরতায় বিভিন্ন দারিদ্র্য-বিমোচন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ দারিদ্র্যকে জাদুঘরে প্রেরণের ঘোষণা পর্যন্ত দিয়েছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিভৃত পল্লীর চাষা এবং কারখানার শ্রমিক রেডিও-টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে বিশ্বের অন্য গোলার্ধের স্বজনের সাথে কিংবা শহরের সাথে তথ্যগতভাবে সংযুক্ত ও হালনাগাদ। এরকম বাস্তবতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পচিন্তার পুনর্বিবেচনা এখন সময়ের দাবি। গত কয়েক দশকে শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক ও চারিত্রিক বহু পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে। একারণে একটি বিশেষ সময়ের পটভূমিতে পুনরায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যয়ন জরুরি, তাঁকে পুনর্গঠন ও পুনরাবিষ্কারের স্বার্থেই।

মানিকের দিন বদলের গান

মুজতবা আহমেদ মুরশেদ

আরোগ্য উপন্যাস হাতে পাওয়া গিয়েই ঝামেলা বেধে গেল। কোথাও নাই। যেখানেই হাত বাড়াই সেখানেই নাই। মূলত বেশির ভাগ লোকই এই উপন্যাসের নাম জানে না। মানিকের লেখার যাদুতে মুগ্ধ আমিও খোঁজটা জানতাম না। আসলে আমরা প্রায়ই সবাই কোন একটা লেখা তখনি পড়ি, যখন সেটার নাম শুনে পাগল হবার জোগাড়।

ফলে আমাকে যখন বাংলা একাডেমী থেকে *আরোগ্য* নিয়ে লিখতে বলা হল তখন অবাক হলাম! এটা সত্যিই একটা চমৎকার লেখা তো! পড়ে মজা পাব তো? কোথাও না পেয়ে নিজের ভেতর এই সব প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখেই অবশেষে *আরোগ্যের* খোঁজ শুরু করলাম গুগুল সার্চে। মানিকের ওপর সেখানে যে তথ্যভাণ্ডার, তাতেও আরোগ্যের উল্লেখ নেই! আছে কেবল গোটা সাতেক উপন্যাসের নাম। পুরো বিষয়টা একটা বিস্ময় হিসেবে দেখা দিল আমার কাছে! মনে হল, তাহলে বোদ্ধাদের কাছে ওই গোটা কতক উপন্যাসই হিসেবে নেবার, এটা নয়। অবাক হয়ে ভাবতে থাকলাম যে, বাংলা একাডেমী আমাকে এমন এক উপন্যাস নিয়ে লিখতে দিয়েছে যা কিনা মানুষের কাছে আপাত অস্তিত্বহীন!

যাই হোক, একাডেমীর লাইব্রেরি থেকেই জোগাড় করতে হল *আরোগ্যকে*। পড়তে শুরু করলাম। বইটা বাংলা ১৩৬৭ সালের আশ্বিন মাসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স কর্তৃক আড়াই টাকা মূল্যে প্রকাশিত। ঠিকুজি খুঁজে দেখলাম, এটার জন্ম ১৯৫৩ সালে। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৬ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। অর্থাৎ আরোগ্য উপন্যাস অকাল-প্রয়াত মানিকের পরিণত বয়সের লেখা। পরিণত বয়সের লেখা সাধারণত সব সময়ই ভিন্নভাবে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। ভিন্নভাবে আকর্ষণীয় বলছি এ জন্যে যে, চল্লিশ পেরুনো লেখক ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠেন অনেক বেশি দার্শনিক। নির্দিষ্ট কোনো এক বিষয়কেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ আর দশটা অভিজ্ঞতার সাথে যোগবিয়োগে, মিল-অমিলে তার নিজের ভেতর একটি সুদৃঢ় ধারালো আকার লাভ করে এবং সে আকার বা ধারটা যখন লেখায় উঠে আসে, তখন সে লেখায় স্বভাবতই থাকে এক ভিন্ন স্বাদ।

ভাবলাম, তাই যদি হয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাহলে কেন এই উপন্যাস স্বাভাবিক নিয়মে বাজারে নাই? কেন এই উপন্যাস নিয়ে কোথাও কোনো উল্লেখ নাই? সাধারণ পাঠকের কাছে কেন এটা আদরণীয় নয়? কেন? বিস্ময় বাড়ল! আবার এও ভাবলাম, নাকি তার ঊনচল্লিশ উপন্যাসের দীর্ঘসারির শেষের দিকে *আরোগ্য* জন্ম হওয়ায় অন্য উপন্যাসের সুলম্ব ছায়ায় ঢেকে গেছে এই উপন্যাসের আকার। নাকি *আরোগ্য* শব্দটা পাঠকের অনুভবে তাৎক্ষণিক হাসপাতাল আর ডেটলের গন্ধ উৎপাদন করায় বলে পাঠক আর সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি!

কেন? প্রশ্নটার প্রবলতাই আমার মাঝে গেড়ে বসল। পুরো উপন্যাসটা দ্রুত পড়ার তাগিদ বোধ করলাম। সত্যি বলছি, এটাই ছিল উপন্যাসটা পড়া শুরুর প্রথম সত্যি। তারপর প্রাথমিক কিছু ধাক্কা ছাড়া যতই এর ভেতর গিয়েছি, ততই অবাক হয়েছি এই উপলব্ধি করে যে, মানিক তাঁর সমস্ত জীবনধরে যে সমাজকে দেখেছেন এবং সেটা নিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে তার যে উপলব্ধি হয়েছে, সেই উপলব্ধিগুলোই তিনি ঢেলেছেন এখানে। এই উপলব্ধিতে এক সরল, কিন্তু শক্তিশালী দায়বদ্ধতা প্রকাশিত।

আমরা যখন লেখকের দায়বদ্ধতার কথা বলি, তখন স্বভাবতই সেই দায়বদ্ধতাকে এভাবে দেখি যে, তিনি মানবতার জন্যে কী কথা উচ্চারণ করছেন। একটা ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থায় যখন ধনী আর দরিদ্রের মাঝে ফারাকটা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, সেখানে তিনি কোন ধারার বিধানের কথা বলছেন। চলমান সমাজে নারীর মর্যাদাকে কীভাবে তিনি সঠিক স্থানে নিয়ে যেতে চান। আধুনিকায়নের ধারায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে কতটুকু প্রাধান্য দেয়ার মাপকাঠি তিনি নির্ধারণ করতে উৎসাহী। অথবা সমাজবিন্যাস থেকে রাষ্ট্রকাঠামো পেরিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে নির্যাতনকারীর হাতে যখন নির্যাতিতরা আরও বেশি মাত্রায় নিগৃহীত এবং অবহেলিত হতে থাকে, তখন লেখক দানবদের বিরুদ্ধে কোন অভিশাপ উচ্চারণ করতে সাহসী হন, প্রত্যয়ী হন– তাই দেখার একটা বিষয় থাকে। বোঝার বিষয় থাকে, সর্বোপরি লেখকের সাথে পাঠকের একটা প্রচণ্ড বোঝাপড়ার বিষয় থাকেই সেখানে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা উচিত যে, একজন শক্তিশালী লেখকের অন্তরপ্রবাহে ভাবনার যে কথা উপরে বলেছি, বা সৃষ্টির সৌন্দর্য রক্ষায় তার যে ভূমিকা হবার কথা বোধ করেছি, মানিক যেন ঠিক সে মাত্রাটাই এই *আরোগ্য* উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন।

আরোগ্য উপন্যাসে চিত্রিত উপাদানের ভেতর আছে শহর আর গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মাঝে প্রকটভাবে বিরাজিত বৈষম্য। আছে শহুরে সমাজে বাস-করা মানুষের ফাঁপা অবয়ব। আবার শহর এবং গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর সামষ্টিক বৃত্তে নর এবং নারীর মাঝে মর্যাদা এবং কর্তৃত্বের যে আনুপাতিক হারের অসম বিন্যাস এবং সেই অসম বিন্যাসের চলমান ধারায় যে নীরব সংঘাত, সেই সংঘাতে চিরাচরিতভাবে নারীর যে পরাজয়– এই উপন্যাসে তাও উপস্থিত।

তিনি কিন্তু এখানে এই চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত হননি। মানুষকে জাগাতে শিল্পিত মৃদু কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে সমাজের ফাঁপা স্থানে খোঁচা মেরেছেন সেই সকল অসংগতিগুলোকে মানুষের সামনে তীব্রতায় উপস্থাপন করতে। বলা যায়, শেষমেশ একেবারেই সরাসরি রামদা দিয়ে এক কোপ বসিয়ে পচা সমাজটার গলাটাই নামিয়ে দিতে অন্তরে এক সরব পণ করেছেন। তিনি মূলত সমাজ বদলের সরাসরি একটা নির্দেশনা দিয়েছেন এখানে।

এখানে আমি *আরোগ্য* নিয়ে যেভাবে মন্তব্য করছি, তাতে করে যেন কারো এমন কিছু মনে না হয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনোজাগতিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কারিগর এ দফায় *আরোগ্য* নাম দিয়ে উপন্যাসের ঢাউস পাতায় বিপ্লবের একটা নিরেট খসখসে লিফলেট লিখেছেন। আসলে একটা উপন্যাসে যে সব উপদান পরিমিতভাবে থাকা দরকার, যেভাবে চরিত্রগুলো নির্দিষ্টভাবে আবর্তিত হয়ে মূল সুরটা ছন্দোময়ভাবে ধারণ করতে পারার ক্ষমতা থাকা দরকার— তার সবই এখানে উপস্থিত। আমি শুধু বলতে চাইছি, তিনি যে স্বাপ্নিক সমাজ বুকের মাঝে লালন করেছেন, সেই স্বাপ্নিক

সমাজকেই প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আপন ভুবনে আমূল পরিবর্তনের সংকল্পসিদ্ধ এক দ্রোহের ডাক দিয়েছেন এই উপন্যাসে। সেই আহ্বানটা, ডাকটা খুবই শক্তিশালী। এ যেন নিজের ভিতর ডাক, 'জাগো বাহে, কুনঠে সবায়।'

উনিশ'শ ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মহামন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানিক প্রত্যক্ষ করেছেন দ্রুত শহরায়ন। মুনাফার দ্রুত বর্ধনশীল এনাকোন্ডাসাপ শহর থেকে গ্রামীণ জনপদে তার লম্বা জিহ্বাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। চুষছে। কিন্তু গ্রামীণ জনপদে সঠিক মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবাহটা সৃষ্টি করছে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বদলের আভাস সবখানে। ভারতের বাংলাতেও এই একই ধারা। বাংলার গ্রামে পুরোনো আর জীর্ণতার প্রাধান্য থাকলেও, সেখানে নতুনের আগ্রাসনের একটা প্রকট খাপছাড়া চিত্র। উপন্যাসের নায়ক কেশব যে অঞ্চলটায় থাকে তা হল গ্রাম্য শহরতলী। রেললাইন পেরিয়ে কেশব তার আবাসস্থলে যায়।

> বোসপাড়া পর্যন্ত একমাইল হাঁটতে হয়। সেখানে ছোট-বড় নতুন পাকা বাড়ি আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারি দোকান এবং লন্ড্রি হেয়ার কাটিং সেলুন এসবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচাপাকা বাড়ির, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবা পুকুরের সঙ্গে মেশানো শহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দমার।

শহরের বাইরে এই পশ্চাৎপদ স্থানগুলোতে পরিবর্তনের ধারা অগ্রসরমান হলেও, সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য বা নজর না দেবার নীতিনির্ধারণী যে উদাসীনতা তা খুব প্রকটভাবে ধরা পরে বর্ণনায়।

> বোস পাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিমটিম করে আলো জ্বলেছে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবাপুকুর খোলার ঘরের বাগ মানা মানুষগুলোকে জানিয়ে দেওয়া যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বাললেই কি এসপ্লানেডের মত ঝলমল করে? এটাও বৈদ্যুতিক বাতি- এদিকে তাকিয়ে ঘরে লণ্ঠন আর ডিবরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

মার্কসীয় চিন্তাচেতনায় বেড়ে ওঠা মানিক এই সমাজের প্রতিটা গলিতে দেখতে পেয়েছেন আসলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এই বাংলার মাটি থেকে বিশ্বব্যাপী ফাঁপা আর নকল অস্তিত্বের চাষ হচ্ছে। নিয়ত মানুষের বিবেক আর মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ফলে তার ভিতর এক প্রবল বোধের আগ্নেয় ক্রোধ তৈরি হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, ওই সকল প্রতারণা রোধ করতে হলে মানুষকে জাগাতে হবে। সমাজকাঠামো বদলাতে হবে। আর এ কথাটা এই উপন্যাসে মানিক খুব জোর দিয়েই বলেছেন। কোন রাখঢাকের চেষ্টা করেননি। ফলে যাদের আঘাত করতে চেয়েছেন, তাদের মুখোশ উন্মোচনে কোনো শিল্পের ধারও ধারেন নি।

> এদের শুধু বাইরের জাঁকজামক ভিতরে ফাঁকি। প্রাণান্তকর চেষ্টায় একটা ধোঁয়াটে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে বাস্তব জগত আর জীবনকে ঝাপসা করে রাখে। কত হীনতা দীনতা অনিয়ম চাপা থাকে চকচকে পালিশ করা প্রকাশ্য জীবনের আড়ালে! কত দুঃখবেদনা পঙ্গুতা ব্যর্থতা যে সর্বসম্মতিক্রমে চাপা দিয়ে রাখা হয় হাসি গান আর জ্ঞান বিজ্ঞান-সাহিত্যের তৈরি করা মিথ্যা সার্থকতার আবরণে!

আর তখনি আমার মনে হয়েছে, এমন নয় তো যে, প্রচলিত কাঠামোবিরোধী বক্তব্য সম্বলিত উপন্যাস হবার কারণে পরিবর্তনে ভয় পাওয়া শক্তিগুলো এই উপন্যাসকে জনসম্মুখে আসতে উৎসাহ দেয়নি। কেননা, এই সকল ভাবনাচিন্তা সব সময়ই মুনাফাভোগী শ্রেণীর সুখের মাথাটা মাটিতে নামিয়ে ফেলে।

এটা ঠিক যে, প্রচলিত অনুশাসনের চাবুকটা যাদের হাতে, তারা একজন লেখককে রুশো বা ভলতেয়ার হতে দিতে চায় না। তাতে যে তাদের বড় ক্ষতি। একটা চমৎকার পরিভাষায় সুললিতভাবে বলেন, 'কাব্য হবে শিল্পমণ্ডিত, শুধু উপমা আর আবেগের এক ঘন নির্যাস থাকবে সেখানের প্রতিটা অলিন্দে। না, না, শিল্পে কেন রাজনীতি থাকবে! দিন বদলের গান কেন উচ্চারিত হবে উচ্চমাত্রায়। এটা তো স্লোগান। শিল্পের মাঝে তা বড়ই বেমানান। একেবারেই অসুরের মত অসহনীয়'।

অনেক সময় ঢাকার কিছু জাতীয় দৈনিকের সাহিত্যপাতার চাকুরে মগজের আধাশিক্ষিত সাহিত্য সম্পাদককেও বলতে শুনি একই ধারার কথা। তারা এমন এক অস্বাভাবিক কর্তৃত্বের গন্ধ মেখে এ কথাগুলো বলেন যে বোঝাই যায় তাদের এই উচ্চারণ সমাজপতিদের কর্তৃত্বময় মনোজগতের সাথে একই সূত্রে ক্রীড়নকের মতো গাঁথা।

ভাবতে তখন অবাক লাগে,— তবে সমাজটা বদলানোর আহ্বান জানাবে কে? "আমি ভাবি, 'কবি' সাহিত্যিক আর শিল্পীই তো সমাজকে দেখবে তার খর চোখের শাণিত দৃষ্টিতে এবং নির্লোভ মনে প্রার্থনা করবে– বৈষম্যের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো সমাজে নিরীহ আর নির্যাতিত মানুষ খোলস ছেড়ে উদ্যত হবে সকল অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে"। কিন্তু আমাদের অনেকের এসব ভাবনা তো আর সব না। ঐ অপচক্রটা অনেক শক্তিশালী। তারা না এক নতুন নজরুলের পাশে দাঁড়ান, না মানিকের মতো ঔপন্যাসিকের দ্রোহটাকে সামনে আনেন।

এই অপপ্রক্রিয়াটা ফলাফলরূপে 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট'— গানের কবিকে গোসল করিয়ে তাঁর ভেতরের দ্রোহের উত্তপ্ত লাভা নিংড়ে, ঝেড়ে মুছে তাকে যেমন এক নিরেট জাতীয় মর্যাদায় বেঁধে মুসলমানের কবি বানিয়েছে; ঠিক তেমনিভাবে বোধ হয় মানিককেও কেবল পদ্মানদীর মাঝি বা পুতুলনাচের ইতিকথার মতো কথাশিল্পের অনন্য লেখকসত্তার ভাবনাচক্রে বেঁধে রেখেছে। এটা ঠিক, মানিককে একজন মহাপরাক্রম শব্দশিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ কার্পণ্য করেনি। তার সম্পর্কে খোঁজ রাখা অনেক মানুষ মানিককে মার্ক্সীয় চিন্তাবলয়ে বিচরণকারী লেখকও বলে। কিন্তু তার বিষয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত যেটা, তা হল– তিনি কী মাত্রায়, কী ভঙ্গিতে এই ভাবনার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন তা সবাই আর খুলে বলেন না। এই অসম সমাজটাকে পদাঘাত করার মানিকের দ্রোহকে কেউ আর সামনে আনেন না। যদি আনতেন, তাহলে অনেক আগেই *আরোগ্য* উপন্যাস লাখ লাখ পাঠকের কাছে যুক্তিসঙ্গতভাবেই পৌঁছুত। বলতে চাই, মানিকের দ্রোহটাকে সরাসরি সামনে আনা জরুরি ছিল।

২

একটা কথা সত্যি, মানিকের প্রথম দিকের কালজয়ী লেখাগুলোতে শক্তিশালী চরিত্রের সাথে মিশবার যে মজাটা আছে, অর্থাৎ অসাধারণভাবে সৃষ্ট চরিত্রে যে নিপুণতা মানুষকে মোহাবিষ্ট করে, তা এই উপন্যাসে নাই। এই উপন্যাসে মূলত উপলব্ধিটাই চরিত্র যেন! উপলব্ধি বা ধারণা বা আহ্বানটাই পরিশেষে বলিষ্ঠভাবে হাজির হয়েছে। এই উপন্যাসে সমাজ চিন্তাবিদের মতো ড্রাইভার কেশব আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আবার শহর এবং গ্রাম– এই দুই ধারার সমাজের নারীর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে শিক্ষিতা এবং সঙ্গীতশিল্পী তরুণী ললনা এবং গ্রামীণ সমাজকাঠামো থেকে এসেছে নিজের ভঙ্গুর

অস্তিত্ব রক্ষায় নিজেকে কেশবের পায়ে উজাড় করে দেয়া বিধবা মায়া এবং সেই সাথে দেহজ কামনায় উদগ্র মোহিনী। তারা এই উপন্যাসে নিজেদের কথা বলেছে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যেহেতু মানিক এই উপন্যাসে একটা নির্দিষ্ট আহ্বান জানানোর সংকল্পে স্থির ছিলেন, সেহেতু প্রতিটা চরিত্রকে আপন ডানায় উড়তে দেননি। নিয়ন্ত্রণ করেছেন। মানিক তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করেছেন নিজের সকল কথা বলার জন্যে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণটা এত সূক্ষ্ম যে বোঝার উপায় থাকে না যে এটা ঘটেছে। ফলে কোনোভাবেই কোনো চরিত্র কৃত্রিমতার ছায়ায় ঢেকে যায় নি। তবে যেহেতু এই চরিত্রগুলো মানিকের বিশেষ উপলব্ধির মাত্রা মাত্র, তার ফলে, *আরোগ্য* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বলে বিবেচিত কেশব ড্রাইভার নিজের জীবনযাপন প্রণালীর জন্যে তেমন একজন অসাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হয়নি। কিন্তু তার ভেতর যে মনোরোগের বাসের কথা বলা হয়েছে, সেই রোগটাই সমাজের রোগ হিসেবে যখন পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হতে থাকে, তখন পাঠক স্বভাবতই এই রোগ নিরাময়ের চিকিৎসার দিকে নজর দেয়।

এই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষের দিকটাতে এগুতে থাকলে মনে হবে, মানিক এটাকে তেল রঙের মাধ্যমে না এঁকে ওয়াটার কালারে কাজ করেছেন। প্রথমে হালকা রং টেনেছেন এবং ক্রমান্বয়ে তার ওপর গাঢ় রং চড়িয়েছেন। ওয়াটার কালারের প্রাথমিক বেইজ তৈরি করতে গিয়ে ড্রাইভারি পেশাটাকে তিনি একটা খোল বা ক্যারিয়ার বানিয়েছেন সমস্ত সমাজে চলমান মেশিন টেম্পারামেন্টের লোকগুলোকে দেখানোর জন্যে।

'কিন্তু কাহিনীটা বলছি কেশব ড্রাইভারের'

কিন্তু আমার মনে হয়েছে ক্যানভাসে রং চড়াতে গিয়ে তিনি ভুলবশত প্রথমেই ক্যানভাসের এক কোণে চড়া রং দিয়ে ফেলেছিলেন এবং পরে তা আর কারেকশন্স করা হয়নি। তার ফলে প্রথম কিছু পাতা পড়তে গিয়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সাধারণত ওয়াটার কালারে কাজ করতে গিয়ে বেইজ স্পেসে একবার একটু ডিসটিউনড হলে তা ঠিক করা বেজায় ঝামেলা। আর তা ঠিক না হলে পেইনটিংটা দেখার মজাটা ধাক্কা খায়। মানিক হয়ত সেই ডিসটিউনিংটা দেখতে পাননি। আবার এটা ভাবাও সত্যি কষ্টকর যে, মানিকের মতন একজন শক্তিশালী লেখক কোনো অসংলগ্নতা দেখতে পাবেন না? তা মানা যায় না। ফলে সে সব জায়গায় বেশ ক'বার ফিরে ফিরে গিয়ে ধৈর্য ধরে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি এটা কার ভুল? লেখকের না প্রকাশকের? কলকাতায় প্রথম প্রকুশের প্রায় সাত বছর পর ১৩৬৭ সালের (সেটা কি খ্রিষ্টীয় ১৯৬০?) দিকে পূর্ব পাকিস্তানে *আরোগ্য* প্রকাশের সময় প্রকাশকের দ্বারা কোন মুদ্রণ প্রমাদ কিনা?

যাই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থেকেই দুটো অসংলগ্নতা তুলে ধরছি। মানিক তাঁর এই উপন্যাসের মূল চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে একটা লেখার এক্কেবারে শুরুতেই কলকাতার পথে গাড়ি দুর্ঘটনার অবতারণা করেছেন এবং সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, দুর্ঘটনার সময়ে গাড়ির ভিতর একজন তরুণী এবং একজন প্রৌঢ় বয়সী ছিলেন। আবার, দুর্ঘটনা-পরবর্তী প্রায় শ'দুয়েক শব্দ পরেই গাড়ির ভিতর তিনজন নারীকে হাজির করেছেন। দুর্ঘটনার বর্ণনা এরকম :-

সেলুন গাড়িটার পিছনে আসছিল পুরানো লম্বাটে আকারের একটি গাড়ি। ব্রেক কষেও সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুন গাড়িটার উপরে। ফলে পিছনের সিটের ডান দিকের কোণ ঘেঁষে যে প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী তরুণীটির কোলে ঢলে পড়ে...।

এর ক্ষণিক পরেই তিনি ড্রাইভারকে একটু ধাতস্ত হবার সময় দিতে গিয়ে গাড়ির লোকদের সাথে তার কথোপকথন সাজিয়েছেন এভাবে,

ললনা বলে, আপনার কি হল কেশববাবু? দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

কেশব বলে, আমার এখনো মাথা ঘুরছে। চালাতে পারব না।

গীতা বলে, বাঃ বেশ! ওদিকে স্কুলে যে দেরি হয়ে যাবে আমার?

ললনা বলে, গাড়িতে এসে বসুন আমিই চালাচ্ছি।

মন্দ্রা হাত চেপে ধরে বলে, না ভাই! কাজ নেই!"

এখানে স্পষ্ট যে, গাড়ির ভিতর কোন প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোক ছিল না, ছিল তিনজন তরুণী। অর্থাৎ ললনার দুই মেয়ে-বন্ধু!

দ্বিতীয় অসংলগ্নতা হল– লেখক এই তিনজনের একত্র হয়ে গাড়িতে চেপে যাওয়ার ক্ষেত্রে কমন ফ্যাক্টর হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন স্কুল যাবার উদ্দেশ্যকে। আবার কিছু পরেই বলেছেন তারা কলেজে যায়। চিত্রটা ঠিক এরকম,

'সপ্তাহে দু'দিন গীতাকে স্কুলে যেতে এবং অন্য দু'দিন স্কুল থেকে ফিরতে বাসের পয়সা খরচ করতে হয়।'

অর্থাৎ গীতা স্কুলে যায় তা নিশ্চিত। কিন্তু ললনার ক্ষেত্রে তিনি তাকে কলেজ গোয়িং বলছেন।

'...একটা আস্ত গাড়িতে একলা কলেজ যাতায়াত করতে ললনার ভালো লাগে না বলে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থাটা চালু করেছে।'

এখানে ললনা কলেজছাত্রী। কিন্তু সমস্যা হলো, তার চেয়ে আট বছরের বয়সে বড় গীতা কিভাবে তবে স্কুলছাত্রী হয়?

'মন্দ্রা ও শোভনা ললনার ক্লাস ফ্রেন্ড। গীতা তাদের চেয়ে আট বছরের বড় হবে।'

ব্যাপারটা কি তবে ঘোরতর মুদ্রণ প্রমাদ? এখানে এটাই তো স্বাভাবিক, হয় ওরা সবাই কলেজছাত্রী, অথবা গীতা স্কুলছাত্রী হলে, সে মন্দ্রা ও শোভনা ললনার চেয়ে আট বছরের বড় নয়। বরঞ্চ আট বছরের ছোট। ললনা কলেজের ছাত্রী হলেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা তার দ্বারা সমাজবিষয়ক যে সকল পরিপক্ব সম্পর্কের অবতারণা মানিক করেছেন, সেটা একজন কলেজছাত্রীর পরিপক্বতায় সম্ভব। সুতরাং তার বন্ধুরা তো সবাই কলেজছাত্রীই হবে!

উপন্যাসের মূল স্পিরিটটা মেনে এই প্রমাদ বলুন বা ভ্রান্তি বলুন, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায়। এড়িয়ে গিয়েছি। তারপরও খটকা লাগে। মগজের কোষে যুক্তির বিন্যাসে এগুলো বাধা দেয়। এখানে এসে আমার এমনও মনে হয়েছে, মৃগী রোগের কারণে মানিক যেহেতু প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন, তবে কি এমন কিছু ঘটেছিল যে মৃত্যুর মাত্র বছর তিনেক পূর্বে উপন্যাসটির সৃষ্টিকালে তিনি অসুস্থ হচ্ছিলেন বারবার এবং তারই ফলস্বরূপ এই ভ্রান্তি ঘটেছে?

এ দুটো অসংলগ্নতা ছাড়া আরও একটা বিষয় আমি অনুভব করেছি যে, মূল চরিত্রকে ড্রাইভার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে অন্য কোনো পেশায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি তার চরিত্রকে পরিচালিত করলে, ধৃষ্টতা নিয়েই বলি, ভালো করতেন। তিনি কেশবকে এঁকেছেন এভাবে।_

মদ খায় না বলে গর্ববোধ করে না কেশব। বেশি খেতে ভয় করে তাই খায় না। ..একবার চড়া নেশা হলে হাজার ইচ্ছা করলেও রেহাই পাবে না, নেশার প্রক্রিয়াটাকে ঘটাতে দিতেই হবে। অথবা

লেখাপড়া ছেড়ে তাই সে বখাটে হয়েছে, কেরানি হবার বদলে হয়েছে মোটর ড্রাইভার।

আসলে কোন পাত্রে কোন বস্তু বা পণ্য রাখা হচ্ছে তা ভাববার অবকাশ থাকে, থাকতে হয়। এভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন ঢিলেঢালা ঢাকনাওয়ালা কৌটোয় চাপাতা রাখলে তা সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে না, নষ্ট হবে। অথবা দেশীয় কমদামি কাচের গ্লাসে টগবগে গরম পানি ঢালা মাত্র তা যেমন মুহূর্তে ফেটে চৌচির হবে। ঠিক সেভাবেই একজন ড্রাইভারও সমাজ বদলের জটিল চিন্তাগুলোকে মাথায় এনে প্রবল প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে না। এটা তার মেধার সক্ষমতার ভিতর নয়। একজন ড্রাইভারের যে জীবনযাপন পদ্ধতি, বা তার ভিতর যে পারিবারিক মূল্যবোধের জেনিটিক্যাল বিস্তার, বা তার ওপর পারিপার্শ্বিকতার যে প্রভাব, তা কোনোক্রমেই একজন ড্রাইভারকে গভীর চিন্তাচেতনার মানুষ হয়ে উঠতে দেয় না। যেমন ধরা যাক কোন একটা পর্যায়ে ললনা এবং ড্রাইভার কেশবের মাঝে সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং তারই পরিক্রমায় কেশবের বিশ্লেষিত উপলব্ধি এরকম–

মানুষের সভ্যতা ভালো ভালো বড় বড় কথার সভ্যতা নয়, ভালোভাবে বাঁচার সভ্যতা।

এটা মানিকের নিজস্ব উপলব্ধি তা বলাই বাহুল্য এবং এটাও ঠিক লেখক চরিত্রের ভিতর দিয়ে তার উপলব্ধির অনুপ্রবেশ ঘটাবে। কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছে, এখানে এই মাত্রার উপলব্ধির ধারণপাত্র যেন একজন ড্রাইভার হয়ে উঠতে পারে না!

দেখা যাচ্ছে, মানিকের নায়ক কেশব ড্রাইভারের পড়াশোনার উচ্চতা খুব বেশি না। আর বহির্বিশ্বের ধ্যানধারণা সে অর্জন করেছে তার গাড়িতে চেপে যাওয়া ললনা এবং বান্ধবীদের ম্যাগাজিন পড়ে। তিনি কেশবের মননশীলতার জায়গাটাকে উন্নত করতে মূলত ললনা, মন্দ্রা, শোভনা এবং গীতার কথোপকথনের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করেছেন।

কতটুকু সময়ের জন্যেই বা তারা গাড়িতে একত্রিত হয়! সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাদের কথাবার্তা তর্কবিতর্কের ভিতর থেকে নতুন দিনের মেয়েলি মনের এলোমেলো টুকরো টুকরো পরিচয় বেরিয়ে আসে। কেশব আশ্চর্য হয়ে, বিব্রত হয়ে শোনে।

কত বিষয়ে কি স্পিডেই যে ওরা কথা চালায়। গোড়ায় কেশব বেশিরভাগ কথা বুঝতেই পারতো না, মনে হতো ঠিক যেন পাখির কিচিরমিচির। শুধু শুনতে শুনতেই ভাষাটা তার আয়ত্ত হয়নি। ললনারা যে কাগজ আর মাসিক পড়ে, অবসর কাটাতে সেগুলো পড়েও ওদের ভাষা বুঝতে তার অনেক সাহায্য হয়েছে।

আমার হিসেবে মানিক সরলীকৃত অঙ্কে তার নায়ককে ড্রাইভারি পেশায় নিযুক্ত করেছেন সমাজটাকে দেখার জন্যে একটা জানালা পেতে। শহর আর নগর জীবনের যে ফারাক, শহুরে জীবনে ফাঁপা মূল্যবোধের মানুষগুলোর কীটসর্বস্ব আচরণ চোখে আঙুল

দিয়ে দেখানোর জন্যে। আমার বিবেচনায় এই দুর্বলতা সত্ত্বেও সামগ্রিক দেখানোটায় উপন্যাসটা জুড়েই একটা শক্তির দাপট আছে।

কেশবের গাড়িতে যেমন তার মালিক ওঠে, তেমন মালিকের কলেজপড়ুয়া মেয়ে ললনা এবং তার বন্ধুবান্ধবরাও ওঠে। ফলে কেশব ড্রাইভার দেখতে পায় সেই জীবনটা, যেই জীবনকে সে প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ সেই জীবন লাভের নিয়ত আকাঙ্ক্ষায় প্ররোচিত হয় তার সত্তা। ফলে শহর আর গ্রামীণ মিশ্র আবেশের এক দ্বৈতসত্তায় পরিণত হয় কেশব এবং দুই ভিন্ন সমাজ কাঠামোর দুই নারীর আকর্ষণে ভাঙচুর চলে তার ভিতর।

> হঠাৎ মমতার বন্যায় প্রাণটা যেন গলে যেতে চায় কেশবের। তার জন্যে এও সম্ভব করতে পারে মায়া? সন্ধ্যা রাতে চালা ঘরে একা রাঁধতে যার ভয় করে, ছেলেমেয়ে একজনকে পাহারা দরকার হয়, প্রায় মাঝ রাতে সে এসেছে কলাবাগান আর পুকুর পাড়ের অন্ধকার দিয়ে একা!

> আবার এরই পাশাপাশি কেশব বিদ্ধ হয় আরেক টানে।

> কর্মচঞ্চল কোলাহলমুখর শহর আবার তাকে টানছে।... বাড়ির ভিতর থেকে ললনার গানের সুর কানে না এলে তার স্বস্তি নেই। কিন্তু দিনান্তে আবার যে সে ক্রমে ক্রমে পাগল হয়ে উঠবে এখানে ফিরে আসতে?

জীবনযাপনের সনাতন খোঁপগুলোতে চলতে চলতে যে অনিবার্য ধারায় বিশ্লেষিত নতুন বোধ কেশবকে তাড়িত করে, সেই তাড়নায় অভিষিক্ত হয়ে অভ্যস্ত না হয়ে উঠবার ব্যর্থ যন্ত্রণায় সে বিদ্ধ! এই চলমান সংস্রোত কেশবের ভিতর অসুস্থতার জন্ম দেয়।

> কবে শুরু হয়েছিল অসুখ? কিসে এর সূত্রপাত?

> তন্নতন্ন করে নিজের অতীত জীবন খুঁজে কেশব এ প্রশ্নের জবাব পায় না। মনে হয় এ যেন তার জন্মগত বিকার, সারা জীবনে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

> বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়েছে লক্ষণগুলি। ধীরে ধীরে তার জীবনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নিজের বড় হওয়াটা যেমন খেয়ালে আসেনি বড় হওয়ার আগে, অসুখের বাড়টাও তেমনি খেয়াল করে নি লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হওয়ার আগে।

> ...যাই হোক, মোট কথা এই যে তার জীবন আর এই অসুখ এক সাথে গাঁথা। এ জীবনে তার রেহাই নেই।

৩

কেশবের এই অনুভূতিই হল চলমান সমাজের রোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে মুনাফার যে বিন্যাস অসামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে সেগুলোকেই মানিক এখানে বিশ্লেষণ করেছেন, দেখিয়েছেন এবং তাকে আক্রমণ করেছেন। বিষয়টা তিনি ললনা এবং কেশবের ভিতর তর্ক বাধিয়ে আদায় করেছেন।

> ললনা আবার বলে, বেশ একটু ঝাঁঝের সাঙ্গে বলে..। ওই গরিবের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই বলা যায় চালে আছি, বাড়াবাড়ি করছি। এত লোকের ভাঙা কুঁড়ে, আমাদের কেন মডার্ন ফ্যাশনের পাকা বাড়ি থাকবে?... এত লোকের চুলে জট গায়ে মাটি, নেংটি পরে আধপেটা খায় আবার না খেয়েও মরে– আমরা কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব, ভালো পোশাক পরব, ভালো খাব?

কিন্তু তার পরেই ললনা সব গুলিয়ে দেয়। সেটা মূলত ধনিক শ্রেণীর ইনকসিসটেন্সি। ললনা আর কেশবের তর্কটা চলে এভাবে,

: গরিবের ঘাড় ভেঙ্গে যারা টাকার কাঁড়ি করে তারাই আপনাদের দেয়।

: দেয় না, আমরা আদায় করি। আমাদের ছাড়া ওদের চলে না।

: গরিবদের ছাড়াও ওদের চলে না। আপনাদের টাকাও আসলে গরিবদের টাকা। ওরা গরিবকে শোষণ করে, আপনারা তারই একটু ভাগ পান।

আর স্বভাবতই ভেবেছেন সত্যিকারের মুক্তির পথ। আর খোঁজার মাঝে তিনি সতর্ক থেকেছেন মানুষ যেন নিয়তিনির্ভর না হয়ে পড়ে। তাই তিনি বলিষ্ঠভাবেই কেশবকে দিয়ে অপার্থিব শক্তির পরিধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কেশব যখন তার রোগ নিয়ে বড়ই বেচাল, অস্থির, তখন তার আরেক ভিন্নমাত্রার উপলব্ধি।

অবিশ্বাস? এক অজ্ঞাত দুর্জয় শক্তিতে অন্ধবিশ্বাসের অভাব? কত অসংখ্য মানুষের এ বিশ্বাস ভেঙে গেছে। কই তারা তো ভোগে না তার মত রোগে? হাসি আর আনন্দের অভাব তো নেই তাদের জীবনে।

মূলত মানিকের কাছে মানুষের ইতিবাচক শক্তিকেই মূল উপাদান হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সত্য হিসেবে তাই তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, মুক্তি আনতে হলে মানুষের ইতিবাচক শক্তিকেই অভিবাদন জানাতে হবে। মানুষের ভিতর সুর আর অসুরের দ্বন্দ্বে তিনি সুরকে জাগ্রত করার পক্ষে। ফলে সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি যেমন তির্যক হয়েছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং হত্যার বিরুদ্ধে, আবার মানুষের ভিতরের সত্যিকারের মানুষটাকেও করেছেন নমস্কার।

জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোটো এবং বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াই ধাত বিনে মানুষের...।

কিংবা কেশবের ভাবনায় নিজেই বলেছেন–

না, মানুষের জীবনকে যারা ব্যাহত ও ব্যর্থ করে রাখে কেবল তাদের ছাড়া সংসারে কোন মানুষকে বাজে ভাবা যায় না, ছোট ভাবা যায় না, ঘেন্না করা চলে না। সংসারে গলদ থাকলে মানুষের মধ্যে গলদ থাকবে না? সংসারে মহৎ মানুষ, বীর মানুষ, এগোনো মানুষ আছে বলেই হীন মানুষ, ভীরু মানুষ, পিছানো মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

তিনি মানুষের ভিতর শক্তির আকর খুঁজতে গিয়ে বা এই বিষয়ে তার উপলব্ধিকে সমাজের লোকের মগজে অনুপ্রবেশ ঘটাতে গিয়ে তিনি মূলত এই সমাজে নারীর মর্যাদা বা অবস্থানটাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসে একাধিক নারীকে নানান ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে তাদের সঠিক ক্ষতটা আমাদের দেখাতে। এদের মাঝে যে দুটো শক্তিশালী নারী চরিত্র ললনা এবং মায়া এখানে আবর্তিত, তাদের উপর কিছুটা আলো ফেললে এই সমাজে নারীর অবস্থানটা অনেক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসের মূল শক্তিমত্তাটাও টের পাওয়া যায়।

প্রথমেই ধরা যাক ললনার কথা। সে অর্থশালী পরিবারের কলেজপড়ুয়া মেয়ে। সঙ্গীতশিল্পী। কেমন শিল্পী সে?

ললনার গান অবশ্য এক ধরনের তন্ময় করে দেয়, ব্যাকুলতা জাগায়। তার গান শুনতে শুনতে মজা লাগে, রাগ হয়, ঘৃণা জাগে- তেজের সঙ্গে গর্জে উঠে জগৎ থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূর করতে কোমর বাঁধার তাগিদ জাগায়।

কিন্তু তার এই পারিবারিক এবং শিক্ষার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে তার আশপাশের পুরুষদের থেকে কৌশলে বাঁচতে হয়েছে। আবার যখন পারিবারিক অর্থশক্তি কমে গেছে তখন ললনাকে তার নিজের অবস্থান বদলাতে হয়েছে। সিনেমার জন্যে গান গাইতে শুরু করতে হয়েছে।

আজ মুস্কিলে পড়ে দরকার হয়েছে এই লড়াই শুরু করা। কিছুটা আত্মসমর্পণ কি করতে হয়নি? এতদিনের নীতি আর আদর্শের সঙ্গে খানিকটা আপোস !

কিন্তু মানিক এই ললনাকে তার মূল হাতিয়ার করার জন্যে ক্রমান্বয়ে হাতুড়ি বাটালে তাকে ধারালো করে তুলেছেন আগামী দিনের সাথে সংগ্রামের জন্যে।

আর সন্তানের জননী বিধবা মায়ার পরিপ্রেক্ষিতটা হল এরকম যে, মায়া তার অস্তি ত্বের প্রয়োজনে কেশবকে সব উজাড় করে দিচ্ছে।

রাত বেড়ে চলে। তখন আলো জ্বলে মায়ার ঘরে। জানালায় একটি লণ্ঠন বসানো আছে দেখা যায়। খানিক পরে নিভে যায় আলোটা। মায়ার সংকেত।

কিন্তু সেই মায়া সম্পর্কেই আবার কেশবের অবশেষে ধারণাটা এরকম–

খসে গেছে মায়ার ফাঁকির মুখোশ...। আর কোন উপায় নেই বলে, এ জীবনে অন্য কারও কাছে আরাম বিলাস গিন্নিপনার সাধ মিটবার সম্ভাবনা নেই বলে, তাকে মায়ার ফাঁদে ফেলে তাকে নিয়ে তার উপার্জনে বাকি জীবনটা একটু সার্থক করার সাধটাই মায়ার আসল।

এরপর আবার কেশবই উপলব্ধি করে এক ভিন্নমাত্রায়, যেখানে এই সমাজে পুরুষের লোভের দিকটা প্রকট হয়ে ওঠে বা নারীর অসহায়ত্ব।

কিন্তু তার নিজের দিকটা কি দাঁড়ায়?

মায়া আর মায়ার জীবন ও জগতকে ভালবেসেও সে রাত্রির অন্ধকারে মায়াকে ভোগ দখল করেছে...।

নারীর ভঙ্গুরতা তিনি এভাবে চিত্রিত করেছেন। যাদবের বৌ আদরিণীর এই এতখানি ঘোমটা। ঘোমটা তারই জন্য– সে ভাসুর।... ঘাটে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে গা ধোয়, স্নান করে- চারিদিকে কত চোখ, গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু ভাসুরের কাছে ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে থাকা চাই।'

আবার এক পর্যায়ে সেই অবস্থাটার উপসংহার টেনে কেশবের মনে হয়-

তবু আজকে প্রথম তার খেয়াল হয় যে, পুকুরে গামছা পরে নাইতে আর ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফেরাটা মেয়েদের লজ্জাহীনতা বা অসভ্যতা নয়, নিছক দুর্দশা।

৪

এই হাজারো অবহেলা আর দুর্দশার ভিতর মনিক মানুষের সেই ইতিবাচক শক্তিকেই প্রস্তুত করেছেন তার উপন্যাসের মাটিতে এবং সেই বিবর্তিত শক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সমাজ বদলানোর। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানিক এখানে দুর্বল সম্প্রদায় থেকেই

শক্তিমান প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে।

শহুরে ঠাটবাটে বড় হওয়া, আধুনিকা রমণী ললনার ভাবনাতেই তিনি বিস্তৃত পরিবর্তন এনে তাকেই প্রস্তুত করেছেন বিপ্লবের আলোকবর্তিকা হিসেবে। যে সমাজ কাঠামোতে প্রায় সকল মূল্যবোধ অর্থকে ঘিরে, সেই সমাজকাঠামো থেকেই তিনি তাকে বের করে এনেছেন পথনির্দেশিকা হিসেবে।

দেশের অবস্থা বদলাবার জন্য যে সভায় গিয়ে সে বিপ্লবের গান গেয়ে মানুষকে মাতিয়ে দেয়, সেটা যেন সে করে নিজের স্বার্থে। মুখ ফুটে যেন তার বলে দেবার দরকার ছিল যে মনেপ্রাণে সে দেশের দুর্দশার অবসান চায়।

অন্যদিকে যে কেশব ছিল কেবল একজন গাড়ির ড্রাইভার এবং রোগাক্রান্ত, সেই কেশবকেই তিনি বদলালেন ললনার নবরূপের শক্তির সংস্পর্শে এনে। এখানে তিনি দুটো শ্রেণীর শক্তি সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কেশব উপলব্ধি করে ললনার শক্তি এবং রূপকে নতুনভাবে।

আলো পেয়েছে বলেই ললনা আসল কথাটাও ধরেছে ঠিক- জগতটা পাল্টে নিতে হবে, সেজন্যে লড়তে হবে।

যে অনিয়মের জন্যে তার রোগ, সেটা রয়েছে সংসারে। সংসারটা না পাল্টালে অনিয়মটা যাবে না। তার রোগও আরোগ্য হবে না।

অবশেষে, মানিক একেবারেই সরাসরি লড়াইয়ের কথা দিয়েই উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। সারা উপন্যাসে যে ভঙ্গুর কেশব পাঠকের সামনে উপস্থিত ছিল, সেই কেশবই এখন তার এই নতুন লড়াকু ভাবনা নিজস্ব পরিমণ্ডলে বন্ধু কানুর সাথে ভাগাভাগি করছে দীপ্ত ঘোষণায়।

: আমার রোগ সেরে গেছে।

: সেরে গেছে? হঠাৎ?

: আমার অসুখ কেন জানিস? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পাল্টে দেবার লড়াই করবো বলে ঠিক করেছি।

কানু বলে, বটে! তা ও লড়াই তো কত লোকই করছে। সংসারটা যদ্দিন না পাল্টাচ্ছে তদ্দিন তোর রোগ সারবে না?

কেশব বলে, শোন, সে কথাই তো বলছি। সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করবো ঠিক করতেই রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য।'

৫

এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবতার খাতিরে আলো জ্বালিয়েছেন। সরাসরি লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন নিজের ভিতর। তিনি একজন মানুষের আপন মনোজগতে আমূল পরিবর্তনের ঈশারা করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে কেশব তার রোগ নিয়ে অস্থির, সেই কেশবই এখন ললনার সংস্পর্শে এসে বোধোদয়ের স্থানে প্রবেশ করেছে।

সেই ললনা সিনেমায় ঢুকেছে পয়সার জন্যে। তার রক্তমাংসের একমাত্র জীবন্ত দেবী সস্তা সিনেমায় ভিড়ে গেছে পয়সার দরকারে। কিন্তু তার রাগ হচ্ছে কই ?

মায়াকে নিয়ে যে ঘৃণা, তাই আবার নতুন বোধে উৎসারিত।

মায়া যদি লাথি ঝাঁটা বাখারির মার মুখ বুজে সয়ে যাওয়াই সংসারে নিয়ম বলে জানে, নিয়ম পালন করার জন্যে তাকে অমানুষ বলা চলে কোন যুক্তিতে?

অতঃপর কেশবের ভাবনাতে যে মূল সুর তা এই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপক্ষে।

দোষ ওদের নয়। মন্দ জগতের মন্দ নিয়ম খাটছে তাদের জীবনে, তারা কি করবে?

এই যে একজন মানুষের ভিতরে বোধোদয়, তা একেবারেই নিজের। আপন মুক্তির বোধ। এখানে লক্ষণীয় যে, মানিক এই লড়াইটা হবার জন্যে কোন রাজনৈতিক পরিকাঠামোর কথা বলেন নি। তার জীবনপ্রেক্ষিত বলে যে, তিনি ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

যাই হোক, প্রবলভাবে সমাজসচেতন এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ একজন লেখক তার স্বপ্ন সফল করার জন্যে একটা রাজনৈতিক কাঠামোকে বেছে নেবেন, অথবা তার পাঠককে সেই নির্দেশনা দেবেন এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ধরে নেয় অনেকে। কিন্তু এখানে কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্য যে কোন জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে হাজির হবার কথা তিনি খুব সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিধিভুক্ত সংগ্রাম বা আন্দোলন নয়, বরঞ্চ মানুষের নিজ পরিবর্তনের ধারায় খুবই চিরন্তন অবস্থানের কথা নির্দেশ করেছেন তিনি।

আসলে তার মনে হয়েছে নিজের ভিতর সঠিক লড়াই চালু থাকলেই, তার ভাষায় 'বদখত সমাজ'-এর বেশিরভাগটাই এমনিতেই সুবিধাবাদের ভূমিকা থেকে সরে যেতে বাধ্য।

আরোগ্য উপন্যাসের মাঝে সঠিক বোধ এবং সংগ্রামের এই যে বলিষ্ঠতার সুর, সেটাই একজন পাঠককে চাঙা করে তোলে। কেশবের ভিতর থেকে উচ্চারিত মানিকের একটা কথা শেষে না উল্লেখ করলে এই উপন্যাসের শক্তিটা অনুধাবন করা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

জগতের সব চেয়ে অগ্রসর মানুষ হবার অধিকার নিয়ে মানুষ হয়েই সে জন্মেছে।

এই বাক্যের মাঝে শব্দগুলো যখন গির্জা বা মন্দিরের হাজারো ঘণ্টাধ্বনির মত বুকের ভিতর বাজতে থাকে, তখন আর পাঠকের কাছে জীবনের পরাজয়গুলোকে তেমন গাঢ় মনে হয় না। বরঞ্চ একটা অদৃশ্য শক্তির তেজোদীপ্ততা আপন অনুভূতির তন্তুতে সমুদ্রের ঢেউয়ের অভিঘাতের মতো বারবার আছড়ে পড়ে *আরোগ্য* উপন্যাসকে সফেন করে তোলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিকীতে অবলোকন

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

আমাদের কথাসাহিত্যের ভুবনে অনন্য সৃজন-প্রতিভা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বছর জন্মশতবার্ষিকী। প্রসঙ্গত প্রস্তাব করব, অবকাশ এসেছে– আগ্রহী, উৎসুক পাঠক সাধারণ আমরা মহত্তম এই শিল্পীকে নানান মাত্রিকতায় অবলোকনের প্রয়াস পাব; এবং এতদ্‌সহ তাঁর সৃজনের-ফসলের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে উদ্যোগী হব।

তবে এমনতরো ক্ষেত্রে সাধারণত যা লক্ষ করা যায়, সেইখানেতে রয়ে থাকে যান্ত্রিক হেন আনুষ্ঠানিকতার চল; ছকে বাঁধা নানাবিধ আয়োজনই সবটা জুড়ে বসে। যেন তাই সমস্ত নিয়েই আমাদের তরফে যত যা দায় পালন করে যাওয়া। অর্থাৎ কিনা রুটিন–অনুষ্ঠান মোতাবেক উদ্‌যাপনেই আমাদের পরিকল্পিত সমুদয় প্রাপ্তি, এবং অতঃপর তাতেই এবারকার মতো ইতি।

সে যাক। এখন বিশেষ করেই বর্তমান-উদ্দিষ্ট প্রসঙ্গটি। আবারো তাহলে এই মতো করে বলবার যে, এ অবকাশে মুখ্যত সন্ধান আমাদের– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিচিতিতে উজ্জ্বলিত সেই তাঁকে, এবং জীবনভর তাঁর সৃজনসম্ভার যতটা সম্ভব অনুধাবন করে নেয়া। অতএব প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের তাগিদে গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি এইখানে,– মনে করি যে, 'সৃজনের শিল্পী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আদপে অবশ্য 'আমাদেরই লোক'। সচেতন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক আমরা ক্রমে পাঠ করে যাব,– শুরুর পর্বে *জননী*, *পদ্মা নদীর মাঝি*, তারপর *পুতুলনাচের ইতিকথা* ইত্যাদি থেকে সময় বহমানতার সমান্তরালে রচিত *ছোট বকুলপুরের যাত্রী*, *ফেরিওলা* অবধি তাবৎ, তাঁর লেখালেখির সম্ভার। তবে বুঝে যাব, গভীরে কী কথা কয় কমিটেড শিল্পী মানিক-সৃজন।

ধারণা করি, সৎ পাঠককুলের কাছে তেমন আর বিশেষ করে জানান দেয়ার অপেক্ষা রাখে না যে, সেইখানেতে বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ব্যাপী সাধারণ জনমানুষের ইতিকথা। যারা বঞ্চিত-শোষিত-নির্যাতিত, এবং সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। আবার, তাঁর লেখাতে একই সাথে ডাক শুনি প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম তখন হাতিয়ার হয়ে আসে।

প্রসঙ্গের জের টেনে এই সাথে খোঁজ করে নেব, একের পর এক তাঁর সৃজনসমূহের নামকরণই তো সরাসরি কেমন ইঙ্গিতবহ। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে বরং একটি নির্বাচিত তালিকামতো উপস্থাপিত করা যাক। লক্ষ করব, ইতিপূর্বেই তো যেমনটা উল্লিখিত হয়েছে তাঁর প্রথম দিককার প্রকাশিত উপন্যাস তিনটির নাম— *জননী* (১৯৩৫), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), আর *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)। অতঃপর কেমন সার বেঁধে আসছে— *সহরতলী* (১৯৪০), *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬), *চিহ্ন* (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০), *সোনার চেয়ে দামী* (১৯৫১), *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫২), *হলুদ নদী সবুজ বন* (১৯৫৬)

ইত্যাদি। আর অমনটাই একই সাথে ছোটগল্প সংকলন– যেমন *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮), *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৪৩), *আজকাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬), *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯), *ফেরিওলা* (১৯৫৩) ইত্যাদি।

জোরটা দেবে– স্বল্পায়ু (১৯০৮-১৯৫৬) এই লেখক সারাটা জীবন ধরে লিখেই গেছেন। কি বলব, ব্রতই যেন তাঁর লেখালেখির কমিটমেন্ট-এ। গণনার হিসেবে সেই সংখ্যা কত প্রচুর, বিবেচনা করি যে, জিজ্ঞাসা সেইখানেতে নয়। আসলে উৎসর্গপ্রাণ আমাদের এই শিল্পীর সড়ক যাত্রা কোন নিশানাতে, সম্মানটা নেয়ার প্রশ্ন সেইখানেতে। মনে করি সৎ-সচেতন পাঠক এ সম্পর্কে অবশ্য অবগত।

এখন আরো জেনে রাখছি পেশাজীবনে প্রধানতই সদা লেখালেখির কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁর ঘর বাঁধা। আর সেই সাথে উল্লেখ্য যে, গণমানুষের স্বার্থে আর্থ-রাজনীতির কর্মকাণ্ডে তাঁর আপোশহীন দীক্ষা। এবং তাই থেকে আপন বিশ্বাসের আদর্শে আমৃত্যু তিনি সম্পর্কিত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে। অতএব এই সুবাদে স্বভাবতই তাঁর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সাথে সক্রিয় ঘনিষ্ঠতা। অতঃপর যথার্থ করে যদি চিহ্নিত করবার প্রয়াস, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সেই সময়ে যে 'গণসাহিত্য' আন্দোলনের উদ্ভব-বিকাশ, তার পয়লা সারিতে গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, ভবানী সেন, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ, এদের সাথে অন্যতম পুরোধার ভূমিকায় আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে অবশ্য অতীব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি আদৌ কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠার কথা ছিল? আর, বলতে গেলে এক রকমের রাতারাতিই, এবং অমন খ্যাতির মাপের? বিবেচনাতে জানছি, পিতৃদত্ত আনুষ্ঠানিক নামকরণে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম পিতার কর্মস্থল বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনাতে দুমকা শহরে। প্রথম জীবনের লালনও তদঞ্চলে, মেদেনীপুরে, বাঁকুড়াতে, (যদিও ঊর্ধ্বতন বংশসূত্রে একদার দেশের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর)। লেখাপড়ায় ভালো ছাত্র, অংক শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম লিখিয়েছিলেন। অপর দিকে নিয়তির লিখনই বটে, তা খণ্ডাবে কে, কলেজে সহপাঠী বান্ধবদের সাথে বাজি রেখে গল্প লিখলেন 'অতসীমামী', আর এই গল্প ছাপা হল সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'বিচিত্রা'য় (পৌষ সংখ্যা, ১৩৩৫/১৯২৮)। অতঃপর আর নয় দেয়াল ঘেরা প্রেসিডেন্সি কলেজ চত্বরে ছাত্রত্বের দিন যাপন। পাঠরত সেই ছাত্র প্রবোধকুমার ইতিমধ্যে কথাসাহিত্যের অঙ্গনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথায় রইল পড়ে একাডেমিক অংক বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পাঠচর্চা, আর কোন বিপরীতে সুকুমার শিল্পসৃজনের ভুবনে বিচরণ।

আমাদের কথাসাহিত্যের আঙিনাতে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারে নতুনের বাঁক। এসে যাচ্ছে আধুনিকত্বের বাঁধ-উপচানো জোয়ার। চিহ্নিত করে নিতে চাইছি, এই পটভূমিতে নবীন প্রজন্মের বিশেষ এক অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতএব যে পটভূমিতে তাঁর 'হয়ে ওঠা', সেইটের অবয়ব অনুধাবনে আনতে চাই। সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে যদি তুলে ধরা, অবলোকন করেছি– সেই সময়, গত শতকের কুড়ির তিরিশের দশকে তখন চারদিক জুড়ে আর্থ-মন্দার আগ্রাসন, বিরাজমান সমাজে ভাঙনের চিড়, অভ্যস্ত মূল্যবোধের শেকড়ে অবক্ষয়, এবং বিশেষ করে সাধারণ্যে কেমন অসহায় ফ্রাস্টেশন ছড়িয়ে পড়ছে। অপর পক্ষে ক্রমে আরো আঁটো হয়ে আসছে বণিকী

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যশক্তির শাসন-শোষণ, সাথে তাঁদের জোট দেশের সামন্ত প্রভুত্ব, এবং ফায়দা সন্ধানী উঠ্‌তি মালিক-ধনীর দাপট। এমন আগ্রাসী, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোকাবিলায় দেশের শ্রমজীবী-নিম্নবিত্ত-মধ্য অবস্থানের গণমানুষের কাছে আসছে প্রতিরোধের জাগরণের ডাক, এবং ক্রমে দান বেঁধে উঠছে আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধিকার চেতনার উদ্বোধন।

বলা গেছে, শিল্প সাহিত্যের সৃজন-কর্মকাণ্ডে 'নতুনের বাঁক', লক্ষ করছি, এসে গেছেন 'বিদ্রোহী' কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা* ইত্যাকার তাবৎ গিয়ে পৌঁছুচ্ছে চল্লিশের দশকের সীমানাতে। আর ততদিনে এইখানেতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ এঁরা।

প্রতীকী এই তথ্যের সাথে এখন যোগ করে নেব, ইতঃপূর্বে এমনতরো করে আরো উল্লিখিত হয়েছে, এসে গেছে সেই সময়, যখনাবধি আধুনিকত্বের 'বাঁধ-উপচানো জোয়ার'। প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগে, শুধুই কি কেবল কাল-কালান্তর নিয়ে আধুনিকত্বে পালাবদলের কথা? তাই যদি সেইটে কিন্তু অংক গণনার অধিক নয়। বর্ণিত এই ক্ষেত্রে আসলে যা, সচেতন জনের অবশ্য জানা রয়েছে, মুখ্য-আবশ্যিক হয়ে আসে– কী কথা কয় সমকাল, সমকালের আধারে মানুষ, মানুষের সমাজ, এবং মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। অতএব বিবেচনাতে আনব, সুকুমার শিল্প-সৃজনের ভুবনে সেই মহাজন উক্তি– মোটে নয় 'শিল্পের জন্যে শিল্প', সর্বার্থেই মানুষের জন্য শিল্প। আর এই তাগিদেই আধুনিকত্বে ঠাঁই করে নেয় বিষয়বস্তুতে, উপস্থাপনায়, আঙ্গিকে ঐ সমকালের প্রতিফলন। উদাহরণত যেমন কিনা প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তখন *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪), নাটক *রক্তকরবী* (১৯২৪), *তাসের দেশ* (১৯৩৩), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৩)।

অতঃপর এখন সেই তাঁদের প্রসঙ্গ, এবং বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর প্রসঙ্গটি। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি, যেন বা ঝাঁক বেঁধে আবির্ভাব ঘটেছিল সবার তাঁদের। তবে নির্দেশিত করবার যে, অবশ্য অকস্মাৎই নয় তেমনটা। বরং আমাদের পূর্বালোচনার জের টেনে জেনে রাখবার– এই যে আধুনিকত্বের বৈশিষ্ট্যে প্রণীত উজ্জ্বল এঁদের সৃজন-স্বর্ণফসল, মূলতই তা সব বহমান কালের দাবিতে। আমাদের কবিতায়-কথাসাহিত্যে নতুন সড়কের দিশারী যাঁরা, ঔৎসুক্য জাগে কারা তাঁরা? প্রসঙ্গত এইখানে তেমন কতিপয় বিশেষ প্রতিভূকে স্মরণে আনতে চাইছি। বিবেচনায় আনছি 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে'র ধ্বজাধারী কাজী নজরুলের মোটামুটি সমকালীন এঁরা, এবং সহযাত্রী বটে। চিহ্নিত করে নেব, সেই কাতারে এসে যাচ্ছেন যাঁর যাঁর আপন বিশেষ স্বকীয়তা নিয়ে– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ। তালিকা দীর্ঘতর করবার মোটে প্রয়োজন দেখি না; এই থেকেই স্পষ্টত অনুধাবন করে নিতে পারি। এবং আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সচেতন-সন্ধিৎসু পাঠকের জন্যে কি তেমন করে জানান দিতে হবে– জীবনভর কেন লেখালেখির বলয়ে অমন ব্রত-সাধনা এঁদের? এবং কাদের জন্যেই বা আজীবন এঁদের তাবৎ কর্মকাণ্ড?

অতঃপর এখন বলবার যে, উপরেবর্ণিত সবটা মিলিয়ে নিয়ে, এবং সামগ্রিকতার পটভূমিতে-পরিবেশে তবে চিনে নেব– এই আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবারো

বলে নিই, যিনি সময়ের সন্তান এবং সময়ের পালা বদলের পটে যিনি দেশের আর্থ-সমাজ আর প্রতিবাদী বাম রাজনীতির আন্দোলনের সাথে অন্তরঙ্গ বিশ্বাসে সম্পর্কিত।

ফিরে আসি এখন শুরুর অন্তত এই কথাটিতে– মানিক জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁকে আমাদের অবলোকনের প্রয়াস। ইতিতে এমন নিবেদন যে, সীমিত অবকাশে এবং সাধ্যে তবু হয়তো বা খানিক কিছুটা করা গেছে। প্রসঙ্গত, তবে আমাদের কাছে কী যে অপার বিস্ময় বয়ে আনে– যেমন করে তাঁর সেই *পদ্মানদীর মাঝি*। কী কাহিনীর বিষয়বস্তু-ডকুমেন্টেশন, কী কাহিনীর স্বতঃ- এগিয়ে যাওয়া, কী চরিত্র সমাবেশ-চিত্রণ, চরিত্র-সংলাপ এক গোটাগুটিতে অমন উপস্থাপনা– এই সমুদয় ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখকের অবস্থান– অন্তরঙ্গ মেশামেশি কোন উৎসে? অবশ্য বুঝ্‌-এ আনতে পারি– কোন স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়, উদাহরণত যেমন কি না তারাশংকরের *ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, কী বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী, ইছামতী*, জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা*, হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী*, গোলাম কুদ্দুসের *বাঁদী*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *লালমাটি*, অদ্বৈত মল্ল বর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* ইত্যাকার এমনতরো আরো কত। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ঐ জিজ্ঞাসাটিরই বারবার মুখোমুখি হই– কেমন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনে *পদ্মানদীর মাঝি?* আর, জানাই তো রয়েছে আমাদের, একেবারে বিপরীত মেরুর এলাকাতে লেখকের আজন্ম বসবাস, এবং সর্বার্থেই তাঁর হয়ে ওঠা।

এখন বলব যে, তার পরেতেও ইনিই আমাদের সেই আপন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর আঁকা ছবিতে আমার বাংলার পদ্মানদী, এই পদ্মানদীর মাঝি, মাঝিদের জীবনাচরণ, এমন কি বাঙাল বুলি পর্যন্ত অমন নিখুঁত যথার্থতায় ফুটে ওঠে, কথা কয়। সৃজনের শিল্পী তখন বা স্থূল, মোটা দাগের তথাকথিত বাস্তব ডাইমেনশন পেরিয়ে যান। এমনতরো নজিরই কি যথেষ্ট নয়– শেক্সপীয়রের লেখনীতেই তো ডেনমার্কের *হ্যামলেট, ওথেলো দ্য মুর, দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মো. আশরাফুল ইসলাম

দিবারাত্রির কাব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) প্রথম রচিত উপন্যাস [১] এবং এটি তাঁর একুশ বছর বয়সের রচনা। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে রচিত এ উপন্যাস বহুমাত্রিক কারণে তাঁর অন্যান্য রচনা থেকে স্বতন্ত্র। প্রথম রচনা বলে এর রচনাকালে ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট কোন বিশ্ববীক্ষায় স্থির হতে পারেননি। তবে উপন্যাসটির নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্যে আমরা ভবিষ্যতের অসাধারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রসূচনা বা পূর্ব-অভিজ্ঞান লক্ষ করি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ এ উপন্যাসে রূপকের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই *দিবারাত্রির কাব্য* কেবল উপন্যাসই নয়, এটি রূপকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসটির ভূমিকায় ঔপন্যাসিক সে কথাই বলেছেন :

> *দিবারাত্রির কাব্য* আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
>
> *দিবারাত্রির কাব্য* পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক, –তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection- মানুষের এক এক টুক্‌রো মানসিক অংশ।[২]

শৈলীর মধ্য দিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিষয়কে আবিষ্কার, উদঘাটন ও বিকশিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই আলোচ্য উপন্যাসটির নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় আমরা শৈলীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সময় বলা হতো 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য খুব বেশি দিনের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। অল্পকালের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লিবিডো' ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণ-তাত্ত্বিক দর্শন, সমকালীন বিশ্বযুদ্ধোত্তর (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থিতিকাল: ১৯৩৯-১৯৪৫) বৈনাশিক পৃথিবীর অবসাদ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পাশবিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা– এ সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভা উন্মেষিত, লালিত ও বিকশিত। পিতার সরকারি চাকুরির (সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো) সুবাদে মানিককে প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়েছে এবং সে সূত্রেই বিচিত্র মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তাঁর হয়েছিল।[৩] এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখার ও জানার জগৎ ছিল বিস্তৃত। শৈশবকাল থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে ভালবাসতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মানিক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য[৪] এবং সমকাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পবোধ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় তিনি সবকিছুকে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস গঠনে এই বিজ্ঞানচেতনা (বিশেষ করে ফ্রয়েড ও হিউমের তত্ত্ব) গভীর প্রভাব ফেলেছিলো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে চারুচন্দ্রের (১৮৭৭-১৯৩৮) *পঙ্কতিলক* (১৯১৯) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৬৩-৬৪) *পাপের ছাপ* (১৯২২) গোকুলচন্দ্র নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) *পথিক* (১৯২৫) প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) *পাঁক* (১৯২৬) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) *বেদে (১৯২৮)* জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯) উপন্যাসে মানব মনের অতলান্তিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা লক্ষ করি। মানুষ যে কেবল বিবেক দ্বারাই পরিচালিত হয় না, এর সঙ্গে তার মধ্যে আদিম প্রকৃতিরও যে সংশ্লেষণ আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে চেতন-অবচেতনের ব্যাপারটি গুরুত্ব পেলেও মানব প্রকৃতির এই আদিমতা উপেক্ষিত থেকেছে।

মানব মন ও মস্তিষ্কের যে দ্রুত গতি তথা মনোবিজ্ঞানের চেতন-অবচেতনের ধারণা তা আরিস্টটলীয় (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) প্রারম্ভ-মধ্য-অন্ত্য সাহিত্য ধারণাকে ম্লান করে দিয়ে আত্মবিকশিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিকোণের ভিন্নতার কারণে একটি বস্তু বিভিন্নভাবে রূপ পেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৯১৯) সাহিত্যে সমকালীন বিশ্বপ্রেক্ষপটই রূপাঙ্কিত হয় বিভিন্ন সাহিত্যিক, লেখকের রচনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিপ্রেক্ষিতের ঔপন্যাসিক।

মন বা হৃদয় বলতে আসলে কিছু নেই– আছে কেবল মস্তিষ্ক। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যে চেতন (Conscious) ও অবচেতন (Unconscious) সত্তা রয়েছে। মানব মস্তিষ্কে থাকে 'ইদম' 'অহম' এবং 'সুপার ইগো'। মানসিক বিকারের কারণ মূলত আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থতার বিরোধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট। 'লিবিডোর আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেঃ বিশেষত, *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯২৯), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) এবং *পুতুল নাচের ইতিকথা*-য় (প্রকাশ ১৯৩৬) এই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সুগভীর প্রভাব লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের লিবিডো আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থতাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে বিশেষ করে *দিবারাত্রির কাব্যে* সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেছেন।

দিবারাত্রির কাব্য তিনটি ভাগে বিভক্ত : প্রথম ভাগে 'দিনের কবিতা' দ্বিতীয় ভাগে 'রাতের কবিতা' এবং তৃতীয় ভাগে *দিবারাত্রির কাব্য।* উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব প্রতিটি ভাগেই উপস্থিত এবং তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী ক্রমবিকশিত হয়েছে। *দিবারাত্রির কাব্য* কোন কাহিনী নির্ভর উপন্যাস নয়, ফলে 'গল্পভুক' পাঠকের আনন্দ এর পাঠে তেমন নেই। কেন্দ্রীয় চরিত্র হেরম্ব তার পূর্ব পরিচিতা সুপ্রিয়ার সংসার দর্শনে আসে পাঁচ বছরের ব্যবধানে এবং একটিমাত্র দিবসে দুজনের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, জটিলতা, পারস্পরিক আসক্তি ও আসক্তিহীনতা এবং সর্বোপরি মনোজাগতিক নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 'দিনের কবিতা' অংশটির সমাপ্তি। উপন্যাসখানির প্রতিটি ভাগ কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। এ কবিতা রূপকধর্মী এবং কবিতার রূপক মূল বক্তব্যের ইঙ্গিতবাহী। প্রথম ভাগ : 'দিনের কবিতা' অংশের কবিতা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হল :

'প্রান্তে বন্ধু এসেছে পথিক,
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি।
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
রাতের কাজল-লোভী কাতর নয়ন,
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।

স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়,
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিশ্বাস
গৃহাঙ্গণে মরীচিকা আনে।
বক্ষ রিক্ততার মমতায়
এ জীবনে জীবনের এলনা আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।' (১/৯৩)

উপন্যাসের প্রারম্ভে এমন প্রতীকী কবিতার সচেতন সংযোজনে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য আছে। আমরা প্রথম ভাগের ঘটনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তর্কময়তা এবং হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার জীবনের ক্রমপরিণতির যে আভাস লক্ষ করি তা-ই উপর্যুক্ত কবিতায় 'মৃত মৌমাছি', 'শুষ্ক জীর্ণ তৃণ'; 'মরীচিকা', 'বিশীর্ণ মরুতৃণ', ইত্যাদির প্রতীকে উঠে আসতে দেখেছি।

'দিনের কবিতা'র সূচনা হয়েছে সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপাইকুড়া গ্রামে হেরম্বের পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে। রাত বারোটা থেকে বিসনা হতে রূপাইকুড়া থানার সামনে আসতে সকাল সাতটা বেজে গেছে। হেরম্বের ছুটে চলার মধ্যেই উপন্যাসের শুরু এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শক্তি অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ সে ছুটেই চলেছে কিন্তু কোনো লক্ষ্যে সে পৌঁছতে পারে নি। দিনের কবিতা অংশের ব্যাপ্তি এক রাত বারোটা থেকে আরেক মধ্যরাত পর্যন্ত। বারো ঘণ্টার মধ্যবর্তী সময়সীমায় ঘটিত ঘটনাবলি নিয়ে 'দিনের কবিতা'। রূপাইকুড়াতে হেরম্ব ক্লান্ত, অবসন্ন, রিক্ত, শূন্য (ইতোমধ্যে হেরম্বের মা দেহত্যাগ করেছে এবং স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে) অবস্থায় পৌঁছে। কিন্তু হেরম্বের আগমন সুপ্রিয়ার কাছে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ও আনন্দের । হেরম্বের অর্থহীন পরিক্রমা তাকে রূপাইকুড়াতে আনলেও সুপ্রিয়ার মধ্যে এ আগমন উত্তেজনা ও আগ্রহের সঞ্চার করেছে। স্বামী অশোকের অনুপস্থিতিতে সুপ্রিয়া তার প্রাক্তন ভালোলাগার মানুষটিকে নানাভাবে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু হেরম্ব নির্বিকার। আসলে হেরম্ব নিজেই জানে না তার কতর্ব্য কি। সে একটি অমীমাংসিত চরিত্র হিসেবেই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল।

'দিনের কবিতা'র 'রান্নাঘর' একটি রূপক। এ শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'রান্না' ও রান্না-সম্পর্কিত শব্দ এসেছে বারংবার। সুপ্রিয়া কৈশোর বয়স থেকেই 'রহস্যময়' পুরুষ হেরম্বকে ভালবাসতো কিন্তু হেরম্ব 'ছেলেমানুষ' সুপ্রিয়াকে 'ভুলিয়ে ভালিয়ে' বিয়ে দেয় দারোগা অশোকের সঙ্গে যা সে মন থেকে কখনোই মেনে নেয়নি। কিন্তু যেহেতু বিয়ে হয়েছে তাই অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। বিয়ে পরবর্তীকালে সুপ্রিয়া জীবন ধারণের চেয়ে টিকে থাকার দিকেই বেশি মনোযোগী হল। আর সেই সংগ্রামের সাথী হিসেবে সে 'রান্নাঘর' কে বেছে নিল। মানসিক শূন্যতা বা জাগতিক অন্যান্য সমস্যাকে পাশ কাটাতেই সুপ্রিয়ার এ রান্নাঘরপ্রীতি:

'গৃহকর্মকে সে সত্যসত্যই এত ভালবেসেছে যে, মাছের ঝোলের আলু কুটতে বসেই তার মনের আঘাত মিলিয়ে আসে।' (১/১০০)

উপন্যাসটির প্রথম ভাগে একটি বিষয়ই স্পষ্ট বোঝা যায়- যা সহজেই কাছে পাওয়া যায়, যাকে পেতে কোনো শ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তার প্রতি মানুষের প্রাপ্তির তীব্রতা, প্রাবল্য থাকে না। সুপ্রিয়ার প্রতি হেরম্বের দৃষ্টিকোণও তাই। হেরম্ব সুপ্রিয়াকে স্ফটিকস্বচ্ছতার মতোই জানে, হেরম্বের কাছে সুপ্রিয়া রহস্যময়, অস্পষ্ট কোনো নারী নয়- তাই সুপ্রিয়ার প্রতি হেরম্ব নির্মোহ, আকর্ষণহীন। হেরম্ব যে সুপ্রিয়ার চিন্তা-চেতনার জগতের সবকিছু গভীরভাবেই বুঝতে পারে তা তার কথাতেই স্পষ্ট :

> ওই তোর প্রকৃতি। পনের বছর বয়সেই তুই একটু পেকে গিয়েছিলি, সুপ্রিয়া। বাইস-তেইস বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে, তোর মধ্যে সেটা পনের বছর বয়সে এসেছিল। তখনই তোর জীবনের দুটো পথ তুই একেবারে স্থির করে ফেলেছিলি। (১/৯৯)

হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার মধ্যে তাই প্রথম থেকেই হেরম্ব একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। ঔপন্যাসিক তাদের দূরত্বকে রূপকের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। 'উঠানে চনচনে রোদ' সুপ্রিয়া ও হেরম্বের মধ্যে দূরত্বের রূপক হিসেবে কাজ করেছে। প্রথম ভাগ তাদের দূরত্বের আভাসটি স্পষ্ট করেই সমাপ্ত হয়েছে। আর এ ভাগের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিয়া হেরম্বের বিপ্রতীপ, অব্যাখ্যাত, জটিল এবং অমীমাংসিত সম্পর্ক একটি অসাধারণ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে তা বুঝে নেবার বা চিন্তা করার ভার পাঠক-মস্তিষ্কের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর সে পরিপ্রেক্ষিত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

> 'আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।' (১/১১২)

প্রথম ভাগের শুরুর কবিতায় আমরা যে 'বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে'র কথা পেয়েছিলাম তা এ ভাগের অন্তিমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠার অপূর্ব অনিশ্চিত আশ্বাসের আভাস আছে।

এ ভাগে উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার কিছু পূর্ববর্তী ইঙ্গিত রূপকের সাহায্যে দেয়া হয়েছে। আবার রূপকের মাধ্যমেই দ্বিমুখী অবস্থানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুপ্রিয়ার স্বামী দারোগা অশোক বিশ্বাসহন্তী স্ত্রীর হত্যাকারী বিরসাকে গ্রেফতার করে থানায় এনেছে, অথচ তার নিজের ঘরেই তখন তার স্ত্রীর প্রণয়ী হেরম্ব উপস্থিত। এ ধরনের বিপ্রতীপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বি-মাত্রিক সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'রাতের কবিতা'য় 'আনন্দ' চরিত্রের নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। আনন্দ একরকম অজ্ঞাত, অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। হেরম্বের নিকট আনন্দ তাই মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল স্বাভাবিকভাবেই। 'রাতের কবিতা'য় দিনের চেয়ে রাতের অন্ধকারেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বেশি। প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা'র মতো দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা'র শুরুতেও একটি বার পঙ্‌ক্তির কবিতা যুক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ভাগের কবিতাও পূর্বভাগের কবিতার মতোই ইঙ্গিতবাহী, রূপকধর্মী। কবিতাটির শেষ ছয়টি চরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

> শান্ত রাত্রি নীহারিকা লোকে,
> বন্দী রাত্রি মোর বুকে উতল অধীর–

অনুদার-—সঙ্কীর্ণ আকাশ।
মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে
প্রেম তার মহামুক্তি। —নূতন শরীর
মুক্তি নয়, মুক্তির আভাস। (১/১১৩)

এ ভাগে প্রেম নিয়ে হেরম্ব ও আনন্দের মধ্যে বিস্তর আলোচনা ও তর্ক হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে যার বিশ্বাসে স্থির থেকেছে। আনন্দ নিজেকে একটা রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে এবং তা করেছে অনেকটা রাতের আঁধারের মতো। তাই উপর্যুক্ত কবিতায় 'রাত্রি' শব্দটি তিনবার ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক আনন্দকেই ইঙ্গিত করেছেন।

বাবা-মার প্রণয়ঘটিত বিয়ের পরবর্তীকালে একটি বিচ্ছিন্ন-বিশৃঙ্খল ও ক্লেদাক্ত পরিবেশে বসবাস আনন্দের মন ও মানসিকতাকে বিব্রত, বিপর্যস্ত, অসহায় করে তুলেছে, আনন্দ তাই কামনা করেছে চিরায়ত অবিচ্ছেদ্য প্রেম। কিন্তু হেরম্ব এই চিরায়ত প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। আনন্দ হেরম্বের আলোচনাতেও বারবার এ বিপরীতমুখী স্রোত উঠে এসেছে :

"আনন্দ বলল, 'প্রেম কতদিন বাঁচে?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'কি করে বলব আনন্দ! দিন গুণে বলা যায় না। তবে বেশীদিন নয়। একদিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস।'

শুনে আনন্দ যেন ভীতা হয়ে উঠল।

'মোটে'

হেরম্ব আবার হেসে বলল, 'মোটে হল? একমাসের বেশী প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ-— একমাসের বেশী হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দু'দিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তাই -— প্রেম এক তেজী নেশা।" (১/১৩০)

আনন্দের প্রেম নিবেদন হেরম্বের কাছে তাই উপেক্ষণীয়। তাছাড়া হেরম্ব 'প্রেম চিরকাল বাঁচে কোনদিন কোন অবস্থাতে কোন মানুষকেই এ শিক্ষা দিতে' চায় না। তাই:

"মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।" (১/১৪৮)

অর্থাৎ একটি অস্পষ্ট, রহস্যময় ও দুষ্প্রাপ্যকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সত্যিকার প্রেম। 'দিনের কবিতা'র সুপ্রিয়া 'দিন'আর 'রাতের কবিতা'র রহস্যময় অস্পষ্ট দুষ্প্রাপ্য আনন্দ 'রাত'।

তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'। পূর্বের মতোই যথারীতি এ ভাগেরও সূচনা কবিতার সংযোজনের দ্বারা। উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতির আভাস এ কবিতায় দেয়া হয়েছে। আনন্দকে আমরা উপন্যাস অন্তে আগুনে আত্মাহুতি দিতে দেখি। সে কথা কবিতায় এসেছে 'শ্মশানে'র রূপকে :

'সব্যসাচি! আমি ক্ষুধাতুরা,
শ্মশানের প্রান্ত-ঘেঁষা উত্তর-বাহিনী
নদীস্রোতে চলেছি, ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ- ভরা

ব্যর্থতার পরপারে। -- কে হে কাহিনী,
মোর লাগি রহিবে বসিয়া? (১/১৪৯)

দিবারাত্রির কাব্য ভাগে দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। এ-অধ্যায়ে সুপ্রিয়া ও আনন্দ অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির আগমন ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে কাহিনী অগ্রসরমান। বস্তুত, তৃতীয় ভাগের নামকরণটিও রূপক। আত্মাহুতি বা আত্মবিসর্জের মধ্য দিয়ে আনন্দ তার প্রেমকে চিরায়ত করে রাখতে চেয়েছে।

সুপ্রিয়া সহজপ্রাপণীয় তাই সে নির্মোহ হেরম্বের নিকট আকর্ষণহীন। আর অপ্রাপণীয় ও অস্পষ্টতর জন্য আনন্দ হেরম্বের কাছে আকর্ষণীয়। প্রণয় সম্পর্কে এই কথাই দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'Emotional Libido' বা প্রণয়ের সঙ্কটকে এবং তার ট্র্যাজিক পরিণামকে দেখানোর জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *দিবারাত্রির কাব্য* রচনা করেছেন।

নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের অভিনবত্ব, প্রাগ্রসরতা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আঙ্গিকশৈলীর যে নব নব নিরীক্ষা করেছেন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'শেষের কবিতাকে (১৯২৯) মনে করিয়ে দেয়। 'শেষের কবিতা'র প্রণয়সঙ্কটকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার দ্বারা হয়তো তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন।

দিবারাত্রির কাব্যের সংগঠনশৈলীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাধর্মী মনোভাব সুস্পষ্ট। এখানে প্রচলিত আদি, মধ্য, অন্ত্যরীতি (আরিস্টটলীয় রীতি) ভেঙ্গে দিয়েছেন তিনি। তিনটি পৃথক ভাগে (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ যথাক্রমে 'দিনের কবিতা', 'রাতের কবিতা' ও 'দিবারাত্রির কাব্য') কাহিনীর বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ উপন্যাসে নাটকীয়তা, সংলাপধর্মিতা, মাঝে মাঝে বিশ্লেষণধর্মিতা, গীতময়তা বা কাব্যিকতার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে *দিবারাত্রির কাব্যের* কাহিনী সুগঠিত নয় বরং বিক্ষিপ্ত, বিশ্লিষ্ট। কিন্তু এ বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট কাহিনীর উপস্থাপনেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য রকমের সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। রূপকের আশ্রয় নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কথাকে অল্প কথায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। দিনের রূপকে তিনি সুপ্রিয়ার চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন এবং আনন্দ এসেছে রাতের রূপকে। বিষয়, বাক্য এমনকি শব্দ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাই উপন্যাসটির কাহিনী সুগঠিত না হলেও এখানে কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি বা আতিশয্য অলক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক :

ক) থানার মিটমিটে আলোটির দিকে মুখ করে তারা বসল।
সুপ্রিয়া হঠাৎ বলল, 'বৌয়ের কথা বলতে কি আপনার কষ্ট হয়?
হেরম্ব পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জবাব দিল, 'না'।
'বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?'
'জানি না'। (১/১০৬)

খ) আনন্দকে দেখে হেরম্ব হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ থাকে না। (১/১১৮)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথমটিতে ঔপন্যাসিক আশ্চর্য রকমের সংযমী। হেরম্বের স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ বর্ণনা না করে হেরম্বের মুখ দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব 'জানি না' বলিয়েছেন যা একই সঙ্গে কৌতূহলউদ্দীপক ও সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত রূপবর্ণনার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পূর্বে লেখকরা রূপ-বর্ণনা করতেই যেখানে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করতেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৃষ্ঠাতো দূরে থাক কয়েকটি উপমা (অপ্সরী, বিদ্যাধারী, তিলোত্তমা, মোহিনী) দিয়েই সহজে এ পাঠ চুকিয়েছেন। অথচ এই এক পঙ্ক্তি পরিসরে রূপ বর্ণনার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দের সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন যা কেবল মহৎ বা বড় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই কবি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট *দিবারাত্রির কাব্য* একটি ব্যতিক্রমী কাব্যধর্মী উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় যে কয়টি কাব্যধর্মী উপন্যাস রয়েছে তন্মধ্যে *'শেষের কবিতা'*র পরেই *দিবারাত্রির কাব্যে*র অবস্থান। উপন্যাসের বিভিন্ন ভাগের প্রারম্ভেই কেবল যে কবিতা সংযোজন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নয়, বরং কাহিনী বা বক্তব্য বিষয়ের মধ্যেও মাঝে মাঝেই আমরা কবিতার লাবণ্য ও মাধুর্য্য লক্ষ করি যা আবার অনেকটাই গীতময় :

'আনন্দের ভিতরে ও বাহির সুন্দর, অপার্থিব, অব্যবহার্য সৌন্দর্যে তার দেহ-মন খণ্ডিত হয়ে আছেঃ সে রঙিন কালিতে ছাপানো অনবদ্য কবিতার মতো।' (১/১৭৫)

চরিত্র ও চরিত্রায়ণ এক নয়। প্রথমটি উপস্থাপিত চরিত্র, আর, দ্বিতীয়টি উপস্থাপিত করার পদ্ধতি বা কৌশল। *দিবারাত্রির কাব্য* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রচিত উপন্যাস হলেও এতে বিশেষত হেরম্ব চরিত্রের আভ্যন্তর পটভূমিকে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সে যে অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত এ কথা নিজেই স্বীকার করেছে। হেরম্বের চরিত্রের অস্বাভাবিকতা আমরা প্রথম থেকেই লক্ষ করি। তাঁর চিন্তার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য নেই। বার বছর বয়সেই হেরম্ব তার চেয়ে চার বছরের বেশি বয়স্কা যুবতী সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে বিয়ে করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেছিল। আবার এই হেরম্বই ছত্রিশ বছর বয়সে মালতীর কন্যা আনন্দকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে হেরম্বের আচরণ সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল না। হেরম্বের ঔদাসিন্যের কারণেই তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। হেরম্বের প্রতি সুপ্রিয়ার গভীর অনুরাগের কথা জেনেও সে তাকে গ্রহণ করেনি বরং 'ভুলিয়ে ভালিয়ে' দারোগা অশোকের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বিয়ে দিয়েও হেরম্ব তার ভাব, আবেগ বিসর্জন দেয়নি। বিয়ের পাঁচ বৎসর পর সে আবার সুপ্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে। এ প্রসঙ্গ আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের 'সুরেশ' চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুরেশ যেমন মহিম-অচলার গৃহদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল হেরম্বও তেমনি সুপ্রিয়া-অশোকের গৃহের শান্তি নষ্ট করেছে। হেরম্ব চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সে অমীমাংসিত চরিত্র। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে সে, তার কর্তব্য সম্পর্কে সে সচেতন নয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আর তাই সংসার, সমাজ, প্রেয়সী সবার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে, একাকিত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আনন্দের প্রতি হেরম্বের যে প্রেম তাও স্বাভাবিক নয়, বরং

আনন্দের রহস্যময়তাই তাকে আকৃষ্ট করেছে এর বেশি কিছু নয়। আর তাই অপ্রেমের যন্ত্রণায় হেরম্বকে দগ্ধ হতে হয়েছে, যদিও আনন্দ আত্মাহুতি দিয়ে যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র হেরম্ব ব্যতীত অন্যান্য মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্রগুলির (অনাথ, মালতী, সুপ্রিয়া, আনন্দ, দারোগা অশোক) সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সম্ভব। এক সময়ের মাস্টারমশায়, পরবর্তীকালের প্রেমিক অনাথ যার হাত ধরে বার বছরের মালতী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সেও শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনাচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মালতী ও হেরম্বের জবানীতে আমরা জানতে পারি সুদর্শন পুরুষ অনাথের ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা আকর্ষণ করার মতো। আর সে আকর্ষণেই মালতী তার প্রেমাসক্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা উপন্যাসে অনাথের উপস্থিতিতে প্রেমের সে রকম কোন নিদর্শন লক্ষ করি না। জীবিত থেকেও অনাথ যেন অনেকটা জীবনমৃত। তাঁর আচরণ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল, জীবন যাপনে অসুস্থ মানুষের একাধিক উপসর্গ স্পষ্ট। হেরম্বের কাছে যেমন অনাথকে 'রূপকথার রহস্যময় মানুষ' মনে হত, পাঠকের কাছেও শেষ পর্যন্ত অনাথ রহস্যময় থেকে গেল। তার অসংলগ্ন কাজ ও কথার কিছু দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি :

> ধ্যানে বসার জন্য আসন খুঁজে না পেয়ে মালতীকে বলে– 'আসনটা কোথায় লুকিয়েছে, বার করে দাও মালতী। আসন কখনো সরাতে নেই এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।' (১/১২১)
>
> তারপর সে আনন্দের কাছে তার চাদরের সন্ধান করে আসন পেতে বসার জন্য। মালতীর জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে অনাথ বলে– 'আসনটা লুকিয়ে তুমি ভালোই করেছ মালতী। দশ বছর ধরে ব্যবহার করে আসনটাতে কেমন একটু মায়া বসে গিয়েছে। একটা জড় বস্তুকে মায়া করা থেকে তোমার দয়াতে উদ্ধার পেলাম।' (১/১২২)

এমনই বহুমাত্রিক অসংলগ্নতায় অনাথ চরিত্র পূর্ণ। অনাথ পলায়নবাদী চরিত্র। স্ত্রী কন্যা বা সংসার কোন কিছুর প্রতিই তার আকর্ষণ নেই। তাই এক সময় নিজেই অজানার পথে হারিয়ে যায়।

মালতী স্বাভাবিক হলেও সুস্থ নয়। জীবনে তার কোন প্রত্যাশাই পূরণ হয়নি। যাকে ঘিরে সংসার রচনার আশায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সেই অনাথ তাকে চরম ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। সংসার গড়া তো দূরে থাকুক, তারা লোকালয় ছেড়ে 'ভাঙ্গা প্রাচীরে ঘেরা বাগান' ও 'বাগানের শেষের দিকে গাছপালায় প্রায় আড়াল-করা ছোট একটি মন্দিরে' বসবাসে বাধ্য হয়েছে। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, স্বামীর ঔদাসীন্য প্রভৃতি নানা কারণে মালতী হয়েছে বিকারগ্রস্ত ও নানা রকম বিকৃতি তাকে পেয়ে বসেছে। সুখের অত্যধিক বাসনা এই চরিত্রটিকে সুখহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মালতী তাই অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলে মরেছে সর্বক্ষণ। মালতীর জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, অপ্রাপ্তিজনিত হতাশবোধ ইত্যাদি তার নিম্নোক্ত কথায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

> --- সুখ? নাইবা রইল সুখ। সুখ তো শুঁট্কি মাছ। জিভকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেলে না। সুখ স্থান জুড়ে নেই, প্রেম দিয়ে ভরে নাও, আনন্দ দিয়ে পূর্ণ কর। সুবিধা কত। মদ নেই যদি, মদের নেশা সুধায় মেটাও। (১/১১৮)

সুপ্রিয়া অত্যন্ত রোমান্টিক চরিত্র। ভাব, আবেগ, ভাবাবেগ, ভাবালুতা প্রভৃতির মিশেলে এ চরিত্র নির্মিত। বাল্যপ্রেমের মুগ্ধতার জগতে সে সর্ব সময় বিচরণ করে এবং

এ মোহ থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি। এ মোহই তাকে বিকারগ্রস্থ করে রেখেছে এবং সে সারা জীবনের জন্য হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তবুও 'প্রেমে, ঈর্ষায়, একনিষ্ঠতায়, দায়িত্ব সম্পাদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুপ্রিয়া সজীব চরিত্র বলে প্রতীয়মান হয়।'

আনন্দ এ উপন্যাসের সবচেয়ে সজীব সচল চরিত্র। একাধিক মানসিক রোগীর মধ্যে সে-ই কেবল সুস্থ স্বাভাবিক। আনন্দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ভাব বা আইডিয়া' মাত্র হলেও উপন্যাসে তার সবল পদচারণা লক্ষ করা যায়। আনন্দ একটি অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে কিন্তু নিজে অসুস্থ হয়নি। অনেকটা নীরবে নিভৃতে অর্থাৎ লোকালয়ের কোলাহল ছেড়ে বাগানের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরে বড় হয়েছে, আনন্দ। তাই তার মধ্যে অকৃত্রিমতা, আদিম সারল্য, সৌন্দর্যবোধ লক্ষ করা যায়। আনন্দ তার বিশ্বাসে স্থির। সে একই সঙ্গে আনন্দ, বেদনা প্রেম হতাশা ও মৃত্যুর ভাব মূর্তি।

দিবারাত্রির কাব্য একটি রূপক উপন্যাস। ফলে এ উপন্যাসের চরিত্র উপস্থাপনের পদ্ধতি তথা চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকাশ্রয়ী। রূপকের নানা রূপে তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে উপস্থাপন করেছেন। এই রূপকের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী ভাষাবৈশিষ্ট্য যোগ হওয়ায় চরিত্রগুলি নিজ নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন বিশেষ চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একই উপমান একাধিকবার ব্যবহার করা। *দিবারাত্রির কাব্যে হেরম্বের* দৃষ্টিকোণ থেকে সুপ্রিয়ার শীতল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্যে ঔপন্যাসিক দুবার 'ইঁদারার জল' ও 'দার্জিলিঙের হাওয়া'র উপমান ব্যবহার করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী সময়ে রচিত উপন্যাসেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে তিনি 'কপিলা' চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন- 'অবাধ্য কঞ্চির মতো কপিলা'।

দিবারাত্রির কাব্যে ঔপন্যাসিক একাধিক পরিচর্যারীতির ব্যবহার করেছেন, তবে, এ উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণরীতিতে রচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়েই উপন্যাসটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন। নানামাত্রিক পরিচর্যারীতির (Treatment) ব্যবহার আলোচ্য উপন্যাসটির নন্দনতাত্ত্বিক দিককে বিশিষ্টতা দিয়েছে। নিম্নে কিছু রীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল :

কাব্যধর্মী এ উপন্যাসের শুরুতেই চিত্রাত্মক রীতির (Pictorial treatment) প্রয়োগ লক্ষ করা যায়:

> পুব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রামের সবুজ চাপড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি দু'টি নয়, ধোঁয়ার নৈবেদ্যের মতো অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে– অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই, আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধমাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতকগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। (১/৯৫)

কখনো কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতিকেও (Analytical treatment) আশ্রয় করেছেন। আনন্দকে প্রথম দর্শনের পর হেরম্বের মনের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতীত প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে (Flash back) বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতির আশ্রয় নিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

...কিন্তু হেরম্বের কথা আলাদা। এই মালতীকে নয়, সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে সে আজও ভুলতে পারেনি। এই স্মৃতির সঙ্গে তার মনে বারো বছর বয়সে, খানিকটা কাঁচা ভাবপ্রবণতা আজও আটকে রয়েছে। আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্ব-শিল্পীর কারখানা সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, বোবা পশু ও পাখির মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ এক সময় বসন্তের বাতাস এসে যে ভাবে নাড়া দিয়ে যায়, আনন্দের আবির্ভাবও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনি ভাবে নাড়া দিয়ে দিল। (১/১১৯)

সংলাপধর্মিতা এ উপন্যাসের কাহিনী বা ঘটনার চলমানতায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। একটু বর্ণনা আর সংলাপ, সুপ্রিয়া-হেরম্ব, হেরম্ব-মালতী, হেরম্ব-আনন্দ-এর মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং এ সংলাপধর্মিতাই উপন্যাসটির সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী :

ক. মালতী আঁচল থেকে চাবি খুলে হেরম্বের হাতে দিল।

'আমি চললাম, হেরম্ব।'

হেরম্ব শান্তকণ্ঠে বলল, 'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

মালতী বলল, তুমিও খেপলে নাকি? আনন্দ একা রইল, তুমিও যাচ্ছ! আনন্দের চেয়ে আমার জন্যই তোমার মায়া বুঝি উথলে উঠল?'

হেরম্ব বলল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব আছে। রাতদুপুরে আপনাকে আমি একা যেতে দিতে পারিনা। (১/১৮৫)

খ. বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙে হেরম্ব দেখতে পায় তার ঘুমের অবসরে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে বাইরে দারুণ দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। ...উঠে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। (১/১৬৭)

এ ধরনের নাটকীয় পরিচর্যারীতি (Dramatic Treatment) এ উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ *দিবারাত্রির কাব্যের* পুরো ঘটনা, বিষয় বা কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে দৃশ্যবদ্ধ পরিচর্যারীতির (Scenic treatment) মাধ্যমে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কিছু বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে একাধিক চরিত্রকে (হেরম্ব, আনন্দ, সুপ্রিয়া) স্থাপন করে তাদের বক্তব্য, উচ্চারণ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন।

উপন্যাসটির কাব্যিক পরিচর্যার কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি প্রতিভা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এ উপন্যাস একটু ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। উপন্যাসের প্রতি ভাগেই অন্তর্মথ গভীর আবেগের সাথে বর্ণিত বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে বেদনাময় কবিতাক্রান্ত।

লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হলেও প্রয়োজনে উপন্যাসের একাধিক চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুও ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে হেরম্বের প্রেক্ষণবিন্দু সর্বাধিক ব্যবহৃত হযেছে। বর্ণনাধর্মিতা, কার্যকারণ ব্যাখ্যা, চিত্ররূপময় ও চিত্রকল্পময় পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমা ব্যবহার- আলোচ্য উপন্যাসের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান দিক। প্রসঙ্গেক্রমে কিছু উপমা উদ্ধৃত করা গেল :

ক. আনন্দের নাচের জন্যই যেন নিশীথ আকাশের নিচে এই সরস কোমল গালিচা বিছানো আছে। (১/১৮৫)

খ. বিরাট যজ্ঞানলের মতো ঘৃতসিক্ত কাষ্ঠের স্তূপ হুহু করে জ্বলে উঠল। সমস্ত উঠান সোনালী আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। (১/১৮৮)

উপন্যাসে সময় ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণত দু'ধরনের নিয়ম প্রচলিত। চরিত্রের আভ্যন্তর পরিবর্তনের চিহ্নগুলি স্পষ্ট করে অথবা প্রহর-দিন-মাস-বছরের সীমা (যাকে ক্যালেন্ডারের সময়ও বলা যায়) উল্লেখের মাধ্যমে। *দিবারাত্রির কাব্যে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত কোন রীতিরই অনুসরণ করেননি। এ উপন্যাসের সময় উল্লম্ফনধর্মী বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনিয়মতান্ত্রিক। হেরম্বের ভাবনায় অকস্মাৎ স্মৃতির সময় উঠে এসেছে শৈল্পিকভাবে :

> বহুদিন আগে একবার এক বর্ষণ-ক্ষান্ত নিশীত স্তব্ধতায় সজল বায়ুস্তর ভেদ করে হেরম্বের কলকাতার বাড়িতে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল। স্ত্রীর ভয় তার মনে সংক্রমিত হওয়াতে বাকি রাতটা হেরম্ব আতঙ্কে ঘুমোতে পারেনি। আজ কিছুক্ষণের জন্য তার অবিকল সেই সকল ভয় করতে লাগল। (১/১৫৫)

জটিল, কঠিন, দ্বন্দ্বময় মনস্তাত্ত্বিক নানা টানাপোড়েন এবং প্রেম ও অপ্রেমের উপাদান নিয়ে *দিবারাত্রির কাব্য* রচিত বলে এর ভাষা বৈশিষ্ট্য একটু ভিন্নমাত্রার। উপন্যাসে ব্যবহৃত কেবল উপমা, রূপক, চিত্রকল্পই নয় এ শব্দগুলো পর্যন্ত আমাদের রোজকার বা প্রাত্যহিক জীবনের নয়। চিত্রকল্পময় ও বিশ্লেষণাত্মক ভাষা বৈশিষ্ট্য এ উপন্যাসটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষা বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছেন তাতে ফল্গুস্রোতে গোপন কাব্যময়তা ও সঙ্গীতময়তা বিদ্যমান এবং এর মতো সংযত, সংহত ও আবেগী ভাষা অন্যত্র দুর্লক্ষ্য, আবেগময় ভাষারীতি :

> আকাশ আর বাতাস থেকে আমার মন আমার হৃদয় নিজেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেনি, তাদের প্রত্যেকটি কণা এসেছে মানুষের ভাণ্ডার থেকে। আমরা জন্মাই একটা বিপুল শূন্য, আজীবন মানুষের সাধারণ হৃদয়-মনের সম্পত্তি থেকে তিল তিল করে ঐশ্বর্য নিয়ে সেই শূন্য পূরণ করি। আমরা তাই পরস্পর আত্মীয়, আমরা তাই প্রত্যেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের ভালবাসা যখন মরে যাবে, অন্য মানুষ তখন ভালবাসবে। আমাদের প্রেম ব্যর্থ হবে না। (১/১৫৭)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম পরিস্ফুটন ঘটেছে তাঁর প্রথম রচিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্যে*। ঔপন্যাসিক নিজে একে 'খাপছাড়া, অস্বাভাবিক' বললেও এক ধরনের আপাত-অসংলগ্নতা, আপাত-অস্পষ্ট কাহিনী ও চরিত্র-বিন্যাসে এবং রূপকের নতুন রূপ রচনার মধ্য দিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে আধুনিকতার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। আবার, এ উপন্যাসে লক্ষণীয় আধুনিকতার নানা লক্ষণ 'প্রটাগনিস্ট' চরিত্র হেরম্বের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সুরাসক্ত ও লোকালয়ের বাইরে ধর্মচর্যার আড়ালে অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মালতী ও তার স্বামী অনাথের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা ও চূড়ান্ত মানসবিচ্ছন্নতার মধ্যেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক জীবনদৃষ্টির লক্ষণ পরিস্ফুট। হেরম্বের মননধর্মী জটিল আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মহনন, আত্মখনন ও আত্মখণ্ডন প্রবণতাই তার চরিত্রে আধুনিকতার আদলটিকে স্পষ্ট করেছে। উচ্চ শিক্ষিত হেরম্ব :

জটিল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। তার মন সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়, জীবনে সে এত বেশী পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। (১/১১৯)

উপনিবেশ-শাসিত সময়কালের মধ্যে বেড়ে ওঠা হেরম্ব কোথাও শান্তি পায়নি, সর্বত্রই সে অস্থিরতা লক্ষ করেছে। সমকাল তাকে নিঃসঙ্গ ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন করেছে। তাই সে পলায়নবাদী, সুপ্রিয়ার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। 'বরফের মতো শীতল' হেরম্ব নীতিবাদী নয়, তবে বিপন্ন এক সত্তা। তার একটি পারিবারিক জীবনপট ছিল- স্ত্রী ও কন্যা। স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে। তার জন্য হেরম্বের কোথাও কোন বেদনাবোধ নেই। আর মেয়ের সম্পর্কে তার উক্তি :

একটা মেয়ে আছে - দু'বছরের। আছে বলছি এই জন্য যে পনের দিন আগে ছিল দেখে এসেছি। এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকলে নেই। (১/১১৭)

অর্থাৎ স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতায় জড়ানো সংসার জীবন থেকে সে পুরোপুরি বিচ্ছন্ন 'Alienated' এক 'প্রবাসী' মানুষ। উপর্যুক্ত উক্তিটির সঙ্গে আমরা পরবর্তীকালের আধুনিক ফরাসি ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কাম্যুর (১৯১৩-১৯৬০) *আউটসাইডার* (১৯৪২) উপন্যাসের নায়কের মুখে তার মা'র মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কিত উক্তিটির তুলনা করতে পারি। কাম্যু সেখানে উচ্চারণ করিয়েছিলেন- "Mother died today or may be yesterday- I can't be sure" দেখা যাচ্ছে কাম্যুর পূর্বেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিকল 'পূর্বাভাস' ধ্বনিত করে গেছেন। হেরম্বের সংলাপে-চিন্তায় মানুষের বেঁচে থাকার এই ভয়ংকর অর্থহীনতা ও অস্তিত্বের গূঢ় সংকটের দিকটি উদঘাটিত :

মানুষ কি করবে বল? পঞ্চাশ-ষাট বছর তাকে বাঁচতে হবে অথচ তার কাজ নেই।

'কাজ নেই?'

'কোথায় কাজ? কি কাজ আছে মানুষের? অঙ্ক কষা, ইঞ্জিন বানানো, কবিতা লেখা? ওসব তো ভান, কাজের ছল। পৃথিবীতে কেউ ওসব চায় না। একদিন মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না, মানুষের কিছু এসে যায়নি। আজ মানুষেরে ওসব আছে কিন্তু তাতেও মানুষের কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ নিরূপায়, তার মধ্যে যে বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভরতেই হবে। মানুষ তাই জটিল অঙ্ক দিয়ে, কায়দাদুরস্ত ভাল ভাল ভাব দিয়ে, ইস্পাতের টুকরো দিয়ে, আরও সব হাজার রকম জঞ্জাল দিয়ে সেই ফাঁকটা ভরতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখো, জীবন নিয়ে মানুষ কি হইচই করছে, কি প্রবল প্রতিযোগিতা মানুষের, কি ব্যস্ততা! কাজ! কাজ! মানুষ কাজ করছে! বৌকে কাঁদিয়ে বিজ্ঞানী খুঁজছে নূতন ফরমূলা, আজও খুঁজছে কালও খুঁজছে। দোকান খুলে বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে চারিদিকে ছেয়ে ফেলে, উর্ধ্বশ্বাসে ব্যবসায়ী করছে টাকা। ঘরের কোণে প্রদীপ জেলে বসে বিদ্রোহী কবি লিখছে কবিতা, সারাদিন ছবি এঁকে আর্টিস্ট ওদিকে মদ খেয়ে ফেনাচ্ছেন জীবন। কেউ অলস নয় আনন্দ, কুলি মজুর গাড়োয়ান তারাও প্রাণপণে কাজ করছে। কিন্তু কেন করছে আনন্দ? পাগলের মতো মানুষ খালি কাজ করছে কেন? মানুষের কাজ নেই বলে। আসল কাজ নেই বলে। ছটফট করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই বলে। (১/১৩১)

জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতাই হেরম্বের সঙ্গী। স্বীয় জীবনের এই নিরর্থকতা হেরম্ব চরিত্রকে শুধু আধুনিককালের লক্ষণে চিহ্নিত করেছে তাই নয়, চরিত্রটিকে

আধুনিক উপন্যাসের 'অ্যান্টিহিরো (Anti-hero)'-র পর্যায়ভুক্ত করেছে। আর এ সব বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে নান্দনিক কুশলতায় অঙ্কন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাসেই তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'বাস্তবকে স্বীকৃতিদান'। এর সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য স্মরণ করতে পারি আমরা:

ক. ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।[৯]

খ. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পর্কে - তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরামোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।[১০]

গ. কল্পনা প্রসঙ্গে - উপন্যাসেও কাব্যসৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হয়ে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস-জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই।[১১]

ঘ. বাস্তবতা সম্পর্কে - বাস্তব মানুষ বাস্তব জীবন, বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এসব ঘটাতে হবে।[১২]

ঙ. বাস্তবতাই মুখ্য - লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার।[১৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরিউক্ত বক্তব্যের কথা মনে রেখে যদি আমরা *দিবারাত্রির কাব্যের* দিকে তাকাই তাহলে দেখি শ্রুতে রূপক ও রোমান্টিকতার প্রশ্রয় সত্ত্বেও এর "নায়ক-চরিত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধিজীবী নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের জটিল দ্বন্দ্ব-দীর্ণ, বিচ্ছিন্ন অনিকেত সত্তার বিশ্লেষণধর্মী তীক্ষ্ণ আত্মজিজ্ঞাসার যে অভিব্যক্তি চোখে পড়ে, তা নিঃসন্দেহে লেখকের গভীর বাস্তব-সচেতনতার শিল্পরূপ।[১৪] ঔপন্যাসিকের এই বাস্তবতাবোধের মুখ্যবাহন এর নির্মোহ নিরুচ্ছ্বাস ভাষাভঙ্গি, বাইরের কাব্যময়তাকে যা ছাপিয়ে উঠেছে।

আপাতদৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত *দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে* দু'টি মৃত্যুর কথা আছে এবং এ দুটি মৃত্যুই বিবৃত হয়েছে নায়ক হেরম্বের জীবন ও দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করে। বাংলা উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বসূরী লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র। তিনি একট নির্দিষ্ট চরিত্রের Point of view থেকে প্রথমাবধি মৃত্যুকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ফলে মৃত্যু 'করুণ', 'নিষ্ঠুর' বা 'সমস্যার সমাধান' হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। হেরম্বের মতো নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী মানুষ, আধুনিক কালের দ্বিধা ও সংশয় যার অস্তিত্বের নিত্যসঙ্গী- তার জীবনে দুটি মৃত্যুই বস্তুত আত্মহনন, আত্মখনন হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রথমটি, স্ত্রীর আকস্মিক আত্মহত্যা (আত্মহত্যা না হত্যা তা নিশ্চিত করে বলা হয়নি উপন্যাসে), অন্যটি আনন্দের নৃত্যরত অবস্থায় চিতায় আত্মবিসর্জন। দুটি মৃত্যুই পাঠকের সামনে রহস্যের পর্দা টেনে দিয়েছে। মৃত্যুর কারণ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কোনো কিছুই পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয় তবে পাঠক তা ভেবে নিতে পারবে সে সুযোগ ঔপন্যাসিক করে দিয়েছেন। পাঠকের মেধার উপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু প্রসঙ্গকে ছেড়ে দিয়ে এক রহস্য-চেতনার সাংকেতিক ব্যঞ্জনা উপন্যাসে নির্মাণ করেছেন নান্দনিক শিল্প–শোভনতায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে লেখককের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা বাস্তবতার অন্বেষণ। বস্তুত, এই বাস্তবতার অতন্দ্র অন্বেষণ প্রসঙ্গেই তাঁর উপন্যাসের নন্দনতত্ত্বের যা কিছু তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞানীর মতো নির্মোহ মর্মভেদী দৃষ্টিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করেছেন। চিরে-চিরে টুকরো করে বিশ্লেষণ করেছেন নর-নারীর জীবনকে, ব্যক্তিচরিত্রকে। 'আবার সেই সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে যেমন কাজ করেছে সব কিছুইকেই সব খণ্ড অংশকেই একটি বোধের সূত্রে সমগ্রতায় গেঁথে তোলার প্রবণতা'[১৫] আমরা তাঁর উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনাতেও লক্ষ করি।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের নামের মধ্যে কবিতা-লক্ষণ আভাসিত হয়েছে। 'দিবা' ও 'রাত্রির' কাহিনীর মেলবন্ধনে ফুটে ওঠে জীবনের বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার এক মিশ্ররাগ-এক পরিণামী কাব্য সংবেদন- বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "শুধু নামও নয়, সারত একটি দীর্ঘ কবিতা।" তবে উপন্যাসটির শিল্পশরীর কবিতার নয়, উপন্যাসের। কিন্তু একথাও ঠিক এতে প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের প্রচলিত লক্ষণ প্রায়শই অনুপস্থিত। এ উপন্যাসে জীবনধর্মী কাহিনীর পরিবর্তে জটিল মনোলোকের একান্ত ভাবনা মুখ্য হওয়ায়, প্রচলিত অর্থে উপন্যাস না বলে লেখক একে বলেছেন, "এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী"।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের সমাপ্তি প্রচলিত মিলনাত্মক বা বিয়োগাত্মক কোনোটাই নয়। বরং এর সমাপ্তি অনেকটা অ্যাবসার্ডধর্মী বা প্রায় অসম্ভব। মনোবিশ্লেষণ ও মনের জটিলতা অন্বেষণে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রবণতা এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রেই লক্ষ করা যায়। দিবারাত্রির কাব্যের সুপ্রিয়া, মালতী, অনাথ, হেরম্ব- চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে করেছেন সেভাবে অশোক কিংবা আনন্দ চরিত্র দুটো বিশ্লেষিত হয়নি। এ দুটি চরিত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক রূপকের আশ্রয় নিয়েছে সর্বাধিক। এ চরিত্র দুটিকে বুঝবার দায়িত্ব মানিক বন্দোপাধ্যায় পাঠকের মেধার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর একথাও ঠিক যে চরিত্র দুটিই পাঠকের সহানুভূতি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।

অশোককে আপাতদৃষ্টিতে অস্ফুট চরিত্র বলে মনে হলেও সে তা নয়। অশোক এ উপ্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র (যদিও উপন্যাসে তার বিচরণ খুব বেশি নয়)। স্ত্রীর পূর্ব প্রণয় ও প্রণয়ঘটিত সব কথা জেনেও অশোক স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করছে। স্ত্রীর পূর্ব প্রেমিক তার বাড়িতে আসলে তাকে সামাজিক দিকগুলো রক্ষা করতে হচ্ছে। একদিকে দারোগা অশোক বিশ্বাসহন্তী স্ত্রীর হত্যাকারী বিরস্যাকে গ্রেফতার করে থানায় আনে :

> ধরেছি। বড় ভুগিয়েছে ব্যাটা। এ গাঁ সে গাঁ-হয়রান করে মেরেছে! শেষে একটা ঝোপের মধ্যে কোনঠাসা করে ধরতে ধরা দিলে।' ...সুপ্রিয়ার চোখের দিকে একবার স্পষ্টভাবে তাকিয়ে হেরম্ব বলল, 'কাকে খুন করেছে?'
>
> 'বৌকে। চিরকাল যা হয়ে থাকে' -- অসময়ে স্বামী বাড়ি ফিরল, লাভার গেল পালিয়ে, বৌ হল খুন। গলাটা একেবারে দু'ফাঁক করেও ব্যাটার তৃপ্তি হয়নি। সমস্ত শরীর দা দিয়ে কুপিয়েছে।' (১/১০৮)

অন্যদিকে অশোকের নিজের স্ত্রীই বিশ্বাসহন্তী। অশোকের ঘরেই তখন তার স্ত্রীর প্রেমিক। অশোকের কিছুই করার নেই। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার এই প্রান্তটিকে

ঔপন্যাসিক অশোক চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন প্রতীকী বর্ণনায়। এ যন্ত্রণা ভুলে থাকতেই অশোক মদ্যপানে আসক্ত হয়েছে।

কোন কোন সমালোচক অশোককে দুর্বল চরিত্র বলেছেন যা সমর্থনযোগ্য নয়। অশোকের স্বাস্থ্য দুর্বল হতে পারে কিন্তু চরিত্র হিসেবে সে দুর্বল নয়। আমরা অশোক চরিত্রের মধ্যে যে প্রতিশোধস্পৃহা লক্ষ করি তা দুর্বল চরিত্রের পক্ষে বেমানান। যে অশোক হেরম্বকে সুপ্রিয়া সম্পর্কে বলে :

> আমার কি ভীষণ সেবাটাই যে ও করেছে, দাদা বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, নিজের চোখে যে না দেখেছে- এখনো যথেষ্ট করছে। ও মনে করে আমি বুঝি কিছুই চেয়ে দেখি না, আমার কৃতজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ওর সেবা আমি কখনো ভুলবো না। (১/১৬৭)

সেই অশোকই একটু পরে সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। আসলে অশোক চরিত্রটির হাত-পা বাঁধা এবং তার জীবনটাই যেন পূর্ব নির্ধারিত। সব কিছু জেনে, শুনে, দেখে, বুঝেও তার যেন কিছুই করার নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪)/*কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসের সেই 'ললাট-লিখন'ই যেন অশোকের নিয়তি যা অনতিক্রম্য।

আনন্দ চরিত্রও অনেকটা নিরুপায়। কপালকুণ্ডলার মতোই একটা ব্যতিক্রমী পরিবেশে বেড়ে উঠা আনন্দ নিষ্পাপ, অকৃত্রিম এবং কৌতূহলী। হেরম্বের সঙ্গে কথোপকথনে তার কৌতূহল প্রকাশ পায় বারংবার। আনন্দের প্রশ্নগুলো থেকেই তার চারিত্রিক সারল্য ও কৌতূহল-প্রবণতা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি।

ক. আনন্দ হেরম্বের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেকদিন বললেন যে? দেড়বছর কি অনেক দিন?' (১/১২৯)

খ. আনন্দ মনে মনে একটু হিসাব করে বলল, 'দেড় বছরে সূর্য্য ওঠে পাঁচশো সাতচল্লিশ বার। লোক জন্মায় কত? কত লোক মরে যায়?' (১/১২৯)

গ. 'কিন্তু দেড় বছরে আর যাই হোক, মানুষ কি বদলাতে পারে? (১/১২৯)

ঘ. আনন্দ বলল, 'প্রেম কতদিন বাঁচে?' (১/১৩০)

ঙ. আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেম মরে গেলে কি থাকে?' (১/১৩১)

এ গ্রন্থে আনন্দই একমাত্র চরিত্র যার চেতন-অবচেতনের বিরোধ শৈশবের পর্যায় অতিক্রম করেনি। সে কারণে তার মধ্যে বাস্তব ও অবচেতনের বিরোধে যন্ত্রণাবোধ তীব্রতর দুঃখের জন্ম দিয়েছে বারে বারে।[১৬]

আনন্দের নৃত্য (পূর্ণিমার নাচ তথা 'চন্দ্রকলা' বা 'পরীনৃত্য') ও নৃত্য দৃশ্যের বর্ণনা রূপকাশ্রয়ী। আনন্দ তার শৈশবের চেতনার সঙ্গে বাস্তবতাকে মেলাতে পারেনি ফলে তার মধ্যে আত্মহননের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আর তাই আনন্দ 'চন্দ্রকলা' নৃত্য থেকে পরীনৃত্যের (আলো জ্বালিয়ে নৃত্য) দিকে অগ্রসর হয়েছে। পূর্ণিমার নাচের শেষে হেরম্ব 'প্রশান্ত চিত্তে' ভেবেছিল, 'পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালই করেছে।' (১/১৪৮) কিন্তু আনন্দ যখন বুঝল তার প্রেমের ব্যর্থতা অপ্রতিরোধ্য তখন তা রোধ করার পন্থা হিসেবে সে বেছে নিল পরীনৃত্যকে। 'প্রেম যে দেহকে আশ্রয় করে চন্দ্রকলার মতো বিকশিত হয় ও কৃষ্ণপক্ষের মতো বিলীন হয়ে যায় – সেই দেহকেই অগ্নিশিখায় পূর্ণ আলোয় লীন করে'[১৭] দিল আনন্দ।

দিবারাত্রির কাব্যে বিশদ বর্ণনার পরিবর্তে প্রতীক-সংকেতের প্রযুক্তিগত ব্যবহার ঘটেছে বেশি। আর এ প্রতীক সংকেতের প্রয়োগ বেশি চোখে পড়ে প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রে। দিনের কবিতা অংশে হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার মাঝখানে "উঠোনের ব্যবধান ভ'রে ঝাঁঝালো কড়া রোদ" বিস্তৃত বর্ণনায় পরিস্ফুট না হয়ে সুপ্রিয়ার মনে হেরম্ব-সুপ্রিয়ার সম্পর্কের 'রূপক' রূপে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'দিনের কবিতার শেষ অংশের মেঘে-ঢাকা বিদ্যুৎ-চমকানো আকাশ ও শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠের অতি সীমিত চিত্রে যেন হেরম্বের অন্তর্লোকের প্রতীকী উদ্ভাসন। 'রাতের কবিতা' অংশে একদিকে প্রাচীন মন্দির-বাড়ির ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, জ্যোৎস্নাস্নাত গভীর পূর্ণিমা রাত্রি; অন্যদিকে, পূর্ণিমা রাত্রে পুরী-সমুদ্রের উত্তাল রূপের পটভূমিতে সুপ্রিয়া-আনন্দের মনের ক্ষুব্ধ আলোড়ন রোমান্টিক ব্যঞ্জনাধর্মী এসব উপাদান উপন্যাসের নিহিত অর্থহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার চেতনার নেপথ্যে এক প্রতীকী প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে রাখে।[১৮]

তথ্যনির্দেশ

১. রচনাকালের দিক থেকে প্রথম। রচনাকাল ১৯২৯, প্রকাশকাল ১৯৩৫
২. *মানিক গ্রন্থাবলী*, (কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯শে মে, ১৯৮২), পৃ. ৯২
৩. দ্রষ্টব্য : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: *ফ্রয়েড থেকে মার্কস* (কলকাতা, জলার্ক ১৯৩৭), পৃ. ৪৬১-৪৬৩
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১-৪৬৩
৫. ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ঢাকা, মুক্তধারা মার্চ, ১৯৯১), পৃ.১১৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪
৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং জানুয়ারি, ১৯৯৮), পৃ. ১৬
৮. *মানিক বন্দোপাধ্যায়:* জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা* (কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ভাদ্র-১৩৬৪), পৃ. ৩১
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
১২. পূর্বোক্ত পৃ.৬২
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৬২
১৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯*
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
১৬. ফ্রয়েড থেকে মার্কস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩
১৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

বাংলার সামাজিক নাড়ীস্পন্দন 'মাটির মাশুল'

লুৎফর রহমান জয়

রক্তমাংসের মানুষের যে জীবন, সে জীবনের আশ্রয়স্থল হল সমাজ। মানুষের মহাকর্মযজ্ঞ, ধ্বংসক্রিয়া সবই সমাজে অভিস্রবিত হয় এবং মানুষই আশ্চর্যরকমের ভূমিলগ্ন। সময়ের সাথে সাথে মানুষকে নিয়ে সমাজেরও তাই বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে হয়— আশা, নিরাশা, ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অবক্ষয়, দারিদ্র্য, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি অবস্থায় তার যেন অতি-প্রাকৃত শরীরী অবস্থা অন্তর্দৃষ্ট হয়।

সমাজের প্রতি গভীর মমতা আর সংশ্লিষ্টতার যোগসূত্র স্থাপন করা একজন সাহিত্যিক বা লেখকের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যেসব লেখক তাদের ধ্যান, জ্ঞান, পেশা এক করে শুধু লেখনীর মাধ্যমেই ইহজীবন কাটিয়েছেন তাঁরা একনিষ্ঠভাবেই সমাজদ্রষ্টা এবং বিনির্মাতাও বটে। বাংলা সাহিত্যে এমনই এক সমাজদ্রষ্টা এবং বিনির্মাতা হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি শুধু লেখনীর প্রাপ্তিতেই বলতে গেলে জীবন-সংসার পার করেছেন। সে লেখনীর প্রাপ্তি তাও আবার অর্থমুখী (টাকামুখী) ছিল না— ছিল সমাজমুখী। টাকার জন্য লিখলে হয়ত তিনি প্রচুর অর্থ-প্রতিপত্তির মালিক হতেন, কিন্তু তিনি সমাজের নাড়ীদ্রষ্টা হয়েছেন নিঃস্ব হয়ে, একাকী হয়ে। ছোটবেলা থেকেই বোধকরি সমাজের টান তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে এক রেখায় মিশে গিয়েছিল। জীবন যত বড় হয়েছে ঐ রেখাটিও তত বড় হয়েছে, অথচ কোন রেখায় তা কখনও প্রতিস্থাপিত হয় নি। জীবনে সমাজের সব স্তরের টানে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশৈশব বেপরোয়া ও চঞ্চল ছিলেন। স্কুলজীবনে কখনো তিনি জননীকে কাঁদিয়ে টাঙ্গাইলে নদীর ধারে নোঙর করা নৌকায় মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে দু'চারদিন থেকে আসতেন। কখনো বাবা-মার শাসনভীতি অস্বীকার করে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে গিয়ে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন, কখনো মেদিনীপুরের লাল ধুলো-ভরা শহরের নোংরা পুরোনো লোকালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে দিন কাটাতেন। তাঁর নিজের জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন :

> ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরিব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচেরতলার মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে। গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত-জিজ্ঞাসা জাগত তাহলে আসল ব্যাপারটা কি—?[১]

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প-উপন্যাস। গল্প-উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে।"[২]

মানিকের এই অনুসন্ধিৎসু চঞ্চলতার শেষ একটা আশ্রয় আমরা দেখতে পাই যেখানে গিয়ে তিনি শান্ত হয়েছেন এবং আজীবন সেখানেই থেকেছেন। তাঁর ভাষায় সেই ইঙ্গিতটা আমরা লক্ষ করি;

'...একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিন চারদিন মাঠে ঘাটে, গাছে, গাছে, নৌকায় নৌকায়, হাটবাজারে মেলায় ঘুরে আর হৈ চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম।'[৩] অর্থাৎ মানিক তাঁর সব চঞ্চলতাকে সমাজের মানুষের সঙ্গে একীভূত করেছেন সেই শৈশবকাল থেকেই। জ্ঞানের ধাক্কা সামলাতে তিনি মাটিকেই বেছে নিয়েছেন। মানুষের স্রোতেই মিশে গিয়েছেন। সমাজের, মাটির আর সময়ের প্রবহমানতায় সাধারণ মানুষের দলে মিশে গিয়ে একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে তার স্বাক্ষর রাখলেন ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে। এরপর থেকে বলতে গেলে ভূমিলগ্ন নিমজ্জ শ্রেণীর নিঃস্বপ্রায় মানুষের আজন্ম সহচর হয়েই মাটির পৃথিবীতে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক সমালোচক এই বিষয়টিকে মানিকের এই পর্বের রচনার দীপ্তিকে তাই নিস্প্রভ বলতেও দ্বিধা করেন নি। যদিও তাঁদের এই বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি এবং আরও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমাদের এই রচনার কেন্দ্র এবং প্রসারমান পরিধিও মানিকের ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *মাটির মাশুল*কে নিয়ে। সুতরাং এ গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (মহাসমর), বঙ্গভূমির মন্বন্তর, ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমজীবী পেশাজীবীদের সংগ্রাম-ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, মনুষ্যত্বহীন মুনাফালোভীদের গোপন ব্যবসা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত ভূমিসন্তান বাঙালি।

১৯৪৮ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। *ছোট বড়* এবং *মাটির মাশুল*। *ছোট বড়* মোট চৌদ্দটি গল্পের সংকলন এবং *মাটির মাশুল* মোট পনেরটি গল্পের সংকলন। এদের মধ্যে 'ভয়ংকর' *ভেজাল* (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থের 'ভয়ংকর' গল্প অবলম্বনে লেখা একাঙ্ক নাটক। তাছাড়া 'ব্রিজ' এবং 'নব আলপনা' গল্প দু'টি *ছোট বড়* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অতএব *মাটির মাশুল* গ্রন্থের মোট মৌলিক গল্প হল বারোটি।[৪] সেগুলো হল: 'মাটির মাশুল', 'বক্তা', 'ঘর ও ঘরামি', 'পারিবারিক', 'ট্রামে', 'ধর্ম', 'দেবতা', 'আপদ', 'পথান্তর', 'সিদ্ধপুরুষ', 'হ্যাংলা' এবং 'বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে'।

কৃষক সদলবলে ফসল (ধান) কাটছে এমন একটি প্রচ্ছদপটে *মাটির মাশুল* গ্রন্থটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই গ্রন্থের' কয়েকটি গল্প কয়েক বছর আগে লেখা। অন্য গল্পগুলো যেমন 'আপদ' 'বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে' ইত্যাদি এই বছরের মধ্যেই লেখা।[৫] সুতরাং কালের পরিপ্রেক্ষিত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি 'মাটির মাশুল' নাম ভূমিকার গল্পটি প্রথমেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় মা, মাটি আর ফসলের সঙ্গে।

"...ভোরের কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে চারিদিকে মাটি ঢেকে গেছে আগামী ফসলের তরুণ সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলোভাবে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষি। সারাদিন কাঁচা সবুজ শিষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনও খেয়ালি, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেকে

যায়, বায়ু বয় পুব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বইতে শুরু করে দখিনা হয়ে। *ধানের শিষ টিপলে এখন* দুধ বেরোয়, উপোসি মানুষ-মায়ের স্তনের দুধের চেয়ে ঘন, বুঝি বা মিষ্টিও। চাষিরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই (মাটির মাশুল)।[৬]

সবুজ ফসলের গুরুত্ব মায়ের দুধের থেকেও এখানে বেশি হয়ে উঠেছে অভাবী, অনাহারী মানুষের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, এমনকি এরই মধ্যে স্বাধীন হয়ে যাওয়া ভারত—সাধারণ মানুষদের স্বাধীনতার স্বাদটুকু দিতে পারে নি। অভাব-অনটন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চারদিক থেকে এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে। চাষীদের অভাব নিয়ে মহাজন-জোতদারদের যে আমানবিক মহাজনী পীড়ন তা এই 'মাটির মাশুল' গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গ্রামজীবনে এর প্রতিক্রিয়ায় কৃষকদের মধ্যে যে হাহাকার ও দুশ্চিন্তা এবং পরিণতিতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে চূড়ান্ত উচ্চকিত হওয়ার বিকল্প নেই—এই ইঙ্গিতের নির্দেশ গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে। জোতদারদের ঋণ শোষণের প্রতিক্রিয়ায় সোনামাটি গ্রামের কৃষকদের যে-দুরবস্থার চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, তা যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে কৃষিজাত ঋণের আদান-প্রদান চলে আসছে একথা ঠিক, তাই বলে ফসল কাটার পনেরো দিন কিংবা একমাস পূর্বে বাধ্য হয়ে ঋণ নিলেও দুঃখজনকভাবে পঞ্চাশ ভাগ সুদের টাকা গুনতে হবে কৃষকদের; অথবা ছয় মাস পূর্বে ঋণ নিলেও একই পরিমাণ-সুদ দিতে তারা বাধ্য থাকে। ঋণ হিসেবে তারা বেশিরভাগ ধান কর্জ নিয়ে থাকে। ফসল ওঠার সময় ধানের দাম কম থাকে আর কম দামে বেশি সুদে ঋণের টাকা পরিমাণে বেশি হওয়ায় প্রায় সব ধানই আবার মহাজনের ঘরে ফিরে যায়। মহাজনী এই ঋণের প্রভাব সমাজকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তা আমরা লক্ষ করি—তোরাবের গৃহে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রী অথচ খাদ্য নেই এক মুষ্টিও। ভূষণের পুত্রের মৃত্যু ঘটে বিনা চিকিৎসায়। বৃন্দাবনের বড় ছেলে মারা যায় অনাহারে, ছোটটিরও মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু গ্রাম্য কর্তাব্যক্তিদের চাপে পুত্রের রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিথ্যাভাষণ প্রচার করতে হয় মাইতিকে। কেননা না খেয়ে মারা গেছে এখবর পত্রিকাতে বেরুলে পুলিশ আসবে নানা রকমের সমস্যা তাতে আরও বাড়বে। মহাজন ধরণী তরফদারের অপকর্ম-বিরোধী মামলায় কৈলাস সত্য সাক্ষ্য দিলে তার জমিজমা নিলামে ওঠে। অনাবৃষ্টি নয়, দুর্ভিক্ষ নয়, অজন্মা নয়, জমিতে ফলন খুব ভালো, অথচ কৃষকের ঘরে অনাহারের প্রকোপ। ক্ষুদ্র চাষীকুলের চোখেমুখে তাই দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের এক ঘন গভীর কালো ছায়া। ভূমিলগ্ন মানুষের ভেতরে বিদ্রোহের নাড়ীস্পন্দন যেন 'মাটির মাশুলে' প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এক সময় চাষীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় মহাজন ধরণী তরফদারের ধানের খামার লুট করার।

গল্পের এই পরিণতি এবং বিষয় ঠিক যেন তৎকালীন সমাজ-দাঙ্গার সঙ্গে মিলে যায়। ১৯৪৮ সালের "ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন বিপ্লবের স্বপ্নখচিত এমন রণনীতি গ্রহণ করে, যার ফলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন তীব্র-তীক্ষ্ণ জঙ্গী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। পরিণতিতে মার্চ মাসেই নিষিদ্ধ হয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা; নির্মম ও নির্দয় নিষ্পেষণের মাধ্যমে দলিত-মথিত হয় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন; বিশেষভাবে তেভাগার দাবিতে গড়ে-ওঠা কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বড় কমলাপুর চন্দনপিঁড়ি, বুধাখালি, ডাঙ্গাজোড়, সাঁখরাইল ও ডুবিরভেরিতে পুলিশের গুলিতে নিহত কৃষকরক্তে রঞ্জিত হয় ফসলের মাঠ।"[৭] 'মাটির মাশুলে'র সমাজনাড়ী আরও স্পষ্ট হয়েছে 'পারিবারিক'

'আপদ' এবং 'পথান্তর' গল্পে। স্বাধীনতা কথাটা অল্প দিনেই বাসিপচা সংবাদে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মধ্যবিত্ত কেরানিদের দাসত্বের ডিগ্রি বহুগুণে বেড়েছে। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মত এদের মাসিক উপার্জনের টাকা জিনিসপত্রের আগুন দামে মাসের প্রথম দিকেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মাসের অর্ধেকটারও বেশি বাকি সময়টা কীভাবে চলবে তা কেউ ভেবে পায় না। তার উপর সংসারে যেন নিত্য রোগের হাট-বাজার, সমারোহ লেগে আছে। অথচ খবরের কাগজে তাদের এই দুর্দশার চিত্র নেই। সংবাদপত্রে তাই কারোর সন্তুষ্টি নেই বরং অবজ্ঞা প্রকাশই এর জন্য ঠিক। 'খবর আর বিজ্ঞাপন সব এক ধাঁচের— ধর্মশক্তি বৃদ্ধি এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি। ...সংবাদপত্রগুলো যেন ছাঁটাই বাছাই করা ঘুরিয়ে বলা সত্য— মিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘণ্টের মতো, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া (পারিবারিক)'।[৮]

মধ্যবিত্ত এক পরিবারে তাদের পারিবারিক গালগল্পের মতই নিজেদের ভেতর বাহির বলতে গেলে পারিবারিক গল্পের মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছে। পরিবারটির বর্তমান অবস্থা আমরা সংক্ষেপে অনুমান করতে পারি– 'বাড়ির কাঁচা অংশের খড়ো ঘর দুখানার এবং রান্নাঘর ও গোয়াল ঘরের চালা সারা হয়নি চার বছর, জলে ভেসে গেছে। গোয়ালটা শূন্য, বছর দুই গরু নেই, চালাটা বর্ষার জলে গলে গেলেও কিছু আসে যায় না। —এই বর্ণনাতে। পারিবারিক তথ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক দুর্গতি মানুষের জীবনকে কত দিকে পরিবর্তন করতে পারে 'আপদ' গল্পে তার স্বাক্ষর মেলে। যে-নলিনী একদিন কনাদ রায়কে তার দেশপ্রেমের জন্য শ্রদ্ধা করত, '৪৭-উত্তরকালে ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতার সুফলের পরিবর্তে অর্থনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই নলিনীই দেশপ্রেমকে ভুলে গেছে এবং কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে সে নিজেও জানে না। একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অর্থের অভাব সে বুঝেছে। অর্থনৈতিক সাফল্য ছাড়া ব্যক্তি ও পরিবারজীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কীভাবে আবেদনহীন হয়ে পড়ে তা উন্মোচিত হয়েছে 'আপদ' গল্পে।

মহাসমর এবং মন্বন্তরের সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যে গোপন ব্যবসার সূচনা ঘটেছিল, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পরেও তার অবসান হয় নি। দেশ স্বাধীন হলেও মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রেশনে বরাদ্দকৃত চাল দিয়ে সরকারি অফিসের কেরানি কনাদ রায়ের, সংসার চলে না। ওই চালে সপ্তাহের মাত্র চারদিন অতিবাহিত হলেও বাকি তিনদিন তাকে নির্ভর করতে হয় চোরাবাজারের চালের ওপর। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে শূন্যতা দেখা দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে চোরাকারবারীদের গুদামে গুদামে জমে উঠেছে ধান-চালের পাহাড়। দেশে চালের অভাব থাকলেও সিনেমা হলের কমতি নেই। নতুন নতুন সিনেমা হাউস দ্রুত গড়ে উঠছে। "ওষুধের নেশার মত সস্তা আনন্দের জোলো দুটি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও সইবে না। তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও— কিছু রেডিয়া-মার্কা মাছি-ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মতো মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায় (আপদ)।"[৯] এ গল্পে নলিনী তার সংসারে অভাবের সঙ্গে কালো রাতের ঘুমঘোরে হাভাতি ভালোবাসার যেমন কোন উপযোগ পায় না— তেমনি সকালের সূর্যের সঙ্গে নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতোই রোগা ফোলা চোখ-মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ানো বস্তির

একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুচো চিংড়ি কিনছে এ যেন একই রকম জীবন। রাতের আঁধার এবং সূর্যের আলোতেও তাদের জীবনের কোনো পার্থক্য পর্যন্ত ধরা পড়ে না। গল্পের নায়ক কনাদ রায়ের ছাত্র-জীবনের আবেগ, বোধ দেশপ্রেম সব এখন উবে গেছে– তার সহধর্মিনী নলিনী যার খুব মাছ পছন্দ ছিল—এক টুকরো মাছ পেলে যে দুধ-ঘি পোলাউ মাংস চাইতো না— সে আজ বাজারে সস্তা পচা মাছটিও কিনতে পারে না। এজন্য যে দেশপ্রেমের জন্য কনাদকে সে শ্রদ্ধা করত সেই দেশপ্রেম থেকেই সে এখন পচা মাছের গন্ধ পায়। এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে মানুষের পরার্থবোধ হ্রাসের মাধ্যমে। দেশের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করায় বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম চেতনা জন্মে ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক দুর্দশা মানুষের সেই সদভাবের জীবনভাবনাকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। সে কারণে মানুষের দেশপ্রেম স্বাজাত্যবোধ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে সেখানে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। সমাজ হয়ে ওঠে সৃজনহীন, নিশ্চল ও কলুষময়। "বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে একই কারণে সৃষ্ট জাতীয় হতাশার বিষয়টি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।[১০]

বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন ভাগ্যে লেখার মত স্বাভাবিক সত্য হয়ে গেছে। বন্যার নির্মম যাতনা ভোগ বাঙালির আরেক বিপর্যয়ের ইতিহাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ বিপর্যয়ের সব ধরনের পথকে উন্মোচন করেছেন কেননা সেখান থেকেই অন্য পথের সন্ধান দেবার জন্য। 'পথান্তর' গল্পে আমরা বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষকে দেখি—যে যেখানে আশ্রয় পেয়েছে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। বন্যায় পীরপুরে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে সুতরাং পীরপুরে লোকজন বেশি আশ্রয় নিয়েছে, ঘাটের চালা গোয়ালঘর, গাছতলা, মাটির পথের বাঁধ যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বেশিরভাগের মাথার ওপরেই খোলা আকাশ, অধিকাংশই উপবাসী। গাঁয়ের লোক কিছু কিছু চাল, ডাল দিয়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য। তাদের নিজেদের সঞ্চয় নেই, তারা কোথা থেকে দেবে? পীরপুরে বন্যার ত্রাণ দেবার জন্য আসার পথে দেখা যায় মৃতদেহ ভেসে যায় নৌকার পাশ দিয়ে, মানুষের, গরু-ছাগলের, কুকুরের। —এমন কষ্টের দিনেও মহাজন জোতদারেরা তাদের ধন-সম্পদ বাড়াতে ব্যস্ত থাকে। অথচ মহাজন জোতদার রাঘব চৌধুরীর ছেলে অতুল ঠিক তার বাবার উল্টো পথের মানুষ হিসেবে এ গল্পে সমাজ বান্ধব হয়েছে– ভঙ্গুর সমাজকে আঘাত করে নতুন সমাজের সন্ধান দিয়েছে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে অতুল বন্যা-পীড়িতদের সেবা করতে বের হয়েছে— তার বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবে তবুও সে একাজে অংশ নিয়েছে। তার বাবার কাছ থেকে পীরপুরের ইজারা ভোগ করে যোগেন সাউ। তার মরাই ভরা প্রচুর ধান থাকতে বন্যার্ত মানুষেরা না খেয়ে থাকতে পারে না। অতুল লোকজন নিয়ে জোরপূর্বক যোগেন সাউ-এর মরায়ের ধান বের করেছে। এ গল্পে বিপ্লবের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এ ধরনের চরিত্র সৃজন সম্পর্কে দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *Primeval and other stories* সংকলনের ভূমিকায় অতুল চন্দ্র গুপ্ত বলেছেন- "Many men and women are taken from classes to which neither the writer nor his expected readers belonged. But the writer's creation of them is creation of concrete universals. They are not abstractions benefit of individual class traits, but shot through by a common humanity which makes them akin to all"[১১]. ব্যক্তিমানুষের যে কোন চিন্তা ও কর্ম সমাজের

প্রতিবেশ স্বীকার করে নেয় এবং নিজস্ব সামাজিক দায়িত্বেই ব্যক্তিকে সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হতে হয়। অতুল সেই সামাজিক আদর্শ চরিত্র হয়ে সঠিক পথের নির্দেশ করেছে।

বিপ্লব ও নতুন পথের সন্ধান আমরা আরও পাই 'বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে' গল্পে। সামন্ত শোষণের এক ভিন্নমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে প্রজাবিদ্রোহের এক সফল পরিণামচিত্র। বাগ্‌দিপাড়ায় 'ঠাকুরের থান' গড়ার নামে জমিদার এমন একটি বাঁধ নির্মাণ করে, যা বর্ষার পানি আটক করে জমিদারের স্বার্থরক্ষা করলেও বাগ্‌দিপাড়াকে ভাসিয়ে দেয়। দেবতার প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্মীয় সংস্কারবশত বাগ্‌দিপাড়ার কোনো মেয়ে পুরুষ কখনো 'ঠাকুরের থান' কেটে পানি নিষ্কাশনের সাহস পায় নি। শোনা যায়, বহুকাল আগে এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বাগদি সমাজের চিরদিনের কল্যাণার্থে এখানেই শিবাই ঠাকুরের বেদি স্থাপনের ব্যাপারে স্বপ্নাদিষ্ট হলে জমিদার নিজে টাকা ও লোক দিয়ে বেদিটা নির্মাণ করে দেন। সেই থেকে মহাসমারোহে বেদিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হলে বাগ্‌দিদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা থাকে না। ফলে ওই বেদি যেমন বাগ্‌দি সমাজের সকল ধর্ম-কর্ম-সামাজিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে আছে, তেমনি বর্ষার জল আটকে বাগ্‌দিপাড়াকে ডুবিয়ে মারে। জমিদারের শোষণ কৌশলটি এখানে এমনই ধর্মাচ্ছাদিত যে, ওই বেদির ব্যাপারে জমিদার থেকেছেন সর্বদা-সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কেননা বেদির সঙ্গে বাগদি সমাজের ধর্মবিশ্বাসকে এমনভাবে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সংস্কারকে ছিন্ন করে বেদি নিয়ে জমিদারের সঙ্গে বিরোধ করার মত সাহস আর কারো হয় নি। যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় বাগ্‌দিপাড়ায় সমাজজীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে– "কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা-নিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে গেছে সমাজ ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বদ্ধ পশুগুলি। তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দিপাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু খেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্‌দিদের। উঁচু তলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতায় পাশবিক সাহস-লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া-চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায় (বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে)।"[১২] এই তেজের বলি হয় বাগদি-পাড়ার প্রধান, দুলে বাগ্‌দি। সে ছিল জমিদার এবং নায়েবের লাঠিয়াল। তাদের হুকুমে সে অনেক বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়েছে। আজ তার বাগ্‌দিপাড়ার লোকেরাই বিদ্রোহী হয়েছে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে শতাধিক বাগদি মেয়ে পুরুষ কোদাল-খন্তা নিয়ে 'ঠাকুরের থান' খুঁড়ে বাগ্‌দিপাড়ার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছে। দুলে বাগ্‌দি, জমিদার ও নায়েবের কাছে এ খবর দিয়ে এসেছে। এক্ষুনি পুলিশ মিলিটারি আসবে বলে সে সকলকে পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। জাত ধর্ম নষ্ট করে যে যৌবনবতী দুলালী কারখানায় কাজ করে। সে খবর দেওয়ার কথা শুনে তার হাতের খন্তা দিয়ে দুলে বাগ্‌দির মাথায় প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল। 'ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।' দীর্ঘদিনের বন্ধনকে তারা সংহত শক্তির জোরে মুক্ত করে দিল। বদ জল আর দুলের সঙ্গে যেন তাদের পরাধীনতার আর শোষণের বদশক্তি বেরিয়ে গেল।

সমাজের রাজনৈতিক দলে এক শ্রেণীর ব্যবসামনস্ক খ্যাতিলোভী ব্যক্তির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে 'হ্যাংলা' গল্পটিতে 'মার্কসীয় ভাবাদর্শে আস্থা স্থাপন এবং রাজনৈতিক দলে সক্রিয় হওয়ার পর মানিকের সকল প্রকার রচনায় রাজনীতি সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাযজ্ঞ বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে তাঁর রচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়।'[১৩]

নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের রুচিহীন লোলুপতার এক সমাজব্যাধি বিন্যস্ত হয়েছে 'হ্যাংলা' গল্পে। মথুরামোহন হলেন উক্ত রাজনৈতিক দলের একমাত্র নেতা এবং সেই সঙ্গে একটি সংবাদপত্রেরও মালিক। তার প্রতি অনুগত মুষ্টিমেয় সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে নিয়ে গঠিত মথুরামোহনের দলটির প্রধান কাজ ধনীর সন্তানদের দলে এনে তাদের মাধ্যমে বড়ো অঙ্কের চাঁদা সংগ্রহ এবং তা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ। রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র– এ দুয়ের মাধ্যমে উচ্চ জীবিকা নির্বাহ, খ্যাতিলাভ এবং সমাজে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মথুরামোহন। মানিকের ভাষায় : 'মথুরামোহনের একটি খবরের কাগজ এবং একটি রাজনৈতিক দল আছে। সে নিজে এবং জনকয়েক অনুগত ছেলেমেয়ে এই নিয়ে তার দল এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। কারণ, দলের গালভরা নাম, নিজের বক্তৃতার দাপট আর খবরের কাগজ, এতেই তার বেশ চলে যায়। হিসাব করে নিজের রাজনৈতিক ওজনটুকু সে ধারও দেয়, ভাড়াও দেয় (হ্যাংলা)।'[১৪]

ধনীতনয়া মীর্ণাকে আগ্রহসহকারে মথুরামোহন তার দলে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্রুত নেত্রীপদও দান করে, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী চাঁদা প্রদানে বিলম্ব করলে অবহেলা প্রদর্শন করে, এমনকি পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা করে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মথুরামোহনের প্রতারণাবৃত্তি এবং অবৈধ অর্থোপার্জনের বিষয়টি। 'বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দল গঠন-প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রচুর সংখ্যক মথুরামোহনের সন্ধানলাভ সম্ভব। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সাইনবোর্ড সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগঠন ও প্রচারহীন নামসর্বস্ব সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে সবচেয়ে উদাহরণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।'[১৫] মথুরামোহন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মানিক তৎকালীন সমাজব্যাধিকে যেমন পরিস্ফুট করেছেন, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রের এই বিশেষ প্রবণতা সম্পর্কে দূরদর্শিতারও পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া গল্পে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে। সুধার মাধ্যমেই মীর্ণা মথুরামোহনের দলে যোগ দেয়; অথচ মীর্ণা ধনী হবার কারণে তারই সহপাঠী সুধাকে সে গুরুত্ব তো দেয়ই না; বরং তাকে চরম অবহেলা করে এমন কি পরিচিতির সৌজন্যটুকুও রক্ষা করে না। মীর্ণাকে নেত্রীপদে উন্নীত করা হয়, অথচ দরিদ্র সুধার অবস্থান কর্মী পর্যায়েই থাকে সীমাবদ্ধ। সমাজের সকল স্তরে দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত হয় এবং বৈষম্যের স্বীকার হয়। দারিদ্র্যের কারণে সমাজের সব মহলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পরিণামে সুধার মধ্যে জন্ম নেয় এক প্রকার শূন্যবিবেচনাবোধ ও বিকারগ্রস্ততা। পুরুষের ভালোবাসা কিংবা ধনীগৃহে সম্মানলাভের জন্যে সে কাঙাল কিংবা অশোভনভাবে লোলুপ হয়ে ওঠে। যার কারণে মথুরামোহন ও সুলেখা সুধাকে 'হ্যাংলা' বলে; আবার মীর্ণার কাছ থেকে অর্থ আদায়ের কারণে মীর্ণা মথুরামোহনকে 'হ্যাংলা' বলে অভিহিত করে। ধনী ও দরিদ্র দুই ধারা যথাক্রমে মথুরামোহন ও সুধা কিংবা মীর্ণা ও সুধা—যারা উভয়েই দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থের প্রতি লোলুপ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ধন বৈষম্যের কারণে সমাজে যে ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে তা এই গল্পে সূক্ষ্মভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে। নিম্নজ শ্রেণীর মানুষের

জীবনে কোন উন্নত বৈচিত্র্যের লক্ষণ আমরা 'মাটির মাশুল' গল্পগ্রন্থে তেমনটি পায় নি। দুঃখ কষ্ট অনাহারের মধ্যে দারিদ্র্যপিড়িত মানুষেরা নেশায় আসক্ত হয়েছে একেবারে স্বাভাবিকভাবে ঘরে তামাক থেকে শুরু করে বুনো সিদ্ধির শরবত পর্যন্ত তারা রেখেছে। 'সিদ্ধপুরুষ', 'বক্তা', 'দেবতা', মাটির মাশুল, 'বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে' প্রভৃতি গল্পে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নজ শ্রেণীর সমাজে এই ক্ষতটি তাদের দুঃখ, অভাব-অনটনেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং অভ্যাস। 'সিদ্ধপুরুষ' গল্পে আমরা দেখি ধনীর পুত্র নিখিলকে তার গরিব বন্ধু অজিত বলছে, "এ কিন্তু দেশী বুনো সিদ্ধি। এদিকে যেখানে সেখানে সিদ্ধি গাছ হয় দেখেছিস তো? এ সেই সিদ্ধি, ভীষণ তেজ, আর খাস না কিন্তু (সিদ্ধপুরুষ)।"[১৬]

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব চর্চার ফলে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধার নানামুখী বিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্তর্মানসে সক্রিয় লিবিডো, সর্ব যৌনবাদে আস্থা, চেতন-অবচেতন-অচেতনের অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মানবমনের নানামাত্রিক প্রান্তসমূহ পরিস্ফুটিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও পরীক্ষাপ্রবণ। তবে তা তত্ত্বেও ভারাক্রান্ত নয়।

বোঝাই গাড়িতে উঠে পড়ি। ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা অবশ্য একেবারেই সম্ভব হয় না, সেকেন্ড ক্লাসে উঠে ঠেসাঠেসি করে কোনো রকমে দাঁড়ানো যায়। কিন্তু ধরে দাঁড়াবার দরকার হয় না, গাড়ির থামা ও চলার টাল সামলাতে মানুষের অবলম্বন পাই। বেশ লাগে দাঁড়াতে। আরাম পাই। আনন্দ হয়। চারিদিক থেকে মানুষের নরম দেহের জোরালো চাপ, মানুষের ঘামের গন্ধ, মানুষের নিঃশ্বাসের ভাপসা বাতাস আর মানুষের দেহের উত্তাপে জমজমাট ভেজা গরম, এসব যেন জীবন্ত করে তোলে আমাকে। গাড়ির ভিড় দেখে স্টপেজে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটি মুখ বাঁকায়, তার কোমল তরুণ রোমাঞ্চময় দেহে চোখ বুলিয়ে মনে হয় ভিড়ের স্পর্শ ঢের বেশি স্নায়বিক, ঢের বেশি উত্তেজক (ট্রামে)।[১৭]

পেটের ক্ষুধা আর যৌনতা কেমন উলঙ্গভাবে মানুষের মধ্যে ক্রিয়ারত তার উদাহরণ 'বক্তা' গল্পে পাই— 'পেট ভরে মাছ দুধ খেলে তোর তেজ কত, জুৎজুয়ানি কত, কাজে তেজ, বজ্জাতিতে তেজ। দুটো দিন উপোস দে, ভালা কাজে ঝিমঝিমোবি, বদ কাজে ঝিমঝিমোবি, কুথাও গা নাই, সাড়া নাই। শালা বোকা বুঝিস না সিধা কথা? দুটা দিন উপাস করে বলিস দিকি গেঁড়িকে একবারটি কাছে এসো— গেঁড়ি এসবে হেসে হেসে টিটকিরি দেবে রাত ভোর (বক্তা)।"[১৮] অভাব, অনাহার, জোতদারি অত্যাচার নিপীড়ন প্রভৃতি মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সেকারণে সমাজে মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটে। পুরোনো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে সচেতন না হলে পারিবারিক জীবনেও বিকার দেখা দেয়। 'ধর্ম' গল্পে তমসা এবং সৌম্যেনের পারিবারিক জীবনে এই বিকারগ্রস্ততা ধরা পড়ে। "...তাদের ভেতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া করছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়। ...একে প্রমাণ করে অপরের স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য, অবিবেচনা, আলস্য, অপটুতা, অকর্মণ্যতা, অন্যায়, অবিচারকে, না-বোঝাকে, স্নেহমমতা ভালোবাসার অভাবকে হৃদয়মন টুকরো টুকরো হয়ে যায় দুজনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষতে রক্ত ঝরতে থাকে (ধর্ম)।'[১৯] কিন্তু নতুন চেতনা উদ্বুদ্ধ হলে জীবনের নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ে। তমসা-সৌম্যেনের জীবনেও তাই ঘটেছিল। সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের দৃশ্য দেখে তাদের মধ্যে সহমর্মিতার জন্ম নেয়। শ্রমিকদের সুখ-দুঃখকে নিজেদের মনে হয়। তমসা-সৌম্যেনের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তা যেন অনেকের সুখ দুঃখের সঙ্গে একাকার হয়ে তাদের নতুন জীবন

দিল। তাদের মনে হয় নতুন করে আবার বিয়ে হয়েছে তাদের। সমাজের সুখ-দুঃখ এভাবে মানুষের মধ্যে সংযোজিত হয়। ফলে পুরোনো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

সমাজে অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে যেমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে এগিয়ে যাবার জন্য ভয়কে জয় করতে হবে। ভয় মানুষের এগিয়ে চলার পথে প্রধান অন্তরায়। 'ভয়ংকর' নাটিকায় বিশ্বম্ভরের কর্মচারী প্রসাদ যেদিন ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে পড়ে ভয়কে জয় করতে শেখে সেদিন বিশ্বম্ভর আর তার গায়ে হাত তোলার সাহস পায় নি। ভয়কে জয় করতে শিখেই প্রসাদ নতুন করে বাঁচতে শিখেছে। প্রেমিকা ফুলিকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবার সাহস পেয়েছে, নতুন জীবনের আনন্দে উল্লসিত হয়েছে।

সোনামাটি গ্রামের কচি ধানের দুধ যেমন মানুষ-মায়ের দুধের চেয়ে ঘন বলে গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের অত্যাচার, নিপীড়ন, মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা, বস্ত্র সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোনো বিকল্প দেখেন নি এবং সংগ্রামের থেকে আরও গুরুত্ব দিয়েছেন একক মানুষের ভেতরের ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে চলার।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য করার আগে', উদ্ধৃত : ড. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৫-১৬
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য করার আগে', উদ্ধৃত : সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প* : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন; বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ পৃ. ৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬
৪. ড. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা-৭৩, আশ্বিন ১৩৮৯ (৩য় সং), পৃ.১৭৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫
৬. মানিক রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩৭১
৭. সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.১৮
৮. মানিক রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৯৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭
১০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬২
১১. ড. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
১২. *মানিক রচনাবলী* ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭
১৩. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১
১৪. মানিক রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০-৪৪১
১৫. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২
১৬. মানিক রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

মানিকের ভাবনা, তাঁকে নিয়ে ভাবনা

শান্তনু কায়সার

বাংলা কথাসাহিত্যের অসাধারণ স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যেমন জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের শেষ নেই তেমনি তাঁর আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়তা ও অশুদ্ধ প্রচলকে ভাঙার দৃষ্টান্তও তাঁকে কম রক্তাক্ত করেনি। 'গল্প লেখার গল্প' লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর গল্প পড়ার অভিজ্ঞতার কথা। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে যখন তিনি *বিষবৃক্ষ*, *গোরা* বা *চরিত্রহীনের* মতো উপন্যাস পড়েছেন তখন তার ধাক্কা সামলাতে নৌকায় বা গাছে চড়ে, হাট-বাজারে বা মেলায়, ঘুরে বেড়াতেন অথবা মারামারি করতেন। 'বড় ঈর্ষা হতো বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর।' 'হয়তো সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ।'

আরেকটি কারণেও তিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহে পড়তেন গল্প-উপন্যাস। 'গল্প-উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।' (সাহিত্য করার আগে)। জীবনকে বুঝতে কথাসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যকে বুঝতে জীবনের কাছে হাত পাতার এই যুগ্ম প্রয়াস অথবা যুগলবন্দীর নামই কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়?

মানিক দেখেছেন তখনকার অন্য কোনো লেখক যা পারেননি শরৎচন্দ্র তা-ই করেছেন, পতিতা বা তথাকথিত অসতীদের চরিত্র করেছেন, 'বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব' এবং 'অনুচিত' প্রেমও হয়েছে 'প্রেম'। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানিকের মনে প্রশ্ন জাগে ও প্রবল হয়ে ওঠে এই ভাবনা যে, 'সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন, মানুষ হয় ভালো নয় মন্দ, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন?' এখানে ও এভাবে তিনি সাহিত্যের জীবন ও বাস্তব জীবনের বিরোধ ও তাদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। এর বাস্তব উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ?'

এই বাস্তবতায় সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যেমন 'দিন দিন বাড়তে থাকে' তেমনি 'আপসোস'ও 'তীব্র হতে থাকে'। 'একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জাগায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি, এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

'এই সংঘাত থেকে সাধ জাগতো যে, আমি একদিন লেখক হবো। নিজেই এর প্রতিকার করবো।' 'সাধ পণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমি হবোই।'

কিন্তু এ প্রত্যয় সত্ত্বেও তিনি জানতেন, 'সাহিত্যচর্চা ছেলেমানুষের কাজ নয়।' ফলে তিনি ভেবেছেন, 'বয়স বাড়ুক, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক, পাস-টাস করে চাকরি-

বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিই, তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান!' এ ভাবনা থেকেই তিনি একটা 'স্পষ্ট পরিকল্পনা' ছকে নিয়েছিলেন। 'বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়। আমি সেই বয়সে লিখবো।' কেন? না, 'এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে।' 'কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারি তার ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলবো।'

কিন্তু দ্বান্দ্বিক এ সমাজে তা তো হবার নয়। চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নেয়া অথবা নিশ্চিন্ত মনে যেন সাহিত্যচর্চা করতে পারেন তার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেটাই বাস্তব ও স্বাভাবিক ছিল। যে সমাজে তাঁর আত্মীয়স্বজন আফসোস করে বলেন 'তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দুহাজার টাকার চাকরি করেছে, তুই কি করলি, বলতো মানিক?— না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি —' সেখানে সুস্থির হয়ে বসার উপায় নেই। সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে মানিকও তা পারেন নি। যেখানে বিদ্যাও পণ্য এবং তাতেই তার সার্থকতা নির্ণীত হয় সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনেও যে ওলটপালট ঘটবে তাতে আর সন্দেহ কী!

কিন্তু তাতেও রয়েছে ভাবনার কথা। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে তিনি যে গল্প লিখলেন এবং সংশয় থেকে নিজের ভালো নামের পরিবর্তে ডাক নামের ব্যবহার করলেন, যা তাঁর জীবন ও সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে গেল, সেই 'রোমান্টিক' গল্প সম্পর্কেই যখন তিনি বলেন 'কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনেও হাসবার সাধ্য হয় না' তখন বোঝা যায়, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

জীবন আসলে যান্ত্রিক অথবা একরৈখিক নয়। মানিক যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন যেভাবে বড় হয়েছেন নবজাত দুটি শিশুকে আক্ষরিকভাবে সেভাবে বড় করে তুললেই যে তারা ঐ মনীষার অধিকারী হতো তা কিন্তু নয়। সেকারণে মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য করার ফলে তাঁর রচনার অসম্পূর্ণতার বিষয়ে সচেতন হয়েও তিনি তাকে নাকচ করতে, দুঃখিত হতে কিংবা নিজেকে ধিক্কার দিতে রাজি নন। কারণ তা 'মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।' নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, তাহলে 'আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে?' মার্কসীয় দর্শনের সৃজনশীল অনুরাগী ও মানিকের পাঠকরা যে এর নীতিবাচক জবাব দেবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, মানিক লেখকের আত্মবিক্রয়ের প্রবল বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি কখনো তাঁর লেখাকে গণ্য হতে দিতে বা 'বিক্রয়' করতে রাজি নন।

একটি উদাহরণ থেকে ব্যাপারটাকে বোঝা যেতে পারে। যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর 'ডায়েরি' অংশে দেখা যায়, ১৯৫৫-এর ২৬ মার্চ নিজের অসুস্থতা বিষয়ে মদ্যপান সম্পর্কে মানিক লিখেছেন, 'আমি নিজে নিজে যদি না সামলাই— ডাক্তার আমাকে কদিন সামলে চলবে?' কিন্তু বাস্তবতা যে কত রূঢ় ছিল তা বোঝা যাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখা চিঠির এই অংশ থেকে, 'রাঁচি যাওয়া এবং একটি পুত্রসন্তান জন্মানোর খরচ প্রভৃতির জন্য আমি গত কয়েক মাস বাবাকে কিছু দিতে পারি নাই। এখন হইতে পূর্বে যাহা দিতাম তাহার চেয়ে ১০/১৫ 'অতিরিক্ত দিবার জন্য ওষুধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি।' 'নিজেকে সামলানো'র

বিপরীত বাস্তবতার দাবিতে যে তিনি ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন— এই বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে যে মানিক লড়েছেন তাই মূলত তাঁর কথাসাহিত্যের শৃঙ্খলার উৎস।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়ি বিক্রি করে তার অর্থ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে আমৃত্যু ভাড়াবাড়িতে বসবাসের যন্ত্রণা ও গ্লানি বহন করেছেন। বাবার এই দার্ঢ্য অথবা 'বাস্তবতাবোধবর্জিত উন্মাদনা' কি পুত্রে এবং তাঁর রচিত কথাসাহিত্যেও বর্তায় নি?

দুই

ফলে মানিক অঙ্গীকারপূর্ব ও উত্তরকালে যেমন তেমনি অনুরাগী ও বিরুদ্ধবাদী এবং 'শিল্পগুণসমৃদ্ধ' ও 'জনসম্পৃক্ত' রচনাবলীর জন্যে সর্বদা প্রশংসা বা স্বস্তির কারণ হন নি।

তাঁর লেখা 'চতুষ্কোণে'র প্রকাশকাল নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং অঙ্গীকার সমর্থক পাঠক ও অনুরাগীরা বিব্রত বোধ করেছিলেন এ কারণে যে, প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল উপন্যাসটির প্রকাশ ১৯৪৮ সালে। অর্থাৎ তিনি পার্টিতে যোগ দেয়ার বেশ পরে তা লেখা। পার্টিতে যোগদানের পরও তিনি কীভাবে এরকম একটি উপন্যাস লিখতে পারেন যেখানে এর প্রধান চরিত্র রাজকুমার তার বান্ধবী রিনিকে নিরাবরণ দেখতে চায়। এতে সে বিব্রত ও অপমানিত বোধ করলে সরসী তা বুঝে দেখতে সম্মত হয়। রাজকুমার জানায়, পুরুষের চেয়ে নারীর মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ। না, তারা 'দেহসর্বস্ব' বলে নয়, তাদের দেহ অন্যরকম বলে। রাজকুমারও জানে, 'শোনামাত্র যুগ-যুগান্তের সংস্কারে ঘা লাগিবে, তাকে মনে করিবে পাগল, অসভ্য, বর্বর।' এই উপন্যাস লেখার জন্য মানিককেও অনেকে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানা গেল উপন্যাসটি ১৯৪৪ এর আগে, অন্তত তেতাল্লিশে লেখা তখন অনেকেই স্বস্তিবোধ করেছিলেন।

কিন্তু তেতাল্লিশে লেখা হলেও মানিক তো ঐ ভাবনাকে পরবর্তীকালেও প্রত্যাহার করে নেন নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে অঙ্গীকার-উত্তরকালেও তিনি বিষয়টিকে নির্মোহভাবেই দেখেছিলেন। মার্কেজের, উপন্যাস 'মাই মেমোরিজ অব মেলানকলি হোরস্'কে মানতে পারলেও আমরা মানিকের যৌনতায় বিব্রত বোধ করি। মার্কেজ আবার প্রভাবিত হয়েছিলেন কাওয়াবাতার 'দ্য হাউস অব বিউটিজ' থেকে। জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে যৌনতার বিষয়ে মানিকের কোনো স্পর্শকাতরতা ছিল না। অন্য প্রসঙ্গে মানিক যে বলেছেন 'দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়— ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা' তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'প্রতিভা' 'ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিস' বলে যে সংস্কার স্বয়ং 'প্রতিভাবান'দের মধ্যেও রয়েছে তাকে যেমন ভাঙতে চেয়েছেন মানিক, তেমনি মধ্যবিত্তের ট্যাবু তথা সংস্কারকেও আঘাত করতে চেয়েছেন।

অন্য আরও ক্ষেত্রের মতো এটিও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়। 'দিবারাত্রির কাব্য'কে তিনি 'রোমান্টিক কাহিনী'র চূড়ান্ত নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু সেজন্য দুঃখিত হন নি। কারণ- 'ভাববাদ যদি এক্ষেত্রে বর্জন করতে পারতাম- তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের!' এর 'প্রয়োজন'ও তিনি স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন 'খাঁটি বস্তুবাদী জীবনাদর্শ গ্রহণ করার স্তরে উঠবার' এটাও 'একটা ধাপ। স্মর্তব্য মানিকের উক্তি, 'যৌন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, অজ্ঞ, সংস্কারবদ্ধ মানুষকে যৌনজ্ঞান দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ভুল হলে তাও কম বিপজ্জনক হয় না।'

এটি ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়। ঐ প্রত্যয়ের ফলে তিনি যেমন অধ্যাত্ম ও ভাববাদের অনেক মোহের স্বরূপ চিনে উঠতে পেরেছেন তেমনি জীবনকেও আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখার কারণে তাঁর লেখা 'বাজে' হচ্ছে বলে যে অভিযোগ তার উত্তরে তিনি যে বলেছিলেন 'নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হলে বস্তুবাদী সাহিত্যিকের চলবে কেন? তাতে তাঁর মোহমুক্তির ব্যাপারটা বোঝা যায়। তাঁর চরিত্রের উক্তি 'তার একি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালোবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছে হয়' স্বয়ং তার গ্রন্থের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

মানিক বলেছেন, উপন্যাসকে যুক্তিবাদের জয়গান বলে আপাত মনে হলেও আসলে তা বস্তুবাদেরই অগ্রগতি বলেছেন, 'বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ।' কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে নানা এলোমেলো থিয়োরি ও ব্যাখ্যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা'রও তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

একজন মহিলাকে ১৩৪২-এর ২৭ মাঘ মানিক লিখেছিলেন, 'মেয়ে পুরুষ অনেকের সঙ্গেই আমাকে পরিচিত হতে হয়, দেখি সেসব প্রায় সব এক ছাঁচে ঢালা- অবোধ, অগভীর, অনাবশ্যক, অর্থহীন, রক্তমাংসের বিকৃত যন্ত্র।' এই চিঠিতেই তিনি আরো লিখেছেন, 'বই তো মলাট নয়, কাগজ নয়, সাজানো সীমার অক্ষরের ছাপ নয়— চিন্তা, ভাব, অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতির সমন্বয় করা একটা ডালি।' সেইসঙ্গে যদি স্মরণ করি কয়েকটি গল্প লেখার পর তিনি যখন এক গ্রাম্য ডাক্তারকে নিয়ে গল্প ফাঁদতে যান তখন তা করার সময় যে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ হয়ে ওঠে দীর্ঘদিন ধরে লেখা উপন্যাস তাতে তার পটভূমি ও চরিত্র চিত্রণে এক গভীরতার সন্ধান পান লেখক। কুসুমকে শশী যতই বলুক 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' তা চরিত্রকে অনাবশ্যক, অগভীর ও অর্থহীনতার গণ্ডি অতিক্রম করে বই তথা উপন্যাসকে চিন্তা, ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ করে তুলেছে। গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাটি লিখে মানিক আসলে তৃণমূলে কলোনির বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু সবকিছুর পর শশী যেমন তার শেকড়ে প্রোথিত হয় ও সেখানেই অবস্থান করে তেমনি মানিকও তাঁর সমস্ত সমালোচনা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে তাঁর সৃজনশীল ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেন। মানিক যে দেখেছেন 'যুদ্ধোত্তর ব্যাপক ছাঁটাই ও অর্থনৈতিক অবনতি শিক্ষিত বাঙালিকে বই কিনে পড়ার নবজাগ্রত ক্ষুধার চাহিদাকে দমাতে পারে নি' তা তাঁরও অদম্য মনোভঙ্গির প্রকাশ।

কিন্তু তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে রেখেছেন, 'জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়। প্রতিভার মালিককে জনসাধারণ কত যে শ্রদ্ধা সম্মান দিয়েছে তার সীমা হয় না, ভবিষ্যতেও চিরকাল দিয়ে যাবে, কিন্তু শ্রদ্ধা-সম্মান ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। তবে মুশকিল এই, যাকে নিচু ভাবি তাকে ঠিক ভালোবাসাও যায় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানও করা যায় না। সেজন্য আগে নিজের মিথ্যা অহংকারটা ছাঁটা দরকার।' একারণে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক দেখে তাঁর মনে হয়েছে, 'এঁরা শুধু শিল্পপ্রাণ নন, দেশ-প্রাণও বটে।' অতএব তিনি মনে করছেন, প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক না হয়েও তাঁদের 'স্বার্থ, সংগ্রাম ও চেতনাকে ষোল আনা নিজের করে নিয়েও' তাঁদের একজন হওয়া যায়। তিনি তাই

হতে চেয়েছেন। এজন্য 'প্রতিবিম্বে' ইংরেজি মত্ততার মতো রুশ মত্ততায় সোভিয়েত নেতাদের দৃষ্টিতে না দেখে নিজেদের দৃষ্টিতে নিজেদের দেশকে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

মানিকের উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার বেশ আগে লেখা উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' থেকে তা বোঝা যায়। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ ঔপনিবেশিতার সৃষ্টি। মন্দির-মসজিদের দ্বন্দ্বে না যাওয়ার দম প্রগতিশীলতা ভেঙে কুবেবের মতো মানুষদের তার গিনিপিগে পরিণত করার ঘটনা প্রমাণ করে তার ও উপনিবেশের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লেখকের অভিপ্রায় ও দৃষ্টি সৎ ও স্বচ্ছ হওয়ায় তলস্তয় যেমন রুশ সমাজের ভাঙন প্রত্যক্ষ করে তার দর্পণ হয়ে উঠেছিলেন তেমনি মানিকও ঐ কারণে উপনিবেশকে বুঝতে ভুল করেন নি।

তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতিকে অখণ্ডভাবে দেখলে তাই আমাদের বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ থাকে না।

তিন

১৯৫০-এর ৬ জুন অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রকে মানিক লিখেছেন, 'আমি এ জগতে কারো স্তাবক নই; নেতৃত্বেরও নয়, যাঁকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করি তাঁরও নয়। সংসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্তাবকতার কম-বেশি ভেজাল থাকাটাই সাধারণ নিয়ম। আমার শ্রদ্ধা তাই অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে সুমিষ্ট লাগে না। কৃত্রিম মিষ্টতার এই অভাবটা কারো কারো কাছে অহংকার বা ঔদ্ধত্য বলেও প্রতীয়মান হয়।'

মানিকের জন্মশতবর্ষে বর্তমান বাংলাদেশে এই কথাগুলো মনে রাখলে ও তার মর্ম অনুধাবন করলে লেখকের প্রতি গভীর ও প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : রুগ্‌ণ জীবনের দিনলিপি

সরকার আবদুল মান্নান

স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন এখন আর নতুন কোনো বিষয় নয়। বিশেষ করে মানুষ কোন অর্থে স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক, মানসিকভাবে সুস্থ বা অসুস্থ এর কোনো সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় নি। যে-কোনো বস্তু বা বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মাপকাঠি বা পরিমাপক প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নির্ধারণে তেমন কোনো পরিমাপক তৈরি আছে বলে জানা নেই। তা হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে সমাজাশ্রয়ী মানুষ সমাজ-বন্ধনের একক হিসেবে বন্ধনের শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলছে কীভাবে– এ প্রশ্ন অমূলক নয়। বিষয়টি কী এমন যে, পূর্বনির্ধারিত ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শের কাঠামোয় মানুষের জীবনাচরণ সীমা পায় বলেই সমাজশৃঙ্খলা নিয়তির মতো নির্দ্বিধ থাকতে পারে? বিষয়টি যদি এমন হত তা হলে নিয়ত উত্তরণের আত্যন্তিক জৈবিক প্রয়াস আর থাকত না, সমাজ একটি যান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে স্থিতি লাভ করত এবং জীবন ও জগতের বিচিত্র ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার কোনো প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস তেমন নয়। অধিকন্তু বহুর বৈচিত্র্যের, বৈপরীত্যের ঐকতানে সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রথাগত বিচারে যাকে স্বাভাবিক বলে শুধু সেই স্বাভাবিকতাই এই নিয়ত প্রবহমান সমাজ-বন্ধনের সূত্র নয়– অস্বাভাবিকতাও এর অন্তর্গত শক্তি। এই অস্বাভাবিকতাই প্রথাগতের ঊর্ধ্বে জীবনের অনেকান্ত অর্থময়তা নির্ধারণ করে। এবং এখান থেকেই শুরু হয় সুস্থতার অন্বেষণ। প্রাচীন গ্রিসের ঋষিপ্রতিম দার্শনিক থেকে শুরু করে আজকের যুগের পণ্ডিত ও ভাবুকগণ মনে করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি মৌল বিষয় উচ্ছৃঙ্খলতা এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে বহু পূর্ব থেকে এই সত্য স্বীকার্য যে, আমাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ পরিচালিত হয় জৈব গড়নের অসুস্থতার পরিমণ্ডলে। বিষয়টি নিশ্চয়ই মানবীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নয় বরং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুষঙ্গে এ-ই হল মানুষের নিয়তি। বিশ্বচরাচরের মতো মানুষের জীবনেও যৌক্তিকতার একটি অধ্যায় আছেই, যেখানে সে শুভ, সুন্দর ও আনন্দিত। কিন্তু যেখানে সে অশুভ, অসুন্দর ও নিরানন্দিত, সেই অযৌক্তিকতার অধ্যায়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে অষ্টাদশ শতকে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের দেবত্বের যে জয়গান করা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সেই ধারণা বদলাতে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখে মানুষের উদ্ভব-সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ঈশ্বর-সংক্রান্ত ধারণার অন্তর্ধান, বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যকার উচ্ছৃঙ্খলতা-বিষয়ক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যুগান্তকারী আবিষ্কার, ফ্রয়েড-ইয়ং-এলিসের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক মতবাদ, মার্কসের সম্পত্তি-শ্রম-বণ্টন বিষয়ক তত্ত্ব এবং সর্বোপরি মানবস্বভাব সংক্রান্ত প্রাণবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ। এসব আবিষ্কার, চিন্তা ও মতবাদ সংগোপনে প্রবহমান এক উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছচারী জীবন ও জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। আমরা স্পষ্টতই অনুভব করি,

মানুষের জৈব-অস্তিত্বের মূলগত উপাদানের সঙ্গে বিকার ও অপরাধপ্রবণতা গভীরভাবে মিলেমিশে আছে।

প্রকৃতির মতো মানুষের জৈবগড়নের সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ সর্বদাই সহজ বিকাশের পথ খোঁজে। কিন্তু সেই পথে যখনই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়; ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ নৈতিকতা ও নিয়মকানুন চাপিয়ে দেয়া হয়, তখনই তা বিকারের পথে, ধ্বংসের পথে, অপরাধের পথে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয় পুঁজিবাদী শোষণ ও দারিদ্র্য এবং উপকরণসর্বস্ব কিম্ভূতকিমাকার এক জীবন। ফলে অবস্থাবৈগুণ্যে মানুষ তার জৈবগড়নের অন্তর্নিহিত সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে উন্মোচিত হয়। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মানব-স্বভাবের এই গূঢ়-গহিন অধ্যায় উন্মোচনে বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

দুই

খুব সাহসের সঙ্গে নিঃসঙ্গভাবে এই যাত্রাপথে প্রথম পা রেখেছিলেন বিস্মৃতপ্রায় কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তখন ১৯১৮ সাল। রবীন্দ্রনাথের শুচিশুভ্র জীবনাদর্শের সর্বগ্রাসী সেই পরিমণ্ডলে 'ধানদিদি' গল্পের মাধ্যমে আইনবিদ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মানবস্বভাবের অপরাধপ্রবণ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা খুলে ধরেন। সেই ১৯১৮ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক মিলিয়ে তিনি রচনা করেছেন তেষট্টিটি গ্রন্থ। এর মধ্যে পাঁচটি গল্পগ্রন্থ এবং সাতচল্লিশটি উপন্যাস। এই বিপুল রচনার মৌল প্রবণতা হল মানব স্বভাবের অশুভ অধ্যায়কে তুলে ধরা। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য হল : 'যৌন ভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তির চিত্রণ বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম।' যাত্রাপথের সেই উপন্যাসগুলো হলো *পাপের ছাপ* (১৯২২), *রক্তের ঋণ* (১৯২২), *লুপ্তশিখা* (১৯৩০), *ললিতের ওকালতি* (১৯২৯), *শুভা* (১৯২০) ও *শাস্তি* (১৯২৩)। এ ছাড়া আছে সুপ্রচুর গল্প। এই বিপুলায়তন সৃষ্টিতে তিনি অপরাধপ্রবণ মানুষের যে জীবনাখ্যান রচনা করেছেন তা যতটা না শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে, তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধবিজ্ঞানীর কৌতূহল ও নিষ্ঠায়। ফলে কথাসাহিত্যিক হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কখনোই তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনায় আসেন নি। কিন্তু তাঁর এই জীবনবোধ বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এবং তারই ধারাবাহিকতায় জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।

নরেশচন্দ্র থেকে জগদীশ গুপ্তের উত্তরণ বিস্ময়কর। নরেশচন্দ্র যৌন-অপরাধকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত জীবনের বহুমাত্রিক টানাপড়েনকে বিস্ময়কর মাত্রাবোধের ভিতর দিয়ে আঁকতে চেয়েছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অনেকটা ক্রাইম রিপোর্টারের মতো যে জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন, জগদীশ গুপ্ত সেই জীবনকে শিল্পের মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছেন। ধর্ম, নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে তিনি মানুষকে একটি জীবতত্ত্বীয় গড়নের নিরিখে বিবেচনা করে তার সমগ্র চারিত্র্যের অনুপুঙ্খ স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। এই ধারা 'ঐতিহ্যবিরোধী' কিন্তু অশ্রুকুমার সিকদার যে 'অমানবতন্ত্রী' ও 'অসামাজিক' বলেছেন জগদীশগুপ্তের সাহিত্যজগৎ কোনো অবস্থাতেই তা নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জগতকেই একটি মানবিক, আদর্শিক ও শৈল্পিক উত্তরণে পৌঁছে দিয়েছেন। বলা যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের হাতে

যে জগতের উন্মোচন, জগদীশগুপ্ত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তার সর্বতো পরিণতি সাধিত হয়।

তিন

শিল্পসৃষ্টি কোনো স্বয়ম্ভূ বিষয় নয়। এমন নয় যে ব্যক্তি-শিল্পীকে অতিক্রম করে শিল্পের একটি স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। হয়ত আছে। কিন্তু সেই অস্তিত্বের মধ্যে শিল্পী যে কত গভীরভাবে চিরকাল স্থায়ী হয়ে থাকেন, যার পরিচয় জানা না-থাকলে সৃষ্টির স্বরূপ চেনা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এ কথা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কেননা, যে জীবন তিনি রচনা করে গেছেন সে-জীবন কোনো-না-কোনোভাবে তার-ই জীবন। বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের ভিতর দিয়ে তিনি রচনা করে গেছেন নিজেকে, নিজের জীবনকে। বিস্ময়কর বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মোহউপলব্ধির সঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কিংবা জগদীশ গুপ্ত তাদের সৃষ্টি থেকে ব্যক্তি-জীবনকে আলাদা করে রেখেছেন, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর কোনো সম্পর্ক সূত্রের ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকেই করে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টি-প্রত্ন-ইতিহাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের গড়ন আর-দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম ও ঐতিহ্যের যে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্নাতীতভাবে একজন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে ধরনের পরিতৃপ্তির মধ্যে বসবাস করেন নি। অধিকন্তু তাঁর মনের গড়নটা-ই এমন ছিল যে, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের পটভূমিতে রচিত তথাকথিত সুস্থির সমাজের কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি। বরং অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে অগ্রগতির যে জাগতিক রহস্য নিহিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রহস্যকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্টতই অনুভব করেছিলেন যে, সুস্থিরতা জগৎ ও জীবনের আদি রহস্য নয়। বরং সংঘাত ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে, বিরোধ ও ঐক্যের নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং ধ্বংস ও সৃষ্টির আবর্তনের মধ্যে বিশ্বচরাচর সক্রিয় থাকে। মানুষও তাই। মহাবিশ্বের অবিচ্ছিন্ন সদস্য হিসেবে মানুষেরও আদি সংগঠন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তার অন্তর্গত রুগ্‌ণতার সূত্রে সে নিয়ত অর্জন করতে চায় সুস্থতার বাতাবরণ। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের রুগ্‌ণতার স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন তার সুস্থতার গন্তব্য আবিষ্কারের জন্য। এ ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

চার

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে রুগ্‌ণ মনোগড়নের প্রথম নায়ক হেরম্ব। ১৩৪১ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' শীর্ষক উপন্যাস। আর এখান থেকেই শুরু হয় জটিল মানসিকতার অসুস্থ মানুষ হেরম্বদের উত্থান। কিন্তু এই উত্থান যতটা আড়ম্বরপূর্ণ পরে সেই আড়ম্বর আর থাকে নি। বরং মানবীয় স্বভাবের অন্তর্গত স্বরূপ হিসেবে সহজাত শক্তি ও সৌন্দর্য হয়ে ওঠে।

প্রতিবেশী হেরম্বর প্রতি সুপ্রিয়ার ভালোবাসা ছিল খুবই খাপছাড়া এবং হয়তো সে-জন্যই গভীরতায় অতলান্ত। যুক্তির চোখ থাকে বলে বেপথু হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, বেহিসেবি হওয়ার সুযোগ থাকে না। কিন্তু যেখানে যুক্তি নেই, লাভালাভের গোপন কোনো হিসাব-নিকাশ নেই, সেখানে পাগল হতে কোনো বাধা নেই। হেরম্বর প্রতি সুপ্রিয়ার এই পাগলপনা ভালোবাসার বিষয়টা হেরম্বকে কীভাবে ভাবাত তার স্পষ্ট

কোনো পরিচয় উপন্যাসে না-থাকলেও হেরম্ব যে তাকে ভালোবাসত না– এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কেননা, ভালোবাসার প্রথাগত চিত্রটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে খুবই হাস্যকর ছিল সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং হেরম্বর ভালোবাসা স্নায়ুর জটিল এক বিকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এবং সেই বিকারের গোপন প্রেরণায় সুপ্রিয়াকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পুলিশের লোক অশোকের সঙ্গে বিয়েতে রাজি করায়। সুপ্রিয়া চলে যায় অশোকের সংসারে।

অশোকের নিষ্প্রাণ সংসারে সুপ্রিয়ার পাঁচ বছরের ঘরকন্না ভেতরে ভেতরে শুধু হেরম্বের জন্য আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিরন্তর এক অতৃপ্তি ও দুর্ভাবনার মধ্যে সুপ্রিয়া মনে ও শরীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত হয় মৃগী রোগে। এ সময় ইংরেজির অধ্যাপক হেরম্ব তার স্ত্রীকে খুন করে কিংবা আত্মহত্যার পথ করে দিয়ে সুপ্রিয়ার বাড়িতে গিয়ে ওঠে সুপ্রিয়ার প্রতি ভালোবাসার টানে নয়, তার প্রতি সুপ্রিয়ার ভালোবাসার মাত্রা উপভোগ করতে। যখন সে বুঝতে পারে যে, সুপ্রিয়া দেহ ও মনে তাকে উজার করে নিবেদন করার জন্য প্রস্তুত আছে তখন সে প্রত্যাখ্যানের অস্ত্র নিক্ষেপ করে। সুপ্রিয়াকে নিঃস্ব করে দিয়ে সে চলে যায় অন্য এক যুবতী আনন্দের কাছে। আনন্দকেও প্রথমে সে তার প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলে তার পর হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। আনন্দ আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যায়।

নিজেকে প্রকাশ করার অসাধারণ এক ভাষাশক্তি হেরম্বের আয়ত্তে। আর আছে যৌক্তিকতার বিচিত্র বাঁক ও মোড়ে নিজেকে সচ্ছলতার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জাদুশক্তি। ফলে নারী তার প্রতি প্রেমমুগ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজানোর এই প্রয়াস বেশিদূর এগোয় না। নারী যখন ভালোবাসার আবিষ্কারে দেহের আস্বাদ পেতে চায় তখন হেরম্ব বিচিত্র ছলছুতোয় পিছু হটে। নারীর দেহ ও মনের অভিব্যক্তি বোঝার অসাধারণ শক্তি তার আছে। বিশ্লেষণী শক্তিও তার অসাধারণ। এই সব অস্বাভাবিক পাণ্ডিত্য-শক্তিতে সে নারীদের নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, যে খেলার সিংহভাগ জুড়ে থাকে জীবন-বিশ্লেষণের অসাধারণ ভাষাভঙ্গি, রুচি, আভিজাত্য ও মাত্রাবোধের এক সম্মোহনী শক্তি। কিন্তু যা থাকে না তা হল পৌরুষ, থাকে না জৈব আকাঙ্ক্ষার বেপরোয়া অভিব্যক্তি। আর এই হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ভদ্রলোকদের আর্কিটাইপ। আর এর বিপরীতে অবস্থান করে ভিখু ও কুবের। সভ্যতার পটভূমিতে মানবিকতার যে মানদণ্ড নির্ধারিত হয়ে আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু নিঃসন্দেহেই স্বাভাবিক মানুষ নয়। কিন্তু পৌরুষের এমন এক আদিম সৌন্দর্য তার মধ্যে লক্ষ করা যায় যা হেরম্বে একান্তই অনুপস্থিত। ফলে হেরম্ব ও ভিখু– এই দুটি চরিত্রই অস্বাভাবিক হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুরই পক্ষপাতী। বিচিত্র ছলছুতো, আড়াল-আবডাল, কপটতা ও ভণ্ডামির মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যে জীবন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জীবনের বিকারগ্রস্ততার স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। হেরম্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জীবন-জিজ্ঞাসার আদি সংগঠন।

অতি শৈশব থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণপ্রবণ মানসিকতায় আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে এই বিশ্লেষণপ্রবণতা, 'কেন' নামক জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল রোগগ্রস্ত তায় পর্যবসিত হয়েছিল। এক পর্যায়ে তিনি নিজেই উপলব্ধি করতেন যে, সহজ-স্বাভাবিক মানুষ নন তিনি। হেরম্ব-চরিত্রের ভিতর দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মনোগড়নের সেই আদি সংগঠনের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। ফিউদর দস্তইয়েভস্কির *কারামাজব ভাইয়েরা* কিংবা *অপরাধ ও শাস্তি* যে-অর্থে আত্মজৈবনিক উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য*ও সেই-অর্থে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরই অন্য এক বিবরণ, আরেক সৃষ্টি। এমনকি এই উপন্যাসে সুপ্রিয়া, আনন্দ, মালতী– এরা প্রত্যেকেই প্রচলিত সুস্থতার বিচারে অসুস্থ মানুষ, হেরম্বর মতোই নিউরোটিক বা সাইকোপ্যাথ। মানব-জীবনে যৌক্তিকতার যান্ত্রিক অনুসরণ যেমন স্বাভাবিক নয়, তেমনি অযৌক্তিকতা ও আবেগের অত্যুগ্র প্রকাশও সুস্থতার পরিপন্থী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের কোনো চরিত্রই স্বাভাবিক নয়। মৃত্যুরাত (Jhanatos) থেকে শুরু করে গুহায়িত যৌনতার অবদমনজনিত বিকার, পাপবোধ, অস্তিত্বের সংকট, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মূলগত বৈশিষ্ট্য। সুপ্রিয়ার স্বামী অশোক আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই উন্মোচিত হয়ে পড়ে যে, আপাত সুস্থতার অন্তরালে অসুস্থতার মর্মন্তুদ লক্ষণগুলো সহজাত শক্তিতে লুকিয়ে রাখে সে। হেরম্বর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা গভীরভাবেই সে অনুভব করে কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়াই প্রদর্শন করে না অশোক। অথচ একদিন হাসি-তামাশা ও সমুদ্র-দর্শনের আনন্দ-উচ্ছলতার ছলে ছাদের কিনারে দাঁড়ানো সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরার নামে নিচে ফেলে দিতে চেষ্টা করে অশোক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই প্রথম উপন্যাসেই মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই অন্বেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিকার অর্থে কোনো বিধান তৈরি হয় না। বরং এই সত্যই প্রতিষ্ঠা পায় যে, মানুষের মুক্তি নেই। ফলে সুপ্রিয়া, অনাথ, মালতী, আনন্দ, অশোক– এরা কেউই সুস্থির কোনো জীবন-পরিধির নাগাল পায় না। আত্মহত্যার মাধ্যমে আনন্দ, পলায়নের মাধ্যমে অনাথ-মালতী, নিস্তব্ধতার আশ্রয়ে সুপ্রিয়া মুক্তির অন্বেষণ করলেও শেষ পর্যন্ত কেউই মানবিক মুক্তির আস্বাদ লাভ করে না। ফলে উপন্যাসটির আখ্যান-সৌষ্ঠব যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাবৎ লেখালেখির মূলগত বুনিয়াদ হয়ে ওঠে।

পাঁচ

ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি, *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে মানুষের মনোগড়নের যে বৈকল্য আঁকা হয়েছে তা একেবারেই পরিকল্পিত এবং স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে *অহিংসা, জীবনের জটিলতা* ও *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে এই পরিকল্পনা ও স্পষ্টতা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। পাণ্ডিত্যের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে নপুংসক এক জীবনের যে মনস্তাত্ত্বিক ট্রাজেডি ইংরেজির অধ্যাপক হেরম্বের নিয়তি, মধ্যবিত্তের সেই নিয়তির মূলগত চারিত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও আখ্যান-সংগঠনে আসে প্রগাঢ়তা ও সারল্য। বিশেষ করে চরিত্রগুলোর কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতই অনুভব করা যায় এবং সেই স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের আলোকে প্রতিটি চরিত্রের সমগ্র অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে কোনো ব্যক্তিই যে একান্ত হয়ে ওঠে না বরং অনেকগুলো চরিত্র ও জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে তার স্বাতন্ত্র্যকে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলে, সেই একা ও ঐক্যের পূর্ণতার আস্বাদে এই সব উপন্যাস মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

খাদ্যের জন্য যুদ্ধের যুগ কখনোই শেষ হয় না। পুঁজিবাদী ও মুনাফালোভী সমাজ-ব্যবস্থায় এই যুদ্ধ চিরকালই থাকবে। এই যুদ্ধের সঙ্গে অন্য এক যুদ্ধ বিচিত্র স্বরূপে

মানবজীবনে নিয়ত বর্তমান। আর তা হল, যৌনতার যুদ্ধ। আদর্শ ও নৈতিকতার কোন মানদণ্ডে যৌনতা-বিষয়ক আচরণগুলোকে বিকারের পর্যায়ে ফেলা হয় তার কোনো পরিমাপক না-থাকলেও প্রতিটি সমাজেই আপনা থেকে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার কতকগুলো ধারণা তৈরি হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারণাগুলোর আলোকে যৌনবিকারের আখ্যান নির্মাণ করেন নি। অধিকন্তু গল্প ও আখ্যানের এমন এক জীবন তিনি রচনা করেন যেখানে স্বাভাবিকতার প্রথাগত ধারণাগুলো ভেঙে যায় এবং নতুন এক জীবনার্থ তৈরি হয়। *অহিংসা, জীবনের জটিলতা* ও *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে এই জীবনের পরিচয় মেলে যেখানে বিকৃতিই স্বধর্ম।

১৩৪৫-এর মাঘ মাস থেকে ১৩৪৭-এর পৌষ মাস পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে-সময়ের অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে উপন্যাসটির সম্পর্ক কোথায়, দুর্বোধ্যতাই বা কোথায় এবং এমনকি উপন্যাসটির গল্প ও আখ্যানের সঙ্গে অহিংসা শিরোনামেরই বা সম্পর্ক কোথায়, ইত্যাকার কোনো বিষয়ই স্পষ্ট নয়। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে প্রথাগত বৈধতার বাইরে অনেকগুলো যৌনসম্পর্ক ও যৌনতার প্রতীক ব্যবহারের বিষয় আছে, স্থূল অর্থে যার কোনোটাই বিকৃতি নয় এবং বাহ্যত হোসেন মিয়ার ষড়যন্ত্রে কুবের কপিলাকে নিয়ে ময়না দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রার বিষয়টি যে গূঢ়ার্থমূলক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নারীকে নিয়ে পুরুষের এই প্রস্থানের বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন— 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে এবং *পদ্মানদীর মাঝি* ও *অহিংসা* উপন্যাসে। নিষ্ঠুরতার রকমফেরের ভিতর দিয়ে 'প্রাগৈতিহাসিক' ও *অহিংসায়* পলায়ন কিংবা প্রস্থান ঘটে। কিন্তু *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে কুবের-কপিলা সম্পর্কের মধ্যে সেই ধরনের কোনো বিকারগ্রস্ত নিষ্ঠুরতা নেই। এই দিক থেকে অর্থাৎ যৌনবিকারের দিক থেকে *অহিংসা* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদ্বিতীয় উপন্যাস।

অহিংসা উপন্যাসের যে গড়ন-সৌন্দর্য এবং মানবীয় সম্পর্কগুলোর যে চারিত্র্যরেখা অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্যে সদানন্দ ও মাধবীর বিকাশ অনেকটা জ্যামিতির অক্ষুণ্নতা লাভ করে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আশ্রমকেন্দ্রিক ক্ষমতাবিন্যাস ও যৌন অনাচারের কথা আমরা নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের কল্যাণে জেনেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবমনের সেই প্রত্ন-ইতিহাস আবিষ্কারের জন্য *অহিংসা* উপন্যাসের যে আখ্যানভাগ নির্মাণ করেছেন তাতে রিরংসা, নির্যাতন ও জিঘাংসাসহ ভারতবর্ষীয় পটভূমিতে যৌনতাকেন্দ্রিক বিকৃতির সবগুলো মাত্রাকে অবলীলায় ধরতে পেরেছেন।

'প্রভু' সদানন্দ তার রুচিবোধ, মাত্রাবোধ, সহযোগিতার মনোভাব ও অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখিয়ে প্রায় দেবত্বের পর্যায়ে উত্তীর্ণ। বৈঠকখানার ঘরোয়া মজলিশে সে সবার কথা শোনে, সবার সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে একাত্মতা প্রকাশ করে। কিন্তু *পুতুল নাচের ইতিকথার* যাদবের মতো এক ধরনের নির্মোহতা তাকে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তোলে। দুঃখে সে বিচলিত হয় না, সুখে আনন্দিত হয়ে ওঠে না। এই নির্বিকারত্বে সাধারণ মানুষের কাছে সে দেবত্বের পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু 'প্রভু' সদানন্দও যে মানুষ এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য তারও জৈব গড়নের অনিবার্য নিয়তি, এই সত্য উন্মোচনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দিষ্ট।

আশ্রমের সম্পত্তিদাতা মহীগড়ের রাজা সাহেবের ছেলে নারায়ণ বহুবার তার প্রমোদবালা নিয়ে আশ্রমে এসে উঠেছে। সদানন্দ ক্ষোভে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু

কাউকেই ভোগ করতে পারে নি। সুতরাং নতুন মেয়ে মাধবীর আগমনে তার বঞ্চিত যৌনতার অবদমিত চাপ থেকে আত্মঘাতী ক্ষুব্ধতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাতে যখন নিজেরই বিছানায় মাধবীকে ধর্ষণ করে তখন দৃশ্যপট ভিন্ন এক খাতে প্রবাহিত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। এবং ধীরে ধীরে মাধবী ও সদানন্দ– উভয়েরই বিকৃত যৌনতারও রোগগ্রস্ত অনুভব-অনুভাবনার প্রতিটি পরত খুলতে থাকে। সদানন্দের অপরাধবোধ, অহংবোধ (ego-centrism), প্রতিহিংসাপরায়ণতা, অস্তিত্বের সঙ্কট এবং মাধবীর মর্ষকামিতা (masochism) উপন্যাসের আখ্যানের জগৎকে মনোবিকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন যে, যৌনবিকার সয়ম্ভু কোনো সত্তা নয়, বরং এর সঙ্গে অপরাধের বিচিত্র উৎসমুখ এসে মিলিত হয়। আশ্রমের অপর ব্যক্তি সদানন্দের বন্ধু বিপিনের সম্পর্ক মর্মান্তিক রূপ লাভ করে অর্থনৈতিক কোনো লাভালাভকে কেন্দ্র করে নয়– মাধবীর প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সদানন্দ তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি সবই হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত এই সর্বস্বান্ত মানুষটি বেঁচে থাকতে চায় অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতা কিংবা প্রেম ও যৌনতার আহ্বানে নয়– নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতার মধ্যে। কিন্তু প্রতিহিংসার মধ্যে ব্যক্তিগত যন্ত্রণার যে দহন থাকে, তার প্রতি গূঢ়-গোপন আকর্ষণও এদের কম নয়। সুতরাং সদানন্দের বেঁচে থাকার মধ্যে আত্মরতি ও আত্মধ্বংসই মুখ্য হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, 'সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূলভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়– ব্যক্তিগত সংঘবদ্ধ জীবনের।' আশ্রম-জীবনে সদানন্দ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ ছিল এবং বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্নায়বিক বিকার জন্ম নেয়া অস্বাভাবিক ছিল না। আর সেখান থেকেই শুরু হয় পতনের। মাধবীকে কেন্দ্র করে সেই পতনের পথ ধরে সে একে একে হারাতে থাকে প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মানের জগৎ এবং ক্ষমতার জগৎও বটে। একসময় তার জীবনীশক্তি শূন্যের কোটায় নেমে আসে এবং সে বিপিনের সম্মুখেই মাধবীকে বলাৎকার করে। কিন্তু সেটা ধর্ষণ ছিল না– ছিল ধর্ষণের মাধ্যমে খুন করার অভিব্যক্তি। আর এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সে খুন করে প্রগতিশীল ভাবনার যুবক বিভূতিকে, মাধবী যার স্ত্রী। উপন্যাস-শেষে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় মাধবীকে নিয়ে তার প্রস্থান নিয়তিনির্ধারিত হয়ে যায়।

সদানন্দের বিকারগ্রস্ত জীবনের কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় দেয়া যায়। কেননা, বিকৃতির এই গড়নটি অপরিচিত নয়। কিন্তু মহেশ চৌধুরী নামক চরিত্রটি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এমন গূঢ়-গোপন হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করে যাকে সদানন্দের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত বলেই প্রতীয়মান হয়। একজন সাধারণ মানুষ তার অন্তর্নিহিত পশু প্রবৃত্তির ভিতর দিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে। এই হচ্ছে তার মৌল স্বরূপ। কিন্তু মহেশ চৌধুরী যেন মানুষ নয়, যেন মানবিক আবেগ-অনুভূতি, হিংসা-ক্রোধ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কোনো কিছুই তার মধ্যে নেই। পুত্রবধূকে যদি কেউ ধর্ষণ করতে চায়, অকারণে যে অন্যের হাতে মার খায়, পুত্র যার অন্যের হাতে খুন হয় এবং এসব ঘটনায় যার কোনো ক্ষোভ থাকে না, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় না, সে মহেশ চৌধুরী। মহেশ চৌধুরী তার জীবনের প্রতিটি নিষ্ঠুর ঘটনাকে ব্যবহার করে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে চায়। সেই প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠান যে সে পেয়ে যায়, তা কিন্তু নয়। তবে প্রতিষ্ঠার

হিসাবগুলোতে সে কখনই ভুল করতে চায় না। তাই বেশ্যাপ্রতিম মাধবীকে পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে 'প্রভু' সদানন্দকে রক্ষা করতে চায় কিংবা চিরদিনের জন্য সদানন্দকে তার করতলগত করতে চায়। এখানে পুত্র কিংবা মাধবী কিংবা সদানন্দ বিবেচ্যবিষয় নয়- বিষয় হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে মাধবীও যৌন অপরাধ ও মর্ষকামবৃত্তির এমন এক অসুস্থতার মধ্যে জীবনযাপন করে যেখানে স্বাভাবিক যৌনজীবন আর উপভোগ্য হয় না। সদানন্দের সঙ্গে তার মর্ষকামবৃত্তির ঘটনাগুলো সবই ঘটেছিল দিনের বেলা। সুতরাং দিনের বেলা স্বামী বিভূতির সঙ্গে মিলনে তার দেহ-মন কখনোই উপযোগী হয়ে উঠত না। আর রাতের বেলা প্রেম ও যৌনতার খেলায় বিভূতিকে জাগিয়ে রাখার উন্মত্ততার মধ্যে তার অস্বাভাবিক মনোগড়নের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও সে তৃপ্তি পায় না। তাই বিভূতিকে পুলিশের লোক খুঁজতে এলে গোপনে গোপনে মাধবী খুশি হয়ে ওঠে, সদানন্দের কাছে, ধর্ষকামী জীবনের কাছে, বিকারগ্রস্ততার কাছে ফিরে যাওয়ার যেন একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত সে নিয়তি-নির্ধারিত পথে সদানন্দের সঙ্গেই হারিয়ে যায়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রত্যেক মানুষই কিছু নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিচয় দেয়। সামাজিক বন্ধনের বিষয়গুলো যে টিকে আছে তার মূলে আছে এই সব অঙ্গীকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিকে এবং কখনো কখনো সমাজকে উন্মোচন করেছেন পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, তাঁর দৃষ্টিই ছিল ব্যক্তি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজের বিকাশের দিকে। জীবনীশক্তিরহিত একটি অকার্যকর মধ্যবিত্তশ্রেণীকে তিনি খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজেই সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। ফলে উন্মোচনের আত্যন্তিকতায় তিনি অতিক্রম করে গেছেন নিজেকে। এবং তিনি দেখেছেন, সর্বস্বান্ত না-হলে মানুষ রুগ্ণতার এতটা ক্লেদপঙ্কিল অবস্থায় উপনীত হতে পারে না। প্রথম পর্বের কথাসাহিত্যে তিনি এই রুগ্ণ মধ্যবিত্তের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

ছয়.

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একজন নতুন মায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে *রক্তের ঋণ* উপন্যাসে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের এই উপন্যাসের সিদ্ধেশ্বরী নগানন্দের মা এবং নগানন্দের জ্ঞাতসারেই সে একজন স্বৈরিণী। এমনকি নগানন্দের পিতাও যে সত্যিকারে তার পিতা নয়- পুত্রের সঙ্গে ঝগড়ার এক পর্যায়ে এই সত্যও সে গোপন রাখে না। সিদ্ধেশ্বরীর বিকারগ্রস্ততা এই একমাত্রিক- অবদমিত যৌনতার যথেচ্ছ প্রকাশ। বিচিত্র আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের খোলসে ঢাকা মা-চরিত্রটি প্রথম নির্মোক ভেঙে বিপ্রতীপ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে *রক্তের ঋণ* উপন্যাসে। কিন্তু এই উত্থানের মধ্যে না-ছিল কোনো বৈচিত্র্য, না-ছিল কোনো গভীর জীবনবোধের প্রত্যয়। ফলে শিল্পের ন্যায়সূত্রে প্রথাগত সকল বিশ্বাস ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের মিথ অতিক্রম করে প্রথম যে মা-চরিত্রের উদ্ভব ঘটে সেই মা সিদ্ধেশ্বরী নয়, শ্যামা। ১৯৩৫ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসের শ্যামা চরিত্রের ভিতর দিয়ে সত্যিকার অর্থে নতুন এক মায়ের আবির্ভাব ঘটে।

বৈবাহিক জীবনের প্রারম্ভে শ্যামা গভীর যন্ত্রণার সঙ্গে অনুভব করেছিল যে স্বামী শীতল অমানুষ- মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র। সুতরাং জৈবজগতের নিয়মে দু-একটি সন্তান জন্ম দেয়ার প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর সঙ্গে সে অন্য কোনো সম্পর্ক অনুভব করে না। তবে

বিবাহিত জীবনের সাত বছর সন্তান-সন্ততি না-হওয়ায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সে পঙ্গু হয়ে যায়। এর পর যখন সন্তান জন্ম নেয় তখন সন্তানের প্রতি স্নেহভাবনার চেয়ে মৃত্যুভাবনাজনিত আশঙ্কাই তাকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশুর সন্ত ানবাৎসল্যের মতো নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের উর্ধ্বে জান্তব অনুভূতি তার মধ্যেও প্রবল হয়ে ওঠে।

আর অন্যদিকে এদেশের অধিকাংশ নারীর মতো শ্যামাও কখনই স্ত্রী হতে পারে নি, হয়েছে জননী। কিন্তু ভালোবাসা মিশ্রিত তৃপ্তিকর যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে যে দাম্পত্য জীবন, সেই জীবনের আস্বাদ না পেয়ে শ্যামার মধ্যে অবদমিত যৌনতার চাপ বিচিত্র বিকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার একরৈখিক ভাবনা ও নিষ্ঠার মধ্যে একজন খ্যাপা জননীকে যতটা উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়, মানুষ শ্যামাকে সেভাবে আবিষ্কার করা যায় না। স্বামীকে সে কখনই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নি। ক্বচিৎ স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময়েও তার জননীসত্তাই প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিদের কেন্দ্র করে স্বার্থচিন্তাই শ্যামাকে গ্রাস করে নেয় এবং তারই বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বিচিত্র বিকার তার চরিত্রের অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

> মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পশুমাতার মৌল সহজাত প্রবৃত্তির (basic instinct) পরিচয়টিকেই এ উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলে অনিবার্যভাবেই মাতৃত্বের অংশ থেকে প্রথাগত আবেগ অনুভূতি, আদর্শবাদ ও দেবত্বের কাব্যসুলভ সকল কৃত্রিমতা এবং বাৎসল্যরসের প্লাবন পরিত্যাগ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক নির্মোহ ও বৈজ্ঞানিক জীবনবোধে শ্যামা-চরিত্র নির্মাণ করেছেন এবং এই নির্মাণে তিনি মাতৃত্ব-বিষয়ে প্রাণবৈজ্ঞানিক সত্যের কাছে যত বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন, লোকশ্রুতি ও আদর্শবাদের পূর্বতন ধারাকে তত বেশি এড়িয়ে গেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দানবীয় প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর সেই সর্বগ্রাসী প্রতিভার বলে তিনি উন্মোচন করে ফেলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবিত্তের যাপিত জীবন। ধর্মীয় আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পটভূমিতে গড়া বাঙালি জীবন নিয়ে যে আত্মতৃপ্তি ও অহংকার দীর্ঘদিন ধরে আমরা লালন করে চলছিলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঠুনকো অহংকার গুঁড়িয়ে দেন। সুস্থ এক জীবনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি আমাদের অসুস্থ জীবনের অনুপুঙ্খ উন্মোচনে তাঁর শিল্পপ্রতিভার বিস্ময়কর প্রতিফলন ঘটান।

মানিকের ভিটেমাটির মায়া : নাট্যকৌশল, সংলাপ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ভিন্নতর প্রয়োগ

সাইমন জাকারিয়া

সম্ভবত কিশোর বয়স থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখির প্রতি অপূর্ব এক মোহ জন্মেছিল। কেননা, আগেই জেনেছিলাম, মানিক ছিলেন জীবনঘনিষ্ঠ লেখক। শুধু জীবনঘনিষ্ঠ বললে ভুল হবে। আসলে মানিকের তেমন কোনো সাহিত্যকর্ম পাঠের আগেই গ্রামের একজন প্রাজ্ঞ পোস্টমাস্টার এবং শিক্ষকদের মুখে জেনেছিলাম, একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে বেয়ে যাওয়া পদ্মা নদীর মাঝিদের সঙ্গে বসবাস করার পর রচনা করেছিলেন অমর সাহিত্যকর্ম *পদ্মানদীর মাঝি*। শুধু এই তথ্যটি লেখক মানিকের প্রতি অন্য রকম একটা মোহ জাগিয়ে দিয়েছিল। সে মোহ থেকে *পদ্মানদীর মাঝি* পাঠ করে বহুবার স্বয়ং পদ্মা নদী ও গোয়ালন্দের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি, আবার *পুতুলনাচের ইতিকথা* কিংবা *ইতিকথার পরের কথা* পাঠ করে গ্রামীণ মানুষের জীবনকে ভিন্ন চোখ দিয়ে পাঠ করতে থাকি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প অতসীমামীতে কুষ্টিয়ার পোড়াদ বা পোড়াদহ স্টেশনের নাম দেখে তো ভেবেই নিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাড়ি-ঘরের নিজস্ব লেখক।

একসময় তাঁর মতো জীবন-প্রত্যক্ষকারী ও জীবন-ব্যাখ্যাকারী লেখক হবার পথ খুঁজে পেতে পাঠ করি 'লেখকের কথা'। কিন্তু মানিক পাঠের এত সব আয়োজনের মধ্যেও অজ্ঞাতে থেকে যায় তাঁর লেখা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক *ভিটেমাটি*। শেষপর্যন্ত কলকাতার গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মে তারিখে প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা : মানিক গ্রন্থাবলী*র ষষ্ঠ খণ্ডে নাটকটি আবিষ্কার করি। পরিশিষ্টে রচনা পরিচয় অংশ হতে জানতে পারি, নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে। প্রকাশক– স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৯৬। এ পর্যন্ত নাটকটির 'নূতন কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি এবং গ্রন্থটি বর্তমানে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।' *ভিটেমাটি* যেহেতু একটি মঞ্চনাটক সেহেতু এর গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যে নাট্যসংশ্লিষ্ট কোনো আগ্রহী পাঠকের মন নিবৃত্ত হবার কথা নয়। কিন্তু গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে নাটকটির মঞ্চায়ন-সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। ধারণা করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক *ভিটে মাটি* সম্ভবত তাঁর জীবদ্দশায় মঞ্চস্থ হয়নি, এমনকি এখন পর্যন্ত কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছে কি-না সে তথ্যও পাওয়া যায়নি।

ভিটেমাটি কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। তাই প্রথমেই এটি পাঠের ক্ষেত্রে এর শরীরে কথাসাহিত্যের আখ্যান-উপাদান কীভাবে নাটকের কাঠামো মেনে বিকশিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ জাগে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ইউরোপীয় পঞ্চাঙ্কের নাট্যাদর্শ গ্রহণ করতে তৎপর ছিলেন।

সর্বমোট পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত করে তিনি নাটকটি রচনা করলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যটি আসলে *একটিই* দৃশ্য, এটি যেমন নাটকটি পাঠ করলে শনাক্ত করা যায় তেমনি নাটকের শরীরে তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতে মানিক যে দৃশ্যগত নির্দেশনা দিয়েছেন সেখানেও স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'পূর্বের দৃশ্য'। তার মানে লেখক নিজেও প্রকাশ করেছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে কোনো দৃশ্যগত বিভেদ নেই। এদিক দিয়ে বলা চলে, *ভিটেমাটিতে* কাঠামোগত দিক দিয়ে পুরোপুরি পঞ্চাঙ্কের ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসৃত হয়নি। কাঠামোগত দিক ছাড়াও ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ ত্রি-ঐক্যের বিধান মেনে চলে, এই ত্রি-ঐক্যের মধ্যে আছে স্থান-কাল ও ক্রিয়ার ঐক্য। ইংরেজিতে যাকে বলে, ইউনিটি অব টাইম, স্পেস অ্যান্ড অ্যাকশন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের ত্রি-ঐক্যের বিধান মেনে চলার একটা প্রেরণা থাকলেও এটি কথাসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছে। সুস্পষ্টভাবে নাটকটির দৃশ্যপট বেশ কয়েকটি স্থানে সংঘটিত হয়েছে, স্থানগুলো হলো– মধুর বাড়ির সামনের আঙিনা, ছোটলালের বাড়ির সদরের দরজা, শম্ভু দাসের বাড়ির উঠান ও বারান্দা এবং গ্রামের পথ। এক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষ করা গেল *ভিটেমাটিতে* স্থানের ঐক্য নেই। অন্যদিকে সময় এবং ক্রিয়ার মধ্যেও তেমন কোনো ঐক্য প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ভিটেমাটি নাটক হলে এর দৃশ্য বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিকসুলভ লেখনভঙ্গিমা প্রয়োগ করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যাবে। যেমন, পঞ্চম দৃশ্যের বর্ণনায় মানিক লিখেছেন– 'আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা ঝোপঝাড়। অন্যদিকে মাঠ, ক্ষেত। চারিদিকে নিঃশব্দ, পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যায় না।' এই বর্ণনাকে কি মঞ্চে দৃশ্যরূপ দেওয়া সম্ভব? মঞ্চ নির্দেশনার ছলে কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের শরীরে যখন এরকম একটি কাব্যিক ও কথাসাহিত্যিকসুলভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন তখন তা প্রচলিত ইউরোপীয় সংলাপাত্মক নাট্যরীতিতে মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, কিন্তু সাম্প্রতিককালে চর্চিত শহুরে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, শুধু মঞ্চ নির্দেশনামূলক কিছু দৃশ্য বর্ণনার জন্যই *ভিটেমাটি* বর্ণনাত্মক নাট্যধারার অনুসারী নাট্যকর্মীদের অবলম্বন হবার যোগ্য নয়। এ নাটকটির চরিত্রের কথোপকথনের ভেতর বর্ণনাত্মক সংলাপের অস্তিত্ব রয়েছে।

নাটকের কাহিনীতে আছে– একটি গুজবের কথা। সে গুজবের এক অশুভশক্তি বা আগ্রাসীর হাঙ্গামার ভয়ে জুনপাকিয়া গ্রামের লোকজন নিজের এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে কিছু সুবিধাবাদী লোক এলাকাত্যাগী মানুষের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে তাদের ভিটেমাটি বিষয়সম্পত্তি আত্মগত করতে লিপ্ত। অন্যদিকে কিছু লোক আবার নিজের এলাকায় থেকে যাবার পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করতে তৎপরতা দেখায়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু চরিত্র পরস্পর দ্বিমুখী টানাপোড়েনে ভুগতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এলাকাপ্রীতির জয় হয়। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষ সবাই তাদের নিজের গ্রাম, এলাকার প্রতি ভালোবাসায় এবং নিজস্ব এলাকার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনচক্র রক্ষায় এক সময় সাংগঠনিক একটি ছন্দ খুঁজে পায়। সে ছন্দের মধ্যেও অশুভশক্তির তৎপরতা কমে না। কিন্তু কে-না জানে, পরিশেষে মানবিক ভালোবাসারই জয় হয়।

নাটকটি শুরু হয়েছে শম্ভু দাসের মেয়ে পদ্মা ও তার প্রেমিক পুরুষ চাষী যুবক মধুর সংলাপ দিয়ে। তার আগে মঞ্চ নির্দেশনামূলক বর্ণনা থেকে জানা যায়– সকাল বেলায়

মধু বাড়ির সামনের আঙিনায় উবু হয়ে বসে চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে সাফ করছিল। এমন সময়, 'দ্রুতপদে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পদ্মা এসে দাঁড়ায়, তার চুল এলোমেলো, আঁচল একহাতে কাঁধে চেপে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে আঁচল ভাল করে গায়ে জড়িয়ে হাঁপাতে থাকে।' মধু উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে তাকে প্রশ্ন করে– 'কি হয়েছে পদি?'

পদ্মা। যাবার আগে একটি বার পালিয়ে এলাম।

মধু। যাবার আগে!

পদ্মা। নইলে ছুটে আসি?

মধু। আমি ভাবলাম তোদের বুঝি যাওয়া হলো না তাই ছুটে এয়েছিস ভাল খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার?

পদ্মা। ছিল না? জিনিসপত্তর গাড়িতে বোঝাই দিয়েছে কখন। এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন আসে মানুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে বুঝি পারলে না একটিবার? না, মন করলে মরুক গে যাক, পদি গেলে মেয়া জুটবে ঢের!

মধু। জুটবে না তো কি? শম্ভু দাসের মেয়া পদ্মা দাসী ছাড়া বুঝি মেয়া নেই কো পিথিবিতে? যাচ্ছিস বেশ যাচ্ছিস। ফিরে যদি আসিস কোন দিন, দেখবি তোর তরে বসে নেই মধু, ভূষণ খুড়োর মেয়াটা তার ঘর করছে।

পদ্মা। ভূষণ খুড়োর মেয়া! মোহিনী!

মধু। হাসির কি হল?

পদ্মা। মেয়া লিয়ে পালাচ্ছে ভূষণ খুড়ো। তোমার অদেষ্ট মন্দ।

মধু। পালাচ্ছে! ভূষণ খুড়োও পালাচ্ছে? ফসল কি করবে? গাইবাছুর কি করবে? তিন জোড়া গাই ওর। কালো গাইটা আজ দশদিন হয়নি বিইয়েছে।

পদ্মা। নকুড় ফসল তুলবে, গাইবাছুর, ঘরদোর দেখবে। যদি অবিশ্যি থাকে কিছু শেষতক।

মধু। তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভালো!

পদ্মা। উপায় কি। কবে হানা দেবে আবার, ঘরদোর পুড়বে, নিজেরা প্রাণে মরবে, তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভাল।

মধু। যেখানে পালাবে সেখানে হানা দেবে না ওরা?

পদ্মা। বিপদ সব যাগায় সমান নয়তো।

মধু। কি করে জানবে কোথা বিপদ কম? ছোটলাল এই কথা বোঝাচ্ছে। যে ভয়ে পালাতে চাইছো এ-গাঁ ছেড়ে ও-গাঁয়ে, সে ভয়ের এলাকা ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। পালাতে দেবেই না।

পদ্মা। আমায় বুঝিয়ে কি হবে! বাবাকে পারলে না বোঝাতে!

মধু। নকুড় পরামর্শ দিচ্ছে, ভূষণ ফুসলাচ্ছে, তোর বাবা কি কিছু বুঝতে চায়! নকুড় গুছিয়ে নিচ্ছে বেশ তলে তলে। জলের দামে কিনে সব বেচছে। ভূষণ খুড়োর গচ্ছিত যা কিছু দিয়ে যাচ্ছে তাও বেচে দেবে। তারপর সরে পড়বে খাসধুবোয়, এখেনে অসুবিধা হলে।

এভাবেই প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ দক্ষতার সঙ্গে পুরো নাটকটির আখ্যানবস্তু ও তার চরিত্রসমূহের পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু ইঙ্গিত প্রদান

করেন। এই ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে পদ্মার সাথে মধুর একটি প্রেমের সম্পর্ক আগেই থেকেই আছে। কিন্তু সে পদ্মার বাবার গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি মধু চরিত্রের সংলাপের ভেতর দিয়ে তার মাঠ, ফসল, গরু-বাছুর ও নিজস্ব এলাকার প্রকৃতি প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মধু চরিত্রের বর্ণনাত্মক সংলাপের ভেতর দিয়েই গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণকারী ছোটলাল চরিত্র এবং সুযোগসন্ধানী ধূর্ত নকুড় চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকীয় ঘটনা সংঘটনে বা কিছু পরিবর্তনশীল মুহূর্ত সৃজনে *ভিটেমাটি* নাটকটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কাহিনীর একরৈখিক চলনের মধ্যে কোনো চরিত্রকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুনির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আরেকটি চরিত্রের আগমন ঘটিয়ে সে সিদ্ধান্তকে সমূলে বদলে দিয়েছেন। যেমন, দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন আমিরুদ্দীন এসে ছোটলালের কাছে নিজের গ্রাম ছেড়ে রসুলপুরে চলে যাবার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। একই সিদ্ধান্ত কাদেরও যখন প্রকাশ করে তখন ছোটলাল অনেকটা হতাশ হয়ে বলেন– 'কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা কমানো গেছে। তোমরা গেলে আবার সকলের ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা হয়ে উঠবে। তোমাদের কেন যে...।' ছোটলালের কথা শেষ হবার আগেই কথা বলে ওঠে আমিরুদ্দীন ও কাদের।

আমিরুদ্দীন। ওসব শুনতে চাই না ছোটবাবু।

কাদের। আর কিছু বলবেন না ছোটবাবু।

ছোটলাল। না, আর কিছু বলবো না তোমাদের। রসুলপুরে তোমাদের কে আছে আমির? কার কাছে যাবে?

আমিরুদ্দীন। আমার জামাই আছে। নাম খলিল। আমাদের খুব খাতির করে। আমরা গেলে বড় খুশি হবে ছোটবাবু।

এধরনের কথোপকথনের মধ্যে আজিজ এসে আমিরুদ্দীনকে বলে–

আজিজ। বাড়ি এসো শিগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন। খলিল? খলিল কোথা থেকে এল?

আজিজ। রসুলপুর থেকে, আবার কোথা থেকে?

আমিরুদ্দীন। খলিল এল কেন রসুলপুর থেকে? আমরা তো যাব রসুলপুরে তার কাছে। আমাদের নিতে এসেছে হবে, অ্যাঁ?

আজিজ। উহুঁক। পালিয়ে এসেছে বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন। আমিনা?

আজিজ। আরে, সব চলে এল, আমিনাকে ফেলে রেখে আসবে? আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে দুটো বাচ্চার বেদম জ্বর।

কাদের। ওরা পালিয়ে এসেছে কেন?

আজিজ। মজিলপুরে ঘাঁটি পড়েছে মস্ত।

কাদের। মজিলপুর তো দূর আছে রসুলপুর থেকে।

আজিজ। দূর হলে কি হবে, সবাই আরও দূরে ভাগছে।

আজিজের সঙ্গে আমিরুদ্দীন চলে গেল।

কাদের। আমি তবে কি করব ছোটবাবু?

ছোটলাল। তুমিও কি রসুলপুরে যাচ্ছিলে নাকি?

কাদের। না, কিন্তু আমি যেখানে যাব সেখানে থেকেও সবাই যদি পালিয়ে থাকে! যার কাছে যাব, গিয়ে দেখি সে নেই! যদিবা থাকে, আবার দু'দিন পরে ফের সেখান থেকে যদি অন্য কোথাও পালাতে হয়।

ছোটলাল। তুমিই ভেবে দ্যাখো কি করবে?

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু?

ছোটলাল। তুমিই বুঝে দ্যাখো।

কাদের। ওই আমিরুদ্দীন বলে বলে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটবাবু। ও তো আর যাবে না। আমিইবা তবে কেন যাব মিছামিছি!

ছোটলাল। (হেসে) যেও না।'

নাটকীয় কৌশলের আশ্রয়ে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসরমান একটি আখ্যানের মাঝখানে একটি দ্বিধা এনে আবার পরক্ষণেই তা ভেঙে দিয়ে প্রকৃত নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকেই ধাবিত হয় *ভিটেমাটির* গল্প। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও তা থেকে উত্তরণে উদাহরণ ও নাটকীয় পরিবর্তনের আরও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত *ভিটেমাটিতে* লভ্য।

মধু গ্রাম ছাড়তে রাজি হয় না বলে শম্ভু দাস পণ নিয়ে নকুড়ের সঙ্গে পদ্মার বিয়ে ঠিক করে। নকুড় একথাটি প্রকাশ্যে মধুকে বলে যায়। কিন্তু নিজের প্রেমিকা হারানোর বেদনাকে যেন পাত্তা না দিয়েই গ্রামের মানুষকে ছোটলালের দীক্ষা মতে সংগঠিত করতে থাকে না পালিয়ে দুঃসময়ের মোকাবেলা করার জন্যে। এরমধ্যে একদিন ছোটলালের উপস্থিতিতে রামঠাকুর নকুড়ের সাথে পদ্মার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে। সেকথা শুনে ছোটলাল সে বিস্মিত হয়ে ওঠে কিন্তু মধু তার বিস্ময়ের স্পষ্ট জানিয়ে দেয়– 'খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্যে নেবে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়।' একথার পিঠে ছোটলাল বলে–

ছোটলাল। তার দোষ কি মধু? শম্ভু জোর করে নিয়ে গেলে সে কি করবে।

মধু। গোঁ ধরতে পারলে না? বাপের আহ্লাদি মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাধ্যি ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওর ইচ্ছে ছিল বড় লোকের বৌ হবে।

রামঠাকুর। সমস্যা ফেলে দিলে বাপু। ভয়ে না, বড় লোকের বৌ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল। (নকুড়ের প্রবেশ)। আরে বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে!

নকুড়। পদ্মাকে কোথা রেখেছিস মধু?

মধু। তুই তোকারি কর না দে'মশায়। অনেকবারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড়। চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা! তোকে আবার আপনি বলতে হবে! শম্ভুর মেয়েকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিস বল্ শিগগির।

এরপর নকুড়ের মুখ থেকেই জানা যায়, কাল সন্ধ্যা থেকে পদ্মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মার নিখোঁজ হবার এই সংবাদ জেনে সবাই যখন খুবই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তখন ছোটলাল বলে–

ছোটলাল। কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে পড়ে।

সুবর্ণ। তাই বলে খোঁজ করবে না?

ছোটলাল। করব বৈকি তবে আমার মনে হয়, পদ্মা নিজেই খোঁজ দেবে আজ-কালের মধ্যে।

ছোটলালের একথা শেষ হতে না হতেই ধূলি-ধূসর শ্রান্ত-ক্লান্ত চেহারায় পদ্মা প্রবেশ করে। তাকে দেখেই বোঝা যায় সে দীর্ঘপথ হেঁটে এসেছে। ছোটলাল তাকে দেখেই বলে ওঠে–

ছোটলাল। এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।

পদ্মা। আমি পালিয়ে এসেছি।

সুবর্ণ। তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধরেবেঁধে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা। বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর। তাই বাড়ি না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝ?

পদ্মা। বড় ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

ছোটলাল। তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব'খন। তুই তো পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, স্যারারাত সারাদিন ছিলি কোথায়?

পদ্মা। পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে গিয়েছিলাম।

সংলাপের এই জাদুকরি প্রকাশ দেখে চমকে না উঠে পারা যায় না, সামান্য একটা মেয়ে যার নাম পদ্মা সে কি-না 'পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে' গিয়েছিল। এই সংলাপের ভেতর নিশ্চয় গভীর একটা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। কেননা, মেয়েটির নাম পদ্মা আর পদ্মার গন্তব্য তো শেষমেশ সমুদ্রের দিকেই হবার কথা। নাটকের একটি নারী চরিত্র পদ্মা রক্তমাংসের একজন মানুষ হয়েও পাঠককে সে কথাটি মনে করিয়ে দেয়। তারপরও আমরা নিশ্চিত জানি না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ইঙ্গিত থেকে এ ধরনের সংলাপ রচনা করেছেন।

সংলাপের চমৎকারিত্ব পুরো *ভিটেমাটি* নাটকের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, এই চমৎকারিত্ব শুধু শব্দ প্রয়োগ বা ভাষার গাঁথুনিতে ভরা নয়। *ভিটেমাটি* নাটকের এক একটি সংলাপের ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা ও প্রকৃতিনিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে অপূর্বভাবে। আসলে, গ্রাম ও গ্রামের মানুষের জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া এ ধরনের সংলাপ রচনা করা সম্ভব নয়।

এবারে *ভিটেমাটি* থেকে উদ্ধৃত করছি কয়েকটি হীরকদ্যুতি দেওয়া সংলাপ–

প্রথমেই থাকছে ছোটলালের একটি বর্ণনাত্মক সংলাপ। তিনি নাটকের একটি স্থানে বলেছেন– "ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মত, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। শহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়িতে বাস, বড়জোর একপুরুষের তৈরি বাড়িতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।" এ ধরনের সংলাপের ভেতর দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস জীবন নিয়ে গ্রাম ও শহরের মানুষের মনস্তত্ত্বকে অপূর্বভাবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্য একটি চরিত্র কাদেরের সংলাপ হলো– "তবে সত্য কথা বলি ছোটবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাইনি, ভোরে উঠে ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো ক্ষেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে

মনটা হু হু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়িটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কি করি সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।" এই সংলাপের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্রামীণ মানুষের প্রাণময় আবেগের কথা। সংলাপটির শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এমন একটি আবেগ, যে আবেগের সূত্র ধরে স্পষ্টই বলা যায়, গ্রামের মানুষ তাঁদের আবাদি মাঠ-ফসল, ঘর-বাড়ি ইত্যাকার জীবনসংশ্লিষ্ট সকল কিছুকে প্রাণময় দেখে থাকে। তা না হলে কি শিশির পড়া ঘরকে একজন কাদেরের কাছে বাড়ির কান্না বলে অনুভূত হয়।

বাংলাদেশের সমকালীন সমাজব্যবস্থার সত্য প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে রচিত *ভিটেমাটি* নাটকের ছোটলালের সংলাপে– "ছোটলাল। আমি একা কি করব? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছু করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক দুর্দিনে কর্তব্যের নির্দেশ পাবার জন্য যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এদেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষানুক্রমে এদেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ এদেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই।"

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'ভিটেমাটি' নাটকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উপাদানকে বিপ্লবী অভিযাত্রার শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন– বাঁশি বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির একটি অনিবার্য উপাদান। *ভিটেমাটি* নাটকে এই বাঁশিকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় নি, তার বদলে বাঁশিকে একটি সাংগঠনিক ঐক্য রচনার অস্ত্র বা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, নকুড় একদিন এক নির্জনতার সুযোগে শম্ভু দাসের বাড়িতে পদ্মাকে তুলে নিতে আসে। পদ্মা তার কথায় সম্মতি না প্রকাশ করে তাকে একটি বাঁশি উঠিয়ে দেখাতেই নকুড় ভীতিতে চমকে ওঠে–

নকুড়।... তোর হাতে ওটা কি?

পদ্মা। অস্ত্র। তোমার মত এমনিভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য সুভাদিদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁয়ের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বৌ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড়। কি অস্ত্র? পিস্তল নাকি?

পদ্মা। পিস্তল নয়, বাঁশি। আমাদের বাড়িটা অন্য সবার বাড়ি থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমায় সবচেয়ে বড় বাঁশিটা দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় যাদের ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, তাদের ছোট টিনের বাঁশি,–সরু আওয়াজ বেরোয়। আমার এ বাঁশিটা সদর থেকে কেনা, টিনের বাঁশিগুলো বানিয়েছে মদন কম্মোকার। একদিনে ও তিন কুড়ি বাঁশি বানাতে পারে।

নকুড়। বাঁশি! তাই বল।

পদ্মা। বাঁশি বলে গেরাহ্যি হল না বুঝি? আমি এটা মুখে তুললে কি হবে জানো? এদিকে ক্ষেন্তি, বকুল, পদীপিসি, মনোর মা, ওদিকে ছুতোর বৌ, মাখনের মা, আন্নাকালী, আর ওই পশ্চিমে বিধু, কৈবর্তী, মালতী ওরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয়তো শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশি শুনে দূরে দূরে যত বাড়ি আছে সব বাড়িতে বাঁশি আর শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা আছে দু'দশজন তারা লাঠিসোটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে এসে

তোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও তোমাদের দু'একজনের দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড়। তুই তবে যাবি নে পদ্মা? সত্যি যাবি নে? পাল্কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

পদ্মা। তাই যাও ভালয় ভালয়।"

রামঠাকুর। ধরেছি পদ্মা। চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছ'টা ষণ্ডাষণ্ডা লোকের সঙ্গে ফিসফাস করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়, যে শ্যামের বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছি। গিন্নির বাঁশিটা কোমরে গোঁজা ছিল!

শুধু বাঁশি নয়, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির আরেকটি উপাদান 'উড়ানি'। রামঠাকুর ধূর্ত নকুড়কে উড়ানি বেঁধে আনে জনসমক্ষে। ভক্তিরসে নিমজ্জিত ঐতিহ্যবাহী উপাদানকে *ভিটেমাটি* নাটকে বিপ্লবী চরিত্র দানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাহস ও অকৃত্রিমতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের দেশের পথহারা বিপ্লবীদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সক্ষম বৈকি। কেননা, রামঠাকুর নকুড়কে গলায় উড়ানি দিয়ে বেঁধে এনে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন–

"রামঠাকুর। গামছা নয়, উড়ানি। পূজোর ফুল পাতা নৈবেদ্য বাঁধা হয়, এ উড়ানি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারো অপমান হয় না। স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।"

ভিটেমাটি নাটকের সংলাপে আছে শুদ্ধ ভাষারীতির সাথে গ্রামীণ ভাষারীতির মিশেল। পরিবেশনারীতির শিল্প হিসেবে এ রকম সংলাপ প্রয়োগ আমাদের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ধারাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া, নাটকটির ভেতর দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যে চিত্র প্রকাশিত হয় তাতে জানা যায়, একসময় এদেশে পাত্রপক্ষ পণ দিয়ে কন্যা গ্রহণ করত সম্ভবত সেটা মুসলিম বিবাহরীতির দেনমোহর পরিশোধের একটি বাস্তব রূপ।

মানিক অথবা শশী ডাক্তারের মর্মকথা

সাদ কামালী

দূরে দূরে,
আকাশের বুক খুঁড়ে-খুঁড়ে
নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায় ...

এলিজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

'মিহি ও মোটা কাহিনী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের বিজ্ঞাপন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে লিখে দেন। নিজের গ্রন্থের নিজের লেখা বিজ্ঞাপনের কথায় মানিক-সাহিত্যের সত্য প্রকাশ হয়েছে বৈকি! '...কালচার নামক ব্যারামটি একশ্রেণীর মানুষের জীবনের আনন্দ-বেদনার উপর কৃত্রিম যবনিকা টানিয়া দেয়, সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন হইতে মানিকবাবু তাঁহার রসসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন। এই সকল মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে মানিকবাবুর লেখায় যে রস সৃষ্টি হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।' রসই বটে ! তীক্ষ্ণ শ্লেষ, তীব্র বিদ্রূপের রসে মোটা মিহি কাহিনী ডোবানো। বাংলা সাহিত্যে অম্লরসের এমন বিপুল আমদানি মানিক সাহিত্যের বাইরে কখনো জোগান ঘটেনি। বস্তুনিষ্ঠায় অদ্বিতীয় মানিক প্রথানুকূল রুচির দায়ে মধুর রস আর কল্পিত রূপ সৃষ্টিকারী মহৎ লেখকদের শিবিরে নিজের নাম নিবন্ধন করতে শেষ পর্যন্ত অপারগ ছিলেন।

নান্দনিক বোধকে সামাজিক রাজনৈতিক চেতনাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো মানবিক মূল্যবোধ ও স্বকল্পিত শ্রেয়বোধ দ্বারা প্রভাবিত হতে দেননি। ভাবালুতা, ভাবগত আদর্শ গল্প-উপন্যাসের শরীর চরিত্র বা ব্যক্তির কাঁধে চড়িয়ে ইচ্ছা পূরণের কাহিনী নির্মাণের কারিগর তিনি ছিলেন না। বস্তুনিষ্ঠ মানিক বাস্তবকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার সমূহ স্বরূপের কথা চারুভাষা বা প্রতীকের আড়ালে নয়, সরাসরি সহজ স্বাভাবিক সৃষ্টির অসামান্য শিল্পী তিনি, স্বতন্ত্র, 'দিবারাত্রির কাব্য' থেকেই স্বতন্ত্র। স্বভাবী দক্ষতা ছাড়াও তাঁর স্বচ্ছ ও নীরোগ দৃষ্টিতে কোনো মহৎ ইচ্ছার শ্যাওলা বা মায়া বিভ্রম ছিলো না। 'ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ' তাঁর চেনা ছিল, অধ্যাত্মবাদ বা ভাষাগত দর্শনের চাপে সত্যকে বিপর্যস্ত হতে দেননি। ব্যক্তি শ্রেণী রাষ্ট্র বস্তু পুঁজি সময় ইতিহাস প্রতিবেশ সম্পর্ক দ্বন্দ্ব প্রেম কাম হিংসা লোভ ক্ষমতা এবং অনুভূতি অনুভব দর্শনে ও উপলব্ধিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো সংশয় শুরু থেকেই ছিল না। যখন তিনি নিতান্তই কিশোর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন, পিতৃদত্ত নামের ভালো ছাত্র প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুড়ি বছর বয়সের *অতসী মামী* (১৯২৮) গল্পের লেখকও নন, স্কুলের ছাত্র, তখন ছিল তার গোপন কবিতা চর্চা। ক্রমে সেই কবিতার শরীরে ভিন্ন আঙ্গিক ও নতুন পোশাকের আড়ম্বর না থাকলেও বোধ ও উপলব্ধির ধরনে কথাশিল্পী মানিকের সব প্রবণতাই সেখানে স্পষ্ট, কিশোরসুলভ কল্পনা ও রূপের ভাবালুতা শুধু নয়, তীব্র শ্লেষ

নির্মোহতা আর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করার অনায়াস সহজ প্রকাশ রীতিমতো বিস্ময়কর। যুগান্তর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' প্রকাশ হয় ১৯৭০ সালে। গ্রন্থে রোমান্টিক মানবিকতার প্রতি দুর্বলতাযুক্ত কয়েকটি 'প্রাথমিক কাব্য' প্রয়াসের সঙ্গে আছে 'ছড়া', 'স্বাধীনতার স্বাদ থেকে', 'সুকান্ত ভট্টাচার্য', 'বুড়ো সন্ত্রাসবাদী', 'চা', 'সুন্দর', 'গুড়ের ভাঁড়', 'ডিসেম্বর' ইত্যাদি তীক্ষ্ণ নিপুণ শ্লেষের কবিতা, তির্যক দৃষ্টির পদ্যপ্রকাশ। 'সুন্দর' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়া যাক—কি নিরাবেগ নিষ্ঠুর উচ্চারণ,

'বাপটা মরল, ভাইটাও
বোনটা ভগবান পেয়েছে টাকা-ওলা গান্ধী-ভাঙানো ব্যবসায়।
ছেলেটা মরেছে, মরেছে !
শুকনো মাই বলে ছেলে বুঝি মরেছে?'

'গুড়ের ভাঁড়' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা ও প্রাপ্তির ফাঁক ও ফাঁকি দেখান—

'ভিক্ষে করা গুড়ের ভাঁড়ে পিঁপড়ে অগণন—
রইল মধু হুল উঁচানো মৌমাছিদের চাকে,
স্বাধীনতার জীবন সুধারস,
শূন্য গুড়ের ভাঁড়েই লোভী পিঁপড়ে হল খুশি।'

কথাসাহিত্য চর্চার প্রাথমিক কালে বা শুরুতেই *অতসী মামী* (১৯২৮), 'নেকী' (১৯২৯), *ব্যথার পূজা* (১৯২৯)-র মতো 'উচ্ছ্বাসময়', মেলোড্রামাটিক শরৎচন্দ্রের ছায়া জড়ানো অমানিক স্বভাবী আটপৌরে গল্পের প্রকাশ হতে হতে মানিক উপন্যাস রচনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত ওই তিনটি গল্পের ভিতর মানিকের পেশল আবির্ভাবের সূচনা ঘটে গেছে। এবং হয়তো তাঁর গন্তব্যও। ভালো নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে *'অতসী মামী'* গল্পটি ভালো বোধ না হওয়ায় ডাকনাম মানিক ব্যবহার করেন, সেই মানিকই বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী উজ্জ্বল মানিক হয়ে উঠলেন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে 'আমার গল্প লেখা' আলাপচারিতায় তিনি ১৯৪৫ সালে জানান, 'ভাবলাম এই উচ্ছ্বাসময় গল্প নিছক পাঠকের মনভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেব না। পরে যখন নিজের নামে ভালো লেখা লিখব, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু কজনকে জানিয়ে গল্পে নাম দিলাম ডাকনাম মানিক।' আত্মপ্রত্যয়ী আত্মসচেতন মানিক অন্যদের মতো বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার বদলে পারিবারিক মতবিরোধ সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে লেখক জীবনকেই বেছে নেন। প্রথম রচিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* এই সময়ই (১৯২৯) লিখতে শুরু করেন। প্রায় গোপনীয় কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাব্য প্রয়াস ও চর্চার ও নান্দনিক ঘোর প্রথম উপন্যাসে হাতছানি দেয়। কাব্যগুণ ও কাব্যদোষের এই আদি উপন্যাস 'সবচেয়ে কম পাকা লেখা' হিসেবে চিহ্নিত হয় স্বাভাবিক কারণেই। ...'শিরোনামাতেই কবিতা আছে। *দিবারাত্রির কাব্য* শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম পাকা লেখা, সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্য তাতে দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে থেকে।' মানিকের অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবন্ধে এই মত দেন ১৯৫৭ সালে।

এই আশ্চর্যের আভাস অলৌকিকের উদ্ভাস এবং দিগন্তপ্রসারী সক্ষমতা, আলাদা গদ্যে নিখুঁত কঠিন ও রহস্যময় বাস্তবতায় নির্মিত *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) উপন্যাস এবং *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থে অর্থাৎ প্রথম পর্বের সাহিত্য সাধনায় অনুভূত হয় বৈকি। পরবর্তীকালের রচনাতেও কঠোরতর বস্তুনিষ্ঠা এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা যা পাঠকের কোনো দুর্বলতাকেই দয়া করে না, সমাজের নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবের ছবি উদ্ধার করে আনেন যে সব গল্প উপন্যাসে সেখানেও 'আশ্চর্যের আভাস' বর্তমান ও বাঙ্ময়। *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *পদ্মানদীর মাঝি* শুধু মানিকেরই নয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল, বাংলাভাষায় প্রথম সফল আধুনিক উপন্যাস। *দুর্গেশনন্দিনী* থেকে উপন্যাসের যে আধুনিক মডেল—আঙ্গিক, বিষয়, ভাষা এবং চরিত্র বা ব্যক্তি নির্মাণের যাত্রা শুরু, পুতুলনাচের ইতিকথা সেই যাত্রার শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই প্রথম বাংলা উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিবেশ ও রূপের অনাবশ্যক বিস্তৃত বর্ণনা, মঙ্গল চৈতন্য, আর্দ্র-আবেগ, ইতিবাচকতা, ভাবালুতা, ও ভাষার আলঙ্কারিক কাব্যপনা ঝেড়ে মানিকের কলমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইতিহাস সময় সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক শ্রেণীসাপেক্ষে চরিত্রগুলো সাবালক বাস্তববাদী রক্তমাংসের হয়ে ওঠে। মনোজগত, অভিপ্রায়, অবচেতন, সবরকম মানবীয় অনুভূতিসহ ব্যক্তির সমূহ বিকাশ ঘটে। এ শুধু সহজাত প্রকাশই নয়, মানিকের সচেতন প্রয়াসেরও ফল। *পুতুলনাচের ইতিকথা* ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন বাংলা ১৩৪১ (১৯৩৫) সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ঐ ১৩৪১ সালেই 'পদ্মানদীর মাঝি'ও প্রকাশ হতে থাকে। তবে পূর্ব্বাশা পত্রিকা প্রকাশনা বিঘ্নিত হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে পারে নি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রকাশের বেশ পরে ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ দাঙ্গার কালে পুরো সমাজতন্ত্রী ও পার্টির নিবন্ধিত কর্মী মানিক সাম্প্রদায়িক মদদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দাঙ্গার পটভূমিতে 'নগরবাসী' উপন্যাসটি লেখেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় (১৯৫১) উপন্যাসটির নাম দেন 'স্বাধীনতার স্বাদ'। এবং কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুরোধে নিজের লেখালেখির ভাবনাসহ আত্মজৈবনিক উপন্যাসের খসড়া 'উপন্যাসের ধারা' শুরু করেন। এই রচনাতেই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লেখার প্রস্তুতি ও সূচনার উল্লেখ আছে, '... কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল পুতুলনাচের ইতিকথার উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাস— এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়' (মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় ভাগ ১৯৫২)। মোহের চোরা স্বরূপ শুধু নয়, সময় ও ব্যক্তির সত্য মূল, অন্তর্লোক, বুদ্ধি উপলব্ধির কার্যকারণ বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অপরিহার্যতা মানিক জেনেছিলেন। উপন্যাসের ধারা প্রবন্ধে লেখেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো যুগের যে কোনো উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে' (ঐ)।

সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক মানিক নিম্নবর্গের মানুষ, মধ্যবিত্তের জীবন মন জগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা মোহ কামবোধসহ ইতি-নেতির সমূহ প্রকাশ করতে পারেন বাহুল্য বর্ণনা, নিরক্ত প্রতীক এবং ভাষার আতিশয্য বর্জন করেই। তার প্রকাশ সরাসরি, স্বভাবী, মর্মভেদী, কোথাও করুণা বা ভণিতা নয়, নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি। অধ্যাত্মবাদী কিছু সংশয় পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে আবিষ্কারের চেষ্টা করা গেলেও বাস্তববাদী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে তা ঘটতে পারে ; কারণ শিল্প সৃষ্টির রসায়নে প্রতিভাবান শিল্পী নিজের দর্শন আদর্শ আরোপ করেন না। শিল্পীর করণীয় হয়ে ওঠে সৃষ্টির উন্মাদনায় নিজের দর্শনের ভিতরেই নিঃশেষিত না হওয়া, সৃষ্টিকর্মের স্বাভাবিক গতি ও প্রকাশ বোধ করে শিল্পী বা লেখক নিজের বিশ্বাস দর্শন গেঁথে দিতে চাইলে জোরের পরিচয় হয়তো মিলে, কিন্তু জোর করা তো শক্তির পরিচয় নয়। কুসুমের বাবা অনন্তর সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান ও চৈতন্যে মানিক বাবুর অর্থাৎ শিল্পীর বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তি ও নাস্তিক্য চড়িয়ে দিতে গেলে অনন্ত আর অনন্ত না হয়ে কৃত্রিম, অবিশ্বাস্য, মরচে-পড়া একজন নিরক্ত মানুষ যে-শিল্পী লেখকের ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই বলে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লেখক নন, কোথাও ফাঁক থেকে গেলেও ফাঁকি তিনি বোঝেন না। শশী ডাক্তারকে অনন্ত বলে, 'সবচেয়ে ভালো ঘর-বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম, ওর অদেষ্টেই হল কষ্ট। সংসারের মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বৈ তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন। শশী একটু হাসিয়া বলিল, তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম। অনন্ত বলিল, তেমন করে চাইলে পাবেন বৈকি, ভক্তের তো দাস তিনি।' লোভী সুদখোর গোপালের মতো মানুষেরও অদৃষ্টের দোহাই দেয়ারই কথা। শশী যখন অমূল্য ডাক্তারকে হাসপাতালে নিয়োগ করে কলকাতায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, গোপাল কোনোভাবে ছেলেকে ফেরাতে না পেরে নিজেই কাশীতে 'বাবা'র কাছে আশ্রমে চলে যাওয়ার কথা বলে। হঠাৎ করে কাশী যাওয়ার কথায় শশী স্বভাবগত মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করলে গোপাল অভিমান করে বলে, 'না যদি থাকতে পারিস তো বল, যাওয়া বন্ধ করি। অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে।' নিরুদ্যম, নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ, ভীরু, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে সংশয়ী, হিসেবি, ব্যর্থ এবং নানা স্ববিরোধিতায় ভরা প্রকৃত মধ্যবিত্ত শশীর মনোজগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অবস্থান দর্শন দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রকৃত আদলের চরিত্র-নায়ক যে তথাকথিত সুপার হিরোর বদলে অনায়কোচিত গুণেই উপন্যাসের কেন্দ্রে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে বেড়ায়। মানিক তাঁর ভাবজগতের অবস্থান উপন্যাসের শেষেও আবেগ ও স্বভাবে বিভ্রান্ত না করে বর্ণনায় শশীর মর্মই প্রকাশ করেন। মানিকের ভাববাদে আস্থা দুর্বলতা বা অনাস্থা বিষয়ে সিদ্ধান্তে গেঁথে দিতে চাইলে লেখকের প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা ঘটে। অনিবার্য শক্তির ইঙ্গিতের মধ্যে মানিককে না খুঁজে শশীকেই খুঁজে নেয়া উচিত। 'কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে।'

দীর্ঘ উপন্যাসের ২য় অধ্যায়ের শুরুতেই মানিক জানিয়ে দিয়েছিলেন 'শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক।' ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা,

রসবোধ এবং কল্পনা উপন্যাসের ইতিকথা পাঠ মাত্রই পাঠক বুঝতে সক্ষম, স্বয়ং লেখকের শশীর চরিত্রের তথ্য আগাম জানান অনাবশ্যক হয়তো। তবে শশীর কল্পনা কতটা মূক লেখকের সঙ্গে পাঠক এ বিষয়ে সহমত পোষণ নাও করতে পারে। 'যতদিন যায় গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে, নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে।' এবং সম্পূর্ণ মূক না থেকে কুসুমকে শশী তার ব্যর্থতা ঢেকে অপারগতার কিছু সামাজিক মেকি কারণ বোঝাতে বোঝাতে বলে, '... বুঝে শুনে কাজ করা দরকার, ... এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যে কষ্ট হচ্ছে, কারো মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বৌ। বাজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনো ফিরব না।' শশীর গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ধীরে ধীরে উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মতো পাঠকও শশীর বয়ানের তরফে জেনে যায়, তার কল্পনার রহস্যময় উদ্ভাস ও আড়াল আর আছে কি! শশীর রসবোধ! রসবোধের কথা মানিক বাবু শুরুতেই বলে ফেলেছিলেন, না হলে শেষ পর্যন্ত এই 'মধ্যবিত্তসুলভ' ডাক্তার বাবুটির রসবোধের কথা হয়তো বলতেন না। কুসুমের কল্পনা ও রসবোধের কথা তিনি বলেননি, পাঠক বারবার কুসুমের রসবোধ কল্পনার দৌড় আর সাহসের চমকে বিস্মিত বৈকি। এক 'জোনাক পড়া' রাতে শশীকে বিস্মিত করে কুসুম বলে, 'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।' বা 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' কল্পনা আর রসবোধে শশীর মতো পাঠককেও চমকিত করে কুসুম। আর লেখকের সনদ পাওয়া রসিক শশী কুসুমের আকুলতা ও আবেগের উত্তরে বলে, 'শরীর! শরীর! তোমার মন নেই কুসুম?'

শশী বা মধ্যবিত্তের ভাবনার জগৎ পাঠের জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি, মার্কস পাঠের আগেই লেখালেখির প্রথম পর্বে সমাজ সংসার মানুষ দেখার বোঝার সহজাত আশ্চর্য দৃষ্টিতে এবং অভিজ্ঞতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপজাত মধ্যবিত্ত সম্পর্কে নির্মম ও বিরূপ ধারণা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে মার্কসবাদ তাকে যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্লেষণের সক্ষমতাসহ বিজ্ঞাননিষ্ঠ রসদ যুগিয়েছিল। শশী, পিতা গোপাল, যামিনী কবিরাজ, নন্দ, কুসুমের বাবা অনন্ত প্রমুখ পুতুল নাচের ইতিকথায় পুতুল বৈ কিছু নয়, প্রচলিত ব্যবস্থায় দৃশ্য অদৃশ্য সুতার অনিবার্য টানেই নিয়ন্ত্রিত; কেউ এর বাইরে যেতে পারে না। মানিক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে এদের প্রামাণ্য করে তোলেন, কেউ তার সীমানা যেমন লঙ্ঘন করতে পারে না, তেমনি সীমানা উপড়ে মানিক তাদের নিজের জমিতে প্রবেশ ঘটান না। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতে নিবন্ধিত হওয়ার (১৯৪৪) পর পার্টির হুকুম বা পরামর্শের তুলনায় নিজের বোধ দ্বারাই চালিত হতেন। তথাকথিত শিল্পমান ও আদর্শে উন্নাসিক সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'পরিচয়' সাময়িকীতে তিনি লিখে গেছেন পার্টির আপত্তি সত্ত্বেও। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মোট ১৩০টি কবিতা লিখে তিরিশের অন্যতম প্রধান 'পাণ্ডব' বাংলা কবিতার অন্যতম আধুনিক পুরুষ হিসেবে গৃহীত যিনি গোর্কির মৃত্যুর পরে 'পরিচয়'-এ (৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৪৩) সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিপ্লবকে বলেছিলেন উপনিপাত বা বিজয়ী বিপ্লবের উল্লাস হলো তার ভাষায় 'শৃগালী ঐক্যতান' বা বিদ্রোহ হলো 'অনাবশ্যক নরবলি' (ম্যাক্সিম গোর্কি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবন্ধসংগ্রহ দ্রষ্টব্য)- সুধীন্দ্রনাথের এই পরিচয়ে লিখতে মানিক কুণ্ঠিত হননি। মাত্র আটাশ বছরের লেখক জীবনে ৪১টি উপন্যাস, ১৬টি গল্পগ্রন্থ, একটি করে নাটক,

নিবন্ধ, কবিতা গ্রন্থ রচনার ভিতর অনেক মামুলি, অপ্রখর, ফর্মুলা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বৈকি। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলে সরব মুখর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরে সৃষ্ট এসব সাধারণ রচনা নীরক্ত বর্ণহীন হলেও 'মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে তাঁর মানসিক অপ্রীতি গোত্রান্তরের মধ্য দিয়েও অপসৃত হয়নি; এই কৃত্রিম ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীকে তিনি (কখনো কখনো) সহানুভূতি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, তার সংগ্রামী চেতনাকে আবিষ্কার করতেও প্রয়াস পেয়েছেন— তা সত্ত্বেও এই সমাজ তাঁর (মানিকের) বুদ্ধির অনুমোদনই পেয়েছে, কিন্তু হৃদয়গত মমত্বে স্নিগ্ধ হতে পারেনি' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচয়, পৌষ ১৩৬৩)। শশীর ভিতরও কখনো এই অতিক্রমণের সম্ভাবনা উঁকি দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভীরুতা অবিকশিত মানসিক গড়ন তাকে রশিতে বাঁধা পুতুলই বানিয়ে রাখে। প্রথা সংস্কার আর বিশ্বাসী মফস্বলের শশী কলকাতায় যায় ডাক্তারি পড়তে। পড়াকালীন সময়ে সহপাঠী, রুমমেট কুমুদের প্রেরণায় ডাক্তারি পুস্তকের বাইরে আরও কিছু আউট বই পড়া এবং সঙ্গগুণে শেষ পর্যন্ত ইহজাগতিক হয়ে উঠতে না পারলেও কিছু সংশয় ও দ্বিধা তৈরি হয় বটে। বাবার ইচ্ছায় ও চাপেও গ্রামে ডাক্তারি ও জীবনযাপনের মধ্যে ওই সংশয় দ্বিধা তাকে প্রায় নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আবার সে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। অদ্ভুতভাবে লগ্ন থেকেই 'ছোটবাবু' হয়ে থাকে। মানিক নিজেই উপন্যাসে বিবৃত করে দিয়েছেন, 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগ নয়।' কেমন গ্রাম্য মনের গড়নের কথা বলছেন মানিক,— গাওদিয়া গ্রাম থেকে 'কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সঙ্কীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল।' পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল প্রায় দশ বছর, রসবোধহীন ভোঁতা মনের শশীর বিশেষ কোনো ব্যত্যয় ঘটে না এই পরিসরের মধ্যে। কুসুম বা মতির সঙ্গে তাঁর আড়ষ্ট আচরণের জন্যই শুধু নয়, শশী তাদের বুঝতেও পারে না। কুসুমের সঙ্গে মতির প্রেম হয়ে গেলে অথবা নয় বছর শেষে কুসুমের শব্দবাণে যেন সে কিছু বুঝতে পারে, কিন্তু এর বেশি তার করার থাকে না, কোনোকিছুর উপরই তার নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট নেই। যে কুসুমকে একদিন ডাক দিলে যে কোনো মুহূর্তে ছুটে আসতে পারত সে শশীর খাপছাড়া আকুলতায় বাঁকা হাসে। কুসুম বলে একদিন, 'স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। ... আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।' নিস্পৃহতা অথবা সামাজিকতার বাহানা, সাহসের অভাব, সংশয় সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শশীকে কূপবাসীই করে রাখে। কুসুম তার শরীর ও মনের ইচ্ছা লুকায় না, নিজের শরীরের উত্তাপে শশীর হাত টেনে বসায়, কিন্তু শশীর মনের রবারের গ্লাভস্ ভেদ করে সেই শরীরী উত্তাপ ছড়ায় না। উল্টা কুসুমকেই নিন্দা করে, তোমার শুধু শরীরই আছে মন বলে কিছু নেই। মন কুসুমের আছে, কিন্তু শশী তার নাগাল পায় না, হয়তো ভয়েই পায় না। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবার কথা অনেকবারই বলে, 'বিদ্যুতের আলোর মতো উজ্জ্বল যে জীবন শশী কল্পনা করিত' সে শুধু কল্পনাই, এবং কিছু মানিক বাবুও এগিয়ে শশীর ভিতর কল্পনা আবিষ্কার করে দেন। শশী সূর্যোদয়ে জীবনের উদ্ভাস খোঁজা অর্থহীন মনে করলেও সূর্যাস্তের ভিতর সে একধরনের দার্শনিকবোধে জড়িত হয়, তার বিদ্যুতের মতো জীবনের কথা কল্পনা মাত্রই; 'গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই' এই ধ্রুব সত্য তার পক্ষে। বলার অপেক্ষা রাখে না শশীর এই গ্রাম শুধু গাওদিয়া গ্রাম নয়, এ তার গ্রাম্য মনের শৃঙ্খল ও ভূগোল। মধ্যবিত্তের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান মানিক

বাবু শশী পুতুলের রশি কখনো আলগা করেন না, অবকাশ তৈরি হলেও নির্ধারিত মঞ্চের সীমানা অতিক্রম করতে দেন না। বাবা গোপালের কাশী চলে যাওয়ার কথা তো শশীকে আটকাতেই আর শশী গোপালের অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ-সংসার পাহারা দিবার জন্য শহরের বিদ্যুতের মতো জীবন হেলায় উপেক্ষা করে গ্রামেই থেকে যাবে! শশী চলে গেলে অত্যন্ত বৈষয়িক লোভী সুদখোর গোপাল তার বাড়িঘর সামলাতে ঠিকই থেকে যেত অথবা গেলেও ফিরে আসতোই, কারণ তার কাশী যাত্রা তো আধ্যাত্মিক মহৎ অভিলাষ নয়। হঠাৎ করা কৌশল। গোপালও জানে, এই সাদা কৌশলেই সে শশীকে বেঁধে ফেলতে পারবে। তারই ঔরসে জন্ম তো, বিদ্যুতের শক্তি ও আকর্ষণ সে কোথায় পাবে!

শশী এবং গোপালের স্নেহ আর বিদ্বেষ, ভয় আর অমান্য করার সাহস, শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার বৈপরীত্যে ভরা জটিল সম্পর্কের ভিতর শশী বারবার এগিয়ে যেয়েও হেরে যায়, বাংলা উপন্যাসে পিতা-পুত্রের এমন নিরাবেগ নির্মোহ সম্পর্ক দ্বিতীয় নজির আর নেই। লোকনিন্দার মিথ্যা অভিযোগ তুলে গোপাল সেন দিদির চিকিৎসা থেকে শশীকে নিবৃত্ত করতে পারে না, কিন্তু রোগীর কাছ থেকে প্রাপ্য দর্শনী না গ্রহণ করায় পিতার সমালোচনায় শশী প্রায় অস্বাভাবিকভাবে টাকার জন্য চাপ দেয়। সেন দিদির সঙ্গে গোপালের সম্পর্কের গোপন কথা শশী জানে, খুব ভালো করেই জানে গোপালের সম্পদ অর্জনের নোংরা পথের কথা, অন্তত গ্রামের সাধারণ বৌ কুসুম গোপালের আয় উপার্জনের কথা তুলে শশীকে আঘাতও করে। শশী বরাবর প্রশ্নহীন থাকে সব ক্ষেত্রেই, কিন্তু বাবার কথা বলে যেমন রোগীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে, তেমনি বাবার শেষ চালে শশী ওই সম্পদ দেখভালের জন্য গ্রামেই থেকে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প বয়সেই তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মাতৃহীন সংসারে সন্তানদের মাতৃস্নেহে দেখা ও লালনের কেউ কখনো থাকে না। নিজেদের জীবন নিয়ে অন্য সকলের ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক। পুতুলনাচের ইতিকথা লিখবার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃগীরোগে আক্রান্ত হন, এই রোগ তাঁর আমৃত্যু ছিল। যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' (১৯৭৬) গ্রন্থে মানিকের চিঠিপত্র সঙ্কলিত হয়েছে। ওসব চিঠির ২৩ ও ২৪ নম্বরে মানিক লিখেছেন, 'অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি— বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড়রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না।'(২৩) প্রথম গল্প ও প্রকাশিত রচনা *'অতসী মামী'* লিখেছিলেন অনেকটা বন্ধুদের সঙ্গে বাহাস করে, খেলাচ্ছলে। নতুনদের লেখাও পত্রিকাগুলো ছাপতে রাজি থাকবে যদি লেখা মান উত্তীর্ণ হয়। *'অতসী মামী'* লিখবার পর প্রতিষ্ঠিত সাময়িকীতে ছাপা হয়ে গেলে মানিকের আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় দৃঢ় হয়। আগে থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন, লেখার সহজাত প্রতিভা এবং ঝোঁক তাঁর ছিলোই। প্রথম গল্প প্রকাশ ও প্রশংসিত হওয়ার পর পর কথাসাহিত্য চর্চায় তাঁর মনোনিবেশ ঘটে। তিনি আর এক চিঠিতে (২৪ নং) লেখেন, 'প্রথম দিকে পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। একমাস থেকে দু'তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। তখন আমার বয়স ২৮/২৯, ৪/৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে

গেছে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ভাই দাদা সুধাংশু কুমারের কাছে আরেক চিঠিতে (১৯৩৭) *মানিক লিখছেন,* 'আমি প্রায় দুই মাস হইল মাথার অসুখে ভুগিতেছি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই। এ পর্যন্ত নানাভাবে চিকিৎসা হইয়াছে কিন্তু সাময়িকভাবে একটু উপকার হইলেও আসল অসুখ সারে নাই। কয়েকজন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেবল ডাক্তারি চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। ... আমার যতদূর বিশ্বাস, সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নাম করিবার জন্য স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করাই আমার এই অসুখের কারণ। এক বৎসর চেষ্টা করিয়া যদি আরোগ্য লাভ না করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমার যে অত্যন্ত উচ্চ ambition ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিব না। আংশিক সাফল্য লইয়াই সাধারণভাবে আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে।'

মধ্যবিত্তের 'ব্যক্তি' প্রতিনিধি শশীকে ভর করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপজাত এই শ্রেণীটি আত্মবিরোধে জর্জরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে যে অনিবার্য অবক্ষয়ের পথেই যাবে— এই নিয়তির ইতিকথা নির্মাণের স্বভাবী ও সচেতন শিল্পী মানিক ক্রমাগত ব্যক্তিকে খুঁড়তে খুঁড়তে তার ঐতিহাসিক পরিণতি নিঃসন্দেহ করে তুলেন। বিশ্বাস সংস্কার মূল্যবোধ সঙ্কল্প প্রেরণা উত্তেজনা কাম চেতনার আব্রু খুলে খুলে উপন্যাসের ভিতর ব্যক্তিকে পরিচিত করে তুলেন। লেখকের স্বকল্পিত ও চর্চিত আদর্শের ব্যক্তি নন, ইতিহাস ও বাস্তবের প্রকৃত মানুষ।

নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শহর ও গ্রামের মানুষের শুধু পূর্বসূরিদের মতো তিনি বহির্বাস্তবতায় চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরতে মানিক আগ্রহী নন। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অন্তর্গত জীবন, ব্যাখ্যাতীত অনুভব অনুভূতিসহ তার সামগ্রিক বাস্তবতাকে তাঁর ভাষায় 'বাস্তবতার সমগ্রতাকে'ই ছেঁকে তুলেন। পুতুলনাচের ইতিকথায় গাওদিয়া গ্রাম নিয়ে কোনো ভাবালুতা, রোমান্টিক বিহ্বলতা, গ্রামের তথাকথিত সবুজ-শ্যামল সরল নিষ্কণ্টক জীবন নিয়ে বানানো আবিলতা করেননি। 'বাস্তবতার সমগ্রতা' নিয়ে অনুভব অনুভূতিসহ মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত শুধু গাওদিয়া গ্রামের নয়, গ্রামোত্তর। সমকালের রক্তমাংসের মানুষ তার সমূহ বাস্তবতাসহ তার সাহিত্যের ভরকেন্দ্রে, গল্প-উপন্যাসের প্লট সন্ধানে দূর অতীত ইতিহাসের নিরাপদ নিরক্ত আখ্যান, অতি কল্পনায় অবাস্তব জগত, অভিজ্ঞতার অতীত বিদেশের বানানো প্রতিবেশ তাঁর সাহিত্যের প্রতিপাদ্য হতে পারেনি, 'বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট লেখক বন্ধু শুভানুধ্যায়ী এবং স্ত্রীর চাপে মানিক কলকাতার ইসলামিয়া হাসপাতালের তিনতলায় এক কেবিনে এসে উঠলেন, ডাক্তার নার্স কড়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তাঁর চিকিৎসা করছেন। তখন একদিন লেখক বন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায় ওই কেবিনে মানিককে দেখতে যান, সেখানে আগেই উপস্থিত ছিলেন 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ। মানিকের মৃত্যুর পর স্মৃতিরচনা 'মানিকবাবুকে যেমন দেখেছি' (মানিক বিচিত্রা, সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম্, কলিকাতা ১৯৭১)-তে ভবানী মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'মানিক কয়েকদিন হাসপাতালের নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ। নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেল, কমলা লেবু চুষতে চুষতে মানিক বলল, যাই বলো বাস্তবের রাজত্ব ছেড়ে পিছু হটে কল্পনার ক্ষেত্রে চলে গিয়ে পিরিয়ডের রোমান্টিক কাহিনীতে কৃতিত্ব থাকতে পারে

গবেষকের, কিন্তু তাতে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যাবে না। মাল-মসলা জোগাড় করে ঠিকাদারের বাড়ি তৈরির মতো ইটের স্তূপ হবে। তার মধ্যে শিল্প-নৈপুণ্য কোথায়? আশপাশের মানুষকে ছেড়ে দিয়ে যাদের কখনো দেখিনি শুনিনি তাদের ব্যথা বেদনার কি ইতিহাস লিখবো আমরা?'

রাষ্ট্র সমাজ পরিবার সজ্ঞের ভিতর ক্ষয়, আত্মবিরোধ, প্রবঞ্চনার শিকার ও ক্রীড়নক মধ্যবিত্তের ভিতরও জন্ম নেয় কঠিন নির্মম চেহারা। অভাবিত এই সময়ের কথা সংবেদনশীল, বস্তুনিষ্ঠ মানিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, এর প্রাগৈতিহাসিক স্বরূপ আবিষ্কার করে বিমূঢ় হন না, নিজের সহজাত বুদ্ধি ও বোধের সমর্থন খুঁজে পান। নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও সেরকম নির্মমতা, মূল্যবোধের ব্যাপক ধস, বাস্তবের উৎকট চেহারা দেখে ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করেন, মানুষ সন্তানকে ভয় করছে? মা তার শিশু হত্যা বা মৃত্যুর খবরে সন্তুষ্ট হয়?

সময়টা ১৯৫০-এর ২১ জুন। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে মানিক তাঁর স্ত্রী ডলিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে ডলি একটি মৃতসন্তান প্রসব করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ জুন ডায়েরিতে লিখছেন, 'বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল, যে বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে ঝিটাকে বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে। মানুষ সন্তানকে ভয় করছে? দশ মাস গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল, অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন। মানুষের বাঁচাই দায়—সন্তানের হাঙ্গামা কে চায়, সন্তান হাঙ্গামা কেন?'

পুতুলনাচের ইতিকথা লিখবার অনেক পরেও এই প্রশ্ন যেমন মানিককে আলোড়িত করেছে, তেমনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্বে পুতুলনাচের ইতিকথা লিখবার সময়েও মানুষের সরীসৃপ কুটিলতা, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার দর্শন করেছেন এবং নিজের যাত্রাপথের সঠিক মাপজোখ করতে ভুল করেননি। ভয়াবহ দারিদ্র্য, অসুস্থতায় জীর্ণ, আপোসহীন মানিকের অকাল মৃত্যুর পর প্রেমেন্দ্র মিত্র দেশ পত্রিকায় ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ সংখ্যায় লেখেন, ... 'চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছাড়ানো, খাদও তেমনি অতল গভীর।'

স্বতন্ত্র নক্ষত্র মানিক কোদাল হাতে চলে গেলেন কে জানে কোথায়, অকালে!

মানিকের বৌদের শেখানো হয় নি নিয়ম ভাঙার অনিয়ম

সালমা বাণী

মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থে গল্পের সংখ্যা তের, যদি মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে লেখকের অকালমৃত্যু না হতো তাহলে আরো নানামুখী কিছু 'বৌ' পেতাম আমরা। কারণ *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*-এর ভূমিকা টীকাভাষ্য ও সম্পাদনা অংশে সম্পাদক শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'সুন্দরী বৌ', 'খুতখুতে মানুষের বৌ' বিষয়ে লেখক আরও দুটি গল্পের কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয়। 'ওভারশিয়ারের বৌ' শব্দটিও একবার ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায় (দ্র. পৃ. ৩৪০, ৩৪২)। তাছাড়া 'অবিশ্বাসীর বৌ', 'মোক্তারের বৌ', 'স্নেহপ্রবণের বৌ', 'চোর-বৌ', 'চাষার বৌ' শিরোনামে কয়েকটি গল্পের খসড়া পাওয়া যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম গল্পসংকলন, একাদশতম মুদ্রিত গ্রন্থ *বৌ*। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক ছিলেন লেখকের সহোদর ভ্রাতা সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র থেকে এই প্রকাশনা সংস্থা গঠনের বিবরণ পাওয়া যায়। উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস নামক প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক ১০ বি জনক রোড, কালিঘাট, কলকাতা; ঠিকানা থেকে *বৌ* যুগপৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত ছিল না। আখ্যাপত্র ব্যতীত পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮১, দাম দেড় টাকা মাত্র। গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা এই নামোল্লেখ দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণভুক্ত গল্পগুলো যথাক্রমে– দোকানির বৌ, কেরানির বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজি বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারীর বৌ, রাজার বৌ।

বৌ গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ (১৯ মার্চ ১৯৪৭) সালে। প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার, এম সি সরকার অ্যান্ডলি, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। দাম দু টাকা বারো আনা। পূর্বসংস্করণভুক্ত আটটি গল্পের সঙ্গে এই সংস্করণে কয়েকটি নতুন গল্প সংযুক্ত হয়– উদারচরিত নামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ির বৌ।

বৌ গল্পগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই শেষ পাঁচটি গল্প বর্জিত হয়। রবীন্দ্র লাইব্রেরি প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৭০, লেখকের জীবনাবসানের সাত বছর পর।

বৌ গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পটি 'দোকানির বৌ'– 'দোকানির বৌ' গল্পে শম্ভু শ্বশুরের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে দোকানের ব্যবসা শুরু করে। আর্থিক সচ্ছলতার মোহে শ্বশুরের কাছ থেকে ব্যবসার টাকা নেয়ার শর্ত ছিল। একান্নবর্তী পরিবার থেকে এই কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থের লোভে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মিক সম্পর্ক,

পরিবারের সম্পর্ক, যে সব শাসন এবং শর্তের উর্ধ্বে মনোবিশ্লেষক মানিক 'দোকানির বৌ' গল্পে সেই সুনিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করেছেন। শম্ভু পারে না মা ভাইয়ের সংসারের মায়া ত্যাগ করে দূরে থাকতে, তাই সে স্ত্রীকে না জানিয়ে মা ভাইদের কাছে আসে বৌ দৃষ্টিকে আড়াল করে। অপরদিকে শম্ভুর স্ত্রী সরলাও পারে না একান্নবর্তী পরিবারের আগ্রহ ত্যাগ করতে। স্বামীর কাছে অধিকতর কদর ও গুরুত্ব পাবার লোভে সে নিজের সাথে নিজে প্রতারণা করে। মনঃসংকটের এই জায়গাটিতে চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক সমাজবাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন মানিক। পুরুষশাসিত সমাজে উপেক্ষার বস্তু ছাড়া নারী আর কিছুই নয়। স্বামী নামক পুরুষ সমাজযন্ত্রের কাছে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য নারীদের অহরহ প্রচেষ্টা নিজেদের অভিনব সব সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া, যা পরোক্ষভাবে নির্যাতিত নারীর দশা স্পষ্ট করে। ছোট্ট এক সংকটের স্মারক এই গল্পটি তেমন স্পষ্ট ও বিশদভাবে মূর্ত করে তুলতে পারেনি পরিবার তথা সমাজের মারাত্মক নিয়তি।

'কেরানির বৌ' গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী না। 'বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোটো ছোটো কটা চোখ। গায়ের রং তার খুবই ফরসা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে হয়। সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙালি গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড়ো হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকি সময় সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মতো শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।'

তের বছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহংকার করার মতো গায়ের রং তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। সরসীর সমাজের লোভী পুরুষের কুনজরে পতিত হওয়াটা অতি স্বাভাবিক। এইসব লোভী কুনজর থেকে নিজেকে সামলে রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদেরই। সরসী আর দশটি মেয়ের মতো নিজেকে সাবধানী করে রাখে।

সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারি হইয়া রহিল চোর।

উপদেশ শুনিল : 'মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কী মা? চাদ্দিকে পুরুষ গুণ্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়'– ব্যস্ এইটুকু সামলে চলা।

ছড়া শুনিল : পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই!

'সাবধানী হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানী হইয়া গেল। ভালো হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায় শুধু এই জন্যই নারীধর্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য সে নিজেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিল।'

'এই অতিসাবধানী সরসীর ষোল বৎসর পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারী নামের এক কেরানির সাথে বিবাহ হইয়া গেল।' আর দশটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি মেয়েদের মতোই সরসীর ভাগ্যে গতানুগতিক সংসার জীবন, স্বামীর শয্যাসঙ্গী, বছর বছর সন্তান প্রসব। এই ধরনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সরসী আত্মহারা হয়ে ওঠে যখন তার স্বামী বাসা ভাড়া করে অন্যত্র বাড়িতে

উঠে যায়। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সে ছাদে উঠে ভোগ করে স্বাধীনতার অপার স্বাদ। কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের ছাঁচে গড়া সরসীর মন স্বামীর আদেশ অমান্য করে যুগপৎভাবে পিষ্ট হয় মানসিক যন্ত্রণার যাঁতাকলে। সে ফিরে আসে তার প্রত্যেহ কি জীবনের মাঝে। নাটকীয়তায় টানটান হয়ে থাকে সব, বিশেষ করে সংলাপের ছোট্ট ছটফটে অস্থির দীর্ণ কথাগুলোয়, আর আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনাই হয়ে ওঠে সরসীর মনঃসংকটের অসহায় অনর্গল বিশ্লেষণে। অনেক গল্পেই যেমন করেন মানিক, মাত্র কয়েকটি পাতায় রচনা করে যান প্রখর নাটক! তীব্র অন্তরঙ্গ রিক্ত ভাষায়, রঙ গাঢ় ঘন, তীব্র কঠিন যুক্তির উচ্চারণ।

'কেরানির বৌ' গল্পে মানিক মূলত মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী পুরুষের স্ত্রীদের পরাধীন চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন, নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতায় অনুপ্রবেশের পর গ্রাম্য পরিবেশে প্রকৃতির মতো স্বাধীনতার আনন্দে বেড়ে ওঠা নারীদের সার্বিক স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটে।

'সাহিত্যিকের বৌ'– কারুণ্য ও হৃদয়াবেগের বাষ্পে ভরা এই গল্প মানিকের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে না।

জীবন দর্শনের প্রতীকী সংমিশ্রণে মানিক-শিল্পের স্বকীয়তায় সার্থক ছোটগল্পের দীপ্তিই তাদের দেহে সঞ্চার করেছেন। যদিও এ সময়ে এসে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো যায় তার এই নানারকম বৌদ্রের গল্পগুলো।

'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পের শুরুতেই শিল্পী-কণ্ঠের দীর্ঘ স্পষ্ট উচ্চারণ শুনি– 'একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন, এবং এ-কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া?'

'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পের প্রধান চরিত্র যতীনের কুষ্ঠরোগ মূলত আমাদের সমাজের ভেতরের অবক্ষয়েরই ইঙ্গিত। পক্ষাঘাতদুষ্ট সমাজের মাঝে বসত করতে করতে এক সময় নারী হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। তাই মহেশ্বেতার মুখ দিয়ে মানিক উচ্চারণ করান– 'ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই'? মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

পুরুষশাসিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে দগদগে ঘায়ের মতো পুরুষের নির্যাতনী চরিত্রের স্পষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছে মূলত 'কুষ্ঠরোগীর' গল্পে। একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীর পক্ষেই সম্ভব এমন করে তার সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত আঙুলের ক্ষত স্ত্রীর শরীরে ঘর্ষণের মাধ্যমে স্ত্রীর শরীরে সংক্রমণের অভিশাপ দেয়া। চিরকালই মানিকের লেখায় যা অনন্যসাধারণ হয়ে থাকবে– তা হল খুঁটিনাটির বিবরণ আর অনুপুঙ্খের পুঞ্জীভূত তালিকা, যার পেছনে তার যে শুধু সযত্ন অভিনিবেশই ছিল তা নয়, যার উদ্দেশ্য ছিল দলিল হয়ে ওঠা– বাস্তব স্পর্শসহ মূর্তিমন্ত্র– ঠিক এই ধরনের সজীব বাস্তবতা পাওয়া যায় 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পে।

'দুটি আরক্ত চোখে একটা অশুভ জ্যোতি নিয়া প্রদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া কাদম্বিনী সমালোচক শত্রুর মতো গুরুপদর মুখের দিকে স্থানুর মতো চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, ঘুমন্ত মানুষটার মুখের রেখায় রেখায় তার স্বার্থপর অত্যাচারী প্রকৃতি রূপ নিয়াছে তাকে নিয়া খেলা করিবার কৌতুককর সাধ মুখের ভাবে সুস্পষ্ট ফুটিয়া আছে। একজন সদ্য সন্তানহারা মায়েরও মুক্তি নাই পুরুষ নামক অত্যাচারী যন্ত্রের হাত থেকে। মৃত

সন্তানের শোক সামলে ওঠার আগেই তাকে পুনরায় স্বামীর কাম চরিতার্থ করতে হয় অনিচ্ছায়। তাই অত্যাচারের নিষ্কৃতিস্বরূপ সে আত্মহননই শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বিবেচনা করে'– 'পূজারীর বৌ'।

'পূজারীর বৌ' গল্পেরও বিষয়বস্তু নারী নির্যাতন। পূজারী স্বামীর এই নির্যাতন সমাজের মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। লোকচক্ষুর আড়ালে, রাতের অন্ধকারে নারীকে খেলার পুতুলের মতো ব্যবহার করে পুরুষেরা, তারই নগ্ন প্রকাশ এই গল্প। জীবন আর মৃত্যুর এই কানামাছি খেলাটাই বিপুলভাবে, সৃষ্টিশীলভাবে, বিচিত্রভাবে তাঁর রচনার মধ্যে আরো একটা আয়তন এনে দেয়। জীবনের গভীরে লুক্কায়িত মৃত্যু, বাস্তবের উপস্থিতি ছাড়াই উপস্থিত জীবিতদের জগতে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আখ্যান– নানারকম তার বর্ণনা, চরিত্রের মনের টানাপড়েন কত জটিল থেকে জটিল আকার ধারণ করতে পারে তার বর্ণ আর এই বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে মৃত্যুই মানিকের চিন্তা চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। মরণ প্রক্রিয়ার, আত্মহননের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি অচলায়তনের মুক্তি খুঁজেছেন।

'উদারচরিত নামের বৌ' গল্প মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ভিত্তিহীন দম্ভ, আন্তরিকতাবিহীন সামাজিক আচার, হৃদয়হীন ব্যবহার সবকিছু একত্রে জড়ো করে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকের বৌ শীর্ষক প্রতিটি চরিত্রেরই যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে। পাঠককে বাস্তবতা বুঝিয়ে দিতে মানিক যেন এক আতশকাচ। প্রতিটি বৌ চরিত্রই যেন আমাদের সমাজের দহন সহ্যকারীর বিমূর্ত রূপ। সামাজিক বাদবিসংবাদগুলো আখ্যানের পর আখ্যান জুড়ে দক্ষ বাজিকরের মতো লুকিয়েছেন করেছেন। চমকপ্রদ নৈপুণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন সামাজিক নারীর বন্দিদশা অস্থিরতার প্রকাশ।

কিন্তু এত বৌ চরিত্র সৃষ্টির পরও ফেমিনিস্ট থিওরিতে মানিককে নারীবাদী লেখকের কোনোরকম সংজ্ঞায় ফেলা যায় না, কারণ তার বৌ চরিত্রগুলোকে শরৎ চন্দ্রের গল্পের চরিত্রদের গুণাবলিতেই আবদ্ধ রেখেছে, সময়কে উৎরে যেতে পারেনি। শিল্পী মানিকের মেজাজ মন মানসিকতা সামাজিক মূল্যবোধ একটা নিরিখে গল্পের ভেতর হতেই অনুভাবনীয় হয়ে ওঠে।

আমরা 'তেজি বৌ' গল্পে দেখতে পাই– প্রথমেই গল্পকার মানিক সুমতির তেজকে দেখাচ্ছেন মস্ত একটা দোষ হিসাবে। সুমতির মস্ত দোষ ছিল– তেজ। 'দেখিতে শুনিতে ভালোই মেয়েটা, কাজেকর্মেও কম পটু নয়, দরকার হইলে মুখ বুজিয়া উদয়াস্ত খাটিয়া যাইতে পারে, স্নেহ-মমতা করার ক্ষমতাটাও সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে তার কোনো অংশে কম নয়,– খারাপ কেবল তার অস্বাভাবিক তেজটা।

এ-তেজি মেয়ে সুমতি বিয়ের পর বেশ কিছুদিন স্বামী, শাশুড়ির সমস্ত শাসন-শোষণ নীরবে মেনে নিলেও ক্রমেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি না পেলে ক্রমেই সে শাশুড়ির স্বামীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে স্বামীর সাথে ঝগড়ার সময়ে সে প্রতিজ্ঞা করে বসে যেমন করেই হোক সে অবশ্যই পিতৃগৃহে যাবে। শেষ রাত্রে কিছু টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ির বাইরে। কিন্তু নানা রকমের ভোগান্তি শেষে তাকে ফিরে আসতে হয় স্বামীর ঘরে অধোবদনে। থেকে থেকে তার কলম উসকে দিতে চেয়েছেন, আগুনমুখী করে তুলতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরিয়ে না আনলে মনে হয় কোনো রক্ষাকর্তা আলো

পাবে না। এই গল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাস্তবতার প্রতিফলনই ঘটিয়েছেন, মুক্তির পথ খোঁজেননি।

'রাজার বৌ', 'সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ', 'অন্ধের বৌ', 'প্রৌঢ়ের বৌ', 'জুয়াড়ির বৌ' সবগুলো গল্পেই মানিক উন্মোচন করেছেন সামগ্রিক বাঙালি নারীর সামাজিক দশা। মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থে সব বৌদ্রের ভাগ্যই যেন এক ল্যান্ডস্কেপের মতো একইসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তীব্র মানসিক বিক্ষেপে, অনিবারণীয় আতঙ্কে, শোকে ও বেদনায়, আক্ষেপে ও গ্লানিতে অন্তহীনভাবে জর্জরিত। পুরুষতান্ত্রিক ল্যান্ডস্কেপ মানিকের এত বেশি চেনা যে, যেন শুধু কতগুলো টানে টানে রেখার নৈপুণ্যে এঁকে গেছেন সেইসব চিত্র। গভীর মনোবিশ্লেষকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সমাজের অভ্যন্তরে নারীর যে আসবাবপত্রী মূক-বধির চরিত্র সেটা স্পষ্টরূপে পরিস্ফুটনের ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। সমাজ বাস্তবতার ছাপই নয় সমাজের ভেতরে তিনি অবিষ্কার করেছেন কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে মনোবৈকল্য। দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে আটকে খাবি খাচ্ছে এই নারীরা। দাসত্বের শৃঙ্খলের প্রবল বিভীষিকার মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ধর্মাচার ও জীবনবোধ। সুন্দর আর কদর্য, আত্মকেন্দ্রিকতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা, ধর্মবোধের উৎসার আর যৌনতার প্রকোপ, তাৎক্ষণিক আর শাশ্বত সব সারাক্ষণ পর পর হানা দেয় তাঁর লেখায়। আর আখ্যানগুলো বারবার পাঠকদের অভিজ্ঞতার পরিধিকেই করে প্রসারিত।

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমরা জীবনের প্রতি স্তরে দেখতে পাই মধ্যবিত্ত জীবনে, তার সবটুকুই যেন মানিক ফুটিয়ে তোলার গভীর প্রয়াস চালিয়েছেন তার *বৌ* গল্পগ্রন্থে।

পূর্ব ধারণাপুষ্টসাহিত্যচিন্তনের সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি মানিক তার *বৌ* গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহ থেকে। তাই 'তেজি বৌ' গল্পের নায়িকার প্রতিবাদী তেজি চরিত্রের সামান্য দেখা পেলেও তারও একই পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু সামগ্রিক আবেদন গল্পগুলোর ভেতর থেকে নাড়া দেয়– জীবনের নিগূঢ় আবিষ্কার অনুভব মন্থিত করে তোলে চেতনায়। মানিক প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত না হলেও পরোক্ষ প্রকাশে একজন নারীবাদী লেখক ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নারীবাদী লেখক হিসাবে প্রতীয়মান না হলেও, একক স্বাধীন সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও সার্বিকভাবে নারীর সামাজিক মুক্তি নিয়ে ভাবতে গিয়ে নারীকে কখনো কখনো ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ফেমিনিস্ট-পোস্টমর্ডানিস্ট অ্যাপ্রোচ থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আপাতত মনে হয় মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থে বৌদের উপস্থাপন ঘটেছে নেতিবাচক অর্থে! অর্থাৎ নারীকে প্রতীয়মান হয়েছে দুর্বল, অস্থির, চঞ্চল, ঝগড়াটে, পরগাছার মতো পরনির্ভরশীল গৃহকর্মের আসবাবপত্রের অনুরূপ। ফেমিনিস্ট ক্রিটিকরা অন্তত এই ধরনের মত পোষণ করবে কিন্তু ডিকন্সট্রাকশন থিওরিতে দেখা যায় মানিক মূলত *বৌ* গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন পুরুষশাসিত সমাজের পুরুষদের নানামুখী নির্যাতনী রূপ ও চরিত্র।

মানিক প্রতিভার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর-বিশিষ্ট গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পটি এই দাবি কিছুটা মেটাতে সমর্থ।

বিষয়ের গভীরে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় মানিক সুনিপুণ সাইকোথেরাপিস্টের মতো সেক্সচুয়াল পলিটিক্স নিয়েও কাজ করেছেন সূক্ষ্ম দক্ষতায়। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানিক যদি ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারায় সেক্সচুয়ালিটি অথবা সেক্সচুয়াল পলিটিক্স নিয়ে কাজ করতেন তাহলে হয়ত সামাজিক প্রতিবাদ অথবা নিন্দার রোষানলে পতিত হতেন। মানিক কি সে বিষয়ে অতি সচেতন ছিলেন অথবা সংস্কারাচ্ছন্ন? তাই তার বৌদের জগৎ শেষ অব্দি থেকেই যায় খিন্ন, করুণ, অবক্ষয়মাণ, স্থানু ও স্থাবর কোনো পরিবর্তন বিমুখ, যেমন পোকা ছটফট করে মাকড়সার জালে। কথাসাহিত্যিক হিসাবে সাফল্যের চূড়ান্তে কতগুলো শিখর তার ছোটগল্পেই জয় করে যান মানিক, যেখানে ছোট্ট একটি ঘটনা– কখনো হয়তো কোনো ঘটনাই নেই, শুধু আছে কোনো চরিত্রের অন্তর্জগৎ, অশান্ত অস্থির আবিষ্ট ও খিন্ন– আর তারই মারফত তিনি আবিষ্কার করেন তাৎপর্য, চূড়ান্ত মরিয়া হতাশার মুহূর্তে মানুষ কেমন করে ভেঙে ভেঙে জড়বস্তুর চরিত্রে বিবর্তিত হয়।

মানিক-প্রতিভার ঐতিহাসিক স্বাক্ষরবিশিষ্ট গল্পগুচ্ছের মধ্যে *বৌ* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করতে পারে না : তবু গল্প-বিবরণীর এই আপেক্ষিক অতিবিস্তার নিরর্থক নয়। অবচেতন ও অচেতনের আঁধারলোকে, মনোগহনের জটিল সর্পিল পথে, কূটৈষণার পথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচরণ গোড়া থেকেই স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা। বিজ্ঞানের ছাত্র, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন– বিদ্যায় পারঙ্গম, অন্তর্গূঢ়-জটিল-পথের স্বচ্ছন্দ পথিক মানিক। মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রূরতা, হিংস্রতা, ও পাশবিকতার নগ্নরূপ উদ্ঘাটন করেছেন *বৌ* গল্পগ্রন্থে। কবি-মানিক, রাজনীতিবিদ মানিক, মনোবিশ্লেষক মানিক সবগুলো গল্পের শরীর জুড়ে অবস্থান করলেও নারীবাদী মানিক কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। বরং পুরাতন ধ্যান-ধারণার বিশ্বাসই যে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফেমিনিজম অথবা পোস্টমডার্নিজম যদি খুঁজি এই গল্পগ্রন্থে তাহলে এই গল্পে সেটা খুঁজে বের করতে হবে অনেকটা স্বপ্রণোদিত হয়ে। গল্পগুলোতে প্রতীকী হয়ে উঠতে পারেনি বারবার নারীর নতিস্বীকার আর পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে। গল্পের যেখানে দাঁড় করিয়ে দিলে বৌ চরিত্রের নারীরা প্রতিবাদী নারীর মূর্ততা লাভ করতে পারত, সেখানে তাদের না দাঁড় করিয়ে বারবার শরৎচন্দ্রের গল্পের নায়িকাদের মতো আত্মসমর্পণ করিয়ে মানিক নিজেকে সনাতন পুরুষতন্ত্রী পুরুষ হিসাবেই পরিচিত করে তুলেছেন। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় প্রতিশ্রুতিহীনতার অনুভবে পীড়িত *বৌ* গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্প।

বৌ গল্পগ্রন্থের চন্দ্রীয় নারীদের সাথে শরৎ নারীদের সাদৃশ্য থাকার একটা কারণ হতে পারে মানিকের ১৯৪৪-পূর্ব অর্থাৎ মার্ক্সিস্ট মতবাদে তথা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে সংযুক্তির পূর্ব মানসিকতা। *বৌ* গল্পগ্রন্থের সমালোচনায় আমাদের সব সময়ই লক্ষ রাখতে হবে– 'সময়'। হয়ত *বৌ* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো যদি মানিক ১৯৪৪ এর পরে রচনা করতেন, হয়ত তাহলে তিনি বৌ চরিত্রের নারীদের পুরুষযন্ত্রের শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে তার ১৯৪৪ পরবর্তী গল্পসমূহের মতো নির্মম কঠিন, পথ বেছে নিতেন। তখন বৌ শীর্ষক গল্পের নায়িকারা শরৎ গল্পের নায়িকাদের মতো পুরুষের পদতলে নিজেকে সমর্পণ না করে হয়ত অন্যভাবে পরিসমাপ্তি টানতেন। তিনি হয়ত শব-ব্যবচ্ছেদকারীর মতো নিপুণ নির্মম হাতে ছুরি চালাতেন *বৌ* শীর্ষক গল্পের অধ্যায়ে অধ্যায়ে এবং পরিসমাপ্তিতে। মানিক নিজেই তো নির্দ্বিধায়

বলেছেন, 'বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী- তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না'। অন্যত্র জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়।' 'জীবন দর্শন' অর্থে কোনো কল্পনা বা বিচারগত আপ্ত-সিদ্ধান্ত নয়, লেখকের স্বআবিষ্কৃত 'জীবন সত্য'। সে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তৎপ্রসূত নিবিড় অনুভবের সারাৎসার, নিভাঁজ বহির্দৃষ্টির সঙ্গে নিরাবেগ অন্তর্দৃষ্টির রাসায়নিক সংযোগে গড়া অখণ্ড জীবন-দৃষ্টি। শিল্পীর মেজাজ- একটা নিরিখ গল্পের ভেতর থেকেই অনুভাবনীয় হয়ে ওঠে- তেজি বৌকে যেভাবে নির্যাতিত স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য করেছেন, হয়ত তেজি বৌকে লজ্জা অপমানের বোঝা মাথায় বয়ে নত মুখে ফিরে আসতে হত না স্বামীগৃহে। যেন এই নারীদের কোনও আত্মসম্ভ্রম আত্মাভিমান নেই- থাকার মধ্যে আছে অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা, আর ইন্দ্রিয়ময় শরীর ও মন। পাঠ্যপুস্তক, আখ্যায়িকা তৈরির রীতিনীতি কৃৎকৌশল ভাষাব্যবস্থায় নারীকে যে আদর্শ হিসাবে খাড়া করা হয়েছে তার সব কিছু ভেঙে নারীকে রূপ দেয়া হয়নি নতুন কাঠামোয়। এখানে তার তাত্ত্বিক চিন্তা আবর্তিত হয়নি কার্ল মার্কসীয় দীক্ষার পরবর্তী ধারায়। সব কিছু ভেঙে নারীকে সমাজ শৃঙ্খলের বাইরে আনতে যেন তার কলম কুঁকড়ে গেছে ভয়ে! মানিকের বৌয়েরা বাস্তবের হুবহু প্রতীক। মানিক সুররিয়েলিজমের প্রতীকে নারীকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেননি। মহেশ্বেতাকে দিয়ে কুষ্ঠ স্বামী, কুষ্ঠ সমাজের নির্যাতন সহ্য করিয়েছেন বারবার; নারীকে নির্যাতনে পিষ্ট হবার মন্ত্রে দীক্ষা না দিয়ে হয়ত স্বাধীনতার স্থপতির মতো পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙেচুরে তছনছ করে নারীকে ঘরের বাইরে বের হবার পথ দেখাতেন। লিও ট্রটস্কির *Literature and Revolution* গ্রন্থের উপদেশমূলক সংজ্ঞায় আমরা দেখতে পাই- 'The relationship between form and content is determined by the fact that the new form is discovered, proclaimed and evolved under the pressure of an inner need, of a collective psychological demand which, like everything else has its social roots.' সর্বপ্রথম সাহিত্যের ফরমের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অতঃপর সেই পরিবর্তন থেকে আইডোলজির বিবর্তন- তখন এক নব্য সামাজিক বাস্তবতা ধারণ করে সাহিত্যের অবয়বে। ট্রটস্কি স্পষ্ট করে বলেছেন- ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজন নব্য শিল্পমানসম্মত ভায়োলেন্ট ক্যারেক্টার এবং অবশ্যই সুররিয়েলিজমের সংজ্ঞায় সেই শিল্প নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করবে। সুররিয়েলিজম পৃথিবীর বিবর্তনে চরম আক্রমণাত্মক রূপান্তর আশা করে। সুররিয়েলিজম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য দাবি করে ক্যাপিটালিস্ট ফাউন্ডেশনের লিবারেল আইডোলজির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। লিবারেল একাডেমিশিয়ান হারবার্ট মূলার সুররিয়েলিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাসিচ্ছলে বলেছিলেন "The glorification of the irrational, the unconscious, finds it to be a 'reactionary' movement and even in the line of facism". প্রচলিত ফরম থিউরি, যৌক্তিকতাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছে সুররিয়েলিজম। অর্ধ শতাব্দী অথবা তারও বেশি সময় ধরে সুররিয়েলিজম মানবমননের সমস্ত শাখাতেই বিস্তার করেছে তার গভীর প্রভাব। এমনকি এর বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেছে এর প্রভাব। মানবজীবনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান টানার জন্য এটা তো কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গ্রহণ করে না। সচেতনভাবেই সুররিয়েলিজম কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয় অথবা এটা

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার গবেষণাও করে না। সুররিয়েলিজমের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ফ্রয়েড, তার সহকর্মী এবং অনুসারীরা। মানিক যখন বিরতিহীনভাবে রচনা করে চলেছেন তার বৌ গল্পগ্রন্থের *বৌ* চরিত্রদের– তখন সুররিয়েলিজমের তীব্র ধাক্কা এসে লেগেছে ইউরোপীয় সাহিত্যের গাঁথুনিতে। কিন্তু বৌ শীর্ষক গল্পের চরিত্রের কোথাও সুররিয়েলিজমের ব্যবহার দেখি না, বরং দেখতে পাই ট্র্যাডিশনাল ফরমের ব্যবহার। তাই মানিকের বৌয়েরা স্বাধীনতা কাকে বলে জানে না, এমন কি স্বাধীনতার আগের পর্যায়– প্রচণ্ড বিক্ষোভ, মানিকের রচনায় একেবারেই অনুপস্থিত। সুররিয়েলিজম মতবাদের অনুসারীরা হয়ত এই *বৌ* গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে এভাবেই সমালোচনা করে বলবে– এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বাস্তবের নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, সাহিত্যের ফরমের পরিবর্তন আর আর আইডোলজির পরিবর্তনের ভেতর মূলত কোনো সামঞ্জস্য নেই। ট্রটস্কি যেভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন– সাহিত্যের আছে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন; অন্তর্বর্তী নিয়মের আবর্তে আপন গতিতে এর বিবর্তন ঘটে কখনো আংশিক কখনো সমস্ত কাঠামোর কিন্তু কখনোই কোনো বিশেষ আদর্শের কাছে মাথা নত করে নয়। সাহিত্যের আদর্শ মূলত লেখকের কলমের ওপরেই নির্ভর করছে, লেখক তাকে কোথায় দাঁড় করিয়ে দেবে তার উপরে। সুতরাং মানিক যদি চাইতেন তাহলে তার নারী মুক্তির শিল্পতত্ত্বকে এনে এমন নিষ্ঠুর জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন যেখান থেকে মুক্তির পতাকা বহন করা ছাড়া ফেরার পথ হত রুদ্ধ। *বৌ* গল্পগ্রন্থের সার্থকতা সম্পর্কে গল্পকার নিজেই যেন সন্দিহান, তেমন কোনো বড়ো মাপের ব্যবধান বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না, আর সৃষ্টি করে না বলেই গল্পগুলো সময়কে ছাপিয়ে গিয়ে চিরন্তন সময়ের দাবিদার হয়ে ওঠে না। এই বড় প্রশ্নটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গভীর অবিচল প্রসঙ্গ *বৌ* গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহ। পেরুর ঔপন্যাসিক মারিও ভার্গাস য়োসা এ প্রসঙ্গে বলেছেন– সাহিত্য হল আগুন- সাহিত্যিকের আছে দুটি অঙ্গীকার– এক. তার শিল্পের কাছে, শিল্পিতার কাছে, দুই. মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে। এক আগুন সারাক্ষণ শুধু স্বয়ং সাহিত্যিককে পোড়ায়, কিন্তু অন্য আগুন পোড়ায় সমাজ, সংস্কার ও রাজনীতির যত অন্যায় ও জঞ্জাল। জীবনদর্শনের যে আগুন মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থ-পরবর্তী গল্প ও উপন্যাসে দাউ দাউ লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে, সেই আগুন ধিকধিক করে ছাইয়ের তলে যেন থিতিয়ে থিতিয়ে জ্বলেছে বৌ চরিত্রসমূহে। মানিক তার পরবর্তী লেখায় বিপ্লবী ও রাজনৈতিক লেখক হয়ে উঠলেও সমাজ সংস্কারক বা নারীবাদী বিপ্লবী রূপ নিতে পারেননি। কার্ল মার্কসের রচনার সাথে সময়ে পরিচয় ঘটেছিল মানিকের; তবে *বৌ* গল্পগ্রন্থ রচনার পরবর্তীসময়ে। তাই *বৌ* গল্পগ্রন্থের বৌয়েরা মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার প্রভাব বিবর্জিত।

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তার *কথাসাহিত্যের কথকতায়* লিখেছেন– 'লেখকমাত্রেই ক্ষমতা সীমিত, ফুরিয়ে যেতে হয় সব লেখককেই, তবে বাস্তবকে বাদ দিয়ে যে লেখকের এক পা এগোনোর ক্ষমতা নেই, বাস্তবকে দেখার নতুন চোখ আর না মিললে, উপলব্ধির সমস্ত সঞ্চয় পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে এমনকি তলানিটুকু পর্যন্ত শুকিয়ে গেলে একজন লেখকের ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে মানিকের জন্য ঠিক তাই ঘটেছিল। তিনি অসাধারণ লেখক ছিলেন। অসম্ভব রকম ব্যক্তিলেখক ছিলেন। অনন্য স্বকীয়তায় তাঁর পরিচয়ের অন্য নাম।' তারপরও মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থের 'সাহিত্যিকের

বৌ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' এ দুটি উল্লেখযোগ্য ছাড়া বাকি গল্পগুলো একঘেয়েমি নিয়ে আসে অর্থাৎ যে নীতি মূল্যবোধ এবং আদর্শে প্রণোদিত হয়ে মানিক একের পর এক *বৌ* শীর্ষক গল্প রচনা করে গেছেন, সে উদ্দেশ্য এর থেকে কম রচনাতে সম্ভবপর ছিল। সবগুলো গল্পই যেন প্রচলিত ধরনে লেখা– কী কাঠামো, কী লেখার ভঙ্গি– দুয়েতেই আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো নতুনত্ব চোখে পড়ে না। একই জীবন-বেষ্টনী ঘিরে এত অসংখ্য বৌ রচনা করে মানিক শুধু গল্পের সংখ্যা বাড়িয়েছেন– বাড়িয়েছেন তার রচনার সংখ্যা কিন্তু সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ নারীদের জন্য একটা শিল্পতত্ত্ব তৈরি করতে পারেননি যেমন তৈরি করেছিলেন মার্তিনিক-এর সেজেয়ার আর সেনেগালের লেওপোল সেঙ্গর সাঁগর– এরা দুজন মিলে কালো মানুষদের জন্য তৈরি করেছিলেন একটি শিল্পতত্ত্ব– যার নাম 'নেগ্রিচুড'। কালোতত্ত্বকে সংস্কৃতির কেন্দ্রে রেখে নেগ্রিচুডের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল কালো রঙ সম্বন্ধে এক ধরনের মরমীয়া ধারণা অন্যদিকে ছিল মার্কসবাদী বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা।

সুখের কথা, 'গল্প লেখার গল্প' (১২ মে ১৯৪৫-এ বেতার কথিকা) শীর্ষক রচনারসহ *লেখকের কথা* (১৩৮৪/১৯৫৭) শীর্ষক পুস্তিকা মানিক তাঁর লেখক-জীবনের নানা সংশয় ও সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন। 'গল্প লেখার গল্প', 'কেন লিখি' (জানুয়ারি ১৯৪৪) 'সাহিত্য করার আগে'– এই নিবন্ধত্রয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের ম্যানিফেস্টো। এত স্পষ্টভাবে, এত অকুণ্ঠভাবে আর কোনো রবীন্দ্র-পরবর্তী কথাশিল্পী নিজেকে উন্মোচন করেননি। এগুলো থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য, অনুধাবনযোগ্য।

লেখক নিজে স্বীকার করেছেন, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আরম্ভ ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা, আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্যকে– একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।"

"ছোট-বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, না হয় মন্দ, ভালোমন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলোও হৃদয়সর্বস্ব কেন? হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে– মধ্যবিত্তের হৃদয়?"

লেখকের নিজ স্বয়ং স্বীকারোক্তি *বৌ* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে স্পষ্ট। একই জীবন-বেষ্টনী ঘিরে শিল্পী প্রায় সবগুলো গল্পেরই শরীর বেঁধেছেন। নারী নির্যাতন নিয়ে লেখক ভেবেছেন, কিন্তু নির্যাতনের চিত্র এঁকেছেন খুব শিল্পিত নরম হাতের ছোঁয়ায়। এত অসংখ্য চরিত্রে বৌদের কাউকেই শেখানো হয়নি নিয়ম ভাঙার অনিয়ম।

সে কারণে হয়ত বৌ সংকলনের কোনো গল্প লেখকের *স্বনির্বাচিত গল্প* গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

সহায়ক গ্রন্থ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র- তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

কথাসাহিত্যের কথকতা- হাসান আজিজুল হক, সাহিত্য প্রকাশ

কালের পুত্তলিকা- বাংলা ছোটগল্পের একশ' বছর/১৮৯১-১৯৯০, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*- আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত

বাস্তবের কুহক, কুহকের বাস্তবতা, লাতিন আমেরিকার প্রবন্ধ সংগ্রহ- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেমিনিজম- অক্সফোর্ড রিডারস

ফান্ডামেন্টাল ফেমিনিজম- জুডিথ গ্রান্ট

Criticism- The Major Statements, Second Edition

Andre Breton, *What is Surrealism? Selected Writings*- Edited and introduced by Franklin Rosemont.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য চেতনায় বিজ্ঞান-দৃষ্টি

সাহেদ মন্তাজ

জীবন-সত্যের বিম্বিত রূপই সাহিত্য। এই জীবন-সত্যের বিম্বিত রূপ বিনির্মাণের অন্যতম নিয়ামক সাহিত্য-চেতনা।

সাহিত্য-চেতনা প্রত্যেক লেখকের মনে জেগে থাকে। সেই চেতনা হল– সাহিত্য কী? সাহিত্য করি কেন? এই চিন্তা সবসময় শুরুতে প্রবলভাবে থাকে না। কারণ যখন কেউ লিখতে শেখে তখন এ প্রশ্ন তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয় না। লেখার আনন্দে সে চিন্তা চাপা পড়ে থাকে। লেখা সম্পর্কে অন্যের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করাই তখন তার কাছে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মানিক বলেছেন বিষয়ের দুর্বলতার কথা, সাহিত্যমানের কথা, সাহিত্য বিচারে গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্যতার কথা। মানিকের ভাষায়, "প্রথম গল্পই আমি লিখি 'অতসীমামী'– রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি– লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপানো নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।" রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী– এই উক্তি স্পষ্টত বিষয়ের দুর্বলতাকে জানিয়ে দেয়।

মানিক 'অতসীমামী' সম্পর্কে বলেছিলেন– 'ওটা সাহিত্য হয়নি।' অথচ এই 'অতসীমামী' গল্পই তাঁকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দিয়েছিল, পাঠকের কাছে তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। সমালোচকেরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন– এটাকে মানিক সাহিত্য হয়নি বলেছেন কেন? তাহলে সাহিত্য কী? অতসীমামী কেন সাহিত্য হয়নি তা লেখকের নিজের বক্তব্য থেকে বোঝা যেতে পারে। তাঁর মতে, (এক) গল্পটা রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী, (দুই) এ গল্প সাহিত্য করার জন্য ছিল না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনী যা বাস্তব নয় এবং যে লেখা সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে রচিত নয় তা সাহিত্য নয়। এখানেও প্রশ্ন এসে যায়– প্রেমকাহিনী মাত্রই কি অবাস্তব? তা না হলে বাস্তবতা বলতে মানিক কি বুঝতেন, যে বাস্তবতা না থাকলে সাহিত্য ঠিক সাহিত্য হয়ে ওঠে না। আসলে মানিকের দৃষ্টিতে এই বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বাস্তবতার জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলেই একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন। তাহলে মানিকের সেই বাস্তবতার জ্ঞান কি? অন্যেরা কি বাস্তবতা নিয়ে সাহিত্য করেন নি? মানিকের সাহিত্যের বাস্তবতার স্বরূপ কী?

মানিকের মতে, সাহিত্যে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনুপস্থিত নতুবা মিথ্যাভাবে উপস্থিত। প্রাত্যহিক জীবনে যে মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে সেই মানুষকে সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ভাষায়, "শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি– সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের– সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?" মানিকের এই উক্তি থেকে বোঝা

যায়, সাহিত্যে ভাবালুতা– স্বপ্নবিলাস বা রোমান্টিকতা থাকবে না; থাকবে বাস্তবতা। ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ফুটে ওঠা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন।

এই বাস্তব জীবন প্রকাশের তাগিদ বা দায়িত্ববোধ বা কর্তব্য থেকেও মানিক সাহিত্য চর্চার প্রেরণা লাভ করেন। মানিকের কথা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় : "...ভেসে আসতো নিজের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া-পড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসতো স্টেশনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ– তাদের আলাপ-আলোচনা, ভেসে আসতো কলেজ সহপাঠীদের মুখ– শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য– সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসতো খালের ধারে, নদীর ধারে বসনো গ্রাম– চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হতো ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিতো, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মতো, কোনদিন উঠতো চাঁদ। আর ওই মুখগুলো–মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো– ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো–ভাষা দাও– ভাষা দাও।" এই দায়িত্ব মানিক মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তা পালন করে গেছেন।

মানিক মনে করেন জীবনের এই সাধারণ সত্য-কথা লেখা ছাড়া অন্য কোনোভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় না বা মানুষকে জানানো যায় না। তাই তিনি মানুষকে এই সত্য জানানোর জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।" তিনি আরও বলেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি!" সুতরাং বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতার অভাব কিছুটা পূরণ করার জন্য মানিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তিনি সাহিত্যে সাধারণ মানুষকে ঠাঁই দিয়েছেন। সাহিত্যে যেভাবে মানুষকে হয় তো ভালো নয় তো মন্দ দেখানো হয়, তা না দেখিয়ে বরং মানুষের স্বাভাবিক যে অবস্থা– ভালো-মন্দ মিশানো– তা দেখিয়েছেন।

জীবন বাস্তবতার আলোকে মানিক কেবল নিজের রচিত সাহিত্যকেই সমালোচনা করেননি, বরং শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শৈলজানন্দের কাব্যকেও সমালোচনা করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি তাঁদের সাহিত্যে অনুপস্থিত কেন? কেন তাঁরা এই বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করে হৃদয় সর্বস্বতাকে সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছেন? শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে মানিক বলেন, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলোও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে– মধ্যবিত্তের হৃদয়।' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃতরূপকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে না পারার জন্য মানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই বলে যে, 'কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই আমি রেহাই দিয়েছিলাম। যেমন তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্প পড়ে সত্যিই একথা আমার মনে হয়নি যে কাবুলিওয়ালাকে তিনি শুধু স্নেহশীল পিতা হিসাবেই দেখলেন, অমন কত স্নেহশীল গরিব পিতার নিরুপায় পিতাকে সে যে কেমন জোঁকের মত শোষণ করে সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়লো না।"

বাস্তবতা বলতে মানিক বাস্তব জীবনকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের বাস্তব জীবন বলতে বোঝায় যে মানুষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জটিল অবস্থার

মধ্যে জড়িয়ে আছে অথচ সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, 'শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লা খনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ– কিন্তু শুধুই ছবি হয়েছে।' বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই সংঘাত আসেনি সুতরাং বৃহত্তর জীবনের পরিসরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতায় সংঘাতমুখর মানুষের জীবন হল বাস্তব জীবন। তাঁর মতে, সাহিত্য তো কেবল মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ ভাবনার ইঙ্গিতকে সে বহন করে। এ ধরনের জীবন সাহিত্য ব্যতিরেকে নিছক প্রণয়মূলক কাব্য রচনা কিংবা বাস্তব জীবনের ছবি আঁকা বিলাসিতা আর শৌখিনতা ছাড়া কিছু নয়।

এই সমাজবাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে ধরার জন্য মানিক যে পদ্ধতির আশ্রয় নেন তা ছিল যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সেজন্য জোলো সেন্টিমেন্টালিটির বিপরীতে মানিকের রচনায় ছিল তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ আর অসাধারণ নির্মোহ-রুক্ষতা। আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কথাটা বাংলা সাহিত্যে যে অল্প কয়েকজন লেখক সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়, মানিক নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মানিক পরিণত বয়সে একটি কবিতায় লিখেছিলেন, বিজ্ঞানের কাছে তাঁর পাঠ নিতে যাওয়ার মূলে ছিল বাঁচবার 'অসীম পিপাসা'। তিনি জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিলেন 'টেস্ট টিউবে'। লেখকের এই আত্মদর্শন তাঁর রচনাতেও প্রভাব রাখে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, তাহলে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।

জীবন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় তাঁর লেখার মূল অবলম্বন। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-চর্চা মানিকের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। মানিকের ভাষায়, "বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ। যে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা করে থাকুন, বস্তুজগতে মানবতার বাস্তব অগ্রগতিই চিরদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়। গদ্য ভাষায় সাহিত্যে এল বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা, নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবনবোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করলো উপন্যাস।" উল্লেখ্য, মানিক যেমন মনে করতেন সাহিত্যিকের বিজ্ঞানদৃষ্টি থাকা উচিত, তেমনি এও মনে করতেন, একজন বৈজ্ঞানিকের সাহিত্যিক চেতনা থাকা উচিত। তা না হলে সমাজের কল্যাণ সাধনে উভয়ের প্রয়াস লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে। তাঁর ভাষায়, "...কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে। তবে এ কথা সত্য যে, কেউ একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক হতে চাইলে তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বা সাহিত্য কোনটারই বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু একথাও সত্য যে, এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব– তাতে শুধু পুরনো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন– তাঁর আবিষ্কারকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।"

মানিকের সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যা মানিকেরই নির্দেশিত। লক্ষণ তিনটি হল– ১. 'কেন' প্রশ্নের তাড়না,

২. ভদ্র আর অভদ্র জীবনের মধ্যে নিহিত আসামঞ্জস্যের ধারণা, ৩. গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ 'বাস্তবতা' সম্পর্কে চেতনা। মানিক তাঁর এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট করেছেন সমুদ্রের স্বাদ গল্পগ্রন্থের ভূমিকায়। সেখানে মানিক দাবি করেন, 'ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা' তিনি নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিতে চেয়েছেন তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে। আর 'কেন' প্রশ্নের তাড়না মানিককে কী-রকম তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল, তা তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায়, যখন তিনি বলেন— "ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, ল্যাবরেটরীতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি, নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়। হাজার নতুন প্রশ্নের ভারে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট-বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসেবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলে মানুষেরও সেটা জানা থাক— যতক্ষণ সেটিকে তুলো ধুনো করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্ত-মাংসে পরিণত করার মতো পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই।" তাঁকে কিভাবে 'কেন' প্রশ্নের তাড়না তাড়িত করেছে তা তাঁর বিভিন্ন রচনার নামকরণ থেকেও বোঝা যায়— 'মাথার রহস্য', জীবনের জটিলতা, 'কে বাঁচায়', 'মানুষ হাসে কেন' প্রভৃতি। মানিকের অনেক ছোটগল্পের শেষ হয় মানুষের প্রকৃতি বা জীবনের ধরণ সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ 'জিজ্ঞাসা' দিয়ে। কখনও তার সাথে জোড়া থাকে একটি উত্তরও। 'প্রকৃতি' গল্পে লেখক শেষে প্রশ্ন করেন, 'মানুষের সাহচর্য ছাড়া কি মানুষ বাঁচে— অন্তত তার একটা খুব বাস্তব অভিনয় ছাড়া?' এরপর লেখক নিজেই উত্তর দেন, 'হোক ফাঁকি, মানুষের এই রকম প্রকৃতি।' 'মাটির সাকি' গল্পের শেষে স্ত্রী সম্পর্কে সুকান্তর মনে প্রশ্ন থেকে যায়, 'কোনো অভাব নেই, তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেল।' এ রকম প্রশ্ন মানিকের সাহিত্যে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন আঙ্গিকে।

বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যচর্চার কারণে প্রথম জীবনে মানিক ফ্রয়েডের অনুসারী ছিলেন। ফ্রয়েডের প্রভাব তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। যেমন প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প এটি। মানিকের এই সময়ের গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রগুলো হচ্ছে গরিব, এর মধ্যে আছে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামের ছবি। কিন্তু মানবজীবন ও সমাজজীবনের বহু সমস্যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানিক শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে নির্ভর করতে না পেরে বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্ক্সবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। ফ্রয়েড-চর্চার প্রভাবে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে মানব চরিত্র বুঝতে চাওয়ার প্রয়াস যে একটা স্তর পর্যন্ত মানিকের রচনায় খুবই প্রবল ছিল, 'হাত', 'রাজার বৌ', 'কবি ও ভাস্করের লড়াই', 'শৈলজ শিলা' গল্পগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু বোঝার জন্য পরবর্তীকালে তিনি বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে ফ্রয়েড ছেড়ে মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেছিলেন; তবে ফ্রয়েডকে একেবারে ছাড়েননি। মানুষের আচরণের ভেতরকার রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টায় তিনি ফ্রয়েডের তত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেবার পরও। যেমন, কম্যুনিস্ট হবার পরও মানিক চতুষ্কোণ লিখেছেন যা নিয়ে মার্ক্সবাদীরা খুবই অস্বস্তিবোধ করেছেন। মার্ক্সবাদী সমালোচকেরা এরমধ্যে 'উগ্র রোমান্সের প্রাধান্য' 'যৌন-রহস্যের' বাড়াবাড়ি দেখতে পান। অথচ রাজকুমারের অদ্ভুত খেয়াল তো আসলে জীবন সম্পর্কে তার একটা অদ্ভুত রহস্যবোধ, আর সেই রহস্যের উৎস সন্ধানেরই প্রয়াস। মেয়েদের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে গিয়ে কয়েকটি অদ্ভুত তিক্ত অভিজ্ঞতা রাজকুমারের

হয়েছিল যে, তার মনে হয়, 'এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে।' উপন্যাসের বাকি অংশটুকু এই বিকৃত নিয়মেরই অনুসন্ধান বলা যায়। কম্যুনিস্ট মানিকের হাতে জীবন-জিজ্ঞাসায় তাড়িত এরকম আরও অন্তত দুটি চরিত্র আমরা পেয়েছি– *জীয়ন্তর* প্রকাশ ও *আদায়ের ইতিহাস*-এর ত্রিস্টুপ। মানিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ-বাস্তবতার বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেন, বা সত্য উপলব্ধির উপযুক্ত পন্থা হিসেবে মেনে নেন, কিন্তু পূর্বেকার সাহিত্য-চর্চাকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে মানিকের নিজের উক্তি তুলে ধরা বোধ হয় যথাযথ হবে। তাঁর ভাষায় 'সদিচ্ছা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, জীবন ও সাহিত্য থেকেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলাম, কিন্তু মার্ক্সবাদ না জানায় কিছুই করতে পারিনি– এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়া মার্ক্সবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ। ... জগতে আমি একা মার্ক্সবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি– আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাব?'

১৯৩৪-৩৫ সালে প্রকাশিত হয় মানিকের পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথা। এ সময়কে লেখকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্রান্তিকাল ধরা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রথমে মানিক ফ্রয়েডকে অনুসরণ করলেও ফ্রয়েডের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নি। এখানেও তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাগ্রসরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় সত্যের খোঁজে নতুনকে গ্রহণে অকৃপণ। ফ্রয়েডকে ত্যাগ করার কারণ হিসেবে মানিক মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ক্রিস্টোফার কডওয়েলকে উদ্ধৃত করেছেন– 'Just because Fraeudism is not a science, it fails as a therapy." তিনি আরও বলেন, "... ফ্রয়েডকে আমরা মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিরদিন স্মরণ করব, কিন্তু কেপলারের মতো ফ্রয়েডেরও পৌরাণিক সংস্কারে আচ্ছন্ন চিন্তাধারা আজ ঢেলে সাজানো দরকার। ভ্রান্তি সংশোধন করা দরকার। ...ভ্রান্তি ঢেলে সাজানো দরকার। ...আঁতুড় থেকে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব অন্যান্য লোকজন বা ঘটনাচক্রেই কেবল মানুষের মন গঠিত হয় না– প্রতিটি মানুষের সামাজিক ছাঁচ আছে, ঐতিহাসিক গড়ন আছে, শ্রেণীও আছে।"

যা হোক, অধিকাংশ সমালোচক মানিকের সাহিত্যের কালকে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন– (এক) মানিকের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান-পূর্বকালের সাহিত্য (১৯৪৪), (দুই) তার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান-উত্তরকালের সাহিত্য। অর্থাৎ মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ (১৯৪৪) নেবার পর বাস্তব একটি রাজনৈতিক ঘটনা দিয়ে তাঁর নিজের জীবনের পর্বান্তরকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। সেই পর্বান্তর চিহ্নকে সাহিত্য সমালোচকরা তাঁর সাহিত্যেও খুঁজে নিয়েছেন। অবশ্য তা যৌক্তিকও। কেননা মানিক যখন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হলেন তখন তাঁর দায়বদ্ধতা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নিরলস অধ্যবসায়ে যেমন মার্ক্সীয় সাহিত্য থেকে তাত্ত্বিক দিক বুঝবার চেষ্টা করেছেন তেমনি তা প্রয়োগের জন্য কাজের ক্ষেত্রেও এগিয়ে গিয়েছেন। পার্টির নির্দেশ মতো কৃষকসভা ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে তিনি আন্তরিক প্রয়াসী হয়েছেন, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি হয়েছেন, বুলেটের মুখেও প্রতিবাদ মিছিলের পুরোভাগে থেকেছেন, খিদিরপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় প্রাণ বিপন্ন করেও শান্তি কমিটি গড়েছেন, নিজের কষ্টার্জিত স্বল্প অর্থের একাংশ

দিয়েছেন পার্টি ফান্ডে। দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী হিসেবে যা কিছু করা দরকার তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন।

মানিক মনে করতেন, সাহিত্য কেবল জীবনের ছবি নয়, সাহিত্যকে জীবনের গতি-প্রকৃতিকে নির্দেশ করতে হবে। জীবনের সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিতে হবে। তিনি মার্ক্সীয় মতবাদ অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে, এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে অতীতে মানুষের জীবন ও সমাজ কিরূপ ছিল; এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতে রচিত বর্তমানকালের মানুষের জীবন ও সমাজের সুস্পষ্ট রূপ এবং সেই সাথে কোন্ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবন ও সমাজ সুন্দর ও মহৎ রূপ লাভ করতে পারে এই সত্যকে অস্বীকার করে। আর্থ-সামাজিক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে নিছক ভালোবাসার জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করার কোন অর্থ হয় না। মানিক স্বীকার করেছেন যে, মার্ক্সবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর লেখার ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ জেগেছিল এবং এমনকি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাঁর অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে?' কেননা, মার্ক্সবাদ যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে। অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কি ভাবে, কোন ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু ঘটতে পারে। এটা থেকে রক্ষা পেতে একশ' সাহিত্যিককে সমাজের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা জেনে সাহিত্যের মাধ্যমে সংগ্রামের প্রেরণা জাগাতে হবে। আর তা কেবল মার্ক্সবাদেই সম্ভব। তাঁর মতে, "সমাজ জীবনে কি আছে, কি নেই, কি এসেছে কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবে– সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজজীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে। আর এই উপলব্ধিকে মার্ক্সবাদ সম্ভব করে তোলে।"

অনেকের মতে, মার্ক্সবাদী পর্বের আগে মানিকের রচনায় সমাজ-বদলের কথা ছিল না। সমাজে ধনবৈষম্যের জন্য কে দায়ী, সমাজের গতি কোন দিকে, সমাজ বদলের কাজে নিয়ামক হতে পারে কোন শক্তিটি– এই সব চিন্তার আভাসও তেমন পাওয়া যায় না বা বলা যায় যেটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে বরং অদৃষ্ট– 'অজানা শক্তির অনিবার্য ইংগিতের' প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস বা জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত এক রহস্য চেতনাই ধরা পড়ে। যেমন 'মাথার রহস্য' গল্পের শেষ দু'লাইন এরকম : 'বড় আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয় কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।' 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পের শুরু এভাবে : 'কোন নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়।'

কেউ কেউ বলেছেন, মানিকের প্রথমদিকের রচনাগুলোতে প্রায় একটা ছক যেন গড়ে উঠতে চায়। একক ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না, তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে অনবরত, প্রতিরোধহীন। অথচ প্রতিরোধের একটা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির ভেতর কোথাও উজ্জীবিত হতে চায় কিন্তু

শেষ পর্যন্ত পারে না। কোনো এক অস্পষ্ট নিয়তিবোধ এই কাহিনীগুলো থেকে সংক্রমিত হতে চায়। এরপরের স্তরে মানিক সেই অস্পষ্ট নিয়তিবোধকে আর একটু স্পষ্ট চেহারা দেন। সেখানে সেই অস্পষ্ট নিয়তি, ব্যক্তির নিজেরও অজ্ঞাত প্রকৃতিতে যেন একটা স্পষ্ট আধার পায়। এই সময়কার গল্পগুলো নিয়েই ফ্রয়েডইজমের কথা, চেতন-অচেতনের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসে। তাঁদের মতে, পর্বান্তরের সময় ও পরের সাহিত্যে সমষ্টির ভেতর আটকে যাওয়া কোনো ব্যক্তির সমাধানহীন যন্ত্রণা অথবা সমষ্টির অন্তর্গত থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার কথা প্রায়ই দেখা যায়। এ সময়ের রচনাগুলোর সামগ্রিক ধারার মধ্যে বিরাট বৈচিত্র্যও রয়েছে।

মানিকের উত্তরকালের রচনার প্রধানশক্তি তীক্ষ্ণ বিদ্রোহ চেতনা। অবশ্য এই বিদ্রোহ চেতনার আভাসও পাওয়া যায় তাঁর প্রথম পর্বের রচনায়। বিশেষ করে নারী চরিত্র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এদিকটি অল্প আলোচনা করা যাক। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেয়েদের যে দিকটা মানিককে আঘাত করেছিল তা হল– তাদের অতিরিক্ত লজ্জাশরম ও ভাবপ্রবণতায় ঠাসা প্রকৃতি; অমানুষিক সহিষ্ণুতার আবরণে গা ঢেকে রেখে স্বামী-পুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবার প্রবণতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'দোকানীর বৌ' গল্পে সুমতির পদে পদে বিপদের কারণ হল তার স্বভাবের মস্ত দোষ তেজ; আত্মহত্যার অধিকার গল্পে বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যাচ্ছে, সেই দুর্যোগের রাতে মেয়েকে নীলমণি তামাক সাজতে বললে ছাতা হাতে শ্যামা নীলমণিকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়– 'ছাতাটা ধরো তবে।' সিঁড়ি গল্পে ইতির গায়ে পাঁচড়া হয়েছে শুনে তার প্রেমিক চমকালে ইতি ক্ষেপে গিয়ে বলে– 'কি করবে তুমি? ঘেন্না করবে? কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে?' মানিকের রচনার সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে হঠাৎ জ্বলে ওঠা বিদ্রোহ দ্বিতীয় পর্বের রচনায় পাওয়া যায় আরও বৃহত্তর এক পরিপ্রেক্ষিতে এবং আরও পূর্ণাঙ্গ চেহারায়। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ চরিত্রগুলোর বিদ্রোহ অনেক সময়ই সরাসরি সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সরাসরি নারীমুক্তির প্রসঙ্গ এনে নারীকে আন্দোলনকারীর ভূমিকায় এনেছেন সেভাবে সমসাময়িক অন্য কোনো লেখক আনেন নি। কেননা মানিক উপলব্ধি করেন, শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজে নারীর মুক্তি একই সূত্রে গাঁথা।

বিজ্ঞানমনস্কতার জন্যই মানিক প্রতিভার অলৌকিকত্বের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাবে আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন। তিনি বলেন, শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল অর্জনের প্রক্রিয়াটি মোটেই দুর্বোধ্য, রহস্য-আচ্ছাদিত বা ব্যাখ্যা-অগম্য নয়। অন্যান্য কর্মস্পৃহার মতো এক্ষেত্রেও কারো বিশেষ আগ্রহ, একাগ্রতা ও শ্রমস্বীকারে অনলস মনোভঙ্গিই সার্থকতার মানদণ্ড বলে বিবেচিত। সেজন্য মানিক যখন নিজেকে 'নিছক কলম-পেষা মজুর' বলে আখ্যায়িত করেন তা তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতারই পরিচয় বহন করে। মানিকের ভাষায়, 'কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা– মানুষ হয়ে জন্মে কারো সাধ্য নেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অতিমানব হয়ে যাবে। ... তবে হ্যাঁ, কাজের তারতম্য আছে। দক্ষতারও তারতম্য আছে। শুধু এইটুকু। প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।'

মানবের প্রতি আস্থা ও বিজ্ঞান দৃষ্টি– এ দুটি বৈশিষ্ট্য মানিকের শিল্পীসত্তায় আমৃত্যু ক্রিয়াশীল ছিল। জীবনাতীত নয় বরং জীবনই সত্য ও সুন্দর– এ অনুভব মানিকের বিজ্ঞানমনস্কতার ফল। সুতরাং তাঁর বিজ্ঞানচেতনা ও জীবনতৃষ্ণা একে অপরের পরিপূরক। ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব ও রোম্যান্টিসিজমের আন্দোলন এবং বাংলার নবজাগৃতি প্রভৃতির চারশ বছরের পথপরিক্রমা শেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনবোধে যে জটিল-গূঢ়-গভীর রহস্যজাল বিস্তার করে, তাকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে হলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা অপরিহার্য– এই প্রতীতি মানিকের শিল্পীমানসে জন্মেছিল কিশোর বয়সেই। এ কারণে তাঁর সাহিত্যচর্চা ও জীবনতপস্যা একই স্রোতে লীন হয়ে যায়। যেমনটি মানিক বলেছেন, '...মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায় বড়ই আপসোস আর রাগ হতো। ...তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি এর কি প্রতিকার নেই! এই সংঘাত থেকে সাধ জাগতো যে, আমি একদিন লেখক হবো। নিজেই প্রতিকার করব।'

মানিকের সাহিত্যচেতনা বাংলা সাহিত্যকে কি দিতে পেরেছে তা আমরা মানিকের ভাষাতেই শুনব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সচেতন ভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে– কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।'

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮।

২. দিলীপন ভট্টাচার্য (প্রকা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৭।

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

৪. কায়েস আহমেদ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৪।

৫. সলিল কুমার গাঙ্গুলী (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৬. সরকার আব্দুল মান্নান, *বাংলা কথাসাহিত্য : আধুনিকতার কুশীলব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮।

আর্থ-যৌননৈতিকতা

সিরাজ সালেকীন

প্রচারিত আছে, ইতিহাস কতিপয় সুবোধ বালকের খেলা। খেলাটি শুরু করেন স্বয়ং শাসক প্রভু; কয়েক দিনের উদ্দেশ্যমূলক দ্রুততায় ও পরিকল্পিতভাবে তৈরি করলেন ঔপনিবেশিক ভারতীয় পৃথিবী। শাসনের প্রয়োজনেই তৈরি হল মানুষ; আদম-হাওয়া নয়, আলোকিত পৃথিবীর উদ্দেশ্যমূলক মানুষ। আপন উদ্দেশ্যে প্রভু সৃষ্টি করলেন ইতিহাস– নারী-পুরুষ, বহুমাত্রিক ক্ষুধা; সাপ– জীবনের পাপ– মাটি-ছাড়া কল্পলোক। এইসব দৃশ্য ও দৃশ্যের অন্তরালে ঐক্য, সূত্র, সুর ও সম্ভাবনায় একজনই গুরু। গুরু তাদের রক্তে খেলা করে। আলো আলোকিত করে এমন বোঝেন সামাজিকেরা; রোমান্টিকেরা বুঝলেন আগুনের হৃদয় দগ্ধ করার ক্ষমতা। এসব শিশুর একভাগে পেল আধখানা চাঁদ, অপরাংশের কপালে অর্ধচন্দ্র। আগুনের ধর্মে মশাল জ্বলতে লেগে গেল একশ বছর। তারপর এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক শতাব্দীরও আগে ভাষা ও ভূমির জন্য নয়– ঐতিহ্য-বিমূর্ত মানুষের জন্য কান্না ছিল, তবুও এই প্রথম কাঁদতে শিখেছিল একদল মানুষ। যে-ভারতীয় সাহিত্যে ছিল না মুখচ্ছবি, ছিল বসনে-ভূষণে সাজানো নির্বিশেষে প্রত্যঙ্গে জোড়-লাগানো বিশেষত নারী, সেখানে পুরুষই দ্রষ্টা, দৃষ্টিকোণ ও স্রষ্টা নিরঞ্জন। অথচ রোমান্টিকতা আলো-অন্ধকারে বুঝতে চেয়েছিল মন, এবারও দেখা হয়নি মুখ। আর আধুনিকেরা দেখেছিল মনোরোগ। প্রথম জন পুড়েছিল মনের আগুনে, দ্বিতীয় জন শুরু করলেন মন-ব্যবসায়। কারো কাছেই ধরা দেয়নি মনের সমগ্র উর্বর ভূমি, যেখানে আবাদ করলে ফলত সোনা। দেহ ও মন সাপেক্ষ, সমাজসত্যে বাণিজ্য ও পুঁজি– রেললাইন, বিচ্ছেদের রূপক। কাঁচামাল সংগ্রহ আর কথিত প্রগতি প্রদানের আসা-যাওয়ার মতোই মুখ ও মুখোশের ব্যবধান আমাদের ঘোচেনি। কুল-বদল ও বহুকুল-বন্ধনের মহড়ায় সাংস্কৃতিক শাসকেরা যাচ্ছি-যাবো করেও যায়নি, রূপ বদলে ভর করেছে সরিষায়। মঞ্চ খালি পেয়ে সুতোর টানে শতাব্দী ধরে অনেক বাদামি বিবেক ধরেছিল মিহিতালের গান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন এদের সর্বনাশে রচিত হবে ভারতের ভবিষ্যৎ।

এই সর্বনাশের ইতিবৃত্ত রচনার স্পষ্টতা অন্তত প্রথম পর্বের মানিকে নেই। বাস্তবতা ও অন্তহীন প্রশ্নের পারাবারে ফ্রয়েড বেশিক্ষণ নৌকা ভাসাতে পারে না। এখানে যতটা আলো তারচেয়ে বেশি জটিলতা। বিশেষত একই উপাত্ত সৃষ্টি ও বিকারে মিশে যেতে চায়– সৃষ্টিশীল বিকৃতি বলে তো কিছু থাকতে পারে না। অর্থ ও ক্ষমতা নিয়ে যা নিরুত্তর তা-ই বিদ্যমানতার মিত্র, ফ্রয়েডও তার ব্যতিক্রম নন। সত্যি ফ্রয়েডের পুঁজিবাদী মনই বটে! প্রথম যৌবনে রাধার রঙিন কটাক্ষে ভোলেনি কে– রাধা আমাদের হাতে না-পাওয়া প্রতিমা! *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস বটে; *পদ্মা নদীর মাঝি*– এমনকি আর তাড়ালো সে মনের মাছি, মাছ সে একবারই বিক্রি করেছে, সুবোধদের আগ্রহ প্রধানত ময়না দ্বীপ ও কুবের-কপিলার সম্পর্ক; *পুতুল নাচের ইতিকথা*তেই দেহের ডাক্তারি ছাড়িয়ে– দেহ বিশেষভাবে বুঝতে গিয়ে মনোরোগের শুরু। তারপর বহুদিন

মনোরোগ আর মনোরোগ; যেমন *চতুষ্কোণ* বর্গ ও অনুর্বর ক্ষেত্রের বন্দিত্ব। মনরে বল্ আবাদ করে এই বুঝি তোর ফলল সোনা! এইসব মগজে-মানা বিদেশী শাসন ও আধাপুঁজির হাঁটুজলে সাঁতার কেটে, জীবনের অনেক কাদা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরমহংস মানিক ভেতরে ভেতরে একরকমের কুল পেতে শুরু করেছিলেন।

'কেন'য়-পাওয়া মানিক জীবনের/লেখকজীবনের সূচনাপর্বেই 'ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা' দ্বারা আলোড়িত ছিলেন, কিন্তু 'বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মতো সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।' 'সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন?'– এমন প্রশ্নও তাঁর ছিল। সবচেয়ে বড় আত্মজিজ্ঞাসা, নিজের মধ্যবিত্ত মানসিকতা চিহ্নিতকরণ। 'ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় ও মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রজীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।' মানিকের এই আত্মপরিচয়ের সংকটে/বাস্তবতায় আছে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতের চিত্র। উত্তরণে সহায়তা করেছে মার্কসীয় মতাদর্শের ব্যক্তিগত প্রয়োগ। কথিত প্রগতি-সাহিত্যে বাদামি বৈকালিক মানসিকতা যে সংকট সৃষ্টি করেছে অনেক কথা লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চাষাভুষো নিয়ে গল্প লিখবো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য, যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করবার অবসর পায়, এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভুষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করবো, একমাত্র ওই দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে– সাহিত্যসৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হলেও ধরা পড়ে গিয়েছে।' এই 'অবসর-সোহাগী মনের' অসংলগ্ন কামনা-কাম-দেহের ব্যাপারটিকেই মানিক বলছেন 'অশ্লীলতা', কেননা তা কেবল দেহ ও মনকেই আলাদা করে না, মানুষের মুখচ্ছবিই তৈরি হতে দেয় না। একথা জানা দেহের অপূর্ণতাই তৈরি করে পর্নোতা, এটাও বাণিজ্যের ঐতিহাসিক খেলা। তিনি লিখছেন : 'দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়– ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা।' দেহ বস্তু নয়, প্রাণ; এখানে বিদ্যমান অস্তিত্বের সূত্র। এজন্যই সামাজিক অভিজ্ঞতার ভেতর গতিশীল মানুষ কথিত বিকারে/বিকৃতিতে ধারণ করে ক্ষমতার সামাজিক সূত্র। মধ্যবিত্ত-নারী ও চাষীবউ অস্তিত্বের সমাজধর্মে পৃথক; তাদের দেহবিক্রি/দেহদানের মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য আছে– এই পার্থক্য সামাজিক বাস্তবতা দিয়েই বিবেচ্য। এভাবে ভাবলে অশ্লীল অর্থনীতি ও ক্ষমতার সূত্রগুলো কেমন করে মানবদেহকে আক্রমণ করে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মানিকের গল্পে।

মানিকের প্রথম পর্বের গল্পে প্রবৃত্তির অগ্নিশিখা চিরন্তন, অনিবার্য, রহস্যময় এবং নিবৃত্তিহীন। এই প্রবৃত্তি একধরনের ব্যক্তিগত সংকট। এই সংকট আসে নৈতিকতা ও স্বার্থ– কথিত লিবিডোর স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব থেকে। ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজসাপেক্ষ, দৈনন্দিন বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় তার দৃষ্টান্ত থাকলেও যৌনতাকে বলা হয়েছে রহস্যময়ভাবে ব্যক্তিগত। এর ফলে সর্বযৌনবাদী মতাদর্শ মানুষের জন্য তৈরি করে

নিরপেক্ষ বা বিচ্ছিন্ন-স্বয়ম্ভূতার কুহক। 'প্রাগৈতিহাসিক' (পপ্র. ১৩৪০) গল্পে একজন ভিখুর *বেঁচে থাকবার* দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার ভেতর আপাত বলিষ্ঠতা থাকলেও তার নিরপেক্ষ ভোগ ও জবরদখলের প্রবণতা সর্বমানবীয় হতে পারে না। গল্পটি নিজেই একধরনের কুহক– বেঁচে থাকা ও বংশবিস্তারের প্রবল বাসনার অন্তঃস্থ শক্তি হিসেবে লিবিডো/যৌনতার দুর্জ্ঞেয়তা এর মূল। জীবনের ক্ষুধা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উর্ধ্বে– এই সত্য প্রমাণের জন্য কেবল যৌননির্ভরতা কোনো সহায়তা করে না। বরং নিয়ে যায় অন্ধকারের দিকে, অব্যাখ্যাত ইঙ্গিতময় সেই প্রসঙ্গ : '...যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।' কথাটা নিয়তির মতো শোনায়, এই নিয়তি শাসককে ক্ষমতা পোক্ত করতে সহায়তা করে। যৌনতা দায়-দায়িত্বহীন ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে সম্পদ নয়, তা কখনো সৃষ্টিশীলও হতে পারে না; তা একধরনের বিপদ। মানিক যাকে আদি অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার সত্যতা ভিখুর স্বার্থান্ধ ক্ষমতা প্রদর্শন ও দখলদারিত্বের মানসিকতায় স্পষ্ট হলেও সেই অন্ধকারের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি। এই অন্ধকারের দায়-দায়িত্বহীন ভারবহনের চিত্র 'শৈলজ শিলা' (পপ্র. ১৩৩৯) গল্পেও অস্পষ্ট নয়। 'প্রাগৈতিহাসিকে'র আগ্রাসী শরীর-মন বিধ্বংসী কাম এই গল্পে স্বরূপে নয়– নামে পাল্টে এসেছে, কেবল মধ্যবিত্ত সচেতন মানুষ বলেই ব্যাখ্যাটা স্পষ্ট :

'আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁসিয়া কাঁটা তরুর মতো– শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নিচে সরস-সতেজ মূল, যাহার মূল কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দুদিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিলাইব এ প্রেম তখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।'

এভাবেই ধরা পড়লেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়! কেননা তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণ মনে নতুনতর বোধ হিসেবে যৌনতা পরীক্ষাগারের উপাদান হিসেবে ওঠে এসেছে। আদিঅন্তহীন একটি মানুষের একটিমাত্র চেতনা– যৌনতা, আর কোনো মানবীয় কর্ম বা দায় তার নেই। দায়হীনতাই তার সংকট। গল্প-কাহিনীর গোলমেলে ছেঁড়া-ছাড়াছাড়া ভাবটির মতোই কথিত শিলার দাদুর কর্মহীন মনও অব্যবস্থিত। এছাড়াও কাহিনীর একজনকে দিয়ে তথ্যটি সর্বমানবের জন্য প্রমাণ করা অসম্ভব বলেই টীকাভাষ্যের জন্য লেখককে বেনামে উপস্থিত হতে হয়। বিশেষত 'আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক' এই উপাত্তের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব ব্যক্তির জন্য জেলখানা/পাগলাগারদ [চিকিৎসার জন্যই বটে!] অনিবার্য। সমাজ ব্যক্তির স্বার্থকে উসকে দেয়, মনের ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে, তারপর নিয়ে যায় জেলখানা বা পাগলাগারদে– ক্ষমতার এই ধারা এখন আর অচিহ্নিত নয়।

যৌনতার ইতিবৃত্ত ব্যক্তিগত বৃত্তে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঘূর্ণাবতের মাধ্যমে তৈরি হয় একধরনের অন্ধ মোহ। এতে আড়ালে চলে যায় শাসন ও শোষণের সূত্রগুলো। 'শৈলজ শিলা'য় যা একজনের সংকট 'মহাকালের জটার জট' (পপ্র. ১৩৩৯) গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রায় সর্বজনীন করে তুলতে সচেষ্ট। তবু মনের নির্বিচার মত্ততা

বেশিদূর এগোয়নি। 'সিঁড়ি' (পপ্র. ১৩৪৩) গল্পেই যৌনতার চৌষট্টিকলায় ক্ষমতা ও ব্যবসায়ী মানসের পারস্পরিক দ্বৈরথ কীভাবে প্রবেশ করে তার অন্তর্বয়নই প্রধান। মানিক বুঝতে পেরেছিলেন ব্যক্তির মন স্বয়ম্ভু নয়, সংকটও স্বয়ম্ভু নয়, সংকটের উৎস পাওয়া-না-পাওয়া জীবনের অর্থনৈতিক জটিলতায়। এজন্য তিনি মনোযোগ দিলেন 'নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার' জন্য। *সমুদ্রের স্বাদ* গ্রন্থের ভূমিকায় তাই আরো লিখছেন : 'আমিও যে মধ্যবিত্ত, পথ খুঁজে পাওয়ার আতঙ্কে বিহ্বল ও উদভ্রান্ত বলেই নির্মম আত্মসমালোচক, এর প্রমাণটাই বড় হয়ে গেছে বিশ্বাসের চেয়ে।'

মিথ্যার খোলস ছেড়ে পথ খোঁজার সংশয় সত্ত্বেও পথের ইঙ্গিত নিয়ে নতুন এক পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে সুকুমারবৃত্তি, দায়হীন ভোগবিলাসে মত্ত হবার সুযোগ, কর্মহীনতা বা অধিকারহরণের মতো জমাট বিচ্যুতি বা পাপ সেখানেই মনের অন্ধকার। সেটা প্রাচীন নগররাষ্ট্রে যেমন সত্য ছিল আধুনিক সমাজে পুঁজির বিকাশে তা আরো গাঢ়তর হয়েছে মাত্র। প্রাচীন 'নাগরেরা' ছিলেন রসজ্ঞ সুকুমার, তা কেন্দ্রীভূত ছিল নগরে; এখন পুঁজি ও অর্থবৈষম্যের সূত্র ধরে তা প্রায় সর্বপ্রসারী। গৌতম পাপমুক্তির জন্য নগর ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক সমাজে প্রস্থানের কোনো সুযোগ নেই। পণ্য তৈরির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা পায়ে পায়ে চলে। 'ভয়ঙ্কর' (পপ্র. ১৩৪৯) গল্পে লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে প্রসাদের কারখানা মালিক ভূষণের ক্ষমতার দাপট ও আশার যৌন-প্রলোভন অতিক্রমের পর্যায়টিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যৌন উত্তেজনার পরিবর্তে ঘনীভূত হয়েছে ক্ষমতার দ্বৈরথ। পৌরাণিক 'কুবের' যেমন ধনাঢ্য তেমনি কুৎসিত; তেমনি একধরনের ভেতরমুখী প্রাকৃতিক প্রতিশোধ এখানেও আছে। প্রায়-ভৃত্য প্রসাদের নিকট আশা শেষ পর্যন্ত 'একটা রাবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা।' আশার '*দুটি স্তনের চাপে আগুন-ধরা রক্ত*' শীতল হয়ে যায় প্রসাদের। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই, নেই মনোজটিলতা। কেবল মুক্তি ও অস্তিত্বের স্বাদ নিয়ে জেগে ওঠে প্রসাদ : 'মনটা প্রসাদের আশ্চর্যরকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যুভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মতো অন্যের চটচটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়।' মাত্র সাতশো তেইশ টাকা মূলধন পাবার সম্ভাবনা প্রসাদের মনে জাগিয়ে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের অন্ধকার রূপায়ণের সম্ভব্য পথ ছেড়ে দিচ্ছেন।

বিত্তের স্বরূপ সন্ধানে বেরিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বৃত্ত সম্পদ ও সঞ্চয়ে লক্ষ করেছেন মানবীয় সম্পর্ক বিচ্যুতির প্রবণতা। সকল প্রকার বৈষম্যের মতো অর্থ বৈষম্যও তৈরি করে বিচ্ছিন্নতা, মানবসম্পর্কও এক্ষেত্রে বিক্রি হয় বাজার দরে। মানিক অনুভব করেছেন মানব-অস্তিত্ব পণ্যমান ও ক্ষমতার দখলিবাণিজ্যে ঘেরা। আবার নৈতিকতাও কাল নিরপেক্ষ নয়। 'ধনজন যৌবন' (পপ্র. ১৩৪৮) গল্পে ভূমির উপর পণ্য-বাণিজ্যের আধিপত্যের মতোই কারখানা মালিক নির্মলেন্দুর দ্বারা ধর্ষিত [?] হয় কৃষক রাঘরের স্ত্রী সুমতি। কোনো ক্রূরতা বা বিদ্বেষের আগুনে ঝলসানো ঘটনা নয়, খুবই নিস্পৃহ বর্ণনা, যেন নৈমিত্তিক কিছু জানছি– লেখকের সচেতনতা এমনই ভয়াবহ মর্মবিদীর্ণকারী। পুরুষতন্ত্রে স্ত্রীর যৌনশুদ্ধতা স্বামীর সম্পদ, এজন্যই সতীত্ব কেবল নারীরই থাকে এবং এরকম বিনষ্টির মুখোমুখি রাঘব ক্ষুব্ধ হতেই পারে। অবশ্য রাঘব তো পুরাণের নয়, আবার সুমতিও সীতা নয়। ক্ষমতা ও বাণিজ্যের সূত্র মেনে নিয়ে যৌনসম্পর্কের ইতিবৃত্ত :

'মেঝেতে বিছানো মাদুরে আছড়ে পড়ে রাঘব তখন সতর্ক চাপা গলায় আর্তনাদ করার সঙ্গে বার তিনেক জোরে জোরে নিজের কপালটা চাপড়ে দেয়। গায়ে জোর আছে, কড়া-কড়া হাতের তালু। গলার চেয়ে কপাল চাপড়ানোর আওয়াজটা হয় জোরালো।

অসতী করেছে, প্রাণে মারতে পারল না? ধম্মো নিল, প্রাণটুকু নিতে তার কী হয়েছিল।

ফাঁসি হবে বলে নিজে সুমতিকে খুন করতে পারছে না, এ আফসোস সে জন্য নয়। আফসোস এখনো সুমতিকে নিয়ে ঘর করতে হবে বলে। তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বিবাগী হয়ে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা নেই। লোহার মতো শক্ত তার দেহমন এই জীবন্ত কোমল চুম্বকে এঁটে গেছে। পিস্তলের সংকেতে ছোটোবাবু মৃত্যুভয় জাগিয়েছিল সুমতির, বাইরের রোয়াক থেকে এক-পা এক-পা করে পিছু হটিয়ে এই ঘরে ঢুকিয়েছিল। যাওয়ার আগে একটি গুলি সুমতির উপর খরচ করে গেলেই এসব হাঙ্গামা চুকে যেত।

সুমতি বলে, কী জ্বালা বেশ্যা নিয়েও তো মানুষ সুখে দিন কাটাচ্ছে। তোমার বুকজোড়া ধন বিয়ে-না-করা ইস্তিরিটি আগে কী ছিল? যা হয়েছে, হয়ে গেছে। অত বাড়াও কেন?

...চৌকির প্রান্তে কনুই পেতে দু-হাতের তালুতে চিবুক রেখে সুমতি নির্বিকার শান্তভাবে বলে, আর তাও বলি, বদমাশ গুণ্ডা তো নয়, লাখপতি বামুনের ছেলে। সেকালে মুনিঋষি অতিথি হলে রাজারা যেচে রানীকে পাঠিয়ে দিত তাদের কাছে, ভাগ্যি বলে মানত। একটা রাজার বংশ থাকত নইলে।

রাঘব উঠে বসে অসহায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। একটু যদি কাদাকাটা করত সুমতি, একবার যদি বলত, এ প্রাণ আমি আর রাখব না! গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত।'

রাজনীতি, অর্থনীতি, দাম্পত্য, নৈতিকতা, ক্ষমতাসহ মানবসম্পর্কের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক উপাদানই এই ইতিবৃত্তে জড়িয়ে গেছে। নির্মলেন্দুর ক্ষমতার বিপরীতে রাঘবের অক্ষমতা, দাম্পত্যে একাগ্রতা বা শুদ্ধতার বিপরীতে সুমতির নতুনতর ঐতিহ্যসন্ধান কিংবা ভূমি ও পণ্যবাণিজ্যের দ্বৈরথে যৌনতার ব্যবহার বা অপব্যবহার একটি উপাদান মাত্র। এই ব্যবহার মনের লাস্যে পালিত নয়, এতে আছে তৃতীয় নয়নের ধর্ম। এখানে যা তাণ্ডব, ভাঙার পূর্বাভাসে তা সত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে চেয়েছেন নির্মলেন্দুর শ্রেণী ও স্বভাবধর্ম, যা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যপুঁজি ও সামন্ত মানসিকতার সংমিশ্রণে সঙ্করতাপ্রাপ্ত। তার বিত্তে দখলি মনোভাব, ভূমি দখলের স্বভাব। অন্যদিকে সুমতিও স্ত্রী ও রক্ষিতার মিশ্রণ; কেননা অর্থ তার জন্য তৈরি করেছে মোহ। ব্যভিচারী সময় ও অর্থনীতির দ্রষ্টা হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুমতি, রাঘব ও নির্মলেন্দু কাউকেই উদ্ধার করতে পারছেন না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, সতীত্বধারণা, ক্ষমতা কিংবা ধর্মীয় নৈতিকতা কোনো কিছুই বাণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি। নারী, নারীদেহ ও যৌনতা পণ্য হিসেবে নতুন নয়। বরং মানবীয় সংকটে এই ব্যবসায়ের স্ফীতি ঘটে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে যৌনতাকে অস্তিত্বের অনিবার্য অংশ হিসেবে মৌলিকত্ব প্রদানের প্রচেষ্টা আছে। বেঁচে থাকা, খাবার, তারপরই বিবেচনা করা হয়েছে যৌনতা। কিন্তু 'নমুনা' (গ্রপ্র. ১৩৫৩) গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে যখন লেখা হয় : 'অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার

একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু-তিন গুন।'– সৃষ্টিশীল লিবিডোতত্ত্ব সম্ভবত এই প্রেক্ষাপটে খাপ খায় না। এখানে অর্থনীতিই প্রধান। কেশবের মেয়ে 'শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।' কালাচাঁদ ও তার বিধবা ভ্রাতৃপত্নী মন্দোদরী দু-বাড়ি মেয়ে নিয়ে শুরু করেছে ব্যবসায় এবং শৈলকে সেখানেই আনা হবে। পিতা হিসেবে কেসবের নৈতিকতা : 'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।' এখানে চোখবোজা যে ধর্মনৈতিকতা আছে, পেটের ক্ষুধাটা তারচেয়ে অনেক গভীর। অর্থনৈতিক অক্ষমতা, যেখানে আছে সুনির্দিষ্ট রাজনীতি– এই রাজনৈতিক অর্থনীতিই দেহকে পণ্য ও যৌনতাকে ব্যবসায়ে নামিয়েছে। এজন্য টাকার হাতে কোনো নৈতিকতাই নিরাপদ নয়, এমনকি ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা কালাচাঁদও তার বাইরে নয়। মন্দোদরী ঠিকই শৈলর ঘরে পুরুষ এনে দেয় :

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে–

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

লোকটা কে?

সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশি টাকা কী? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

এই অর্থনৈতিক বাস্তবতায় স্থিত হওয়ার পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবৃত্তির অনিবৃত্ত উপাদান নিয়ে অনেক অলিগলি ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং মানবস্বভাবের বৈচিত্র্যে তা অসত্যও নয়। যেমন, 'রোমান্স' (পপ্র. ১৩৫০) ও 'ফাঁদ' (পপ্র. ১৩৪৮) গল্পে যৌনতা/জীবন যেন আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী। মুক্তির পথরেখা জানা না থাকায় মুখথুবড়ে পড়ে ব্যক্তি, তবু আকাঙ্ক্ষার আর্তি বড়ো করুণ সুর তোলে। 'ফাঁদ' গল্পে যাত্রাদলের নারী সুভদ্রা অতৃপ্ত জীবনের অনির্বাণ শিখা নিয়ে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এটি কেবল কাঁচা যৌনতা নয়– জীবন-অনুসন্ধান। 'মুখে ভাত' (পপ্র. ১৩৪৮/১৩৪৯) একটু যেন পেছন ফিরে দেখা; তবু লেখকের আশ্চর্য নীরবতায় মন বা কাহিনী গুমোট হয়নি। 'স্বামী-স্ত্রী' (পপ্র. ১৩৫০) দৈনন্দিনতা-স্পর্শী গল্পই থেকে গেল; 'মেনকা লক্ষ করল, এদিক ওদিক নড়েচড়ে বেড়াতে বেড়াতে গোপাল রসিকের বউকে দেখছে, আগ্রহের সঙ্গে দেখছে'– এই সমীক্ষণ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। 'অন্ধ ও ধাঁধা' (গ্রপ্র. ১৩৫২) গল্পে রাধার সন্তান গর্ভে ধারণের রহস্যময় প্রচেষ্টাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করেননি।

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে 'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।' বৃত্তি ও প্রবৃত্তিতে সে সেরা! কেননা সে-ই সৃষ্টি করে মৃত্যুর বাজার ও প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ণ করে প্রবৃত্তির বৃত্ত। এখানে লিবিডো বড় গোলমেলে।

ফিরে দেখা : নোরা ও কুসুম

সেলিনা হোসেন

১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের 'আ ডলস হাউস'। নাটকটি শেষ হয়েছিল এক অসাধারণ শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল নোরা। বের হওয়ার সময় সজোরে বন্ধ করেছিল দরোজা। নাটকের শেষ বাক্যটি এমন : From below, the sound of a door slamming shut. সমালোচকরা এই শব্দকে পুরুষতান্ত্রিক গণ্ডি থেকে নারীর বেরিয়ে আসার জয়ধ্বনি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। নোরাকে দেখা হয়েছিল নারীমুক্তির প্রতীক হিসেবে।

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এ সমাজে যেসব পুতুলকে নাচানো হয় এবং যারা নাচায় তাদের ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে অসাধারণ কথাশিল্পীর মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। এ উপন্যাসে গাওদিয়া গ্রামের ডাক্তার শশীকে ভালোবাসে কুসুম, পরানের স্ত্রী। নোরার চলে যাওয়ার সঙ্গে দুঃসাহসী কুসুমের পরকীয়ার বড় রকমের পার্থক্য নেই। নরওয়ের একটি বাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটি ছিল উচ্চকিত। গাওদিয়া গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে পৌঁছাতে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো কুসুমের পরকীয়ার সংবাদ সে তীব্র গতি নিয়ে ছোটেনি। সেজন্য মানিকের উপন্যাসের শিল্পমূল্যের বিচার হয়েছে, তিনি যে পুরুষতন্ত্রের মানস-বেড়ি ভেঙে নারীর পরিসরকে বাড়িয়েছেন প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সে বিষয় সমালোচকের দৃষ্টি কতটা পড়েছে তা আমার জানার বাইরে আছে এখন পর্যন্ত। নারীর ব্যক্তিত্ব অর্জনের খবরটি পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যে এসেছে বেশ পরে। এই পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কুসুমের সৃষ্টি প্রাগ্রসর জীবনচেতনার প্রকাশ। কুসুমের দীপ্রতার সামনে অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার শশী ম্লান, যতই সে কলকাতা থেকে লেখাপড়া শিখে আসা ব্যক্তি হোক না কেন। এ উপন্যাসে কুসুম একক সত্তায়, নিজস্ব প্রাজ্ঞতায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত। শশী যখন মতির সঙ্গে কুমুদের বিয়ে নিয়ে দ্বিধান্বিত তখন সে অনুভব করল 'কী পাকা বুদ্ধি কুসুমের! কী নিখুঁত কৌশলে মতির বিবাহ সম্বন্ধে সে তার মনের মোড় ঘুরাইয়া দিল! দু'দিন ভাবিয়া সে যা স্থির করিতে পারে নাই, আধঘণ্টার মধ্যে দুটা অচল যুক্তি দেখাইয়া কুসুম কত সহজে সব সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল।'

শশী ও কুসুমের মতির বিয়ে সংক্রান্ত কথা হয়েছিল সন্ধ্যার পরে। আকাশে তখন চাঁদ ছিল। ঘরের চালা যে জ্যোৎস্নার ছায়া ফেলেছিল সে ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনে। এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে কুসুম তার ভালো লাগার কথা সরাসরি জানিয়েছিল শশীকে : 'এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।' শশীর কাছ থেকে এই কথার উত্তর না পেয়ে 'কুসুম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?

শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম।' শশী কুসুমকে এভাবে উত্তর দিয়েছিল।

নিজেকে প্রকাশ করার সাহস ছিল কুসুমের। দ্বিধাহীন অসংকোচ প্রকাশ। গাওদিয়া গ্রামের একজন নারীর এই প্রকাশে কুসুমের স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি নারীকে নারীর মর্যাদায় বুঝেছিলেন। তাকে তার যৌনতা থেকে আড়াল করে প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ শশীকে ঠিকই চিত্রিত করেছেন। দেখিয়েছেন কীভাবে পুরুষ নারীর যৌনতাকে অস্বীকার করে। যৌনতাকে আড়াল করে নারীকে অবদমনের সুস্পষ্ট চিত্রটি মানিক যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেটা বাঙালি নারীর জীবন জিজ্ঞাসায় নোরার দরজা বন্ধ করার শব্দের মতো উচ্চারিত হয়। সাহিত্যের সমালোচকরাও এই বাক্যটি নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'শরীর! শরীর! তোমার কি মন নাই কুসুম– এইটে তো শশীর প্রশ্ন। আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার গঠনের ঔপনিবেশিক জীবন কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক'। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়ের পরিসরে নারীবাদী চিন্তার ধাক্কা বিশ্বব্যাপী নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছে। এই চিন্তার আলোকে যখন ডাক্তার শশী ও কুসুমের সংলাপ দুটি পর্যালোচনায় উঠে আসে তখন এর পরিপ্রেক্ষিত নারীর যৌনতার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ কুসুম স্পষ্টভাবে নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষার কথাই জানিয়েছে নিজের ভালোবাসার মানুষের কাছে। একে উপনিবেশিক দ্বন্দ্বের আড়ালে ব্যাখ্যা করলে ব্যক্তি কুসুমকে অস্বীকার করা হয়। কুসুমের জন্মের পঁচাত্তর বছর পরে তাকে নতুন করে সামনে নিয়ে এলে দেখা যায় নোরার সঙ্গে তার শক্তির অবস্থান কত সমান্তরাল। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানিকের সাহসকে আড়াল করা সঙ্গত নয়। পঞ্চাশ বছর আগে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যা চিন্তা করেছিলেন সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। নারীর যৌনতার খোলামেলা আলোচনা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য আলোচ্য বিষয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাওদিয়া গ্রামের পটভূমিতে যে জীবনবোধ উন্মোচিত করেছেন আজকের নারীবাদী সাহিত্য থেকে তা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে কুসুম যখন গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে তখন কুসুমের শরীর ডাক্তার শশীর কাছে 'অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল।' মানিক লিখেছেন : 'তার সমস্ত শরীর শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল।'

লক্ষণীয় যে একসময় কুসুমের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করেছিল শশী। যখন দেখছে কুসুম অন্যত্র চলে যাচ্ছে তখন নিজের ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্যোগী হতে কুণ্ঠিত হয়নি। কুসুম বলেছে, 'কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটোবাবু? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি? বড় বেয়াড়া রাগ আমার।

শুনিয়া শশীর আধো পাংশু মুখখানা প্রথমে একেবারে শুকাইয়া গেল। কে জানিত কুসুমকে এত ভয়ও শশী করে? তবু কুসুমের হাতখানা সে ছাড়িল না। বলিল, রেগো, কথা শুনে রেগো। আমার সঙ্গে চলে যাবে বউ?

চলে যাব? কোথায়?

যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই চলো আজ রাত্রে।

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না।

শশী ব্যাকুলভাবে বলিল, কেন? যাবে না কেন?

কুসুম শুধু বলিল, কেন যাব?

শশী বোকার মতো, শিশুর মতো বলিল, কেন যাবে? কেন যাবে মানে কী কুসুম?

আজ নাম ধরে কুসুম বললেন! —বলিয়া ছোটো বালিকার মতো মাথা দুলাইয়া জ্বলজ্বলে চোখে শশীর অভিভূত ভাব লক্ষ করিতে করিতে কুসুম বলিল, কী করে যে শুধোলেন কেন যাব! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?

শশী অধীরভাবে বলিল, একদিন কিন্তু যেতে।

কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, তা যেতাম ছোটোবাবু, স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে যেতাম। চিরদিন কী এক রকম যায়? মানুষ কী লোহায় গড়া যে চিরকাল সে এক রকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।'

আ ডল হাউজ নাটকে নোরা তার স্বামী হেলমারকে অচেনা মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছে। হেলমার যখন তাকে এক রাত অপেক্ষা করতে বলেছে তখন নোরার উত্তর : I can't spend the night in a strange man's room. পুরুষের ভণ্ডামির প্রকাশ করতেও ছাড়েননি ইবসেন। হেলমারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : But couldn't we live here like brother and sister। নোরার প্রতিবাদী উচ্চারণ : '... for eight years I've been living here with a stranger, and that I'd even conceived three children – oh I can't stand the thought of it! I could tear myself to bits.

নোরার প্রতিবাদের সঙ্গে কুসুমের প্রতিবাদের বড় পার্থক্য নেই। বিষয়টি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নিঃসন্দেহে এক। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মানিক কুসুমকে একক নারীই রেখেছেন। তাকে মা করেননি। মাতৃত্বে নারীর গৌরব এবং সার্থকতা বলে যে সমাজব্যবস্থা সোচ্চার সেখানেও মানিক প্রশ্ন রেখেছেন। অন্যদিকে মাতৃত্ব যে নোরাকে স্বস্তি দেয়নি এটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন ইবসেন।

ঔপন্যাসিক মানিক আশ্চর্য দক্ষতায় যেমন শিল্প সৃষ্টি করেছেন তেমনি নারী-পুরুষে সম্পর্কের জায়গাটিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন আর একটি উদাহরণ বালিকা মতি। কুমুদের জন্য তার ভালোবাসা পরিশেষে গড়িয়েছে বিয়েতে। কিন্তু বিয়ের এক মাসের মধ্যেই ও বুঝে যায় যে স্বামী কী! কত প্রভুত্ব তার আচরণে! মতি দেখতে পায় 'ছোট-বড় সেবার সুযোগ মতিকে কুমুদ অফুরন্তই দিয়াছে, মতি চা করে, খাবার দেয়, তৃষ্ণার জল জোগায়। দাড়ি কামানোর আয়োজন করে, ক্ষুর ধুইয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখে, কুমুদের টেরিও মতিই কাটে, দিয়াশলাই সিগারেট প্রভৃতি জোগান দেয়। আরো কত কী মতি করে।' এমন সেবার পরও প্রভুত্বের আচরণ বাড়তে থাকে। কুসুম মতিকে পা টিপে দেবার কথা বলে। এমন একটা হুকুম আসবে মতি তা ভাবতে পারেনি।

'মতি আরক্ত মুখে বলিয়াছিল, চাকরকে ডেকে বলো না?

হোটেলের চাকর পা টিপবে? তবেই হয়েছে? দাও না, তুমিই একটু দাও না আস্তে আস্তে?

সেই হইতে দুপুরবেলা কুমুদের ঘুম পাইলে মতি তার পাও টিপিয়া দেয়। শহরের শব্দে তখন স্থানীয় একটু স্তব্ধতার চাপ পড়ে। এ সময়টা মতির মন ভারি খারাপ হইয়া যায়। কলের মতো এক হাতে কুমুদের পা টিপিতে টিপিতে অন্য হাতে তাহাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয়। নিজেকে কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির। মনে হয়, কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোটো ঘরটিতে পা টেপানোর জন্য আটকাইয়া রাখিবে, তার খেলার সাথী কেহ থাকিবে না, আপনার কেহ থাকিবে না, মাঠ ও আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে, বালি মাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে পারিবে না হাঁটিতে।'

বিয়ের পরে এক মাসের স্বামী-সঙ্গে ফুটে ওঠে নারীর বেদনা। বন্দিজীবনের এমন মর্মান্তিক বর্ণনায় শিল্পীর দৃষ্টি খুলে দেয় নারীর অবস্থানকে পর্যালোচনা করার জন্য। হোটেলের ঘরে মতি এমনভাবে চৌকিতে ঘুমায় যে মতির শোয়ার জায়গা থাকে না। ওকে চাদর বিছিয়ে মেঝেতে ঘুমুতে হয়।

প্রেম এবং বিবাহ সূত্রের জায়গাটি এমন আশ্চর্যভাবে উপস্থাপন করেছেন যে নারীবাদীদের চিন্তার ক্ষেত্রটি তিনি তৈরি করে রেখেছেন। উপন্যাসের শৈল্পিক বোধের সঙ্গে এক হয়ে যায় নারীর জন্য নির্মিত সমাজ-বাস্তবতা।

বন্দি ঘরের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে শশীর বোন বিন্দু। কলকাতায় বসে যখন শশী বিন্দুকে জিজ্ঞেস করে, 'নন্দ তোকে ভালোবাসে না বিন্দু?

বাসে। স্ত্রীর মতো নয়। —রক্ষিতার মতো।' সমাজে নারীর অবস্থান তিনি এভাবে মূল্যায়ন করেন। আজকের দিনের নারীবাদী চিন্তার ডিসকোর্স এই বিশ্লেষণে সোচ্চার।

বৈবাহিক ধর্ষণ যে নারীকে কত অবদমিত রাখে এই উদাহরণটির চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে। এখন Marital rape নিয়ে নারীবাদী ডিসকোর্স সোচ্চার। এই সময়ের লেখকরা নানা দিককে বৈবাহিক ধর্ষণ বিষয়ে গল্প লিখছেন। তিরিশের দশকে মানিক বিষয়টিকে সমাজবাস্তবতার নিরিখে উঠিয়ে এনেছিলেন। নারীকে অবমূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে প্রায় একইরকম ছিল তা দুটো উদাহরণ থেকে পরিষ্কার হয়। এক. পুতুল প্রসঙ্গ। *আ ডলস হাউস* নাটকের প্রথম দৃশ্যে ক্রিসমাস উপলক্ষে যে উপহারসামগ্রী নোরা কিনেছে সেগুলো কত সস্তা স্বামীর কাছে সে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে নোরাকে। কারণ হেলমারের ধারণা নোরা অকারণে টাকা খরচ করে। অদৃশ্য অর্থে নোরার উপার্জন নেই। তাই টাকা ব্যয়ের স্বাধীনতা নেই। নোরা ছেলেদের জন্য কিনেছে খেলনা তরবারি, ঘোড়া ও বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে জামাকাপড়। মেয়ের জন্য কিনেছে পুতুল ও পুতুলের খাট। মেয়ের উপহারটা খুবই সস্তা 'They are nothing much, but she'll tear them to bits in no time anyway.' নারীর কাছে সংসার যদি সস্তা হিসেবে বিবেচিত হয় তবে নারী সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো করবে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ইবসেন। যে কারণে নাটকের শেষে পুতুলের সংসার ভেঙে ফেলে নোরা। আর শশী তার ছোট বোন সিন্ধুর পুতুল খেলা দেখে : 'নিচে সিন্ধু পুতুল খেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দেখে।

খুকি, বড় হয়ে তুই কী করবি?

পুতুল খেলব।

এই একটি মাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়।'

নারীর পুতুল খেলার ধারণায় পুরুষের মন হালকা হয়ে যায়, মানিকও একইভাবে দেখিয়েছেন পুতুলের স্বরূপ। পুতুলের ধারণা যে কত আনন্দদায়ক শশীর অনুভবই সেটা প্রকাশ করে।

আর একটি উদাহরণ এমন—নোরাকে স্বামীর কাছে খরচের হিসেব দিতে হয়েছে, কারণ নোরা ছিল গৃহিণী। তার কোনো উপার্জন ছিল না। একইভাবে কুসুমকেও নিজের উপার্জন না থাকার জন্য শশীর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। কুসুমের পেটব্যথার জন্য ডাক্তার শশীকে রাতের বেলায় আসতে হয়েছিল কুসুমের বাড়িতে। বাড়ি ফিরে ওষুধটা লোক দিয়ে পাঠানোর কারণে কুসুম ক্ষুব্ধ হয়। পরদিন সে শশীকে ডাক্তারের দুই টাকা ফিস্ দিতে গেলে শশী বলে, 'টাকা পেলে কোথায় পরানের বউ?

যেখানে থেকেই পাই, আপনার ভিজিট দিয়েছি, নিয়ে যান।

কোথা থেকে পেয়েছ না বললে নিতে পারি না, বউ।

কেন, চুরি করেছি ভাবেন না কি?

শশী ভাবিল, এই বেশ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। কুসুমের এই কথাটাকে পরিহাসে দাঁড় করাইয়া দিলেই সে হাসিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

তা আশ্চর্য কী? চুরি না করলে টাকা তুমি পাবে কোথায়? রোজগার কর? নারীর উপার্জনের দিকটি ফুটিয়ে তোলেন মানিক। নারীর গৃহশ্রম যে অদৃশ্য তা দেখিয়ে দেন সমাজবাস্তবতার আলোকে। এক্ষেত্রে কুসুমের সাহস এবং পরিসর অনেক বেশি। কুসুমের পরকীয়া সম্পর্কের আচরণ তার গৃহবন্দি জীবনের স্বামীর প্রভুত্বের মধ্যে নয়। তার সম্পর্ক বাইরের পরিসরে। কথাশিল্পী মানিক কুসুমকে ঘরছাড়া করেননি। গৃহের বলয়ের মধ্যে থেকেই কুসুম বেড়ি ভেঙেছে। এখানেই নোরার সঙ্গে কুসুমের ভিন্নতা এবং সম্পর্কের জায়গা তৈরির ভিন্নমাত্রা। একজনের সাহিত্য মাধ্যম নাটক, অন্য জনের উপন্যাস। কিন্তু নারী ভাবনায় দু'জনেই শিল্পের মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

কুসুম প্রসঙ্গের আর একটি দিক এমন : পরানের সঙ্গে ঝগড়া করে কুসুম একাদশীর দিন উপোস করেছে। একাদশীর দিন এয়োস্ত্রীর উপোস করা চলে না। মানিক লিখছেন, 'কথাটা সাংঘাতিক। একাদশীর দিন এই উপবাস করার কথাটা। এমন কাজ করিবার মতো বুকের পাটা কুসুম ছাড়া আর কারো হইত কিনা সন্দেহ।

কিছু খাওনি পরানের বউ?

খেয়েছি। খাব না কেন? একটা মাছের আঁশ খেয়েছি। কুসুম ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিয়াছিল।'

রক্ষণশীলতাকে এমন দুঃসাহসে মোকাবেলা করেছে কুসুম। প্রাচ্য সংস্কৃতির ধর্মীয় দিকের এই রক্ষণশীলতা নোরাকে মোকাবেলা করতে হয়নি। প্রাচ্যের এই দিকটিকে মানিক পর্যালোচনা করতে ছাড়েননি।

বাঙালি মেয়েদের স্বাস্থ্য বিষয়টিও মানিক কুসুমের নিপাট স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন : 'কুসুমের স্বাস্থ্য বাহিরের ফাঁকি নয়, ভিতরেও সে খুব মজবুত। কুসুমকে শশীর এই জন্যই ভালো লাগে। দশ বছরে একবার একরাত্রে শুধু একটু পেটের ব্যথায় কষ্ট পায়, আর কোনো রোগবালাই নাই। এই তো চাই। সব বাঙালি ঘরের মেয়ের এরকম স্বাস্থ্য হইলে জাতটা আজ ডুবিতে বসিত না, শশী একথাও ভাবে!'

বাঙালি মেয়ের বিয়ে সামাজিক প্রসঙ্গটিও মানিক তুলে ধরেছেন। বিয়ে প্রসঙ্গে কুমুদ বলে : 'বিয়েই যদি করব, ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করব কেন?' এই একটি মন্তব্যে নারীর শরীর পুরুষের দৃষ্টিতে কতটা অবমাননাকর তা উঠে আসে। জীবনশিল্পী মানিক সমাজের আচরণ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। অন্যদিকে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটি যে উপেক্ষিত তাও উঠে এসেছে এভাবে : 'পুরুষ মানুষের আবার বয়েস– সতিন কাঁটা তো নেই? ঘরে পয়সা আছে লোকটার,– মেয়ে সুখে থাকবে।' সুখের সংজ্ঞা সমাজ দীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই নির্ধারণ করেছিল নারীর জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিল্পকর্মে মানবিক চেতনার জায়গা তৈরির পাশাপাশি নারীর ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য ইতিহাসের উপাদান প্রদান করেছেন শিল্পকে ব্যাহত না করে। নারীর ইতিহাস যে পুরুষ আড়াল করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুমুদের উক্তিতে 'গ্রামে পর্দা-প্রথা শিথিল কিন্তু সে গ্রামেরই চেনা মানুষের জন্য। শশীর বাড়ির মেয়েরা সকাল বেলা অন্তঃপুরে পাক খায়। কুমুদ উৎসুক দৃষ্টিতে খোলা দরজা দিয়া প্রকাণ্ড সংসারটির গতিবিধি যতটা পারে দেখিতেছিল, খানিক পরে ছোট একটি ছেলে আসিয়া দরজাটা ভিজাইয়া দিয়া গেল। কুমুদ আহত হইয়া ভাবিল, আমি তো ওদের দেখিনি? ওদের কাজ দেখছিলাম যে আমি। সকলে মিলে কী রচনা করছে তাই দেখছিলাম।'

আজকের দিনে নারীবাদী আলোচনার অন্যতম বিষয় মূলধারার ইতিহাস থেকে নারীকে অদৃশ্য করে রাখা। কুমুদ বলছে, সকলে মিলে কী রচনা করছে তাই দেখছিলাম। পুরুষতন্ত্র সকল নারীর একত্র রচনাকে প্রকাশ্যে আনে না। নারী তার জ্ঞান দিয়ে যে আপন ভুবন গড়ে সেই অদৃশ্য ভুবন মূলধারার ইতিহাসে যুক্ত হয় না বলে নারীর জীবন হয়ে ওঠে অলীক। এ বিষয়টিও একজন কথাশিল্পীর মনস্কতায় ধরা পড়ে।

নারী যে সংসারের জায়গাটি ধরে রেখে জীবন-পরিচর্যার জগৎ নির্মাণ করে সে কথাও মানিক বলেছেন : 'গুছানো সংসার পাগলদিদির। উপুড় করা বাসনগুলো সাজানো, হাঁড়ি-কলসির মুখগুলো ঢাকা, আমকাঠের সিন্দুকটার গায়ে ধৌত পরিচ্ছন্নতা, পিলসুজে দীপটির শিখা উজ্জ্বল। ঘরে এখনও ধূপের মৃদু গন্ধ আছে। আর শান্ত — সব এখানে শান্ত। মৃদু মোলায়েম প্রশান্তি ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এ ঘরের আবহাওয়ার অমায়িকতা যেন নিঃশ্বাসে গ্রহণ করা যায়। ভাঙা হাটে যে বিষণ্ন স্তব্ধতা ঘনাইয়া থাকে, এ তা নয়। এ ঘরে বহু যুগ ধরিয়া যেন মানুষের জ্বালা করা বেদনার হল্লা প্রবেশ করে নাই। এ ঘরে জীবন লইয়া কেহ যেন কোনোদিন হইচই করিয়া বাঁচে নাই,– আজীবন শুধু ঘুমাইয়া এ ঘরকে কে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। বড় ভালো লাগে শশীর।' সংসারের কাঠামোটি নারীর হাতে ধরা থাকে বলে সংসার ধসে পড়ে না। নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা সত্ত্বেও কাঠামোটি খাড়া থাকে নারীর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগের জন্য। মানবসমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারী উপেক্ষার বেড়ি ভাঙে, নির্যাতন গায়ে মাখে এবং জীবনটাকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখে। এই বিপুল অবদানের জন্য প্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকেনি নারী।

উপন্যাসের এগারো অধ্যায়ের শেষে যাত্রাদলের নায়ক কুমুদ যাত্রা পালায় অভিনয় করার উদ্দেশ্যে অন্যত্র যাবে। মতি তার সঙ্গে যেতে পারবে না। কারণ : 'মতি যে মেয়েমানুষ, বউ যে মতি। আহা, মানুষ যদি ইচ্ছামতো নিজেদের অদল বদল করিতে পারিত, দরকার মতো মেয়েরা হইতে পারিত পুরুষ, পুরুষেরা হইতে পারিত মেয়ে।' এ এক বড় অদ্ভুত মানবিক বিবেচনা। মতির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজভাবনা মেলে না।

নারীর প্রতি সমাজের আচরণ বড়ই নিষ্ঠুর। কিন্তু শিল্পীর কাছে নারী-পুরুষের ভেদ নেই। শিল্পীর দায় স্রষ্টার। শিল্পের জমিন তার নির্মাণের জায়গা। স্রষ্টা মানিক ভবঘুরে প্রতারক কুমুদের সঙ্গে মতির জীবন বেঁধে দিয়েছেন। শশী এবং পরানসহ মতি স্টেশনে আসে কুমুদকে বিদায় জানাতে। মতি কৌশলে ট্রেনে উঠে পড়ে। কারণ কুমুদের সঙ্গে অজানার যাত্রায় সেও সঙ্গী হতে চায়। কিন্তু পরান ও শশীর সামনে নিজের ইচ্ছার কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। তাই এমন লুকোচুরি প্রকাশ মতির। ঔপন্যাসিক এ অধ্যায় শেষ করেছেন এভাবে : 'গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল– আমাদের গেঁয়ো মেয়ে মতি। হয়ত একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়ত একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না - জীবনযাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। আজ সেকথা কিছুই বলা যায় না। *পুতুলনাচের ইতিকথায়* সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত– ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।'

নারীকে মানিক যাযাবর জীবন উপভোগের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করার সাহস দিয়েছেন। মানিকের উপন্যাসে নারীর ভুবন নারীরই।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র কুসুম গৃহের পরিসরে বাস করে আর একজনকে ভালোবাসার সাহস পেয়েছিল। সমাজ তাকে কিছু বলেনি। তাকে প্রত্যাখ্যান করারও সাহস কুসুমের হয়েছিল। সমাজ তাকে কিছু বলেনি। তাহলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি নারীর জন্য সেই সমাজ চেয়েছিলেন যা সাম্য ও সমতার প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র?

পুতুলনাচের ইতিকথা এভাবে নারী-পুরুষের সমতার জায়গা বিনির্মাণের পাটাতন। নারীর ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এবং নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ। একইসঙ্গে এই উপন্যাস কালজয়ী শিল্প এবং নারীবাদী দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণের উপাদান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তেইশ বছর আগে পরে'

সৈয়দ আজিজুল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকসত্তাকে স্পষ্টত দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন সমালোচকেরা। একভাগে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্ব, অন্যভাগে মার্কসীয় সমাজবীক্ষার প্রভাবকেই দেখা হয় বড়ো করে। এর মধ্যে যে সত্য নেই তা নয়, কিন্তু এমন বিভক্তি-সাধনের ফলে অনেক সময়ই মানিকের শিল্পীসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি অনুদ্ঘাটিত থাকে। তাছাড়া এরূপ বিভক্তির মূলে রয়েছে আরেকটি মিথ। তা হল : জীবনের আকস্মিক এক সিদ্ধান্ত আমূল পরিবর্তন এনেছে তাঁর লেখকসত্তায়। এসব মূল্যায়নে মানিকের প্রতিভার উচ্চতাকে খাটো করা হয়। এবং এই সত্যই তাতে প্রতিষ্ঠা পায় যে, মানিক নিজ প্রতিভাবলে নয়, বরং কোনো-না-কোনো তত্ত্বপ্রভাবে আলোকিত হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আসলে তত্ত্বকে মানিক গ্রহণ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু তত্ত্ব তাঁর প্রতিভাশক্তিকে কখনো ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। কতকগুলো বিষয় মানিকের শিল্পবৈশিষ্ট্যে প্রথম থেকে শেষাবধি অক্ষুণ্ন ছিল, তত্ত্ব সংযুক্ত হয়ে তাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত বা তত্ত্বাচ্ছন্ন করতে পারে নি।

মানিক সমাজের শোষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শুরু থেকে সচেতন ছিলেন। ধনী কর্তৃক দরিদ্রকে শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি, শোষণের ফলে লাখ লোকের সম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে কুক্ষিগত হওয়ার কারণে দরিদ্র মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন। 'সরীসৃপ' (১৯৩৩)[১] গল্পের বনমালীর শোষণ-প্রক্রিয়া ও 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' (১৯৩৪)[২] গল্পের সূচনাংশই এর প্রমাণ। ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার এই শোষণ ও বৈষম্যমূলক পার্থক্যের পাশাপাশি আরেকটি ব্যবধান সম্পর্কেও বিশেষ সতর্ক ছিলেন মানিক। সেটি হল সচ্ছল উচ্চ মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সঙ্গে নিম্নবিত্ত দরিদ্রের ব্যবধান। তিনি এই দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের মনেই দেখেছেন সুস্থতার বীজ যেখানে প্রতারণা নেই, যেখানে মুখোশ-পরা নেই, যেখানে প্রকৃত বাস্তবতাকে লুকিয়ে কৃত্রিমতা নিয়ে বাগাড়ম্বরতা নেই। পক্ষান্তরে, তিনি লক্ষ করেছেন সুবিধাভোগী ধনী ও উচ্চবিত্তের মনেই রয়েছে কত প্রকার মুখোশ, কৃত্রিমতা, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস, অস্বাভাবিকতা ও মনোবিকারের নানা গ্লানি। তবে অবদমনজনিত যে মনোরোগ তার শিকার মূলত মধ্যবিত্ত। ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তা থেকে অনেকটা মুক্ত এ কারণে যে, ভোগবাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে তারা অতিমাত্রায় স্বাধীন ও বেপরোয়া। ফলে অবদমনের শিকার তাদের হতে হয় খুব কমই। তবে এই অতি-লালসার মধ্যেই নিহিত তাদের শেণিগত বিকার।

এখানে স্মরণীয় যে, মানিক লেখক-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের বহির্বাস্তবের চিত্রাঙ্কনের চেয়ে মনোবিশ্লেষণেই সর্বাধিক আগ্রহী। বিশেষভাবে যেসব মনে রয়েছে অস্বাভাবিকতা, অসুস্থতা কিংবা বিকারের ঘোর সেইসব মনের ব্যবচ্ছেদ তিনি করেছেন সুস্থতা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। 'কেন'-ধর্মী বৈজ্ঞানিক জীবনজিজ্ঞাসা তাঁর

মধ্যে কিশোরবয়স থেকেই সক্রিয় ছিল। সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে এই অনুসন্ধিৎসা মানবমনের ওপর বহির্জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মানুষের দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক, নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে নানামুখী অনুরণন প্রভৃতি অনুধাবনেই মানিক অধিক মাত্রায় মনোযোগী হন।

এরূপ মনোযোগের মূলে সক্রিয় ছিল কয়েকটি বিষয়। যেমন, বাল্য-কৈশোর পর্যায়েই মানিক নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি-কাঠামোকে অতিক্রম করে নিম্নবর্গীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভে আগ্রহান্বিত ছিলেন। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র থাকাবস্থায়ই তিনি গল্প-উপন্যাস পাঠে হয়ে ওঠেন ব্যাপকভাবে মনোযোগী। বাস্তব জীবনের সংশ্রব ও কথাসাহিত্য পাঠের এই নিবিড়তা তাঁর মনে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তা তাঁকে এই দুয়ের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী করে তোলে, তাঁর মনকে করে তোলে আরো বেশি বিশ্লেষণপ্রবণ। তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় জীবনের বাস্তবতা ও সাহিত্যের বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনই মানুষের মনোরহস্য উদ্ঘাটনে তাঁকে ব্যাপৃত করে। এই আগ্রহসূত্রেই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের দ্বারস্থ হন তিনি। শুধু তাই না, জেমস জয়েস, ফ্রয়েডের শিষ্য বলে কথিত ইয়ুং ও অ্যাডলারের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সূত্রসমূহও তিনি অনুধাবন করেন বিপুল আগ্রহসহকারে।

অতঃপর মানিকের লেখকসত্তার মূল দিকগুলোকে চিহ্নিত করা যায় নিম্নোক্তভাবে :

ক. পূর্বাপর ভাবালুতামুক্ত জীবনবাস্তবতাকে রূপায়িত করতেই মানিক ছিলেন একান্তভাবে আগ্রহী।

খ. বহির্বাস্তবের রূপায়ণের চেয়ে বহির্জাগতিক ঘটনা মানুষের অন্তর্জগতে কী প্রতিক্রিয়া বা অভিঘাত সৃষ্টি করেছে তা বিশ্লেষণেই মানিক অধিক মাত্রায় মনোযোগী।

গ. দরিদ্র, শোষিত ও নিম্নবর্গীয় জীবনধারার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। মধ্যবিত্তের মুখোশ-পরা কৃত্রিম প্রতারণামূলক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের প্রতি মানিকের ছিল প্রবল সমালোচনা। আর শোষক ধনাঢ্য জীবনের প্রতি ছিল সুতীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

ঘ. অর্থনৈতিক শোষণ কিংবা অবদমন মানুষের মনকে যেভাবে অস্তিত্ব-সংকটগ্রস্ত, মনোবিকারগ্রস্ত কিংবা নিরাপত্তাহীন করে তোলে তা থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য তার মনের সুস্থতা সর্বাগ্রে জরুরি বলে মানিক মনে করেছেন। সেই সুস্থতার লক্ষ্যেই ব্যাপৃত হয়েছেন মনোবিশ্লেষণে।

সমালোচকেরা মানিকের শিল্পীমানসের যে দুই পর্বকে চিহ্নিত করেন তার উভয় পর্বেই উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয়। সমাজ ও জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ, মনোবিশ্লেষণ, মনের সুস্থতা কামনা, দরিদ্র-জীবনমমতা– এসবই তাঁর লেখকজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। তাহলে ফ্রয়েডীয় মনোভাবনা ও মার্কসীয় সমাজাদর্শ তাঁর লেখকসত্তায় কী পরিবর্তন এনেছে– সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় :

ক. প্রথম পর্বে দরিদ্রজীবনের অসহায়ত্ব বা নিরুপায়ত্বই মানিক-সাহিত্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এর কোনো সমাধান বা এ থেকে কোনো পরিত্রাণের উপায়ের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না তাঁর সামনে। 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩)[৩] গল্পের নীলমণি কিংবা *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৪-৩৫)[৪] উপন্যাসের কুবের এর উদাহরণ হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে মানিক দেখিয়েছেন : দারিদ্র্য বা শোষণের বিরুদ্ধে সমষ্টিবদ্ধভাবে সংগ্রামশীল হওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা বা শোষণমুক্তির প্রশ্নে অনিবার্য বিজয়

নিহিত। *চিহ্ন* (১৯৪৬)[৫] উপন্যাস কিংবা 'হারানের নাতজামাই' (১৯৪৭)[৬] গল্প এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

খ. অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অন্তর্গত ক্লেদ বা ক্ষতকে উন্মোচন করার মধ্যেই মধ্যবিত্ত মনের সুস্থতা নিহিত বলে প্রথম পর্বে ভেবেছেন মানিক। 'শৈলজ শিলা' (১৯৩২)[৭], 'মহাকালের জটার জট' (১৯৩২)[৮] প্রভৃতি গল্প, *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৪)[৯] উপন্যাসের হেরম্ব, সুপ্রিয়া, *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬)[১০] উপন্যাসের শান্তা, বিমল, প্রমীলা, অধর প্রভৃতি চরিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানিক দেখেছেন, শুধু কৃত্রিমতার মুখোশ উন্মোচন করলেই সম্ভব নয় মধ্যবিত্তের রোগ নিরাময়। দ্বিতীয় পর্বে তিনি এর যথার্থ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। দেখিয়েছেন, এই নিরাময়ের জন্য মধ্যবিত্তের শ্রেণিমানসের পরিবর্তনটিই জরুরি। মধ্যবিত্ত যদি তার নিজ শ্রেণিমানসপুষ্ট মিথ্যা অহংয়ের খোলস ভেদ করে কায়িক শ্রমজীবীর শ্রেণিতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে তাহলেই তার রোগমুক্তি তথা সুস্থতা সৃষ্টি হয়ে ওঠে সম্ভবপর। *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৪৮-৫০)[১১] উপন্যাসের মণিমালা, *সার্বজনীন* (১৯৫২)[১২] উপন্যাসের পরমেশ্বর, সমীর কিংবা 'ফেরিওলা' (১৯৫১)[১৩] গল্পের জীবন বা 'লাজুকলতা' (১৯৫২)[১৪] গল্পের তমাললতা চরিত্র এই সুস্থতার চিহ্নকে ধারণ করে আছে।

মানিকের শিল্পীসত্তার এই রূপান্তরের বিষয়টি কি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতাসহ অনিবার্য ছিল? নাকি, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণসহ (১৯৪৪) মার্কসবাদী ভাবাদর্শে আস্থা স্থাপনের মধ্যে কোনো আকস্মিকতা বিদ্যমান? এ প্রশ্নের মীমাংসাসূত্রে উন্মোচিত হতে পারে মানিকের জীবনাদর্শসম্পর্কিত কিছু সত্য। কলেজজীবনেই (১৯২৬-২৮) স্বাধীনতাকামী গোপন সশস্ত্র গ্রুপ 'অনুশীলন' দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে মানিক যে সচেতন ছিলেন লেখকজীবনের শুরু থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'সরীসৃপ' (১৯৩৩), 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩) ও 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' (১৯৩৪) গল্পে, *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে (১৯৩৪-৩৫)। ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘের 'প্রগতি' সংকলনে তাঁর একটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় চাকরিসূত্রে (১৯৩৭-৩৮)[১৫] তিনি এর মালিক শোষক-শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যকে দেখেছেন অত্যন্ত নিকট থেকে। এই শোষকের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন *সহরতলি* (১৯৩৯-১৯৪০)[১৬] উপন্যাসে। ১৯৩৮ সালে তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির *মা*, বুখানিনের *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ* ও লিয়েনতিয়েভের *মার্কসীয় অর্থনীতি* গ্রন্থত্রয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে চাকরিসূত্রে যুদ্ধবিরোধী একাধিক বেতার-ভাষণ দেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির। ১৯৪৩এ যুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসেবে সংঘটিত হয় দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের চরম অমানবিক নিষ্ঠুরতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব ঘটনার অনিবার্য প্রক্রিয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট হন ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মতৎপরতার সঙ্গে (১৯৪৩), এবং তারই ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ (১৯৪৪)। সুতরাং এটি তাঁর জন্য কোনো এক সুন্দর সকালের আকস্মিক সিদ্ধান্ত ছিল না। ছিল না কোনো আরোপিত ঘটনা। তা হলে আমৃত্যু এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে।

এ গেল বাইরের দিক। এছাড়া ভেতরের দিকেও অর্থাৎ আদর্শ, চেতনা ও বোধের ক্ষেত্রেও একটি অনিবার্য রূপান্তর ঘটেছিল। একে শুধু ফ্রয়েড থেকে মার্কসে উত্তরণ—

এভাবে চিহ্নিত করলে অনেকটা সরলীকরণ করা হবে। যদিও কলকাতা থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত মানিক সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন-গ্রন্থের শিরোনাম এরকমই। অবশ্য মানবমনের রহস্য ভেদ করতে করতেই মানিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মনোজাগতিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যটি শুধু ব্যক্তিসর্বস্ব নয়। তাছাড়া ব্যক্তি যেহেতু নয় সমাজবিচ্ছিন্ন সেহেতু ব্যক্তিমনের ওপর সমষ্টিমনের বা অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের রয়েছে অনিবার্য প্রভাব। মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বা শান্তি বিনষ্টির কারণ শুধু নয় ফ্রয়েডকথিত লিবিডো-সমস্যা ; এর সঙ্গে সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বংশপরম্পরা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি অনেক কিছুরই রয়েছে নিবিড় যোগ— এই সত্য মানিকের মনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সমাজ ও জীবনের বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মানবমন বিশ্লেষণে মানিক ছিলেন এক অক্লান্ত সাধক। এরূপ সাহিত্যসাধনাসূত্রেই তাঁর চিন্তনপ্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটেছিল। তাঁর দৃষ্টি ব্যক্তিমন থেকে সমষ্টিমনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি উন্নীত হয়েছিলেন 'আমি' থেকে 'আমরা'য়।

আলোচনার এই পর্যায়েই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোনামের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। লেখক-জীবনের শুরুতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন একটি গল্প 'ব্যথার পূজা' (১৯২৯)[১৭]। সেই গল্পটি পত্রিকায় মুদ্রণের পর তিনি কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তারপর তেইশ বছর পরে তিনি ওই গল্পের কাহিনিকে অবলম্বন ও প্রলম্বন করে রচনা করলেন একটি উপন্যাস। নাম দিলেন *তেইশ বছর আগে পরে* (১৯৫৩)[১৮]। এই তেইশ বছরে মানিকের সৃষ্টিশীল সত্তায় কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হয়ে আছে এ উপন্যাস।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরো একটি উপন্যাসের নাম। সেটি হল *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫১-৫২)[১৯]। এখানেও নামকরণের মধ্যে রয়েছে পরিবর্তনের আভাস। এর আগে মানিক 'ইতিকথা' নামাঙ্কিত দুটি উপন্যাস রচনা করেন। একটি *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৪-৩৫)[২০], আরেকটি *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪২)[২১]। এই দুই উপন্যাসেরই প্রধান প্রধান চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি ব্যক্তিমনের সংকট, তাদের আশা ও স্বপ্নের অচরিতার্থতাজনিত যন্ত্রণার রক্তক্ষরণ। শশী ও কুসুমের ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণাই *পুতুলনাচের ইতিকথার* পরিণামে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের আশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এই নৈরাশ্য *সহরবাসের ইতিকথায়*ও সুতীব্রভাবে প্রকাশিত। *পুতুলনাচের ইতিকথার* পটভূমি গ্রাম; কিন্তু *সহরবাসের ইতিকথায়* উন্মোচিত হয়েছে নগরজীবনের জটিলতা। গ্রামের ধনাঢ্য যুবক মোহনের শহরবাসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার এই কাহিনিতে পরিণামে ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিস্ফুটিত হয়েছে বিকারের নানা রূপ। অথচ *ইতিকথার পরের কথায়* মানিক ব্যক্তির সংকটকে ছাপিয়ে মুখ্য করে তুললেন সমষ্টির জীবনযন্ত্রণাকে। জমিদারপুত্র শুভ উপন্যাসের পরিণতিতে পিতার শোষক-পরিচয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। শোষিত নিম্নবর্গীয়দের সমষ্টিস্বার্থে সে তার ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংকটকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দেয়। শুভ ও লক্ষ্মীর সম্পর্কের মধ্যে শশী-কুসুমের মতো লিবিডোর সংবেদনা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে ধনাঢ্য যুবক কর্তৃক দরিদ্রের জীবনসংকটের স্বরূপ উপলব্ধির আগ্রহই প্রধান হয়ে ওঠে। এভাবে নিজ শ্রেণিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দরিদ্র-শোষিতজনদের স্বার্থের সঙ্গে লেখক হিসেবে মানিকের জীবনবোধের রূপান্তরের বিষয়টিও যেন সমান্তরালভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার পরিবর্তনরেখাটি এভাবে উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্রের রূপান্তর ও নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। সেদিক থেকে *তেইশ বছর আগে পরে* নামকরণটি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একটি ছোটগল্পের আখ্যানকে উপন্যাসের আখ্যানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে আখ্যানের এই যাত্রাটিও প্রতীকীমূলক। কেন না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনের পর্বান্তরের বিষয়টি এ উপন্যাসে সুচিহ্নিত। গল্পটিকে উপন্যাসে রূপান্তরের যুক্তি হিসেবে উপন্যাসের শুরুতে মানিক যখন বলেন 'কাহিনীটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কীভাবে ফেনিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে ব্যথার পূজা-র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি' তখন এর মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পবোধের পরিবর্তনসূত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ব্যথার পূজা' গল্প নিয়েই বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি। এ পর্বে কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদীশ তার প্রণয়িনীর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে যেমন যন্ত্রণাদগ্ধ ও অনুশোচনাকাতর তেমনি আত্মক্ষয়ী প্রবৃত্তির প্রবল শিকার। সন্ন্যাসী হওয়া তার লক্ষ্য নয়, সন্ন্যাসী তাকে বানিয়েছে লোকেরা। একটি অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর নির্মমতা তাকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমান্বয়িক আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে আত্মনিগ্রহের পথে। অথচ চড়া নেশার মাধ্যমে মনোযন্ত্রণা লাঘবের এই প্রক্রিয়ায় সাময়িক আত্মবিস্মৃতি তাকে আত্মরক্ষাও করে চলেছে। সব মিলে ব্যক্তির জীবনযন্ত্রণা, ভাবাবেগতাড়নাই এ গল্পের মুখ্য বিষয়। কিন্তু উপন্যাসে ব্যক্তির মনঃসংকট ক্রমান্বয়ে সমষ্টির মনোজাগতিক সংকটের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। উপন্যাসের এই উত্তরণটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার রূপান্তরের সঙ্গেও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি মানিকের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংকট থেকে উত্তরণ প্রয়াসের আভাসেও এটি তাৎপর্যমণ্ডিত।

সাধকপুরুষ ভেবে যে-ভক্তরা জগদীশের কাছে আসে তারা নিজ নিজ জীবনের ব্যর্থতা, যন্ত্রণা ও অশান্তি থেকে মুক্তি কামনা করে। নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির শূন্যতা নিয়ে জগদীশ যতই সততা প্রকাশ করে, ততই ভক্তরা একে বিনয় মনে করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভক্তদের সঙ্গে আলোচনায় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। জগদীশ তার বক্তব্যে শুধু নিজ জীবনাভিজ্ঞতার সারাৎসারই তুলে ধরে। ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ সে নিজের মদ ও মাদক সেবনে এবং দরিদ্রদের কল্যাণার্থে ব্যয় করে। তার জীবনের বর্তমান ও অতীত কোনো বিষয়ই ভক্তদের কাছে অপ্রকাশ্য থাকে না। ইহজাগতিক জ্ঞান দিয়ে সে ভক্তদের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। ভক্তদের সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হতে হতে নিজ সমস্যার তীব্রতা তার কাছে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে মাদক সেবন থেকেও নিজেকে একসময় প্রত্যাহার করে নেয়। প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে যে মানসিক সংকটে সে উপনীত হয় তা সমাধানকল্পে তাকে চিকিৎসক ও হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে হয়। অন্যদিকে নিজের ভক্তসহ মানুষের মানসিক শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য জগদীশ মানসিক স্বাস্থ্যের হাসপাতাল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নিজের মানসিক সুস্থতার জন্য মাদকসেবনের যে-পথ সে বেছে নিয়েছিল অভিজ্ঞতা থেকে তার অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে। সেজন্য ওই পথ পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হয়েছে সে। তাছাড়া ভক্ত-সান্নিধ্যে সে উপলব্ধি করেছে, যন্ত্রণা শুধু তার একার ব্যক্তিমনেই নেই, সমষ্টিমনে রয়েছে তার ব্যাপ্তি; সুতরাং শুধু ব্যক্তির সুস্থতাই তার কাম্য নয়, কাম্য সমষ্টির সুস্থতা। সমষ্টির

সুস্থতার জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জগদীশ নিজ জীবনের সুস্থতা ফিরে পায়।

এ উপন্যাস প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, আশ্রম নিয়ে প্রথম পর্বের জীবনে মানিক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যার নাম *অহিংসা* (১৯৩৯-৪০)[২২]। ওই উপন্যাসে ধর্মের নামে ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করাসহ আশ্রমিক ব্যবসার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ উপন্যাসেও আশ্রমের কথা বলা হলেও তাতে নেই কোনো লালসা পরিতৃপ্তির কিংবা ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি অর্জনের গোপন অভিলাষ। সুতরাং মানিকের জীবনবোধের পরিবর্তনরেখাটি বেশ স্পষ্ট। এ উপন্যাসের পরিণামে আশ্রমটি পরিণত হয় রীতিমতো মানসিক রোগের চিকিৎসার আশ্রমে। শুধু তাই নয়, আগে ভক্তদের দেওয়া অর্থ গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হত। শেষে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এভাবে অর্থ বিলিয়ে গরিবের দুঃখ দূর করা সম্ভব নয়। বরং লোকের এত দারিদ্র্য কেন এবং কিসে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য কমবে তা বুঝিয়ে তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে দিলে সেটাই বেশি কার্যকর হবে। জগদীশ তার প্রধান ভক্ত প্রতাপকে বলে : 'লাভের টাকাকে ভগবান না করে মানুষকে এবার ভগবান করো।' অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত মানুষের সেবা বা মানুষের কল্যাণই হয়ে ওঠে এ উপন্যাসে মুখ্য বিষয়। আর এজন্য জগদীশ তার পৈতৃক সম্পত্তির পাশাপাশি নিজের জীবন-যৌবন-ধন-মান সবই উৎসর্গ করে। এক নারীর প্রতি ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর পটভূমিতে সমষ্টিগত মানুষকে ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়। জগদীশ সৃষ্টি করে মানুষের কল্যাণে আত্মসুখ বিসর্জন বা বৃহত্তর ত্যাগের আদর্শ।

চতুষ্কোণ (১৯৪১-৪২)[২৩] উপন্যাসের সঙ্গে এ উপন্যাসের একটি সাযুজ্যমূলক ঘটনাসূত্রেও মানিকের জীবনবোধগত পরিবর্তনের মাত্রাটি বিশ্লেষণসাধ্য। এ উপন্যাসে জগদীশের কাছে তার ভক্ত সুন্দরী যুবতী ললিতা নিজের দেহাভ্যন্তরের খুঁতের কথা প্রকাশ করার পর জগদীশ চিকিৎসকের মতো প্রত্যক্ষভাবে তার দেহ পরীক্ষা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে নারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা-সংকোচ-ভয়ে ও এরূপ অস্বাভাবিক প্রস্তাবের আকস্মিকতায় সে অসম্মত হয়ে মূর্ছা যায়। *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে রাজকুমার কর্তৃক রিনির নগ্নদেহ দেখার ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে এ ঘটনার কিছুটা সাযুজ্য আছে। কিন্তু দুই ঘটনার পার্থক্যই এখানে বিবেচনাযোগ্য। রাজকুমার নারীর দেহসৌন্দর্যের সঙ্গে মনঃসৌন্দর্যের সম্পর্ক আবিষ্কারের লক্ষ্যে রিনির নগ্নদেহ দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিল। রিনি তাতে সম্মত হতে পারে নি, বরং বলেছিল নারীদেহ নিয়ে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা না-বলে ভালোবাসার দাবি নিয়ে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে সে হয়তো রাজি হত। রিনি এই ঘটনার আকস্মিকতায় মনোরোগের শিকার হয়। অতঃপর রাজকুমার তার প্রণয়, সান্নিধ্য ও সহনশীলতা দিয়ে রিনিকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্যদিকে নগ্ননারীদেহ দেখার কোনো আগ্রহই নেই জগদীশের মনে। প্রণয়জাত কোনো আকর্ষণ নয়, ললিতার প্রতি রয়েছে তার গভীর স্নেহ ও মমতা। জগদীশ ললিতার সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করে। সুতরাং উদ্ভট কোনো খেয়ালের বশে নয়, ললিতার দেহগত খুঁতের স্বরূপ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যেই জগদীশ একজন চিকিৎসকের দায়িত্ব ও নিরাসক্তি নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে চায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষণিকের মূর্ছা যাওয়া ছাড়া ললিতার মনেও কোনো বিকার দেখা দেয় না। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার মাধ্যমেই ললিতা সুস্থ হয়ে ওঠে। জগদীশ সেক্ষেত্রে অভিভাবকসুলভ সহায়ক ভূমিকা পালন

করে। দুই উপন্যাসের মধ্যেকার এই পার্থক্যসূত্রেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পবোধগত পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্টতা অর্জন করে।

এ উপন্যাস আরো একটি সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়। তা হল, মানিক তাঁর লেখকজীবনের সকল পর্বেই মানুষের মনোবিশ্লেষণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমনটা ঘটেছে এ উপন্যাসের গল্পখণ্ড ও উপন্যাসখণ্ডের ক্ষেত্রেও। উপন্যাসসাক্ষ্য থেকে জানা যায়, এরূপ মনোবিশ্লেষণের ধারায় জগদীশ নিজের রোগ আবিষ্কার করতে এবং তা নিরাময়ের উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হয়। মানিকের ব্যক্তিজীবনের মদ্যাসক্তি ও জগদীশের মদ্যাসক্তির মধ্যে তুলনা করে আরেকটি সত্যও উদ্ঘাটন করা সম্ভব। মানিক মৃগীরোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও সৃষ্টিকর্মে সজীব থাকার লক্ষ্যে স্বকীয় পদ্ধতিতে নিয়মিত অ্যালকোহল গ্রহণ শুরু করে তাতে আসক্ত হয়ে পড়েন। জগদীশও মনোযন্ত্রণা লাঘবহেতু অ্যালকোহলে আসক্ত হয়। তারপর একসময় জগদীশের এরূপ আত্মোপলব্ধি ঘটে যে : 'শুধু বিষ দিয়ে বিষ ঠেকানো নয়। আগে তাই খেতাম প্রাণের জ্বালা চাপা দিতে। এখন খাই দায় ঠেকাতে। এতকিছু চাইছে মানুষ— ছুটকো ভাবনা-চিন্তা বিচার বিবেচনা কাটিয়ে না উঠে চাহিদা মেটাতে পারি না।' নিজের মনোজ্বালা নিবারণের জন্য মদপান শুরু করলেও এখন তা বহু মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জগদীশের এই আত্মোপলব্ধির মধ্যে মানিকের ব্যক্তিমন যেন স্পষ্টভাবে উঁকি দিয়ে আমাদের জানায় যে, মানিক রোগ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য অ্যালকোহলে আসক্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে লেখার মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব পালনের জন্য তা অর্জন করে অনিবার্যতা।

তেইশ বছর আগে পরে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এভাবে আমরা মানিকের জীবন ও শিল্পবোধের রূপান্তরটি লক্ষ করি। 'মহাকালের পূজা' গল্প রচনার পর্যায়ে অর্থাৎ জীবনের প্রথম পর্বে মানিকের ব্যক্তিক সংকটই ছিল মুখ্য। এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের যথার্থ পথটি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। এটি শুধু মানসিক সংকটের ক্ষেত্রেই না, অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মানিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন, যেমনটা করেছে জগদীশ, সামষ্টিক সংকট নিরসনের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার সংকটেরই— তা মানসিক বা অর্থনৈতিক যাইহোক— সমাধান সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের যে-প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথম মুদ্রণকাল-নির্দেশক। মানিকের অধিকাংশ রচনাই প্রথমে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, যদিও পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি পরিবর্তন-পরিমার্জনা করেন, কিন্তু পত্রিকায় মুদ্রণের সঙ্গে রচনাকালের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ওই কালটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
'সরীসৃপ' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪০ সনের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।

২. 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৪০ সনের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪)।

৩. 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৪০ সনের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৯৩৩) মুদ্রিত হয়।

৪. *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি প্রথমে মুদ্রিত হয় 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস (মে ১৯৩৪) থেকে ১৩৪২ সনের শ্রাবণ মাস (জুলাই ১৯৩৫) পর্যন্ত। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের মে মাসে।

৫. *চিহ্ন* উপন্যাসটি প্রথমে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৩ সনের নববর্ষ সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯৪৬) মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে।

৬. 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৩ সালের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)।

৭. শৈলজ শিলা' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'গল্পলহরী' পত্রিকায় ১৩৩৯ সনের ভাদ্র সংখ্যায় (আগস্ট ১৯৩২)।

৮. 'মহাকালের জটার জট' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'দীপক' পত্রিকায় ১৩৩৯ সনের শারদীয় সংখ্যায় (অক্টোবর ১৯৩২)।

৯. *দিবারাত্রির কাব্য* প্রথমে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৯৩৪) থেকে পৌষ মাস (ডিসেম্বর ১৯৩৪) পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫এর ডিসেম্বরে।

১০. *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসটি প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে।

১১. *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি প্রথমে 'নগরবাসী' নামে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৯৪৮) থেকে ১৩৫৭ সনের আষাঢ় মাস (জুন ১৯৫০) পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫১র জুনে।

১২. *সার্বজনীন* উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর ১৯৫২)।

১৩. 'ফেরিওলা' গল্পটি প্রথমে মুদ্রিত হয় ১৩৫৮ সনের শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৫১)।

১৪. 'লাজুকলতা' গল্পটি প্রথমে মুদ্রিত হয় ১৩৫৯ সনের শারদীয় 'হিমাদ্রী' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৫২)।

১৫. 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় মানিক সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন ১৯৩৭ সালে এবং ওই চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি।

১৬. *সহরতলী* উপন্যাসের ১ম পর্ব প্রথমে সম্পূর্ণভাবে বের হয় ১৩৪৬ সালের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) এবং ২য় পর্ব বের হয় 'পত্রিকা' নামক সাময়িকপত্রে ১৩৪৬ সনের কার্তিক (অক্টোবর ১৯৩৯) থেকে ১৩৪৭ সনের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯৪০) পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে এ উপন্যাসের ১ম পর্ব বের হয় ১৯৪০ সালে এবং ২য় পর্ব বের হয় ১৯৪১ সালে।

১৭. 'ব্যথার পূজা' গল্পটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৯২৯)।

১৮. *তেইশ বছর আগে পরে* উপন্যাসটি প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে।

১৯. *ইতিকথার পরের কথা* প্রথমে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩৫৭ সালের মাঘ মাস (জানুয়ারি ১৯৫১) থেকে ১৩৫৮ সনের চৈত্র মাস (মার্চ ১৯৫২) পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে।

২০. *পুতুলনাচের ইতিকথা* প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৪১ সনের পৌষ মাস (ডিসেম্বর ১৯৩৪) থেকে ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাস (নভেম্বর ১৯৩৫) পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের প্রথমার্ধে।

২১. *সহরবাসের ইতিকথা* প্রথমে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৩৪৯ সনের শারদীয় সংখ্যায় (অক্টোবর ১৯৪২) সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে

২২. *অহিংসা* প্রথমে মুদ্রিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪৫এর মাঘ (জানুয়ারি ১৯৩৯) থেকে ১৩৪৭এর পৌষ মাস (ডিসেম্বর ১৯৪০) পর্যন্ত। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে।

২৩. *চতুষ্কোণ* প্রথমে মুদ্রিত হয় 'নরনারী' পত্রিকায় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) থেকে ১৩৪৮ সনের চৈত্র মাস (মার্চ ১৯৪২) পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২এর মে মাসে।

আক্রান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্য-সমালোচনা

সৌভিক রেজা

১.১ যুগান্তর চক্রবর্তী আমাদের বোধহীন অনুভূতিতে বোধকরি একটা ধাক্কা দেবার অভিলাষ নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'একজন লেখকের চেয়েও কিছু-বেশি এক প্রকার লেখক-মানুষ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। বড় মাপের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে আত্মসচেতনতা থাকাটাই তো স্বাভবিক ঘটনা— এই রকম একটা-কিছু মনে করেই যুগান্তর চক্রবর্তী জানান দিয়েছিলেন, মানিকের 'সমগ্রজীবনের রচনাও প্রকৃতপক্ষে এক দ্বন্দ্বময় লেখক-মানুষের আত্মচেতনার ইতিহাস'। উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা আর বোধের সেই উৎসারণ থেকেই হয়তো মানিক তাঁর প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলো লিখেছিলেন; যাকে অশ্রুকুমার সিকদারের কাছ থেকে ধার-করা ভাষায় বলা যায়, 'অবিশ্বাস্য ফলবান' সময়ের ফসল। কী আছে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেইসব রচনায়? মানিক তাঁর উপলব্ধি পাঠককে পাইয়ে দেবার কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর লেখক-সত্তার কতকগুলো মানসিক অভিজ্ঞতার নানান স্তর রয়েছে। একে মানবিক সম্পর্কের একটা ভাগাভাগির ব্যাপারও বলা যায় । যে-ভাগাভাগির কথা মানিক নিজেও নানাভাবে বলতে চেয়েছেন। তাঁর *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসেই তো মানিক লিখেছিলেন, যে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে 'দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে।' এই দাবি-প্রত্যাশা-ভাগাভাগি-কলহ-পুনর্মিলন নিয়েই মানিকের কথাসাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। সাহিত্যিক হতে হলে বাস্তব জীবনের মতো সাহিত্যকেও অবলম্বন করতে হয়— এই তথ্যটি মানিকের জানা ছিলো বলেই তাঁর রচনায়, চিন্তায়, ভাব-ভাষায়, রচনার আঙ্গিকে— কোথায়ও কোনোকিছুই নিয়েই তেমন বড়রকমের কোনো বাড়াবাড়ি নেই। এর আরো-একটি মূল কারণ হচ্ছে, মানিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র; শুধু ছাত্রই নয়, বলা উচিত নিজের ধরণে নিজস্ব-এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিলো। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানের চর্চা করতে না-পারলেও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁর রচনাকর্মকে বিশেষ-একটা মাত্রা প্রদান করেছে; যার কারণে ঔপন্যাসিক হওয়াটাই তাঁর জন্যে উচিত ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মানিকের মনে হয়েছিলো। তাছাড়া সাহিত্যিক হতে গেলে জীবনের মতো সাহিত্যিকেও অবলম্বন করবার কথা মানিকের যেমন মনে হয়েছিলো, তেমনি নিজের জানা-শোনার জীবন সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত করতে হয় তার কায়দা-কানুনের কথাটাও মানিক মাথায় রেখেছিলেন। শুধু সাহিত্যিক হওয়াই নয়, এসব ছাড়া সাহিত্য-সমালোচকও হওয়া যায় কিনা সে-বিষয়েও মানিকের ঘোরতর সন্দেহ ছিলো।

১.২ মানিকের এই সন্দেহটা যে অমূলক ছিলো না, তা মানিকের রচনাকর্ম নিয়ে তাঁর সমকালের সমালোচকদের সমালোচনার নিদর্শন থেকেও আমরা আঁচ পেতে পারি। বর্তমান প্রাবন্ধিক সেইদিকেই খানিকটা ইশারা দিতে চাইছেন। মানিকের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা আগেই বলেছি; এইটি তাঁকে ক্রমশ বস্তুবাদী চেতনার

দিকে শুধু যে নিয়েই গিয়েছে, তা-ই নয়, তাঁর সেই চেতনাকে প্রতিনিয়ত করেছে সমৃদ্ধ। সেইসঙ্গে মানিকের সাহিত্য-চেতনায় যোগ করেছে এমন-এক বাস্তবতাবোধ, যাকে আয়ত্ত করবার জন্যে মানিককে দীর্ঘসময় প্রস্তুতি নিতে আর পরিশ্রম করতে হয়েছে। শুধু মানিকের কথাই-বা বলি কেন? যে-কোনো সাহিত্যিকের বেলায়ই তাঁর নিজের পায়ে নিজের মতো করে দাঁড়াবার জন্যে এসবের কোনো বিকল্প নেই, থাকা উচিতও নয়। মানিকের সেইটি ছিলো বলেই তিনি তাঁর চারপাশের জগৎ-কে নানা রকমভাবে নতুন-নতুন করে বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। একে সুযোগ না-বলে বরং একধরনের যোগ্যতাই তো বলা উচিত আমাদের। সেই যোগ্যতার কারণেই মানিকের বাস্তবতাবোধ তাঁর কথাসাহিত্যে একটি নতুন শক্তি যুগিয়ে গিয়েছে। এই শক্তির রেশ তাঁর সাহিত্যে বরাবর অক্ষুণ্ন থাকলেও ভারসাম্যের বোধ অবশ্য মানিক শেষাবধি তাঁর রচনাকর্মে বজায় রাখতে পারেন নি। সেইটি অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। মানিক-সাহিত্যসমালোচনার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে অন্য-আরেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে দুটো কথা বলে নেয়া জরুরি। মানিক-রচনার প্রসঙ্গ উঠলেই বাস্তববাদ/ বাস্তববাদী— এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে আমাদের লজ্জে মোটেও আটকায় না। হাসান আজিজুল হককে সেলাম জানাতে হয়, কারণ তিনিই প্রথম এ-বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, মানিক যে একজন বাস্তববাদী লেখক— এইটা বলতে পারাটা একটা 'কুসংস্কারে' পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই মতামত মেনেও নিতে পারেননি; কারণ হিসেবে হাসান আজিজুল হক সোজাসাপ্টা জানাচ্ছেন, 'বাংলাসাহিত্যে অনেক অবাস্তববাদী লেখক আছেন এটা মেনে নেওয়া কঠিন।' কঠিন কেন? না, হাসানের কথাটা এখানে একটু তুলে দিচ্ছি যাতে করে পাঠকের বুঝতে একটু সুবিধে হয়। তিনি বলছেন, 'সব শিল্পী বাস্তবকেই প্রকাশ করতে চান, আরো জাজ্বল্যমান করে, আরো তীব্র করে, হয়তো-বা আরো বাস্তব করে। বাস্তবের পক্ষে আরো বাস্তব হওয়া সম্ভব নয়— সে যা আছে তাই, বেশিও নয় কমও নয়, শিল্পীই একমাত্র চেষ্টা করতে পারেন তাকে আরো বাস্তব করে তুলতে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো দু-দশজন কথাসাহিত্যিকের মতনই বাস্তববাদী লেখক, তাতে সন্দেহ নেই; তবে মানিকের বাস্তববাদের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা ও চেতনার যে ভারসাম্যের বোধ সেটি ছিলো সুবিন্যস্ত; সেইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মানসিক সমতার কথাও এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। আর এইসব কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য-দশজনের চেয়ে একেবোরেই স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে যান।

২.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯৪৪ সালে। কোন্ পার্টি? কমিউনিস্ট পার্টি— স্বপ্ন ভাঙে। বলা যায়, মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতাই মানিককে এই পার্টিতে যোগ দেবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। মানিক স্বীকার করেছিলেন, তাঁর রচনায় যে অনেক বিভ্রান্তি, মিথ্যা, অসম্পূর্ণতা রয়েছে এইটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর সাধ্যমত জানাশোনার পর থেকেই। মানিক মনে করতেন, 'দরকার হলে প্রলাপ শোনার ধৈর্যও মার্কস্‌বাদীর চাই। ...অবজ্ঞা অনুকম্পা বিরাগ বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ দূর করে দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে ভালোবাসতে হবে, এ দরদ না জাগলে বিচারবুদ্ধি, ধৈর্য, কৌশল কিছুই আয়ত্ত করা যাবে না।' কিন্তু এইসবের ছিটেফোঁটাও তিনি তাঁর সেই মার্কসবাদী দলের নেতাদের মধ্যে দেখতে পাননি। যে-কারণে নিজের পার্টি সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে মানিক তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: 'সোজা কথায় বলা যায়— The C.P.I. does not understand

the mind of India'। নিজের দল সম্পর্কে এইরকম রূঢ় সত্য কথা বলার মতো তাকত খুব কম মানুষের মধ্যেই থাকে। মানিক শুধু আত্মসচেতন সাহিত্যিকই ছিলেন না, একজন দৃঢ়চেতনাসম্পন্ন মানুষও যে ছিলেন, তাঁর সেই পরিচয় আমরা নানাভাবেই পেয়েছি। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে মানিকের এই মূল্যায়নকে আজ অসমদর্শী উপলব্ধি হিসেবে খারিজ করে দেবারও উপায় নেই। কারণ সেইসময়ের সাম্যবাদী আন্দোলন নিয়ে যিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন, সেই অনুরাধা রায় এই ২০০৮ সালে এসে আমাদের জানাচ্ছেন, 'একদিকে চিন্তাহীন যান্ত্রিক কিছু নীতি ও তা রূপায়ণে ঔদ্ধত্য এবং অন্যদিকে এক নিয়তিবাদী নিষ্ক্রিয়তা (সাম্যবাদ একদিন আপনা থেকেই আসবে যে!) ...কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মোটের ওপর একটা ভণ্ড ও সুবিধাবাদী চরিত্র দেয়। পার্টির এইসব দুর্বলতা তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে প্রতিফলিত হয়...শেষ-চল্লিশ থেকে সংকীর্ণ দলীয় তথা দলাদালির রাজনীতি ইউনাইটেড ফ্রন্টের অন্যান্য শিল্পীদের, পার্টির সহযাত্রীদের, এমনকি অনেক পার্টি সদস্যকেও এক এক করে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।' অনুরাধা রায় যে-যান্ত্রিক নীতির কথা বলেছেন, সেইটি কতোটা মারাত্মক ছিলো, তার কিছু নমুনা আমরা মানিকের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন যাঁরা সেই সময় করেছিলেন, তাঁদের সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। এইসব তাত্ত্বিক চেয়েছিলেন, মানিক তাঁর সাহিত্যিক-স্বধর্ম ভুলে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে জোড়াতালি দিয়ে মেলাতে চেষ্টা করুক, আর তাতেই ঘটবে প্রগতি সাহিত্যের উন্নতি! এই প্রচেষ্টার ফলাফল না-মানিকের, না-প্রগতি আন্দোলনের— কারো জন্যেই শেষ পর্যন্ত শুভ হয়নি। বরং দেখতে পাই, সময় যতই এগিয়েছে ততই মানিক তাঁর সাহিত্য বা রাজনীতি— কোনোটাকেই ঠিকভাবে নিজের আয়ত্তে আনা তো দূরের কথা, ঠিকঠাক মতোন তিনি মেলাতেও পারেননি। এতে করে, সাহিত্যকে যাঁরা সাহিত্য হিসেবেই বা জীবনের অনুধ্যান হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, সেই পক্ষকে যেমন তিনি অস্বস্তিতে ফেলেছেন; তেমনি সাহিত্যকে যারা সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ভাবতে পছন্দ করতেন, সেই প্রগতিশীলদেরকেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক-ঠিক সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। গোপাল হালদারের মতোন সাহিত্যিক— যিনি ছিলেন সি.পি.আই-এর তকমাধারী— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলেছেন :

> বহু শিথিল প্রয়োগ সত্ত্বেও 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। নৈসর্গিক সত্যের মতোই কৃচিৎ তাঁর আবির্ভাব এবং তর্কাতীত তার প্রকাশ। এ সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও অনেকেই জন্মেন না তবু 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশক্তিকে আর কিছু বলার উপায় নেই। তাঁর অশান্ত প্রাণশক্তি ও প্রাণঘাতী পরিণামের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হয়— এ শুধু প্রতিভা নয়, এ তাঁর প্রকৃতি। এই তাঁর নিয়তি। সেই সঙ্গে তাই এই কথাও মনে হয়— এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়।

গোপাল হালদারের এ-ও মনে হয়েছে যে, মধুসূদন ও নজরুলের মতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন 'বিদ্রোহী প্রতিভা'। আর সে-কারণে তাঁর 'আত্মনাশ ...আত্মপ্রকাশেরই প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ।' তাঁর মানে তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? মানিকের প্রতিভা কোনো-এক মহাশক্তির দান, যা কিনা সেই মহাশক্তির করুণাবশত মানিকের ওপর নাজেল হয়েছিলো! এবং মানিক নিজেও তাঁর সেই প্রতিভা বিষয়ে সচেতন ছিলেন না! যে-কারণে তাঁকে হাসপাতালে নেশার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে হার মানতে হয়। এইরকম নিয়তিবাদী-মার্কা বিশ্লেষণ কে করেছেন? করেছেন গোপাল হালদারের মতো

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক; এবং যিনি নিজেও একজন সাহিত্যিক! গোপাল হালদার যে-ভাষায় মানিকের সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর ব্যক্তিক পরিণতিকে বিশ্লেষণ করেছেন, মানিকের প্রপিতামহও সেই ভাষায় কথা বলতেন কিনা আমাদের সন্দেহ হয়! অন্যদিকে ভবানী সেনের মতো কুখ্যাত তাত্ত্বিক-নেতা মানিকের মৃত্যুর পরে বলছেন—

> দুঃসাহসী, বলিষ্ঠ, দুর্দম ইত্যাদি নানা বিশেষণ মানিক সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে লোকটি সেই 'অতসী মামী'র যুগের মুখচোরা কলেজের ছাত্রই রয়ে গেছে।

এ-কথার মানে দাঁড়াচ্ছে যে কথাসাহিত্যিক হিসেবে মানিকের মধ্যে কখনোই কোনো পরিপক্বতা আসে নি। আর সম্ভবত সেই কারণেই কোনোপ্রকার রাখঢাক না-রেখেই ভবানী সাহেব লিখেছেন, 'মানিকের কলকাতা শহরের যান্ত্রিক সভ্যতার কোন জ্ঞানই ছিল না। অনেক সময় অনেক শিশুসুলভ প্রশ্ন করত।' এই 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য' পাঠককে জানিয়ে দেবার পরে, মানিককে খানিকটা 'দয়া করে', ভবানী সেন তাঁকে কিশোর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার নমুনা—

> কিশোর মানিকের মনে পদ্মা এক গভীর ছায়াপাত করেছিল, অনেকদিন সেইভাবে সে আচ্ছন্ন ছিল।...সমালোচকরা যাই বলুন, আমার মতে 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিকের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। বিশ্বসাহিত্যের যে কোন দশখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

এইটুকুন বলেই ভবানীবাবুর বোধকরি মনে হয়েছিলো যে কথাসাহিত্যিক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খানিকটা বেশি উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন, তাই পরক্ষণেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে বলেছেন : মানিক 'সচেতন শিল্পী নয়, সে অচেতন শিল্পী, নিজেকে সে চিনতে পারেনি, চেনাতেও পারেনি।' আর অচেতন বলেই বোধকরি— ভবানী সাহেবের মতে— মানিক :

> জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখেছে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সোজা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে আগুনে— সেখানে সে জন্ম রোমান্টিক। তার রিয়ালিজমে তাই রোমান্সের খাদ মেশানো আছে। তার মত মানুষকেও জীবনের কুৎসিত বীভৎসতার হাত থেকে পলাতক হতে হয়েছে। কঠোর জীবনকে এড়িয়ে অদৃশ্যলোকে সিদ্ধিলাভ করলো মৃত্যুতে।

২.২ মানিক যে মদ্যপান করতেন, আর এইটেই তাঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ; কিন্তু পার্টির অনুশাসন মেনে চললে মানিকের এই দুর্দশা হতো না— এই কথাটিই গোপাল হালদার থেকে ভবানী সেন সকলেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কতোরকমভাবেই-না বলেছেন! আবার এইসবের পাশাপাশি ভবানী সেনের কণ্ঠ থেকে এই আফসোসও ঝরে পড়তে দেখা যায় যে, মানিক সত্যিকার-অর্থে খাঁটি কমিউনিস্ট-লেখক হতে পারেন নি, অথচ সেই শক্তি তাঁর ছিলো। যদি মানিক সেটি হতে পারতেন, তবে দেশবাসী তাদের এই প্রিয় সাহিত্যিককে মাথায় তুলে রাখতো (যেন এখন পায়ে ফেলে রেখেছে!)। অথচ মানিক সচেতনভাবেই যে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি সে-কথা বারবার বলে গিয়েছেন। প্রবন্ধের কথা না-হয় বাদ রাখি, মানিকের সাহিত্যকর্মই তাঁর সচেতন সাহিত্যিক-মানসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এতোটা প্রস্তুতি নিয়ে-আসা লেখকের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি-একটা আমরা পাই না। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের আদর্শ যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে গোপাল হালদার-ভবানী সেনদের মতো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনা করেন নি ঠিকই— কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই প্রচণ্ড মুখর ছিলেন।

জীবনের আদর্শ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও যে ভাবপ্রবণতার রেশ যে কারো-কারো জীবনে আমৃত্যু থেকেই যায়, গোপাল হালদার-ভবানী সেনরা তার উৎকৃষ্ট একটি নমুনা হিসেবে থেকে গেলেন! মানিক তাঁর প্রথমপর্বের সাহিত্যকর্মে কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শের কথা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন নি, সাহিত্যিক হিসেবে তা কতোটুকু তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, সেইটিও ভেবে দেখার মতোন। কারণ তিনি সাহিত্যিক ছিলেন, রাজনীতিবিদ নন। এইটি মানিক যতোখানি বুঝতেন, তাঁর সহযোদ্ধারা তার কণামাত্রও বুঝতে পারেননি বা বোঝবার চেষ্টাও করেন নি। আর ভবানী সেন? তাঁকে 'কুখ্যাত' আখ্যা দেয়াটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাচ্ছে কিনা সেটির বিচারের ভার পাঠকের দরবারে পেশ করলাম। কারণ তিনি যে শুধু মানিকের প্রতিই বিরূপ ছিলেন, তা-ই নয়; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মোহিনী মায়া' সম্পর্কেও তাঁর মার্কসবাদী বন্ধুদের সতর্ক করে দিতে এই সাম্যবাদী ভদ্রলোক—রবীন্দ্র গুপ্ত—এই ছদ্মনামে ১৯৪৯ সালে লিখেছিলেন :

> মার্কস্‌বাদীগণ এ বিষয়ে সচেতন নন, তাঁরা প্রগতির শিবিরকে রাবীন্দ্রিক মোহে আচ্ছন্ন রেখে শত্রুপক্ষের যাদু বিস্তারে সাহায্য করছেন, তাঁর আদর্শকে আক্রমণ করতে পারছেন না, কারণ সে আঘাত নিতান্ত অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্রনাথের গায়ে এসে লাগে। রবীন্দ্র-দর্শনই ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্র-দর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে মার্কস্‌বাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে প্রগতির শিবিরে তার স্থান হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই যাঁরা নিজেদের শিবিরে এতোটুকু স্থান দিতে নারাজ ছিলেন, তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'জীবন্ত কবর' দেননি—এই তো তাঁর জন্য অনেক বেশি দয়া করা! মানিকের 'দিনলিপি' পাঠ করেই আঁচ করতে পারা যায় যে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে এই লেখকের সম্পর্ক কতোখানি দোটানা অবস্থার মধ্যে ছিলো। এর অন্যতম প্রধান কারণ : মদ্যপানাসক্ত মানিকের অসুস্থতা বা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারটা, যা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রক্ষণশীল নেতাদের কাছে ছিলো একধরনের অস্বস্তিকর ঘটনা। পার্টির বলয়ের মধ্যে যে-সব কবি-সাহিত্যিকের বসবাস ছিলো, তাঁরাও বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মদ্যপানে আসক্ত মানিককে সেদিন খানিকটা এড়িয়ে চলতেন। এইসব কারণেই যুগান্তর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর আসক্তির কারণেই, তাই ...আমাদের কাছে ঠিক তেমন 'সম্ভ্রান্ত' নন।'

৩.১ আজ এতো বছর পরে এসেও নানাভাবে তাঁর অসুস্থতার পাশাপাশি নেশার প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসক্তির কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়। অথচ ঠিক সেইভাবে বলা হয় না তাঁর জীবন-সংগ্রামের কথা বা তাঁর আশেপাশের লোকজন, প্রকাশক, এমনকি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এই লেখকের প্রতি কীরকম বিরূপ আচরণ করেছে— সেইসব ইতিবৃত্ত। প্রয়াত ধনঞ্জয় দাশ মানিকের 'ভারতের মর্মবাণী' শীর্ষক প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মার্কসবাদী সাহিত্য শিবিরে তিনি [মানিক] এক বিরল ব্যতিক্রম। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনই তাঁকে শিখিয়েছিল সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার পথে নিজেকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে।' ধনঞ্জয় দাশের মন্তব্যের পাশাপাশি এখানে যুগান্তর চক্রবর্তীর মন্তব্যটিও আমরা এখানে যোগ করতে চাইছি। তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের প্রধান লেখকদের মধ্যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরে, কিন্তু

একমাত্র তাঁরই সঙ্গে এই যোগাযোগ সংঘের অন্তিমকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে।' কিন্তু এসবের বিপরীতে মানিকের প্রতি তাঁর পার্টির আচরণ কেমন ছিলো, তার খানিকটা বাস্তব নমুনা আমরা পাই ধনঞ্জয় দাশের মাধ্যমে; তবে তাঁর তথ্যের উৎস হচ্ছে— চিন্মোহন সেহানবীশের প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের 'আত্মসমালোচনামূলক একটি প্রতিবেদন'। এইটি তৈরি করা হয় ১৯৫২-৫৩ সালে; এবং তা 'আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত'। ঐ 'অপ্রকাশিত প্রতিবেদন' থেকে (অবশ্যই চিন্মোহনের সৌজন্যে প্রাপ্ত) জানা যায়—

> কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের অনুসরণে পশ্চিমবঙ্গের...কাকদ্বীপ, বুধাখালি ও বড়াকমলাপুরের সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রাম এবং তার বিরুদ্ধে তৎকালীন কংগ্রেস-সরকারের দমন-পীড়ন...এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র কমিউনিস্ট সদস্যরা... ঠিক করেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়াকমলাপরে পাঠাবেন। মানিকবাবুও...যেতে রাজি হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যান নি সেখানে।...এই 'অপরাধে'র জন্য তাঁর কাছে ... কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মানিকবাবু জবাবে বলেন, 'এভাবে গেলেই আমি ভালো লিখতে পারব এমন ধারণাকে...যান্ত্রিক মনে করি।' চিন্মোহন সেহানবীশ মানিকবাবুর জবাব শুনে বলেন, 'বড়াকমলাপুরে তাঁকে লেখার উন্নতি করতে পাঠনো হচ্ছে না, এই মুহূর্তে তিনি কি লেখেন বা না-লেখেন তাই নিয়ে আমরা ব্যস্ত নই, কমিউনিস্ট হিসেবেই তাঁকে সেখানে যেতে হবে।'

এই উপমহাদেশের, বিশেষ করে, বাংলা দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রভাব কতোটা যে সামান্য— উপরের প্রতিবেনটি তার অদ্ভুত নিদর্শন হয়ে থাকবে আমাদের সাহিত্যের ও রাজনৈতিক ইতিহাসে। নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নিজেদের সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রেও এইসব উচ্চ পর্যায়ের নেতা যুক্তিবাদকে প্রায়-বর্জন করেছিলেন। এবং যা গ্রহণ করেছিলেন, সেইটি আপাতদৃষ্টিতে বৈপ্লবিক মনে হলেও, আসলে তা একপ্রকার ভাববাদ আর সুবিধাবাদের মিশেল, যা কিনা দলের ভিতরে নিজের-নিজের অস্মিতার নীতি বজায় রাখার জন্য একধরনের ছল-চাতুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩.২ শুধু ভারতের বা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিই নয়; ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, লেখক-শিল্পীদের প্রতি সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মনোভাব কম-বেশি এইরকমই। খোদ লেনিনই যখন তাঁর পার্টির ছাতার নিচে বসবাস করেন না— এমন সাহিত্যিকদের নিপাত কামনা করেন, তখন অন্যদের কথা আর বলে কী হবে! লেনিন টলস্টয়কে 'রাশিয়ার বিপ্লবের আরশি' বলেছিলেন— এইটুকুর জন্যেই আমাদের দেশের লেনিনবাদীরা খুশিতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকেন, যেন তাঁদের এই নেতা কতোই-না রুচিমান! কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁরা এইটা বলতে ভুলে যান যে 'মহান' লেনিন তাঁর পার্টির নেতা-কর্মীদের প্রতি সাহিত্য বিষয়ে ফতোয়া জারি করেছিলেন এইরকম ভাষায় :

> Today literature, even that published legally, can be ...party literature. It must become party literature...It is not simply that, for the socialist proletariat, literature cannot be a means of enriching individuals or groups; it cannot, in fact, be an individual undertaking,independent of the common cause of the proletariat. Down with non-partisan writers! Down with literary superman! Literature must become part of the common cause of the proletariat, ...Literature must become a component of organised, planned and integrated Social Democratic Party work.

আমাদের প্রগতিবাদী তাত্ত্বিক, সাহিত্যিকরাই শুধু নন; এমনকি প্রগতিতে আস্থাজ্ঞাপনকারী প্রকাশকরাও মানিককে কম হেনস্তা করেন নি। সেই কারণেই অনেকটা বাধ্য হয়ে প্রগতিবাদী-একজনকে (যার নাম-ঠিকানা যুগান্তর চক্রবর্তী গোপন রেখেছিলেন) মানিক চিঠি লিখেছিলেন এইভাবে :

> প্রগতি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কয়েকজনকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে আমি সত্যিই ঠকেছি। যুদ্ধের বাজারে আমার আগেকার প্রকাশকদের চটিয়ে এঁদের বই দিয়েছি— তারা আরও বেশি রয়ালটি দিতে চাওয়া সত্ত্বেও! তার ফলে মার খেয়েছি, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক হিসাবে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়েছে।...সামান্য কিছু রয়ালটি পাইয়ে দিয়ে আমার বইখানা যেন প্রগতির স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত বঞ্চনার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে।

ঐ একই চিঠিতে তাঁকে বেশ কড়া-ভাষায় বলতে হয়েছে, 'একটা কথা মনে রাখবেন যে বইখানা বেঙ্গল পাবলিশার্সকে দিয়েছিলাম— নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম। ...বইখানা আপনাদের যে কেন দিয়েছি সেটা যেন ভুলবেন না! লোকসান হোক— সেটা যেন ফাঁকিবাজির পথে না হয়।' এর পরপরই মানিক যে-কথাটি লিখছেন, সেটা থেকে তাঁর মনোজগতের একটা চেহারা, আবছা হলেও, আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, 'জীবনে এ পর্যন্ত অনেক লোকসান দিয়েছি— আরও অনেক লোকসান দিতেও প্রস্তুত আছি— কিন্তু ঠকতে আমি রাজি নই!' ভাবা যায় কতোটা আত্মপ্রত্যয় ছিলো এই মানুষটার মনের গহনে! তারপরেও কী লেখক হিসেবে, কী মানুষ হিসেবে পদে-পদেই তাঁকে কিন্তু ঠকতেই হয়েছে। আমাদের তাত্ত্বিক দরকার, পার্টি দরকার, প্রকাশক দরকার; শুধু দরকার নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ আর সাহিত্যিকের! তুর্গেনেভের (Ivan S. Turgenev; 1818-1883) *Fathers and Sons* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাজারভ (Bazarov) যেমন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলো, তাকে রাশিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই—

> Russia needs me, indeed? Evidently she does not need me. whom, then, does she need? She needs shoemakers, tailors, butchers...What does a butcher sell? He sells meat.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেধা-রক্তে-ঘামে লেখা বইগুলো নিয়ে একশ্রেণীর কসাই-মার্কা প্রকাশক অর্থ উপার্জন করে গিয়েছেন, আর লেখককে সারাজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে, অসুস্থতার সঙ্গে। সঙ্গত কারণেই যুগান্তর চক্রবর্তী একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির শেষ চার-পাঁচ বচরের লেখায় তাঁর অতি-ব্যক্তিগত জীবনের যে-প্রসঙ্গগুলো ক্লান্তিহীন ধ্রুবপদের মতো ঘুরে-ঘুরে দেখা দেয়, তা অসুখ, আসক্তি ও দারিদ্র্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে অনেকেই জানতেন এবং আজ প্রায় সকলেই জানেন যে তিনি মদ্যপান করতেন।...এবং যে-কথা সকলেই জানতেন ও জানেন কিন্তু যথাসময়ে ভুলে যান তা এই যে, তিনিই ছিলেন এ-দেশের দরিদ্রতম লেখক।

৪.১ আবার অন্যদিকে, মতাদর্শগত দিক থেকে বিপরীত-দিকে অবস্থান করেও, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মননশীল লেখক, কী অদ্ভুতভাবেই-না গোপাল হালদারের সঙ্গে অনেকটাই সহমত পোষণ করে মানিকের প্রতিভাকে 'স্বভাবসিদ্ধ' বলে

রায় দিয়েছিলেন। এমনকি মানিকের কৃতিত্বকে এক ধরনের 'অশিক্ষিতপটুতা' বলে সন্দেহ প্রকাশ করতেও তিনি এতোটুকুনও দ্বিধা করেননি। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মুঠো শক্ত করবার শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ছিলো না বলেই—

> মানিকলালের চৈতন্য মার্জিত নয়— নচেৎ 'পদ্মানদীর মাঝি','কুষ্ঠরোগীর বৌ'-এর মতন লেখায় তাঁর ইউটোপিয়া-প্রীতি সংযত হতো, বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে 'অহিংসা'য়। তাঁর রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে। প্রমাণ? 'কেরানীর বৌ', 'সহরতলী', 'পুতুলনাচের ইতিবৃত্তে'র একাধিক অংশ, 'টিকটিকি', 'সিঁড়ি'।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই মতের সঙ্গে অনেকখানি একমত হয়ে বুদ্ধদেব বসুও সায় দিয়েছিলেন এই বলে যে, মানিকের 'রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না'। তারপরেও বুদ্ধদেব বসু সততার সঙ্গে এইটা কিন্তু স্বীকার করেছিলেন, 'মানিকের সাহিত্যে...অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই, হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা— এই সব ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়...কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়।' শুধু এইটুকু বলেই থামেননি তিনি, সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু অকুণ্ঠভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মধ্য-বিশ-শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই যে একই সঙ্গে দু-রকম মনোভাব পোষণ করা— এটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য-পিপাসু' বুদ্ধদেবকে কতোটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন। আবার আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে এইটিও খেয়াল করি, মানিক যে 'সচেতন সাহিত্যিক' ছিলেন না, সেই বিষয়ে গোপাল হালদার-ভবানী সেন আর তাঁদের মতাদর্শের বিপরীতে দাঁড়িয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ-বুদ্ধদেব বসু— সবাই এক কাতারে মিলে যান! এমনকি জীবনানন্দ দাশ-এর মতো উপেক্ষিত সাহিত্যিকও 'হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি' খেতে-খেতেই কিছুমাত্র দ্বিধা না-করেই বলেছিলেন :

> His(Manik) 'Putul Nacher Itikotha' on a careful first reading does not appear to have the impact of anything more than a highly successful story.

শুধু কী তা-ই? অনেকটা হিসেবি-সমালোচকদের মতো করে কায়দামাফিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে মেনে নিয়েও, জীবনানন্দ দাশ পাঠককে যেন সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন এইরকম ভাষায়—

> Manik's `Padma Nadir Majhi', however is a more weighty novel. But it must not be aligned with the greatness of novels such as 'War and Peace', 'Crime and Punishment', 'Ulysses', Joseph and his brother' and the like.

জীবনানন্দ দাশ যেভাবে টলস্টয়, ডস্টেয়ভস্কি, জয়েস, টমাস মানের উপন্যাসের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন, তার প্রত্যুত্তরে শুধু একটি প্রশ্নই করা যেতে পারে, সেটি হচ্ছে যে-উপন্যাসগুলোর কথা তিনি তাঁর আলোচনায় বলেছেন, সেগুলোকে সমগোত্রের উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারা যায়? অর্থাৎ *War and Peace* যে-মাপের এবং যে-মানের উপন্যাস, *Crime and Punishment* কি ঠিক সেই একই গোত্রের উপন্যাস? আবার প্রথমোক্ত দুটোর সঙ্গে জয়েসের *Ulysses*-এর কোনো তুলনা চলে কিনা— সেই বিষয়েও তো নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। উপন্যাসের কি কোনো নির্দিষ্ট

'ছক' রয়েছে? বা কাকে আমরা উপন্যাস বলবো? সেই বিষয়েও কি কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম রয়েছে? বা কেউ কি সেই নিয়ম মেনে উপন্যাস লেখেন? জীবন সম্পর্কে আমরা কতো কথাই-না বলি, তেমনি মানুষ সম্পর্কেও। কিন্তু কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, জীবন কাকে বলে? কিংবা কাকে বলে মানুষ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হোঁচট খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। মহাপ্রভু যীশুকে যখন রোমান গভর্নর পিলেত, যিনি কিনা যীশুকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সত্য কাকে বলে? যীশু তখন নিরুত্তর ছিলেন। কেননা তিনি এইটুকু অন্তত সেই শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হবার আগে এইসব বিষয় নিয়ে কিছু বলা মানেই অবান্তর কথা বলা ছাড়া তা আর অন্য কিছুই নয়। তেমনি সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, কাকে বলে কবিতা বা উপন্যাস– তার অবস্থা কী হতে পারে সেইটি সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি। টলস্টয়ের হাজার পৃষ্ঠার *যুদ্ধ এবং শান্তি* (War and Peace) যেমন উপন্যাস তেমনি তুর্গেনেভের *বাবুদের বাসা* (A Nest of the Gentry)ও উপন্যাস; অথচ *ইভান ইলিচের মৃত্যু* (The Death of Ivan Ilych) কিন্তু উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথের *গোরা* যেমন উপন্যাস তেমনি আবার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের *আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি*ও উপন্যাস। দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাস আবার ওই একই লেখকের *আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে* সেটিও উপন্যাস। ৯৫ পৃষ্ঠার মধ্যেই বেকেটের (Samuel Beckett) চারটি উপন্যাসিকা (Four Novellas) সেঁটে দেয়া হয়েছে, তাদের একটিকেও 'গল্প' বলা হচ্ছে না। তবে কিসের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করবো আমরা? উপন্যাসের আঙ্গিকের এই আনম্যতাকে বুঝতে পেরেই ভার্জিনিয়া উলফ (Virginia Woolf) জানিয়েছিলেন, উপন্যাস হচ্ছে 'most pliable of all forms'; অন্যদিকে ঈগলটন (Terry Eagleton) সাহেবও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন, 'The truth is that the novel is a genre Which resists exact defination.'। বরং সেই ইচ্ছা মুলতুবি থাক। আর এরই সূত্র ধরে আরো একটু এগিয়ে এসে অশ্রুকুমার সিকদার বলতে পারেন, 'উপন্যাসশিল্প ঔপন্যাসিককে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, একেবারে নিজের মতো করে উপন্যাস লিখবার স্বাধীনতা।' সেই কারণেই এইভাবে বলা উচিত হবে না যে *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *পদ্মানদীর মাঝি* ভালো উপন্যাস কিন্তু তা জয়েসের *Ulysses*-এর মতো নয়। কেননা পাল্টা যুক্তি দিয়ে তো পাঠকও বলতে পারেন, *War and Peace* বা *Ulysses* বা *Crime and Punishment* অথবা *Joseph and His Brothers* ভালো উপন্যাস বটে কিন্তু তারা *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *পদ্মানদীর মাঝি*র মতো নয়!

৪.২ একদিকে গোপাল হালদার-ভবানী সেন অন্যদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ-বুদ্ধদেব বসু— এই দু'পক্ষের মধ্যে নিজের অবস্থান অটুট রেখেও যিনি মানিকের রচনার সমালোচনায় একটা ভারসাম্য-অবলম্বী বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, তিনি হলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। 'সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> নালিশ শোনা যায় যে মানিক বাঁড়ুয্যের সাম্প্রতিক লেখায় সেক্স এবং সেক্স-ঘটিত মনোবিকারের বড়ো বাড়াবাড়ি। কথাটা যদি বাজারে চলতি বা চলতি হবার উমেদার কোনো লিখিয়ে সম্বন্ধে উঠতো তাহলে ভাববার কিছু ছিলো না।...অথবা ধরে নিতে পারতাম যে খোদ লেখকের মনটাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কিংবা 'সহরতলী'র রচয়িতাকে তো এতো সহজে বরখাস্ত করে দেওয়া যায় না। এই তিনটে উপন্যাস এবং কয়েকটি ছোটগল্পে দেখেছি তাঁর মনের সুস্থ মাত্রাজ্ঞান ও

তীব্র সংবেদনশীলতা, তাঁর টেকনিকের মজবুত গাঁথুনি, তাঁর ভাষার নিপুণ গৃহিণীপনা। এ-ও দেখেছি যে তাঁর সবচেয়ে খুঁতখুঁতে সমালোচক তিনি নিজেই। এমন একজন লেখক নিছক খেয়ালের বশে কিংবা বাজারের ফরমায়েশে একটা-কিছু নিয়ে মাতামাতি করবেন এটা কোনো কাজের কথা নয়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব যে-সহানুভূতির সঙ্গে এই সমালোচনা করেছিলেন, সেইটি মানিকের সহযোদ্ধাদের মধ্যেও কখনো দেখা যায় নি; আরো একটি বলার ব্যাপার তা এই যে আইয়ুবের এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল মানিকের জীবদ্দশাতেই। যে-ধরনের সমালোচনা একজন লেখকের জন্যে আরোগ্যস্নানের সমতুল্য, আইয়ুবের লেখাটি ছিলো ঠিক সেইরকম আয়ুর্বেদ। 'শনিবারের চিঠি'র 'কুখ্যাত' সম্পাদক সজনীকান্ত দাস পর্যন্ত মানিক সম্পর্কে 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছিলেন :

> তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ...ধারের কথা পণ্ডিত ও রসিকেরা বিচার করিবেন। আমরা শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে,...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃপক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যে নিজের লেখার সবচেয়ে খুঁতখুঁতে সমালোচক ছিলেন— আইয়ুবের সেই বক্তব্যের অভ্রান্ততার একটি নিদর্শন পাই আমরা সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'তে। আবার লেখকের মৃত্যুর পরে এই সজনীকান্ত দাসই (যিনি ছিলেন আধুনিক সাহিত্যিকদের চক্ষুশূল!) সর্বপ্রথম অত্যন্ত যত্ন আর পরিশ্রমের সঙ্গে মানিকের একটি 'গ্রন্থপঞ্জি' প্রস্তুত করেছিলেন। অথচ কী সাহিত্যিক কী রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে এই দুজনের মধ্যে কতোই-না তফাৎ! যুগান্তর চক্রবর্তী এ-বিষয়ে পাঠকদের জানিয়েছেন—

> গ্রন্থকার হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম আবির্ভাবের বছর থেকে...১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর কোনো গ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল-সম্পর্কিত তথ্যাদির নির্দেশ নেই। সংশিষ্ট প্রকাশকদের খাতাপত্র দেখে সজনীকান্ত যে-তথ্য উদ্ধার করেছেন, অধিকতর নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো সূত্রের অভাবে, তা বাধ্যতই প্রামাণিক বলে মেনে নিতে হয়।

যুগান্তর চক্রবর্তী সেইসঙ্গে এই তথ্যটিও উলেখ করতে ভোলেন নি, 'সজনীকান্ত দাস-কৃত উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় গ্রন্থ-সম্পর্কে আনুপূর্বিক তথ্য-সংকলনের প্রথম তথা প্রাথমিক প্রয়াস— সজনীকান্তের উদ্যোগ ছাড়া বহু তথ্যই এতদিনে বিলুপ্ত হতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি রচনার পরবর্তী প্রয়াসমাত্রই সজনীকান্ত থেকে শুরু হতে বাধ্য।' সজনীকান্ত দাসের পাশাপাশি আরেকজনের নাম এখানে উল্লেখ করাটা ঐতিহাসিক কারণেই অত্যন্ত জরুরি, তিনি হলেন বাংলা কথাসাহিত্যের আরেকজন প্রধান ব্যক্তিত্ব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; যিনি মানিকের হাসপাতাল-বাসের সময় তাঁর সঠিক চিকিৎসার যাতে কোনোরকম ত্রুটি না-হয়, সেজন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছেন। ইসলামিয়া হাসপাতালের শয্যায় বসে উদ্বিগ্ন মানিক তাঁর ডায়েরি'তে লিখেছেন :

> সেমি-জেল কন্ডিশনে কিছুদিন থাকতে হবে— কাকাবাবুর বিশেষ অনুরোধ। তাড়াতাড়ি যেন হাসপাতাল থেকে বিদায় না নিই। সে তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপার কি? ব্যবস্থা কি হল সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারলাম না— ন'দিন কেটে গেছে । দায়িত্বশীল কোন কমরেড উঁকিও মারলেন না ...এক তারাশঙ্কর ছাড়া সাহিত্যিকেরা কেউ দেখা করতে আসে না কেন? এমন কি পার্টির কবিলেখকেরা পর্যন্ত? ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে।

৫. কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে সম্যকভাবে বুঝে নেবার তাগিদ থেকেই আমাদের সাহিত্যের দুই বিরোধী শিবিরের মানিক-মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি নতুনভাবে বুঝে নেয়াটা জরুরি বলে আমরা মনে করেছি। কারণ, মানিক-সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুই ধারা আজো প্রধান সঞ্চালকের ভূমিকায় ক্রিয়াশীল। সেইসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, সেটি হচ্ছে, যাকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি, সেইটি আসলে কী ধরনের বস্তু? তা একেবারেই বায়বীয় কী? মানিকের সাহিত্য-সমালোচনার যে-ধারা আমরা লক্ষ করলাম, তা থেকে আরো-একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে 'সাহিত্য-সমালোচনা'-র মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের তাবৎ জাঁদরেল-সমালোচকেরা পাঠককে অনেক কিছুই বোঝাতে চেষ্টা করেন বটে, আদতে তাঁরা কিছুই বোঝাতে পারেন না, তাঁদের কথাও কিচ্ছুই বোঝা যায় না। আত্মসচেতন লেখকের ভরসার একমাত্র জায়গা অন্বিষ্ট পাঠকের সহৃদয় মন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান যে ঠিক সেইখানে— তাঁর জন্মশতবর্ষে এ-কথা আমরা নিশ্চিতভাবেই বুঝে নিতে পারি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নভূমি

হরিপদ দত্ত

গতকাল থেকে আজকের দিনটিতে যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ভূগোল লেখালেখি করেছেন কিংবা করছেন, তাদের কারো-কারো দর্শন দৃষ্টিকোণ নিয়ন্ত্রিত হয় জোর-জবরদস্তির রাষ্ট্র এবং শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শে। সেই ভাবাদর্শ রাষ্ট্র আর রাজনীতি থেকে ব্যক্তি-মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং ব্যক্তির চোখ থাকে মাটির বদলে আকাশে। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তারা আকাশ দেখে, মইটা যে মাটিতে ভর করে আছে তার অবস্থানটা টেরই পায় না। তারাই কিনা তথাকথিত গবেষক সেজে সাহিত্য সমালোচনার নামে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রচনা করে দাবি করে— এটা এই, উনি এই— এ যেন অলঙ্ঘনীয় ঈশ্বরের বাক্য। তারা যখন দেখতে পায় রাষ্ট্র যারা শাসন করে না, বরং তারা শাসিতদের নিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করছেন, তখনই ভয়ে চমকে ওঠে এবং চেষ্টা করে কোন সূত্রে ফেলে ওসব সাহিত্যকে বাতিল করা যায় কিনা। রাষ্ট্রের জটিল ভয়ংকর বাস্তবতা, জীবনের নির্মম-নিষ্ঠুর বাস্তবতাপূর্ণ সাহিত্যকর্ম দেখে জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা লেগে যায়, লেখকের চরিত্র হননে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটার কথাও নয়। মধ্যবিত্ত আর কমিউনিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট নন এই চাতুর্যপূর্ণ বিতর্ক আজো চলছে। তাঁর সাহিত্যের চেয়ে তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে— মৃগী রোগ, মদ্যপান, পার্টির সঙ্গে দ্বন্দ্ব। তাই সাধারণ পাঠক শ্রেণীর কাছে মানিক যতটা অস্বীকৃত, ঠিক ততটা স্বীকৃত তথাকথিত গবেষকদের কাছে। গাড়ির টায়ার সারাইকারী বালকেরা যেমনি টায়ারে ছিদ্র খোঁজে, জুতো পালিশকারী যেমনি পথচারীর মাথার বদলে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে চটকে যাওয়া রঙের জুতোর সন্ধানে, মলম বিক্রেতারা যেমনি যাত্রীদের শরীরে ঘা, খোস-পাঁচড়া তালাশ করে, আমাদের লেখকদের মধ্যেও অনেকে মানিককে নিয়ে তাই করে। না করে উপায় থাকে না ওদের। নিজেদের ভাণ্ডার যে শূন্য।

কেন এমনটা করে? করে এই কারণে যে, অলঙ্ঘনীয় পর্বতের মতো পাঠকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানিককে না সরালে আপন মুখখানা যে দর্শকের চোখেই পড়ে না। কিন্তু ওরা এটা ভাবে না যে, রাখাল বালকেরা খেলাচ্ছলে যতই ধাক্কা দিক হিমালয়কে, পর্বত তো নেপাল ছেড়ে চীনে ঢুকে পড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে না। আমি একজন অতি নগণ্য লেখক হিসেবে বলতে চাই, মানিককে ছোটো করার কিংবা বাতিল করার হাস্যকর পণ্ডশ্রম বাদ দিয়ে নিজের লেখাটি লিখুন, এতে মানিকের চেয়ে লাভ আপনাদেরই অধিক।

বলছিলাম সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা। ফ্রয়েড খুব সমান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন জীবন বাস্তবতাবাদী কথাকার মানিকের ওপর। মানিক ফ্রয়েডকে নিয়ে কৌতূহলী খেলা খেলেছেন প্রথম জীবনে এবং যথা সময়ে সেই কৌতূহল থেকে দূরে

সরেও গেছেন। অথচ আমাদের মানিক গবেষকেরা মানিক সাহিত্যে কেবল ফ্রয়েডকে দৌড়ে বেড়িয়েছেন। কেন না পাঠকের বদলে তাদের নিজেদের কাছে মানিকের ছায়ার ফ্রয়েড বেশ উপভোগের বিষয়। তাই তাদের লেখায় বারবার মানিকের বদলে ফ্রয়েড যেন শীৎকার করে ওঠেন। আমি এই লেখায় মাত্র একটি গল্পে দেখাতে চেষ্টা করব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিগমন্ড সাহেবকে নিয়ে কী খেলাটা খেলেছেন।

হ্যাঁ, সেই গল্প, মানিক নিন্দুকদেরও দারুণ উপভোগের গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। গৌতম বুদ্ধ একেই বলেছেন মানুষের পক্ষে প্রায় অলঙ্ঘনীয় দুঃখের কারণ। ইন্দ্রিয়জাত সম্ভোগ। স্পর্শে জাগ্রত হয়, পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্পর্শকাতর এই আদিম অভিঘাত। যৌনক্ষুধা। ফ্রয়েডের দাবি উদর ক্ষুধার চেয়েও যৌনক্ষুধা অদমনযোগ্য। অবশ্য কার্ল মার্কস তা স্বীকার করেন না। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞানবার্তা এই, জন্তুদের একদল বিবর্তনবাদের ফাঁদে পড়ে দু'ধাপ এগিয়ে মানুষ হয়ে গেছে, বাকিরা পেছনে পড়ে যথাপূর্বং তথাপরং। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ জিন খুব একটা বিবর্তিত হতে পারেনি বলেই জরা আছে, মৃত্যু আছে এবং সঙ্গে আছে প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তির বিষয়ের আড়ালে মানুষের যে আদি বিচ্ছিন্নতা, যা হতে পারে অস্তিত্বের, আত্মপরিচয়ের, সভ্যতার এবং ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার, সেই কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাকে নিয়ে চমকিত ভয়ংকর খেলা খেলেছেন মানিক 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে। যৌনতাকে মানিক প্রধান করতে চেয়েছিলেন কিনা, গল্পের বয়ানে লেখক-ভাষায় যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তা নিয়ে আজকের দিনে তুমুল তর্ক হতে পারে। এ তর্কে এমনও হতে পারে লেখক মানিক হেরে যেতে পারেন আপন সৃষ্ট শিল্পেরই হাতে। মানিকের অজ্ঞাত অন্য মানিক তার চেতনা থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে। ওই যে বলা হয় লেখক সত্তার আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে যে অন্য লেখকসত্তা, তা লেখক নিজেও জানেন না। তাই কালজয়ী সাহিত্যের স্রষ্টারা কোনো কোনো সময় নিজের সৃষ্টির সামনে নিজেই শিশুর মতো ভেবাচেকা খেয়ে যান এবং তারা তখন আত্মপ্রশ্ন— সত্যি এমনটা লিখেছি?

তো, মানিক কী লিখেছেন ওই গল্পে? এর আগে জানাজানি জরুরি কখন লিখলেন এ গল্প? সময়টা ১৯৩৩। ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে স্বাধীন হতে চাচ্ছে ঔপনিবেশিক বন্দিদশা থেকে। চলছিল অহিংসার পাশাপাশি বিপ্লবী সশস্ত্র লড়াই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তখন চরমে। চলছে সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ গণহত্যা। অন্যদিকে ইউরোপ তৈরি হচ্ছিল মহাযুদ্ধের জন্য, ঔপনিবেশিক বাজার নিয়ে দানব-দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শান দিচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করে ফেলে ততদিনে। পরাধীন জাতি খোঁজে আত্মপরিচয় যা সে হারিয়েছে পলাশী প্রান্তরে। অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন জাতি, যাকে উপনিবেশ করে রেখেছে আদিম বর্বর, সে চায় সভ্যতার কাছে ফিরে যেতে, বেরিয়ে আসতে চায় আত্মগোপন থেকে। এসব চাপ অবশ্যই 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের লেখক মানিক অনুভব করেছিলেন। পার্টির সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হওয়া তারই প্রমাণ। এ গল্প তো কমিউনিস্ট মানিকের প্রস্তুতি পর্বের ফসল।

মানিকের গল্পের ভিখু আর পাঁচী চরিত্র তো প্রপঞ্চ-পাপেরই প্রতিকল্প। গল্পে মানিক ডাকাত ভিখুকে দিয়ে একটি হত্যাকাণ্ড না-ঘটালে সাম্রাজ্যবাদের সেই অন্ধকার উপনিবেশটির খননকার্য করতে পারতেন কি? এখানে মানুষ তার সমস্ত উচ্চতর মানবিক গুণাবলি হারিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত পশু হয়ে যায়। ক্ষুধা আর যৌনতা ভিন্ন জীবনের অন্য ব্যাখ্যা সে হারিয়ে ফেলে। পেছেনে আলো ফেলে অন্ধকারে পলায়ন করে সে।

আত্মপরিচয় বিচ্ছিন্ন করে মানুষ পলাতক জীবনের বর্বরতা— হিংস্রতার ভেতর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে। সবই এই ঔপনিবেশিক বর্বরতারই ফল। ওই যে ঔপনিবেশিক অন্ধকার জগৎ এবং তার ভেতরও পশুর প্রাণ রক্ষার মতো বাঁচার প্রেরণা, তা তো অধীন জাতির জীবনের বাস্তবতা। তাই তো খুনি-ডাকাত, অন্যকে যে খুন করে সেও বাঁচতে চায় সভ্যতা বিবর্জিত আদিম জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে, আত্মগোপন করে। কাঁধে রক্তাক্ত আঘাতের ক্ষত নিয়ে অরণ্যচারীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায় সে। এ হচ্ছে চার্লস ডারউনের অস্তিত্বের লড়াই। লেখক বলছেন, 'ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল ...তৃষ্ণার পীড়ন ...অসহ্য ক্ষুধা ...সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না, সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।'

আমরা পাঠকমাত্র চমকে উঠি। বনের পশু আর পতঙ্গের সঙ্গে বসবাস করলেও সে যে পশু নয়, বরং মানুষ, ভিখুর এই উপলব্ধি আমাদের ভাবিত করে। ভিখুর এই আত্মআবিষ্কার, এবং অস্তিত্বের সংগ্রাম তাকে উচ্চতর প্রাণীর মর্যাদা এনে দেয়। গল্পে দেখা যায়, বন থেকে একদিন ভিখু বেরিয়ে আসে এবং পেহলাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এ যেন গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষের সভ্যতার আশ্রয়ে ফেরা। তারপর ওই যে তার একলা বাড়িতে পেহলাদের বৌয়ের হাত চেপে ধরা, এটাকে আমরা কি নিছক প্রবৃত্তির তাড়না বলব? নিশ্চয়ই তা নয়। এর পেছনে কাজ করেছে ভিখুর সেই উপলব্ধি— সে যে বঞ্চিত মানুষ। মানুষ যেমন নিঃসঙ্গ প্রাণী নয়, তেমনি নিরানন্দের বাসিন্দাও নয়। সে সামাজিক প্রাণী তো বটেই, হৃদয়-চিন্তা-অনুভব-উপলব্ধির প্রাণীও। আসলে পলাতক জীবনে ভিখুর যে বিচ্ছিন্নতা, তা হচ্ছে সামাজিক সঙ্গ এবং চিত্তের আনন্দের বিচ্ছিন্নতা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষিত দরিদ্র তো সঙ্গ পায় পরিবারের কাছে এবং আনন্দকে খোঁজে ঘরের নারীর শরীরে। এ ছাড়া নিঃসঙ্গ-মুক্তি আর আনন্দ-মুক্তির সহজলভ্য উপাদান তো দরিদ্রের হাতের কাছে থাকে না। ভিখুর এই ঘটনা কি আমরা ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনায় অনুসন্ধান করব? আমরা দেখতে পাব ভিখু পলাতক, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ আত্মপরিচয় হারাজীবন থেকে মুক্তি চায়। এমনও তো হতে পারে পেহলাদের বৌয়ের হাত ধরা ছিল ভিখুর একটি প্রতিশোধস্পৃহা। কেননা তার হাতের বাজু বা হাতের গহনা খোয়া যাওয়ার পেছনে সন্দেহ করছে সে পেহলাদকে। এই বাজুর বাজার মূল্য যা-ই থাকুক ভিখুর কাছে তা ছিল তার আত্মআবিষ্কার বা নিজেকে নিজে চিনে নেবার উপকরণ। ওটা তার দেহের অলংকার নয়, বরং সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার আশ্রয়, নিজের বা নিজত্বের সম্পদ। সামাজিক মানুষের শনাক্ত-চিহ্ন।

সঙ্গত কারণেই আমরা মনে করতে পারি যে, ভিখু আসলেই অস্তিত্বের মহাসংকটে পতিত উপনিবেশেরই গণপ্রতীক। তার আদিম-অসভ্য জীবনের বাস্তবতা হচ্ছে শোষণ-শাসনের অভিঘাতে পতিত সভ্যতা হারিয়ে ফেলা একটি জাতির মহাপতনেরই ছায়া। ওই অন্ধকারের ভিতর 'মানুষ' হিসেবে ওই যে তার আত্মআবিষ্কার, তা তো উপনিবেশের পশু জীবনের ভেতর তৎকালের জেগে-ওঠা অধীন মানুষের জাতিসত্তা আর মানবসত্তারই জাগরণ।

পেহলাদের ঘরে আগুন দিয়ে রাতের আঁধারে ভিখুর নিরুদ্দেশ যাত্রার বর্ণনা পাচ্ছি এভাবে, সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের, দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। পাঠক হিসেবে আমরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে রাত্রি বা অন্ধকারের প্রাধান্য অধিক। যেন বা সব ক্রিয়াশক্তির মূলে কাজ করছে আদিম

অন্ধকার। এ যেন অন্ধকারের রহস্য নিয়ে মানিকের শিল্পের খেলা। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই প্রায় পঙ্গু-ক্লান্ত একটি মানুষের ডিঙ্গি করে নদীর স্রোতে ভাসতে থাকা। নদীকে শাসন করার ক্ষমতা তার নেই। এ যেন মানুষের জীবনের এমন এক বৈরী স্রোত যাকে বশ করার ক্ষমতা শূন্য অক্ষমের অনিশ্চিত এক অন্ধকার নিরুদ্দেশ যাত্রা। আর সেই যে দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে পা ফেলে ভিখু, সেখানে ভিখারিনী পাঁচী হয়ে ওঠে তার জীবন অস্তিত্বের নতুন আস্বাদ আর স্বাধীনতারই ঠিকানা–স্বপ্ন। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় তার বাকি জীবন। পাঁচী যেন সেই ঠিকানা, যেখানে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর প্রাণ শক্তির নব উদ্বোধন। ভিখুর কাছে পাঁচী যতটা নারী, যতটা কাম চরিতার্থের যন্ত্র, তার অধিক প্রশান্তি আর অস্তিত্বের দ্বীপভূমি।

ভয়ংকর যে নিঃসঙ্গতা, দুর্বিনীত যে মানব-অস্তিত্ব ভীতি সেখানে শরীরী ক্ষুধার চেয়েও প্রবল আত্মক্ষুধার আশ্রয় তো ভিক্ষুর কাছে একমাত্র পাঁচী। পাঁচীর নোংরা শরীর ভিখুর কাছে মূল্যহীন। কেননা, এ যেন অনেকটা অ্যাডাম আর ইভের মতো। হোক প্যারাডাইজ লস্ট, সঙ্গে থাকুক ইভ। অথচ আমরা কি এমনটাই মনে করতে পারি পাঁচীর দখল নিয়ে বসিরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ভিখুর নারী কিংবা যৌনতা চাই কি ভিক্ষাবাণিজ্য দখলের সংঘাত? কি লুকিয়ে আছে এর অতল অন্ধকার গভীরে? সহজ উত্তর, নিঃসঙ্গতার সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধারে ভিখুর উন্মত্ত প্রত্যাশা।

ভিখুর মধ্যে ওই যে আমরা ঘৃণা দেখি তা অবশ্যই অবিকশিত শ্রেণী-ঘৃণা। সে চুরি করে না বরং জোর করে, খুন করে, ডাকাতি করে, ঘর ওই বিত্তবানের। ডাকাত-খুনি ভিখু যখন ভিক্ষুকে পরিণত হয় তখন মরে না বরং সেই ঘৃণা বরং প্রবল হয়। পথচারী করুণা করেন ভিক্ষাদাতারা বিমুখ করলে সেই ঘৃণাটা উথলে ওঠে। 'আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া...' ওই যে সে বলে, 'হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবো' কথাটা নিজে সে কতটা বিশ্বাস করে? ভগবান যে দেয় না, বরং ভগবানের নোংরা মূর্ত থেকে কেড়ে আনতে হয়, ভিখুর কাছে এটাই পরম সত্য। তার জীবনের অভিজ্ঞতাও তাই।

'নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে। ... নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না।' এখানে ফ্রয়েডীয় ছায়ার আড়ালে রয়েছে পরম সত্য। মেয়েদের ভয় পাইয়ে দিতে ভিখুর দুর্বিনীত হাসি আর নারীসঙ্গবর্জিত নিরুৎসব অর্থাৎ আনন্দশূন্য জীবনের অর্থ আছে। ঔপনিবেশিক শাসক তো ভিখুদের জন্য একমাত্র প্রজনন ক্রিয়ার যন্ত্র নারী ভিন্ন আনন্দ-বিনোদনের কোনো উপকরণ অনুমোদন করেনি। এই উৎসব আনন্দের জন্য শোষিত-দরিদ্রদের পেছনে শাসকদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব নিতে হয় না। বিত্তহীন সমাজ নিজেরাই সমাজ থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে তা লাভ করে। এখানে ভিখুর জন্য সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দরকার নেই। তা যে নেই এর প্রমাণ নারীদের দিকে তাকিয়ে তার দুর্বিনীত হাসি। এ হাসি যৌনতা গন্ধময় নয়, বরং প্রতিহিংসা, ঘৃণা। কেন না ওই ধনীর ঘরের সুখী নারীরা তাকে ভিক্ষা দেয় না, ওরা তার নিরানন্দের জীবনে আশ্রয় ভূমিও নয়। মানিক তাই জানাচ্ছেন, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নিচে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

এই গল্পে মানিক তির্যক গতিতে একটি জগতের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। সেই জগতের মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক নয়, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী। মূল চরিত্র তো বটেই, অন্যরাও। যেমন পাঁচী আর বসির। মানুষ হিসেবে তো নয়ই, সম্প্রদায়গত হিসেবে তারা নিজস্ব আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলেছে। শারীরিক পঙ্গুত্ব, অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও বিচূর্ণ করেছে। ক্ষুধা-মুক্তির নামে শারীরিক পঙ্গুত্ব হয়ে যায় উপার্জনের পুঁজি। অর্থটা কোথায় নিয়ে দাঁড়াল? ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে মানুষ কেবল যে শরীরের পঙ্গুত্বই বরণ করেছে তা নয়, নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে মানুষ্যত্বের দায় খুইয়ে, আপন প্রতিবন্ধী জীবনকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। সুস্থ জীবনের কাছে ফিরতে চাইছে না। শরীরের সঙ্গে আত্মাকেও পঙ্গু ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। ওই যে পাঁচীর প্রতি আসক্ত হলে ভিখুকে সে কি বলে? ঔষধ দিয়ে ঘা সারাতে গররাজি কেন পাঁচী? কি মর্মান্তিক উক্তি। দু'দিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘাটি মুই তখন পামু কোয়ানে?

পাঁচীর কাছে জীবনটা এতটাই নির্মম যে, ইচ্ছে থাকলেও বসিরকে ছেড়ে ভিখুর কাছে যেতে চায় না। কেন চায় না? চায় না এই কারণে যে, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটিও এই উপনিবেশে ফুরিয়ে গেছে। এখানে পাঁচীরও বসিরের প্রতি ভালোবাসা নেই, বনের পশুর মতোই যৌনতা নিরপেক্ষ যৌথ জীবনের তাড়না মাত্র। ঘৃণা নেই ভিখুর প্রতিও। এ যেন প্রতিযোগিতা, একজন নারী সঙ্গীর জন্য দুজন নিঃসঙ্গ আদিম পুরুষের। তাই তো পাঁচী বলে ভিখুকে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া।' দেখা যাচ্ছে নিঃসঙ্গতা নিয়ে দুটো পুরুষই আতঙ্কিত। নারীর কাছে পুরুষের প্রাপ্তি কিংবা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বাইরে এটা মানবিক চাহিদা। পাঁচী এটাও জানে নিঃসঙ্গ একাকী মানুষ বেঁচে থেকেও মৃত। অখন মর গিয়া— এই উক্তির লুকানো সত্য এখানেই।

পাঠক মাত্রই জানেন ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মানিকের ধারণাও নেতিবাচক। তাঁর নিজের বয়ানে এর প্রমাণ মেলে। *পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা* কিংবা অপরাপর উপন্যাস গল্প সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায়। পশ্চিমের এই তত্ত্ব তাঁকে কৌতূহলী করেছে, মুগ্ধ করেনি। যদি করত তবে অচিরেই সেই তত্ত্বকে দূরে ঠেলে তিনি মার্কস-এর কাছে ছুটে যেতেন না। বিস্ময়কর অথচ চিন্তার অতলস্পর্শী কিছু বাক্যের কাছে দাঁড়ালে আমরা কী পাই? 'আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চলার পথে বিন্নু মাঝির সুখী পরিবারটি জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়।... মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।' এখানে 'আপনার ভাগ্য', 'বিদ্রোহী', 'সুখী পরিবার', 'হিংসায় জর্জরিত' শব্দগুলোর ব্যবহারিক অর্থের চেয়ে ব্যঞ্জনার্থ অধিক। নিঃসঙ্গতার অতলস্পর্শী মর্মজ্বালা তো আপন অস্তিত্বের বাইরে অন্যকিছু ভাবতে পারে না ভিখু। সুখ তো ভিখুর দখলে নেই, দখলে বিন্নু মাঝির। তাই পুরুষ হত্যার বিনিময়ে কেবল নারীই নয়, খাদ্য দখলেরই অলীক স্বপ্ন দেখে সে।

এমন বর্ণনা মানিক দিচ্ছেন ফ্রয়েডীয় সূত্র ধরেই। ক্ষুধা আর যৌনতার মধ্যে যৌনতাই প্রবল, এ কথা ফ্রয়েড বললেও মানিক বলেননি। দুটির অভিক্রিয়াকে মানিক আলাদা নয়, এক করে দেখেছেন। মানিক এটাও নিশ্চয়ই জানতেন তাঁর ভিখু চরিত্র

সর্বহারা সমাজের শ্রেণীসচেতন চরিত্র নয়। শ্রেণীবোধের আধুনিক ধারণার বাইরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘৃণা আর হিংসা দ্বারা তাড়িত সে/এটাও মিথ্যা নয় যে, ব্যক্তি ঘৃণাই পরিণতিতে শ্রেণী-ঘৃণায়, শ্রেণী হিংসায় বাস্তব রূপ লাভ করে। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, সুখী, ধনী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুধা আর যৌনতার অনুভব, দরিদ্র এবং পরিস্থিতির শিকার মানুষের পেটের ক্ষুধা আর যৌনক্ষুধা এক নয়/এই অনুভবের শ্রেণীগত দ্বান্দ্বিক বহুমাত্রিক রূপ আছে। তাই ভিখুর ক্ষুধা, যৌনতা, হিংসা আর ঘৃণার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা এবং বহুমাত্রিক।

গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখতে পাব, ভিখু ভয়ংকর এক হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে পাঁচীকে দখল করে পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে। জোর করেনি, পাঁচী স্বেচ্ছায় ভিখুর সঙ্গী হয়। যেন পাঁচী বসিরের হত্যার ভেতর এক নিঃসঙ্গ থেকে মুক্তির জন্য নতুন সঙ্গী গ্রহণ করে। পথ চলতে গিয়ে ভিখু কী বলে? 'খানিক বাদে নবমীর চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

এ নবমীর চাঁদের আলোর পথ যেন মুক্তির পথ। এ পথ অস্তিত্বের কাছে ফেরা, নিঃসঙ্গ-মুক্তির কাছে ফেরা। আঁধার অতিক্রমের এই মানবীয় প্রত্যাশা তো প্রাণী হিসেবে মানুষের সহজাত। আমরা এটাও জানি, ভিখু পাঁচীকে নিয়ে যেখানেই যাক, মুক্তি মিলবে না। কিন্তু সে উদ্ধার পাবে অস্তিত্ব ভীতি আর জীবন-নিঃসঙ্গতার ভয়ংকর অন্ধকারের জগৎ থেকে। ভিখুর যাত্রাপথ কেমন? 'পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত-স্তব্ধতা।' আর এই ঈশ্বরতো আকাশের ঈশ্বর নয়, ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন ও শোষণের ঈশ্বর।

পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের এই তুলনারহিত গল্পটির শিল্পগুণ ব্যাহত হয়েছে এর শেষ অনুচ্ছেদের কারণে। এমনও মনে হয়, গল্পটি শেষ হবার পর এই অনুচ্ছেদটি মানিক নতুন করে যোগ করেছেন নামকরণের যৌক্তিকতার কারণে। বিজ্ঞানের এই জিনেটিক ব্যাখ্যা গল্পটির জন্য মোটেই প্রয়োজন ছিল না। 'হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ... কোনোদিন পাইবে না।' 'প্রাগৈতিহাসিক' নামের বৈধতার জন্য এই ব্যাখ্যা মানিকের যুক্তির বাইরে আবেগের ফসল মাত্র। তারপরও শিল্পবিচারে এই গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' কিংবা 'হারানের নাতজামাই' গল্পের মার্কসীয় শ্রেণী ব্যাখ্যার চেয়েও অধিক সফল সৃষ্টি। অন্তত মার্কসীয় মানবপ্রবণতার জটিল ব্যাখ্যার বিচারে 'প্রাগৈতিহাসিক' বিস্ময়কর শিল্পসফল গল্প। এ কথাও আমার মনে হয় 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রপঞ্চটি, এখানে যা ফ্রয়েডের বহু বহু পূর্বে স্পষ্ট করেছেন গৌতম বুদ্ধ, ওই যে সেই মাতৃগর্ভ থেকে বয়ে আনা প্রবৃত্তি বা পঞ্চইন্দ্রিয়, তা নয়। এখানে প্রাগৈতিহাসিক সত্যটি হচ্ছে মানুষ কর্তৃক মানুষকে ঔপনিবেশিক দাসে পরিণত করা, তার মধ্যে অস্তিত্ব ভীতি জন্মানো, তাকে নিঃসঙ্গ করে দেয়া, প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করা, ক্ষুধা আর যৌনতার নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত করা এবং তার মানুষ্যত্ব-বিবেক-বুদ্ধিকে ধ্বংস করা।

আত্মপরিচয় ধ্বংসের ভিতর দিয়ে মানুষের পলায়ন, সমাজ ও সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মানুষকে ইতর প্রাণীতে পরিণত করা তো উপনিবেশেরই অবদান। তারই অভিক্রিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশ্রয় নিতে হয় মার্কসের জীবনব্যাখ্যার কাছে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যাখ্যার কাছে। আমার এই ব্যাখ্যার বাইরেও গল্পটিকে শিল্পের একাধিক

ডাইমেনশনে ব্যাখ্যা করা চলে। নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই কারণে যে, আমরা আমাদের সাহিত্যের প্রত্নভূমির অভিনব ব্যাখ্যার ভিতরে নতুন আবিষ্কার চাই। তা হলেই মানিকমুগ্ধতা বা বিমুখতার ভিতর দিয়ে একটি যৌক্তিক পথ খুঁজে পাব। কেননা এটাও আমরা জানি, ওই যে মানিক গল্পের শেষ বাক্যে বললেন— 'সন্তানের মাংস আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোন দিন পাইবেও না।' কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর আলো সেই অন্ধকারে পৌঁছবে। ক্রমবিকাশমান জিনবিজ্ঞান ছাড়াও রয়েছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রই বিনির্মাণ করতে সক্ষম নতুন পৃথিবী, নতুন মূল্যবোধের নতুন মানুষ, ত্রুটিহীন জিনবাহী মানবসমাজ এবং সাহিত্য।

সমাজের আরোগ্য, ব্যক্তির সুস্থতা

হামীম কামরুল হক

অনেকদিন হল উপন্যাস তার বর্গ ভেঙে ফেলেছে। এক সময় একে সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, রহস্য-রোমাঞ্চসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও ধারায় যেভাবে আলাদা করা হত উপন্যাস সে জায়গা থেকে সরে এসেছে। ঠিক সরে এসেছে বললে তো হবে না, আসলে শনাক্তকরণটাও বদলে গেছে। ফলে এমবার্তো একো বা ওরহান পামুকের মতো লেখকরা উপন্যাসে থ্রিলারের আবহ এনে সেই মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেন যা অন্য সময় হলে একটা ছকে বেঁধে দেওয়ার সুযোগ ছিল। অবশ্য স্তাঁদাল কি ফ্লবেয়ারের উপন্যাসে নমুনা তো ছিল, যা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে হতে পারত রহস্য উপন্যাস কি থ্রিলার, *স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক* বা *মাদাম বোভারির* কথাই এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস* কি ঐতিহাসিক বা কেবলই সামাজিক উপন্যাস? নাকি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস?

এভাবে উপন্যাসের চিহ্নায়ন সত্যিই খুব সেকেলে ঠেকে। উপন্যাস তো জীবনের মতোই। আমাদের কোন জীবনটা সামাজিক, কোনটা পারিবারিক, কোনটা ব্যক্তিগত, কোনটা রাজনৈতিক– এর ভেতরে মোটা বা সূক্ষ্ম সব ধরনেরই দাগই টেনে দেওয়া যায়। কিন্তু আদতে কি সব মিলিয়েই একটাই তো 'আমাদের আমি'। সেই আমিটাকে যখন উপন্যাসে দেখা হয় তার স্বরূপ আবার আরেক রকম।

উইলিয়াম জেমস তার বিখ্যাত সাইকোলজি বইতে 'আমি' ও 'আমার'– এই দুয়ের পার্থক্য টানতে গিয়ে দেখিয়েছেন– 'আমি' অংশটা অজানা বা জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে; আর যে অংশগুলো জানা হয়েছে সেগুলো নিয়ে 'আমার'। ইংরেজিতে যাকে সেল্ফ বলে, তার বাংলা প্রতিশব্দটা বোধ করি আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি। আবার যাকে আমরা আত্মা বলি তা কিন্তু সেল্ফ দিয়ে বোঝানো যাবে না। সে যাই হোক, উইলিয়াম জেমস ওই সেল্ফের গোড়ার বিষয়টি এভাবে তুলে ধরে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে বস্তুগত, সামাজিক ও চেতনাগত 'আমি' ও 'আমার'-এর বেশ কিছু বিবেচনা আছে। 'আমি'কে খোঁজা 'আমার'-এর বেশ কিছু সূত্রসন্ধান আছে– আমাদের সেদিকে যাওয়ার সুযোগ নেই, কেবল এই সূত্রটুকু মনে রাখার জন্য আমরা এটা উল্লেখ্য করলাম।

বিভিন্ন শিল্পাঙ্গিকেও 'আমি' ও 'আমার'-এর বিচিত্রসব ব্যাপার ঘটে। বিন্দু ও বৃত্তের ছড়াছড়ি সেখানে। 'বিন্দুতে সিন্ধু' বা 'অল্পই শিল্প' বলতে যে পরিমিতি বোধের দিকে ইংগিত যায় বা যে যে উপাদান দিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা হয়, বেছে নেওয়ার যে বিষয়গুলো থাকে– যে যে বিন্দু থেকে উপন্যাসের বৃত্তগুলো তৈরি করতে হয়, সবগুলো বৃত্তের কেন্দ্রকে আবার যেভাবে যোগ করে দিতে হয়–তাতে একটা বিচিত্র রকম জ্যামিতিও থাকে।

একটা বৃত্তের পরিধির প্রতিটি বিন্দুতে নতুন করে তৈরি করা যায় আরো আরো বৃত্ত। নতুন সেই বৃত্তগুলো থেকে ওভাবেই নির্মাণ করা যায় একই প্রক্রিয়ায় আরো বৃত্ত। এটা একটা অন্তহীন প্রক্রিয়া। বইয়ের পাতায় উপন্যাস শেষ হয়ে গেলেও আদতে তাতে কোনো প্রকৃত ইতি টানা যায় না। বরং যেখানে একটা উপন্যাস শেষ হয় সেখানেই অপেক্ষা করে এক বা একাধিক উপন্যাস। দস্তয়েভস্কির *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট* উপন্যাসের শেষ বাক্য বা মানিকের *পুতুল নাচের ইতিকথার* একটি কাহিনীবৃত্তে (কুমুদ-মতি)-র শেষে যে কথাটি কথা আছে তাদের ভেতরে একটা দারুণ মিল পাঠক আশা করি লক্ষ করে থাকবেন। যার সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় : 'আমাদের এই গল্পটার এখানেই ইতি, আর যেটুকু শেষ হল না তা আরেকটি গল্প, সে কাহিনী ভিন্ন।' মানিক সেখানে লিখেছেন : 'পুতুল নাচের ইতিকথার সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত– ওদের কথা এখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।'

দস্তয়েভস্কির বলা কথা থেকে বলা যায়, পৃথিবীর তাবৎ উপন্যাসই হল 'মানবের ক্রমবিকাশের অন্তবিহীন গল্প'। 'মানুষ' মরে গেলেও যে 'মানব' থেকে যায়– সেই 'মানবে'র গল্প। মানবের ভেতরেরও যে মানব, তারও যে মন ও মনের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উপন্যাস করে তোলা হয় এবং যে লেখকরা সে জায়গাটিতে জোর দেন তাদের উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হত। আদতে উপন্যাস সে আরব্য উপন্যাস হোক বা বালজাক-দস্তয়েভস্কি-টমাস মান-কাফকা প্রমুখের উপন্যাসই হোক বা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ কি বিভূতি, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ বা সমরেশ বসুর উপন্যাসই হোক– মানবের মনকে বাদ দিয়ে তা হয়নি।

এরই সূত্রে উপন্যাস মাত্রই ব্যক্তির মাধ্যমে একটা সমাজ বা জনপদের কথাকে তুলে আনে। উপন্যাসের ক্যানভাস জুড়ে একটি লোকের মুখ আঁকা হলেও তা থেকেই এমন একটা নান্দনিক অনুভব পাওয়া যায়– যেখানে তা দেশ কাল সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে সর্বমানবীয় অনুভূতির দ্যোতনা এনে দিতে পারে– যা থেকে কোনো পাঠক নিজের মতো করে সে উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

সে দিক থেকে আমাদের চলমান প্রবন্ধের শিরোনামটা হতে পারত 'মানবের আরোগ্য, মানুষের সুস্থতা' আপাত অর্থে মনে হতে পারে তা-ই বরং অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হত। আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভঙ্গির বিশেষ একটা দিককে দেখে নিতে তার আরোগ্য উপন্যাসটি বেছে নিয়েছি।

এ উপন্যাসটি মূলত একজন ব্যক্তিরই 'সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টার বিবরণ'। অন্তত ব্যক্তিকেই সামনে আনা হয়েছে, কেন্দ্র একজনকে রাখা হলেও অসুখ বা অসুস্থতার খপ্পরে পড়া বেশ কিছু চরিত্রের দেখা মিলবে এখানে। এতে ব্যক্তির পটচিত্রটা সামনে থাকলেও শেষাবধি সেটি পেছনে চলে যায়, সেখানে ব্যবহৃত রঙগুলো জলের ভেতরে পাথরের ডুবে যাওয়ার মতো করে ডুবে যায়। ফুটে ওঠে এর পেছনের রঙগুলো। ব্যক্তি যদি হয় সেই ডুবন্ত পাথর, তাহলে পুরো সমাজটা হল সেই পুকুর। ব্যক্তির সুস্থতা খুঁজতে গিয়ে চূড়ান্তে নিয়ে আসা হয়েছে সামাজিক সুস্থতাকে।

হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিটি সুস্থ হয়ে ওঠে না, যে অর্থে ব্যক্তিগত সুস্থতা কেউ ফিরে পায়; সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজেকে নয়, সারিয়ে তুলতে হবে সমাজটাকে। কারণ সমাজটাই অসুখের আগার। সে অনুভব করে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করতেই সে নিজেই অর্ধেকটা সুস্থ হয়ে গেছে। আর লড়াইটা বাস্তবিকভাবে শুরু করে দিলে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।

যেন স্লোগানের মতো কানে বেজে ওঠে এর শেষ বাক্যটি : 'লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য'।

মানিক এখানে কারবার করেছেন 'সুস্থতা' বিষয়টি নিয়ে। কে সুস্থ? সুস্থতা কাকে বলে? কীভাবে সুস্থতা বজায় রাখা যায়, বা ফিরিয়ে আনা যায়?– মনে হতে পারে উপন্যাসটি লেখার আগে এই নিয়ে নিজের বিশ্লেষণের জায়গাজমি তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই উপন্যাসে প্রথমে সুস্থতার কথা পেছনে রেখে সামনে আনা হয়েছে অসুখ ও অসুস্থতার বিষয়গুলো। আর শেষে গিয়ে সুস্থতার কয়েকটা একটা সূত্রকে খুঁজে বুঝে নেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্তে টানা হয়েছে সিদ্ধান্ত। একে এক ধরনের প্রপাগান্ডাও বলা যায়। কিন্তু *আরোগ্য* পাঠ করে যে আশ্চর্য রকমের সমকালীনতার দেখা পাওয়া গেল– তাতে বোধ করি যে কোনো পাঠকের কাছে এই উপন্যাসটি নতুন অর্থে ধরা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।

২.

এ উপন্যাসে গল্প আছে অনেক। সে অর্থে বৃত্তও আছে বেশ কয়েকটা। মূল বৃত্তটি কেশবের এবং তার কেন্দ্রও সে। কিন্তু অন্য যে বৃত্তগুলো আছে সেগুলোর কেন্দ্র নির্দিষ্ট নয়। যেমন ললনার বৃত্ত, কানুর বৃত্ত, মায়ার বৃত্ত, মোহিনীর বৃত্ত। ললনার বৃত্তে একবার অনিমেষ চলে আসছে কেন্দ্রে আরেকবার ললনাই থাকছে কেন্দ্রে, প্রান্তে চলে যাচ্ছে অনিমেষ। মোহিনী তার বৃত্তের কেন্দ্র ভাগ করে নিচ্ছে ভুবনের সঙ্গে। সব মিলিয়ে যে বৃত্তটি তার নাম নগর ও এর বিকারকে আবিষ্কার। এবং তা এতটাই সমকালীন হয়ে ওঠে, মনে হয়, এ যেন একেবারে এই সময়ের কাহিনী। আরো বড় ব্যাপার জাঁক লাঁকা যেভাবে মার্কস ও ফ্রয়েডকে জোড়া দিয়েছিলেন ঠিক সে কাজটাই মানিক করেছেন এ উপন্যাসের সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে।

অনেকেরই অভিযোগ, মার্কস সমষ্টির কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তির অনুভূতির কথাটা পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন, আর ফ্রয়েড সমাজের অবক্ষয় অসুস্থতার প্রতিকার খুঁজেছেন ব্যক্তিকে সুস্থ করার মাধ্যমে। এখানে এও জেনে রাখা ভালো যে মার্কসের শুরুটা হয়েছিল ব্যক্তির সেই বিচ্ছিন্নতাকে খুঁজে বের করার মধ্যে দিয়ে– যেখানে সে নিজের সত্তাকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। আধুনিক সময়ে 'এলিয়েনেশন' নামের যে অসুখের কথা বলা হয় তার শনাক্তকরণের শুরুটা মার্কসের হাত ধরেই। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়ই জন্ম দিয়েছে এই অসুখ। যেখানে ব্যক্তি তার উৎপাদন ও শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন, শ্রম বিচ্ছিন্ন হচ্ছে উৎপাদনের সঙ্গে, আবার ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে তার নিজের সঙ্গে। সে তার 'আমার' ও 'আমি' কোনোটাকে চিনে নিতে পারছে না। কিন্তু এর জন্য সে কেবল নিজে দায়ী নয়, এই অসুখের উৎস হল সে যে সমাজের বাস করে সেই সমাজ। সমাজ তৈরি করছে অসুস্থ ব্যক্তি, আর অসুস্থ ব্যক্তি তৈরি করছে অসুস্থ সমাজ। এখানে অসুস্থ বা অসুখী সমাজে বদলে বলা যায় 'বিকারগ্রস্ত সমাজ', যার ভেতরে ক্ষয় বাইরের চাকচিক্য দিয়ে ঢাকা থাকে। *আরোগ্য* উপন্যাসের ললনাদের পরিবারের সেই অবক্ষয়টা খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

দিনের পর দিন ঠিক মতো ঘুমাতে না পারা, মাথাব্যথা করা ও একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা বোধ করা কেশবের অসুখকে মোহিনীর স্বামী ভুবন আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'অবিশ্বাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এটা ছিল ভাববাদী ব্যাখ্যা। দাওয়াই হিসেবে নিজের অহংকে ছোট করা এবং বিয়ে থা করার কথা বলেছিল সে। কেশব এই ব্যাখ্যায়

সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে কানুকে দিয়ে বোঝে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বালাই নেই যাদের তারাও *দিব্যি* আছে, তাহলে ব্যাপারটা অন্য কোথাও।

সে অনিমেষ নামের একজন অসৎ ব্যক্তির প্রাইভেট কারের ড্রাইভার। তার মেয়ে ললনা ও তার কয়েকজন বান্ধবীকেও বিভিন্নস্থানে নিয়ে যাওয়া ও আসার কাজ করে থাকে। মাঝে মাঝেই সে ললনার কাছ থেকে বই পত্রপত্রিকা নিয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিষয়ে জেনে বুঝে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় সেখানে সে তার নিজেকে ও নিজের পরিপার্শ্বকে বুঝে নিতে চেষ্টা করে। সবচেয়ে যা বুঝে নিতে চেষ্টা করে তার অসুখের কারণটা। কিন্তু কিছুতেই সে তা ধরতে পারছিল না।

বিধবা মায়ার সঙ্গে গোপনে গভীর রাতে অভিসার ও তাদের অবৈধ সম্পর্ক তার মনে কোনো পাপের জন্ম দেয় না। সে নিজে কোনো ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করে না। সংসারের স্বার্থ সে দেখছিল ঠিক মতোই, কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে তার সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা। সবার অমতে নিজের বাড়ি বন্ধক দিয়ে সে স্পেশালিস্ট ডাক্তার দত্তকে দেখাতে যায়। দত্ত তাকে নাটবল্টু খোলার মতো করে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেন তার গলদগুলো কোথায়। তার অবদমিত কামনা-উৎস তাকে কীভাবে গলদের ভেতরে ঠেলে দিয়েছে।

ফ্রয়েড অবদমন থেকে ব্যক্তির যে বিকার ও অসুস্থতাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তার উৎস যে সমাজেই সেটি বিশ্লেষণ করে খোলসা করেছেন জাঁক লাঁকা। ফলে ব্যক্তির অবদমন থেকে তৈরি হওয়া অসুখ আর সমাজের অবদমন, বৈষম্যের ফলে তৈরি হওয়া বিকারের কেন্দ্র তাই মিলে যায়। ফ্রয়েড তাঁর 'সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস' প্রবন্ধে, যে লেখাটিকে তার দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত ফল বলে মনে করা হয়, দেখিয়েছেন, প্রেম ও শ্রমের বিলি বন্টনের বৈষম্যের কারণে কীভাবে অতৃপ্তি ও অবদমন তৈরি হচ্ছে।

আরোগ্য কেবল চরিত্রগুলোর অবক্ষয়ের গল্প নয়, সুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চাও কীভাবে বাজারের পণ্য হয়ে যায় তারও গল্প। কেশব দেখে কীভাবে নিজের প্রতিভা নষ্ট করে সিনেমা গান গাচ্ছে ললনা। টাকার জন্য ও নায়িকা হয়ে ওঠার জন্য বাড়ি স্বামী ছেড়ে চলে গেছে মোহিনী। এ উপন্যাসে সংস্কৃতির এ দিকটা যেন একেবারে হাল আমলের মতো মনে হয়। সুন্দরী নারীরা নিজেকে রূপের ফেরিওয়ালা করতে সিনেমার প্রতি ঝুঁকছে, যে কোনো মূল্যে টাকা চাই খ্যাতি চাই– *আরোগ্য* সেই অসুখটাকে তুলে ধরেছে। যাতে আমরা বুঝতে পারি সংস্কৃতি শুভ বোধের, সুন্দর, সত্যের ও কল্যাণের ধারক-বাহক হওয়ার বদলে হয়ে উঠছে স্রেফ ব্যবসা আর ভোগের ক্ষেত্র। এর পেছনে আছে টাকার জোগান।

মানিক যদিও এ জায়গাগুলো নিয়ে বেশি কিছু বলেননি, যতটুকু এর কথা এসেছে তাতে *আরোগ্যের* সমকালীনতা আমাদের বিস্মিত করে। আসলে সমাজবিকাশের ধারাকে তার মতো লেখকরা তো এভাবেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন আরো অর্ধশত বছর আগে।

৩.

একটি সড়কপথের দুর্ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা। আর জীবন পথের নতুন প্রত্যয় দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি। মাঝখানে আছে নাগরিক মানুষের বিকারের পেছনের

অনেকগুলো গল্প। এর ভেতর দিয়ে মানিক বুঝে নিতে চেয়েছেন অভ্যস্ততা, দক্ষতা, প্রতিভা, প্রেম, ব্যবসা ও স্বার্থ, যৌনতা, গোপন সম্পর্কের সুখ-অসুখ-আত্মত্যাগ, সিনেমাজগৎ, অভিজাত সমাজ, নেশা, ভালো লোক ও মন্দ লোকের লক্ষণ, পরিবারের দায় ও দায়িত্ব প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটি বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে। ব্যক্তি মানুষ সমাজের সঙ্গে এই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তার বাঁচাটাকে বুঝে নিতে চাইছে।

মানিকের উপন্যাসে ফিরে ফিরে আসে বেঁচে থাকার বিকার ও প্রতিকারকে বুঝে নেওয়ার বিন্দু ও বৃত্তগুলো। একজন মানুষ যেভাবে বাঁচে আর তার যেভাবে বাঁচা উচিত– এই দুয়ের মধ্যে যখন ফাঁক থেকে যায় সে জায়গাটা ভরে ওঠে অতৃপ্তি দিয়ে। তার চাওয়া আর পাওয়ার মাত্রাও আলাদা। অনেক কিছু পেলেও যেমন করে সে পেতে চায় সেভাবে না পেলেও তার সেখানে তৃপ্তি মেটে না।

ললনার প্রতি টান বোধ করে কেশব। মনে মনে তাকে ভালোওবাসে। অন্যদিকে তার গোপন সম্পর্ক আছে মায়ার সঙ্গে। মায়া নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে হলেও কেশবকে সুস্থ করতে চায়। শারীরিক সুস্থতার জন্য সে কেশবকে চুরি করে গরুর দুধ এনে খাওয়ায়। কেশব তাকে বিয়ে করার চিন্তাও করে। কিন্তু কোথায় যেন একটা দ্বিধা থেকেই যায়। অন্যদিকে যৌনাবেদনময়ী মোহিনীর শরীর তার চোখে মাঝেমাঝেই চমক লাগায়। পাতলা একটা শাড়ি আলগাভাবে জড়ানো মোহিনীকে দেখে তার অজন্তার নারীমূর্তির কথা মনে পড়ে। মোহিনীর কাছে তার স্বামী ভুবনের খোঁজ করলে সে বলে, 'শুধু ভুবনদার সঙ্গে কথা কইতে আসা হয় বুঝি? আমাকে পছন্দ হয় না।' কেশব সপ্রতিভ উত্তর দেয়, 'পছন্দ হয় বলেই তো ভয় করে।'

পুরো উপন্যাসে কেশব বেশ সপ্রতিভ। ডাক্তার দত্ত তাকে বলেছিলেন, 'আজ পর্যন্ত আপনার মতো সুস্থ সবল রোগী আমার চেম্বারে আসেনি।' ডাক্তার দত্ত তাকে বলেছেন, তাকে মনের অসুখের চিকিৎসা করতে হবে। বলেছেন, কেশবের দুটো জগতের কথা। বলেছেন, ওই দুটো দু'রকম জগতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চাওয়ার ফলে মিথ্যা কল্পনার জাল বুনে নিজেকে অসুস্থ করে তোলার বিষয়টি বুঝে নিতে পারলেই তার আরোগ্য। নিজেকেই বুঝে নিতে হবে গণ্ডগোলটা কোথায় বেধেছে? তাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, তার মনটা হয়ে উঠেছে ভুলের গুদাম। বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারে সেটি ঠাসা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, মানসিক রোগ সারিয়ে দেওয়া তার কাজ নয়, তার কাজ হল কোন কোন কারণে তার এই রোগটা হল সেটিকে বুঝিয়ে দেওয়া। সেরে ওঠার কাজটা তার নিজেকেই করতে হবে।

ডাক্তার তার অতৃপ্তি ও তা থেকে জন্মানো জীবন সম্পর্কে তিক্ততার দিকটি দেখিয়ে দেন। কেশব তাকে প্রশ্ন করে, তার মতো মেশালো জীবন তো অনেকের আছে– কিন্তু তারা কেন অসুস্থ হয় না? ডাক্তার তাকে বোঝান যে, তারা অসুস্থ হয় না কারণ, তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী আপোস করে নিতে পারে। তারা তার মতো জেদি ও একগুঁয়ে নয়। দুর্বল প্রকৃতির লোক হলে সংঘাতটাকে এড়িয়ে চলে কিন্তু কেশব সংঘাতের মুখোমুখি হতে চাইল এবং তার চাওয়া, না পাওয়া আর জেদ এই তিনে মিলে তার ভেতরে অসুখ তৈরি করল। ডাক্তার বলেন, এই বিষয়টি ভালো মতো বুঝে নিতে পারলেই তার অসুখ সেরে যাবে। ডাক্তার আরো যোগ করেন, রোগ সারবে কিন্তু তার জীবনের সুখ-শান্তি আনন্দ তার নিজেকেই নিয়ে আসতে হবে। তার মাথা ঘোরা, ঘুম না হওয়া, বুক ধড়াৎ

করে ওঠা তিনি ওষুধ দিয়ে দূর করে দিতে পারেন কিন্তু তার মনের দুঃখ তিনি দূর করতে পারবেন না।

কেশব জীবনের আরেকটি দিক বোঝে তার বন্ধু কানুকে দিয়ে। কানুর সমস্ত কিছু স্বাভাবিক, সে মদ খায়, বেলা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে, নিজের অধিকার সম্পর্কে জানে, কোনো রকম বিকারে সে ভোগে না। সে যে জীবনযাপন করে সেটাই তার জীবন। কেশবের মতো তার জীবনে দু'মুখী টান নেই। কোনো অসম্ভবের পায়ে সে গোপনে মাথা কুটে মরে না। তার কোনো গোপন রাত্রি নেই, সেখানে কোনো মায়া (কথাটা জীবনের মায়া-মোহ অর্থেও, আবার কেশবের প্রেমিকা বিধবা মায়ার অভিসারে আসাটাকে মনে রেখে বলা) আসে না। ললনা, মায়া, মোহিনী– এই তিনটি নামের ভেতরেই যেন কেশবের মনের তিনটি দিকের পরিচয় মেলে। ডাক্তার বলেছিলেন দুটো জগৎ তার। মোহিনীও সেখানে আরো একটা জগতের মতো ছিল। ললনা অভিজাত, দূরবর্তী, মায়া বাস্তব কিন্তু গোপন, আর মোহিনী মনের আরো গহিনে আরো গোপন। ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারে নিজের সেই গোপনীয়তার মুখোমুখি তাকে দাঁড়তে হবেই। ফলে সে সম্পর্কগুলোকে বুঝে নিতে গিয়ে দেখে, '...রাত্রির গোপনতার রোমাঞ্চকর অসামাজিক প্রেমে তার রুচি জন্মে থাক, সেটাই সব নয়। মোহিনীর সঙ্গে ভালোবাসার খেলায় ঢের বেশি রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার প্রতিশ্রুতি ছিল। মায়ার সঙ্গে ভাব হওয়ার আগে মোহিনীর তীব্র আকর্ষণে নিজের রোগের যাতনা পর্যন্ত সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল তবু মোহিনী চেষ্টা করেও তার মন পায়নি। কেন? কেশব বুঝতে পারে না মোহিনী কাছে যাওয়া হয়ে ওঠে নি কি তার স্বামী থাকার কারণে, নাকি তার নীতিজ্ঞান? কেশব টের পায় আসলে রোমাঞ্চটাই সব নয়, আরো বড় কোনো ব্যাপার মায়ার ভেতরে আছে– নইলে মায়াকে সে ভালোবাসত না। আবার মায়ার ভালোবাসাকেও তার স্বার্থপরতা মনে হয়। কেশব টের পায়, মায়া আর ললনা একই মিথ্যার এপিঠ ওপিঠ।' দু'জনেই তাদের নিজের প্রকৃত সত্তার সঙ্গে প্রতারণা করে, দু'জনেই আত্মবিক্রি করে, স্রেফ পথটা আলাদা। কিন্তু মোহিনীর কাছে সে তার সেই পথটির দেখা পায় যাকে বলে লড়াইয়ের পথ। নিজের 'আমার' থেকে বেরিয়ে প্রকৃত 'আমি'কে বুঝে নেওয়ার পথ।

৪.

জীবন একটা আয়োজন। এখানে প্রতি পদে নানান অনুষ্ঠান। কিন্তু সব অনুষ্ঠান সুন্দর করে শুরু করা যায় না। কিন্তু দেখা গেল মাঝখানটায় অনুষ্ঠানটা জমে উঠল কিন্তু শেষটায় ফের পড়ে গেল। ফলে আয়োজনে যে উদ্যোগ তাকে দায়ী করা হল। কিন্তু কেবল কি উদ্যোগের সমস্যাটাই দায়ী? সঠিক লোকটা সঠিক উদ্যোগ নিয়েছিল কিনা সেটিও তো খুঁজে দেখার আছে। যার কাজ তাকেই সাজে, অন্যে করলে লাঠি বাজে– সেই লাঠিই যেন বাজছে নাগরিক সমাজের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা বোধ আর সামাজিক সংঘাতের ছড়ানো প্রান্তজুড়ে।

মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতা নিয়ে তো অনেক কথাই হয়। সেও এক ধরনের আরোগ্য লাভের চেষ্টা, উদ্যোগ ও আয়োজনে ভরা। কিন্তু তিনটি কথাই আলাদ আলাদা করে বুঝে নিতে চাইলে বোঝা যাবে– মানুষটা কী? মুক্তিটাই বা কীরকম? স্বাধীনতা কোন ধরনের স্বাধীনতা? আধুনিককালের দার্শনিকের আলোচনার অনেকটা ক্ষেত্রজুড়েই এখনো এই মুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। জীবনের মুক্তির পাশাপাশিই এসে পড়েছে

শিল্পের মুক্তি। কিন্তু সব কিছুর কেন্দ্রে তো সেই 'মানুষ'ই। তাকে ঘিরেই জীবন, তাকে ঘিরেই শিল্প। তাকে ঘিরেই উপন্যাস ও তার ক্রমবিকাশ।

মানিকের মতো লেখকের উপন্যাসকে একালে বিচার করতে গেলে তাকে কেবল সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে বা রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসেবে তকমা পরিয়ে দেওয়া যাবে না। *আরোগ্য* উপন্যাসটির গতিপথ খেয়াল করলে দেখা যাবে– এটি তথাকথিত সামাজিক উপন্যাসের গতি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হয়ে শেষাবধি যে জায়গাটিতে এসে থামে তার পেছনে যেন একটা রাজনৈতিক প্রণোদনাই প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজকে সুস্থ করে তুলতে হবে, সবাইকে শুধরে দেওয়ার জন্য লড়াইয়ে নামতে হবে– এমন একটা ধারায় একে মুক্ত করে দিয়েছেন মানিক। যাকে বলে 'ওপেন এন্ডিং'।

খেটে খাওয়া মানুষ, অভাব অনটনে থাকা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক অভিজাত মানুষের সমস্ত বিকারের প্রতিকার-সূত্র ওই ছোট কথাটির সঙ্গে যোগ করে দেওয়া– 'লড়াই'– যার যার অবস্থানে থেকে তার তার নিজেকে সারিয়ে তোলার লড়াইটা করতে হবে সবাইকে সারিয়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে। তাহলে নাগরিক বিকারগ্রস্ত জীবনের বিকারগুলো বুঝে নেওয়ার আগেই তা দূর হয়ে যাবে। কারণ বিকার তো সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ পাবে না।

তাই *আরোগ্য* উপন্যাসটি হয়ে ওঠে এক ধরনের ব্যবস্থাপত্র, যাকে বলে প্রেসক্রিপশন। এতে উপন্যাসের শৈল্পিক সিদ্ধি কতটা অর্জিত হয়েছে– সে প্রশ্নও যেন এখানে করার সুযোগ নেই। মানিকের এই উপন্যাসে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছোড়ার কাজ করেছেন। তবে সবার জীবন শুধরে দেওয়ার লড়াইটা কীভাবে কোথা থেকে শুরু করবে কেশব তার কোনো কেন্দ্র আমার পাইনি। সে কি রাজনীতি শুরু করবে না সামাজিক আন্দোলন করবে, কোনো দলভুক্ত হবে কি হবে না তার কোনো আভাস আমরা পাইনি। অন্তত জোরালোভাবে পাইনি। কেবল ঘোষণা পেলাম যে একটি লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। সামনে কেশবের নতুন জীবন এবং সে জীবনের গল্পটা আলাদা। কিন্তু কী আছে সেই গল্পটার শেষে? সেখানে কী আরো নতুন কোনো সংকট দেখা দেবে না? ভোগের দুর্ভোগে নিমজ্জিত পৃথিবীতে যে নেমে আসতে যাচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধের, বিশ্বব্যাপী অনাগত পরিবেশ বিপর্যয়ের যে পদধ্বনি– ইদানীং আমরা যেসব আভাস পাচ্ছি সেই উপন্যাসের কাহিনী নিশ্চয়ই আলাদা। সেখানে আছে নতুন কোনো অসুখ, নতুন কোনো সংকট– সেখানে হয়তো তৈরি হবে নতুন কোনো উপন্যাস, নতুন ধরনের উপন্যাস।

মানিকের কথা— গদ্য বাস্তবের ভিতর-পিঠ

হাসান আজিজুল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল, মৃত্যুর পরেও কেটে গেল বাহান্ন বছর। মাত্র ৪৮ বছরের জীবনকালে ২৮ বছরের লেখক-জীবনে তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুলই বলতে হবে। সেদিক থেকে তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছে, এ-কথা বলার উপায় নেই, বরং লেখক হিসেবে তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টি সামনে রাখলে বুঝতে বাকি থাকে না, তাঁর রচনা পূর্ণ পরিণতিতেই পৌঁছেছিল; দীর্ঘতর জীবন লাভ করলে তাঁর লেখক-জীবনও যে দীর্ঘতর ও পূর্ণতর হত এমন মনে হয় না। বিশ বছর বয়স থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর লেখা সকাল-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ণের পূর্ণ বৃত্তই ঘুরে এসেছিল।

লিখতে শুরু করার পর থেকেই তিনি সাহিত্যপাঠকের মনোযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণ পাঠকের কথা বলছি না, জনপ্রিয়তার কথাও নয়। আদপে সাধারণ পাঠকের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি আর কবে বোঝা যায়? জনপ্রিয়তাই বা ঠিক ঠিক কী করে মাপা যায়? বই বিক্রির সংখ্যা জানতে চেয়ে বা কেমন ধরনের কত পাঠক কিনে বই পড়লেন এসব খবর নিয়ে কি খুব লাভ হয়? মানিকের বেলায় সাধারণভাবে পাঠকপ্রিয়তার কথা বলা যায় না। কিন্তু বলা চলে, সাহিত্যপাঠক বা সমঝদার পাঠকদের মনোযোগ তিনি শুরু থেকেই পাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে পত্রিকার ঝানু সম্পাদক আছেন, সাহিত্যের সমালোচক আছেন, আর অবশ্যই অনুরাগী অগ্রসর অভিজ্ঞ পাঠকও আছেন। প্রথম গল্প 'অতসীমামী' ছাপা হবার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস মনে রাখার মতো। এই গল্প লেখার আগে হাত মকশোর আরো লেখা কিছু আছে কিনা জানি না, তবে তাঁর আত্মবিশ্বাস থেকে মনে হয় 'অতসীমামী' গল্পটিকেও তিনি নেহাত কাঁচা লেখা বলে মনে করেননি। গল্পটি ছাপার পরে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক নিজে এসে দশ টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন এবং আরো গল্প চেয়েছিলেন, ছেপেছিলেন আরো দুটি গল্প। বারকতক 'মানিকলাল, মানিকলাল' বলে উল্লেখ করলেও সে-সময়ের মহাবিদ্বান জাঁদরেল সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাস নিয়ে কিছু সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন। একটা বিশেষ অবস্থান থেকে গোপাল হালদার, সরোজ দত্তর মতো সমঝদার সাহিত্যিকরাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর লেখা পড়ছিলেন, আলোচনা করছিলেন। তবু চলতি কথায় যাকে জনপ্রিয় লেখক বলা হয়, তেমন জনপ্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখনো ছিলেন না, আজও নন। তুলনায় তাঁর একেবারে সমসাময়িক দুজন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকপ্রিয়তা বেশি ছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য মুগ্ধপাঠক, বশীভূত পাঠক, প্রায় আত্মবিস্মৃত পাঠক শরৎচন্দ্রের চেয়ে বেশি আর কারো ছিল না। নিজের কথা মনে করেই একথা বলতে পারি। তবে তারপরে বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্করের কথাই বলতে হয়। বিভূতিভূষণ বরাবরই পাঠকপ্রিয়, সত্যজিৎ ছাড়াও, আজও তাই। *পথের পাঁচালী*, *আরণ্যক*, *অপরাজিত* পড়েছেন এমন অনেক অপ্রত্যাশিত অসম্ভব পাঠকের সন্ধান পেয়ে আমি

বরাবর আশ্চর্য হয়েছি। বিভূতিভূষণের পরেই কিন্তু জায়গাটা তারাশঙ্করের, মানিকের নয়।

তাহলে কি আমি জনপ্রিয়তার বিপরীতে মৌলিকতার কথা বলতে চাইছি? না, মৌলিকতা নিয়ে কোনো কথা নয়। সে বড়ো প্যাঁচালো বিষয়। বরং খানিকটা আন্দাজ হয় যে, মানিক শুরু থেকেই হতে চলেছিলেন শাসক-সাহিত্যিক। তখনকার কথা জানি না, তবে তখনকার জায়গা থেকে এখন লেখক হিসেবে মানিকের শুরুর সময়টা দেখতে গিয়ে মনে হয়, বাংলা সাহিত্য শাসনের জায়গাটা তাঁর জন্যে ক্রমেই নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। একদিনে নয়, মানিককে কোনোদিন সে-ভূমিকা দাবি করতেও হয়নি, চোখ রাঙাতেও হয় নি।

কেন মনে হয় এই কথা? তাঁকে নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বির্তক, তর্কাতর্কি, বিভ্রান্তি, ভুল বোঝা, ভুল বোঝা থামাতে মানিকের নিজের আলোচনায় যোগ দেওয়া, কখনো কৈফিয়ৎ, কখনো আত্মসমালোচনা করা সবই টানা দুটি দশক ধরে যেভাবে দেখা গেছে তাতে একদিকে যেমন সময়ের অস্থিরতা ধরা পড়ে, অন্যদিকে তেমনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনড় ধারণার আসনগুলোকেও নড়াচড়া করতে দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁকে নিয়ে লেখালিখি, বির্তক কখনো একেবারে থেমে যায়নি। বরং তৈরিই হয়ে গেছে সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বড় ধারা। এসব থেকেই তাঁর বিস্ময়কর প্রভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও স্বাভাবিক নিয়মে, ভালো-মন্দ যা-ই হোক, সবকিছু ভিন্নপথ ধরলেও মানিকের প্রতি আগ্রহ কিন্তু অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই বর্তমানে যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয়তা নয়, তাহলে এ কি মানিক-সাহিত্যের উৎকট স্বাতন্ত্র্য? হতে পারে অস্বস্তিকর কিন্তু অনস্বীকার্য মানিকের সাহিত্য-শাসনের প্রবলতা।

সাহিত্যে একটা ঐতিহ্য তৈরি হতে কত দিন লাগে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। এমন একটা ধারাই-বা কতদিনে সৃষ্টি হতে পারে যাকে বলা যাবে মূলধারা? বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের চিনতে পারার মতো একটা ধারা তৈরি হয়েছে বলে যদি মেনে নিই, তাহলে কি বলতে পারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা তা থেকে একেবারে প্রথম থেকেই ভিন্নপথে মোড় নিয়েছে? যদি পারি, তাহলে এ কথাটা বলার পরেও আমি নতুন, মৌলিক, অভিনব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে চাই না। প্রায় ধাঁধার মতো, এসব বিষয়ে সকলের স্বীকার্য সুরাহা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আমাদের মনে পড়বে নতুন-পুরনো তর্ক গত শতকের বিশের দশকেই উঠে পড়েছে, ঘোষণা দিয়ে বা না-দিয়ে। 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ইত্যাদি সাহিত্যপত্রিকা নতুন সাহিত্যের পতাকা উড়িয়ে দিয়েই কাজে নেমেছে। নতুন, বিদ্রোহী, দুঃসাহসী, আন্তর্জাতিক, আধুনিক, অলজ্জ যৌনতাচেতন ইত্যাদি লব্জ দিয়ে শ্রেণীকরণ, বর্গীকরণ তখনই বেশ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মানিক একটুখানি দেরিতে এলেন, কিন্তু এসবের কোনো কিছুতেই গেলেন না। তাঁর লেখা শুরু হল তাঁর নিজের লেখক-স্বভাবে। তাই মৌলিক, নতুন এসব না বলে বরং বলা যাক, তিনি ওইরকম। আলাদা দেখছেন, আলাদা ভাবছেন। মানুষ, সমাজ, সময় যেভাবে দেখছেন, তা একেবারেই ভিন্ন, আর কারো সঙ্গে মিলছে না। বাংলা কথাসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার কোনো ভাবনাই তাঁর মাথায় নেই। তিনি শুরু করছেন সম্পূর্ণ নিজে নিজে। হাত মকশো করবার সময়ও

যেন নেই, এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে যা লেখার। সংকল্প করছেন লেখক হবেন, আর কিছু নয়। তাঁর নিজের ভাষায় সাহিত্যের কোন শেষ থেকে তিনি শুরু করবেন তা নিয়েও তাঁর চিন্তা নেই। কাজেই প্রথম থেকেই তাঁর লেখা আলাদা আর নতুন। এইটুকুই। এখানে অন্ততপক্ষে মৌলিকত্ব, নতুনত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাটত্ব বা মহত্ত্ব ঠাহর করবার দরকার নেই। তার চেয়ে তাঁর ভিন্নতা আর নতুনত্বের ধরনটা বোঝার চেষ্টা করাই বেশি কাজের হবে।

'*অতসীমামী*' মানিকের প্রথম লেখা গল্প আর *জননী* প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও *দিবারাত্রির কাব্য* তাঁর একুশ বছর বয়সের প্রথম লেখা উপন্যাস। *জননী* নানাদিক থেকে আমাদের একটু চমকে দেয়। গল্পটিতে নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে চরিত্রগুলো বেশ চেনাই লাগে, তবু তারা সরাসরি যখন আমাদের সামনে আসে, কথা বলে, চিন্তা করে আর নানা আচরণ ও কর্মের ভিতর দিয়ে তাদের ভাবনাগুলোর সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তি মিশিয়ে নিজেদের প্রকাশ করে, তখন তারা যে আমাদের দেখা, চেনা গতানুগতিক চরিত্রগুলোর মতো নয় সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু *জননীর* খানিকটা চমকে আমরা একটু সময় নিয়েই অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এর আগে লেখা *দিবারাত্রির কাব্যের* প্রকাশকাল ১৯৩৫-এ ফিরে যেতে বলি।

আসলে কী ঘটেছিল *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসটিতে? বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্য খুব নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল? রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মনে রেখে, ভালো-মন্দ প্রশ্ন শিকেয় তুলে রেখেও কি মনে হবে একজন নতুন লেখক উপন্যাসের গদ্যকে ভিন্নতর উদ্দেশ্যে, ভিন্নতর কাজ করিয়ে সেটার জন্যে একেবারে আনকোরা করে ফেলেছেন? যদি তাই হয় তাহলে তা করার প্রয়োজন হল কেন?

মানুষ আর তার সমাজকে উলটা জায়গা থেকে বাঁকা চোখে দেখতে চাইছিলেন বলেই কি ভাষার ওই তির্যক ব্যবহার? সব রকমের সম্পর্ককে তিনি কি বিজ্ঞানের নিয়মের আওতায় দেখতে চাইছিলেন? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানবের সঙ্গে মানবীর সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক? আমাদের মধ্যবিত্তের বৃত্তের মধ্যে? প্রেম, শরীর, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ— মানব সম্পর্কের বেলায় এসবের অনুপাত কেউ কি মিলিয়ে দিতে পারবে? না, মানুষ এভাবেই একসঙ্গে সব বইতে-বইতে অস্তিত্বের দায়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বাধ্যবাধকতায় পুড়তেই থাকবে? আরো প্রশ্ন : ঠিক এই ভঙ্গি, এই জিজ্ঞাসা-কঠিন, অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত ভঙ্গি কি বাংলা উপন্যাসে এর আগে কোনোদিন দেখা গেছে? বাংলা উপন্যাসের যে ধরন-ধারণ, প্লট, গল্প-বিন্যাস, কোনো একটা কাঠামো, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পেরিয়ে যা গড়ে উঠেছিল, তার কোনোরকম ছাপ না রেখেই রচিত হয়ে গেল কি একটি উপন্যাস? কাঠামোর কথা আর কী বলব? আমরা জানি, বোধহয় উপন্যাস তিনি লিখেছিলেনও না। কী তিনি লিখছিলেন তিনিই জানেন। সম্পাদকের পরামর্শেই নাকি তিনি *দিবারাত্রির কাব্যের* একটি অংশ জমা দিতে গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সম্পাদক মহাশয় একটি সম্ভাব্য উপন্যাসকে আঁতুড়ঘরেই নুন দিয়ে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন।

কী হয়েছিল জানি না! তবে মনে হয়, এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর থেকেই বাংলা উপন্যাস আলাদা একটা ঠিকানা তৈরি করে নিল। বাস করার জন্য আলাদা একটা বাড়ি। পুরনো বাড়িটা রইল, আর অনেকদিন থাকবে হয়ত, আর যাঁরা সেখানে থাকবে তাঁরা হয়ত খানিকটা মেরামত করে নেবেন, দরকারমতো বাড়াবেন বা সংক্ষিপ্ত

করবেন। এই পুরনো বাড়ির পাশেই একজন নতুন লেখক ভিন্ন একটা নির্মাণ খাড়া করতে চাইলেন। বোঝা গেল, চলতি কাঠামো ভেঙেছে, ভাষা জটিল-কুটিল পথে চলতে শুরু করেছে, মসৃণ প্রশস্ত বড় রাস্তা থেকে পাঠকদের নেমে আসতে উসকানি দিচ্ছে। যা পরিচিত চেনা, তাকে এমন করে চিনতে বলছে যেন তা আবার অপরিচিত অচেনা হয়ে ওঠে।

আমি ভিন্নতার কথা বললাম, নতুন পথের কথা বললাম, কিন্তু কোথাও কোনোরকম শ্রেয়তার কথা তুলিনি। এমনকি, আধুনিকতা সমকালীনতার কথাও নয়। পুরনো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সবাই এখানে চলে আসবে, আসাটাতেই বাংলা উপন্যাসে প্রগতি ও আধুনিকতা এ-কথাও বলা হচ্ছে না। ঘটেও নি তেমন। বাংলা উপন্যাস অনেক বদলেছে, প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। ব্যতিক্রম হিসেবে দু-চারজন একেবারে ভিন্নপথে হেঁটেছেন। কিন্তু পুরনো, চেনা ধারাটি ঠিকই বজায় আছে। একজন সতীনাথ ভাদুড়ী, একজন কমলকুমার মজুমদার বা অমিয়ভূষণ মজুমদার কিংবা দেবেশ রায় কি এঁদেরই মতো আরো কেউ-কেউ রয়েছেন, যাঁদের রচনাকে ঠিক বাংলা কথাসাহিত্যের চেনাধারার সঙ্গে মেলানো যায় না— বাংলাদেশে যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস— তবু বলতে হয়, বাঁধা, পরিচিত সড়ক ঠিকই রয়ে গেছে। আবার যাঁদের প্রভাবশালী স্বতন্ত্র পথের পথিক বলা হল, তাঁরা সবাই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-অনুপ্রাণিত এ-কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তা যে নয়, সেটাই জোরের সঙ্গে বলা উচিত। প্রসঙ্গটা এজন্যই তোলা যে, মানিকই প্রথম পৌনে এক শতাব্দী আগে বাঙালি উপন্যাস পাঠকদের হকচকিয়ে দেন, উপন্যাস-পাঠের উপভোগ, আনন্দ, স্বস্তি আর আরামকে আয়াস-প্রাপ্য করে তোলেন। উপন্যাস-পাঠেই স্তরান্তর ঘটান; প্রবন্ধ, মননশীল রচনা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদির সঙ্গে কথাসাহিত্যের তফাৎ কমিয়ে আনেন, উপন্যাসের ধারণাটিকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। আমি মনে করি, শুদ্ধ সাহিত্যের ভাবনা মানিক পাঠকের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। একালের ইতিহাস, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যেন সাহিত্য ঠিক কী বস্তু সেটা আর নির্ধারণ করা না যায়। উপন্যাসের ভাষা, আঙ্গিক, কাঠামো, বিষয়-প্রসঙ্গ চরম মীমাংসার বাইরেই চলে যায়। সমস্ত আপ্তবাক্য বাতিল হয়ে পড়ে। উপন্যাসের একটা নতুন পথ মানিক যেন জোর করে দেগে দেন। সাহিত্যে কল্পনাবৃত্তি, সৃজনবৃত্তি, উদ্ভাবনবৃত্তির সঙ্গে মেশে বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের শুকনো-নীরস আরো কিছু ভিন্নতর বৃত্তি। ব্যবচ্ছেদে শল্য-চিকিৎসকের হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরির যে-কাজ, অনেকটা সেভাবেই বুদ্ধিকে উপন্যাসের উপজীব্য জীবন ও সমাজের তন্নতন্ন বিচারে ব্যবহার করতে চাইলেন মানিক। বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসের সূত্রপাত খানিকটা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে হয়েছিল, তবে তা ছিল গণিতের মতো শুকনো। তিনি তো কথাসাহিত্যিক ছিলেন না। তেতো, কশায়, বিস্বাদ, মিষ্ট দিনের মানুষের জীবনযাপনের রস সেখানে ঠিক মেলে নি। মানিক বুদ্ধির এই শাণিত আর আলোসদৃশ অস্ত্রটি নিয়ে জীবনের খুব ভিতরের কক্ষগুলোতে ঢুকে পড়তে চাইলেন।

জননী তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। আগে বলেছি অনেকটা চেনাই লাগছিল সেটা, খুব ভড়কে দেবার মতো কিছু আপাতদৃষ্টিতে ছিল না তাতে। বিশের দশকের শহর-নগরের উপকণ্ঠের গ্রাম-শহর মেশানো সমাজের নেহাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গল্প। গল্পের কেন্দ্রে, সংসারের কেন্দ্রে-থাকা মা। খুবই চেনা, কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই

একটু অন্যরকম। গল্প হাজির করার বেলায় অন্যরকম, চরিত্রগুলোর আচার-ব্যবহার অন্যরকম। সাদামাটা, কিন্তু সেইসব আচরণ-ক্রিয়ার পিছনে আবেগ-চিন্তা-অনুভবের, যুক্তি-বিন্যাসের ধরনটা আলাদা, একটু যেন তেরছা, যেন লুকনো-জিনিস বের করে আনার মতো। দেখতে পাচ্ছি, মানিকের স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়াটা *জননীতে* ঠিকই আছে, শুধু ঢাকনাটা আটপৌরে। বরং প্রথম লেখা কিন্তু প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের পরে প্রকাশিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবাক করা আনকোরা, নতুন, পুরোপুরি মানিকীয়। তাঁর রচনা তখন পূর্ণ বিকাশের অপেক্ষায় থাকলেও।

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *দিবারাত্রির কাব্য* পড়বার পরে মনে হয় মানিক মনস্থির করেই ভাবতে শুরু করেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে মানুষকে এবং মানুষের সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রকে ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা হয়েছে এতকাল। ছুরির নিচেও ফেলা হয় নি, অণুবীক্ষণের তলাতেও পরীক্ষা করা হয় নি। সুবিধাজনক আর স্বস্তিকর কতগুলো সামাজিক মূল্যবোধ ও ধারণাকে আঁকড়ে ধরে উপন্যাস এতকাল এগুনোর চেষ্টা করেছে। বাঁধা ও ধরে নেওয়া কতকগুলো মানুষীয়-বৃত্তি— যেমন দয়া, মায়া, সহানুভূতি, সমবেদনা, বাৎসল্য; অন্যপক্ষে লোভ, লালসা, কাম, বাসনা ইত্যাদি অবলম্বন করে সাহিত্যের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুকেই পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। এক কথায় বোধহয় গোটা মানব-অস্তিত্বটারই মুখোমুখি হওয়া যায় নি। আমরা জানি, সত্যিকার জীবনে কিছুতেই ফাঁকি চলে না, কড়ায়-ক্রান্তিতে তার পুরো মূল্য শুধতেই হয়। কিন্তু সাহিত্যে চলেছে ক্রমাগত ফাঁকি। জীবনের ছবির সবরকম রঙ সেখানে অনুপস্থিত। অনেককিছুই সেখানে কৃত্রিমভাবে গুছিয়ে নেওয়া, ওপর-ভাসা, আপ্তবাক্য ভরা। মন্থন করে দেখা হয় নি মানবিক-চেতনা অস্তিত্ব থেকে কী কী উঠে আসতে পারে। অমৃতে আত্মহারা হওয়া হয়তো চলে, কিন্তু জীবন যখন বিষ উগড়ে দেয়, তাকেও তো গলাধঃকরণ করা দরকার। জীবনটা অবিকল কী, জানা না গেলেও যতটা জানা যায়, তা জানতে চেষ্টা করা কি হবে না? সাহিত্যের কি সেই দায় একেবারেই নেই?

আমরা দেখছি, একেবারে প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* থেকেই শুরু হয়ে গেছে জীবনের ভিতর-পিঠ পরীক্ষা করা। সকলের সামনে পাতা নকশার ভালো-মন্দ বেশ দেখা যায়। উলটে, নিলে মোটা মোটা দাগ, ছেঁড়া সেলাই, রঙের ভিতর-পিঠ চোখে পড়ে। তখন যা কিছু উপায়-উপকরণ দিয়ে জীবন তৈরি সেগুলোকে আঁশে আঁশে ছড়িয়ে ছাড়িয়ে টেনে-ছিঁড়ে দেখা সম্ভব হয়। সাহিত্যের কাজের তখন আর শেষ থাকে না। জীবনকে অনেক খোপে রেখে পরীক্ষা, শুদ্ধ মানব অস্তিত্ব নিয়ে বিচার, এক-একটা বৃত্তি নিয়ে জটিল অধ্যয়ন— এসবই তখন সম্ভব হতে পারে। যেমন প্রেম— *দিবারাত্রির কাব্য*; অহিংসাবৃত্তি— *অহিংসা*; সৌন্দর্য, নারীশরীর— *চতুষ্কোণ*। এভাবেই সব সম্ভবপর মানবিক পরিস্থিতি, সম্ভবপর সব সমাজ-সম্পর্ক, তারপর সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ, দারিদ্র্যের ফাঁদে, শোষণের জালে আটকানো মানুষ, জানা-অজানা অসংখ্য সম্পর্কের জটিল-কুটিল বাঁধনের মধ্যে উদ্ধারহীন বন্দি মানুষ— লেখকের অনুসন্ধানের কাজ তো অন্তহীন!

দিবারাত্রির কাব্যের বিষয় কী? সাধারণ কথায়, এককথায়, 'প্রেম'। যে-কোনো গড়-পাঠককে জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তরই পাওয়া যাবে। মোটামুটি সন্তুষ্টই হওয়া চলে তাতে, কারণ 'প্রেম' কথাটি দিয়ে কিছু-একটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝি। তা না হলে কথাটা ব্যবহার করে কেন লোকে? বেশ তো কাজ চলে যাচ্ছে— প্রেম করতে, বা অন্যদের

প্রেমকর্ম বুঝতে, কারো আটকাচ্ছে না কোথাও। এরকম একটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে পড়া হল *দিবারাত্রির কাব্য*। গেল সব গুলিয়ে। প্রথমে ধ্বংস হয়ে গেল কথাটার গড়পড়তা মানে। চলতি, আবছা অনির্ভরযোগ্য ও ব্যক্তিগত যে-অর্থটা একরকম করে ছিল, সেটা স্রেফ উবে গেল, তৈরি হল ফাঁকা এক জায়গা, তারপর সেই ফাঁকায় এসে জমতে লাগল সন্দেহ, সংশয়, শ্লেষ-বিদ্রূপভরা নানা প্রশ্ন আর একটার পর একটা পরস্পর নির্ভরশীল, পরস্পর-বিরোধী জিজ্ঞাসার জাল বোনা শুরু হল : প্রেম কি শুদ্ধ মুগ্ধতা? কতদিনে তা ছিঁড়ে ফেঁসে যায়? প্রেম কি রক্ত-মাংসের অন্ধ তাড়না, একেবারে লৈঙ্গিক? ভীষণ ঈর্ষা, ভয়াবহ বিদ্বেষ, প্রেমের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে না কি? শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, বিবমিষা, চরম নিষ্ঠুরতা ও হনন-প্রবৃত্তি প্রেমের সহগামী হতে পারে না কি? আর ওরাই বা কারা– ওই হেরম্ব, মালতী, আনন্দ— ওরা? মানিক নিজেই বলেন, ওরা কেউ পুরোদস্তুর মানুষ নয়, কোনো একটা মানবীয় ধারণা বা বৃত্তির 'প্রজেকশন' মাত্র। আমরা দেখতে পাই মানিক, খুঁড়তে খুঁড়তে একরকম প্রায় 'ইনসেন্ট' অবধি পৌঁছে যান। *দিবারাত্রির কাব্য* পড়তে পড়তে যা ঘটতে থাকে তা শেষ পর্যন্ত এই : যে ধারণা, বিশ্বাস বা এমনকি যুক্তি মনের মধ্যে প্রোথিত-প্রতিষ্ঠিত থাকে তা ভেঙে পড়ছে কিন্তু তাদের জায়গায় নতুন কিছুই গড়ে উঠছে না, অথচ মনে হয় অনেক হাঁটা হল, দেখা হল, আলো-অন্ধকার এল, গলি-ঘুঁজি পেরনো গেল কিন্তু কোনো কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। উপন্যাস পাঠের শেষে তেতো হয়ে যাওয়া একটা বোধই যেন স্থির হয় : মানুষকে জোড়াতালি দিয়েই জীবনের কালটা খরচ করে ফেলতে হয়।

সাহিত্যে মানিকের মৌলিক কৃত্যের এই জায়গাটা মনে রেখে এইবার *জননী* পড়তে গেলে বোঝা যাবে এ-উপন্যাসের বিষয়টা আলাদা বটে, কিন্তু এর রচনার পেছনে কাজ করছে মানিকের সেই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত কঠিন লেখক-অবস্থান। যা ভাবনাহীন অন্যমনস্ক মেনে নেওয়াকে ভাঙতে ভাঙতে এগোয়, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত বা শেষ সত্য বলে কোনো কিছুকে বানিয়ে তোলে না। আলো ছড়াতে-ছড়াতে যায়, নানা কার্যকারণ সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে– বিষয় যা-ই হোক, সমাজ হোক, রাষ্ট্র হোক, দারিদ্র্য, শোষণ, নিগ্রহ, শ্রেণী- শোষণ, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, শহর-নগর গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা হোক, কোথাও তিনি কোনো লব্‌জকে পাত্তা দেন নি, ঋষি-বাক্যের দোহাই মানেন নি। নিজের স্বতন্ত্র চিন্তার প্রাধান্যতেই তিনি অকুণ্ঠে তুলে ধরেছেন। পরপর *পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জীবনের জটিলতা* ইত্যাদি উপন্যাস আর তাঁর অজস্র ছোটগল্প পড়লে বোঝা যাবে, যে-মানিকের শুরু *দিবারাত্রির কাব্য, জননীতে, অতসীমামীর* গল্পে সেই একই মানিক দ্রুত পরিণত, সমৃদ্ধ দাপটে হয়ে উঠছেন। বিষয় ক্রমাগত বদলাচ্ছে— যদিও বিশেষ একটা বিষয়-বৃত্ত নির্দিষ্ট হয়ে উঠছে, তাঁর সমবেদনা, সমর্থন, সহানুভূতি ক্রমেই শক্ত চেহারা নিচ্ছে, তবে কিছুতেই বাঁধা-পথে তিনি হাঁটতে চাইছেন না। গল্পের মানুষজন খুব বদলাচ্ছে। মিছিল করে তারা আসছে, এঁদো, বদ্ধ ডোবায় আটকানো গাওদিয়া গ্রামের নানা পেশার মানুষজন, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জোয়াল-আটকানো পদ্মাতীরের গরিবের গরিব মৎস্যজীবী জেলে-সম্প্রদায়, নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে তাঁর রচনায় দেখা দিচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যেই বস্তুবাদী, জীবনবাদী, বাস্তববাদী ইত্যাদি নানা খেতাব জুটে যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর মাঝ-চল্লিশে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পর এসে যাচ্ছে একটা স্থায়ী মার্কা— সাম্যবাদী, সমাজবাদী, বামপন্থী লেখক। বলতে কী এসব উপাধির সত্যিকার কোনো নির্দিষ্ট মানে নেই। সাধারণভাবে কিছু একটা

বোঝাতে পারে হয়ত। কিন্তু দু-একটি প্রশ্ন তুলতেই, যেটুকু বা বোঝা যায় তা আর ধোপে টেকে না। জীবনবাদী, বস্তুবাদী নয় কোন লেখক? অ-বাস্তববাদী লেখক আছে নাকি কোথাও? আমার ধারণা, মানিক নিজেকে কমিউনিস্ট মনে করলেও কোনো খেতাব বা মার্কায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মুখে কী বলতেন, না বলতেন, তা ধর্তব্য নয়। তাঁর সব লেখা, শেষ লেখা পর্যন্ত প্রমাণ দেয়, সাহিত্য হিসেবে দাঁড়াক না-দাঁড়াক, যুক্তি-প্রক্রিয়া হাস্যকর হয়ে উঠুক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিটা ভুয়ো-ঠুনকো মনে হোক, তবু যে— মন্থনকারী, খননকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা শুরু থেকেই দেখে আসছি, সারাজীবন তিনি তা-ই থেকে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বটের বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য ইত্যাদি সবই আছে, ক্ষীণ বটচারা কোনোরকমে বাড়ে, সেই একদিন সতেজে দেখা দেয় শাখা, পাতা, ফুল-ফল নিয়ে, তারপর আকাশ ছুঁয়ে ফেলে, তারপর একদিন ঘুণ ধরে, ক্ষয়ে যায়, মরতে থাকে আর নেহাত বট বলেই বেঁচে থাকে। এই রকমই অভিজ্ঞতার লোহা-লক্কড়, আদর্শের অমোচনীয় চিহ্ন, ঘুণ-ক্ষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও আমরা দেখতে পাব।

এখন শেষ প্রসঙ্গ। দুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্ত স্বাধীন (?), অদীক্ষিত (?) স্রেফ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া 'কমিউনিস্ট' বা ঘোষিত 'বামপন্থী' লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক একেবারে দুখণ্ড। দুখণ্ড কেন? দশ খণ্ড করতে পারলেই আমাদের স্বস্তি। কারণ একজন লেখক কিছুতেই যে আটকা থাকতে চান না, কেবলই উপচে-উপচে পড়েন, যে-পাত্রে রাখতে চাই কিছুতেই তাতে ধরতে চায় না। সেজন্যে একেবারে ভাগ-ভাগ খণ্ড-খণ্ড করতে পারলেই আর আলাদা-আলাদা বাক্সে বন্ধ করে ফেললেই লেখক সহজে কব্জা হয়ে যেতে পারে। আমরা ভুলে যাই শুরুতে যেমন কোনো না কোনোভাবে শেষ আছে, শেষেও তেমনি শুরু আছে।

এইবার একটা আলাদা হিসাব করি। সব লেখকই লেখকজীবনের কোনো-একটা পর্যায়ে তাঁর সেরা লেখাগুলো লিখে ফেলেন। তারপরেই একটু-একটু করে এগিয়ে আসে অপরাহ্ণ, একটু-একটু হেলে পড়া। দেখা যাচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার আগে লেখা-শুরুর ১৫-১৬ বছরের মধ্যে মানিক তাঁর সেরা (অন্য কোনো শব্দ এক্ষুনি খুঁজে পাচ্ছি না বলেই এই পুরনো শব্দটি ব্যবহার করছি) লেখাগুলো লিখে ফেলেন। এর মধ্যে উপন্যাস-গল্প দুই-ই আছে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের পর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা বলতে পাই, উপন্যাস নয়, গল্পই বেশি : *আজকাল পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, হলুদ পোড়া*; উপন্যাসের মধ্যে দুই খণ্ডে *সোনার চেয়ে দামি, চিন্তামণি*, হয়তো বা *দর্পণ*। ভালো-মন্দ রচনা দু-পর্বেই আছে। শেষপর্বের লেখায় দেখা দিচ্ছে নানারকম 'ম্যানারিজম', অনেক লেখার ক্লান্তি, অভ্যাসে ভাসা-ভাসা লেখা, মনের মধ্যে বেড়ির মতো চেপে-বসা চিন্তাভাবনা সৃজন-প্রক্রিয়ার নিপীড়ন। তেমনি প্রথম পর্বেও ছিল একধরনের কচলাকচলি, ক্লিনিক্যাল মনোবিকলনের নাছোড় প্রবণতা। শেষদিকে আরো দেখা দিয়েছিল শ্রেণীতত্ত্বে, শ্রেণীসংগ্রামে নিজের ওপর নিজের চাপানো আস্থায় ইচ্ছাপূরণের চরিত্র আর ঘটনার সৃষ্টি করা। সব মিলিয়েই মানিক। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, মার্কসীয় দর্শন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই গ্রহণ করেছিলেন। এসব তত্ত্ব তাঁকে অধিকার করে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বানায় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি

অশ্রুকুমার সিকদার

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে মোটামুটি দুই পর্বে ভাগ করে দেখার একটি প্রচলিত প্রবণতা আছে। *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) থেকে *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) পর্যন্ত এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— অ-কমিউনিস্ট। আর *দর্পণ* (১৯৪৫) থেকে *মৃত্যুকাল* ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আর এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সকলেই একমত যে প্রথম পর্বের রচনায় যে অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভার দীপ্তি ও শিল্পগত সার্থকতা লক্ষ করা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের রচনায়, কমিউনিস্ট হওয়ার পর থেকে শেষ বারো বছরের রচনায় তার অনেকটাই অনুপস্থিত। অবশ্য দু-একজন বলেছেন, এই বারো বছরে মানিকের সৃজনী প্রতিভার অপকর্ষ ঘটেছিল এই কথা নিতান্ত কিংবদন্তী, বরং "লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রগতির প্রমাণ তাঁর শেষ দশ বছরের গল্প উপন্যাসেই স্পষ্ট।"[১] কিন্তু এই মত নিতান্ত ব্যতিক্রম। যে-সমস্ত সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁরাও বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর রচনার অপকর্ষ ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। এই সময়কার উপন্যাস সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কেউ লিখেছেন, "সমাজপ্রেক্ষিতের উপর বেশি জোর দিতে গিয়ে মনের জগৎ হারিয়ে গেছে অতি— সরলীকরণে।"[২] "নতুন রূপরীতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি"[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু কেন এই ব্যর্থতা? কেন দশ বছরের মধ্যে, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে তীব্রভাবে জ্বলে উঠে ফুরিয়ে গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত পৌরুষময় সাহিত্যজীবন? বাকি বারো বছর তিনি কি শুধু ব্যর্থতার জের টেনে চললেন? কেনই বা সেই ব্যর্থতা? এই বারো বছরের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্জৈবনিক ইতিহাসের অনেক ইশারা রয়ে গেছে তাঁর ডায়েরিতে। তার ভূমিকায় বলা হয়েছে, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির শেষ চার-পাঁচ বছরের লেখায় তাঁর অতি-ব্যক্তিগত জীবনের যে প্রসঙ্গগুলি ক্লান্তিহীন ধ্রুবপদের মতো ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়, তা অসুখ, আসক্তি ও দারিদ্র্য।"[৪] চিকিৎসাতীত অসুখ ও আসক্তি এবং স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্যের সমবেত আক্রমণে তাঁর অস্তিত্বসুদ্ধ এই পর্বে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এদেরই যুগপৎ আক্রমণের শিকার হয়ে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তাদেরই ব্যূহবদ্ধ আক্রমণে তাঁর সাহিত্যজীবন হয়েছিল বিপর্যস্ত, তাঁর রচনা হারিয়েছিল অভ্রান্ত শিল্পিত পরাক্রম। দায়ী তাহলে এই তিন শত্রু— অসুখ, আসক্তি আর দারিদ্র্য।

কিন্তু শেষ পর্যায়ের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার সংকট ও ভাঙনের কারণ হিসেবে এই সব যুক্তি কতোদূর গ্রহণযোগ্য? প্রথমত, তাঁর অসুখ, তাঁর চিকিৎসাতীত

ধর্মাবলম্বীর পক্ষে যদি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়, তাহলে কমিউনিস্টের পক্ষেও বা হবে না কেন? ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি গভীর আনুগত্য সত্ত্বেও এলিয়ট বা ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন; কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও এলুয়ার বা নেরুদা দিয়েছেন উল্লেখযোগ্য সৃজনীপ্রতিভার পরিচয়। একজন দীক্ষিত কমিউনিস্ট সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি হিসেবে কৃতিত্ব কম নয়। তাছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের ইতিহাসও এই সরল সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। কারণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ১৯৪৪ সালে, অথচ তারপরেও তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন; লিখেছেন, *দর্পণ*, *চিন্তামণি*, *চিহ্ন*। লিখেছেন প্রথম শ্রেণীর কিছু ছোটগল্প। আসলে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা বা কমিউনিস্ট দলে যোগদান থেকে মানিকের সাহিত্যজীবনের অবক্ষয় শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে আরো পরে। যাঁরা ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ঘটনাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের জলবিভাজিকা হিসেবে দেখতে চান, তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদনাজনক নিয়তির কারণ নির্ণয়ে তত উৎসাহী নন, যত উৎসাহী তাঁর রাজনৈতিক মত ও সাহিত্যাদর্শকে আক্রমণ করতে।

কমিউনিজমের মতাদর্শে দীক্ষার মধ্যে নয়, একটা বিশেষ সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পদ্ধতিকৌশল ও পার্টির সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক ব্যবহারের মধ্যে হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তাঁর সাহিত্যজীবনের ভাঙনের ইতিহাস ১৯৪৪ সাল থেকে শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সালের পর। ১৯৪৮ সালের পর *সোনার চেয়ে দামীর* প্রথম খণ্ড বাদ দিলে তিনি আর কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখে উঠতে পারলেন না। আর সেই অবক্ষয়ের নিহিত হেতুর সন্ধান করতে হবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের বিশেষ পর্বে, যখন ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অতি-বাম বিচ্যুতি ও তার প্রক্রিয়ায় দক্ষিণপন্থী শোধনবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই বিরুদ্ধ প্রবণতার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছিল তথাকথিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে এবং নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে— ব্যক্তি মানিক ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর।

সেই বিতর্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের পক্ষে কতোটা মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিকর হয়েছিল তা নির্ণয় করতে গেলে ভূমিকা রচনার জন্য আমাদের খানিকটা দূরে যেতে হবে— দেশগতভাবে, কালগতভাবে। লেনিনের ১৯০৫ সালে লেখা 'Party Literature and Party Organization' প্রবন্ধটিকে শিল্পসাহিত্যে কমিউনিস্ট সংকীর্ণতাবাদ ও গোঁড়ামির বাইবেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালের 'Drushba Narodov' নামক সোভিয়েত পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় ক্রুপস্কায়ার যে চিঠি ছাপা হয় তা থেকে জানা যায় ঐ প্রবন্ধের বিবেচ্য 'পার্টি-সাহিত্য'; রম্যসাহিত্যের নান্দনিক গুণাগুণ নির্ণয়ের প্রশ্ন ঐ প্রবন্ধের বিবেচনার বিষয় ছিল না। সে যাই হোক, রুশ-বিপ্লবের পরে, তৃতীয় দশকে বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ কম ছিল বলে সাহিত্য ও শিল্পকলায় দেখা দিয়েছিল সৃজনশীলতার এক আশ্চর্য উচ্ছ্বাস। অন্তত ১৯৩২ সাল পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ সার্বভৌম হয়ে ওঠে নি— শিল্পীর আত্মবিকাশের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। ফলে চিত্রকরদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে— "The Revolution gave a reality to their activity and a long-

sought direction to their energies."[১৪]— সে কথাসাহিত্যিকদের সম্বন্ধেও সত্য ছিল। কিন্তু নেতৃত্বের রশ্মি স্ট্যালিনের হাতে একত্রিত হবার পর লেখকদের ইউনিয়ন সংগঠিত হলো। ১৯৩৪ সালে ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে জ্দানভের জবানিতে সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম্ রাষ্ট্রীয় সাহিত্যাদর্শের মর্যাদা অর্জন করলো।[১৫] সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আমলাতান্ত্রিক হুকুমনামার পরিণাম হলো, একজন পশ্চিমি কমিউনিস্টের ভাষায়, "Conformism was enforced on pain of death or withdrawl of the right to publish, and few writers were brave enough to resist relapsing into the hackwork expected of them."[১৬] মহাশুদ্ধির তাণ্ডবের কালে যথার্থ শিল্পীদের ললাটে জুটেছিল তাই জীবননাশ, নির্বাসন, কণ্ঠরোধের নিয়তি— মায়াকোভস্কি, জেমিয়াটিন, মানডেলস্টাম, পিলনিয়াক, বাবল (যিনি বলেছিলেন, 'I have invented a new genre— the genre of silence.'), পাস্টেরনাক, বেলি, মিরস্কি, ৎস্বেতায়েভা— বিষণ্ণ সেই তালিকা দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ। লেখক শিল্পীদের উপর পার্টির আমলাতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক মুরুব্বিয়ানার পরিণাম হলো মর্মান্তিক। শুধু লেখকদের উপরে নয়, সোভিয়েত রুশসাহিত্যের উপরে। কতোদূর মর্মান্তিক হলো সেই কথা জানিয়ে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন লেখক বলেছেন, "Administrative measures lead to an impoverishment of art; literature which was written 'to order' is a caricature of committed literature."[১৭]

রাষ্ট্র ও পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় যে সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের সাহিত্য *ভূরিপরিমাণ* ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, সেই সাহিত্য আর সমাজজীবনের দ্বন্দ্বময় গতিশীলতাকে প্রতিবিম্বিত করলো না; তার কাজ হয়ে উঠলো 'the illustration of an abstract truth',[১৮] আর তার মধ্যে যে 'prettified human reality'[১৯] বিধৃত হলো তাকে বাস্তববাদ বলার অর্থ বাস্তবতা-শব্দের অর্থবিকৃতি ঘটানো। বাস্তববাদ নয়, তা হয়ে দাঁড়ালো 'socialist idealism'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, জাতীয় অস্তিত্বের সংকটের দিনে, শিল্পসাহিত্যের উপর আমলাতান্ত্রিক ছড়ি-ঘোরানোর ব্যাপার স্থগিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সেই পুরোনো অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। যুদ্ধজয়ের ফলে পূর্ব-ইউরোপে কমিউনিস্ট-পন্থী অনেক রাষ্ট্র গড়ে ওঠায় এবং অ-কমিউনিস্ট দেশেও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠায়, শিল্পসাহিত্যের উপর এই আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-প্রবণতা শুধু সোভিয়েত দেশের সীমান্তের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না, গিয়ে পড়লো বিশ্বের অন্য দেশের কমিউনিস্ট শিল্পীসাহিত্যিকের উপরেও। যতোদিন না চীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়, ততোদিন, যুগোশ্লাভ পার্টির ব্যাপার সত্ত্বেও, সোভিয়েত পার্টি অন্য সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিস্তার করেছিল অসপত্ন আধিপত্য। সোভিয়েত পার্টির ঈষৎ কোনো পাশ-পরিবর্তন, সোভিয়েত নেতৃবর্গের যে-কোনো বক্তৃতা বিস্তার করতো সুদূরপ্রসারী প্রভাব— সেই বক্তৃতা যদি স্ট্যালিনের হতো তাহলে তো কথাই নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তির পর্যালোচনায় এই সব কোনো কথাই যে অপ্রাসঙ্গিক নয় তা অচিরে প্রকাশ পাবে। নিয়তি প্রসঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথায়* যে কথা বলেছিল কুসুমের বাবা— "পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন"— সেই কথা এই প্রসঙ্গে অক্ষরে-অক্ষরে খেটে যায়।

মৃগীরোগ তাঁর সাহিত্যিক বিপর্যয়ের জন্য কতোটা দায়ী? প্রাণান্তকর পরিশ্রম, পরিবারের মানুষের ঔদাসীন্য, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ১৯৩৫-৩৬ সালের কোনো সময়ে প্রথম তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি দাদাকে জানাচ্ছেন, "আমি প্রায় দুই বৎসর হইল মাথার অসুখে ভুগিতেছি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই।"[৫] কিন্তু এই মৃগীরোগ তাঁর সাহিত্যিক সত্তার সংকটের কারণ হতে পারে না, কারণ এই রোগের আক্রমণ শুরু হওয়ার পরেও তিনি জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), সহরতলী (১৯৪০-৪১), চিন্তামণি (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭)-এর মতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন। বরং হয়তো এই রোগের দাক্ষিণ্যে তিনি অর্জন করেছিলেন এক উদ্ভট অন্তর্দৃষ্টি, যা তিনি অন্যভাবে আয়ত্ত করতে পারতেন না। অন্তত তিনি নিজেই তাঁর মৃগীরোগ-সংক্রান্ত নোটে লিখেছেন, এই রোগে আক্রমণের পরিণাম— "excessive ability for fine analysis and extraordinary imagination"।[৬] এ ব্যাপারে অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদক টোমাস মান্ বা এডমান্ড্ উইলসনের প্রতিধ্বনি করে যে-কথা বলেছেন— "ব্যাধিই চৈতন্য, চৈতন্যই ব্যাধি"[৭] সেই কথায় মন সায় দেয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে চৈতন্যের সংকটের জন্য ব্যাধিকে দায়ী করা চলে না, বরং সেই ব্যাধির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তুলনা করতে গেলে, যাঁর কথা সকলের লেখনীতে প্রথমেই সাবলীলভাবে চলে আসে সেই ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যজীবনেও মৃগীরোগ কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি[৮] বরং তাঁকে দিয়েছে সেই বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি, যার জোরে তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমা।

দ্বিতীয়ত, আসক্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদ্যপানের আসক্তিকেও কি তাঁর পরিণামী বিপর্যয়ের হেতু বলা চলে? বাঁকুড়া কলেজে মানিকের ছাত্র-জীবনের বিবরণ প্রসঙ্গে সরোজমোহন মিত্র মানিকের এক সমসাময়িকের যে-স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায়, সেই সময় থেকেই কিছু-কিছু মদ্যপানে মানিক অভ্যস্ত হয়েছিলেন।[৯] তিরিশের দশকে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে সুরাসক্তি রীতিমত ফ্যাশন ছিল। অনুমান করি, পরিবার-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানিক সহজেই এই ফ্যাশনের বশীভূত হয়েছিলেন। সুতরাং মদ্যপানের নেশায় তিনি সাহিত্যজীবনের আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন, সারা সাহিত্যজীবনে এই নেশা তাঁর সঙ্গী ছিল। সুরাসক্তি সত্ত্বেও তিনি *দিবারাত্রির কাব্য* বা *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) লিখতে পেরেছিলেন। এই নেশার ফলে শেষ পর্যায়ে তাই সমস্তরের সাহিত্য রচনায় তাঁর কোনো অনিবার্য বাধা ছিল না। জীবনের শেষে মদ্যপানের মাত্রা হয়তো বেড়েছিল, আসক্তি হয়েছিল তীব্রতর। কিন্তু সেই আসক্তিকে তাঁর সাহিত্যকসত্তার সংকটের কারণ মনে না করে বিপরীতভাবে হয়তো বলা যায়, সাহিত্যিজীবনের এই বন্ধ্যাত্ব, সৃজনশীলতার এই অভাবই তাকে হয়তো আরো নেশার গাঢ়তায় আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যতো বেশি ব্যর্থতা, ততো বেশি ব্যর্থতাকে ভোলার জন্য আসক্তির তরলতায় নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া, আর তাই আরো বেশি অক্ষম হওয়া। এই দিক থেকে মানিকের নিয়তির সঙ্গে প্রতিতুলনা করা যায় ইংরেজ কবি ডাইলান টমাসের নিয়তির। টমাসের মৃত্যু হয় ১৯৫৩ সালে, কিন্তু ১৯৫১ সালের পর তিনি আর কোনো কবিতা শেষ করতে পারেন নি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে বছরে একটি করে কবিতা লিখেছেন গড়ে। আর যতোই তাঁর সৃজনশীলতা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, ততোই সেই পঙ্গুতাকে ভোলার সহায় হিসেবে উত্তেজক পানীয় হয়ে উঠেছে তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ

পর্যায়ের সাহিত্যিকসত্তার বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে অন্যত্র, মদ্যাসক্তিতে নয়।

বাকি থাকে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য স্বেচ্ছানির্বাচিত। যে-দিন তিনি সাহিত্যচর্চাকে নিজস্ব নিয়তি বলে নির্বাচন করেছিলেন, সেই দিনই তিনি অভাবের জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দাদারা কৃতী ও সফল ছিলেন। নিজে ছিলেন মেধাবী ছাত্র। গতানুগতিক পথে চললে তাঁর পক্ষেও বৈষয়িক সাফল্যলাভ অসম্ভব হতো না। কিন্তু যে-পথে নিয়মিত উপার্জনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেই সাহিত্যরচনাকেই জীবনের যুগপৎ ব্রত ও পেশা করার ঝুঁকি নিয়ে তিনি পরিবার থেকে কার্যত হলেন নির্বাসিত। সাহিত্যচর্চার অনিশ্চয়তায় অবতীর্ণ হয়ে অনেক লেখক একটি দ্বিতীয় জীবিকা গ্রহণ করেন, শিক্ষকতা বা সাংবাদিকতা বা অন্য কিছু। কিন্তু মানিক তাও করেন নি। সারাজীবনে দুবার মাত্র চাকরিগত নিরাপত্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন, মোট চাকরিকাল বছর চারেক। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন 'নিছক কলমপেষা মজুর'।[১০] পেশাদার অথচ আপসে-অনভ্যস্ত সাহিত্যিকের অনিবার্য নিয়তি যে দারিদ্র্য তাই ছিল ফলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের নিত্যসহচর। এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি বিবাহ করেছেন, দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর সন্তান-সন্ততি জন্মেছে, দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। সাহিত্যজীবনের প্রথমে আর্থিক দারিদ্র্যের মধ্যেই জন্মেছে রচনাগত ঐশ্বর্য; শেষজীবনে আর্থিক অভাবের সঙ্গে দেখা দিল সৃজনী-প্রতিভায় দারিদ্র্য। কি করে বলি প্রথম দারিদ্র্যই দ্বিতীয় দারিদ্র্যের কারণ— কারণ অভাব-অনটন তো তাঁর প্রথম পর্বের সৃজনশীলতাকে অবরুদ্ধ করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তরকালের মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা, বর্ধিষ্ণু পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন, পিতার প্রতি দায়বদ্ধতা সেই আর্থিক সমস্যাকে হয়তো তীব্রতর করেছিল, কিন্তু কুড়ি বছরের সাহিত্যজীবনের কোনো পর্বেই তিনি আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই পান নি। সুতরাং নিছক আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এক পর্বে সৃষ্টিশীলতার পক্ষে যখন বাধা নয়, তখন অন্য পর্বেই বা হবে কেন? স্ত্রীপুত্রকন্যার মতো অসুখ, আসক্তি ও অভাব যেন তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। এদের অচ্ছেদ্য সাহচর্য বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্যই তিনি রচনা করেন নি— উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। হতে পারে সীমাবদ্ধ সময় ধরে যাদের ক্ষয়কারী সাহচর্যকে উপেক্ষা করা যায়, তারাই দীর্ঘকালীন সান্নিধ্যের সুযোগে করতে পারে স্বাস্থ্যের হানি, প্রতিভার বিনাশ। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক অকালমৃত্যুর জন্য এরাই মাত্র দায়ী নয়।

এই অকালমৃত্যুর আর একটা কারণের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরজীবনের রাজনীতি ও সাহিত্যাদর্শের প্রতি যাঁরা অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভার অকালবন্ধ্যাত্বের জন্য তাঁরা দায়ী করেন মানিকের 'ধর্মান্তর'কে।[১১] "কি সহজে হঠাৎ সব-কিছু শিশিতে-ভরা, লেবেলমারা হয়ে গেল।"[১২] কমিউনিস্ট মতাদর্শ যেই তিনি শিরোধার্য করে নিলেন অমনি "সহজ, অতি তরল হয়ে গেল সব-কিছু। চরিত্রের কোনো জটিলতা, ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন, পরিণতি কিছুই রইলো না।"[১৩] এই মতাদর্শের সার্বভৌম সর্বাত্মক প্রভাবে গল্পের নিয়ম উপেক্ষিত হয়, হারিয়ে যায় শিল্পীর জীবনকে দেখার দৃষ্টির সততা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মান্তরই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী এই মতের সমর্থক অনেক। এই মত গ্রহণের রাজনৈতিক প্রলোভন বোধগম্য, কিন্তু এই মত যুক্তি সম্মত নয়। যদি ধরেও নিই কমিউনিজম্ এক ঈশ্বর-বর্জিত ধর্ম, তাহলে অন্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো; অব্যবহিত পরেই স্ট্যালিন-সাহিত্যনীতি বিধৃত হলো সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৬ সালের ১৪ আগস্টের প্রস্তাবে, যে প্রস্তাব লেনিনের মৃত্যুর পরে-পরেই ১৯২৫ সালে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিপরীতধর্মী।[২০] এর পরেই স্ট্যালিনের শিল্পসাহিত্যনীতি-বিষয়ে মুখপাত্র জ্‌দানভ্‌ ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে দিলেন তাঁর কুখ্যাত বক্তৃতা। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলেন জোশচেঙ্কো ও আখ্‌মাটোভা। জোশচেঙ্কোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সোভিয়েত সমাজজীবনকে "unattractive and cheap"[২১] বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং আখ্‌মাটোভার রচনার বিষয় 'individualistic to the core'[২২]। অন্য সাহিত্যপাঠকের যেমন মতপ্রকাশের অধিকার আছে, তেমনি জ্‌দানভেরও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু জ্‌দানভ্‌ যেহেতু পার্টিসংগঠনের মুখপাত্র সেই কারণে এই সমালোচনার ফল হলো শাসনতান্ত্রিক। '*Leningrad*' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলো, 'Zuezda'-র পরিচালকমণ্ডলী হলো তিরস্কৃত। লেখকসমিতির সভাপতির পদ থেকে টিখোনোভ্‌ হলেন অপসারিত এবং বলাই বাহুল্য জোশচেঙ্কো ও আখ্‌মাটোভা লেখকসমিতি থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

জ্‌দানভের এই বক্তৃতা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র বিতর্কের ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘূর্ণাবর্তের আঘাত-প্রত্যাঘাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিভাবে আহত করেছিল তা বুঝতে গেলে একটি কালানুক্রমিক তালিকার প্রতি আমাদের মাঝে মাঝে নজর দিতে হবে।[২৩]

তারিখ	পত্রিকা	প্রবন্ধ	লেখক
১৪ আগস্ট ১৯৪৬	[সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্যনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব]		
২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬	[Report on the Journals 'Zvezda' and 'Leningrad']		
জ্‌দানভ্‌			
অগ্রহায়ণ ১৩৫৩	'প্রভাতী'	'নতুন সাহিত্য'	সুবোধ দাশগুপ্ত
পৌষ ১৩৫৩	'পরিচয়'	'নতুন সাহিত্য' প্রসঙ্গে	হিরণকুমার সান্যাল
চৈত্র ১৩৫৩	ঐ	'নতুন সাহিত্য'	নৃপেন্দ্র গোস্বামী
শারদীয় ১৩৫৪	ঐ	গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা	বিষ্ণু দে
অগ্রহায়ণ ১৩৫৪	'পরিচয়'	শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প [পত্রিকা প্রসঙ্গ]	নীহার দাশগুপ্ত
পৌষ ১৩৫৪	ঐ	ঐ [পাঠকগোষ্ঠী]	বিষ্ণু দে
		হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ও কুরপালা [পুস্তক পরিচয়]	হিরণকুমার সান্যাল
		সাহিত্যের চরম ও উপকরণমূল্য	আবু সয়ীদ আইয়ুব
মাঘ ১৩৫৪	ঐ	শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প [পাঠকগোষ্ঠী]	নীহার দাশগুপ্ত
		ঐ	অনিলকুমার সিংহ
		[আইয়ুবের প্রবন্ধের উত্তর]	অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
২৮ ফেব্রুয়ারি- ৬ মার্চ ১৯৪৮		[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস]	
ফাল্গুন ১৩৫৪	'পরিচয়'	শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প	

		[পাঠকগোষ্ঠী]	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
	ঐ	[আইয়ুবের প্রবন্ধের জবাব]	শীতাংশু মৈত্র
		[পরিচয়-এর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সংস্রবত্যাগ]	
চৈত্র ১৩৫৪	ঐ	বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য	আবু সয়ীদ আইয়ুব
বৈশাখ ১৩৫৫	'নতুন সাহিত্য'	প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫	'পরিচয়'	'সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ'	নীরেন্দ্রনাথ রায়
শ্রাবণ ১৩৫৫	[বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ]		
	'সাহিত্যপত্র'	পুস্তক পরিচয় ['রাজায়-রাজায়']	বিষ্ণু দে
অক্টোবর ১৯৪৮	'মার্কসবাদী'	'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'	ভবানী সেন
	ঐ	'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি'	প্রদ্যোত গুহ
২২-২৮ এপ্রিল ১৯৩৯	[প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলন]		
বৈশাখ ১৩৫৬	'পরিচয়'	'মার্কসবাদের নয়াভাষ্য'	নরহরি কবিরাজ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬	ঐ	'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম'	চিন্মোহন সেহানবিশ
জুলাই ১৯৪৯	'মার্কসবাদী'	'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা'	প্রদ্যোত গুহ
সেপ্টেম্বর ১৯৪৯	ঐ	ঐ	ভবানী সেন
শারদীয় ১৩৫৬	'ডাক'	'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'	শান্তি বসু
পৌষ ১৩৫৬	'পরিচয়'	'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ জানুয়ারি ১৯৫০	['For a Lasting Peace, For a People's Democracy'-পত্রিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নীতির সমালোচনা]		
ফাল্গুন ১৩৫৬	'পরিচয়'	'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা'	শীতাংশু মৈত্র
চৈত্র ১৩৫৬	ঐ	ঐ	নীরেন্দ্রনাথ রায়
বৈশাখ ১৩৫৭	'ইস্পাত'	'সংগ্রামী সাহিত্য'	শান্তি বসু
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	'পরিচয়'	বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা	সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭	'নতুন সাহিত্য'	'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য'	অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র
শ্রাবণ ১৩৫৭	'পরিচয়'	'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
	'নতুন সাহিত্য'	['Golden Book of Tagor' থেকে সোভিয়েত লেখক পি.এস. কোগানের রবীন্দ্রশ্রদ্ধাঞ্জলির রবীন্দ্র মজুমদার কৃত তর্জমা]	
আশ্বিন ১৩৫৭	'ইস্পাত'	সংগ্রামী সাহিত্য	প্রদ্যোত গুহ

নতুন সাহিত্য অর্থাৎ প্রগতিসাহিত্যের লক্ষণ কি তাই নিয়ে পঞ্চম দশকের গোড়া থেকে বিতর্ক শুরু হলেও, বিতর্ক প্রকৃতপক্ষে জমে উঠলো বিষ্ণু দে-র 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' প্রবন্ধকে আশ্রয় করে। সমকালে যেমন জ্দানভের বক্তৃতার তেমনি ফরাসি কমিউনিস্টদের মধ্যে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তর্কের ঢেউ এদেশে এসে পৌঁছেছিল। গারোদিপন্থীদের বক্তব্য হলো আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোনো লাইন নেই; শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে সমালোচনার অধিকার আছে সমালোচকদের। বিপরীতপন্থী আরাগঁর বক্তব্য ছিল নন্দনতত্ত্বকে ও

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে। বিষ্ণু দে ছিলেন মোটের উপর গারোদিপন্থী; নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মোটের উপর আরাগঁ-পন্থী। বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে অ-কমিউনিস্ট লেখক তারাশঙ্করের রচনায় দেখলেন 'কাঠামোর ব্যাপ্তি', অচিন্ত্যকুমারের রচনায় 'সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি'। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাসে দেখলেন 'বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টিতে কলকাতার একটি স্মরণীয় রূপ', তবু এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করে প্রশংসা করলেন অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের। কিন্তু বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমারের 'মুচিবায়েন' গল্পকে আশ্রয় করেই নীহার দাশগুপ্ত পরবর্তী প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখালেন কেন তিনি অচিন্ত্যকুমারের রচনাকে বিষ্ণু দে-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চমূল্য দিতে নারাজ। পরের সংখ্যা 'পরিচয়ে' বিষ্ণু দে তীব্র আক্রমণ করলেন নীহার দাশগুপ্তকে। সাহিত্যবিচারে তিনি গারোদপন্থায় প্রত্যাশা করলেন দলীয়তাহীন বুদ্ধির চর্চা এবং কিছুটা জ্ঞান'। সঙ্গে-সঙ্গে লিখলেন, "পাঠকেরা যেন কোনো গল্পে তেভাগা বা ঐ রকম কোনো আন্দোলনের ছক না দেখতে পেলে তার লেখককে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় উড়িয়ে না দেন।" যে সংখ্যায় বিষ্ণু দে এই কথা লিখলেন সেই সংখ্যাতেই 'পুস্তক পরিচয়ে' হিরণকুমার সান্যাল হাঁসুলীবাঁকের *উপকথা* ও রমেশচন্দ্র সেনের *কুরপালা* উপন্যাসের তুলনাত্মক আলোচনা করলেন, যে-আলোচনায় বিষ্ণু দে-র মতে প্রকাশ পেয়েছে 'ঘোর অবজ্ঞা' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি বিরোধী গোঁড়ামি'। হিরণকুমার *হাঁসুলীবাঁকের উপকথাকে* বললেন 'ভানুমতীর ভেলকি' এবং মানিকের রচনার সঙ্গে তুলনা-প্রসঙ্গে লিখলেন, *পুতুলনাচের ইতিকথার* মতন সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস নয়, এ হল ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করা ছেলেভোলানো রূপকথা।" পরবর্তী সংখ্যায় নীহার দাশগুপ্ত একদিকে বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করলেন এই বলে যে "সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন", এবং অন্যদিকে অচিন্ত্যকুমারের রচনায় বাস্তববোধের অভাবের কারণ নির্ণয় করলেন তাঁর আদর্শনিষ্ঠার অভাবের মধ্যে। একই সংখ্যায় অনিলকুমার সিংহ একটা মধ্যপন্থী মীমাংসায় আসতে চাইলেন এই বলে যে, "আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর মহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশি দেবার জন্য ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না"। ঠিক পরের সংখ্যায়, ফাল্গুনের 'পরিচয়ে' বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন আমাদের নায়ক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে বিষ্ণু দে-র 'তির্যক অবিনয়ও' শুধু প্রতিবাদের যোগ্য বিবেচিত হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টির বিকৃতি— "বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতোদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই।" মানিক তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই সিদ্ধান্তে, "দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জবাব যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখনই কলকাতায় বসেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। সেই দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে অতিবামপন্থী রণনীতি ও রণকৌশল গৃহীত হয়েছিল তার অনিবার্য প্রভাব এসে পড়েছিল সংস্কৃতিফ্রন্টে। জ্দানভ্-বক্তৃতার সঙ্গে যুক্ত হলো পার্টির নতুন অতি-বামপন্থী রণনীতি, ফলে মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের একদলের মধ্যে সহজেই অতিবামপন্থী উগ্রতা ও

হঠকারিতা অভ্যর্থিত হলো। এই পরিস্থিতিতে বিষ্ণু দে 'পরিচয়ে'র সঙ্গে ফাল্গুন ১৩৫৪ থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে তাঁর মতাবলম্বীদের আত্মপ্রকাশের মুখপত্র হিসেবে শ্রাবণ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশিত হলো। তার প্রথম সংখ্যায় তিনি বুদ্ধদেব বসুর *An Acre of Green Grass* গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে একদিকে বুদ্ধদেব বসুর ধরনের শুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক সৌকুমার্যচর্চা ও অন্যদিকে তৎকালীন পার্টিলাইনের মুখপাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনে মার্কসবাদীমনা হঠকারী অতিবামপন্থী সংকীর্ণতা ও সরলীকরণের মধ্য অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন এই দুই উগ্র মতবাদই, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের শুদ্ধতা আর মানিকের গোঁড়ামি, 'সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল'। প্রসঙ্গত তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রতি তির্যক মন্তব্য করলেন, "অসামান্য কুশলী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্ঘে যোগ না দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব।" পরবর্তী বাকবিতণ্ডায় বিষ্ণু দে আর প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন নি, কিন্তু তখন তাঁর মতাবলম্বীদের সেনাপতিত্ব করছিলেন শান্তি বসু। সে যাই হোক, সমকালে 'নতুন সাহিত্যে'র বৈশাখ ১৩৫৫ সংখ্যায় সাহিত্য সম্পর্কে তৎকালীন কমিউনিস্টদের গোঁড়ামিতে সংশয়ান্বিত হয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, "প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা মুখোশ-আঁটা Leftism-এর খপ্পরে গিয়ে পড়ছি না তো? প্রতিবিপ্লব ঠেকাতে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো অতিবিপ্লবের চোরাবালিতে?"

বিতর্ক এখানেই শেষ হলো না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলির ভিত্তিতে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মার্কসবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হলো। তারই প্রথম সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তৎকালীন গৃহীত নীতিসমূহের অন্যতম তাত্ত্বিক প্রবক্তা ভবানী সেন 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধে জানালেন, "বিষ্ণুবাবুর কলাকৌশল ও দর্শন উভয়ই ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সমাজের ক্ষয়ের পরিচয়।" তারাশঙ্কর সম্পর্কে তিনি হিরণকুমার সান্যালের সমালোচনাকে সমর্থন করলেন, অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করলেন তাও বিষ্ণু দে-র মতের বিরোধী। প্রবন্ধের শেষে মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের কি কি করণীয় তার এক তালিকাও তিনি দিয়ে দিলেন। প্রথমত, "শ্রেণীসংগ্রামকে অবলম্বন করতে হবে, শ্রেণী-নিরপেক্ষ জাতির কথা ছাড়তে হবে।..." দ্বিতীয়ত, "ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বর্জন করতে হবে, গণসমাজের কথা বলতে হবে।" তৃতীয়ত, "প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশ খুলে ধরতে হবে, তাদের ভণ্ডামিকে আক্রমণ করতে হবে, ধারালো অস্ত্রে জোরালোভাবে।" চতুর্থত, "সহজ-সরল এবং উদ্দীপনাময় কলাকৌশলের সাহায্যে সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে।" পঞ্চমত, "অধ্যাত্মবাদের শেষ সীমা ছেড়ে মার্কসবাদের পথে সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে।" 'মার্কসবাদী'র একই সংখ্যায় বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করলেন প্রদ্যোত গুহ 'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' প্রবন্ধে। তিনি বললেন 'সাহিত্যপত্রে'র প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু উপলক্ষ হলেও, বিষ্ণুবাবুর আক্রমণের আসল লক্ষ্য মানিকবাবুরাই। "বিষ্ণুবাবু মার্কসিস্ট নন, মার্কসবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব"। 'মার্কসবাদী'র জুলাই ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রদ্যোত গুহ আবার আক্রমণ করেন বিষ্ণু দে-কে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পরিচয় পত্রিকার দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদকে। পরিচয় সম্পর্কে তিনি লিখলেন, "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবিলতার বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সংগ্রাম শুরু করেছেন 'পরিচয়ে'র পরিচালকবৃন্দ তার থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না"

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়ে' 'মার্কসবাদের নয়াভাষ্য' লিখলেন নরহরি কবিরাজ। দ্বিতীয় পার্টিকংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রেরণায় এই প্রবন্ধটিতে সাহিত্যক্ষেত্রে বামপন্থী 'হঠকারিতার অট্টহাসিই যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।' নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বারে বারে তিনি জ্দানভ্ থেকে নজির দিলেন। তিনি দেখালেন, গারোদি-ভক্ত 'সাহিত্যপত্রে'র তাত্ত্বিক নেতা বিষ্ণু দে মিত্রবেশে শত্রুর কাজ করছেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন বুদ্ধদেবকে সমালোচনার ভান করলেও বিষ্ণু দে আসলে বুদ্ধদেবের ভাববাদী সাহিত্যাদর্শেরই সমর্থক। অবশেষে চূড়ান্ত কথা তিনি জানিয়ে দিলেন, "মার্কসবাদী সাহিত্যসৃষ্টির স্বাধীনতার নামে সাহিত্যিকের এই শ্রেণী-নিরপেক্ষ জনগণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুতেই বরদাস্ত করে না।" এই প্রসঙ্গে লক্ষ করি, বিষ্ণু দে যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলীয়তাবুদ্ধি, গোঁড়ামি অতিবামপন্থী উগ্রতার জন্য সমালোচনা করেছিলেন, সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অন্য পক্ষে উগ্র গোঁড়া পার্টিতাত্ত্বিকদের দ্বারা তিরস্কৃত ও সমালোচিত হয়েছিলেন। তাঁকে, একমাত্র তাঁকেই সহ্য করতে হয়েছিল যুগপৎ দুই দিকের আক্রমণ।

পাশাপাশি আর একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব 'পরিচয়ে'র পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণমূল্য' প্রবন্ধ লিখে। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর বক্তব্যের জবাব দিলেন পর-পর অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এবং শীতাংশু মৈত্র। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আইয়ুব সাহেব দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলেন ঐ বছরই চৈত্র মাসের 'পরিচয়ে'— 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য' সেই প্রবন্ধের নাম। সেই বিতর্কের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই। তিনি সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন সমকালীন আর একটি বিতর্কে। 'মার্কসবাদী' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সংখ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এক বিপ্লবাত্মক পুনর্মূল্যায়নের সূত্রপাত করেন ভবানী সেন 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধ লিখে। প্রবন্ধটিতে তিনি রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রগতিবিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার ঐতিহ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। চতুর্থ সংকলন মার্কসবাদীতে প্রকাশিত প্রদ্যোত গুহের বক্তব্য যাঁরা মেনে নিতে পারেন নি, পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত ভবানী সেনের বক্তব্য তাঁরা মেনে নিলেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেনে নেওয়ার কারণ ততোটা ভবানী সেনের প্রবন্ধের যুক্তির জোর নয়, যতোটা পার্টিতে ভবানী সেনের পদমর্যাদা। যাঁরা প্রদ্যোত গুহের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পার্টিনেতৃত্বের কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হলো। এমন সময় একই শিরোনামে 'পরিচয়ে' প্রবন্ধ লিখে বিতর্কে যোগ দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন হতে পারে, পার্টি নেতৃত্বের মতের পক্ষে একজন সৃজনশীল সাহিতিক্যের সমর্থন লিখিয়ে নেওয়া ভালো মনে করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এই প্রবন্ধ লেখানো হয় এবং 'আলোচনার জন্য' প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রবন্ধটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, সাহিত্য-ঐতিহ্য ব্যাপারে ঐ সব গোঁড়া মত মানার ব্যাপারে তাঁর মনে গভীর সংশয় ছিল। প্রদ্যোত গুহের প্রবন্ধে তিনি দেখেছেন যান্ত্রিকতার প্রভাব, অথচ "রবীন্দ্র গুপ্ত (অর্থাৎ ভবানী সেন) দেখিয়েছেন, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের (অর্থাৎ প্রদ্যোত গুহের) বক্তব্য সঠিক। আমার মতে, এটা মানতে কোনো মার্কসবাদীরই এখন— অর্থাৎ রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনা পড়বার পর, দ্বিধা হবে না।" কিন্তু এই বাক্যটির দ্বিধান্বিত গঠনেই রয়ে গেছে মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্নিহিত দ্বিধার প্রমাণ। তিনি বিষ্ণুবাবুদের আঙ্গিকবিলাসকে বলেছেন 'ফাঁকিবাজি', কিন্তু প্রদ্যোত গুহের মতো হঠকারী অতিশয়োক্তি করে বলতে পারছেন না, লোককবির আঙ্গিকই কমিউনিস্ট কবিকে গ্রহণ করতে হবে; কারণ, "এ-কবিতার আঙ্গিক মূলত পুরাণ ও পাঁচালীর আঙ্গিক— অতীতের সংগ্রামহীন শান্ত মন্থরগতি গ্রাম্যজীবনের আবেগ-চেতনা রূপায়ণের উপযোগী।" ফাল্গুনের 'পরিচয়ে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হলেন এই প্রবন্ধের জন্য, আক্রমণকারী শীতাংশু মৈত্র। শুধু নৈয়ায়িক-ধরনে তিনি স্ববিরোধ দেখিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, আক্রমণ করলেন মানিকের দ্বিধান্বিত মানসিকতাকে। এদিকে জ্‌দানভ্‌-এর বক্তৃতার আলোয় বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পুনর্বিবেচনার ও পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেন নীরেন্দ্রনাথ রায় 'পরিচয়ে'র ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। "জ্‌দানভের সমগ্র প্রবন্ধটি সতর্কভাবে পড়িলে বোঝা যায়, তিনি এখানে সকল দেশের সকল কালের বুর্জোয়া সাহিত্যের বিচার করিতেছেন না। ...এই মন্তব্যকে সমগ্র বুর্জোয়া সাহিত্যবিচারের মূল-সূত্র হিসাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিলে জ্‌দানভ-এর প্রতি অবিচার করা হয়।" সে যাই হোক, শীতাংশু মৈত্রের আক্রমণে আহত হয়ে পরের বছরের শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' ঐ নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন পৌষ ১৩৫৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি। অবশ্য শীতাংশু মৈত্রের প্রবন্ধের ব্যক্তিগত আক্রমণতীব্রতাই প্রত্যাহারের প্রধান কারণ নয়। তাই যদি প্রধান কারণ হতো তাহলে দুই প্রবন্ধের মাঝখানে দীর্ঘ ছয়মাস কালের ব্যবধান থাকত না।

আসলে, এর মধ্যে পৌঁছে গেছে For a Lasting Peace. For a People's Democracy নামক কমিনটার্নে মুখপত্রের ১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অতিবামপন্থী বিচ্যুতি ও হঠকারী নীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। শীতাংশু মৈত্রের প্রবন্ধ প্রকাশের সময় সে খবর হয়তো এসে পৌঁছোয় নি, হয়তো পৌঁছেছিল নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ রচনাকালে। অন্তত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধ রচনাকালে যে পথপরিবর্তনের নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক পথপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মত-পরিবর্তনের সূচক এই প্রবন্ধে প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য রবীন্দ্র গুপ্ত ওরফে ভবানী সেন। এবং প্রসঙ্গত ভবানী সেনের সমর্থক শীতাংশু মৈত্র। ভবানী সেনেরা মার্কসবাদের নামে এতদিন 'মারাত্মক ট্রটস্কিবাদী চোরাকারবার' করেছেন, এই হল অভিযোগ। উনিশ শতকের সাহিত্য-ঐতিহ্যের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যায় তাঁরা ডিমিট্রিফ্‌-কথিত 'national nihilism'-এর পথ ধরেছিলেন। তিনি জানালেন, "প্রগতি সাহিত্যিকদের আজ দু-ফ্রন্টে লড়াই চালাতে হবে, একদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, অন্যদিকে বামপন্থী অতি-বিপ্লববাদ— এবং বর্তমানে দ্বিতীয়টাই বেশি জরুরি।" এই সময়ে, যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে বিষ্ণু দে কর্তৃক অতিবামপন্থী গোঁড়ামির জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন এবং সম্প্রতি শীতাংশু মৈত্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন পার্টি-সাহিত্যনীতির প্রতি আনুগত্যের অভাবের জন্য, তিনি এখন আবার নতুন নীতির প্রবক্তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকলেন পরিত্যক্ত ভবানী সেন-নীতির সমর্থক হিসেবে। হঠকারী বামচারের দিনে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন ছিলেন সন্দেহ অপপ্রচারের শিকার, আজ তেমনি পরিবর্তিত অবস্থায় বিপরীতপক্ষের হাতে অপপ্রচার ও সন্দেহের শিকার হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই-পক্ষ পরস্পরকে পরস্পরের

বিচ্যুতির জন্য আক্রমণে উদ্যত হলো, উভয়পক্ষই দুই-পক্ষকে দিল ট্রটস্কিবাদী বলে মরার বাড়া গালাগাল। নীতিগত বিরুদ্ধতা নেমে এল ব্যক্তিগত বিদ্বেষের পর্যায়ে। এই পটভূমিকায় পঠিতব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি-নিবন্ধ নতুন সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব-সম্বন্ধে— নরহরি কবিরাজ, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যগুলি।[২৪] ডায়েরির মন্তব্য থেকেই জানা যায় কেমন ছিল তৎকালীন সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাসের পরিবেশ।[২৫] "স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে।"[২৬] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই জোট বাঁধার "অপচেষ্টার মূল নীতি : সাংস্কৃতিক কর্মী ও উৎসাহী সাধারণের মধ্যে হতাশা, বিভ্রান্তি ও বিভাগ বজায় রাখা, পুষ্ট করা ও সৃষ্টি করা।"[২৭] সম্পর্কের এতদূর অবনতি হয়েছিল যে, যে-অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্রকে তিনি এই চিঠিটি লিখছেন সেই অমরেন্দ্র প্রসাদ তাঁর 'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য' ('নতুন সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭) প্রবন্ধে সৃজনশীল কমিউনিস্ট লেখকদের তালিকা থেকে, যেন অসতর্কভাবে, আসলে খুব সচেতনভাবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাদ দেন। 'সুভাষ-সুকান্ত-মঙ্গলাচরণ-ননী ভৌমিক-সুশীল জানা-সলিল চৌধুরী প্রভৃতি'-র নাম থাকে, থাকে না শুধু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই, শুধু শীতাংশু মৈত্রের প্রবন্ধে আঘাত পেয়ে নয়, এই হতাশা-সন্দেহ-সঙ্কুল পরিবেশের তাড়নায়, পার্টির পথপরিবর্তনের দিনে অনুগত পার্টিকর্মী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আগের প্রবন্ধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২৮] তিনি লিখলেন, "পৌষ ১৩৫৬ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করছি। ... এরূপ প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হবে ভাবি নি। আমার ধারণা ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল বিষয়টি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ এবং এ লেখাটিও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। ... দেখা যাচ্ছে, অনেকের ধারণা এই যে, আমি এখনও উপরোক্ত প্রবন্ধের মতামত আঁকড়ে আছি। পুনর্বিবেচনার জন্য তাই এই প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হলো।" দেখা গেল, একবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কট্টর উগ্রপন্থী বলে, আর একবার আক্রান্ত হলেন ততো উগ্রপন্থী নন বলে, তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন আবার উগ্রপন্থী বলে।

জ্দানভ্-ভবানী সেনের সাংস্কৃতিক মত সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা নিয়ে সমালোচনা শুধু শীতাংশু মৈত্র করেন নি। সেই সময় আর একটি বিতর্কে জড়িত হয়েও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছিল। 'পরিচয়ে'র জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬ সংখ্যায় 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামে চিন্মোহন সেহানবিশের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই প্রবন্ধের সামান্য কিছু আগে ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত হয়। 'সাহিত্য ও গণসংগ্রামের' সম্পর্ক বিষয়ে দুই রকম মত দেয়া যায়। প্রথম মত হলো, ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষানসভার কর্মীর মতো সাহিত্যিক-শিল্পীর প্রত্যক্ষভাবে গণসংগ্রামে যোগ দেবার দরকার নেই। চীনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে চিন্মোহন সেহানবিশ সমর্থন করলেন দ্বিতীয় মতের। বললেন, "মজুর-কিষানকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিষান-সংগঠকেরা যে-কাজ করেন, শিল্পী-সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে শুধু গণসংগ্রামের খাতিরে নয়— সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও। ... অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের নামে দূরত্ব বজায় রাখা চলবে না— বিশেষ সুবিধা দাবি করা চলবে না। ... তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষানসভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে যদি দুচার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর

মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই— আগামী দিনের ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। ... কবিকে, শিল্পীকে, সাহিত্যিককে ট্রেড ইউনিয়ন-ভুক্ত মজুর ও কিষানসভার কিষানের সহকর্মী হতেই হবে— তাদের বিপ্লবী কাজের দর্শকমাত্র নয়। ... আমি জানি এ-প্রসঙ্গে বিপ্লবী কাজের মধ্যেও কাজ-ভাগাভাগির কথা উঠবে। এই মুহূর্তে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে মজুর-কিষান আন্দোলন বিনা শর্তে আত্মনিয়োগ করার পথে নানা অসুবিধার কথা উঠবে; আত্মনিয়োগ করলেই সৎসাহিত্য সৃষ্টি হবে— এ মত যান্ত্রিকতাদুষ্ট, এমন কথা উঠবে। এ সবই ঠিক; কিন্তু এ সবের বিচার হবে প্রাথমিক সমীকরণের চেষ্টার পর। ... ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে।"

এই প্রবন্ধের পিছনে একটি পটভূমি আছে এবং যদিও এই প্রবন্ধের কোনো অংশেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই, শুধু প্রচ্ছন্নভাবে তিনিই এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের অনুসরণে পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপে, বুধাখালিতে, বড়াকমলাপুর কৃষক অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার স্বভাবতই সেই সংগ্রাম দমনের জন্য কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কমিউনিস্টদের মধ্যে সেই ঘটনায় তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট লেখকদের তরফে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়াকমলাপুরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি যেতে স্বীকৃত হয়েও শেষ পর্যন্ত বড়াকমলাপুরে যান নি। নেতৃত্বের তরফ থেকে তাঁর কৈফিয়ত দাবি করা হয়। তিনি নাকি জবাবে বলেন, "এ ভাবে গেলেই আমি ভাল লিখতে পারবো এমন ধারণাকে আমি যান্ত্রিক মনে করি।" প্রত্যুত্তরে চিন্মোহন সেহানবিশ মানিককে তিবস্কার করে বলেছিলেন, "বড়াকমলাপুরে তাঁকে লেখার উন্নতির জন্য পাঠানো হচ্ছে না, এই মুহূর্তে তিনি কি লেখেন বা না-লেখেন তাই নিয়ে আমরা ব্যস্ত নই। কমিউনিস্ট হিসেবেই তাঁকে সেখানে যেতে হবে।" প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধটি এই পটভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে লেখা হয়। সেই সম্মেলনে চিন্মোহন সেহানবিশ ও অন্যান্য কিছু ডেলিগেট "সমস্ত প্রগতিবাদী লেখকদের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষানসভায় যোগদান বাধ্যতামূলক করা"র কথা সংঘের ঘোষণাপত্রে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বড়াকমলাপুর-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কৈফিয়ৎ তলব, 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট যে তিনিই এবং সংঘের সম্মেলনে কিছু ডেলিগেটের ঘোষণাপত্র সংশোধনের চেষ্টার 'পাতিবুর্জোয়া বামপন্থী বিপ্লববাদেরই' চরমতা— এই সব ব্যাপারে কোনো কিছুই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলতে পারেন নি, তার প্রমাণ 'পরিচয়ে' প্রকাশিত তাঁর প্রথম 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধটি। সেই প্রবন্ধের কোনো-কোনো অংশে মানিকের আক্রমণের লক্ষ্য চিন্মোহনের বক্তব্য। তিনি লিখেছেন, "তিনি (অর্থাৎ চিন্মোহন) চান বুদ্ধিজীবী শিল্পীসাহিত্যিক এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন যাতে দু'চার বছর তুলিকলম তাকে তুলে রাখতে হয়। দু'চার বছর তুলি-কলম চালাতে অপারগ হওয়াটাই তাঁর কাছে সংগ্রামে যথোচিত অংশ গ্রহণের মাপকাঠি।" তিনি আরো দেখাচ্ছেন, চীনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এ দেশের বাস্তব অবস্থা মেলে না, তাই চীনের দৃষ্টান্ত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। এ দেশে "অজস্র প্রচারযন্ত্র ও অসংখ্য দালালের মারফতে যেখানে অহরহ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আফিমের ধোঁয়া ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে জনসাধারণের মগজে, বুর্জোয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান কায়দা, সেখানে সেই অবস্থায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণকে কলম ও তুলির সাহায্যে জোরালো করার বদলে কলম ও তুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বলা বামপন্থী বিপ্লববাদেরই

নমুনা, সংগ্রামকে বানচাল করতে উপদেশ দেওয়া।" পরিশেষে তিনি বললেন, "সাংস্কৃতিক কর্মীদের মজুর-চাষীর সাথে কাঁধ মেলাবার প্রশ্ন। এ যেন একটা ফরমুলা দাঁড়িয়ে গেছে, যন্ত্রের মতো আমরা কথাটা আউড়ে চলেছি।" চিন্মোহন সেহানবিশের বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করলেন শীতাংশ মৈত্র তাঁর 'পরিচয়ে' প্রকাশিত ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার প্রবন্ধে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি (অর্থাৎ মানিকবাবু) নিজে চিহ্ন-এর পর আর এগুতে পারছেন না কেন? কেন কাক্দ্বীপ, তেলেঙ্গানা, মৈমনসিংহে এত রক্ত ঝরলেও আমাদের সাহিত্যিকদের কলম দিয়ে সেই সব বীরযোদ্ধাদের জন্যে এক কলম কালি ঝরে না? কেন আজ দেশের চারিদিকের বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ আমাদের শ্রমিকের সঙ্গে 'একাত্ম' সাহিত্যিকদের আত্মায় আগুন ধরাচ্ছে না?" তিনি নিজেই জবাব দিলেন প্রশ্নের, "আমরা বলছি, মার্কসবাদ বলছে, ঘরে বসে সংগ্রামী সাহিত্য হয় না।" ছয় মাস পরে যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম প্রবন্ধটিকে প্রত্যাহার করে নিলেন, তখনও তিনি প্রসঙ্গক্রমে শীতাংশু মৈত্রের 'যান্ত্রিক অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র নিন্দা করলেন। এইভাবে, এই দীর্ঘ পর্যালোচনা থেকে, দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের গোড়া থেকে ১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত এই অসামান্য সৃজনশীল লেখককে, সংকীর্ণ অতিবামপন্থী উগ্র হঠকারিতা এবং দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের কূট নৈয়ায়িক তর্কের জালে বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল; সৃষ্টিক্ষমতাহীন পার্টি-আমলাদের দ্বারা দুই দিক থেকে বার-বার আক্রান্ত হতে হয়েছিল। সহজেই অনুমান করা যায়, এই তীব্র সংবেদনশীল মন, যাঁদের বন্ধু ও সহসংগ্রামী বলে জেনেছে, তাঁদের আক্রমণে সমালোচনায় তিরস্কারে কতোদূর আহত, কতোদূর পীড়িত হয়েছিল। ...

দারিদ্র্য, আসক্তি, রোগ— এই তিন দুরন্ত শত্রুর সঙ্গে কোনোদিনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনাক্রমণচুক্তি হয় নি; এই তিন শত্রুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই তাঁর প্রতিভা বার-বার জয়ী হয়েছিল। শেষজীবনে বয়োবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যভঙ্গের সুযোগে এই তিন শত্রু তাঁকে খানিকটা কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি পরাস্ত হলেন এই তিন শত্রুর যুগপৎ আক্রমণে নয়। তিনি পরাস্ত হলেন, যাঁদের তিনি সহকর্মী ও সহযোদ্ধা বলে জেনেছিলেন তাঁদের আক্রমণে-প্রতিআক্রমণে জর্জরিত হয়ে। এমন-সব সাংস্কৃতিক নেতার আক্রমণ, যাঁদের সৃজনশীলতার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, যাঁরা জীবনে 'not breed one work that wakes'[২৯]। কমিউনিস্ট লেখক বেরটোল্ট ব্রেখ্ট লিখেছিলেন, "No painter can paint when his hand trembles before the judgement of the functionary who may perhaps be politically well-informed and conscious of his political responsibility, but who is aesthetically badly trained and not fully aware of his responsibility to the artist."[৩০] এইরকম নিয়ন্ত্রণের শাসনের পরিস্থিতিতে যখন মতাদর্শের বিরুদ্ধতার দোহাই দিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকের উপর 'administrative measure'[৩১] নেওয়া হয়, তখন চিত্রীও আঁকতে পারেন না, সাহিত্যিকের কলমও অসাড় হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও গিয়েছিল।

চিত্রী ও সাহিত্যিকের তুলনার কথাটাও সেরে নেওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, এই তারিখগত যোগাযোগকে আশ্রয় করে কেউ-কেউ মানিকের সঙ্গে পিকাসোর তুলনা করেছেন। বলেছেন, প্রথমজন অস্তিত্বের সংকট থেকে এবং দ্বিতীয়জন বাস্তবতার সংকট থেকে, সদর্থের সন্ধানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে

যুক্ত হন। দুজনকেই "সাহিত্যের ক্ষেত্রে তৎকালীন সোভিয়েট পার্টির আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সোভিয়েট লৌহযবনিকার ছাঁচে ঢালা সাহিত্য ও শিল্পের এক কঠিন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি"র[৩২] সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু পিকাসো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেও শিল্পের ক্ষেত্রে স্ট্যালিন-জ্‌দানভ্‌ নীতি বা পার্টির তত্ত্বগত খবরদারি মেনে নেন নি। বরং এই নীতি শিরোধার্য করে যে-শিল্পকলা তৎকালে সোভিয়েত ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছিল তাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। বন্ধু এরেনবুর্গকে পরিহাস করে তিনি বলেছিলেন, You ought to rationalise the production of paint. At your factories they should manufacture mixed colours and label the tubes 'For the face', 'for hair', 'for military uniform'. That would be much more practical.[৩৩] তিনি পার্টির সাংস্কৃতিক আমলাদের খবরদারি মেনে নেন নি, আমলারাও তাঁর উপরে তদারকি করতে সাহস পায় নি। অথচ পিকাসোর সমস্ত শিল্পকলা স্ট্যালিন-জ্‌দানভ্‌ সমর্থিত সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের সোচ্চার প্রতিবাদ— এমন কি যে Guernica ছবি নিয়ে পার্টি-আমলারা উচ্ছ্বসিত হয় সেই ছবিও। তবুও পিকাসোর বিরুদ্ধে পার্টির সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেয় নি, তার কারণ অনেক। অ-সূক্ষ্মদর্শী মানসিকতায় ভাষাগত প্রতিবাদ সহজেই ধরা পড়ে, রঙরেখার প্রতিবাদ ততো সহজে ধরা পড়ে না। তার চেয়েও অনেক বড় কারণ অবশ্য, পিকাসোর অসামান্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক নেতারা যেহেতু সেই যশকে নিজেদের প্রচারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে, সেই কারণে তাদের সাহস ছিলো না যে পিকাসোকে আক্রমণ বা সমালোচনা করে। পিকাসোর এক দশকের সঙ্গিনী বলেন, "Although Pablo's art was anathema to most of the Party hierarchy, they realised how useful his name and image would be to their cause."[৩৪] তাই পিকাসো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীন আত্মবিকাশে কোনো বাধা পান নি।

দুর্ভাগ্যবশত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ব্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল না। পার্টির সাংস্কৃতিক আমলাদের কাছে মানিকের সাহিত্যিক-যশ এতোটা মূল্যমান ছিলো না যে তার বিনিময়ে খানিকটা শিল্পগত স্বাধিকার তিনি আদায় করে নিতে পারেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর-এক দুর্ভাগ্য কমিউনিস্ট হিসেবে যে-সময় তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন সেই সময় ক্রেমলিনই ছিল কমিউনিস্ট রাজনীতি তথা সাহিত্যনীতির একমাত্র নিয়ামক। বহুকেন্দ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে নি তখন, একজন কমিউনিস্ট নেতার পক্ষে তখন ক্রেমলিনের সাহিত্যনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলা সম্ভব ছিল না— "But why endeavour to seek in the frozen forms of socialist realism the only valid recipe? ... let us not attempt to condemn all post-nineteenth-century art forms from the political theme of realism *at-all-costs*."[৩৫] আজ আন্তর্জাতিক কমিউনিজম্‌ যখন বহুকেন্দ্রিক, পশ্চিমি দেশসমূহেও যখন কমিউনিজমের ইতিহাস ও তত্ত্বের গভীর নিবিষ্ট, কখনো হয়তো বা ঈষৎ হেরেটিক্যাল চর্চা হচ্ছে, এদেশেও যখন আজ কমিউনিস্ট পার্টি অন্তত ত্রিধাবিভক্ত, তখন যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকতেন তাহলে অনুমান করি, এই নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট তাঁর আদর্শে'র প্রতি অনুগত থেকেও, সাহিত্যনীতি বিষয়ে সেই স্বাধিকার লাভ করতেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার ঘটতো স্বাভাবিক বিবর্তন ও যথাযোগ্য বিকাশ। সেই সুযোগ যদি তিনি পেতেন তাহলে 'বিদ্রোহী মানিক' কমিউনিস্ট মানিকের দৃঢ় প্রত্যয়

'নানা অসংলগ্নতা', 'এলোমেলো নানা চিন্তা'য়[৩৬] গ্রস্ত হতো না। তাহলে 'বিপর্যস্ত শেষজীবনের অতিগোপন মানসিক আশ্রয়' হিসেবে কোনো অতিলৌকিক মায়ের কথা ডায়েরির নিভৃত পৃষ্ঠায় তাঁকে বারবার লিখতে হতো না। তাহলে 'শেষজীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবোধ এবং এক প্রকার আধিভৌতিক বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে' 'বিশ্বাসের সংকটে' বিপর্যস্ত হতেন না। শেষ পর্যন্ত যে-নিয়তি এই অসামান্য প্রতিভাকে বেদনাজনক বন্ধ্যা-পরিণতির দিকে প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবে নিয়ে গেল, সেই নিয়তির হাত থেকে তিনি নিস্তার পেতেন। কিন্তু পেলেন না। স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়, যে কণ্ঠ থেকে গান উৎসারিত হতো, সেই কণ্ঠ সেই গান অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

তথ্যনির্দেশ

১ মালিনী ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অপ্রকাশিত*, 'এক্ষণ', ৫ম-৬ষ্ঠ, ১৩৮৩

২ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কয়েকটি নায়ক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস', 'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৬৯

৩ যুগান্তর চক্রবর্তী (সং), *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ১৯৭৬, পৃ. ৪২

৪ *তদেব*, পৃ. ২০৪

৫ *তদেব*, পৃ. ২৬৬

৬ *তদেব*, পৃ. ৪০

৭ ভূমিদাসগণ-কর্তৃক পিতার হত্যার খবর পেয়ে ডস্টয়েভস্কি প্রথম মৃগীরোগে আক্রান্ত হন, এই প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত 'Dostoevsky and Parricide' প্রবন্ধ লেখেন। এই কার্যকারণ যে আদৌ ভিত্তিহীন তা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য, Joshep Frank, Dostoevsky, the Seeds of Revolt 1821-1849, 1977, p 379-391

৮ সরোজমোহন মিত্র, '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*', ১৩৭৭, পৃ. ১২

৯ '*কেন লিখি*', '*মানিক গ্রন্থাবলী*', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ. ৪২০

১০ জ্যোতির্ময় দত্ত, 'জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬৬

১১ Camilla Gray, 'The Russian Experiment in Art' 1863-1922, 1971, p 219

১২ এই বক্তৃতায় জ্দানভ্ যখন বলেন, 'Our Soviet literature is not afraid of the charge of being 'tendentious.' Yes, Soviet literature is tendentious ...' তখন তিনি মার্কসীয় সমালোচনার ভিত্তিস্বরূপ মার্গারেট হার্কনেস ও মিন্না কাউট্স্কিকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি দুটির বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। দ্রষ্টব্য, Marx and Engels, 'Literature and Art', Bombay, 1952, p 35-40

১৩ David Craig (ed), Introduction, 'Marxists on Literature', Penguin, 1975, p 18

১৪ Max Adereth, What is Literature Engagee, David Craig (ed), p 460

১৫ Georg Lukacs, 'The Meaning of Contemporary Realism', 1962, p 119

১৬ Adolfo Sanchez Vazquez, 'Art and Society', 1973, p 34

১৭ Marc Slonim, 'Soviet Russian Literature', 1977, p 50-এ ১৯২৫ সালের সেন্ট্রাল কমিটির প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৮ Craig, p 515

১৯ Craig, p 519

২০ এই তালিকা প্রস্তুতির কাজে এবং প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগের পরবর্তী অংশ রচনায় আমি তথ্যের জন্য ধনঞ্জয় দাশ-সম্পাদিত *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, প্রথম (১৯৭৫), দ্বিতীয় (১৯৭৬) এবং তৃতীয় (১৯৭৮) খণ্ডের উপর নির্ভরশীল। এই অংশের সমস্ত উদ্ধৃতি, অন্য নির্দেশ না থাকলে, ঐ তিন খণ্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সংকলিত প্রবন্ধগুলি থেকে গৃহীত। আমার ভাষ্যের দায়িত্ব অবশ্য শ্রীদাশের নয়।

২১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে ১৪.২.৫০ তারিখে মন্তব্য পাচ্ছি- 'কমিনফর্ম। আলোড়ন। সংশোধন-দিকপরিবর্তনের সূচনা।' যুগান্তর চক্রবর্তী (সং), *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পৃ. ৬২

২২ *তদেব*, পৃ. ৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য

২৩ 'বিভ্রান্তি ও হতাশা-সুবিধাবাদ। ... প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবছে।'
তদেব, পৃ. ৬৩

২৪ *তদেব*, পৃ. ৬৪

২৫ *তদেব*, পৃ. ২২১

২৬ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৭.২.৫০ তারিখের ডায়েরি থেকে জানতে পারি এই প্রবন্ধ নিয়ে ঐদিন তিনি 'পরিচয়ে'র তৎকালীন অন্যতম সম্পাদক গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পৃ. ৬২

২৭ Gerard Manley Hopkins, "Thou art indeed just, Lord"

২৮ Frederic Ewen, Bertolt Brecht, *His Life, His Art and His Times*, 1970, p 455-এ উদ্ধৃত

২৯ Max Adereth, *তদেব*

৩০ যুগান্তর চক্রবর্তী, *সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর কবিতা*, 'এক্ষণ', কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯

৩১ Elya Ehrenburg, *People and Life*, Vol. I, 1961, p 213

৩২ Francoise Gilot and Carlton Lake, *Life with Picasso*, Signet, 1965, p 57। পিকাসো সম্পর্কে পার্টির কর্তাদের আসল মত জানা যায় একটি ঘটনা থেকে। পিকাসোর নব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭১ সালে পিকাসোর শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সেই প্রদর্শনীতে বিখ্যাত দর্শক হিসেবে ব্রেজনেভ্ উপস্থিত হলে পিকাসোর শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। ব্রেজনেভ্ বলেন, "He had a good idea to use a dove as a symbol of peace". অর্থাৎ এই প্রচারকর্মে সহায়তাই তাঁর মহিমার সারাৎসার।

৩৩ Ernesto Che Guevara, *Man and Socialism in Cuba*, John Gerassi (ed). Venceremos, *The Speeches and Writings of Ernesto Che Guevara*, 1968, p 396

৩৪ সরোজমোহন মিত্র, *তদেব*, পৃ. ১২৪

৩৫ *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পৃ. ৪৪

৩৬ 'But I subdued myself,
setting my heel,
on the throat of my song'.—Mayakovski, *At the Top of My Voice*.

ঈষৎ সংক্ষেপিত
[উৎস : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অশ্রুকুমার সিকদার, কলকাতা, ১৯৮৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তার আগে আগে বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ একটা উপনিবেশে যতোটা সম্ভব তার অনেকটাই হয়ে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে কিছু লোক বিত্ত ও দাপটের মালিক হয়েছিলো, সেই সুবাদে তাদের বংশধররা তো বটেই, বংশধরদের আশেপাশে আরো অনেকে জোতজমি করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে একটুআধটু হাত লাগিয়ে এবং চাকরি-বাকরিতে ঢুকে কিংবা উকিল-মুকতার হয়ে নিজেদের ছেলেপুলেকে লেখাপড়া করাবার সুযোগ করে নিয়েছে। আশু মুখুজ্যের কল্যাণে আর কিছু না হোক, ছেলে কিংবা জামাই যেন গ্র্যাজুয়েট হয় এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করার সাহস তখন অর্জন করেছে এমন কি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিও। বাংলার ভদ্দরলোক রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার সাধকে সংকল্পে রূপ দেওয়ার তাগিদ বোধ করছে। তা রাষ্ট্রক্ষমতা না পেলেও রাজ্যে তো বলতে গেলে কংগ্রেসের দখলে, তারা রাজত্ব চালাচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর জ্যোতির্ময় যষ্টি হাতে। ভদ্দরলোকদের ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মালা-পরানো শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও খুদিরামের পাশে ঝুলছেন মহাত্মা গান্ধী। ওদিকে স্টেটসম্যান পড়ে ইংরেজি ভাষার গৌরব রপ্ত করার সাধনা চলছে, পাশাপাশি চলছে ঠেসে বাংলা উপন্যাস পড়া। শ্রেষ্ঠ বাঙালি পুরুষ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন শীর্ষে, রবিঠাকুর তখন দেশবাসীর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব। কিন্তু তাঁর বই বিক্রি যতো হয় ততো পঠিত হয় না; ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে রবীন্দ্রসংগীত প্রচলনের জন্যে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। দেশের মানুষ তাঁকে নিয়ে যতো গর্ব করে তাঁর কথায় কান দিতে কিন্তু ততো উৎসাহ পায় না। তাদের চোখের সামনে এবং নয়নের মাঝখানে তখন গান্ধী মহারাজ। তাঁর চরণপ্রান্তে দেশবন্ধু। শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বাংলার ঘরে ঘরে।

বাংলার মুসলমানের যে ছোট অংশটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কামরায় ঢোকার জন্য উঁকিঝুঁকি মারছে, কংগ্রেসের প্রভাব তাদের ওপরেও কম নয়। ইংরেজি পড়তে পড়তে তারা একই সঙ্গে দীন ইসলাম ও মহাত্মার ভক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের দীন ও দীনের ওপর ভর করে উম্মাহ্ পরিচালনায় গান্ধীর উৎসাব প্রবল, খেলাফত কায়েমের জেহাদে তাদের সঙ্গে তিনিও শামিল হয়েছেন। আবার কামাল পাশা এসে যখন খেলাফতের পাছায় দুটো লাথি মারলেন তখন ঐ মুসলমানদেরই কামাল পাশার শক্তিতে মুগ্ধ হতে বাধলো না; এমন কি খেলাফত রক্ষার জন্যে দুদিন আগের উন্মাদনার কথা ভেবে তাদের আফসোস করতেও দ্যাখ্যা পেলো না। পীরসাহেবদের সঙ্গে গান্ধী ও দেশবন্ধুও বাংলার নতুন মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ঘরে সমান ঠাঁই পেয়েছেন। পরে এঁদের সঙ্গে শরিক হলেন ফজলুল হক। আর নজরুল ইসলাম ছিলেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের সঙ্গেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, ধর্মবিশ্বাসে উত্তেজিত করা, সাম্যবাদের ধারণায় অনুপ্রাণিত করা, ভক্তিতে আচ্ছন্ন করা এবং নারী ও পুরুষের সঙ্গে যথাক্রমে

পুরুষ ও নারীকে প্রেমে বিহ্বল ও বিরহে কাতর করা— এতগুলো এলোমেলো দায়িত্ব তিনি বেশ কার্যকরভাবে পালন করে গেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে ভালো মৌসুমও ঐটাই। রবীন্দ্রনাথের এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলো লেখা হয়েছে, তাঁর উপন্যাস লেখাও চলছে। শরৎচন্দ্রের বই একটার পর একটা বেরিয়ে সবাইকে অভিভূত করে দিচ্ছে, তাঁর সমাজ সংস্কারের ভাবনাতেও মধ্যবিত্ত অস্থির। তা খুদিরাম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, দেশবন্ধু যাদের সমানভাবে বুঁদ করে রাখতে পারে, শরৎচন্দ্রের পায়ের এলামেলো রেসে খুঁড়িয়ে চলতে তাদের বেগ পাবার কথা নয়। ধর্মভক্তি ও ধর্ম সংস্কার, সমাজের প্রতি আনুগত্য ও সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, ইংরেজের দেওয়া আধুনিক শিক্ষালাভে উৎসাহ ও শিল্পসাহিত্যচর্চায় আগ্রহ— সর্বক্ষেত্রে উত্তেজনা বাংলার মধ্যবিত্তকে একটি হৃষ্টপুষ্ট শরীরে দাঁড় করিয়ে দেয়। তো এই শরীর কি পেটানো? আমাদের বাংলা ভাষায় যাকে বলি শিলানো গতর, তাই? নাকি ফাঁপা? মধ্যবিত্তের বিকাশের সবচেয়ে প্রধান লক্ষণ যে ব্যক্তির উত্থান,-তাকে কি কোথাও ঠাহর করা যাচ্ছে? বিচিত্র সব পরস্পরবিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ সব বিশ্বাস, ভক্তি, সংস্কার, মূল্যবোধ, উত্তেজনা, প্রেরণা ও সংকল্পের নিরাপদ সহ-অবস্থানে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা একশোটা শার্লক হোমসেরও সাধ্যের বাইরে। গ্রাম থেকে শহরে আসার ফলে বড়ো পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু ভাঙা টুকরোগুলোতে পুরনো বাড়িরই ভাঙাচোরা ছায়া;-বর্ণ কি বংশ কি খানদান ছাড়িয়ে কেউ আর ব্যক্তি হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। বাংলার মধ্যবিত্তের উত্থান যে 'ব্যক্তি'টিকে পয়দা করলো সে বেচারা প্রথম থেকেই রিকেটগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ। এই মধ্যবিত্ত হলো দেশবাসীর প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তির দেওয়া উপহার। উপনিবেশের মানুষ একটু ছোটই হয়, তাকে খাটো করে রাখতে না পারলে শাসক টিকে থাকে কি করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শক্তসমর্থ 'ব্যক্তি'র অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু সমাজে যা নেই তার খোঁজ তিনি পাবেন কোথায়? নিজেদের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা এবং সঙ্কল্প ও শ্রম দিয়ে হাতে গোণা যায় এমন কয়েকজন মানুষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বে উন্নীত হন, কিন্তু এঁরা বড় হয়েছেন ব্যক্তির মাপকে ছাড়িয়ে, এঁদের দিয়ে মধ্যবিত্তের মানুষকে চিনতে যাওয়া কেবল অসমীচীন নয়, অসম্ভবও বটে।

তিরিশের দশক শুরু হতে না হতেই বাংলার মধ্যবিত্তের ওপর বড় ধরনের আঘাত আসতে শুরু হলো। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা ধাক্কা দিলো এখানেও, একটি মহাযুদ্ধের পর আরেকটি মহাযুদ্ধের যে পাঁয়তারা চলছিলো তার ঝাপটা লাগছিলো এখানেও। ইউরোপে স্বাধীন ও সবল ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে যুদ্ধের সঙ্গেই, ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে পর্যবসিত হয়েছিলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং তাকে ব্যক্তিসর্বস্বতায় অধঃপতিত করে ব্যক্তিকে একটি নিঃসঙ্গ কুৎকুতে চোখওয়ালা ঘিনঘিনে শরীরে গুটিয়ে এনে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন করে। শুরু হয়েছিলো বিপুল গর্জনে, শেষ হলো কাৎরাতে কাৎরাতে। আর আমাদের এই উপনিবেশে মধ্যবিত্তের নাবালক ও বামন সন্তান শ্রীমান ব্যক্তিবাবু চলছিলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, তাঁর খোঁড়ানোকে দ্যাখ্যা হচ্ছিলো নাচের মহড়া বলে। তা তিরিশের দশকে শ্রীমান আছাড় খেয়ে পড়েই গেলেন, তাঁর কাপড়চোপড় আর কিছুই রইলো না, রোগাপটকা গতরটা উদোম হয়ে গেলো।

ভক্তি ও বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ, সাধ ও সঙ্কল্প এবং উত্তেজনা ও প্রেরণার জবড়জঙ উর্দি তুলে নাবালক ও বামন এবং পঙ্গু ও রুগ্ন ঐ ব্যক্তিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটি হাতে নিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ছিলো খুঁটিয়ে দ্যাখার ধাত, রক্তের ভেতর তাঁর বিশ্লেষণ করার প্রবণতা। ভক্তিভাব থেকে তিনি মুক্ত একেবারে প্রথম থেকে। ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁর কাছে সমার্থক নয়, সংস্কারকে তিনি মূল্যবোধের মর্যাদা দেন না এবং প্রশ্রয় ও ভালোবাসাকে তিনি আলাদা করতে জানেন। তাই বাংলার গ্রাম মানে প্রকৃতির রূপে আত্মহারা ভূখণ্ড নয়, গ্রামের মানুষ মানে সহজ-সরল উদারহৃদয় এবং প্রেম ও করুণায় টইটম্বুর অবাধ জনগোষ্ঠী নয়। একজন তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন, ডাক্তারি বিদ্যা আয়ত্ত করে লোকটি নিজের গ্রামে ফিরে গিয়েছিলো। তার মূর্খ দেশবাসী, শূদ্র দেশবাসী ভাইদের সেবা করার নিয়ত তার ছিলো কি-না তিনি আমাদের বলেননি, তবে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে ঐ তরুণ বেশ মেলামেশা করে, তাদের চিকিৎসা করে এবং নিজের সচ্ছল ও অসচ্ছল, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজনকে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলার তাগাদা দেয়। কিন্তু উপনিবেশের প্রধান শহরটিতে তার কয়েক বছরের শিক্ষালাভ, নিজের পেশা রপ্ত করার জন্যে বিজ্ঞান পাঠ, পেশার বাইরেও অন্যান্য বিষয়ে তার পড়াশোনার অভ্যাস, শহরে থাকতে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা— সব মিলিয়ে তাকে এমন একটি প্রাণীতে পরিণত করেছে যে ঐ গ্রামে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে। শিক্ষা ও বিবেচনাবোধ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জন্মজন্মান্তরের ভক্তিভাব থেকে তাকে রেহাই দিয়েছে; কিন্তু মানুষের গদগদ ভক্তি এবং ভক্তি পাওয়ার লালসা যে মানুষকে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে তাই দেখে সে একেবারে অসহায় বোধ করে। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনকে সনাতনী আদর্শের অব্যাহত ধারা বলে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, আবার এখানে বাস করে এর মধ্যে গতিসঞ্চারের সুপ্ত ইচ্ছাও তার নেতিয়ে পড়ে। গ্রামে থেকে এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেও তাকে থাকতে হয় বাইরের লোক হয়। লোকটি মধ্যবিত্ত একজন 'ব্যক্তি', তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো লাগা-খারাপ লাগা সবই আছে। এই নিস্তেজ সমাজে বিলীন হয়ে যাওয়া তার স্বভাব নেই। কিন্তু সে হলো উপনিবেশের ব্যক্তি, সমাজে থেকেও নিজেকে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, নিজেকে আলাদাভাবে অনুভব করাও তার আয়ত্তের বাইরে। দিন যায়, স্বাতন্ত্র্যের বদলে নিজের বিচ্ছিন্নতা তার কাছে প্রকট হতে থাকে। বাপের সঙ্গে পর্যন্ত আত্মীয়তা ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে দূরত্ব। বাপের অপত্যস্নেহ চাপা পড়ে ঐ ঘোরতর বৈষয়িক বুড়োটির ক্ষুদ্রতা, লোভ আর লালসার নিচে। তার কিছুই করা হয় না। গেঁয়ো একটি মেয়ের জন্যে নিজের দুর্বলতা বুঝতে বুঝতে মেয়েটির মন থেকে সে হারিয়ে যায়। গোটা পরিবেশ দিনদিন ভোঁতা থেকে ভোঁতাতর হতে থাকে, এই অবস্থায় সে নিজেও পরিণত হয় একটি সঙ্কুচিত জীবে। ভয়াবহ রকমের বিচ্ছিন্নতায় তার ক্রমাগত ক্ষয় উপন্যাসটির পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে, লোকটিকে ঝেড়ে ফেললেই যেন পাঠক বাঁচে। কিন্তু ঝরে পড়ার মতো অলীক মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গড়েন না। গপ্পো বয়ান করার লেখক তো তিনি ননই, এমন কি চরিত্র সৃষ্টিও তাঁর কোনো প্রধান কাজ নয়। মানুষের দিকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, ইচ্ছে হোক চাই নাই হোক তার মধ্যে নিজের অনিবার্য ক্ষয় না দেখে পাঠকের আর উপায় থাকে না।

উপন্যাসের সঙ্গে পাঠক একাত্ম বোধ করবেন, এটাই তো নিয়ম। সচ্চরিত্র, সাহসী বীরপুরুষ, উন্নতশির, আত্মত্যাগী— এঁদের তো কথাই নেই, এমনি নিরীহ ভালোমানুষ, গেরস্থ টাইপের প্রেমিক, দেবদাস মার্কা ছিঁচকাঁদুনে বা অপদার্থ বেকার হলেও চলে, এমন কি বদমাইশ, লম্পট, নিষ্ঠুর, দাঙ্গাবাজ বা আলবদর কি শিবসেনা হলেও কোনো না কোনো জায়গায় লেখকের প্রশ্রয়ে চরিত্র একটুখানি হলেও ভালোবাসা দাবি করে এবং পাঠক তার ভেতর নিজেকে দ্যাখে কিংবা দেখতে চায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের লেখার লোকজন পাঠকের দুর্বলতাকেই উস্কে তোলে, তাদের মতো হওয়ার জন্যে তাকে হাতছানি দেয় না। বরং পাঠককে তারা বড়ো ঝামেলায় ফেলে, নিজের অনেক ভেতরে চোখ ফেলতে বাধ্য হয়ে সে দ্যাখে তার মধ্যে কি শোচনীয়, কি ভয়াবহ রকমের ধস নেমেছে। প্যাথলজির রিপোর্ট হাতে নিয়ে ল্যাবরেটরির দরজায় সে দাঁড়িয়ে থাকে, চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে, তার নাদুসনুদুস গতরটা তাকে এতোদিন কি প্রতারণাই না করে এসেছে! অণুবীক্ষণ যন্ত্র তার যে রোগ শনাক্ত করেছে তার চিকিৎসা কেউ জানে না। চোখের সামনে তার ঘনঘোট অন্ধকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন গভীর কোনো খাদের কিনারে, নিচের দিকে তাকালে অনিবার্য পতনের ভয় তার দাঁড়িয়ে থাকার বলটুকু পর্যন্ত শুষে নেয়।

এই রুগ্ন ব্যক্তিটি কিন্তু স্বয়ম্ভু নয়, কিংবা বহু পূর্বপুরুষদের রক্তের স্রোতে এইসব রোগ তার শরীরে উজান বয়ে আসেনি। বর্ণে, ধর্মে ও শ্রেণীতে ছেঁড়া এবং স্টেটসম্যান, রামকৃষ্ণ, খুদিরাম, মহাত্মা, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, নজরুল ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে তৃপ্ত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা হলো এই 'ব্যক্তি'র পৃষ্ঠপোষক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্বের রচনায় ব্যক্তির গভীর ভেতরকার রোগ শনাক্ত হতে থাকে তাদের লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে। এর একটি হলো অসুস্থ যৌনতা। এখানে তাঁকে ফ্রয়েডের তত্ত্বে প্রভাবিত বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা তখন থেকেই লক্ষ করা যায়। মানুষের যে জীবনস্পৃহা ও মরণপ্রবণতাকে আদিমকাল থেকে মানুষকে সমন্বয় ও সংঘাতের ভেতর পরিচালিত করে বলে ফ্রয়েড বিবেচনা করেন তা কিন্তু শ্রেণীনিরপেক্ষ, সমাজকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কহীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকজন কোনো-না-কোনোভাবে নিজ নিজ শ্রেণীগত অবস্থানের শিকার। হাজার বছর ধরে যেসব মূল্যবোধকে গৌরব দেওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে সমাজে, তারও লাভ-লোকসান হিসাব আছে, তাও শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। যাকে আমরা বিবেক বলে মহিমান্বিত করি, নিম্ন মধ্যবিত্ত একজন ভদ্দরলোক তাকেও ব্যবহার করে একেকজনের কাছে একক রকম করে। গণেশ, কুবের ও ধনঞ্জয়-পদ্মা নদীতে মাছ ধরার এই ছোট দলের তিনজনেই কিন্তু গরিব, নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। মাছ ধরার নৌকাটির মালিক বলে ধনঞ্জয়ের অবস্থানটা একটু উঁচুতে, তামাক সাজানো হলে হুঁকোতে প্রথম টানটি দেবে সে-ই এবং সুযোগ পেলেই সে কুবের ও গণেশকে ঠকায়। গণেশ লোকটা বেশ বোকা, কুবেরের চেয়েও তার আর্থিক অবস্থা খারাপ, সুতরাং কুবের তাকে অবহেলা করে। যে লোকটি কুবেরের কাছে থেকে আড়ালে দুটো ইলিশ মাছ হাতিয়ে নিয়ে 'কাইল দিমু' বলে দাম না দিয়েই কেটে পড়ে, সেও কিন্তু উচ্চবিত্ত নয়, তবে কুবেরের তুলনায় সচ্ছল এবং সর্বোপরি একজন ভদ্দরলোক তো বটেই। এখানে শোষণের বুনুনিটা বেশ বোঝা যায়। —গণেশ যদি বোকা না হয়ে একটু চালাকচতুর হতো তা হলেও কুবের কোনো না কোনোভাবে তাকে অবহেলা করতোই। ধরা যাক, ধনঞ্জয় একজন মহাপুরুষ। তা

হলেও নৌকার মালিক হওয়ার জন্যেই কুবের ও গণেশকে না ঠকিয়ে তার আর উপায় নেই, তার ঐ একটুখানি আর্থিক সঙ্গতিই তাকে ওদের ঠকাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সস্তা মাছ ছাড়া আর কিছু হাতাবার ক্ষমতা ঐ নিম্ন মধ্যবিত্তের লোকটির জীবনেও হবে না এবং এই দায়িত্বপালনে তার টার্গেট সব সময়েই নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। মেজবাবুর মতো গরিবের বন্ধু দেশের নিরন্ন মানুষকে উদ্ধারের মতলব আজো ছাড়েননি; রঙবেরঙের জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, এমন কি সমাজতান্ত্রিক পোশাক শরীরে চড়িয়ে তাঁরা এখন একটির পর একটি ভোটের বিপ্লব করেই চলেছেন। আরেকটি গল্পে পরিবারের রোজগেরে ছেলেটির প্রতি সবার উপচে-ওঠা স্নেহ কি একেবারে আকস্মিক? বিপত্নীক বেকার জ্যাঠামশায়ের চাকরি জোগাড় হয়েছে শুনে সমস্ত বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক দুধ জোগাড় করতে বেরোয় অনেক রাত্রে, দুধ না হলে জ্যাঠামশায়ের আফিমের মৌতাত জমবে না। যাকে মূল্যবোধ বলি তা তো বটেই, এমন কি মানুষের প্রবৃত্তি পর্যন্ত সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে ওঠানামা করে, সমাজকাঠামো অনুসারে তার ভাঙচুর হয়। একটি উপন্যাসে একই পরিবারের একটি ভাগ উচ্চবিত্ত এবং আরেকটি ভাগ নিম্ন মধ্যবিত্তের পর্যায়ে পড়ায় তাদের জীবনযাপন থেকে শুরু করে মানসিক গঠন পর্যন্ত আলাদা। কোনো অংশকেই গৌরব দেওয়ার বা ধিক্কার দেওয়ার প্রবণতা নেই, নির্বিকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সময় কোনো রাজনৈতিক দর্শনে আস্থা না থাকা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রবণতা, মূল্যবোধ, প্রবৃত্তি, বিকার প্রভৃতি বিশ্লেষণে তাদের শ্রেণীগত রুগ্নতার দিকে তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই সময়ের লেখায় মানুষেব যৌনতা কিন্তু মোটেই সুস্থ নয়। যৌনপ্রবৃত্তির আদিম বলিষ্ঠ প্রকৃতি এখানে অনুপস্থিত। কাম এখানে জীবনচালিকা শক্তি নয়, চরিত্রের অসুস্থ যৌনতা। তাঁর রুগ্ন মানুষ, ক্লিষ্ট মানুষ বাঁচার উত্তেজনা বরং ঐ যৌনতার ঝাঁঝ পেতে চায়। কামকে সুস্থভাবে, স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করার শক্তি থেকে তারা বঞ্চিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে চরিত্রটিকে খুব কামুক বলে ঠাহর করা হয় সে লোকটিও কিন্তু একটির পর একটি মেয়েকে আকর্ষণ করে, অথচ সুস্থ জীবনযাপনের মধ্যে কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাপনের কামনায় কারো সঙ্গে কামকে গভীরভাবে কি তীব্রভাবে অনুভব করার তাগিদ তার শরীরে কি স্বভাবে কোথাও নেই। তার যৌনতা কিংবা কাম হলো ব্যারাম, ঠিক করে বলনে, কঠিন ব্যারামের উপসর্গ।

মানুষের অনেক ভেতরে খানাতল্লাশি চালিয়ে অন্ধকার ও ঝাপসা মনোজগতের যে সুষ্ঠু পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে বের করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে এখন পর্যন্ত তা তুলনাহীন। কিন্তু অবচেতনের প্রলাপ নোট করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন নি, মানুষকে সম্পূর্ণ করে চিনতে গিয়ে তার আবেগের বিকার, বুদ্ধির অপচয় এবং শক্তির ক্ষয়কে পর্যবেক্ষণ করেছেন নানা দিক থেকে। এর প্রকাশ নির্মোহ ও নির্বিকার; কিন্তু নির্লিপ্ত কিংবা নিরপেক্ষ শিল্পী তিনি কখনোই ছিলেন না। রোগের শনাক্তকরণেই তাঁর ক্ষোভের এই প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সামাজিক অনাচার এর প্রেক্ষাপট, অনাচারটি সমাজব্যবস্থার ফল। রোগের যিনি শনাক্তকরণ করেন তিনিই অনুভব করেন যে এর প্রতিষেধক দরকার। মার্কসবাদী হওয়ার অনেক আগে থেকেই রোগ নিরাময়ের উপায় তিনি খুঁজছিলেন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও কৌশল সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল তাঁর ছিলো, কিন্তু এতে তাঁর আস্থার কোনো প্রকাশ কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নেই। রুগ্ন ও বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অবদমিত কাম, তার স্বপ্ন, অপূর্ণ কামনা ও চাপা সাধকে বিশেষ পদ্ধতিতে টেনে বের করে তাকে সাময়িকভাবে

আরাম দেওয়া যায়। অথবা পূর্বপুরুষের ভয়, আতঙ্ক, স্বপ্ন, অপমান, গ্লানি কিংবা বেদনাকে রোগের কারণ বলে নির্ণয় করলেও রোগীর নিজের দায়ভাগের মোচন হতে পারে। কিন্তু এতে আরোগ্য কোথায়? সমাজের যে ব্যবস্থা রোগের শেকড়কে লালন করে তাকে উপড়ে ফেলবে কে? উপনিবেশের জন্মপঙ্গু 'ব্যক্তি' ভুগছে সায়েবদের ব্যক্তিসর্বস্বতার ব্যারামে। এখানে কেবল রোগ বা বিকারটির দিকে সমস্ত মনোযোগ দেওয়ায় মানুষের সামগ্রিক চেহারাটিই উপেক্ষিত হয়। এই চিকিৎসা তাই কাজ করে আফিমের মতো। এতে চিকিৎসার প্রতি আকর্ষণই রোগীর দিনদিন তীব্র হতে থাকে, আরোগ্যের সঙ্কল্প তো দূরের কথা, সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা পর্যন্ত লোপ পায়। একটি উপন্যাসে উচ্চবিত্ত পরিবারের বিষাদগ্রস্ত এক মহিলাকে দেখি মনোবিজ্ঞানীদের লেখার নিয়মিত পাঠে তাঁর রোগের উপশম তো হচ্ছেই না, বরং জটিলতা বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিকে দেখতে দেখতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেন যে তার ওপর অনেক দিনের অনেক মানুষের অনেক সংস্কার ও অনেক প্রথার চাপ কি প্রকট! এই চাপটিকে তিনি পাঠককে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়েন। এইসব প্রথা ও সংস্কার লালিত হয় কড়া বিন্যাসের ভেতর, বিন্যাসটির উৎস দেখতে গেলে সমাজ ও সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি তাঁর চোখে উন্মোচিত হয়।

সমাজভাবনা কথাসাহিত্যের একটি প্রধান শর্ত। সমাজের যে কোনো রদবদল যাঁদের চোখের বিষয়, সমাজ নিয়ে উদ্বেগ কিন্তু তাঁদেরও কোনো অংশে কম নয়। বাংলা উপন্যাসের শুরুতে বিধবা বিবাহ যাঁর কাছে মূর্খের তৎপরতা এবং তরুণী বিধবা প্রেমে পড়লে মেয়েটিকে গুলি করে না মারা পর্যন্ত যাঁর শক্ত কলমটা ক্ষান্ত হয় না কিংবা আরো কিছুদিন পর সুন্দরী বিধবার ক্ষুরধার জিভে সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে লম্বাচওড়া বাণী হাঁকিয়ে তারপর তারে গৌরব দিতে ঐ জিভেই ফের হবিষ্যি ছাড়া যিনি আর কিছু তুলে দেন না, বড়ভাইয়ের পর জন্মগ্রহণে ছোটভাইয়ের আক্ষেপের কিছু নেই— এই অজুহাতে বর্ণভেদের প্রতি যিনি নিজের প্রশ্রয়ের কথা ঘোষণা করেন,— সমাজের কাঠামোয় যাতে এতোটুকু চিড় না ধরে সেজন্যে তাঁর বড়ই উদ্‌গ্রীব। সুতরাং সমাজভাবনা তাঁদের কোনো অংশে কম নয়, এটি না থাকলে অতো বড় লেখক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

সমাজভাবনা তো বটে, সেই সময়ের রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন লেখকদের অনেকেই জড়িত ছিলেন। তাঁদের সাহিত্যকর্মেও সমসাময়িক রাজনীতির পরিচয় বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় বেশিই এসেছে। বাংলা ভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখিত হয়েছে ঐ সময়েই, তার কোনো কোনোটিতে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে লেখকের অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে। এর পাশাপাশি বাংলার নিম্নবিত্ত চাষীর জীবন, পুরনো সমাজের ভাঙন, মূল্যবোধের ক্ষয় প্রভৃতির যথাযথ চেহারাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ত্যাগী পুরুষের মহিমা মানুষকে মুগ্ধ করলেও এইসব ত্যাগ দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও জীবনবোধে কি প্রভাব ফেললো কিংবা এ সবে আদৌ কোনো সাড়া পড়লো কি-না তার পরিচয় অনুপস্থিত। একজন খুবই বড়ো মাপের শিল্পীর লেখায় নিম্ন মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য প্রকাশিত হয় সমস্ত গ্লানি নিয়ে। কিন্তু এই দারিদ্র্য লেখকের নিজের এবং ঐ দরিদ্র লোকদেরও মোলায়েম ভালোবাসায় স্নিগ্ধ, পাঠক গরিব হওয়ার ধিক্কার ধরতেই পারেন না। এই যে দেশপ্রেমের দীপ্তি, আত্মত্যাগের তেজ এবং দারিদ্র্যের তাপ— এর

কোনোটাই এই সমাজের নয়, এ সবই অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে ধার করা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই জানতেন, সেই নক্ষত্র যদি আদৌ কখনো থেকেও থাকে তো তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, মৃত নক্ষত্রের আলোতে তিনি পথ চলতে চাননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক বড় লেখকদের সবারই সমকালীন রাজনীতিতে আস্থা ছিলো, মধ্যবিত্তের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কার বা আদর্শ বলে বিবেচিত সংস্কারের সহ-অবস্থানে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেননি, জগাখিচুড়ি কিছু ধারণাকে রাজনৈতিক আদর্শের মর্যাদা দেওয়ার আরামদায়ক রেওয়াজকে তাঁরা মেনে নেন উদ্দীপনার সঙ্গে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট যেভাবে তৈরি করেন তাতেই সমকালীন রাজনীতির প্রতি তাঁর প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। একটি উপন্যাসে বড়লোকের ভালো ছেলে চরিত্রটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের জেদি ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন তরুণীকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিচলিত হয়ে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে একটি মিটিং হচ্ছে দেখে সে সেখানে ঢুকে পড়ে। রাজনৈতিক সভাটির মঞ্চে বসে-থাকা বক্তাদের একজনকে সে চেনে, লোকটি পাকা ধান্দাবাজ। বক্তাদের ভাষণে তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চে উঠে পড়ে এবং নিজেই চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করে। সভায় হাজির সবাইকে সে ধিক্কার দেয় এই বলে যে, তারা সব ন্যাকা, নিষ্ক্রিয় এবং স্বার্থপর। শ্রোতারা তার কথায় মজা পেয়ে গেছে, বিক্ষুব্ধ তরুণকে আরো বলার জন্যে তারা উৎসাহিত করে। অবস্থাটা সভার উদ্যোক্তাদের জন্যে কেবল বিব্রতকর নয়, বিপজ্জনকও বটে, মিটিং তো পণ্ড হতে যাচ্ছে। এখন মঞ্চ থেকে তাকে নামাবে কে? তাদের এই বিপদ কাটে মঞ্চেরই এক নেতার ফন্দিতে। নেতা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বিক্ষুব্ধ তরুণকে ভাষণ দেওয়ার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানায়। এবার তরুণ কিন্তু বিব্রতবোধ করে, সে আর কিছু বলতে পারে না। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পড়তেই বিদ্রোহী তরুণের বিস্ফোরণ চুপসে জল। সে চুপচাপ বসে পড়ে। মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ চাপা দেওয়াই হলো নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য। আন্দোলন আর সংগ্রামের পরিণতি গড়ায় আপোস পর্যন্ত। সে সময়ের রাজনীতির সারমর্ম শেষ পর্যন্ত আপোষ এবং সেই আপোসে সাড়া দেওয়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাতে নেই। সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বে যার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন সেই লোকটি ঔপনিবেশিক শাসনে বামন, বর্ণপ্রথার চোখ রাঙানিতে জড়সড়, শ্রেণী শোষণে ক্লিষ্ট এবং আপোস করা রাজনীতিতে সন্তুষ্ট ও কাতর। শ্রীশ্রীকালীমাতার পদপ্রান্তে উত্তপ্ত মুণ্ড লুটিয়ে সায়েব মেয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞায় এরা উত্তেজিত, আবার সায়েবদের হাতে বেদম প্যাঁদানি খেয়ে অহিংসার বাণীতেও এরা মুগ্ধ। উল্লেখযোগ্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটি কখনো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় শাসন প্রবর্তনের জোশে মাতোয়ারা আবার কখনো সায়েবি কায়দায় জীবনযাপন করেও ধর্মের নাম করে নিজেদের আলাদা রাজনীতি তৈরি করতে তৎপর। মধ্যবিত্ত তখন রঙবেরঙের সংস্কারের প্রতি ভক্তিতে গদগদ, রুগ্ন ও নিস্তেজ এবং শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে রঙবেরঙের ফন্দিকে আদর্শের জোব্বা পরাতে লিপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সমাজজীবনের খুঁটিনাটি খুব বেশি নেই। কিন্তু ব্যক্তিটির দিকে নজর দিলেই তার স্রষ্টা সমাজ, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির প্রকৃতি, স্বভাব ও পরিচয় গোপন থাকে না।

আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক
অনন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে— করে হতবাক।

— এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তির রোগ নির্ণয় করেছিলেন বলেই রোগ নিরাময়ের পথ অনুসন্ধানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকণ্ঠা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও তীব্র। রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার বিলাসিতা তাঁর ছিলো না, মানুষের রুগ্ন অন্তর্লোকে খানাতল্লাশির কাজটি তিনি করেছিলেন ক্ষোভ ও উদ্বেগ নিয়ে। প্রথম থেকেই তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে, ব্যক্তি হলো সমাজের তৈরি এবং তার রুগ্নতা ও ক্ষয়ের উৎস হলো সমাজ। এই অসুস্থ ব্যক্তিটির সুস্থ হয়ে মানুষ হওয়ার জন্যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন যে সবচেয়ে জরুরি, এই কথাটি সোজাসুজি না বললেও এই অনিবার্য প্রতিষেধক সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তিনি সচেতন। সৎ, অকপট ও নির্মোহ বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষকে তার যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে অনুভব করানো ঔপন্যাসিকের কাজ, কিন্তু বড়ো মাপের শিল্পী তার মুক্তির জন্যে উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন না। জীবনের ব্যাখ্যার সঙ্গে এর পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন কার্ল মার্কস, এই পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব তাঁর দর্শনে তারও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তাই মার্কসবাদী হওয়াটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি তাঁর উটকো কোনো সিদ্ধান্ত নয়। পরবর্তী পর্বের লেখার সঙ্গে প্রথম পর্বের লেখার পার্থক্য থাকলেও কোনো বিরোধ কিন্তু নেই। বরং বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শেষ পর্বের রচনায়।

চল্লিশের দশকের শুরুতে দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। মার্কসবাদী সংগঠন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে তাৎপর্যময় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়; কলকারখানা ও রেলওয়ে শ্রমিকদের বড়ো একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শামিল হয়। সামন্ত শোষণকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার আয়োজন না থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ হলো তেভাগা আন্দোলন। কংগ্রেসের গদগদ ভক্তিভাবের আড়ালে তাদের পুঁজিবাদ তোষণ দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। কংগ্রেস প্রধানের পদ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে গান্ধীর চক্রান্ত দলের হাজার হাজার কর্মীর অনুমোদন পায়নি। গান্ধীর কর্মকাণ্ড কংগ্রেসের বহু কর্মীর কাছে তাঁর মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দেয়। এমন কি পূর্ব বাংলার নিভৃত গ্রাম থেকে কংগ্রেসের সমর্থক ও কর্মীগণ গান্ধীকে ইংরেজের বন্ধু, মন্ত্রী-উজিরদের প্রভু প্রভৃতি বিশেষণে চিহ্নিত করে মুদ্রিত লিফলেট প্রচার করে। কংগ্রেসের ভেতরকার এই অসন্তোষের কারণ যাই হোক, সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সামন্ত দাপট ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সঞ্চারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা খাটো করে দ্যাখ্যা যায় না। প্রতিক্রিয়াশীল দল মুসলিম লীগেও ইংরেজের পদলেহী সামন্ত প্রভু, নবাব, নবাবজাদা, খান বাহাদুর, খান সাহেব প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে এই

গোষ্ঠী যথেষ্ট সাড়া জাগায়। এইসব প্রতিষ্ঠানে সামন্ত দাপট ও সামন্ত সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব গড়ে উঠেছিলো কমিউনিস্টদের তৎপরতার ফলেই।

এই দশকে বাংলা কবিতায় সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রকাশ করার আয়োজন চলে। বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী ঢুকেছিলো তিরাশির দশকে, চল্লিশে এসে তারা তাদের ওপর আরোপিত মধ্যবিত্তসুলভ ভাবাবেগ ঝেড়ে ফেলার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলো। সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করে অনেক বই লেখা হতে লাগলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক শিক্ষিত তরুণ বাঙালির কাছে বিবেচিত হলো আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, আমাদের দেশেও বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী অনেকে শ্রেণী সংগ্রামের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হলেন।

তরল ভাবাবেগে পরিচালিত এবং পশ্চাৎমুখী সংস্কার ও উদ্ভট ধারণার দ্বারা পরিচালিত মধ্যবিত্তের ওপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে এই পরিবর্তনের আভাস নিশ্চয়ই প্রেরণাদায়ক। এই সময় সাহিত্যচর্চায় তিনি মানুষের এমন শক্তির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন যা দিয়ে ব্যক্তির রুগ্নতা নিরাময়ের লক্ষে সামাজিক ব্যাধি নাশ করা সম্ভব। তাঁর এই পর্বের লেখায় নতুন উদ্যোগটি পাঠকের চোখ এড়ায় না। কিন্তু মূল প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে না।

তাঁর রচনা আগের মতোই এগিয়ে চলে মানুষের স্বভাব ও প্রবণতা এবং ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে করতে। তবে এখানে এই বিশ্লেষণ পরিচালিত হলো সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে মানুষের শক্তির অনুসন্ধানে।

এই শক্তি সবচেয়ে বেশি ধারণ করে নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ। উপনিবেশের ব্যক্তিবাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে তারা মুক্ত, তারা ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়নি, হাজার দুর্বলতা নিয়েও তারা মানুষই রয়ে গেছে এবং মানুষ মানেই অনেক মানুষ, ঐক্যবদ্ধ মানুষ। সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাও তাদের একটু বেশি। এর একটা কারণ এই যে, অনেকের সঙ্গে মিলতে হলে একান্ত নিজের কিছু ছাড়তে হয়; ছাড়ার মতো জিনিস তাদের নেই বলে নিরাপত্তার পিছুটানে পদে পদে তাদের থমকে দাঁড়াতে হয় না। তবে শুধু এজন্যে নয় কিন্তু। পেশার সঙ্গে তারা অনেক ঘনিষ্ঠ, এই ঘনিষ্ঠতার ফলে একই পেশার অন্য মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার তাগিদ তাদের বেশি। তার সৃষ্টিশীলতার প্রকাশও তার পেশার মধ্যেই, এজন্যে তাকে নিভৃতে যেতে হয় না, তার জমি কিংবা যন্ত্রই তার গভীর আবেগ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে দেখি, সুতার অভাবে তাঁতিরা যখন বেকার ও নিরন্ন, হতাশ ও বিক্ষুব্ধ, তখন এক মধ্যরাতে গ্রামের নীরবতা চিরে বেজে ওঠে তাঁত চালাবার খটখট আওয়াজ। নিজের কাজ করতে না পারায় তাঁতির হাতে পায়ে খিল ধরার দশা হয়েছে; শুধু শরীরের জড়তা নয়, কর্মহীনতার মানসিক চাপ কাটাতেই সুতা ছাড়াই সে তাঁত চালাতে বসেছে। শ্রমজীবীর কাজের মধ্যেই তার প্রেরণাকে তুলে ধরে শক্তির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে যা খেয়াল করি তা হলো এই যে, সুতরা লোপাটকারী বিত্তবানদের বিরুদ্ধে গ্রামের সব তাঁতির সমবেত ক্রোধই তার সৃজনশীলতার প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু মধ্যবিত্তের বেলায় কি হবে? শোষণের প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে হোক আর ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই হোক, মধ্যবিত্তের একটা ভূমিকা থাকেই। অবচেতনভাবে এই

ভূমিকা পালন করতে করতে সৃষ্টিশীলতার শক্তি তার লোপ পায়। তার মেধা প্রয়োগ করতে হয় সমাজে বা পরিবারে নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে, এজন্যে তাকে নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতে হয়। তার বুদ্ধি মানেই ফন্দি, তার উদ্দেশ্যের প্রতিশব্দ হলো মতলব। ফন্দিপটু আর মতলববাজ লোক ব্যক্তির কোটর থেকে বেরিয়ে আর মানুষ হতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরের মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো ফন্দিচর্চা ছেড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের অধঃপতিত অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে, সমাজকে বোঝে এবং এর পবিরর্তনের জন্যে তাদের মাথাব্যাথাও প্রবল। এই শ্রেণীর অনেক তরুণকে দেখি যারা নিজের পরিবার ও শ্রেণীর 'মূল্যবোধ' ও 'নীতি'তে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম পর্বের মধ্যবিত্ত চরিত্রের দমবন্ধ হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা এখানে এসে পরিণত হয়েছে অনাস্থা ও বিরক্তিতে। কারো কারো ভেতর এই অবস্থা উঠে এসেছে ক্রোধে। এখন এই ক্রোধকে সমাজব্যবস্থা পালটাবার সংকল্পে ফুটে তোলার ক্ষমতা তাদের কতোটা?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্বের একটি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের একটি তরুণ ঐ ধরনের লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মাতৃহীন এই ছেলেটি মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবন মোটেই স্বস্তি পায় না, ভালোবাসার নামে তরল ভাবালুতা এবং স্নেহের বন্ধনের নামে পুরুষমানুষকে চিরশিশু করে রাখার প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে প্রত্যাখ্যান করে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের চেয়ে যে বরং আরাম পায় একেবারে নিম্নবিত্ত অস্পৃশ্যদের অকপট ও বেপরোয়া আড্ডায়। এদিকে দেশের পরাধীনতাও তার কাছে অসহ্য, সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে সে উদগ্রীব। কিন্তু ঐ দল তার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। দলের শক্ত শৃংখলায় বাঁধা পড়তে তার অনিচ্ছা এর আপাতকারণ হলেও সন্ত্রাসবাদীদের স্যাঁতসেঁতে সনাতন ভারতীয়তা, উদ্ভট ভারতীয় রহস্যময়তার প্রতি ঘিনঘিনে ভক্তিভাব প্রভৃতির প্রতি ঐ তরুণের ঘৃণাই তাদের সঙ্গে তার সহ-অবস্থানের প্রধান বাধা। অস্পৃশ্য নিম্নবিত্তের মদের আসরে তার আড্ডা দেওয়া কিংবা নিষিদ্ধ এলাকায় তার আসা-যাওয়া ভক্তিরসে-টইটম্বুর সন্ত্রাসবাদীদের শুচিবায়ু স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

কিন্তু তারপর? এই সাহসী ও সংস্কারমুক্ত ছেলেটি কি শেষ পর্যন্ত নিজের কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো? তার সাহস, বেপরোয়া স্বভাব, প্রতিষ্ঠিত সংস্কারকে অবহেলা করা— এসবের উৎস হলো তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মধ্যবিত্তের পঙ্গু কিংবা স্বাভাবিক পরিণতিই তাকে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ উপহার দিয়েছে, যেখান থেকে এই আলো সে ধার করেছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে কোন্ সাহসে? তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয় পারিবারিক রক্তের স্রোতে; অসুস্থ হয়ে সুন্দরী মামীর সেবা নিয়ে নিজের অজান্তেই সে সেবা করে মামীর অবদমিত কামনাকে।

চরিত্রে শক্তি এবং স্বভাবে সামঞ্জস্য পাই বরং তার চাষী বন্ধুর মধ্যে। ভদ্দরলোকের ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে পড়েও তার জাতের স্বভাব সে হারায় নি। মধ্যবিত্তের ঘোরতর ব্যক্তিবাদ থেকে সে আজন্ম মুক্ত। যেসব স্যাঁতসেঁতে আবেগ ঝেড়ে ফেলতে মধ্যবিত্তের বিদ্রোহী সন্তানকেও মুণ্ড ঝাঁকাতে হয়, সেগুলো তাকে মোটে স্পর্শই করেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার নেই, তার আছে গোঁয়ার্তুমি। এই গোঁয়ার্তুমি তাকে তার সমাজের আর দশজন থেকে বিচ্ছিন্ন তো করেই না, বরং তাদের দুর্বলতা ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করতে তাকে সাহায্য করে। তার একান্ত নিজের স্বার্থ আর পারিবারিক স্বার্থ আর তার সমাজের স্বার্থে কোনো ফারাক নেই, কোথায় রুখে দাঁড়ালে সে নিজের স্বার্থেই দাঁড়াবে, ঐ স্বার্থ ও তার নিজের সমাজের স্বার্থ অভিন্ন। তার শক্তির প্রকাশে, এমন কি

সম্ভাবনাতেও রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোকের চেয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে তার আসন অনেক পোক্ত। কিন্তু এই যোগ্যতা দিয়ে গোটা দেশের সমাজ পরিচালনা কি সেটা ভাঙার দায়িত্ব কি সে পায়? কিংবা সেই দায়িত্ব তার আসছে এমন কোনো আভাস কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে দিতে পারেন?

এই প্রশ্ন তাঁর শেষ পর্বের গোটা শিল্পকর্ম সম্বন্ধেই করা যায়। প্রথম পর্বের মতো এখানেও তাঁর সব লেখাই পরিকল্পনাপ্রসূত। যান্ত্রিক কিংবা ছককাটা গল্প নয়, কিন্তু স্কিম ধরে কাজ করার অভ্যাস তাঁর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। ঘটনা কি কাহিনীতে প্রধান গুরুত্ব না দিয়েও এবং চরিত্র সৃষ্টির দিকে বিশেষ মনোযোগ না থাকলেও গভীর বোধ ও তীব্র অনুভূতির কারণে তাঁর লেখা কখনোই শিথিল নয়, পরিণতি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের লেখায় তাঁর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাহিনীর ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য অখণ্ড স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয় না। প্রায়ই কাহিনীকে উপচে ওঠে তাঁর সিদ্ধান্ত, চরিত্রের বুদ্ধি সমাজের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রথম পর্বের রচনায় সমাজব্যবস্থার রাক্ষুসে হাঁয়ের ভেতর রুগ্ন ও হাঁসফাঁস-করা ব্যক্তিকে দেখে বিচলিত পাঠককে তিনি পরের পর্বে রচনায় ঐ সমাজ ভাঙার স্বপ্ন কিন্তু দ্যাখাতে পারেন না। বিচ্ছিন্ন মানুষ যেমন তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে, ভাগ্য পরিবর্তনের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষ কিন্তু তার মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা সেভাবে পায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে কি করতে পারতেন? সাহিত্যের পণ্ডিত সমালোচকদের জন্যে এর জবাব দেওয়া সোজা, কারণ শিল্পীর দায়িত্ববোধ ও তাগিদ থেকে তাঁরা মুক্ত এবং সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি বিবেচনাকে তাঁরা আমলে দেন না। তাঁদের রেডিমেড রায় হলো এই যে, মার্কসবাদকে গ্রহণ না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্ধকার ভেতরটা অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকলেই ভালো করতেন।— তো এতে কি হতো?— ব্যক্তির ক্ষয় ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে রূপ নিতো বিশেষজ্ঞের দক্ষতায় এবং এই দক্ষতা তাঁকে বঞ্চিত করতো মানুষকে সামগ্রিকভাবে দ্যাখার শক্তি থেকে। দক্ষ বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেয়ে শিল্পীর দায়িত্ব পালন করাই তাঁর অনিবার্য নিয়তি। মনোবিশ্লেষণের বিশেষজ্ঞ হওয়ার দশা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন শিল্পী হিসাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে। অন্তর্দৃষ্টি কোনো অলৌকিক উপহার নয়, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টির প্রধান উপাদান হলো ক্রোধ। প্রথম পর্বের শিল্পচর্চাতেও তিনি নিরপেক্ষ নন, মানুষকে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁর ক্ষোভ দানা বাঁধে ক্রোধে। সমাজব্যবস্থাকে মানুষের রোগের কারণ জেনে তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হয় ঐ ব্যবস্থার ওপর। ব্যবস্থাটির বিনাশের সঙ্কল্প থেকেই তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পর্বের শিল্পচর্চার বিরোধ কোথায়? মানুষের প্রতিরোধের শক্তিকে তিনি পাঠককে অনুভব করাতে পারলেন না কেন? তাহলে কি বলতে হবে যে, মার্কসবাদ তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়নি? অনেক দিন থেকেই তাই বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁর প্রথম পর্বের রচনাতেও মধ্যবিত্ত সংস্কার, ক্ষুদ্রতা, ভক্তিভাব ও শোচনীয় সীমাবদ্ধতাকে খুলে ফেলার বিশ্লেষণও তো মার্কসবাদী প্রবণতাই। এভাবে দেখতে দেখতে পরিবর্তনের তাগিদ বোধ করলে মার্কসবাদী হওয়া ছাড়া তিনি আর কি করতে পারেন?

মার্কসবাদ গ্রহণের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর যা করতে পারতেন তা হলো এই : তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী অনেক বামপন্থী লেখকদের মতো ইচ্ছাপূরণের গপ্পো ফাঁদা। জঙ্গি মজুরদের দিয়ে মালিককে ঘায়েল করে গোটা কয়েক লাল সূর্য উঠিয়ে

তিনি নিরাপদে বিপ্লবের জয়ধ্বনি করতেন। দেশে বিক্ষোভ থাকলেও রাজনীতিতে প্রতিরোধের সঙ্কল্প গভীর ও ব্যাপক না হলে সাহিত্যে তার রঙিন ছবি আঁকা ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কি? এই ভাঁওতাবাজি হলো বিপ্লববিরোধী তৎপরতা। বিপ্লবের মাধ্যমে সভ্যতার ফসলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে মার্কসবাদ। এই দর্শনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে তাঁর শিল্পকর্মে পাঠককে সেই তাপ দিতে পারলেন না কেন যা বিপ্লবের স্বপ্নকে ইন্ধন জোগায়?

ঐ আগুনের তাপ বোঝার প্রধান শর্ত হলো সমাজে সেই রাজনীতির আঁচ থাকা। এই আঁচের প্রধান উৎস হলো রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক দল থাকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভেতরেই। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উৎখাত করাই এর লক্ষ্য। এই দল সামাজিক সংস্কারের জন্যে আন্দোলন করে না; সমাজকাঠামোর বিলোপ সাধন করে নতুন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অভিন্ন আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রায় নিয়ে সবাইকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে মার্কসবাদী দর্শনের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটায়। মার্কসবাদকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে নিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চার বিষয় নয়; এটি তাঁর কাছে মানুষের দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার হাতিয়ার। উপন্যাসে কোনো দর্শন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, চরিত্র ও কাহিনী এবং মানুষের জীবন ও তার বিশ্লেষণেই তার বিকাশ ঘটে। সমকালীন রাজনীতিতে সেই দর্শনের চর্চা এমনভাবে থাকে যাতে তা সামাজিক স্বভাবের অন্তর্গত হয়।

রাজনীতির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতে। রাজনীতিতে নিয়োজিত কিংবা রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্তের সবাই যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হবে এরও কোনো মানে নেই। কিংবা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত কর্মী কি নেতা যে বাড়িঘর ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে ঠাঁই নেবে অথবা তারা সব গরিব দেখে দেখে বিয়ে করবে— এ কথা ভাবা হাস্যকর। কিন্তু এই রাজনীতির চর্চা মধ্যবিত্তের বড়ো একটি অংশে নতুন ভাবনা তৈরি করবে এবং সংস্কৃতিতে এর প্রভাব ফেলবে। এর লক্ষণ তো দ্যাখা গিয়েছিলো। কমিউনিস্টদের তৎপরতাই তো প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন কংগ্রেস, এমন কি মুসলিম লীগের ছোট অংশের মধ্যে হলেও একটুখানি তোলপাড় তুলেছিলো। কিন্তু সেটা টিকলো কোথায়? ব্যাপক সামাজিক প্রভাব ফেলার আগেই সেটা একেবারে মিইয়ে গেলো।

ছাত্রদের যে অংশটি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো, তারা বড় হয়ে কর্মজীবনে ঢুকতে না ঢুকতে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তেভাগার চাষীদের রক্ত কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পরিণত হলো গোলাপি আভার মিষ্টি উত্তেজনায়। ওদিকে কংগ্রেসের সামন্তদাস আপোশকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রধান শক্তি সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাতে চলে গেলেন ফ্যাসিবাদের ঢালের আড়ালে। কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ বলে পরিচিত অংশের নেতা তখন জওয়াহেরলাল নেহেরু। ভারতীয় রাজনীতির হ্যামলেট এলাহাবাদের এই রাজপুত্র সমাজতন্ত্রের আবেগে মাতোয়ারা, আবার যথাসময়ে গান্ধীর সামন্ত চরণপ্রান্তে নতমুণ্ড। তাঁর সমাজবাদের বুলিতে কমিউনিস্টরা অভিভূত। ওদিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার নাম করে ইংরেজ বিরোধিতা স্থগিত রাখার জন্যে কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্ত কি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য? সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে

জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রধান শত্রুকে রেয়াদ দেওয়া কি আন্তর্জাতিকতাবাদের বিলাসিতা ভোগ করা নয়? এই বিলাসিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষায় না। তাঁর উপন্যাসের একটি চরিত্র কমিউনিস্টদের ঐ মনোভাবকে ধিক্কার দেয় 'রুশপনা' বলে। যে রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত, তারই প্রবক্তাদের সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা থাকলে ঐ রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ উপন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় কিভাবে?

১৯৩৪ সালে লন্ডন প্রবাসী ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা যে প্রগতিশীল সংগঠন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঐ দশকের শেষে এবং চল্লিশের দশকে এই দেশে তার বিকাশ ঘটতে থাকে। ঐ সংগঠনের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত আমাদের প্রশংসা পেয়ে আসছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী শিল্পী ও লেখকদের এই সংগঠন দেশজুড়ে উদ্দীপনামূলক নাটক ও সংগীতচর্চার যে ব্যাপক আয়োজন করে এখন পর্যন্ত তা অতুলনীয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার সাফল্য ম্লান হয়ে আসে এবং মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব প্রায় মুছে যায়। প্রগতি লেখক সংঘের সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব কিন্তু সমার্থক নয়। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার সঙ্গে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার বক্তব্যও তাঁদের শিল্পচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিলো। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার কারণে সেখানে ঠাঁই নিতে হয়েছে অনেককে, ফলে ছাড়ও কম দিতে হয়নি। দেখতে দেখতে শ্রেণী সংগ্রামকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠলো কেবলি ভালো সমাজ গড়ার নিরাপদ বাসনা। সেখানে কে না ছিলেন? গান্ধীর অহিংস ও হিংস্র অনুসারী, তাঁর হিংসুটে বিরোধী লোকজন, মুসলিম লীগের অপেক্ষাকৃত উদার অংশের সঙ্গে জুটেছিলেন ঐ সংগঠনের জেহাদি ও তৌহিদি সমর্থকগণ। এটা তখনকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মনোভাবেরই প্রতিফলন। জওয়াহেরলালের প্রকৃতিতে সমাজবাদের উপাদান পাওয়া, পাকিস্তান দাবিতে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করা— এসব কি ঘোরতর স্ববিরোধিতা নয়? এটাও ভালো, ওটাও ভালো, 'সস্তা ভালো, দামিও ভালো, তুমিও ভালো, আমিও ভালো'— সবাইকে ভালো ভাবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে যারা তাদের জন্যে 'সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।'— এই সহাবস্থানের ইচ্ছার উৎস হলো দায়িত্বকে ঝামেলা ভেবে তাই এড়াবার প্রবণতা। এইসব মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসার কারণ হলো সমাজতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করেও বিপ্লবের ধাক্কা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার লোভ।

ফল কি হয়েছে? জওয়াহেরলারকে সমাজবাদী বলে যারা পুলকিত তাঁর কাছে তারা জিনজার গ্রুপের বেশি দাম পায় না। আদার একটুখানি ঝাঁঝ ছড়ানো ছাড়া কমিউনিস্টরা আর কিছু করতে পারে বলে তিনি গণ্য করেন না। সবাইকে এক দেহে লীন করার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সবচেয়ে ক্ষতি হলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের। এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কমিউনিস্টদের শ্রমিক আন্দোলন ও তেভাগা অন্য দলগুলোর ভেতরেও প্রগতিশীল ভাবনার আলো ফেলতে শুরু করেছিলো, সেই ভাবনা ক্রমেই পিছিয়ে যেতে শুরু করলো। মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও যে একটি অংশ সামন্ত প্রভুদের কোণঠাসা করার আয়োজন করেছিলেন, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি এসে তাঁদের সমস্ত শ্রমের ফল ভোগ করতে লাগলেন বিত্তবান প্রায়-বুর্জোয়া নেতারা এবং আরো কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাইকে উৎসাহ করে দল কব্জা করে ফেলে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তিতে নিয়োজিত সামন্তপ্রভুরা। মুসলমান তরুণ বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন তাঁদের অনেকেই পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করতে

লাগলেন। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক বছর আগেই 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হলো, এঁদের সাহিত্যচর্চা অবশ্যই বাংলা ভাষায়, কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্যভাবনায় এঁরা বিভ্রান্ত। প্রতিভাবান মুসলমান কবি ইসলামি ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে ঢুঁ মারলেন মধ্যপ্রাচ্যের পুরাণে যার চরিত্রের অনেকেই অমুসলমান। নিজেদের মুসলমান পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্যে এঁদের উৎসাহ কখনো কখনো উন্মাদনার ধার ঘেঁষে গেছে। এমন মুসলমান কলেজ শিক্ষকের কথা শুনেছি যিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের মার্কসবাদ আস্থা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মিনতি করেন, 'কমিউনিস্ট যখন হবেই তো মুসলমান কমিউনিস্ট হয়ো।'

কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হতে না হতে কংগ্রেসের সনাতন ভারতীয়ত্ব ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সাম্প্রদায়িতকতা হিন্দু মধ্যবিত্তকে এতোটাই আচ্ছন্ন করে যে দেশভাগের সময় বাংলাকে অখণ্ড রাখার দুর্বল উদ্যোগটিকে তারা রোধ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পর্যবসিত হলেন শুধুই হিন্দুতে, মুসলমান বাঙালির সঙ্গে বসবাস করা তাদের রুচিতে বাধলো। পাকিস্তান বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলমানদের জীবনযাপন, তাদের পারিবারিক প্রথা, মুসলমান নাম প্রভৃতি নিয়ে এমন সব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলেন যেখানে ন্যূনতম রুচির পরিচয় নেই। জনপ্রিয় দৈনিক আনন্দবাজার দীর্ঘকাল ধরে একই জাতির একটি প্রধান সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে ইতর মনোভাবের সৃষ্টি করেছিলো তা থেকে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত রেহাই পায় কি করে? এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় দৈনিক আজাদ। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়া, পশ্চাৎপদ মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয় পত্রিকার ভূমিকা অসাধারণ। এতো করেও নজরুল ইসলামকে হটানো গেলো না। মুসলমান মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে তখন জিন্নাহ ও নজরুলের উদ্ভট সহ-অবস্থান।

মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি এই অবস্থায় কোন পর্যায়ে নেমে আসতে পারে? হিন্দুদের বিশুদ্ধ হিন্দু এবং মুসলমানদের সাচ্চা মুসলমান থাকার উস্কানি দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলেন গান্ধী। তাঁর ভক্ত এবং শত্রু সবাই তাঁর এই আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চললো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস লিখছেন, বিশেষ করে শেষের দিকে, দেশজুড়ে তখন শুধু হিন্দু আর শুধু মুসলমান, মানুষ পাওয়া ভার। তখন সুস্থ থাকতে পারেন কেবল কমিউনিস্টরা; সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করা, দেশবাসীর কাছে প্রকৃত শত্রুকে শনাক্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দায়িত্ব পালন করার কথা তো তাঁদেরই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। তো তাঁরা করলেন কি?— সাম্প্রদায়িকতার মোকাবেলা করতে তাঁরা হাঁক ছাড়লেন, 'গান্ধী-জিন্নাহ এক হও।' তাঁরা ঐক্য চাইলেন দুটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। গান্ধী-জিন্নাহর ঐক্যে মানুষের লাভ কি? এই দুটোই তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ল্যাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নিজের সংগঠনের এই 'দাবী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেচনা করেন আবদার বলে এবং ঐ সময়ের পটভূমিতে লেখা একটি উপন্যাসে কমিউনিস্ট কর্মীর মুখ দিয়ে নিজের কথা জানান, গান্ধী ও জিন্নাহর ঐক্য চেয়ে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছেন।

অথচ দল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির জন্যে মনের টান জীবনের শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছেন। প্রবল দারিদ্র্যে জীবনযাপন করলেন,

সপরিবারে কষ্ট করলেন, মৃত্যু হলো প্রায় বিনা চিকিৎসায়। নিজের শরীরের ওপর যতভাবে সম্ভব অত্যাচার চালিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যেও চোখে পড়ে তাঁর অসাধারণ দায়িত্ববোধ। বড়লোক ভাইদের ওপর নির্ভর না করে বৃদ্ধ পিতাকে রেখেছেন নিজের সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ না করাটাও তাঁর দায়িত্ববোধেরই আরেকটি প্রকাশ। দলের নীতিনির্ধারণ করার অবস্থান তাঁর কখনোই ছিলো না, আশা করেছিলেন যে এদের দিয়েই সমাজের পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। এই আশাটুকু না থাকলে তাঁকে আগেই আত্মহত্যা করতে হতো।

অন্যদিকে, এই দল মধ্যবিত্তের ভেতর স্বপ্ন ও সঙ্কল্প সৃষ্টি না করে বরং মধ্যবিত্তের সংস্কারে পরিচালিত হয়েছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য কামনা করে তাঁরা চরম মূর্খতার পরিচয় দেন। শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্য তাঁদের বিবেচনায় না থাকার ফলেই এরকম উদ্ভট কথা তাঁদের মনে হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার কথা যদি ছেড়েই দিই তো মধ্যবিত্তের মানসিকতাটি তখন কোন পর্যায়ে? যারা অসাম্প্রদায়িক তারাই বা কোন মনোবৃত্তির অধিকারী? কোটি কোটি চাষীর প্রাণান্ত শ্রমের ফসলে মধ্যবিত্তের মুখর গ্রাস জোটে। ঐ ভাত খেয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যায়, পড়তে পড়তে কেউ কেউ মার্কসবাদীও হয়। কিন্তু ঐ চাষা থাকে না খেয়ে, তার ছেলের অক্ষরজ্ঞান হয় না, অন্ন খুঁজতে শহরে একে বস্তিতে বাঁচে কুকুর-বিড়ালের মতো— এ নিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুকের ছোট্ট কোনো কোণেও অপরাধবোধের একটুখানি কাঁটাও তেমন বেঁধে না। স্ট্যালিনের হাতে ফ্যাসিবাদের পতন হওয়ায় সভ্যতার বিপর্যয় রোধ হলো। খুব ভালো, সবাই খুশি। কিন্তু ফ্যাসিবাদের প্রাচীনতম ও ইতরতম চেহারা ভারতীয় বর্ণপ্রথায় তো চিড় ধরে না। বিয়েতে পণ নেওয়া অব্যাহত থাকে, তরুণী বিধবার বৈধব্যের আগুনকে আলো বলে ঠাহর করার অভ্যাস চল্লিশের দশকেও লোপ পায়নি।

প্রথম পর্বের রচনায় সেই সময়ের রাজনীতি, সামাজিক অনাচার, আদর্শের ছলে বিচিত্র সব সংস্কারের উদ্ভট সহ-অবস্থান সামনে না এনেও এসবের শিকার রুগ্ন ব্যক্তিটিকে যথামাত্রায় তুলে ধরেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের ক্ষয়কে উন্মোচন করে পাঠককে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ক্ষয়ের নিরাময়ের সঙ্কল্প খুঁজতে গেলেন যেখানে সেখানে তখনো ঐ অবক্ষয় অব্যাহত রয়েছে। বিদেশী শাসনের অবসান ঘটছে, সেখানে বিপুল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। শ্রমজীবী লড়াইতে নেমেছে, লড়াইয়ের নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা ঐ হাতই মেলাতে চায় ভক্তিবাদীদের সঙ্গে। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীরা হেরে গেছে, কিন্তু দেশের বিশাল সমাজে ফ্যাসিবাদের কদর্য রূপের চর্চায় বিরতি পড়েনি। দুর্ভিক্ষে মুনাফা লোটে যারা, ক্ষমতায় আসে তারাই। নতুন রাজনীতির রোগা ধারাটি মধ্যবিত্তের যে পরিবর্তটুকু এনেছে সেখানেও নতুন ধরনের উদ্ভট সহ-অবস্থান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন যদি কোথাও থাকে তো তা পাওয়া যায় কেবল নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর জীবনে। উচ্চবিত্ত ও নানা কিসিমের মধ্যবিত্তের লাথিঝাঁটা খেয়ে, তাদের খাওয়াপরার সংস্থান করে এবং নিজেরা না খেয়ে, উচ্চবর্ণের কাছে জানোয়ারের অধম হয়ে থেকে এবং দফায় দফায় ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েও তারা যে বাঁচে এবং বাঁচার জন্যে আরো অনেকের জন্ম দেয়, তা কেবল বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার বলেই

সম্ভব হচ্ছে। এরাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার পাত্র, এরা তাঁর উপন্যাসের বিষয়ও হয়েছে। কিন্তু তাঁর রূপ রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের রাজনৈতিক কর্মী। এই কর্মীও শ্রমজীবীর কাছে অনেক শেখে, প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করার শক্তি পায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত কোটর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ন্যূনতম সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে পায় না। যে-সংস্কৃতির ভেতর সে বড় হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করতে করতেই তো তার শক্তির অনেকটা নষ্ট হয়। বিভ্রম কাটাতে, খোঁয়ারি সারাতে যার সময় যায়, স্বপ্ন দেখবে সে কখন? আর সেই স্বপ্ন রূপায়ণ তো আরো অসম্ভব কাজ।

উপন্যাস কাজ করে ঘোরতর বর্তমানের ভেতর। আদিম মানুষের সঙ্গে হিংস্র জানোয়ারের লড়াই নিয়ে গল্প লিখলেও লেখককে দাঁড়াতে হয় বর্তমানের এবড়োখেবড়ো ডাঙায়। রূপকথা হচ্ছে, কেচ্ছা, ফ্যান্টাসি তো উপন্যাসে থাকতেই পারে, অনেকের লেখায় বেশ অনেকটা জুড়েই থাকে; কিন্তু এগুলো ব্যবহৃত হয় বর্তমানকে তাৎপর্যময় করার লক্ষ্যে। যে মধ্যবিত্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে মানুষের স্বপ্নে রূপায়ণের দায়িত্ব নেয় সেই লোকটির আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত, সততায় ফাঁক নেই এবং তার নিষ্ঠা নিরঙ্কুশ। মধ্যবিত্ত পরিবারে বড়ো হওয়ায় তার অপরাধবোধ দিনদিন প্রকট হয়, এর সঙ্গে মেশে ক্ষোভ ও বেদনা, এগুলোকে সে গড়ে তোলে ক্রোধে। তার সংস্কৃতির মান উন্নত বলেই সে নতুন পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তখন গোটা সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধ একেবারেই অন্যরকম। তাকে এগুতে হয় পদে পদে বিশ্লেষণ করতে করতে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হয় স্বয়ং লেখককে। লেখক তার সঙ্গ না ধরলে তো সে পড়ে যাবে। চরিত্র তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আর হয় না, পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ হয় শিথিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন তাই শেষ পর্যন্ত সামাজিক সঙ্কল্প হয়ে ফোটে না। এই কথাটি চেপে গেলে বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্যময় শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের খুব বড়ো মাপটিকেও অস্বীকার করা হয়।

[উৎস : *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮]

সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ

আবু সয়ীদ আইয়ুব

নালিশ শোনা যায় যে মানিক বাঁড়ুয্যের সাম্প্রতিক লেখায় সেক্স এবং সেক্স-ঘটিত মনোবিকারের বড় বাড়াবাড়ি। কথাটা যদি বাজারে চল্‌তি বা চল্‌তি হবার উমেদার কোনো লিখিয়ে সম্বন্ধে উঠতো তাহলে ভাববার কিছু ছিলো না। উপন্যাস যতো পানসেই হোক্ তাকে চালু করবার সহজ অথচ অমোঘ উপায় হচ্ছে সেক্সের ঝাল-মসলাটা বেশ করে মাখিয়ে দেওয়া; তাতে সাহিত্য-রসিকের মুখে যদি না-ও রোচে, বেরসিক হাজারও পাঠকের জিভে জল আসবে। অথবা ধরে নিতে পারতাম যে খোদ্ লেখকের মনটাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু *পদ্মা নদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* কিংবা *সহরতলীর* রচয়িতাকে তো এতো সহজে বরখাস্ত করে দেওয়া যায় না। এই তিনটে উপন্যাসে এবং কয়েকটি ছোটগল্পে দেখেছি তাঁর মনের সুস্থ মাত্রাজ্ঞান ও তীব্র সংবেদনশীলতা, তাঁর টেক্‌নিকের মজবুত গাঁথুনি, তাঁর ভাষার নিপুল গৃহিণীপনা। এ-ও দেখেছি যে তাঁর সবচেয়ে খুঁতখুঁতে সমালোচক তিনি নিজেই। এমন একজন লেখক নিছক খেয়ালের বশে কিংবা বাজারের ফর্‌মায়েশে একটা-কিছু নিয়ে মাতামাতি করবেন এটা কোনো কাজের কথা নয়। অথচ নালিশটা যে একেবারে ভুয়ো তা-ও বলতে পারিনে।

যাঁদের আমরা বলি ভদ্রলোক, সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁরা নানা কৌশলে সমস্ত সমাজটাকে এমন করে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছেন যে তাঁদের বেশ-খানিকটা গণ্য না-করে উপায় নেই। এই ভদ্রসন্তানরা যতোদিন সমাজ-শাসন ও পরিচালনার ভার নিজের হাতে রাখবেন, আইন গড়বেন, আদালত করবেন, দর্শন-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায়-প্রশাখায় নিজের একচোখা মনের ছাপটি এঁকে চলবেন, ততোদিন সাহিত্য থেকে এঁদের বিতাড়িত করবার চেষ্টা নিরর্থক। চোখ বুঁজে সাহিত্যের আসবের এদের অস্তিত্ব লোপ করে সান্ত্বনাটা কী যখন চোখ খুললেই দেখতে পাই এঁরা অক্‌টোপাসের মতো আট পায়ে সমাজটাকে আঁকড়ে বসে রয়েছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাঁরা শ্রমিক-সাহিত্য দাবি করছেন তাঁরা সাহিত্যকে এগিয়ে দিচ্ছেন না, গুলিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। শ্রমিকতন্ত্র স্থাপনের পূর্বে শ্রমিক সাহিত্য নিয়ে দাপাদাপি একধরনের উবুড়-করা আইভরি টাওয়ার-বিলাস। তবে বুর্জোয়া সমাজের বাইরের ব্যবস্থায় যেমন ভাঙন ধরেছে, তার মনের ভিতরেও তেমনি বিকার ঢুকেছে। সে-বিকারের প্রভাব সমগ্র সমাজ-দেহের উপর অনিবার্য এবং অপরিমেয়। যে-কারণে হোক্-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অনুভূতি ও ভাবনা আজ যদি শারীরিক বৃত্তিবিশেষের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে চলে, তাহলে তো আজকের সাহিত্যিক তার ধোপদুরস্ত কোঁচাটিকে আলগোছে তুলে পাশে সরে দাঁড়াতে পারে না; তাকে যে এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে— যদি একে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি বলতে চান— নেবে আসতেই হবে। সেই কারণটা কী বরঞ্চ তাঁর খোঁজ নেওয়া দরকার।

আজকের দিনে যেমন সেক্স, তেমনি 'বিশুদ্ধ প্রেম' নামক দূর-আকাশবর্তী এক বাষ্পনীহারিকার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতো উনিশ শতকের সাহিত্যে। রোমান্টিকদের এই প্রেম আমাদের মানসিক পরিবেষ্টনে এতোখানি জায়গা জুড়েছে যে আমরা সহজেই ভাবি এ এক চিরন্তন প্রবর্তনা, সাহিত্যের সঙ্গে এর যোগ স্বতঃসিদ্ধ ও শাশ্বত। হাক্সলি বা কড্ওয়েল মনে করিয়ে দিলে ভাবতে অবাব লাগে যে এরও ইতিহাস আছে, আদি অন্ত আছে। অথচ মাত্র কয়েক শতাব্দী পার হয়ে রেনেসাঁস যুগটা ছাড়িয়ে গেলে আমরা আর রোমান্টিক প্রেমের পাত্তা পাই না, না সমাজে না সাহিত্যে। তার মানে এ নয় যে এমন একসময় ছিলো যখন নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিলো না। সে আকর্ষণের উৎপত্তি খুঁজতে হলে মানবেতিহাসের বহু কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণীলোকের নিম্নতম স্তরে গিয়ে হাজির হতে হয়, যেখানে বংশবৃদ্ধির উপায় স্ত্রী ও পুং প্রাণীর সঙ্গম হয়, লিঙ্গবিহীন জীবাণুর বিভাজন। নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণকেই যদি প্রেম বলেন তাহলে বলতে হয় যে প্রেম সম্বন্ধে প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অন্যরকম, আজকের প্রায় বিপরীত। রোমান্টিকদের কাছে প্রেম হলো এক স্বর্গীয় বা ঐশী প্রেরণা, মানব-জীবনের যা শ্রেয়তম ও সুন্দরতম তারই নির্যাস। প্রাচীনযুগে প্রেমের সাক্ষাৎ যদি-বা পাই (বিশুদ্ধ সেক্সের কথা বলছি না) যেমন হেলেনের প্রতি প্যারিসের প্রেম, তার সম্বন্ধে গদ্গদ ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বরঞ্চ তাকে ভাবা হয় যেন মানুষের ভূতে-পাওয়া দশা, অথবা এক ভয়াবহ ব্যাধি যার কবলে পড়লে আর রক্ষা নেই, কিন্তু কবলে না-পড়ার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করাই সুস্থ লোকের কর্তব্য।

মানুষ একদিকে হলো দলচর জীব, সামাজিক বোধ ও প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, বহুলোকের সহযোগিতায় প্রতিপালিত, তাদের দাবি মেনে চলতে এবং তাদের উপর দাবি খাটাতে অভ্যস্ত। সে চাষ করে একজোট হয়ে, শিকার করতে যায় দলবেঁধে, লড়াইয়ের ময়দানে সে সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। তার উৎসব-অনুষ্ঠান পালাপার্বণ নৃত্যগীত সমস্তই সম্মিলিত। অন্যদিকে তার সেক্স তাকে করেছে যূথভ্রষ্ট, মিথুনচারী। সমাজের প্রতি সে বিমুখ, জনতার মধ্যে মাত্র একজন তার সকল আগ্রহ কেড়ে রেখেছে। তার সেই একেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে সে নীড় বাঁধবে, বেড়া তুলবে, পর্দা টানবে। ফিউডল্ যুগের কবি ওমর খৈয়াম বনজঙ্গলের মাঝখানে তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে বসে এক টুক্রো রুটি আর এক পেয়ালা মদ নিয়ে স্বর্গ-রচনা করবেন। বনজঙ্গলের মাঝখানে কিন্তু ঐ দুটি বস্তু কোথা থেকে জুটবে এবং ফুরিয়ে গেলে দিনের পর দিন জুটতে থাকবে— এই গদ্য চিন্তাটা কবির মনে না-আসারই কথা। তবে স্বর্গ-রচনার ব্যাপারে প্রিয়ার সঙ্গে পাউরুটির মূল্য সমীকরণে যে অকবিজনোচিত কাণ্ডজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে তা খৈয়ামী চতুষ্পদীর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। রুটির আবশ্যকতা অবশ্য সবাই একবাক্যে মেনে নেবে; কিন্তু মদের পাত্র না-হলে কি ভূ-স্বর্গের খস্ড়াটা অসমাপ্ত থাকতো? থাকতো বোধহয়, কারণ কবিও যে সামাজিক জীবন, সমাজের হাজারো লোকের সঙ্গে দায়িত্বের হাজারো সূত্রে বদ্ধ, সেটা তো সহজে ভোরা যায় না, তার জন্য ইরানি সুরার ঘন-ঘন প্রয়োজন। শ্রেণীবিভাগের পাকা ব্যবস্থায় লালিত কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজ থেকে আরও দূরে সরে এসেছেন। নিজের সামাজিক অস্তিত্বটাকে ভুলবার জন্য ইরানি সুরা তাঁর দরকার নেই। বর্ষার দিনে প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে তিনি সরাসরি বলতে পারেন :

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।

কেবল আঁখি দিয়ে   আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

সেই 'আঁধারে' সামাজিক মানুষের সত্তাও লোপ পেয়েছে।

মানুষের এ দুটি দিকই যখন মৌলিক ও চিরন্তন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাহিত্যে ও শিল্পসৃষ্টিতে দুটি ধারাই যুগে-যুগে প্রবহমান থাকবে। কিন্তু সাহিত্য একটা থেকে আর-একটাতে দোলা খেয়ে এসেছে, কোনো একসময় দুটোকে সমানে কোল দিতে পারেনি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে sex এবং herdinstinct যতোদিন instinct মাত্র ছিলো ততোদিন তারা সাহিত্যের উপাদান হতে পারেনি, ততোদিন সত্যিকার সাহিত্য বা যে-কোনোপ্রকার শিল্পকলা জন্মাতেই পারেনি। যখন সেগুলি নিছক উপজ্ঞা থেকে হৃদয়াবেগের স্তরে উপনীত হলো, মানুষ তখনই হলো শিল্পী, চাষবাসের যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে সে এমন একটা-কিছুর সন্ধান পেলো যা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক না হলেও জীবন-সম্ভোগের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। যা সে অন্যকে দিতে বা অন্যের কাছ থেকে পেতে উৎসুক। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে, হোমর হিসিয়ডের মহাকাব্যে দেখা যায় যে প্রেম তখনও তেমনি পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত নয়, তাতে মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক অনুভূতির বিস্তার ও গভীরতাই। প্রাচীনযুগে এটাই স্বাভাবিক, কেননা সেক্স অনেক কাল কেবল শারীরিক প্রবর্তনা রূপে থেকে গেলেও জীবনযাত্রা অচল হয় না, কিন্তু ছোট-ছোট উদ্বাস্তু শিকারি মানুষের দল যখন কৃষি-প্রধান জনবহুল শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী সমাজে পরিণত হয় তখন herdinstinct-এ আর কুলোয় না, আত্মচেতন সামাজিক বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই নবপরিস্ফুট সামাজিক চৈতন্য থেকেই মহাকাব্যের জন্ম, এবং একে পরিপুষ্ট করাতেই তার সার্থকতা।

সেক্সের মানসিক বিকাশ প্রেম এলো অনেক বিলম্বে, সভ্যতার অনেকখানি অভিব্যক্তির পর। ফিউডল্ যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগে আসতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সমাজে মানবিক সম্বন্ধের ক্রমশ হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ কিছু এখনও জমিদারি প্রথার মধ্যে টিকে রয়েছে। প্রতাপশালী জমিদার যদি-বা প্রজাকে অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণ করে তবু প্রজাদের জীবন থেকে সম্পর্কছিন্ন নয় তার জীবন, তাদের সুখ-দুঃখের খবর ও ভার কতক পরিমাণে না-নিয়ে সে থাকতে পারে না। কোম্পানির মালিকের সঙ্গে কারখানার মজুরের যে-সম্পর্ক তার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে দুটোর প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, জাতিগত। একটাতে হৃদয়বৃত্তির বিকাশের রাস্তা খোলা আছে, আরেকটাতে নেই। মার্কস্-এর ভাষায় "বুর্জোয়ারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলে বাকি রেখেছে কেবল নগ্ন স্বার্থের, নির্মল দর-কষাকষির যোগসূত্র।" অনুভূতির সামাজিক স্রোতোধারা অবরুদ্ধ হয়ে অন্যদিকে বাঁক ফেরালো, যুগল প্রেমের খাদে বইতে লাগলো। সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মের কড়া অনুশাসন সেক্সের শারীরিক বিকাশকে অহেতুক বিধিনিষেধের বেড়াজালে ঘিরে মনের দিকে তার প্রসার অস্বাভাবিকরকম ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুললো। এ দুটি মূল কারণ থেকেই রেনেসাঁস যুগের রোমান্টিক প্রেম উদ্ভূত। উনিশ শতক পর্যন্ত সাহিত্যে সর্বত্র তার বোলবোলাও, কবি মানেই প্রেমিক, উপন্যাস মানেই প্রেমের কাহিনী।

বিশ শতকে আবার হাওয়া গেলো পাল্‌টে। প্রেমের কবিতা লেখা একরকম বন্ধ হয়ে এলো, উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের জায়গা নিলো নির্জলা সেক্স। এর জন্য প্রথমত দায়ী ভিয়েনীজ স্কুলের মনোবিকলনতত্ত্ব। বিস্তর তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে অত্যন্ত খাঁটি শেলি-মার্কা সেই-যে "the worship that the heart lifts above, and the heavens reject not'— তার পেছনেও রয়েছে চাপা লিবিডো-র প্রবল তাড়না। এর ফলে সেক্স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন বাড়লো, স্নায়বিক চাঞ্চল্যজনিত যে-কৌতূহল এতোদিন ধামাচাপা ছিলো তা-ও তেমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লেখাপড়ায় কথাবার্তায় চিন্তা-ভাবনায় সর্বত্রই প্রসঙ্গটির ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি। সাহিত্য তার আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কেন। দ্বিতীয়ত গত মহাযুদ্ধের সর্বনাশা আবর্তনে মানুষের সমস্ত চরমমূল্য গেলো তলিয়ে, এক বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ও অবিশ্বাস সারা ইউরোপের— এবং সারা পৃথিবীর— চিত্ত ভাসিয়ে দিলো। প্রেম ছিলো অন্যতম প্রধান মূল্য, তার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটলো না, মানুষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সইতে না-পেরে পঞ্চশর তাঁর তূণটি বগলদাবা করে কেটে পড়লেন। বুর্জোয়া মূল্যের বিনাশকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভাঙনের পূর্বাভাস মনে করা অসঙ্গত নয়। আর্থিক জগতে যার নাম দেওয়া হয় capitalist crisis, মূল্যবোধের উপপ্লবকে তারই আধ্যাত্মিক প্রতিফলন বলতে পারেন। এক সভ্যতার পতন এবং আর-এক সভ্যতার উত্থানের মাঝখানকার সময়টা স্বভাবতই অরাজকতার সময়। এই সময়ে আদিম মানুষের প্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতি নাকি vacuum বরদাস্ত করতে পারে না। সভ্যতার ফাঁক ভরবার জন্য তাই ছুটে আসে মানুষের অবদমিত বর্বরতা। তাই ফ্যাসিস্ট দেশের মাথায় রক্ত চাপে, সংস্কৃতির নাম শুনলে হাত যায় পিস্তলের দিকে। তাই ক্যাপিটালিস্ট দেশে, প্রচণ্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌনবিকার, মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি।

এই সামাজিক পটভূমিকার উপরেই *চতুষ্কোণ* উপন্যাসের চরিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। বইয়ের *চতুষ্কোণ* নামটিতে বোঝায় সেই শেল্‌ফে-আলমারিতে টেবিল-চেয়ারে এবং রাজকুমারের ভাবনায়-দুর্ভাবনায় স্বপ্নের বিকারে দিবাস্বপ্নের জঞ্জালে ঠাসা ছোট ঘরটিকে। কিন্তু *চতুষ্কোণ* বলতে আরও-কিছু বোঝায়। নামকরণে ইঙ্গিত রয়েছে সমাজের সেই সংকীর্ণ কক্ষটির দিকে যা উত্তেজনার উপকরণ-বাহুল্যে ঠাসা, সেখানে বিরাট পৃথিবী ও বৃহৎ সমাজের আলো-বাতাস পৌঁছায় না, যার বাসিন্দাদের প্রচুর অবসর শুধু নিরানন্দ আমোদের পেছনে ধাবমান এবং বিক্ষুব্ধ। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার যখন এক চতুষ্কোণে বসে-বসে বই পড়ে, আর শুয়ে-শুয়ে হাজারো এলোমেলো ভাবনা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে বেরিয়ে যায় অন্য চতুষ্কোণটিতে। সেখানে যাদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ তারা তাকে আঘাত করে কিন্তু জাগিয়ে তুলতে পারে না, উত্তেজিত করে উৎপ্রাণিত করতে পারে না; তাদের ঘোরানো-প্যাঁচানো বাঁকানো-চোরানো জীবন তার জীবনকে জটিলতর করে দেয়, সিদ্ধি বা শান্তির কোনো রাস্তাই বাতলে দিতে পারে না। বিভ্রান্ত রাজকুমার ফিরে আসে তার পূর্ব চতুষ্কোণটিতে। আবার ভাবে, বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে— এমন-সব স্বপ্ন যা ফ্রয়েড, আদ্‌লার, জোন্‌সের বইয়ের সেরা দৃষ্টান্ত হতে পারতো। এমন মানুষের মনে বিকার না-এসে পারে না। নারী সম্বন্ধে রাজকুমারের চৈতন্য অস্বাভাবিক প্রখরতা লাভ করে। নারীকে কিন্তু সে ভালোবাসে না, তার আসঙ্গও সে চায় না, সে কেবল তার সুপরিচিতা কোনো মেয়ের

নগ্নদেহ একবার চোখ ভরে দেখবে। এই বাসনার এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া করে নিজের মনকে সে চোখ ঠারে। কিন্তু তাতে শান্তি কই। তার জীবন এগিয়ে চলে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, বিকারের দিকে।

কোনো-কোনো পাঠক অনুযোগ করেছেন যে বইটা যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব নয়। নায়কের মনের গড়ন যেমন সৃষ্টিছাড়া, তার জীবনের ঘটনাগুলিও তেমনি অভূতপূর্ব, আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের বিচার কি আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজেই করতে হবে? সাহিত্যিক কি দৈনিক কাগজের রিপোর্টার যে বাইরে যা যেমনটি ঘটছে সেটাকে ঠিক তেমনিই টুকে এনে সকালবেলা আমাদের চায়ের টেবিলে হাজির করবে? মানিকবাবুর লেখায় বিশেষত *চতুষ্কোণে* কল্পনার ভাগটা প্রবল স্বীকার করছি, কিন্তু সে-কল্পনা স্বৈরাচারী নয় কাজেই মিথ্যা নয়, তা শিল্পধর্মী অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ। তাছাড়া রাজকুমারের চরিত্র কি সত্যিই খুব উদ্ভট বা অস্বাভাবিক? একটু তলিয়ে দেখলেই কি ধরা পড়ে না যে তার মনের গড়নের এমন-কি তার বিকারেরও অস্বাভাবিকতা যতোটা মাত্রাগত ততোটা জাতিগত নয়। তাকে যদি আমরা আকারে ছোট করে দেখি, তার সুরটাকে একটু খাদে নাবিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে দেখবো যে রাজকুমারের মনের বৈশিষ্ট্য এবং বিকার তার স্বশ্রেণীর, তারই মতো আধুনিক কালের প্রসাদলালিত অবসরভোগী মধ্যবিত্ত অনেক যুবকের মনের আনাচে-কানাচে বর্তমান। ততোটা দৃষ্টিগোচর নয় অবশ্য, কারণ একদিকে তার মাত্রা অল্প, এবং অন্যদিকে সাধারণ পর্যবেক্ষকের বিশ্লেষণী শক্তি অপটু। রাজকুমারের মন সর্বতোভাবে না-হলেও মূলত আর পাঁচজনের মতো, শুধু লেখক তাঁর মাইক্রস্কোপের সামনে ধরে বিরাট করে দেখিয়েছেন। মাইক্রস্কোপে দেখা জিনিস এক হিসাবে খুবই অস্বাভাবিক, সেই অস্বাভাবিকতা রাজকুমারের চরিত্রাঙ্কনেও পরিলক্ষ্য। তবে কিনা লেখকের উদ্দেশ্য তা-ই ছিলো, সে-কথা ভূমিকাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই দেখা যায় রাজকুমারের মাথা ধরেছে। সে নিজে স্বীকার না-করলেও তার ডাক্তার-বন্ধু অজিত জানে যে স্বাস্থ্য তার খারাপ, মানসিক ব্যাধিরও একটু ইঙ্গিত করলো বন্ধু, সেটা কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলে। তখনও সে বিকারগ্রস্ত নয়, তবে মন তার অনিবার্যরূপে এগুচ্ছে বিকারের দিকে। আমাদের চোখের সামনে বিকারের চিহ্নগুলি একে-একে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; উপন্যাসের আকার ক্ষুদ্র এবং লয় দ্রুত বলে ৭০/৮০ পৃষ্ঠার মধ্যেই আমরা একটি পুরোপুরি নিউরোটিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই নিউরোসিসের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। জানি না আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্ব সম্বন্ধে মানিকবাবু কতোদূর অভিজ্ঞ। যদি তিনি অভিজ্ঞ না-হন, তাহলে তাঁর সহজাত গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। যদি হন, তবে তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের সংযম ও নিরাড়ম্বর পশ্চাদপসরণ প্রকৃত শিল্পীরই যোগ্য। বহু দেশী ও বিদেশী ঔপন্যাসিক এ-স্থলে libido, repression, regression, sublimation, voyeurism, censorship প্রভৃতি তত্ত্বকথা ও পারিভাষিক শব্দের পসরা বের করে পাঠকের মনে চমক লাগাতে গিয়ে উপন্যাসটাই মাটি করতেন। আর-একদিক থেকে উপন্যাসের আরও ঘোরতর সর্বনাশ ঘটতে পারতো কাঁচা লেখকের হাতে। বইয়ের যেটাকে ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারে, যেখানে রাজকুমারের বিকৃত মনকে আসন্ন উন্মাদ-রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সরসী তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার পদদলিত করে নিরাবরণ দেহে রাজকুমারের সামনে এসে তার নিউরোটিক খেয়ালের তৃপ্তিসাধন

করলো— সেই দৃশ্যটি এতো ক্ষণভঙ্গুর, লেখকের বিন্দুমাত্র অক্ষমতা অসাবধানতার ফলে vulgarity-র দিকে ঝুঁকে পড়তে পারতো এতো সহজেই, যে সমস্ত অধ্যায়টি আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছি, প্রতি ছত্রে মনে আশঙ্কা জেগেছে এই বুঝি গেলো সব। কিন্তু শিল্পীর পাকা হাত মুহূর্তের জন্যেও কাঁপেনি, কোনো রেখা বেঁকে যায়নি, কোনো রঙ একটু বেশি বা কম পড়েনি।

১৩৫০
[উৎস : *পথের শেষ কোথায়*, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৭]

পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

জমিদার রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ যৌবনে রাজস্ব সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে। কলকাতার অভিজাত সমাজের বাইরে সেই প্রথম তিনি এদেশের মানুষকে দেখলেন— নানা রকমের মানুষ।[১] রবীন্দ্রসাহিত্যের রাজকোষে নতুনতর অভিজ্ঞতার রাজস্ব স্তরে স্তরে সঞ্চিত হলো। বস্তুত সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনপ্রসঙ্গ এলো। সমসাময়িককালে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, "... মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।"[২] সেই ধ্যানের রাজ্য থেকে গ্রামবাংলার সহজ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনের অভিসারী হলো রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। রতন, ফটিক, সুভা, রাইচরণ এদের মতো আরো অনেকে আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবিতে ভিড় করে এলো আমাদের কাছে। নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনে গুরুভার দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অবারিত নিসর্গ ও মানুষের ভেতরে কবি যেন নিজেকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহীতে বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের প্রাকৃত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ কবি যখন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিমুখে যাত্রী— তখন এই এলাকার মানবজীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে সংসারের সুখ দুঃখ বিরহ মিলন চিহ্নিত মঞ্চের দিকে। সমালোচকের ভাষায়, এই পর্বে তাঁর রচনার নায়ক দু'জন— পদ্মা এবং পদ্মাতীরবর্তী অখ্যাত মানুষ।[৩] নদীকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন দেখেছেন এক অবিরাম গতির প্রতীক হিসেবে। কিন্তু পদ্মা শুধু প্রতীক নয়— অবিশ্রাম ভাঙা-গড়া, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে প্রবহমান পদ্মা তাঁর কাছে বাস্তব সত্য। এই পদ্মার সৌন্দর্য তিনি সযত্নে মিশিয়ে দিয়েছেন ছোটগল্পগুলির বর্ণনায় যে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঠাকুরবাড়ির জমিদারি ব্যাপ্ত ছিলো, সেখানে পদ্মাই সবচেয়ে শক্তিশালিনী— তবে পাশাপাশি ছিলো যমুনা, গোড়াই, নাগর, ইছামতী। যমুনা ছাড়া অবশিষ্ট তিনটি নদীই ছোট, তন্বী এবং পদ্মার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর্লোক অধিকার করেছিলো পদ্মা— পদ্মার বিপুল বিস্তার ও অন্তহীন রূপবৈচিত্র্য। এমনকি তার ভয়ঙ্কর ভাঙনেও যেন দুরন্ত লাস্য।

> বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।[৪]

এই সর্বগ্রাসী পদ্মার আহ্বানে 'খোকাবাবু' যখন সাড়া দেয়— তখন হতবুদ্ধি রাইচরণের অসহায়তা তীব্রতর হয়— কেননা প্রচণ্ড শক্তিময়ী সেই গতিধারার কাছে সে কতোটুকু! উপরন্তু 'খোকাবাবু' নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পদ্মার ঔদাসীন্য যেন জীবনের মতোই।

> ... পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।[৫]

অন্যত্র বর্ষারম্ভে পদ্মা ও তার তীরবর্তী জনপদকে রবীন্দ্রনাথ দুই 'লাজুক প্রণয়ী' বলে বর্ণনা করেছেন— তারা যেন "... অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপছে এলো বলে— প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে।"[৬] কিন্তু বর্ষার জল কমে গেলে এই পদ্মা "... একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে।[৭] বিভিন্ন ঋতুতে পদ্মার এই বেশ ও চরিত্র-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ গভীর মমতায় এঁকেছেন তাঁর কবিতায়, চিঠিপত্রে আর ছোটগল্পে। কিন্তু কবিতায় আছে সৌন্দর্যের প্রতি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আর চিঠিপত্রে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বর্ণনা, পক্ষান্তরে ছোটগল্পে এসেই পদ্মার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটেছে। তবে আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে চাই যে— কেবল পদ্মা নয়— পদ্মার দাক্ষিণ্যপুষ্ট শাখা নদীগুলিও রবীন্দ্র ছোটগল্পে মাঝে মাঝে ছায়াপাত করেছে। যেমন 'সুভা' গল্পে বাণীকণ্ঠের ঘর যে-নদীর ওপরে তা আদৌ বড় নয়—

> নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়া-ঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।[৮]

পদ্মা এবং তার শাখা নদীপথে যাতায়াতের সময় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল লাবণ্য ও সম্পদ দেখেছেন, তা নয়।

> যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ণ ছেলে মেয়েরা এখানে-সেখানে জলে-কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্প স্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়— তখন সে দৃশ্য কোন মতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলে-ওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না— এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়।[৯]

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সৃষ্টির প্রেরণা দেয় নি— তিনি স্পষ্টতই বলেছেন "সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না";— সম্ভবত সেজন্যেই তাঁর ছোটগল্পে এই দুঃখ, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য অনুপস্থিত। জীবনের অপূর্ণতার বর্ণনায় তাঁর স্বস্তি বা আগ্রহ কোনোটাই নেই। মানুষের সংসারে যা-কিছু হৃতশ্রী— তাকে তিনি নেপথ্যে রাখতেই ভালোবাসেন। অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রছোটগল্পে নর-নারীর বাইরের আবেষ্টন ও আচরণের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে তাদের অন্তর্লোকের রহস্য। অসুখী পোস্টমাস্টারের, প্রত্যাশিত নগর-প্রত্যাবর্তনের সময়, বুকের ভেতরে নৈঃসঙ্গ্যের একতারা বাজে; অফুরন্ত প্রাণময় ফটিক শহরে গিয়েই ছুটি খুঁজতে খুঁজতে অনন্ত ছুটি পেয়ে যায়; অপত্যস্নেহে আপ্লুত রাইচরণ এক কথায় পিতৃত্বের অধিকার ত্যাগ করে— ঘাতক কাবুলিওয়ালা ছোট্ট মিনির দর্পণে নিজের পিতৃসত্তার ছায়া দ্যাখে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সামাজিক মাপকাঠিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলির কেউই সচ্ছল নয়। কিন্তু এদের বৈষয়িক অসচ্ছলতার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিরুৎসুক। বরং এইসব অল্পবিত্ত কিংবা বিত্তহীন মানুষের অন্তরে বিভিন্ন

বৃত্তির— 'দেবত্ব ও পশুত্বের'— লীলা যে কতো ঐশ্বর্যময় সেটাই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। 'সুভা' বোবা হলেও তার পৈতৃক অবস্থা ভালো। অতএব সংক্ষেপে তার পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছেন কবি।

> 'বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোলাঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহিনীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'[১০]

এরকম দৃশ্য যে 'নৌকাবাহিনীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ' করতে পারে তার প্রমাণ ছিন্নপত্রে আছে।[১১] মোটকথা, গ্রামের, বিশেষত পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলির তীরবর্তী লোকালয়ে সহজ সচ্ছল সংসার-যাত্রার যে সব ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন— ছোটগল্পের পটভূমি বুনে তুলতে গিয়ে তিনি তার অকৃপণ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেখানে পচা পাটের গন্ধ; সহিষ্ণু জন্তুর মতো গৃহস্থ মেয়েরা যেখানে ঘরকন্নার কাজ করে যায়; ঘরে ঘরে যেখানে বাত, সর্দি, জ্বর, প্লীহা-; সেখানে তিনি সৃষ্টির কোনো উপকরণ লক্ষ করেন নি। কিংবা এই উপকরণকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহারযোগ্য মনে করেন নি। পক্ষান্তরে বাইরের লোক[১২] হিসেবে গ্রামবাংলাকে দেখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিতে দারিদ্র্যের কুশ্রীতা অথবা অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের ভয়াবহতা ততো মুখ্য নয়। বরং দূর-থেকে-দেখা গ্রামীণ জীবনকে তিনি তাঁর স্বভাবজ আনন্দে ভাস্বর করে এঁকেছেন। বলা যায়, পদ্মানদীর পটভূমিতে উদ্ভিন্নমান জীবনের ঐশ্বর্যের দিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। অজ্ঞাতনামা সাধারণ মানুষ-মানুষীর অন্তরে তিনি সম্ভাব্য অনন্ত মানবকে আবিষ্কার করেছেন— সেখানেই গল্পগুচ্ছের চমৎকারিত্ব।

২.

শিল্পের উপকরণের জন্যে পদ্মার তীরে দ্বিতীয়বার নৌকো ভিড়িয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)। কিন্তু 'ভাসমান নৌকা হইতে তীরভূমির পল্লীকে দর্শন'[১৩] করেন নি তিনি। পূর্ব বাংলার মাঝিদের সঙ্গে জীবন-যাপনের দুঃসাহস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিলো।[১৪] অতএব কল্পনার বদলে প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তরঙ্গ বিবরণ এসেছে সহজেই। ছোটগল্পের বদলে এবার একটি গোটা উপন্যাস গড়ে উঠলো— পদ্মাপাড়ের ধীবরপল্লী কেতুপুর গ্রাম— আর সেই পল্লীর নর-নারীর প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কাহিনী নিয়ে। সেই উপাখ্যানই *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)।

সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র এই গ্রন্থকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক স্তরের জীবন-যাপনের প্রামাণ্য দলিল বলে নির্ভর করতে পারেন। সর্বোচ্চ প্রলোভনেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সত্যকে ভাবালুতার কাছে বিকিয়ে দিতে পারেন না তার প্রমাণ, এই গ্রন্থের কোথাও আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জন নেই— দুঃখকে তিনি যেমন অকারণে বাড়িয়ে দেখেন নি, সুখকে তেমনি দেন নি অপ্রাপ্য মহিমা— শিল্পের চেয়ে জীবনই তাঁর কাছে গভীরতর সত্য। *পদ্মানদীর মাঝি* সম্পর্কে এই মন্তব্য সর্বদাই প্রযোজ্য বলে মনে করি। সেজন্যেই এ-গ্রন্থে শিল্পের কারুকাজের আড়ালে জীবনের এতো বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে ওঠে।

প্রধানত ধীবর-অধ্যুষিত কেতুপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। কুবের-গণেশ-জহর-আমিনুদ্দিন সমাজের প্রধান সম্পদ ও সাদৃশ্য ধারাবাহিক দারিদ্র্য। এই সমাজের সমর্থ পুরুষদের রাত কাটে নৌকোয়— পদ্মার বুকে— ইলিশের সন্ধানে জাল ফেলে, অথবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রী পারাপার করে। ধীবর-মেয়েদের স্বভাব

নিয়ে তাই একটু কানাকানি হয়। এমনকি কুবেরের স্ত্রী মালা পর্যন্ত— যে কিনা আজন্ম পঙ্গু— এই সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পায় না। তার সদ্যপ্রসূত সন্তানের গৌরবর্ণ টাটকা রসিকতার জন্ম দেয়।

কুবের-গণেশ এই দরিদ্র সমাজেরও নিম্নতম তলের সদস্য। তাদের নিজের নৌকা নেই— অতএব ধনঞ্জয়ের নৌকোয় সারারাত মাছ ধরেও দুজনের ভাগ্যে যা জোটে ধনঞ্জয় বিনা পরিশ্রমেই তা পায়। ইলিশের মরশুমে তাদের দুবেলা দুমুঠো ভাত মেলে— মাছভাজা হয় ইলিশ মাছের তেলেই; তবু এর ভেতরেই জন্ম-মৃত্যুর পালা অভিনীত হয়। ভদ্রলোকেরা প্রসূতির জন্যে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলে দেয়— কুবের-গণেশের স্ত্রীদের সন্তান হয় স্যাঁতসেঁতে দাওয়ার ওপরে। প্রসূতির ব্যবহৃত স্থান অপবিত্র বলেই তাদের বিশ্বাস— তাকে তাই শয়ন ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয় না। জমিদার কুলের কোনো প্রহলাদ এই দরিদ্র অশিক্ষিত জেলেদের ভেতরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বাণী ছড়াতে চাইলেও লাভ নেই। উপরন্তু জেলে-রমণীদের দুর্নাম হয়। ঐশ্বর্যকে এই সরল মানুষগুলি ভয় করে।

এদের সংস্কার-বিশ্বাসও বিচিত্র। মুসলমান হোসেন মিয়া নির্বিঘ্নে কুবেরের ঘরে উঠতে পারে— তার ঘটিতে পানিও খেতে পারে— কিন্তু ঘরের চাল-চুঁয়ে-পড়া বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে অপবিত্র ঘটিকে শুদ্ধ করা হয় হোসেন মিয়ার সামনেই। এসব নিয়ে কেউ কিছু মনে করে না। উচ্চতর বর্ণের জমিদার হাজার সহৃদয় হলেও তাঁর কাছে গিয়ে কুবের-গণেশ বড় জোর ফরাসের সামনে বসবার অনুমতি পায়— কিন্তু 'যুক্তকর মুক্ত করিবার নিয়ম নাই'।

ভদ্রসমাজের মাপকাঠিতে এদের নৈতিকতার মান হয়তো নিচু। বিবাহবহির্ভূত দাম্পত্যজীবন কেতুপুরের সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা। গৃহত্যাগী যুবতী হয়তো একটু সচ্ছলতার লোভেই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পাড়ারই এক প্রান্তে ঘর বাঁধে— তার সন্তান হয়— সমাজের জ্ঞাতসারেই। এ নিয়ে নানারকম রসিকতা ও গল্পগুজব হয়— সমাজ কাউকে শাসন করে না, সম্ভবত তার সে ক্ষমতাই নেই। প্রায় প্রত্যেক রমণীকে নিয়েই তাই কানাকানি চলে অবাধে। কিন্তু নিজ নিজ স্বামীর জন্যে তাদের অনুরাগও কম নয়। নিরাপদে যাতে ঘরের পুরুষ ঘরে ফিরতে পারে সেজন্যে জেলে রমণী ঝড়ের দেবতাকে দুর্যোগের রাতে মিনতি করে— শান্ত হয়ে বসার জন্যে উঠোনে পিঁড়ি পেতে দেয়।

মাত্রাতিরিক্ত শ্রম ও দুর্বিষহ দারিদ্র্যের গতানুগতিকতায় এই জেলে সমাজের জীবনে প্রেম-ভালোবাসার আগমন ও নিষ্ক্রমণ দুই-ই ঘটে নিঃশব্দে। মেয়েরা এগারোতেই বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। স্বামীর বয়স বেশি হলেও আপত্তি নেই যদি তার সচ্ছলতা থাকে। কনের অবয়ব নিখুঁত হলে তার পিতা বরের কাছে চড়া দাম হাঁকে— তিন কুড়ি থেকে পাঁচ কুড়ি টাকা। তারপর তারা নিয়মিত রান্না করে, সংসার দেখা-শোনা করে, সন্তানের জন্ম দেয়। স্বামীদের চোখে তারা প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসা পৃথিবীর কোনো স্বামীর মতো মাঝিরাও সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। প্রেমের স্থান পূরণ করে অধিকার বোধ— তাই সামান্য সন্দেহেও ফেনিল হয়ে ওঠে ঈর্ষা। পঙ্গু মালাকে নির্যাতনের ভেতরে কুবেরের ভালবাসার চেয়ে স্বার্থপরতাই প্রবলতর অভিব্যক্তি পায়। ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লম্পট পুরুষ দরিদ্র জেলে রমণীর দেহে দু'দিনের বৈচিত্র্য খোঁজে— সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কুবেরের মতো

সৎ জেলে কিন্তু সাধারণত অন্য রমণীতে আসক্ত নয়। এমনকি যখন তারা অসামাজিক প্রেমে, তীব্র ইন্দ্রিয়জ বাসনায় দগ্ধ হয়— তখনো এক ধরনের সামাজিক বিবেক তর্জনী তুলে থাকে। স্ত্রীর বোনের সঙ্গে ঈষৎ ফষ্টিনষ্টিকেও নানা রকম সামাজিকতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এই পরিবেশে যাদের জীবন কাটে তাদের লোভ-লালসাও সংকীর্ণ। নোট ও কাঁচা পয়সায়-ঠাসা ব্যাগ হাতে পেলেও তেরো আনার বেশি তারা চুরি করতে পারে না। তিন টাকা থেকে দু'আনার বেশি সরাতে পারে না। বেশি চুরি করার সামর্থ্য তাদের নেই জেনেই মনিব তিন টাকা খরচের হিসেব নিতে চায় না।

এই সরল জেলেদের শোষণ করে সবাই। জমিদার, তার নায়েব-গোমস্তা, এমনকি জেলে সমাজেই যারা একটু অবস্থাপন্ন তারাও বাদ যায় না। জমিদারের কর্মচারী তাদের কাছ থেকে ধারে মাছ কেনে নিয়মিত, ধার শোধ করতে চায় না। অথচ রক্ষিতার জন্যে তার খরচের হাত দরাজ।

এই সমাজের কোনো পীড়িতা মেয়েকে মহকুমা শহরের হাসপাতালে প্রেরণ যেন প্রতিমা বিসর্জনের মতোই করুণ ঘটনা। সারা গ্রামের লোক ঘাটে ভেঙে পড়ে। হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য থাকলেও ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ বিচার আছে। কিন্তু সংকটকালে তারা ভদ্রসমাজের মতো এই গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে থাকে না— তখন মুসলমান তরুণীকে অনন্যোপায় হয়ে শুদ্ধ বস্ত্রেই জেলে রমণী জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। মোটকথা, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ঔদার্য-সংকীর্ণতা মিলিয়ে কেতুপুরের মাঝিদের জীবন। লেখকের নিজের ভাষায় 'ভদ্রলোকের মত একটানা সঙ্কীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ'।

পদ্মানদীর পটভূমিতে রচিত এই জীবনালেখ্যের শিল্পরূপ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "... উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিত বোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।"[১৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিমিতিবোধ এই গ্রন্থে এতো প্রচণ্ড যে মাঝে মাঝে মনে হয় পদ্মানদীর মাঝি কি জীবন সত্য (whole truth) না জীবনের প্রতিভাস (tragedy)? সমগ্র উপন্যাসে শুধু একটি জায়গায় এই নিখুঁত শিল্পরীতির স্খলন ঘটেছে।[১৬] এছাড়া অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র অন্যমনস্কতা নেই। প্রত্যেকটি বাক্য নির্ভার ঋজু; প্রত্যেকটি পরিস্থিতি অথবা দৃশ্যের ভিত্তিমূলে নিরেট সংহত বাস্তব অভিজ্ঞতা; প্রত্যেকটি বর্ণনায় নিরাবেগ শান্ত শিল্পদৃষ্টি।

প্রথম তিন পরিচ্ছেদেই উপন্যাসের পরিণতির আভাস নিপুণ কৌশলে সংকেতায়িত হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের দারিদ্র্য, রাসুর ময়নাদ্বীপ থেকে প্রত্যাবর্তন, হোসেন মিয়ার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব— সবই যেন অনিবার্য বেগে কাহিনীকে একটি বিশেষ মোহনার পথে আকর্ষণ করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ শুরু হবার অব্যবহিত আগের বাক্যেই লেখক কুবের চরিত্রের এক অনাবিষ্কৃত প্রদেশের ওপর আলোক নিক্ষেপ করলেন। গণেশের উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়ে 'কুকী' তন্ময় হয়ে রূপকথা শুনতে শুনতে ভুলে যায় তার বসন বিস্রস্ত— অপর শ্রোতা কুবের এই সুযোগ নষ্ট করে না। সুতরাং মালাকে বলতেই হয় : "কুকী'! গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদী! মাইয়া য্যান সঙ? বলিয়া আড় চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া মালা আবার রূপকথা বলিতে থাকে।"[১৭] কুবের-চরিত্রের

স্বতন্ত্র সম্ভাবনা এই চকিত আলোর ঝলকানিতে আভাসিত হয়। অতঃপর কপিলার আবির্ভাবে তার (সেই সম্ভাবনার) স্পষ্টতর ছবি উপাখ্যানের ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চার করে। বলা যায় যে, চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই উপন্যাস ভিন্ন মোড় নিয়েছে। কেতুপুরে অকিঞ্চিৎকর মাঝি কুবের হঠাৎ ব্যক্তি কুবের হয়ে উঠলো। দৈনন্দিন দারিদ্র্যের আবরণে তার অন্তর্জগত ঢাকা পড়েছিল, কপিলার ছন্দোময় গমনভঙ্গি— লাস্যমণ্ডিত চালচলন, পঙ্গু মালার সঙ্গে প্রতিতুলনায় তার অতিরিক্ত সজীবতা— সব মিলিয়ে এক তুমুল বিস্ফোরণের শব্দে কুবেরের ঘুম ভাঙলো। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আশ্বিন মাসের অতর্কিত ঝড় কেতুপুরের বহির্জীবনকেই বিপর্যস্ত করে নি— কুবেরের অন্তর্জীবনেও এই ঝড় প্রচণ্ড আঘাত হানে। দুর্যোগের রাত শেষে হলে পরের নৌকোয় নদী পার হয়ে কুবের যখন ঘরে ফেরে, পথিমধ্যে প্রতীক্ষমাণ কপিলার সজল উচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে কুবেরের জন্যে তার অনুরোগটুকু তখন আর গোপন থাকে না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আহত গোপীর চিকিৎসা উপলক্ষে মহকুমা শহর আমিনবাড়ির হাটে 'চাঁচের বেড়ায় ঘেরা' কক্ষে অনিচ্ছসত্ত্বেও কপিলার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে কুবের। হঠাৎ একদিন দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে শ্যামাদাস এসে কপিলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রহস্যময়ী নারী মোটেই আপত্তি করেন না। অতঃপর সুদীর্ঘ শেষ পরিচ্ছেদে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে— ইলিশের মরশুম ফুরিয়ে যায়। অসন্তুষ্ট ধনঞ্জয় কুবেরকে আর কাজে বহাল রাখে না। অভাবের গাঢ় ছায়া পড়ে কুবেরের সংসারে। হোসেন মিয়া কি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো? কুবের গণেশ দুজনেই হোসেন মিয়ার নৌকায় চাকরি নেয়। একবার তারা নৌকা নিয়ে যায় বহু-আলোচিত ময়নাদ্বীপে। সচ্ছলতা আসে কুবেরের সংসারে। সেই সঙ্গে আবার আসে রক্তের মধ্যে কপিলার জন্যে চঞ্চলতা। বিনা কারণেই কুবের একদিন শ্যামাদাসের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কিন্তু কপিলার রহস্য বোঝা ভার। গোপীর পা ভালো হয় দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারে। সঙ্গে সঙ্গে পণের অঙ্ক বাড়িয়ে দেয় কুবের। পাণিপ্রার্থী রাসুর তাতেও আপত্তি ছিলো না— কিন্তু হোসেন মিয়ার হস্তক্ষেপে সচ্ছলতর বঙ্কুর সঙ্গে গোপীর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে উপলক্ষে আসে কপিলা। উৎসবের আহলাদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই কুবেরের ঘর থেকে রাসুর মামা পীতম মাঝির অপহৃত ঘটি বের করে পুলিশ। নদীর ঘাটে প্রতীক্ষমাণ নিয়তির মতো হোসেন মিয়া তার উদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। নৌকায় ওঠে কুবের। সঙ্গে যায় কপিলা। গন্তব্যস্থল ময়নাদ্বীপ।

এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। সামাজিক মানুষ হিসেবে সে দরিদ্র ছা-পোষা জেলে। তার সংসারে সর্বমোট ছজন পোষ্য। জমিদারের কর্মচারী তাকে দরিদ্র বলে ঠকায়, নৌকার মালিক ধনঞ্জয়ও ঠকায়। এমন কি তার চেয়েও সঙ্গতিহীন প্রতিবেশী সিধু পর্যন্ত তার সঙ্গে প্রতারণা করে। কর্মজীবনে তার একমাত্র অনুগত ব্যক্তি গণেশ— আর সংসারে, তার স্ত্রী মালা। গণেশ নির্বোধ আর মালা আজন্ম পঙ্গু। এই দুটি ক্ষেত্রেই কুবেরের স্বাভাবিক আধিপত্য। নিজের সম্পর্কে সে অজ্ঞ নয়। বিমুখ ভাগ্যের সঙ্গে সে আপস করেছে, কেননা সে জানে : "গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোট লোকের মধ্যে আরও বেশি ছোট লোক। ... তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না।"[১৮]

এই ধরনের পটভূমিতে কুবেরের মতো মানুষের চরিত্রের গড়ন যেমন হওয়া সম্ভব তেমনই হয়েছে। সে আজন্ম ভীরু। নৌকোর মালিক ধনঞ্জয়কে কুবের যেমন সমীহ করে চলে, তেমনি মাথা নিচু করে মেনে নেয় ময়নাদ্বীপের মালিক হোসেন মিয়ার

নির্দেশ। জমিদার মেজো বাবুর বিরুদ্ধে গোপন ক্ষোভ তার মনেই থাকে— কিংবা বলা যায় তার বিকৃত প্রকাশ ঘটে পঙ্গু মালাকে নির্যাতনের ভেতর দিয়ে— কিন্তু মেজো বাবুর সম্মুখে গিয়ে আবেদনে নিবেদনে কুঁকড়ে যায় ভীত, দরিদ্র কুবের। মানুষকে তার ভয়, ভয় কাল্পনিক অপবাদকেও। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে কপিলার হাসির শব্দে "কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে।" তারপর রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেলে তার ভয় আর পাঁচজন ভীতু লোকের মতোই পরিণত হয়ে ক্রোধে— কপিলাকে সে তিরস্কার করে বলে : "খাটাসের মত হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?" উপাখ্যানের প্রায় উপান্তে কেতুপুরের ঘাটে অনেক রাতে, কুবের শাদা কাপড় পরিহিতা এক রমণীকে দেখতে পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার "... বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের।" এবারো দেখা গেল কোনো অশরীরিণীর বদলে রীতিমতো শরীরী নায়িকা কপিলাই ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

এহেন ভীতু কুবেরের জীবনে দারিদ্র্য আর প্রেমের এক বিরতিহীন প্রতিযোগিতা শুরু হয় : তার পটভূমি রচনা করে পদ্মার মতো অনিশ্চিত নিষ্ঠুর নদীস্রোতের খেয়ালখুশি, হোসেন মিয়ার মতো এক আধা স্বাপ্নিক আধা বাস্তব মানব, সর্বোপরি কপিলার মতো এক রহস্যময়ী যুবতী— গতি পরিবর্তনের স্বেচ্ছাচারে সে কি পদ্মার চেয়ে কম কিছু?

সম্ভবত মালার পঙ্গুতাই কুবেরের উপবাসী মনের কাছে কপিলার সহজল সাবলীল চলন এবং সুস্থ অভিব্যক্তিকে অতো মোহময় করে তুলেছিল। কিন্তু দারিদ্র্য যার দৈনন্দিন সঙ্গী— তার আবার মর্মবেদনার বিলাস কেন? শ্যামাদাসের সচ্ছলতার ছবি দেখে ঈর্ষায় নিজেকে গুটিয়ে নেয় কুবের। মার-খাওয়া কুকুরের মতো ফিরে আসে পঙ্গু স্ত্রীর কাছে। কিন্তু তার কানের ভেতরে— অথবা অন্তরের কোনো অদৃশ্য গুহায় সব সময় কপিলার সেই সংলাপ বুঝি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়— "চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাটা কইও! কইও, কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথি কই থাকব, অতিথি কি খাইব, কপিলারে কেবা তা জিগায়? দুখী কইরো মাঝি, শাইপো— কিন্তু এই কথাটা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।" কুবের তাই স্বপ্ন দেখে, একদিন তার সৎ পরামর্শে হোসেন মিয়া নিষিদ্ধ আফিম চালানীর ব্যবসা নিশ্চয় ছেড়ে দেবে— পুরস্কার হিসেবে কুবেরকে দেবে অঢেল অর্থ। স্বপ্নের প্রবল তোড়ে ভেসে গিয়ে 'চার' ভিটায় চারিখানি বড় বড় ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানের মাড়াই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের— "ও কপিলা, আমারে ফেইলা যাইস না, যাইস না— আমিনি মইরা গেলাম কপিলা তরে না দেইখা!"

কিন্তু কুবের ভাববিলাসী মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ নয়— জীবন-যুদ্ধে মার-খাওয়া পদ্মানদীর মাঝি। তার স্বপ্নের রাশ টেনে ধরে নিরাবরণ বাস্তব। হৃদয়ের স্থান অধিকার করে উদরের ক্ষুধা। চারটি সন্তান এবং অসহায় স্ত্রীকে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে তার সংসার। হোসেন মিয়ার নৌকোয় মাঝিগিরি করতে করতে তার জীবনে সামান্য সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত প্রেম তাই স্থগিত থাকে। হোসেন মিয়ার মধ্যস্থতায় গোপীর বিয়ে স্থির হয় সোনাখালির এক নোঙরহীন যুবকের সাথে। আট কুড়ি টাকা পণের

আশ্বাসে পিতা কুবের স্বস্তি লাভ করে। যদিও বিয়ের পরে গোপীকে ময়নাদ্বীপে গিয়ে বাস করতে হবে জেনে তার পিতৃহৃদয় 'জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মত' ছটফট করে, তবুও। আপেক্ষিক সচ্ছলতায় অতঃপর "কুবেরের ... মন কেমন করিতে থাকে"! দেহের ক্ষুধা তৃপ্ত হওয়ার ফলে তার শরীরের জেল্লা যতোই বাড়ে, ততোই যেন দুর্বল অভিমান কমে গিয়ে মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ততোই "মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা চাঞ্চল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোর-বেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান্ আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা"?

কপিলা এবং নিয়তি দুজনেই যেন আড়ালে আড়ালে কুবেরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। আকুর-টাকুরে শ্যামাদাসের ভর-ভরন্ত সংসারে যে-কপিলার আচরণের অর্থ কুবের তার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে নি— সেই আবার কুবেরের চরম দুর্দিনে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অজ্ঞাতপূর্ব ময়নাদ্বীপে যাত্রার জন্যে নৌকায় উঠে বসে— কারণ, নিরীহ কুবের, ভীতু কুবের, নির্বোধ কুবের "একা অতদূরে ... পাড়ি দিতে পারিবে না"। এই ভীরুতা-নির্বুদ্ধিতা আর দারিদ্র্যের টানাপড়েনেই কুবের-চরিত্র এতো বাস্তব। তার ব্যক্তিত্বের প্রথম উন্মেষ হৃদয়ের জাগরণে। কিন্তু হৃদয় এখানে কয়েকটি সৌখিন আবেগের ফুলঝুরি মাত্র নয়। তার উপমা দেওয়া চলে এক বিকাশোন্মুখ তরুণ বৃক্ষের সাথে— যার শিকড় ছড়ানো প্রতিদিনের পরিচিত রূঢ় মৃত্তিকায়, যার প্রতিটি টাতা সতেজ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে বেড়ে উঠতে চায় অথচ দারিদ্র্য নামক ভীষণ ঝড়ের ঝাপটায় বারবার তাকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। বিমুখ বাস্তবের ভেতরে হৃদয়ের এই প্রচণ্ড উন্মেষে কুবের-চরিত্রে যে দার্ঢ্য সঞ্চার করেছে তারই জোরে সে আমাদের কাছে সত্য ও জীবন্ত হলো। মহাকাব্যের নায়কের মতো সে আদর্শ গুণাবলির সমাহার নয়; তার নীচতা-সংকীর্ণতা-অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কুবের যে একটি উপাখ্যানের নায়ক হতে পারলো, তার মূলে আছে এই অবিমিশ্র স্বাভাবিকতা— যাকে আমরা বাস্তবের সঙ্গে সমীকরণ করতে পারি অনায়াসেই। হয়তো আরো তলিয়ে দেখলে কুবের-চরিত্রে চেতন-অবচেতনের নিষ্ঠুর ও রহস্যময় দ্বন্দ্বের মানবিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে, কী করে অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সীমাবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তির রূপ নির্ণয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এইখানেই পদ্মা নদীর প্রথম মাঝি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলিতে যেসব নরনারী জীবন্ত হয়েছিলো তারা ছোটগল্পের চরিত্র। মুহূর্তের আলোক সম্পাতে তাদের আমরা দেখেছি সত্য হয়ে উঠতে, কিন্তু সেই সত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলো একজন সংবেদনশীল কবির অন্তর্দৃষ্টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্দৃষ্টিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছেন, বরং বলা যায়, তিনি তাঁর চরিত্রাবলির অন্তরের গহিনতম গুহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন— কিন্তু তৎসহ তাদের পরিপার্শ্বের সীমা নির্দেশ করেছেন স্পষ্টভাবে— ফলে তাদের অসহায়তা আরো বেশি প্রকট। ভূপাতিত এ্যালবাট্রসের মতো তারা আকাশের স্বপ্ন দেখলেও আর আকাশে উড়তে পারে না। আজন্ম পঙ্গু মালার হৃদয়ে সন্তানের জন্যে মমতার অভাব নেই— অস্ত্রোপচারে গোপীর আহত পা ভালো-হয়ে যাওয়ায় তার মাতৃহৃদয় উৎফুল্ল হয়— সঙ্গে সঙ্গে তার মনেও একবার সুস্থ সহজ মানুষের মতো চলা-ফেরার বাসনা জাগে। কুবের কি তাকে একবার

হাসপাতাল নিয়ে যেতে পারে না? কুবের তা পারে না বলেই যেন মালার নির্ভেজাল সন্তান-বাৎসল্য পর্যন্ত আক্রোশে-ঈর্ষায় ফেনিল হয়ে ওঠে। "কোলের ছেলেটাকে মালা মাই ছাড়াইয়া নিচে ফেলিয়া দেয়, ঘুরিয়া বসিয়া দরজার খুঁটিতে ঠকঠক করিয়া মাথা ঠোকে আর কাঁদিতে কাঁদিতে আহ্বান করে মরণকে— যে মরণ এমন নির্দয় যে মালার মত পোড়া-কপালির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।"

বস্তুত মালা ও কপিলা যেন দুটি প্রতীক চরিত্র। মালা স্থির, অচল, নিশ্চিত। কপিলা অস্থির, জঙ্গম, অনিশ্চিত। মালা ঘর, সত্য, সামাজিক। কপিলা বাহির সম্ভাবনা, অসামাজিক। এই দুইয়ের মাঝখানে কুবের। সংসার তাকে দিয়েছে সন্তান, আশ্রয় আর দারিদ্র্য। বাহির তাকে আকর্ষণ করে স্বপ্ন, শঙ্কা আর অসম্ভবের পথে। পদ্মানদীর মাঝির জীবনে যেহেতু কোনোটির দাবিই কম নয়— তাই কুবেরকে আমরা দেখি দ্বন্দ্ব-বিক্ষত। কিন্তু পদ্মার বিপুল বিস্তার ও স্রোতের মেদির সম্মোহন যার জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করে আছে— তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিতের পথে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

মালা ও কপিলাকে প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা গেলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে তারা কেউই টাইপ চরিত্র নয়। তাদের ব্যক্তিত্বের রক্ত-মাংসময়তা আমাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে আক্রমণ করে যে মালা অথবা কপিলার সামান্যতম অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে এড়ায় না। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো এই দুটি চরিত্রের বাস্তবতা যেন আমরা প্রায় স্পর্শ করতে পারি। বিশেষত কপিলার বেগুনি রঙের শাড়ি ও তেলে-ভেজা চুল এবং বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গি! তার যখন-তখন প্রগল্‌ভ হাসি ও তির্যক কথার বিদ্যুৎ যেন পদ্মার মতোই রহস্যের পসরা ছড়িয়ে যায় গতিপথে। কিন্তু কপিলার চরিত্র তাই বলে সমালোচকের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

কুবের তবু তো মালাকে তবু সন্তান প্রজননের উপায় হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছিলো— শ্যামাদাস কপিলাকে যে সেটুকুটুক দেয়নি তার প্রমাণ পাই যখন দেখি দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু না-হওয়া-পর্যন্ত সে কপিলার খোঁজ পর্যন্ত নেয় নি। কপিলার ফলন্ত শরীরও শ্যামাদাসের কাছে মূল্য পায় নি— মন তো অনেক দূরের ব্যাপার। এই লীলাময়ী নারীর অপমানিত সম্ভ্রমবোধ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে উপাখ্যানের চতুর্থ পরিচ্ছেদে— যখন কুবের কপিলা কবে পিতৃগৃহে এলো জানতে চেয়ে নির্দোষ প্রশ্ন করেছে। "কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, হাসলা যে মাঝি?"— সহজ স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তি দেখিয়া কুবের একটু অবাক হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে চাহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ চোখ মটকাইয়া তাহাকে কী যেন একটা ইশারা করিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুবের করিল কি, মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, "হাসি নাই কপিলা, হাসুম ক্যান।" স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীর সবচেয়ে দুর্বল স্থানে হাত-পড়াতেই যে এই আকস্মিক বিস্ফোরণ— কুবেরের তা বোঝার ক্ষমতা নেই— তবে পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। কুবেরের শুধু মন উপবাসী ছিলো— কপিলার দেহ-মন দুই-ই। অচিরেই কুবের তার প্রতি ভয়ানকভাবে আকৃষ্ট হলো;— কপিলার যেন দুই সত্তা— একদিকে সে চঞ্চলা চপলা কিশোরী— অন্যদিকে প্রৌঢ়া পরিণত নায়িকা। কখনো সে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন নদীতীরে এসে কুবেরের হাত ধরে টানাটানি করে, আবদার করে, কুবের কি তাকে সঙ্গে করে নৌকোয় নেবে না? তখন কপিলা ভুলে যায়, সে

মালার সহোদরা। তার প্রগলভতায় বিরক্ত কুবের কপিলাকে তিরস্কার করে— "অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মত তাহাকে পিছনে হেলাইয়া, বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা। কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, আরে পুরুষ!— তাহার নির্বিবাদের কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস— সব রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড় ভয় হয়।"

কিন্তু কুবেরের ভয় কি কপিলাকে? এই প্রশ্নের উত্তর না-বোধক। কুবেরের ভয় তার নিজেকে। কেননা তার পেছনে আছে জঙ্গম কপিলার সহোদরা স্থবির মালার সামাজিক বন্ধন। তাই তাকে বলতেই হয়— "মাইনষে কইব কী? যা বাড়িত যা।" এ যেন নিজের প্রবৃত্তিকেই প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া। কিন্তু নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি বেশি দিন চলে না। কেতুপুরে পূজার উৎসবে ঠাকুর দেখতে গিয়ে কপিলা যখন জমিদারের কর্মচারী শীতলের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে তখন আড়াল থেকে তাই দেখে কুবেরের সর্বাঙ্গে ঈর্ষার আগুন জ্বলে— "ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া এত কথা কীসের কপিলার?" এ যেন আধুনিক কবির মতোই সুরঞ্জনার প্রতি জিজ্ঞাসা— "কী কথা তাহার সাথে— তার সাথে?" আর সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যেই যেন অন্ধকার পথের ওপরে কুবের কপিলাকে জড়িয়ে ধরে— তার প্রবৃত্তির সমস্ত সামাজিক শৃঙ্খল অকস্মাৎ স্খলিত হয়ে যায়। কপিলা কিন্তু "শান্ত হইয়া থাকে, হঠাৎ বড় যেন করুণ কণ্ঠে বলে, মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়। কুবের তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান রে কপিলা? কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে। সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।" তবে কি সবই কপিলার অভিনয়? অন্তত কুবেরের তাই মনে হয়। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, স্বামীকে মনে পড়া আর স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এক জিনিস নয়। চিরন্তন নারীর হৃদয়ে নিজেকে একটি বিশেষ পুরুষের কাছে একান্তভাবে সমর্পণের বাসনাই এই ছদ্মবেশী বাক্যটির ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিলো। নইলের সপত্নীর মৃত্যুর পরে, স্বামীর বাড়িতে আপাতদৃষ্টিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও কুবেরের সঙ্গে কপিলার রহস্যময় ব্যবহারের তাৎপর্য কোথায়? দিদির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মিনতির ভেতর কপিলার অন্তরের শূন্যতাই কি অনুরণিত হয় নি? স্বামী শ্যামাদাসের কাছে তখন তার দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেছিলো— কিন্তু তার প্রেম? কপিলার স্বামী শ্যামাদাস অবস্থাসম্পন্ন লোক— তার সংসারে সচ্ছলতার অভাব নেই। কিন্তু তার চরিত্রের চেহারা যেন তার অবয়বেই ফুটে উঠেছে— "লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবড়ি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নিচে এক জোড়া উদ্ধত গোঁফ— খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কারো সে তোয়াক্কা রাখে না।"— কপিলা তো বিশ্বজগতের বহির্ভূত কেউ নয়— অতএব তার হৃদয় নামক বস্তুটির স্বীকৃতি যে শ্যামাদাসের কাছে আদৌ মেলে নি— তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কুবেরকে দেখে কপিলার অতৃপ্ত অন্তর তাই সহজেই জেগে ওঠে— কিন্তু সমাজ যেখানে অন্তরায় সেখানে নিভন্ত আগুন খুঁচিয়ে লাভ কি? তাই সে কুবেরকে অনুযোগ করে— "যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি"।

নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি কারো পক্ষেই বেশি দিন চালানো সম্ভব নয়— কপিলার পক্ষেও নয়। তাই চরডাঙায় পিতৃগৃহে দোলের দিনে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কুবের-কপিলা দুজনের অসংকোচে সত্যের মুখোমুখি হয়। "কুবের বলে, তর লাইগা

দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা। কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামির ঘরে গেছি না আমি? আমারে ভুইলো মাঝি— পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।" লক্ষণীয়, বাহ্যত এই উপাখ্যানে একমাত্র মালা-ই পঙ্গু। কিন্তু কপিলার মতো ছন্দময়ী তরুণীও কি সমাজ-মানুষের কাছে পঙ্গু নয়? যে কুবের দিগন্ত-বিসারী পদ্মা পাড়ি দেয় অবলীলায়— সেও কি অদৃশ্য নিয়তির হাতে পঙ্গু ক্রীড়নক নয়? তাদের মিলনের প্রয়োজনীয় পটভূমি রচনার জন্যেই যেন আরেকটি দুর্ঘটনা আবশ্যক ছিলো। সেই অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যের এক তীব্র আঘাতে পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবন তীরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের নোঙরচ্যুত হয়ে ময়নাদ্বীপ নামক এক সুদূর গন্তব্যের অভিসারী হলো।

সেই অনিবার্য পরিণতির জন্যে প্রয়োজন ছিলো এই উপাখ্যানের অন্যতম পুরুষ হোসেন মিয়ার— যাকে এই আলোচনার সূচনায় আধা স্বাপ্নিক আধা বাস্তব চরিত্র বলে বর্ণনা করেছি। হোসেন মিয়া যেন তার ময়নাদ্বীপের মতোই রহস্যময়— যে ময়নাদ্বীপের চাক্ষুষ পরিচয় কেতুপুরে খুব কম লোকই রাখে— অথচ যার গল্প প্রায় কিংবদন্তির মতো সবার মুখেমুখে। হোসেন মিয়া নিজেও একদিন দরিদ্র মাঝি ছিলো— কিন্তু নিজের হাতে সে ভাগ্য পরিবর্তন করে ধনবান ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। তাই বলে তাকে জেলেপাড়ার লোকেরা দূরে সরিয়ে রাখে না। জমিদার অনন্ত বাবুকে তার পরোপচিকীর্ষা সত্ত্বেও সবাই ভয় করে, অনাত্মীয় মনে করে— কিন্তু হোসেন মিয়াকে নয়। তার কারণ খুঁজতে দূরে যেতে হয় না। অনন্ত বাবু জন্মসূত্রে জমিদার— তার শ্রেণী সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে ভাগ্য-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে হোসেন মিয়ার শ্রেণী-চরিত্রের রূপান্তর ঘটলেও তার অতীত-জীবনের স্মৃতি সবার মনেই জাগরূক আছে। তার প্রাক্তন শ্রেণী-পরিচয় যেমন হোসেন মিয়ার পক্ষে জেলে পাড়ায় অবাধ যাতায়াতের জন্যে সহায়ক হয়েছে— তেমনি পরবর্তী শ্রেণী-পরিবর্তনের অভিজ্ঞান তার জন্যে এনেছে একরম রহস্যমেশানো শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা তার সম্পদকে; রহস্য— সেই সম্পদের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত। শ্রদ্ধার সঙ্গে আতঙ্ক যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। ধনের সঙ্গে সেই শঙ্কা যেন চিরদিনই হাত ধরাধরি করে আছে। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ যেন এক বিশ শতকী প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র। কোনো অনিচ্ছুক মানব-মানবীকে নিয়ে সেখানে সে বসতি স্থাপন করতে চায় না। কিন্তু হোসেন মিয়ার ইচ্ছাই যখন তাদের ইচ্ছা হয়ে ওঠে— তখন পৃথকভাবে তাদের অনিচ্ছার কোনো মূল্য আছে কি? হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে প্রয়োজন শুধু নবীন নর-নারীর। তাই আমিনুদ্দি-নসীবনের মতো ঘর-ভাঙা কপাল-পোড়া নারী-পুরুষকে সংগ্রহ করে সে নিয়ে যায় সেই অজ্ঞাত জনপদে— যেখানে সব মিলিয়ে জনসংখ্যা একশোর বেশি নয়। সেই ময়নাদ্বীপের সমাজ-শাসনের ন্যায় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যদি না মেলে তবে কি দোষ দেয়া যায় হোসেন মিয়াকে? বৃদ্ধ বসিরুদ্দিনের তরুণী স্ত্রী যদি পাঁচ বছরেও সন্তানবতী না হয় তবে যোয়ান এনায়েতের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ককে পরিণয়ের ভেতরে স্বাভাবিক পরিণতি দেয়াটাই কি সঙ্গত নয়? অতএব বসিরুদ্দিনকেই শেষ পর্যন্ত দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে হয়। এনায়েত এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বসিরুদ্দির তরুণী স্ত্রীকে সন্তানবতী করার অধিকার পায়। কারণ ময়নাদ্বীপে নতুন মানুষ দরকার।

সন্দেহ নেই, হোসেন মিয়ার চরিত্রে রোমান্টিক কল্পনার উপাদান আছে যথেষ্ট। সুস্পষ্ট বাস্তব-ভিত্তি নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও এই চরিত্রটির ওপরে কল্পনার এমন গাঢ় অভিক্ষেপ ঘটেছে যে, কুবেরের মতো, পাঠকদেরও মনে হতে পারে, "লোকটার আদি-অন্ত পাওয়া ভার"। তবে 'আদি' লেখক নিজেই এভাবে বর্ণনা করেছেন : "প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়া ছিল পরণে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় এক ঝাঁক রুক্ষ চুল— ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত। জেলেপাড়া-নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় সে বৈঠা বাহিত।"

কিন্তু সে তো পূর্বজন্মের কথা; এখন? লেখকের ভাষাতেই বলা যাক : "আজ সে তাহার বেঁটেখাটো তৈল-চিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে।" এই রীতিমতো বাস্তব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও হোসেন মিয়া ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠেছে, তার কারণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই একটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে নিজের রোমান্টিক কল্পনাকেই যেন রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। লেখকের মানসপুত্র হোসেন মিয়ার অসাধ্য কিছু নেই। মুখে মুখে এক আশ্চর্য মরমীয়া গান বেঁধে সে যখন কুবেরকে বলে 'খুল হলি না পারি কী'— তখন তার সেই প্রত্যয়ের অংশীদার হতে আমাদেরও বুঝি আপত্তি থাকে না। হোসেন মিয়া প্রসন্ন হলে সবই করতে পারে। বিশাল দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে দক্ষ নাবিকের মতো সে নৌ-চালনা করতে পারে, জেলের আসামিকে আইনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ময়নাদ্বীপে আশ্রয় দিতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে কুবেরের মত মাঝির শোবার ঘরের মাঝখানের খুঁটি বেয়ে উঠে আফিমের বান্ডিল লুকিয়ে ফেলতে পারে! মন খুশি থাকলে ছোটখাটো শঠতা যেমন উপেক্ষা করতে পারে, তেমনি দরিদ্র জেলেদের বিপর্যয়ে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার জীবনের উদ্দেশ্য একটাই— ময়নাদ্বীপের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। সে এক কুমারী অরণ্যের বুকের মাংস খুবলে নিয়ে আবাদ করা বসতি-, সেখানে জমি যে আবাদ করবে সেই মালিক; হোসেন মিয়া তার স্বপ্নের দ্বীপে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কাউকে বুনতে দেবে না— তাই ময়নাদ্বীপে মসজিদ-মন্দির কিছুই নেই। কিন্তু তবুও এ-সত্য স্বীকার করতেই হবে যে হোসেন মিয়ার চরিত্র অবিমিশ্র আদর্শায়িত নয়— তার আচরণের সীমাবদ্ধতার ভেতরেই আছে বাস্তবতার রক্তিম আভাস। যখন প্রকাশিত হয়ে যায় যে আফিমের চোরাই ব্যবসাই তার সৌভাগ্যের উৎস তখন হোসেন মিয়ার আদর্শায়িত চেহারা ঈষৎ মলিন হয় বটে কিন্তু সেই মালিন্যের ক্যানভাসেই তার অবয়ব যেন রক্ত-মাংসের পূর্ণতা পায়। কুবেরের ঘরে যখন পীতম মাঝির চুরি-যাওয়া টাকার ঘটি পুলিশ খুঁজে পায়, তখনো এই অপকর্মের দায়িত্ব লেখক যেন নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার ওপরেই ন্যস্ত করেন, কেননা কুবেরের ভাগ্যবিপর্যয়ে হোসেন মিয়ার স্বপ্নই তো সফল হয়— যন্ত্রচালিতের মতোই কুবের ময়নাদ্বীপে যেতে সম্মত হয় আর কপিলা সঙ্গে গেলে ময়নাদ্বীপের জনসংখ্যায় নতুন মানুষ যোগ হবে বৈ কি। স্বপ্ন ও বাস্তবের অপরূপ অথচ সুষম সমন্বয় ঘটেছে বলে হোসেন মিয়ার চরিত্র শুধু 'পদ্মানদীর মাঝি' নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেরই এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। লেখকের পরিমিতবোধের গুণে তার দেবত্ব ক্ষুণ্ন হলে হোসেন মিয়া পশুতে রূপান্তরিত হয় না, মানুষ হয়ে ওঠে। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যতা।

এই উপন্যাসের আরেক প্রধান চরিত্র পদ্মা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে যেমন নায়ক দু'জন— পদ্মা এবং পদ্মাতীরবর্তী মানুষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিতেও তাই। কিন্তু গল্পগুচ্ছকে যদি গীতিকবিতা বলা যায়, তবে পদ্মানদীর মাঝিকে বলতে হয় মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাই পদ্মার খণ্ড খণ্ড রূপের পরিচয় আছে, পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই খণ্ড রুপের ভেতরে এনেছেন নিয়তির মতো এক বিপুল স্রোতের ধারাবাহিকতা। কোনো বিশেষ মনোভাব বা মুড্-এর প্রতীক হিসেবে নয়— একটি প্রচণ্ড সত্তার মতো এই উপাখ্যানের সমস্ত নরনারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে পদ্মা। তার বুকের ঐশ্বর্য রুপোলি ইলিশের ফসল তুলে পদ্মানদীর মাঝি যেমন সাময়িক সচ্ছলতার মুখ দেখে— তেমনি তার প্রবল পুচ্ছের তাড়নায় ঘর ভেসে যায়, মানুষের সংসারে গাঢ় দুর্ভাগ্যের ছায়া পড়ে। পদ্মাকে বাদ দিয়ে পদ্মানদীর মাঝি জীবন-পরিকল্পনা করতে পারে না। এই স্বেচ্ছাচারী সুন্দরীর প্রতি তাদের রক্তে মাংসে তাই Love-hate-এর মিশ্র অনুভূতি। হেমিংওয়ের বুড়ো যেমন জীবন নামক মাছটিকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলার সাধনায় ব্যস্ত, পদ্মানদীর মাঝি তেমনি এই সুন্দরীর মন রক্ষার জন্যে। কিন্তু মাছ যখন উঠলো, দেখা গেলো তার শরীরের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, পদ্মাও তেমনি কারো বশ্যতাই স্বীকার করে না। আর সেজন্যেই তার রহস্যেরও বুঝি শেষ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক বৈশিষ্ট্য— তাঁর গৌণ চরিত্রসমূহ। গণেশ, রাসু, পীতম, শীতল, সিধু, জহর, আমিনুদ্দি, এনায়েত— এদের কারোই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথচ এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে। গণেশের নির্বুদ্ধিতা, রাসুর সুবিধাবাদ, পীতমের আত্ম[illegible], শীতলের লাম্পট্য ও শঠতা, সিধুর প্রতারণা, আমিনুদ্দিন বিপর্যয়, এনায়েতের দুঃসাহসিকতা কিছুই দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। এমন কি মিতভাষী জহর পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে সামান্য কয়েকটি রেখার আঁচড়ে— শুধু বর্ণনার গুণে। কপিলা-মালাকে বাদ দিলে অপ্রধান নারী চরিত্রগুলিও কম জীবন্ত নয়। পীতমের মেয়ে এবং শীতলের রক্ষিতা যুগী, গণেশের বৌ উলুপী, কুবেরের মেয়ে গোপী, বসিরুদ্দির তরুণী স্ত্রী যার নাম নেই, এবং যার মুখে লেখক একটি সংলাপ পর্যন্ত দেন নি সেও কি আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে নিব? আমিনুদ্দিনের মেয়ে মমিন যখন তার পিতার ময়নাদ্বীপে যাত্রার খবর পেয়ে আলুথালু বেশে নদীর ঘাটে এসে 'বাপজান', 'বাপজান' বলে কাঁদতে থাকে, তখন তার আকুলতায় হোসেন মিয়ার মন টলে না, কিন্তু মন টলে পাঠকের। মমিনের কান্নার রেশ আমাদের মন থেকে কখনোই মিলিয়ে যায় না— তার এলোমেলো চেহারার ছবি জেগে থাকে চৈতন্যে— অথচ তার মুখে আর কোনো সংলাপ নেই— সমগ্র উপন্যাসে তার আর কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু তাই বলে সে কি অপ্রয়োজনীয়? না— তাকে বাদ দিয়ে আমিনুদ্দিনের বেদনা ও ট্রাজেডির চরিত্র অস্পষ্ট হয়ে আসে— আমিনুদ্দিন দুঃখের গভীরতা পরিমাপের জন্যেই মমিনের প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এমনি করেই গোটা উপাখ্যানের সবগুলি চরিত্রের ভেতরে লেখক এক অপরিহার্য পরস্পর নির্ভরতা গড়ে তুলেছেন। কুবের-কপিলার চিত্ত-রহস্য এদেরই সহায়তায় মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা পেয়েছে— অসতর্ক লেখকের পরিচর্যায় যা সহজেই 'খেউড়' হয়ে যেতে পারতো।

সমগ্র আলোচনায় আমি এই নিয়ে দুবার মহাকাব্য শব্দটি ব্যবহার করেছি। এবং তা অহেতুক নয়। মহাকাব্যের নায়কের মতোই কুবেরের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম— তার

প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়তি, কিংবা নিয়তির মতো পদ্মা। অতএব তার পরিণামকে মহাকাব্যিক বলা কি অসঙ্গত হবে? উপরন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকরণ— যা কিনা মহাকাব্যের মতোই ক্লাসিক সংযম ও শৃঙ্খলা এক আশ্চর্য উদাহরণ। একটি অতিরিক্ত শব্দ নেই— একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র বর্ণনার নিষ্ঠুর পরিমিত ও প্রায় বিনা উপমাতেই বক্তব্যকে দৃশ্যমান করে তোলার এই ক্ষমতা বাংলা কথাসাহিত্যে তুলনারহিত বললে কি বাড়িয়ে বলা হবে?

একশো বত্রিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপমা ব্যবহার করেছেন দশ থেকে বারোটি। এবং তার উপমানের জন্যে কবিপ্রসিদ্ধির কাছে হাত বাড়ান নি। প্রথম বিশ পৃষ্ঠায় কোনো উপমা ব্যবহৃত হয় নি। একুশতম পৃষ্ঠায় পদ্মার আকাশে মেঘকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "পাতলা কুয়াশার মত মেঘ আকাশ ভরিয়া আছে—" তারপরই একটি চিত্রকল্প— "নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতে অসংখ্য ছোট ছোট বুদবুদ ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে।" আরো বিশ পৃষ্ঠা পরে একচল্লিশতম পৃষ্ঠায় দেখি দ্বিতীয় উপমার আবির্ভাব। সদ্যপ্রসূত সন্তানকে কোলে নিয়ে কুবেরের "রোগা বৌটিকে ... রাজরানীর মত দেখাইতেছে বটে"। কিন্তু এই উপমানের হাস্যকরতা লেখক এক তীব্র আঘাতে বিদীর্ণ করেছেন পরবর্তী বাক্যেই— "কে জানে রাজরানী দেখিতে কেমন"? তৃতীয় উপমায় সদ্য নিদ্রোত্থিত কুকুরের বর্ণনা পাই : "দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুবেরের মতই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে ...।" চতুর্থ উপমা পাই উপন্যাসের পঞ্চাশতম পৃষ্ঠায়। রহস্যময়ী কপিলার হাসির শব্দে অন্ধকার নদীতটে আতঙ্কিত কুবের প্রশ্ন করে : "খাটাসের মত হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?" ষষ্ঠ উপমায় দেখি— গোপীর দিক তাকিয়ে রাসুর মনে হয় সে "পরীর মত সুন্দরী"। এবং এখানেও বাস্তব কল্পনার অবাস্তবতা লেখক নির্মম হাতে উদ্‌ঘাটিত করেছেন পরবর্তী বাক্যেই। "হ রুখো রুখো লালচে বটে চুলগুলি গোপীর, কপালটা একটু উঁচুই, থ্যাবড়ানো নাকের নিচে উত্তোলিত ওষ্ঠে ঠেকিয়া নোলকটা তাহার দুলিতে পায় না, আর হ, বড় নোংরা গোপী।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে এর পরে 'পরীর মত সুন্দরী' উপমাটির আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। গোটা উপন্যাসে উপমা ব্যবহারের এই রীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যৌনতার প্রাচুর্য সম্পর্কে যে অভিযোগ শোনা যায় অন্তত *পদ্মানদীর মাঝি* যে তার চৌহদ্দির বাইরে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কুবের-কপিলার অসামাজিক প্রেম, অন্ত্যজ জীবনযাত্রা, এসবই যৌনতার লোভনীয় উপকরণ বটে— কিন্তু লেখক সেই উপকরণ ব্যবহারে যে শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তাও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। আমিনবাড়ির হাটে কুবের-কপিলার চাঁচের ঘরে এক শয্যায় রাত্রি যাপন কোটো ঘটনা ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়। উদ্দাম কামনার ফেনিল স্রোতে কুবের-কপিলার ভেসে-যাওয়ার মুখেও লেখক দৃঢ় হাতে সংযমের বাঁধ দিয়েছেন। চরডাঙায় দোল খেলার শেষে যখন কুবের-কপিলার জন্যে গ্রামের পুকুরের জলকেলির এক নির্জনতম অনুকূল অবকাশ সৃষ্টি হলো— বিস্রস্ত-বসনা কপিলাকে যখন জলের ভেতরে কুবের আলিঙ্গনাবদ্ধ করলো তখন লেখক তার কোনো সুযোগই নেন না। "ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে

বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি?" এই পর্যন্তই। প্রবৃত্তির হাতে অসহায় পুতুল কুবের, তবু এর বেশি সে এগুতে পারে না— কারণ, কপিলার ভাষায়, "মানুষ আছে।"

আলোচনা শেষ করার আগে বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষকে দেখেছিলেন— মানুষের অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতির সহজ সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন; আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির মতোই দুর্জ্ঞেয় এক শক্তি— মানুষের প্রবৃত্তিকে দেখেছিলেন তার অন্তরের গুহায়িত আসনে। পঞ্চাশ বছর আগে পদ্মানদীতে নৌকা ভিড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে উপকরণ তুলে এনে শিল্প রচনার সূত্রপাত করেছিলেন— পঞ্চাশ বছর পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ বিকাশের উত্তর গতিতে *পদ্মানদীর মাঝি* লিখে ঐতিহাসিক ধারার পরিণতি দান করলেন।

তথ্যসঙ্কেত

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনী*, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, ১৩৭৭, কলকাতা, পৃ. ৩০৯
২. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৪শ খণ্ড, ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ৫৩৮
৩. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, ৩য় সং, ১৩৬৮, পৃ. ১৭
৪. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৬শ খণ্ড (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন), ১৯৬৫, কলকাতা, পৃ. ২৯৬
৫. *ঐ*, পৃ. ২৯৮
৬. ৩ জুলাই, ১৮৯৩, *ছিন্নপত্র*
৭. মে, ১৮৯৩, ছিন্নপত্র
৮. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭শ খণ্ড (সুভা), ১৯৬৫, কলকাতা, পৃ. ২৩৭
৯. ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, দিঘাপতিয়া জলপথে, *ছিন্নপত্র*
১০. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭শ খণ্ড (সুভা), পৃ. ২৩৬
১১. "ছোটখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া, ওল, কচু, লতাগুল্ম-তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধ্যের সময় সাজাদপুর এসে পৌঁছেছি।"— ৭ জুলাই ১৮৯৩, সাজাদপুর, *ছিন্নপত্র*
১২. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, পৃ. ৯
১৩. ঐ, পৃ. ১০
১৪. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, ১৩৭৭, কলকাতা, পৃ. ৪৯
১৫. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ৫ম সং, ১৯৬৫, পৃ. ৫১৬
১৬. কুবেরের সাংসারিক সম্পত্তি একটি ঢেঁকির প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মোট পনেরোটি বাক্য ব্যয় করেছেন। দ্র. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রথম পাকিস্তানি সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃ. ১২
১৭. *পদ্মানদীর মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
১৮. ঐ, পৃ. ৮

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *বর্ণমিছিল*, ঢাকা, ১৯৭৫]

মানিক-প্রতিভা

গোপাল হালদার

প্রায় ৩৬খানা উপন্যাস ও ১৭টি গল্প-সংকলনে মোট প্রায় ১৭৭টি ছোটগল্প রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩ ডিসেম্বর (১৯৫৬ ইং) চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ৪৬ (বা ৪৮) বৎসরের অকাল-নিমীলিত জীবনের ও ২৮ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনের সাক্ষ্য এই বিপুল দান। শোকাচ্ছন্ন বন্ধুদের পক্ষে এখনো তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এমন কি, তাঁর সকল লেখার সঙ্গে বহু পাঠক পরিচয়ও রাখতে পারেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থসমূহের সঠিক তালিকা সংকলন করতে গিয়ে গবেষণা-কুশল বন্ধুরাও বিপন্ন বোধ করেন। তাই তাঁর বিস্মৃতপ্রায় রচনাসমূহ বিলীয়মান স্মৃতিগুলিকে সযত্নে আহরণ করাও তাঁর বন্ধুদের ও সাহিত্যানুরাগীদের একটি গুরুতর দায়িত্ব। সে দায়িত্ব এখন পালন না করলেও পরবর্তীকালে তা আরও দুঃসাধ্য হবে। কারণ, বাংলাদেশে পাঠক-সাধারণের মনের সম্মুখে থেকেও এমন করে স্ব-সমাজের কৌতূহলদৃষ্টির অগোচর হয়ে যেতে বোধহয় আর কোনো সাহিত্যিক পারেননি। অথচ ৩ ডিসেম্বরের শোকযাত্রায় ও ৭ ডিসেম্বরের শোকসভায় যেভাবে সাহিত্যিক ও যুবক সমাজ স্বতঃউৎসারিত বেদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন তাতে স্পষ্টই বুঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা ও সৌহার্দ্য সামাজিক পুরস্কার ও অভিনন্দনের অপেক্ষা না রেখে বস্তুত গভীর ও নিবিড়ভাবে তাঁর দেশবাসীর ও সাহিত্যিক বন্ধুদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অবশ্য আত্মীয়তা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'টি পথ তাঁদের সম্মুখে এখনো উন্মুক্ত আছে— মানিক বন্দ্যোপাধায়ের পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য-পালন তাঁদের সামাজিক কর্তব্য; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার সহিত তাঁর স্বদেশবাসীর ও বিদেশীয়দের পরিচয়-সাধন তাঁদের সাহিত্যিক কর্তব্য। কারণ, সাহিত্যিকের অমর-সত্তা সাহিত্য-আলোচনার সূত্রেই অমরত্ব লাভ করে, শোকাভিভূত বন্ধুগণের পক্ষেও তা স্মরণীয়। শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের সহিত সমকালীন সাহিত্যিকগণ সে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হলে সেই সাহিত্যক কর্তব্যই পালন করবেন।

বহু শিথিল প্রয়োগ সত্ত্বেও 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। নৈসর্গিক সত্যের মতোই ক্বচিৎ তার আবির্ভাব এবং তর্কাতীত তার প্রকাশ। এ সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও অনেকেই জন্মেন না তবু 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশক্তিকে আর কিছু বলার উপায় নেই। তাঁর অশান্ত প্রাণশক্তি ও প্রাণঘাতী পরিণামের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হয়— এ শুধু প্রতিভা নয়, এ তাঁর প্রকৃতি। এই তাঁর নিয়তি। সেই সঙ্গে তাই এই কথাও মনে হয়— এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন ও প্রতিভার ধর্ম নয়।

ইউরোপীয় ভাষায় যে দুর্জয় শক্তিকে 'ডীমন' বলে অভিহিত করা হয়, আমরা তাকে কি নাম দিতে পারি জানি না। সর্ব নীতি-নিয়মের অতীত সেই মানসশক্তি যে,

নিজেই একমাত্র নিয়মের অতীত নয়। যাকে সে আশ্রয় করে তার দৈহিক মানসিক সমস্ত জীবনকেই সে কবলিত করে একমাত্র আপনার অমোঘ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নেয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা তাকে 'ডেভিল' বলতে পারেন; আর আমাদের অদৃষ্টবাদের দেশে বিমূঢ় হতাশায় আমরা তাকে 'নিয়তি'ও বলতে পারি। 'মেফিস্টোফিলিসে'র রূপকেও আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলতে পারে কবিকল্পনা, সেই ক্রূর নিষ্ঠুর শক্তি যাকে কবলিত করে দানবীয় ঐশ্বর্যের বিদ্যুচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হয় তার নানা রীতি। আর সেই বিদ্যুজ্জ্বালাতেই ঝল্‌সে যায় তার দেহ, তার মন, তার আত্মা। কিন্তু এ রূপকেও আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এ শক্তিকে 'প্রকৃতি'ও বলতে পারতাম, 'প্রবৃত্তি'ও বলতে পারতাম; কিন্তু 'প্রতিভা' বলেই এ ক্ষেত্রে আমরা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য। আর তার স্বরূপ বুঝলে বলতে পারি— এ হচ্ছে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'— বিদ্রোহেই যার আত্মপ্রকাশ, আর তাই আত্মনাশ যার আত্মপ্রকাশেরই প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ।

বাংলা-সাহিত্যে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'র সঙ্গে আমাদের আরও সাক্ষাৎকার না ঘটেছে তা নয়। আমরা মাইকেলকে জানি, নজরুলকে দেখেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁদের সগোত্র। আত্মরক্ষার বুদ্ধি এঁদের অশান্ত প্রতিভাকে আত্মবিকাশ থেকে বিরত করে এমন সাধ্যও কারো হয় না। অবশ্য একই গোত্রের হলেও এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, স্রষ্টা মাত্রই যেমন বিশিষ্ট। তা ছাড়া দেশকালের যোগাযোগ নানা রূপেই প্রত্যেকের পার্থক্য সুচিহ্নিত করে তোলে।

২.

প্রতিভার জন্ম-রহস্য আজও অজ্ঞাত, পিতৃমাতৃ-'পরিচয়ে' তার সূত্রসন্ধান করা বৃথা। ১৯০৮-এই হোক বা ১৯১০-এই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখনি জন্মে থাকুন, ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের বৈজ্ঞানিক মনীষাসম্পন্ন তাঁর অগ্রজদের কথা উল্লেখ করেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দান করা সম্ভব হয় না। বরং পদ্মাতীরে তাঁর পৈতৃক বাসভূমি ও পিতৃকর্মোপলক্ষে নানা অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর অচিরস্থায়ী পরিচয়— এই পরিবেশের স্থূল বা সূক্ষ্ম চিহ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত প্রাণ-শক্তিতে ও তাঁর অস্থির, নির্মায়িক শিল্প-চেতনার সন্ধান করা যেতে পারে। অবশ্য প্রতিভার-গতি-প্রকৃতিও শুধু পরিবেশের আক্ষরিক বিচার দ্বারা (এনভাইরন্‌মেন্টালিজম্‌-এর সূত্রে) বোঝা যায় না; প্রতিভারও নিজস্ব প্রকাশ-রীতি আছে। না হলে পদ্মাতীরের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথেরই মতো।

> 'হে পদ্মা আমার,
> তোমায় আমায় দেখা কত শতবার।'

বলে অপূর্ব রহস্যাবেশে কৃতার্থ হতে পারতেন; *পদ্মানদীর মাঝি* লিখবার কথা তাঁর মনেও উঠত না। কিংবা রাঢ়ের গ্রামে-প্রান্তরে আপনাকে তিনি তেমনি উদাস দৃষ্টিতে হারিয়ে ফেলতে পারতেন 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথে'। এরূপ অবকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘটেনি, তার প্রথম কারণ— তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের— রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতো সুসংসহত প্রতিভা নয়, সুষমায় যার অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত সাধনায় যা আপনাকে প্রকাশিত করবে। কাল ও দেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁরা আপন ব্যক্তিপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করতে করতে আপন ব্যক্তিস্বরূপকে আবিষ্কার করতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, এব নব-নব প্রকাশে নিজ শক্তিকে বিকশিত

করে তুলতে পারেন, তেমন সম্পূর্ণ ও আত্মগঠনসমর্থ প্রতিভা মানিকের ছিল না। তাঁর প্রতিভা— বিদ্রোহী প্রতিভা। বিদ্রোহই তাঁর মূল প্রকৃতি। তাই পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে একদিকে নব-নব স্পর্ধায় তা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে; অন্য দিকে সেই স্পর্ধার সূত্রেই আপনাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে, উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে। এই সুতীব্র প্রকাশ যেমন সেই প্রতিভার ধর্ম, এই প্রচণ্ড বিনাশও তেমনি সেই প্রতিভার ধর্ম। এ জন্যই মনে হয়, প্রকৃতিই বুঝি এর নিয়তি, 'ক্যারেকটার ইজ ডেস্টিনি'।

কিন্তু প্রতিভার গতিপ্রকৃতি বিচারে দ্বিতীয় সত্যটিও এরূপই স্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই প্রতিভার গতি-প্রকৃতি কতকাংশে নির্ধারিত হয়ে ওঠে, তাতে ভুল নেই! এজন্যই মাইকেল বা নজরুলের সঙ্গে একদিকে সগোত্র হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র — মাইকেল উনবিংশ শতকের জাগরণের যুগে যে আশা উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাতে তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা বিপ্লবী প্রতিভায় উন্নীত হতে পেরেছিল। আমাদের কলোনিয়াল জীবনের সংকীর্ণতায় ও গ্লানিতে তা অতি অল্পকালের মধ্যেই আপনার ঐশ্বর্য খুইয়ে ফেলে; তারপর থেকে মাইকেল নিষ্প্রভ। শুধু 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' বলে সেই বিরাট প্রতিভা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। নজরুলও বিংশ শতকের মানবমুক্তির একটা মহালগ্নকে আশ্রয় করে একবারের মতো এমনি বিপ্লবী চেতনায় আপন বিদ্রোহী প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাল-সংঘাতে তা সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহী কবির আত্মদ্রোহী রূপই ক্রমে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

যুগ-সংকটের যেই তীব্রতর লগ্নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তখন তার সাময়িকভাবেও এরূপ মহৎ আশায় প্রবুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিংশ শতকের ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কালটি বিশ্বসংকটেরও একটি তমিস্রা-ঘন পর্ব। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের— সোভিয়েত সাম্যবাদ 'এক নূতন সভ্যতা?'— এ প্রশ্ন অবশ্য উদিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী তখন আর্থিক সংকট, ফ্যাসিস্ত-দানবতার তখন দাপট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশে ও সাহিত্যেও তখন পর্বটা শুধু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর্ব নয়। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বের অশ্রদ্ধাকে (সিনিসিজম্) বাঙালি নাকিসুরে ও বর্ণচোরা ভাবালুতায় ঢালাই করছিলেন অতি-আধুনিক সাহিত্যিকরা— নকল হলেও এটা একটা পর্ব-লক্ষণ। কারণ, প্রতিবাদের সুর সার্থকভাবে তুলেছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ লেখকগোষ্ঠী। কৃতী তরুণ লেখকেরা অনেকেই সন্ধান করছিলেন কৃতিত্বের পথ, কিন্তু যুগের নিজস্ব রূপ বা নিজেদের বাণীরূপ তখনো তাঁদের চেতনায় প্রতিভাত হয়নি। বরং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই আপনার নবীন বিকাশে তরুণদের সেই অসংবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রয়াসকে লজ্জা দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল কাব্যে, উপন্যাসে। অন্য দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্রষ্টা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ ও বিস্ময়রসের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুরকে যেন মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু যে বিক্ষোভ শতাব্দীর নাড়িতে নাড়িতে জমেছে— দেশের পাঁজরে পাঁজরে যার দাগ পড়ছে— তা এভাবে মিথ্যা হয়ে যায় না একথা বলাই বাহুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এই সত্যকে ঘোষণা করে— রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সুষমাবাদে আর তার কুলোয় না। অতি-আধুনিকের প্রতিবাদ এবার নাস্তিকের বিদ্রোহে রূপায়িত হল। আর মানিকের বিদ্রোহী প্রতিভা যুগের সেই সঞ্চিত বিক্ষোভকে যে রূপদান করলে তা বাংলা সাহিত্যে তার পূর্বে

বা পরে এখন পর্যন্ত আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রতিভার অধিকারী আর কেউ সে যুগ-ব্যাধিকে এমন করে অনুভব করতে পারেননি।

কিন্তু এইটিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কথা নয়। সভ্যতার সেই শব-ব্যবচ্ছেদ-সূত্রেই এই সত্যেরও আভাস পান লেখক— শবটাই সব নয়। শব শুধু জীবন-হীন দেহ। আর জীবন একটা পরমাশ্চর্য সত্য— তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা তাকে মানতে না চাইলেও সে সত্যই থাকবে। এইখান থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনার দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা। বিদ্রোহী প্রতিভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানবতায় বিশ্বাসী লেখকের। জীবন ও মানবতায় বিশ্বাস নিয়ে ১৯৪৩-এর প্রারম্ভ থেকে তিনি চাইলেন নবজীবনবাদের ভিত্তিমূলক রচনা করতে। তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভাকে চাইলেন বিপ্লবী প্রতিভায় রূপান্তরিত করতে। যাঁরা মানিক-প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁরাই বুঝবেন এ কত বড়, বিরাট ও দুর্জয় সাধনা। তাঁর প্রতিভারই একাংশের সঙ্গে তাঁর আত্মার এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সংগ্রাম। আর তাঁরাই সশ্রদ্ধ হৃদয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শেষ পর্বের সাধনাকে অভিনন্দিত করবেন— মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছবার প্রয়াস জীবনেরই মূল বাণী।

৩.

১৯২৮ সনের যে দিনটিতে ঘটনাক্রমে 'অতসী মামী' গল্পটি লিখিত হয় এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের সে গল্প ('বিচিত্রা', ১৯৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়, সেদিন থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার প্রকাশপথও আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। এমন সত্য কথা আর নেই— পরবর্তী আটাশ বছরে "অন্য কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই।" তাঁর প্রতিভা তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি, জীবনের শত আবর্তে তাঁকে বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত করেও আবেশে সাহিত্যের সৃষ্টি-স্রোতেই একূলে-ওকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম গল্প *অতসী মামী* ও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননীতে* (১৯৩৫ মার্চ) বাংলা কথা-সাহিত্যের পরিচিত পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রতিভা প্রায় তখনই তার নিজস্ব খাত আবিষ্কার করে ফেলেছে। *অতসী মামী* নামক প্রথম গল্প সংগ্রহও এ সময়েই (১৯৩৫, আগস্ট) প্রকাশিত হয়। তাঁর দশটি গল্পের মধ্যে আছে 'সর্পিল', 'আত্মহত্যার অধিকার' প্রভৃতি মানিক প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষরসম্বলিত গল্প। কিন্তু তারও পূর্বে তাঁর *দিবারাত্রির কাব্যের* প্রাথমিক পরিকল্পনা ও আদিলিখন (১৯২৯? ১৯৩১?) শেষ হয়েছে। 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প (বঙ্গশ্রী ১৩৪০ বাং) রচিত হয়েছে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নিবার্য প্রতিভা (বাং ১৩৪১ এ বঙ্গশ্রীতে) ভাঙাগড়ার সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্থির মনকে ভেঙে গড়ে যে কী রূপ দান করতে চলেছে, তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ১৯৩৫ (ডিসেম্বর) সনেই *দিবারাত্রির কাব্যও* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকাররূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তাই এই বছরেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যেই তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছে। তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে বাংলা সাহিত্যে অভিনব সে বিষয়ে ১৯৩৫-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনেও সংশয় নেই। *অতসী মামী* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন, *অতসী মামী* আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।" *দিবারাত্রির কাব্যের* নিবেদনাংশ আরও উল্লেখযোগ্য— *দিবারাত্রির কাব্য* পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া,

অস্বাভাবিক (তা না মনে হয়ে পারে না— লেখক) — তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপকাহিনী। কিন্তু লেখক এ কথায়ও সুস্থির বোধ করেন না, কারণ এক অর্থে সমস্ত উপন্যাসই তো রূপক হতে পারে না। রূপকের সাধারণকৃত রীতিতে মানবসত্যকে ঢেলে সাজালে 'চরিত্র' তার বৈশিষ্ট্য হারায়। লেখক তাই 'রূপক-কাহিনী' বলেই আবার বলেছেন, রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেগুলোকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection— মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।"

দিবারাত্রির কাব্যই মানিক-প্রতিভার প্রথম ও বিশিষ্ট নিদর্শন। তাই এ কাব্যের এই নিবেদনাংশটুকুকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিশ্লেষণে দেখতে পাই— প্রথমত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে তাঁর রচনার গোষ্ঠীবিচারে কত অসমর্থ। এ কাহিনীর জন্ম ও বিকাশ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস (শ্রীসজনীকান্ত দাসের *আত্মস্মৃতি* ২য় খণ্ডে তা লিখিত হয়েছে) জানলে বেশ বোঝা যায়— মানিকের প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে কিভাবে এ কাহিনীর কথা-অংশ গড়ে তুলেছে। কিভাবে তার রূপ-রীতি নির্ণীত করে ফেলেছে। মানিকের শিল্পীসত্তা আত্মসচেতন না হয়ে আত্মনিবেদনেই দুর্জয় শক্তির অধিকারী।— মানিক-সাহিত্যের বিচারকালে এই মূল সত্যটি পরীক্ষা করার মতো কারণ বারবার জুটবে।

দ্বিতীয়ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পরীতির সুপরিচিত বাস্তব পদ্ধতি নয়— মানুষকে, বিশিষ্ট মানুষকে, আশ্রয় করে তিনি চরিত্র-সৃষ্টিতে অগ্রসর হননি, বরং অনুভূতিকেই আশ্রয় করে— অমূর্ত ধারণাকে গ্রহণ করে— তাকেই মানব-চরিত্ররূপে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection। সাবজেক্ট বা বিষয় থেকে তিনি বিষয়ীকে চিনতে চান। ভাব থেকে যান রূপে।

তৃতীয়ত, এই সাধারণীকৃত সূত্র বা ভাব-উপাদানকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। তিনি গ্রহণ করেছেন "মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ"— সম্পূর্ণ ভাব-জীবনও নয়, ভাব-জীবনের একটা খণ্ডাংশ।

কোনো লেখকের প্রথম প্রকাশিত কোনো এক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে এত বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিশ্চয়ই অসমীচীন। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানিক-প্রতিভার স্বরূপ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই এর গুরুত্ব। মানিক-প্রতিভার দু'একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করছি। পৃথিবীর সাহিত্যে এগুলির স্থান স্বীকার করতেই হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) অন্যতম। মানিকের নাস্তিক্য-প্রতিভারও তা একটা বিশিষ্ট প্রমাণ। কথা-বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গল্প একটা বীভৎস রোমান্টিক কাহিনী। একে বাস্তব বলা অসাধ্য। আর ভাববস্তুর দিক থেকে এর বক্তব্য পরিস্ফুট গল্পের উপসংহারে— পাঁচীকে পিঠে লইয়া ভিখু যেখানে জোরে জোরে পথ চলিতেছে :

"দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।"

"হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকারে মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহার সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।"

বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে এই মন্তব্য অচল। মানব-প্রকৃতি যে অর্থে অপরিবর্তনীয়, সে অর্থটি অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ শুধু প্রাগৈতিহাসিক ক্রূরতার জালে আবদ্ধ পশু নয়, একথা আমরা সকলেই জানি। মানবতা বলতে আমরা আজ যা বলি তাও তার ধর্ম এবং সে ধর্মই দিনে দিনে নব বোধে নবায়মান। তাই মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক প্রমাণ করবার জন্য প্রথমত অনুভূতির কয়েকটা খণ্ডকেই লেখক পাঁচী ভিখু প্রভৃতি রূপে দাঁড় করিয়েছেন— অদ্ভুত প্রতিভার সেই রোমান্টিক আখ্যানে সত্যাভাস সংযোগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি খণ্ড সত্যকে— এমন কি, অপ্রধান সত্যকে— সমগ্র সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এ গল্পের অনস্বীকার্য-সার্থকতা এই যে, প্রতিভা এমন নিঃসংশয়ে এই খণ্ড সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে যে, শত সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারব না যে, এ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা আমাদেরও গহন মনের কোনো গহ্বরে লুক্কায়িত নেই। অর্থাৎ যে অংশটি আমাদের সচেতন মনের অগোচরে, সে অংশটি আমাদের চেতনালোকে অনুভূত হয়ে উঠল।

ঠিক এ কথাই বলা চলে তাঁর আরও ভয়ঙ্কর গল্প 'সরীসৃপ' সম্বন্ধে। তার অনায়াস বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যে যে শিল্পকুশলতা মিশিয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে দুর্ভার পীড়নে যেখানে হেমলতার প্রশ্নে— 'হা রে ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?'— বনমালী বলে, 'আপদ গেছে, যাক।'

এর পরে হয়তো মন্তব্য শিল্প-নিয়মে দোষাবহ— যদি না সে মন্তব্য হয় এমন নির্মম :

"ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।"

নাস্তিক্য-প্রতিভার এমন উক্তি আর ক্বচিৎ দেখা যায়। কিন্তু কে না জানে এ উক্তি অর্ধ-সত্যও নয়, বারো আনা মিথ্যার সঙ্গে বড়জোর চার আনা সত্যের ভেজাল? অথচ সমস্ত গল্পটি যে চতুরতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, নিরাসক্ত শিল্প-দৃষ্টিতে তার হিংস্রতা ও ক্লেদাক্ত পর্যায়ে একের পর এক উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে সভ্যতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রূপ-শাণিত বক্রোক্তি মোটেই অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মানবতাও মিথ্যা নয়, মানুষের সভ্যতাও যে মানুষকে সুস্থরতর জীবন-বোধেই জাগ্রত করছে তাতেও সন্দেহের কারণ নেই। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ক্ষয়ও একমাত্র সত্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম তাতে আছে। সমগ্র মানুষকে গ্রহণ না করে মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশকে গ্রহণ করলে মিথ্যাই এরূপে সত্য হয়ে উঠতে চায়। গল্পটি তথাপি এক অমোঘ সৃষ্টি— প্রতিভাই এই অমোঘতা দিয়েছে।

এ-তুলনায় *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ও *পদ্মানদীর মাঝিতে* (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'নাস্তিক্য-প্রতিভা' অনেকটা সুশৃঙ্খল। পদ্মাপারের যে কোনো লোক জানেন— পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনযাত্রার দিক থেকে সে উপন্যাসের চিত্র

অনেকাংশেই অযথার্থ, বিশেষত হোসেন মিঞার কলোনি-গড়ার আকাঙ্ক্ষা যেন অবিশ্বাস্য একটা রোমান্টিক রচনা কথা। কিন্তু উপন্যাসের এই দীর্ঘতর আয়তনে এক-একটু করে মানসিক অংশ নিয়ে কাহিনী রচনা করা চলে না। তাই এ কাহিনীতে অসঙ্গতি ও গঠন-দোষ থাকলেও একটা সমগ্রতা আছে। আর, তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি ও সরসতা কাহিনীকে স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। প্রতিভা এখানে মানুষকে অনেকটা পথ ছেড়ে দিয়ে আপনার সার্থকতা আরও সুনিশ্চিত করে তুলতে পেরেছে।

পুতুলনাচের ইতিকথায় ও এক পরিমিত রঙ্গবোধ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ-বোধে পরিণত হয়নি। মানুষ সেখানে শয়তানের খেলার উপাদান ততটা নয় যতটা সে কামনা-বাসনার খেলার পুতুল। সেই পুতুলের জন্য বিদ্রূপেও লেখকের একটা ক্ষীণ অনুকম্পা আছে— হায় রে পুতুল! আর পুতুলই হোক, আর যাই হোক, উদ্ভট, অদ্ভুত, উচ্ছৃঙ্খল, সাধারণ, অসাধারণ সকল খেলার মধ্যে দিয়ে তারা প্রত্যেকেই যে মানুষ এই সত্যটা অস্বীকার করবার মতো আক্রোশ তখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে পেয়ে বসেনি। কিন্তু ক্রমেই তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়ে বসে। 'টিকটিকি' (*মিহি ও মোটা কাহিনী*, ১৯৩৮) প্রভৃতি ছোটগল্পে তা ক্রমেই শ্বাসরোধী একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলে, *চতুষ্কোণের* (১৯৩৮) মতো উপন্যাসে পর্যন্ত সেই যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃত বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তার পূর্বেই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চাপা অন্ধকার থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মোদ্ধারের পথ সন্ধান করেছিলেন। যে পথ তিনি বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করেন মার্কস্‌বাদের আলোকে, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা সে পথকে মানতে প্রস্তুত ছিল না— এবং শেষ পর্যন্তও এই প্রতিভা সে পথে তাঁকে স্বচ্ছন্দ পদে চলতে সহায়তা করেনি। 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) প্রভৃতি গল্পের সময় থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নূতন পথের সন্ধান সূচিত আরম্ভ হয়। 'সমুদ্রের স্বাদ' দুঃখবাদে করুণ হলেও জীবন-সম্বন্ধে নৈরাশ্যেরই দ্যোতক। 'বৌ' (১৯৪৩) ও 'ভেজালে'র (১৯৪৪) অধিকাংশ গল্পও সেই জীবন-বিরূপ প্রতিভারই সৃষ্টি। 'দর্পণে সেই নব প্রয়াস ও বিরূপ-চেতনার বাঁকা-চোরা প্রতিলিপিই পড়েছে।' এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়ে নিষ্ক্রান্ত হবেন, এমন সম্ভাবনা হয়তো ছিল না। কারণ তাঁর প্রতিভা এই নূতন ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে না।

তথাপি তাঁর শক্তির স্বাক্ষর, অদ্ভুত শিল্প-কুশলতা নানা গ্রন্থেই দেখা গিয়েছে। এক-একবার মনে হয়েছে হয়তো প্রতিভাকে তিনি এবার কবলিত করতে পারলেন— যেমন, কোথাও কোথাও *আজ-কাল-পরশুর গল্পে* (১৯৪৬), *পরিস্থিতিতে* (১৯৪৬) *চিহ্ন* উপন্যাসে (১৯৪৭) *ছোট বকুলপুরের যাত্রীতে* (১৯৪৯) *সোনার চেয়ে দামীর* প্রথম ভাগে (১৯৫১) এবং এরূপ আরও অনেক লেখায়। কিন্তু তাঁর ক্ষয়িষ্ণু দেহ ও ক্ষীয়মান প্রাণ সমস্ত সম্ভাবনা ও সংগ্রাম সমাপ্ত করে অবশেষে অকালেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

৪.

এক জন্ম থেকে আর-এক জন্মে পৌঁছানো— এই জীবনের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘটানো— মানিক-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হল না কেন তা আমরা দেখেছি। হয়তো তা সম্ভব হত যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো পথে এই জন্মান্তর কামনা করতেন। যে গভীর বক্রদৃষ্টিতে তিনি সভ্যতা ও মানবতাকে অন্তঃসারহীন বলে চিনেছিলেন তা থেকে মুক্ত না হয়েও কোনো কোনো শিল্পী নিষ্কৃতি পান— দেবতার নামে আত্মনিবেদন করে, পাপোহম্‌ পাপসম্ভবোহম্‌ বলে খ্রীষ্টীয় পাপানুভূতি ও ভগবদানুভূতিতে।

স্টেডয়ভ্স্কির মতো, বা আধুনিক ইউরোপীয় ক্যাথলিক-বিশ্বাসবাদী গ্রেহাম গ্রিন প্রভৃতি শিল্পীর মতো একটা পথ গ্রহণ করলে— মানুষকে অস্বীকার করে, জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেও একটা ভাবালোকে আশ্রয় রচনা করা যায়। সেরূপ আশ্রয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী প্রতিভাকেও পরিত্যাগ করত না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরূপ আশ্রয় না চেয়ে চাইলেন পৃথিবীকে, জীবনকে, মানুষকে— যে সবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিভার বিদ্রোহ, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগে তাঁর প্রতিভা পরিপুষ্ট। দেবতার বা পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস অনেক সহজ, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস, সভ্যতায় বিশ্বাস অনেক দুশ্চর সাধনা-সাপেক্ষ। এ সাধনাকে গ্রহণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মানবীয় সততার প্রমাণ ও শিল্পী-সত্তার এক মহৎ ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন— যারা সাহিত্যে বিশ্বাসী, মানবতায় বিশ্বাসী তাদের জন্য রেখে গিয়েছেন পরাহত মানবাত্মা ও মানুষের এই জয়স্তম্ভ।

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন

চিন্মোহন সেহানবিশ

১৯৪০ সাল। ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের চেষ্টা কতক গুরুতর, কিইবা তার তাৎপর্য, এই নিয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষ বিষম দোটানায় পড়েছেন। কিছুদিন আগেও প্রগতি লেখক মহলে যথেষ্ট আনাগোনা ছিল, এমন একজন নামজাদা গল্প লেখকের তখন সবেমাত্র গোত্রান্তর ঘটেছে। তিনি ঐ সময়ে কমিউনিস্ট-মেধ যজ্ঞে তিলাঞ্জলি অর্পণ শুরু করলেন একটি ছোটগল্প ফেঁদে। গল্পটির নাম বা কোন পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ আর তার মনে নেই। শুধু মনে পড়ে যে কমিউনিস্টদের ধনতন্ত্রবিরোধ যে আসলে মেকি তা প্রমাণ করার জন্য ঐ গল্পে আমদানি হয়েছিল এক বিদঘুটে ধনিক কমিউনিস্ট চরিত্রের।

আমাদের মতো ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ পৃথিবীব্যাপী তোলপাড়ের মুহূর্তে সব দেশেরই কিছু কিছু দুর্বল হৃদয় যে টলবে আর ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে সস্তা কমিউনিজম–বিরোধিতার স্রোতে গা ভাসাবে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

আশ্চর্য হলাম যখন এর কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ নজরে পড়ল একটি গল্প, যার চরিত্রগুলি, মায় তাদের নাম পর্যন্ত ঐ আগের গল্পের সঙ্গে হুবহু এক অথচ যার তীব্র শ্লেষের শিকার হল কমিউনিজম নয়, কমিউনিজম-বিদ্বেষ। গল্পটির নাম 'হ্যাংলা' যদিও কোথায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ তা বেমালুম ভুলে গেছি। এতে একই নামের চরিত্র মারফত লেখক শুধু কমিউনিজম ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের মৌলিক দ্বন্দ্বের কথাই নয়, অত্যন্ত নিপুণভাবে এও দেখিয়েছিলেন যে গোত্রান্তরিত লেখক কমিউনিজমকে হেয় করার উদ্দেশ্যে 'ধনিক কমিউনিস্টের' বিরুদ্ধে যে সব গোলাবাজি করেছেন আসলে তা অম্লরসে পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাফলের মতই নিছক হ্যাংলামি।

আরো বিস্ময়কর ঠেকল দেখলাম এ গল্পের লেখক স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *প্রাগৈতিহাসিক*-এর গল্পের আমরা তখন অনুরাগী পাঠক। তবু তাঁর মতো জটিল ও সূক্ষ্ম মানবমনের কারবারি যে আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র ধারে–কাছে আসতে পারেন এমন 'অঘটনের' প্রত্যাশা আমি অন্তত করিনি। কারণ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের বিপর্যয়কর তাৎপর্য সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের চোখেই ফ্যাসিজমের মতোই ফ্যাসিজমবিরোধিতা ছিল নিছক রাজনীতি আর তাই আমাদের 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'ও একান্তভাবেই 'রাজনীতি ঘেঁষা', অতএব পরিত্যজ্য।

স্বভাবতই আমরা তাই উৎসুক হয়ে উঠলাম মানিকবাবুর গল্প পড়ে। এমন সময়ে আমাদের ঔৎসুক্যে ইন্ধন জোগাবার জন্যই যেন প্রকাশিত হল মানিকবাবুর আর একটি

ছোটগল্প— 'প্রতিবিম্ব'। এতে তিনি কয়েকটি কমিউনিস্ট চরিত্রের অবতারণা করেন। আমাদের সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল এ গল্পের ছত্রে ছত্রে। তবু এতে প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রগতি সম্পর্কে তাঁর এতদিনকার আধানৈরাজ্যবাদী ধারণার জেরও তাই অধিকাংশ চরিত্রই আমাদের কাছে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ হয়েছিল। সব মিলিয়ে গল্পটি উতরোয়নি মোটেই।

তবু এ গল্পের সূত্র ধরেই মানিকবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম প্রতিবিম্ব সম্পর্কে আমাদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড় লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে : 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চান তো? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমতো চিনবো দেখবেন তখন গল্প উতরোয় কি উতরোয় না!'

এক মুহূর্তে আমরা মানিকবাবুর নাগাল পেয়ে গেলাম। কারণ তাঁর কথায় সেদিন সহজ আত্মাভিমানশূন্যতার পাশাপাশি যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সুর বেজে উঠল আমাদের বুঝতে এতটুকু দেরি হল না যে সেই সুরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে 'কেন লিখি' নামে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ পনরোজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জবানবন্দী হিসাবে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার মধ্যেকার মানিকবাবুর রচনাটি 'পরিচয়ে'র এই সংখ্যাতেই আবার প্রকাশিত হচ্ছে। তাতেও তিনি লিখেছেন :

'কলমপেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপসোস জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হব।'

এ হেন মানুষের প্রতি আত্মীয়তাবোধ সহজেই গভীর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল— মানিকবাবু একেবারে দলিল হয়ে গেছেন। এর জবাব দিয়েছিলেন মানিকবাবুই ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়' :

"....দুটো দল হয়ে গেচে, উপায় কি? ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।"

অর্থাৎ অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা নয়, দ্বিধাহীন সাফ জবাব।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে যখন আমাদের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (এখানেই সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমাদের সংঘেরও নামকরণ হল 'প্রগতি লেখক সংঘ')। তখন মানিকবাবু সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এর পর থেকে সংঘ যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিনই মানিকবাবু তার নায়কতা করেছেন। সে নায়কতা শুধু সম্মেলনের ভাষণ বা আনুষ্ঠানিক কাজকর্মেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের সংঘের ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটস্থ দপ্তরের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে, বয়স বা সাহিত্যিক গুণাগুণ নির্বিশেষে সংঘের কর্মীদের সঙ্গে প্রাণখোলা

সকৌতুক আলাপে, 'পরিচয়ের' শুক্রবাসরীয় বৈঠকে— সর্বত্রই তা সমানভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত।

সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সদ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সদ্যরচিত গান গাইতেন। এইখানেই বিজন ভট্টাচার্য পরের পর তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মতো করে পড়ে শোনান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গেয়ে শোনান তাঁর 'নবজীবনের গান' ও 'মিছিলের গান'। সুকান্ত আবৃত্তি করেন 'রাণার', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ও 'ফসলের ডাক'। তুলসী লাহিড়ী ও শম্ভু মিত্র পাঠ করেন তাঁদের 'দুঃখীর ইমান' ও উলুখাগড়া'র প্রাথমিক পাঠ, গোলাম কুদ্দুস শোনান তাঁর 'হিসাব-নিকাশ' এবং সুলেখা সান্যাল উপস্থিত করেন তাঁর প্রথম গল্প লেখার প্রয়াস। এই বুধবার বৈঠকেই 'পরিচয়'-এর বর্তমান সম্পাদক ননী ভৌমিক আসর মাত করেন একটি ছোট গল্প শুনিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কোনো সদ্যরচিত কবিতা এখানে পড়েছিলেন কি না মনে নেই, তবে তাঁর 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' আমরা তখন গেয়ে বেড়াতাম পথেঘাটে, সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে— সর্বত্রই।

মানিকবাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সদ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সেসব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত। মন্বন্তরের সময়কার দু-একটি গল্প ছাড়া 'পেটব্যথা'র মতো নির্মম অত্যাচারের কাহিনীও তিনি এইখানেই শোনান। সব থেকে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি পড়ার স্মৃতি। সময় সম্ভবত ১৯৪৬ সালের শেষ অথবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক। দাঙ্গার দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা। গোলাম কুদ্দুসের মতো সাহিত্যিক সংবাদদাতারা জেলায় জেলায় সফর করে আন্দোলনের জ্বলন্ত ছবি আঁকছিলেন 'স্বাধীনতা'র পাতায়। এমন সময়ে এল মানিকবাবুর 'হারানের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া শেষ করলেন তখন আমি ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারালো হাতিয়ার হতে পারে সংগ্রামের। কিষানী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই কিন্তু তার গোঁয়ার জামাইও কি ফেলবার? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

বুধবারের বৈঠকগুলিতে রচনা-পাঠের পর বেশ দিলখোলা আলোচনার রেওয়াজ ছিল। সে আলোচনায় শুধু মানিকবাবুর মতো নামজাদারাই যোগ দিতেন না, আনকোরারাও নির্ভয়ে গুরুগম্ভীর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না, এমন কি মানিকবাবুর গল্পের ভালোমন্দ নিয়েও। হয়তো বা অনেক কাঁচা কথাই বলা হত সেখানে। তবু একমুখ হাসি নিয়ে মানিকবাবু বসে বসে শুনতেন আলোচনা, থেকে থেকে জোরালো সমর্থন বা প্রবল প্রতিবাদ করতেন কোনো মন্তব্যের, মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেতে উঠতেন প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনায়। কিন্তু কখনও তাঁকে অধৈর্য হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

উত্তেজনার কথা বলতে মনে এল নৌবিদ্রোহের, রসিদ আলি দিবস বা ২৯ জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এসব দিনে মানিকবাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্রমনে চলেছেন, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে,

কখনও সংঘ অফিসে অথবা কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর। আর এইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে কখনও রূপ পেয়েছে 'চিহ্নের', কখনও জ্বলন্ত বিবৃতির ১৩৫৫ সনের মাঘ মাসের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত ছাত্র-মিছিলের উপরে পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদ 'মানবতার বিচার' দ্রষ্টব্য) কখনও বা বড়ো উপন্যাসের উপাদানের।

১৯৪৭ সালে পূজোর আগে প্রগতি লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে একযোগে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গাবিরোধী মিছিলের ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর কাছে সেদিন বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন নবজীবনের বাণী নিয়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিশেষ করে যে-সব অঞ্চলে দাঙ্গার আশঙ্কা বেশি সেইসব এলাকায় সেদিন মানিকবাবু, তারাশংকরবাবু, গোপালবাবু, জ্যোতির্ময় রায় প্রভৃতি সাহিত্যকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন শান্তির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা— সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ গেয়েছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। কলকাতাবাসীর সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে মানিকবাবুর যোগ বহুদিনের। সুধীন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনও 'পরিচয়ে' মানিকবাবুর 'অহিংসা' উপন্যাস ও একাধিক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। আর হাল আমলে তো তিনি এর পরিচালকবর্গের অন্যতমই ছিলেন। প্রত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডারও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী পাণ্ডা। বেশ কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়াও এই সময়ে তাঁর '*জীবন্ত*' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়ের' পাতায়। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে আমরা তখন সবেমাত্র 'পরিচয়'-পরিচালনার ভার পেয়েছি। ফি মাসেই তখন পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটত। কারণ ঐ মানিকবাবুর *জীয়ন্ত*। বাংলাদেশের পত্রিকা-পরিচালকমাত্রই বোধ কী দুরূহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই তিনি ঘোষণা করতেন— 'কাল নিশ্চয় দেব'- তারপর কিছুতেই পেরে উঠতেন না কথা রাখতে। আমাদের তাগাদার পেয়াদা তাঁর কাছ থেকে বারতিনেক ঘুরে আসার পর আমি মরিয়া হয়ে একবার মানিকবাবুকে এই মর্মে চিঠি লিখি : *জীয়ন্তের* এবারকার দফার কপি কাল বেলা বারোটার মধ্যে যদি আপনি প্রেসে পৌঁছে না দেন তা হলে আমি নিজেই সেটা লিখে দিতে বাধ্য হব। তাতে হয়তো দেখতে পাবেন আপনার নায়ককে বাঘে খেয়েছে, নায়িকা পাগলিনী হয়েছেন, উপনায়ক-উপনায়িকারা আত্মহত্যা বা ঐরকম কিছু একটা কাণ্ড করে বসেছেন। মোট কথা, এমন একটা অঘটন আমি ঘটাব যার রসাতল থেকে স্বয়ং তলস্তয়, বালজাক বা গোর্কিও উপন্যাসকে পুনরুদ্ধারের কোনো পথই পাবেন না। বলা বাহুল্য, আগের সংখ্যাগুলির মতোই এবারেও ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনারই নাম থাকবে শিরোনামায়- কাজেই ঝুটো মানিক ধরা পড়বে না নাম থেকে। শেষবারের মতো আপনাকে বিবেচনা করতে বলি ব্যাপারটা সত্যই কি ভালো হবে?

পরদিন বেলা বারোটার মধ্যে সাচ্চা মানিকেরই 'কপি' পাওয়া গিয়েছিল আর তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি— 'আচ্ছা জব্দ করলেন মশাই!'

অবশ্য এমনটা সম্ভব হয়েছিল মানিকবাবু 'মানিকবাবু' ছিলেন বলেই। ১৯৪৮ সালে আমাদের উপরে নামল সরকারি দমননীতির খাঁড়া। গোপাল হালদার, সুভাষ

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন। সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মানিকবাবুর সভাপতিত্বে। দমননীতির প্রকোপে আমাদেরও তখন সুর খুব চড়া। সেই উত্তেজনার আবহাওয়ায় আমি সম্মেলনের সামনে 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামে একটি প্রবন্ধ দাখিল করি। তাতে যথেষ্ট বেপরোয়া ঢালাও কথাবার্তা ছিল এই ধরনের : "শিল্পী বা সাহিত্যিকের উচিত ট্রেড ইউনিয়নিস্ট বা কিষাণ সমিতির কর্মী হিসাবে মজুর বা কিষানের মধ্যে কাজে নামা। তার ফলে যদি লেখা বা শিল্প সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েও যায় তাতে ক্ষতি নেই। যে অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করবেন তার ফলে ভবিষ্যতে নতুন শক্তিশালী শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠবেই।"

মনে আছে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সেদিন মানিকবাবু আমায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই প্রবন্ধের সুরেই বাঁধতে হবে আমাদের ঘোষণাকে। তবু আমার মনে হয় সেদিনও হয়তো আমরা তাঁকে শুধু হৃদয়াবেগের তোড়েই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম— আসলে তাঁর শিল্পী-মন কখনও সায় দেয়নি আমার বেপরোয়াপনায়। তাই তিনি সাহিত্যিকের স্বধর্ম, 'কলমপেষার পেশা' ছাড়েন নি একদিনের জন্যও। দু'বছর পরে জেলখানায় বসে 'পরিচয়ে'র পাতায় পড়লাম তাঁর *বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা*। তাতে তিনি আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করে তার যুক্তিগুলিকে খান করেছিলেন একে একে।

মনে পড়ে জেলে যাবার কিছুদিন আগে একদিন মানিকবাবুকে পীড়া-পীড়ি করেছিলাম পুলিশি সন্ত্রাস-জর্জরিত বড়া-কমলাপুরে যাবার জন্যে- কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম, 'লেখক হিসেবে না হয় নাই গেলেন, কমিউনিস্ট হিসাবেই যান।' সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছিল এ আশ্চর্য গল্পটিতে। মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।

আরও প্রায় দেড় বছর পরে একদিন বক্সা ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে হাতে এল 'পরিচয়'। তাতে পড়লাম মানিকবাবু লিখেছেন :

"সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, *চিন্মোহন* সেহানবিশ, পারভেজ শাহীদী, সুনীল বসু, দ্বিজেন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখক, কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদেরও *বক্সায়* পাঠানো হয়েছে। ...শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প কবিতা-প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই— গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক শ্রোতা দর্শক পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই। সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র প্রয়োগযোগ্য আইন। শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদেরা সম্পূর্ণরূপে গণমত ও গণবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই এবং শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতিবিদদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর— তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?"

কৃতজ্ঞতা মন ভরে এল আমাদের। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখলাম অসম্ভব সে চেষ্টা— ছেলে মানুষের মতো অধীর আগ্রহ নিয়ে মানিকবাবু আমাদের জেলখানার গল্প শুনতেই ব্যস্ত।

জেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপরাধে ইতিমধ্যে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকবাবুর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন কি সাময়িকী পত্রিকার পূজাসংখ্যাগুলি পর্যন্ত অপরিসীম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বেশ নিয়মিতভাবেই লেখা চাইতে ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভাষার এই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কাছ থেকে। অন্যদিকে আমরাও এদিক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারলাম না তেমন করে। সে দায় আমাদেরই।

দিনের পর দিন এই কোণঠাসা, দম-আটকানো অবস্থা চলতে লাগল একটানা। অতীতের রাহু আবার তাঁকে গ্রাস করল এরই সুযোগে।

হয়তো একেবারে শেষের দিকে অবস্থান্তর ঘটেছিল কিছুটা। প্রকাশক ও পত্রপত্রিকার রুদ্ধ দরজা আবার কিছুটা খুলেছিল ধীরে ধীরে। সমাজের জ্ঞানী-গুণী-মানী ব্যক্তিরা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হাত। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

তবু মানিকবাবুর মৃত্যু আজ আমাদের সকলকেই মিলিয়েছে এটাই মস্ত সান্ত্বনা।

পুলিশের গুলিতে মরণাহত 'চিহ্নের' সেই ছাত্রটির কথা কেন জানি মনে হচ্ছে— মিছিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে যে ক্রমাগত বলছিল : 'ওরা এগোচ্ছে না কেন? ওরা কি আর এগোবে না?"

'পরিচয়' ॥ পৌষ, ১৩৫৩
[উৎস : মানিক বিচিত্রা]

নেয়ারের খাট, মেহ্‌গিনি-পালঙ্ক এবং একটি দুটি সন্ধ্যা

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বর, ২। ১৯৫৬

খাট থেকে ধরাধরি করে যখন নামানো হল, তখন দুটি চোখই খোলা। কপালের ওপর আর কানের পাশে কয়েকটা শিরা কুঁচকে উঠেছে। ডান হাতটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে একবার নাড়লেন। চাউনিতেই তীব্র প্রতিবাদ ছিল। গলায় অস্ফুট শব্দ, যার কোনো ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে।

ডাক্তারিশাস্ত্র আমি জানি না, মনোবিজ্ঞানেও পারদর্শী নই। তবু খাট থেকে সেই বিরাট দেহটা যখন বহু যত্ন আর পরিশ্রমে স্ট্রেচারে তোলা হল— তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিতে আমার শুধু মনে হল— প্রতিবাদ। প্রতিবাদ আর ভাষাহীন যন্ত্রণা!

অথচ শুনেছি বিকেল থেকে তিনি অচৈতন্য। সন্ধ্যার সময় খবর পেয়ে যখন পৌঁছেছি, তখনও তাঁকে সজ্ঞানে দেখি নি। ছোট্ট ঘর, চটের পর্দা দিয়ে কোনোরকমে পার্টিশান করা। ও-পাশে বৃদ্ধ বাবা রোগশয্যায় শুয়ে নীরবে। এ পাশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে নীরবে। একটা ভাঙা আলমারি, একখানা বুক-সেলফ্, একটি টেবল্। অজস্র বই আর পত্র-পত্রিকা গাদা করা। কিছু চিঠি আর ছেঁড়াখোঁড়া পাতায় লেখা খসড়া রচনা এখানে-ওখানে গোঁজা। যেন কিছু সৃষ্টির বীজ হেলা-ফেলা করে ছড়ানো। টেবিলের ওপর কয়েকটি ওষুধের শিশি আর চীনেমাটির ও আটার বটল। জয়ন্তী সংকলন 'পরিচয়' এবং মলাট ছেঁড়া পুরানো 'মৌচাকে'র একটি বার্ষিক সংখ্যা বুক-সেল্‌ফের ওপর এমনভাবে রাখা যে, চোখে পড়বেই। মাথার কাছে বাড়ির বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে। কারোর মুখে কথা নেই, চোখে আশঙ্কা আর প্রশ্ন। ভাষাহীন প্রশ্ন। যা আমাদের সারা গায়ে বিঁধছে, মাথা হেঁট করে দিচ্ছে।

পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নেয়ারের খাটটার এক মাথা শক্ত দুহাতে চেপে ধরে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। লেপের তলায় সমস্ত শরীরটা ঢাকা শুধু ডান হাতের কনুই থেকে কব্‌জি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চওড়া হাড়ের ওপর মাংস নেই, মেদ নেই। শিথিল চামড়া। যেন আকাশের দেবতার ভ্রূকুটিতে সমস্ত সঞ্চয় কে শুষে নিয়েছে। দেখছিলাম মানিকবাবুর কপালে কি অজস্র রেখার জটিল আঁকিবুঁকি। মুখের এখানে ওখোনে দু-একটা কাটা-ফাটার চিহ্ন। মাথায় কদিন তেল পড়ে নি জানি না, শুকনো চুলগুলো বালির মতো ঝুরঝুরে, পাক ধরেছে। আর, সেই আশ্চর্য চোখ দুটো বন্ধ।

এই অনুভূতিই আমাকে হতবাক করে দিচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি যাঁকে দেখছি, তিনি আজ চোখ বন্ধ করেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ যে দুটো চোখকে ভয় করত, শ্রদ্ধা

করত, ভয় আর শ্রদ্ধা— সেই চোখজোড়ার পাতা এখন নামানো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অথচ তাঁর চোখে দৃষ্টি নেই, হাতে সামর্থ্য নেই। এ কি বিস্ময়!

সেই আশ্চর্য মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পায়নি। অথচ বরানগরে ছুটে আসার সময় বারবার মনে হয়েছিল, হয়তো সইতে পারবো না। হয়তো ভেঙে পড়বো। কিন্তু সেই আশ্চর্য মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পায়নি। আমি শুকনো দুটো চোখে কান্না আর জ্বালা, জ্বালা আর কান্না নিয়ে দেখছিলাম। অক্সিজেনের সিলিন্ডারটা খাটের তলায় শুইয়ে রাখা। সরু একটা রবারের নল বাঁ নাকের ফুটোয় ঢোকানো। শরীরের নড়াচড়ায় যাতে পড়ে না যায় তাই এক টুকরো প্লাস্টার দিয়ে নলটা গালের ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ডান হাতটা অস্থিরভাবে নাড়ছেন। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে কাতর শব্দ বেরুচ্ছে যার কোনো ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে।

আমি ভেঙে পড়ি নি। সেই চতুষ্কোণ খাটে শোয়ানো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম বাংলাদেশের চিহ্ন। মনের মধ্যে আবেগের ছিটে-ফোঁটাও তখন ছিল না। পোড়-খাওয়া অকালবৃদ্ধ আর অভিন্ন গাণিতিকের মতো আমি হিসেব করছিলাম।

আসার পথে কি দেখিছি? দেশবন্ধুর কৌমার্যব্রতী শিষ্য বিধান রায়ের আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বামপন্থীদের বৃহৎ নির্বাচনী সভা, রাস্তার দেয়ালে হাঙ্গেরির গোলযোগের ওপর উত্তেজিত পোস্টার, কলেজ স্ট্রিটে সারবাঁধা বইয়ের দোকান, সিনেমা হলের সামনে লম্বা লাইন আর পুলিশ। কি শুনেছি? দক্ষিণেশ্বরগামী কিছু বাসযাত্রীর পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, খাবারের দোকান বা চায়ের স্টল থেকে হঠাৎ ছিট্‌কে আসা দু-এক কলি চটুল বা গম্ভীর গানের সুর।

যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যিনি এখন চোখ বুজে। যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যাঁর ডান হাতটা দুর্বলভাবে উঠছে আর নামছে। যা দেখতে আর শুনতে হয়েছে, সেই বিচিত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যিনি মরে যাচ্ছেন।

বোবার গানের মতো এই একটা কথা বার বার আমার মনে জান্তব আর্তনাদের আঁচড় কাটছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন।

কি চিকিৎসা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাচ্ছি টেবিলে ওষুধের শিশি কটা দেখে! কি পথ্যি তিনি পেয়েছেন, তার প্রমাণ মিলেছে বৌদির মুখের অসতর্ক একটি কথায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানিকবাবুর স্ত্রীকে অভিযোগ করে বলেছিলেন : এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেন নি কেন? উত্তরে তাঁকে হাসতে হয়েছিল। আর তারপরে অস্ফুটে বলে ফেলেছিলেন : তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।— মৃত্যুকালে বাংলাদেশ তাঁকে কি মর্যাদা দিল, তারও প্রমাণ আমরা বাইরের সাতটি মানুষ। অথচ নাকি লেখক, পাঠক এবং কৃষ্টি-কলার পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় আমরাই ভারতবর্ষে অগ্রণী। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি!

মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা অ্যাম্বুলেন্স এল। যে মানুষটিকে খাট থেকে নামালে হার্ট ফেল করার সম্ভাবনা, তাঁকে এই গাড়িতেই নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাভাবে ভালো গাড়ি আর মুরুব্বির অভাবে বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করা যায়

নি। কলকাতার পথে পথে অসহায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নাকি এখনও একটি পরশপাথরের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকশান দিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র আমার জানা নেই। অচৈতন্য মানুষের যন্ত্রণাবোধ আছে কিনা জানি নে। কিন্তু দেখলাম হাতের ওপর স্পিরিটমাখা তুলো ঘষতেই মানিকবাবু অল্প চোখ মেললেন। বিড়বিড় করে যে কি যেন বললেন। কথা, না গলার ঘড়ঘড়ানি তা বুঝলাম না। ইনজেকশান দেবার সময় ব্যথায় তাঁর সমস্ত শরীরটা মুচড়ে উঠল। চোখ দুটো খুললেন। তাতে যেন কিছুটা ভয়, কিছু বেদনা। ভয় আর বেদনা। তারপর ধরাধরি করে যখন তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকিয়েছেন। তাঁর চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিতে আমার মনে হল, তিনি প্রতিবাদ করছেন। বাড়ি ছেড়ে যেতে কিংবা শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের সাতটি মানুষের সহায়তা গ্রহণ করতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মেঝেতে স্ট্রেচারের ওপর তিনি শুয়ে। মাথার কাছে আমি। বুকের ওপর ঝুঁকে ডাক্তারবাবু। তাঁকে সমস্ত পথ পাল্‌স্‌ দেখতে হবে। বরানগরের দুটি তরুণ শক্ত করে অক্সিজেনের সিলিন্ডার ধরে। দরজার কাছে বেঞ্চির ওপর বসে আছেন বৌদি এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বৌদির হাতে চীনেমাটির সেই জলের পাত্রটা। সামনে ড্রাইভারের পাশে 'স্বাধীনতা'র মণি ভট্টাচার্য। কলকাতা থেকে আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বাসে ফিরবেন।

ড্রাইভারকে আস্তে চালাতে বলা ছিল। আস্তে আর সাবধানে। অথচ গাড়িটা প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। রাস্তাও খারাপ। থেকে থেকে ঝাঁকুনি লাগছে। সকলে এক একবার চমকে মানিকবাবু মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

মৃত্যুর এতো কাছে এর আগে আমি আসি নি। আমার শরীর, মন এবং অনুভূতির ওপর এতো চাপও কখনো পড়ে নি। হাঁটু গেড়ে বসে দুটো হাত তাঁর কপাল, গাল, কখনো গলার খাঁজে শক্ত করে ছুঁইয়ে রেখেছিলাম। শুশ্রূষার আবেগে নয়, তিনি বেঁচে আছেন আর শরীরটা এখনো গরম— শুধু এটুকু উপলব্ধির স্বস্তি পাবার জন্য।

বরানগর থেকে মৌলালি। কি দীর্ঘ সেই যাত্রা আর কি ভয়ংকর! স্পষ্ট বুঝছিলাম আস্তে আস্তে তাঁর জ্বরতপ্ত শরীরের উত্তাপ কমছে। আর আহা, আমি বুঝছিলাম তিনি মরে যাচ্ছেন। নাড়ি ধরে মুখ নিচু করে বসে ডাক্তার কি ভাবছিলেন জানি নে। একটু উত্তাপের জন্য আমি কি প্রার্থনা করবো? কিন্তু কার কাছে, কি ভাবে? আমি কি চিৎকার করে, চিৎকার করে ডাক্তারবাবুকে ধম্‌কে উঠবো? গাড়ি থামিয়ে একটা ইনজেকশান কেন দিচ্ছেন না এই অজুহাতে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন অথচ আমার কিছু করার নেই কেন?

মাঝে মাঝে তীব্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার চোখ জানতে চাইছিল, কি বুঝছেন? কিন্তু তিনি নির্বাক। আমার চোখ বলতে চাইছিল, সাবধান। কিন্তু তিনি নির্বাক। দেখলাম তাঁর কপালে কয়েকটা শিরা ফুলে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি সংক্ষিপ্ত আর তীক্ষ্ণ, ডিসেম্বর মাসে ঝরঝর করে ঘামছেন। আমার কপালেও বিনিবিনি ঘাম। আবার গাড়িটা ঝাঁকানি দিল। মনে হল একটা জন্তুর মত চিৎকার করে, চিৎকার করে ড্রাইভারকে গালাগালা দি। কিন্তু তিনি নির্বাক। আর সত্যিই তো, ড্রাইভারের দোষ কোথায়?

হাতটা আর নাড়াচ্ছেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত নিশ্চল হয়ে গেছে। শুধু মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ করছেন নিঃশ্বাস নেবার অস্থির চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করছেন। কিছু কি বলছেন? কান পেতে শুনলাম— নাঃ, নাঃ। কি না, কেন না, আমি জানি না। আমি জানি না। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছবার আগে আরও কয়েকবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে বলেছেন— নাঃ, নাঃ।

গাড়ি ততক্ষণে বি.টি. রোডের মাঝামাঝি এসেছে। কানের পাশের শিরায় নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা যায়, এ আমি দেখেছি। কিন্তু পাগলের মত হাতড়েও মানিকবাবুর সেই শিরাটি খুঁজে পেলাম না। ডাক্তারকে বললাম, গাড়ি থামিয়ে পাল্‌স্‌টা একবার দেখুন।

ডাক্তারবাবু সত্যিই গাড়ি থামাতে বললেন। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে পড়ায় একজন পথচারী জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই চলে গেলেন। আমার কেন যেন হাসি পেল। হিংস্রতা আর কৌতুকভরা হাসি। লোকটা জানে না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন। দিকে দিকে এতো তুচ্ছ আর যেমনতেমন জীবনের টিকে থাকার ভাঁড়ামি, অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হচ্ছে! লোকটা জানে না, কেউ জানে না। কিন্তু এই কলকাতা শহরেই বছর তিন চার আগে এমন একটি সন্ধ্যায় ইংলান্ডের রাণী এলিজাবেথের প্রথম ও নিরাপদ সন্তান প্রসবের খবর নিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল।

ডাক্তারবাবু পাল্‌স্‌ দেখলেন। তারপর হাতল ঘুরিয়ে সিলিন্ডারে অক্সিজেনের চাপটা বাড়িয়ে দিলেন। বৌদির হাত থেকে জলের পাত্রটা চেয়ে মানিকবাবুর নাকের নল টেনে বার করে তার ভেতর চেপে ধরলেন। কি পরীক্ষা করলেন জানি না, শুধু দেখলাম জলের ভেতর মৃদু শব্দে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। আর ততক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশ্বাসের আকুলতায় বুদ্বুদ হয়ে উঠছেন।

আবার গাড়ি ছাড়ল। মাঝে মাঝে বৌদির দিকে তাকাচ্ছিলাম। পাথরের মূর্তির মত বসে। চোখে-মুখে ভাবাবেগের কোন চিহ্ন নেই। এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এমনকি একটিবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না। আমার কেমন যেন ভয় করছিল। ভয় আর অস্বস্তি। তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিলাম না।

মাঝে মাঝে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বৌদির সঙ্গে নিচু গলায় হয়তো দুটো কথা বললেন। চোরের মতো একটিবার মানিকবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর আবার তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। মনে পড়ল, হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্সের সব বন্দোবস্ত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্ট্রেচারে তোলার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দূরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের বন্ধ দরজাগুলো ঠিক তখনই একটা একটা করে খুলে যাচ্ছিল।

তারপর শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়। অনেক আলো, অনেক ভিড়, অজস্র কোলাহল। আলো আর ভিড় আর কোলাহল। কফি-হাউস, কাগজের স্টল, নিয়ন আলোয় কিসের যেন বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন। হাত দেখিয়ে ট্রাফিক পুলিশ আমাদের সামনের কয়েকটা গাড়ির গতি রুদ্ধ করল। পাঁচ রাস্তার মোড়ের গোল চত্বরটার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে আমার মনে পড়ল এই পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। তার ভেতর এশিয়া একটি মহাদেশ। তার বুকে ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার কোলে শহর কলকাতা— যার ইতিহাস আছে, ইতিহাস আর ঐতিহ্য; এবং যীশুখ্রীষ্টের

জন্মের পর মানুষের সভ্যতার বয়েস হয়েছে এক হাজার নশো ছাপান্ন বছর। আর আমার অসহায় দুটো হাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে, গালে, গলায় এই মুহূর্তে উত্তাপ খুঁজছে!

আবার বিশ্রী ঝাঁকুনি শুরু হল। এই ঐতিহাসিক নগরীর সার্কুলার রোড রাস্তাটি যে এতো কদর্য, কোনদিন তা নজর করে দেখার প্রয়োজন হয়নি। এঁকেবেঁকে ট্রাম লাইন গেছে। লাইনের ফাঁকের ইট অসমান। ঝাঁকুনির প্রকৃতি দেখে রাস্তার আকৃতি আন্দাজ করছিলাম। আমার সমস্ত ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা শেষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আর উপায় নেই। আর থেকে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই সুরে অস্ফুটে আর্তনাদ করে বলে উঠছিলেন— নাঃ, নাঃ।

গাড়ি যখন হাসপাতালে পৌছল, তখন মানিকবাবুর মুখও বন্ধ হয়েছে। আর তিনি কথা বলেন নি। শুধু মনে আছে এমার্জেন্সির টেবিলে পরীক্ষার পর যখন স্ট্রেচারে করে তাঁকে উডবার্নে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ চোখের কোণ থেকে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। মানিকবাবুর কান্না! সমুদ্রের স্বাদ কিনা জানি নে। কারণ মনোবিজ্ঞানে আমার পারদর্শিতা নেই। হয়তো আগে যাঁদের দুর্জয় স্বাস্থ্য ছিল, মরার আগে স্নায়ুর দুর্বলতায় তেমন মানুষেরই চোখে জল আসে।

আর মনে আছে তারই কিছু পরে উডবার্নের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেছিলেন : দু'দিন আগে যদি আনা যেতো, তাহলে হয়তো মানুষটা বেঁচেও যেতে পারতেন।

মনে হল বৌদি সব বুঝতে পারছেন। আমার কাছ থেকে চশমাটা চেয়ে নিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাপসুদ্ধ চশমাটা তিনি আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর আশা ছিল হাসপাতালে মানিকবাবু সেরে উঠবেন। তারপর আবার চশমাটা পরে সেই আশ্চর্য চোখ দুটো মেলে তাকাবেন পৃথিবীর দিকে। হয়তো।

আমি ঠিক জানি না। আমাকে জানতে নেই। হয়তো!

ডিসেম্বর, ৩। ১৯৫৬

পালঙ্কসুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয়, তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। ঠোঁটের এক পাশ একটু যেন চাপা। এটা ঠিক হাসির ভঙ্গী নয়। কিন্তু আমার মনে আছে— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির কয়েকটা ধরন ছিল। তা ছাড়া আধখোলা ডান চোখটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন ডান দিকের ঠোঁটে একটা চাপা হাসি।

শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দুপাশে। হু হু করে হাওয়া বইছে আর ধুনুচির ধোঁয়া জটিল রেখাচিত্রের মত পাক খেয়ে চারপাশে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আজকে ঝাঁকুনি লাগলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু লাগবে না। ট্রাকটা বড়, বড় আর পোক্ত। মধ্যিখানে সুদৃশ্য পালঙ্কের ওপর সেই মৃতদেহ। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা, সাহিত্যিক! সামনে, পেছনে, দু'পাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না।

বাংলাদেশটাকে আমি বুঝতে পারি না। হাত বাড়িয়ে বারবার ফুল নিচ্ছিলাম আর অবাক হয়ে, অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। দেশের জ্ঞানী, গুণী আর সাধারণ মানুষের এই শোক, এই আবেগ যে কতো অকৃত্রিম, তা আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝেছি। কাল এমনি সময় অ্যাম্বুলেন্সে বসে বাংলাদেশকে আমি ঘৃণা করেছিলাম। আজ তাকে কি বলবো? কাল কাঁদি নি, এখন আমার চোখে জল এল।

হঠাৎ গোপাল হালদার আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। ফুলের ভারে দামি পালঙ্কের একটা পায়ে ফাটল ধরছে। ভেঙে ভেতরের পেরেকটা অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো খাটটার কথা মনে পড়ল। শুনেছি নেয়ারের বাঁধন ছিঁড়ে গেলে তিনি নিজেই আবার তা বেঁধেছেঁদে নিতেন। খাটটার জীর্ণ অবস্থা নিজে দেখেছি। তবু তাতে মানিকবাবুর নিরাপদ আশ্রয় জুটতো।

অথচ আজ এই নতুন, সুদৃশ্য পালঙ্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত শরীরের ভার বহন করতে পারল না। অবিশ্যি মানিকবাবুর ওজন কোনদিনই এতো ছিল না। জীবনে এতো ফুলও তিনি পান নি।

আমি একা পারবো না দেখে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার এসে দাঁড়ালেন। পায়ের দিকের পায়া দুটো ঠেলে ধরে থাকতে হবে। নইলে পালঙ্ক ভেঙে পড়বে।

হঠাৎ হাসি পেল। কাল এমনি সময় একটা ভাঙা গাড়ির বুকে বসে একটা জীয়ন্ত শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করছিলাম। আজ একটা পোক্ত গাড়ির বুকে দাঁড়িয়ে একটা ভাঙা পালঙ্কের আয়ু সামলাচ্ছি।

আজ কপালে ঘাম নেই, একটু যেন শীতও করছে। রাত হয়েছে। আজও দীর্ঘ পথের যাত্রা, থেমে থেমে। তবে বরাকনগর থেকে মৌলালির হাসপাতাল নয়। মৌলালি থেকেই নিমতলার শ্মশানঘাট।

মনোবিজ্ঞানে আমার পারদর্শিতা নেই। তবে জানি মৃতদেহের ভাব অভিব্যক্তি বলে মানুষ যা ভাবে, আসলে তা তার নিজের কল্পনা। তবু মনে হচ্ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চোখ মেলে তাকিয়ে যেন সব কিছুই দেখছেন। আর তিনি যে দেখছেন, তা তাঁর ঠোঁটের চাপা হাসির টুকরোয় গোপন করেও রাখেন নি। দেখা আর প্রকাশ— মৃত্যুর পরও মানিক বাঁড়ুয্যের চরিত্র পাল্টায় নি!

মানিক-স্মরণে, ১৯৬৮
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বান্তর

দেবেশ রায়

একজন সৃষ্টিকর্মীর সারাজীবনের কাজ যখন একটা সমগ্রতায় আমাদের কাছে ধরা পড়ে তখন সেই সমগ্রতাকে আমরা নানা ছোট-ছোট ভাগে আবার টুকরো-টুকরো করে নিতে যে-চাই সেতু ঐ সমগ্রতার ধারণাটা আছে বলেই। তা না থাকলে ঐ ছোট-ছোট টুকরোগুলো হয়ে ওঠে ঐ সৃষ্টিকর্মীর সমগ্রতার বিরোধী। আর তার ফলে সেই টুকরোগুলো একটা স্বাতন্ত্র্য পেয়ে যেতে পারে-যেন ঐ টুকরোটা সমগ্রের চাইতে বড়।

চিত্রশিল্পীদের কাজে নানা প্রভাব ও ঝোঁক অনেক প্রত্যক্ষ বলেই বড় প্রায় সব শিল্পীকেই আমরা বুঝে নিতে চাই এই রকম নানা পর্বে তাঁর কাজগুলোকে ভাগ করে-করে। পিকাসোর একেবারে কিশোর বয়সের আঁকা ত্রুটিহীন পোর্ট্রেট দেখে আমাদের মালুম করতে হয় যে, ঐ মহাশিল্পীকে কোন সহজ সিদ্ধি অতিক্রম করে নিজের পরাক্রান্ত রূপায়ণশক্তির যোগ্য আঁকার ধরন আবিষ্কার করতে হয়েছিল। 'নীল পর্ব', 'গোলাপি পর্ব' তাই পিকাসোর ক্ষেত্রে বিকাশের সূত্র-পরম্পরা নয়, হয়ে ওঠে নিজের অঙ্কনের কাছে পৌঁছবার জন্যে পেরনো এক-একটি পর্ব। আমাদের নিজেদের যামিনী রায় যে পোর্ট্রেট বা থিয়েটারের সিন-সিনারি আঁকতেন তার ভেতর থেকে তাঁর নিজস্ব অঙ্কনকে খুঁজে পান নি-পোর্ট্রেট বা সিন-সিনারির রঙ আর রেখা সম্পূর্ণ বর্জন করে তিনি তাঁর নিজস্বতায় পৌঁছেছিলেন। কখনো-কখনো এমন তর্ক দেখা যায় যে যামিনী রায় তাঁর পটচিত্রগুলো আঁকতে শুরু করার পরেও কখনো— কখনো পোর্ট্রেট এঁকেছেন। সে-তর্কে যামিনী রায়ের ছবি আঁকার এই পর্বভাগকে কৃত্রিম এক নাটকীয়তায় দেখা হয় গোটা পর্বের এই ক্রম ভুলে গিয়ে যে যখন পোর্ট্রেট আর থিয়েটারের সিন-সিনারি তিনি আঁকছেন তখন পটচিত্র আঁকেনেই নি। এখানে পর্বভাগের উদ্দেশ্য যামিনী রায় কী করে 'যামিনী রায়ের ছবি'-তে পৌঁছলেন সেটাই দেখা। কিন্তু এরই বিপরীত এক পদ্ধতিতে আর এক যুগন্ধর শিল্পী নন্দলাল তাঁর বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে বর্জনের এমন নাটকীয়তা বা নিজেকে আবিষ্কারের অবিকল এমন তাড়না নেই। খুব সম্প্রতি সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর 'নন্দলাল' বইটিতে আমাদের জানিয়েছেন সারা জীবনই নন্দলাল প্রকরণের সঞ্চয় বাড়িয়ে যান কী ভাবে ও তাঁর ক্ষেত্রে কোনো প্রকরণই অবান্তর হয়ে পড়ে না কেন। সেখানে নন্দলারের আত্মবিকালের পর্বভাগের চিহ্নগুলো নাতিস্পষ্ট, নাতি-উচ্চারিত। রামকিঙ্করের ছবিতে কোনো ভাস্কর্য গুণ নেই— সে-ছবি এতই বেশি ছবি, সে-ছবিতে রেখার ভারতীয়তার চাইতে রঙের তীব্র প্রক্ষেপ অনেক বেশি স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে রঙের এই প্রক্ষেপণের সমতুল্য বিমূর্তন প্রথম দিকে ছিল না, বরং তাঁর 'সাঁওতাল পরিবার'— ভাস্কর্যে রেখার ভারতীয় বিন্যাস অনেক বেশি স্পষ্ট, রেখার সে-বিন্যাসে মূর্তির পেশিও ঢাকা পড়ে যায়। তিনি যখন 'সুজাতা', 'রবীন্দ্রনাথ' গড়েন তখন মূর্তির অন্য এক বিমূর্তমাত্রা তাঁর আঙুলে এসে গেছে। এমন শিল্পীর ছবির পর্ব

ভাগ ও ভাস্কর্যের পর্ব ভাগ একটি মাত্র নীতিতে করাই যাবে না, বা এই দুই ধরনের শিল্পকর্মের জন্যে যদি— যা দুই ভিন্ন পর্বক্রম তৈরি করে নেয়া যায়, চিত্র ও ভাস্কর্য মেলানো তাঁর যে— সমগ্রতা সেই সমগ্রতা বোঝার পক্ষে তা আর কার্যকর হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পর্ব-পর্বান্তর বেছে নেয়া দিনে-দিনেই জটিলতর হয়ে উঠছে। এককালে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পুনশ্চ' দিয়ে যদি-বা তাঁর প্রায় সত্তর বছরব্যাপী কাব্যচর্চাকে বেশি সরল করে বুঝে নেয়া যেত, এখন তাঁর কবিতার পর্বভাগের নীতিকে তাঁর গান অবান্তর করে দেয়, তাঁর গদ্যরচনার পর্বচিহ্ন মুছে যায় তাঁর ছবির যুক্তিতে। পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা এমন জটিল হয়ে উঠেছে বলেই হয়ত আধুনিক রবীন্দ্রচর্চায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারেরও এক বেশ যোগ্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এই ক্রমজটিলতাতে হাঁপিয়ে গিয়ে কখনো কখনো আমাদের মনে হচ্ছে-পর্ববিভাগের এই প্রক্রিয়াটিই অপ্রয়োজনীয় আবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অস্থির হয়ে উঠতে হয় এই জটিল সমগ্রতাকে বোঝার তীব্র কৌতূহলে।

পর্বান্তর নির্দেশের চেষ্টা এভাবেই কখনো শিল্পীর জীবনের বাস্তবের ওতপ্রোত হয়ে যায়, কখনো ঘটে শিল্পীর জীবনের বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতা, কখনো চিহ্নগুলো থাকে প্রকট, কখনো আমাদেরই কতকগুলো চিহ্ন দেগে দিতে হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝার জন্যে এই পর্বচিহ্নের জটিলতা যে— সবচেয়ে বেশি ঠেকে তার একটি কারণ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেওয়ার মত বাস্তব একটি রাজনৈতিক ঘটনা দিয়ে তাঁর নিজের জীবনের পর্বান্তরকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ও আমরা সেই পর্বান্তরচিহ্ন তাঁর সাহিত্যে খুঁজে নিতে চেয়েছি। যদি সেই পর্বান্তর তাঁর গল্প— উপন্যাসেও নাটকীয়ভাবে উচ্চকিত থাকত— যেমন তলস্তয় নিজেই তাঁর উপন্যাসগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বা যেমন ঘটেছিল যামিনী রায়ের— তা হলে হয়ত তাঁর জীবনের পর্বান্তরকে সাহিত্যের পর্বান্তরে বুঝে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধে হত না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হওয়ার আগেই এমন অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন যা তিনি কমিউনিস্ট হওয়ার পর লিখতে পারতেন বা কমিউনিস্ট হওয়ার পরেও তিনি এমন গল্প-উপন্যাস লিখেছেন যা তিনি কমিউনিস্ট হওয়ার আগে লিখতে পারতেন 'অহিংসা' ও 'চতুষ্কোণ'-এর একালের ভুল তারিখের ভিত্তিতে— এই রকম একটা ধারণাও আমাদের বিব্রত করে আসছে।

এই ধারণার পেছনে নিশ্চয়ই এ-রকম একটা বিশ্বাস কাজ করে যে কমিউনিস্ট হওয়ার সঙ্গে লেখার বিষয় ও ধরনের একটা প্রয়োজনীয় যোগ আছে; কমিউনিস্ট লেখকের লেখা থেকে বোঝা যায় যে তিনি কমিউনিস্ট; অকমিউনিস্ট লেখকের রচনা পড়ার প্রত্যাশা আর কমিউনিস্ট লেখকের রচনা পাঠের প্রত্যাশার ভেতরও ফারাক আছে।

এখানেই এই প্রশ্নটা তৈরি হয়ে যায়— কমিউনিস্ট লেখকের এই বৈশিষ্ট্যটি কী, তাঁর সম্পর্কে প্রত্যাশার পার্থক্যই-বা কোথায় আর এমন বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের কারণই-বা কী?

কিন্তু এই প্রশ্নের আগেও, বা হয়ত এই প্রশ্নের সঙ্গেই, আরো একটা প্রশ্ন তৈরি হয়ে আছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়াটাই-বা কেন চিহ্নিত হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের পর্বান্তর হিসেবে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কমিউনিস্ট

পার্টিতে এসেছিলেন— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে-রকম কংগ্রেসের আইন-অমান্য, অসহযোগে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি সারা জীবনই কংগ্রেসে ছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীও আইন-অমান্য ও অসহযোগে যোগ দিয়েছিলেন, পরে তিনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তারাশঙ্কর ও সতীনাথের এই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কাজকর্ম তাঁদের উপন্যাসগুলোর ভেতর এক ধরনের ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা এনেছে। বিভূতিভূষণ ও আরো অনেক লেখকই গান্ধীজীর আন্দোলন, ইংরেজ-ভারতবাসীর সম্পর্কে ইত্যাদির কথা বলেছেন কিন্তু সে-কথাগুলো তাঁদের গল্প-উপন্যাসে বড় জোর পরিপ্রেক্ষিতের কাজ করে।

তারাশঙ্কর ও সতীনাথের গল্প-উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, চরিত্রগুলোর ভেতরকার সম্পর্ক রাজনৈতিক যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাজনৈতিক যুক্তিতেই তৈরি। রাজনৈতিক সেই সমগ্রতাবোধের জন্যেই হয়ত তারাশঙ্করের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় পৌঁছানো। দুর্গা মুচিনী 'গণদেবতা'য় অতটা প্রাধান্য পেয়েও প্রধান চরিত্রের একটি হয়ে ওঠে না-'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্কর মুচি-কাহাদের একমাত্র চরিত্র করে তোলেন। 'জাগরী' থেকে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'-এ সতীনাথ পৌঁছাতে পেরেছিলেন রাজনীতির জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়েই হয়ত। রাজনীতির প্রত্যক্ষতা যাঁর উপন্যাস-প্রয়াসের অন্যতম প্রধান একটি অবলম্বন নয়, তেমন কোনো লেখকও এ-রকম লিখতে পারতেন কিনা এমন সম্ভাব্য পাল্টা ওকালতি প্রশ্নের জবাবে বলে রাখা নিরাপদ আমরা কোনো সাধারণ সূত্রে পৌঁছাচ্ছি না, বাংলা উপন্যাসের এই দু-জন লেখকের প্রসঙ্গেই কথাগুলো আপাতত বলা।

কিন্তু তারাশঙ্কর বা সতীনাথ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁদের এই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা লেখকের তত্ত্ববিশ্বের (আইডিওলজি) যুক্তি হিসেবে আসে না কেন? 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা' ও 'জাগরী'তে রাজনীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রাসঙ্গিক, সে-তথ্য বাদ দিয়ে কাহিনী বা চরিত্রগুলোকে বোঝা যাবে না। তাই এই উপন্যাসগুলোর বেলাতেই সেই রাজনীতির কথাটা পাঠককে জেনে নিতে হয়। কিন্তু *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* বা *ঢোঁড়াইচরিত মানস*-এর লেখকদের রাজনীতি আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় *ঠেকে* না।

ঠেকে না যে তার অন্য ধরনের নজিরও দেয়া যায়। তারাশঙ্কর বা সতীনাথের রাজনীতিবোধ আমাদের কাছে তাঁদের লেখক পরিচয়ের আবশ্যিক উপকরণ নয় বলেই তারাশঙ্করের 'আগুন', 'পঞ্চ পুত্তলী', 'আরোগ্যনিকেতন', 'বিচারক', 'মঞ্জুরী অপেরা', 'সপ্তপদী' পড়ে বা সতীনাথের 'অচিন রাগিণী' পড়ে এই রচনাগুলো ও তাঁদের রাজনীতির সঙ্গতির প্রশ্নটি কখনো পাঠনের মনে ওঠে না। এমন-কি তারাশঙ্কর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে সময়, তখনকার রচনা 'মন্বন্তর'-এর প্রসঙ্গেও রাজনীতির কথাটা অবান্তর থেকে যায়। কিন্তু সেখানেও তো এমন প্রশ্ন উঠতে পারত, ওঠা উচিতও হয়ত, 'ধাত্রীদেবতা-গণদেবতা'র রাজনীতি ও 'মন্বন্তর'-এর রাজনীতির ভেতর কোথায় বদল ঘটে যাচ্ছিল।

তাঁদের রাজনীতির কথাটি তারাশঙ্কর ও সতীনাথের আলোচনায় এখনো প্রাসঙ্গিক হয়ে না ওঠায় এই দুই প্রধান ঔপন্যাসিকের রচনাগুলোতে স্থানাঙ্ক ও উপাঙ্ক সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা তৈরি হতে পারছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তির প্রতিবাদী জাতীয় আস্ফালনের প্রধান ধারণা থেকেই এঁদের রাজনীতির প্রত্যক্ষতা অর্জিত হয়েছিল-দেশ

স্বাধীন হওয়ার পর সে-রাজনীতি আর প্রতিবাদী রাজনীতির অংশ নয়, সাম্রাজ্য-শক্তির সঙ্গে তার বিরোধিতাও আর সক্রিয় নয়। ফলে, *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* (১৯৪৮) বা *ঢোঁড়াইচরিত মানস* (১৯৪৯) পড়বার জন্যে লেখকের রাজনীতি সম্পর্কে অনাগ্রহী হলেও পাঠক আর তেমন ক্ষতি বোধ করছে না। বরং যে-কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দুই লেখকই সক্রিয় ছিলেন স্বাধীনতা লাভের পর সেই কংগ্রেসই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে; তখন রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা নতুন মাত্রা পেয়েছে, রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষ বদল ঘটে গেছে। জাতীয় আন্দোলনের ভেতর থেকে উৎসারিত দেশের মানুষের সঙ্গে অন্বয়ের যে-মহৎ সংরাগ *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* ও *ঢোঁড়াইচরিত মানস* পর্যন্ত ঔপন্যাসিককে নিয়ে যেতে পারে সে সংরাগ এই বই দুইটি রচনাকালের জাতীয় রাজনীতির সত্য আর ছিল না। *ঢোঁড়াইচরিত মানস*-এ যখন গাছের লাউয়ের গায়ে গা নহী বাওয়ার আবির্ভাব পাঠক পড়ছে তখন গান্ধীজি মারা গেছেন, গান্ধীজির সারাজীবনের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়ে গেছে, নতুন ভারতরাষ্ট্রে গান্ধীবাদ থেকে সরে আসছে ইতিহাসের যুক্তিতেই হয়ত, কিন্তু যে-মূল্যবোধ গান্ধী-আন্দোলন থেকে জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল সেই মূল্যবোধও ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে অসহায় দেশবাসীর সামনে। গান্ধী আন্দোলনেরই পঁচিশ বছর ধরে যে-দেশ দেশবাসীর আপন হয়ে উঠেছিল, স্বাধীনতার পরপরই তা অচেনা অপরিচিত হয়ে যায়। সেই সময় 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' অনেকখানিই টানে কাহারদের জীবনের অজ্ঞাত রহস্যের কারণে আর 'ঢেঁড়াইচরিত মানস' এক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত দূরবর্তী ঠেকে।

কিন্তু প্রকাশকাল এত অপঠিত, প্রকাশের পর পঁচিশ বছর ধরে প্রায় অপরিচিত ঢোঁড়াই-এ আমাদের আগ্রহ নতুন করে জেগে ওঠে দেশের নানা দিকে হরিজন-গিরিজন-আদিবাসীদের নানা রকম বিক্ষোভ-বিদ্রোহের সত্তরের দশকে। যখন লেখা হয়েছিল, ঢোঁড়াইয়ের রাজনীতি তখন অতীতের রাজনীতি, তখনকার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। যখন পড়া হল ঢোঁড়াই তখন অতীতের রাজনীতির অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের চৈতন্যবিকাশের আখ্যান হিসেবে আর এক নতুন রাজনীতির আধার। রচনাকালে এ-উপন্যাস দুটির কোনোটিরই কোনো রাজনৈতিক intervention ছিল না। সেজন্যে পাঠকও এ-উপন্যাস দুটিকে বা তার লেখকদের রাজনীতিকে রচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ভাবে নি। পাঠের বহুবাচনতা একটি মহৎ উপন্যাস নিহিত রেখে দিতে পারে যোগ্য সময়ের অপেক্ষায়। তেমন মাহেন্দ্রক্ষণে প্রয়োজনীয় পাঠের নির্ভুল উঠে আসা ক্লাসিকসের সনাতন লক্ষণ। *ঢেঁড়াইচরিত মানস* তার রাজনীতির অব্যবহিত থেকে মুক্ত হয়েই ক্লাসিক হতে পারল। কিন্তু তার রাজনীতি যতদিন অব্যবহিত থেকেছে ততদিন ঢোঁড়াইয়ের রাজনীতি বা তার লেখকের রাজনীতিতে আমরা আগ্রহ বোধ করি নি।

তারাশঙ্কর ও সতীনাথ ভাদুড়ীর চাইতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যায় অনেক কম রাজনীতির গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর এমন কোনো গল্প-উপন্যাস নেই-ই যেখানে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন পুরো উপন্যাসের ঘটনাগুলোকে বা চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

কিন্তু তাঁর বেলাতেই রাজনীতিই হয়ে ওঠে কেন পাঠক-সমালোচকের প্রধান বিবেচনা আর কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর যোগ দেয়ার ঘটনাটাই কেন হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্য জীবনের একটা প্রধাব বিভাজিকা?

একটা কারণ-কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়াটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে একটা সচেতনতার পরিণতিতেই মাত্র ঘটতে পারে, সেটা ধরে নেয়া। সচেতনতার যে-

পরিবর্তন একজন লেখককে পরিণত বয়সে কমিউনিস্ট পার্টিতে টেনে নিয়ে যায়, সে পরিবর্তন তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করবেই, এটাও মনে করা হয়।

আরো একটা কারণ হয়ত নিহিত আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনার তত্ত্ববিদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত এই ধারণায় যে, সে-বিশ্বে ফ্রয়েডিয় চিন্তাভাবনা একটা প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। মার্কসতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনের সঙ্গে ফ্রয়েডতত্ত্বের সম্পর্ক-এটাও সেই প্রচলিত ধারণার মধ্যে ছিল। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়াটা একটা নাটকীয় পর্বান্তরের আভাস এনেছিল।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে আমরা পরে আসব। তার আগে প্রথম প্রসঙ্গটির সূত্রেই একটু আগে উত্থাপিত আমাদের প্রশ্নটিতে ফিরে যাওয়া দরকার— একজন কমিউনিস্ট লেখকের কাছে কোনো বৈশিষ্ট্য কি প্রত্যাশিত ছিল, তেমন প্রত্যাশার কারণই বা কী?

কমিউনিস্ট পার্টিপর রাজনীতি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সক্রিয়তা দ্বারা নির্ধারিত নয়। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাস, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সম্পূর্ণ আদর্শ-আনুগত্য, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকায় আস্থা ও নেতৃত্বপ্রধান দৃঢ় শৃঙ্খলাপরায়ণ একটি পার্টির প্রতি ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ বাধ্যতা— এগুলো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার আবশ্যিক শর্ত ছিল। একজন লেখক বা শিল্পী নিজের সৃষ্টিশীল সক্রিয়তাকে যখন এতগুলো বাধ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে চান, তখন তাঁর সৃষ্টিশীলতা আর পুরনো ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, এটাই ধরে নেয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে চিন্তা বা কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের কোনো জায়গা নেই, অথচ একজন লেখক তেমন সংঘাত ছাড়া লিখতেই পারেন না— এই দ্বন্দ্বের নিরসন কীভাবে ঘটবে তাও একজন কমিউনিস্ট লেখক সম্পর্কে পাঠককে বিশেষভাবে কৌতূহলী করে তোলে।

এমন কৌতূহল ও প্রত্যাশা দুদিক থেকে তৈরি হয়েছে। আমাদের শিল্প-সাহিত্য চেতনা লালিত হয়েছিল প্রধানত ইংরেজ নন্দনচিন্তায়। এমন কি ইউরোপীয় নন্দনচিন্তার অইংরেজ জার্মান বা ফরাসি সংস্করণের সঙ্গেও আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। ইংরেজ নন্দনচিন্তায় শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতাবোধ কোনো সময় প্রায় সমাজনিরপেক্ষও হয়ে যেতে চায়, আবার বাস্তবতার সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের এক ধরনের সার্বভৌমতাও সেই নন্দনচিন্তায় স্বীকৃত। সেই মিলটনের 'এ্যারিওপ্যাগিটিকা' থেকে শুরু করে ডিকেন্স-লরেন্স-ভার্জিনিয়া উলফ-জয়েসে বাস্তবতার বিপরীত উপস্থাপন ছিল ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহ্য। রোমান্টিক কবিরাও সেই ঐতিহ্যেরই পোষকতা করেছেন। তাতে শিল্পী-সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত বিদ্রোহের স্বায়ত্তশাসনই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এই ধারণায় আমাদের নন্দনচিন্তা এত বেশি লালিত যে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতাকে আমরা অন্য সব স্বাধীনতার চাইতেও বেশি মূল্যবান মনে করে থাকি। স্বাধীনতার সেই বোধ মনন কর্মের বেলাতেও বিস্তারিত হয়ে থাকে। এই স্বাধীনতার কথা তো প্রধানতম সৃষ্টিকর্মী ও মননকর্মীরাই বলে থাকেন— তাই এই স্বাধীনতার মূল্য তুলনীয় অন্য অনেক স্বাধীনতা থেকেও অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এই স্বাধীনতা কী করে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রশ্রয় পাবে আর সেই লেখকই বা নিজের সৃষ্টির স্বাধীনতাকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার সঙ্গে কী করে মেলাবেন— এই নিয়ে আমাদের একটা সংশয় ছিল। সেই সংশয় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির একজন লেখক সম্পর্কে

কতকগুলো বিশেষ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। সে-প্রত্যাশা কোনো-কোনো সময় হয়ত আশঙ্কাই ছিল।

অন্যদিকে তখনকার কমিউনিস্ট আন্দোলন স্তালিনীয় নেতৃত্বে সংগঠন ও বিপ্লবচিন্তাকে একটা যান্ত্রিক অনমনীয় আকার দিয়েছিল। সেই যান্ত্রিকতায় কমিউনিস্ট পার্টির দলগত শৃঙ্খলা প্রায় পৌত্তলিকতা হয়ে উঠেছিল। পার্টির জন্যেই সব কিছু— এই বিশ্বাস থেকে ব্যক্তির উদ্যোগকে অনেক কম মূল্য দেয়া হত। অথচ শিল্প-সাহিত্য ত সম্পূর্ণতই এক ব্যক্তি উদ্যোগ। সেখানেও সেই ব্যক্তিলেখক বা শিল্পীকে তাঁর ব্যক্তি ক্ষমতায় পার্টির প্রয়োজনীয় কথাই বলতে হবে— এটাই ছিল প্রত্যাশিত। পার্টির এই প্রত্যাশা-পার্টিভুক্ত লেখকদের ভেতর অনিবার্যতাই চারিয়ে যেত। সেখানেই কমিউনিস্ট লেখক সম্পর্কে অন্য এক ধরনের প্রত্যাশা তৈরি হত। এমন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে পার্টির যা লাইন, গল্প-উপন্যাস-কবিতাতেও সেই লাইনই প্রমাণিত হবে— এমন প্রত্যাশা শুধু সম্ভবই ছিল তা নয়, বহু-বহু দিন, এমন কি হয়তো এখনো, কমিউনিস্ট লেখকের রচনার প্রাথমিক বিচার হত পার্টির লাইন ধরে। সেই বিচারে কমিউনিস্ট পার্টি যে-প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামে জড়িত, শিল্প-সাহিত্যেও শ্রেণী-সংগ্রামের সেই প্রত্যক্ষতাই দাবি করা হত। সেই দাবি তৈরি হতে পারত লেখক-শিল্পীদের প্রত্যক্ষণের ভিন্নতর কোনো উপায় বা অবলম্বন অস্বীকার করেই। কমিউনিস্ট পার্টির স্ত ালিনীয় সেই সংগঠনের পার্টির জ্ঞানতত্ত্ব ও শিল্পসাহিত্যের জ্ঞানতত্ত্ব একাকার হয়ে যেত প্রায় সব সময়ই শিল্পসাহিত্যেরই মূল্যে। ফলে যে-বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেয়ার জন্যে একজন লেখক লিখতে চান, কমিউনিস্ট পার্টি অভিজ্ঞতার সেই বিশেষত্বটাকেই অস্বীকার করতে চাইত। সেই কারণেই একজন লেখকের কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় হয়ে ওঠা সাধারণভাবে সেই লেখকের সৃষ্টিশীলতার বিপরীতেই প্রায় সময় স্থাপন করা হত। বুদ্ধদেব বসু এ-রকমই মন্তব্য করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে।

কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাদেশিক সীমার মধ্যেও একটি বিশেষ কালে দেখা গেল যে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গভীর সম্পর্কই কোনো কোনো কবি ও ঔপন্যাসিককে নতুন সৃষ্টিকর্মে উৎসাহিত করেছে। একই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন বিষ্ণু দের কমিউনিস্ট পর্বের কবিতাগুলো সম্পর্কে যে বিষ্ণু দের কলমে আন্দোলন, রাজনীতি আর রাজনীতির ভূগোলও কবিতা হয়ে ওঠে। সভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উচ্ছ্বসিত আবেগ তো বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসেরই বিষয়। চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ভাষা তৈরি হচ্ছিল প্রধানত কমিউনিস্ট কবিদের কাব্যে ও তাঁদের সহযাত্রীদের রচনায়। গল্প-উপন্যাসেও তারাশঙ্করের দেশজ্ঞাননির্ভর উপন্যাসমালা থেকে যে-ঔপন্যাসিকরা প্রেরণা ও সমর্থন পেয়েছিলেন, তাঁরাও কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই শরিক ছিলেন। এই কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনায় তাঁদের বিশ্বাসের সত্য এক স্পষ্টতায় উচ্চারিত হত। সে বিশ্বাসের সত্য অনেক সময় হয়ত অভিজ্ঞতার সত্য ছিল না, আবার অনেক সময় হয়ত ছিলও। কিন্তু শুধু বিশ্বাসের সত্য পরিবহণেও তো সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কমিউনিস্ট আন্দোলন একদিকে ভাষার আধুনিকতার নতুন উৎস খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে কবিতা ও গল্প-উপন্যাসে বিষয়ের আধুনিকতা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সেদিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়াটা অন্তত ৪০-এর দশকে কোনো প্রবল বিদ্রোহের ব্যাপার ছিল না।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার ঘটনাটি তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে যে-এমন জড়িয়ে যায় তার এক গভীরতর কারণ নিহিত আছে হয়ত তাঁর গল্প-উপন্যাসের একান্ত নিজস্ব কোনো নির্দিষ্ট ধরনে। আর সেই নির্দিষ্ট ধরনটি যে কী তা নিয়ে পাঠক আর লেখকের মধ্যেও হয়ত ছিল এক অনুচ্চারিত দ্বন্দ্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠক তাঁর *পুতুলনাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, জননী* উপন্যাস আর *অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক* ও *সরীসৃপ*-এ সংকলিত প্রথম দিকে লেখা ছোটগল্পগুলো থেকে এমন একটা ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলেন— কথাসাহিত্যিক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যক্তির নিয়তিই শেষ পর্যন্ত প্রধান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সময়কার রচনা সম্পর্কে এ রকম ধারণা যে এখনো প্রচলিত তা বিভিন্ন সমালোচনা নিবন্ধে চোখে পড়ে। এমন ধারণা গড়ে উঠেছিল এই রচনাগুলোর একটা বিশেষ ধরনের পঠনের ফলে। সেই বিশেষ ধরনের পঠনও সম্ভব হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীবিবরণের কতকগুলো মৌলিক ও নির্দিষ্ট ঝোঁকের ফলেই।

মানিকের এই প্রথম দিকের রচনাগুলোতে প্রায় একটা ছক গড়ে উঠতে চায় যেন। একক ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না, তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে অনবরত, প্রতিরোধহীন। অথচ প্রতিরোধের একটা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির ভেতর কোথাও উজ্জীবিত হতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। কোনো এক অস্পষ্ট নিয়তিবোধ এই কাহিনীগুলো থেকে সংক্রামিত হতে চায়।

এর পরের স্তরে মানিক সেই অস্পষ্ট নিয়তিবোধকে আর একটু স্পষ্ট চেহারা দেন। সেখানে সেই অস্পষ্ট নিয়তি, ব্যক্তির নিজেরও অজ্ঞাত প্রবৃত্তিতে, একটা স্পষ্ট আধার পায় যেন। এই সময়কার গল্পগুলো নিয়েই ফ্রয়েডিজমের কথা, চেতন-অচেতনের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে-ফিরে আসে। এমন হতেও পারে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত ফ্রয়েডিজমের কোনো কোনো তত্ত্বে ব্যক্তিসংক্রান্ত তাঁর জিজ্ঞাসার একটা উত্তর পেতে পারেন বলে মনে করছিলেন। তেমন গল্পও তিনি একাধিক লিখে থাকতে পারেন। আমাদের পাঠকদের কাছে সেই গল্পগুলো একটা অদ্ভুত প্রাধান্য পেয়ে আসছে।

'জলার্ক'— চতুর্দশ সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি সরোজ দত্ত তৈরি করেছেন তা থেকে আরো জানতে পারি ১৩৪৬ পর্যন্ত মানিকের তিনটি গল্পগ্রন্থে-*অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক* ও *সরীসৃপ*-এই গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে— 'অতসী মামী', 'নেকী', 'বৃহত্তর-মহত্তর', 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'সর্পিল', 'পোড়াকপালী', 'আগন্তুক', 'মাটির সাকী', 'মহাসঙ্গম', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'চোর', 'যাত্রা', 'প্রকৃতি', 'ফাঁসি', 'ভূমিকম্প', 'অন্ধ', 'চাকরী', 'মাথার রহস্য', 'মহাজন', 'বন্যা', 'মমতাদি', 'মহাকালের জটার জট', 'গুপ্তধন', 'প্যাঁক', 'বিষাক্ত প্রেম', 'দিক পরিবর্তন', 'নদীর বিদ্রোহ', 'মহাবীর ও অবলার ইতিহাস', 'দুটি ছোটগল্প', 'সরীসৃপ'। এই সময়ে লেখা আরো কিছু গল্প ১৩৫২-এ প্রকাশিত 'হলদু নদী সবুজ বন' আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক পাঠক এই বইগুলোতে চেতন-অবচেতনের নকশা বা যৌনতার অপ্রতিরোধ্যতা খুঁজে পাবেন কম গল্পেই। কিন্তু সমষ্টির ভেতর আটকে যাওয়া কোনো ব্যক্তির সমাধানহীন যন্ত্রণা অথবা সমষ্টির অন্তর্গত থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার কথা এই সব গল্পে এখন আমরা প্রায়ই পেয়ে যেতে পারি।

আর এর বিপরীতে *দিবারাত্রির কাব্য* ও *চতুষ্কোণ*-এ পাঠক ব্যক্তির আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-যৌনতার এক বিমূর্তনের বিবরণ দেখে তত্ত্বেরই যেন একটা অর্ধস্পষ্ট ছকে। বাংলা গল্প-উপন্যাসের পাঠকের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা ছিল নতুন। এর আগে ইতিহাস বা সমাজের একটা ভিত্তিতে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ও তাদের অন্তসম্পর্কের কাহিনী পাঠক পড়েছে। সেই ইতিহাস ও সেই সমাজ বদলেছে, বদলেছে ব্যক্তির কাহিনীও। বাংলা গল্প-উপন্যাস প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের *পাঁক বেদে* হয়ে তারাশঙ্করের *চৈতালী ঘূর্ণি*— *রাইকমল* ও বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী*তে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেই পঠন অভিজ্ঞতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলোকে পাঠক সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে পারছিল না। ব্যক্তির নিয়তি যে-মানিক অনেক সময় প্রায় ছকে ফেলে দিচ্ছিলেন তাও পাঠকের কাছে ছক বলে ধরা পড়ছিল না। কারণ এমন ছকও তার অচেনা। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনী-বিবরণের গদ্যের মৌলিকতা ও শক্তি থেকে বিষয়ের ছকের ভেতরও সঞ্চারিত হচ্ছিল এমন এক বেগ— যা বাংলা গল্প-উপন্যাসের পাঠকের পরিচিত নয়। বিষয়ের ছক কখনো কখনো ভেঙে যাচ্ছিল অন্য এক আঘাতেও— মানিক তাঁর কাহিনীকে স্বচ্ছন্দে স্থাপন করছিলেন আমাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন শ্রেণীতে। ফলে সংলাপের ধরন বদলে যাচ্ছিল, বদলে যাচ্ছিল চরিত্রদের ভেতরকার সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন।

১৩৪৬ থেকে ১৩৫০-৫১ র মধ্যে *বৌ* ও *সমুদ্রের স্বাদ* নামে দুটি গল্প সংকলনে বেরয়। তাতে এই গল্পগুলো ছিল 'দোকানীর বৌ', 'কেরানীর বৌ', 'সাহিত্যিকের বৌ', 'বিপত্নীকের বৌ', 'তেজী বৌ', 'পূজারীর বৌ', 'মুহুরীর বৌ', 'উদারচরিতানামের বৌ', 'প্রৌঢ়ের বৌ', 'সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ', 'অন্ধের বৌ', 'জুয়াড়ীর বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভিক্ষুক', 'পূজা কমিটি', 'আফিম', 'গুণ্ডা', 'কাজল', 'আততায়ী', 'বিবেক', 'ট্রাজেডীর পর', 'মালী', 'সাধু', 'একটি খোয়া'। এই সময় তাঁর উপন্যাস হচ্ছে— 'সহরতলী', 'ধরা বাঁধা জীবন', 'অহিংসা'।

বৌ-গল্পক্রমে মানিক এক একটি চরিত্রকে ধরেছেন আর-একটি চরিত্রের সম্পর্কের সূত্রে। সেখানে ব্যক্তিপরিচয়ের অবলোপই সেই বৌদের নিয়তি। এ-নিয়তি প্রবৃত্তি-আশ্রিত নয়। 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটি এই সময়ের আগে লেখা। অন্য গল্পগুলোতেও ব্যক্তির কাহিনী অনেক বেশি সমষ্টিনির্ভর। সমষ্টি যে লেখককে কী ভাবে ভাবিত করছে তার একটা অন্য রকম সাক্ষ্য পাই গল্পগুলোর নামকরণেও। 'সমুদ্রের স্বাদ'-এর নতুন গল্পগুলোতে নামকরণ লেখকের কোনো মন্তব্য নয়, অনেক জায়গাতেই সমষ্টির দিকে ইঙ্গিত। এমন কি 'অহিংসা'র মত উপন্যাসেও লেখক তাঁর কাহিনীকে মাঝে মাঝেই যে 'লেখকের মন্তব্য' দিয়ে ব্যাখ্যা করেন তাও কি কাহিনীর গতিকে বারবারই ব্যক্তি অতিরেক থেকে ঘুরিয়ে আনার জন্যেই? 'অহিংসা' উপন্যাসটির প্রধান লোকটি তার নিজস্বতায় সমষ্টিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়, তার সম্পর্কগুলোও সমষ্টির রীতিনীতির ভেতর আটকে থাকতে চায় না কিন্তু সে সমষ্টিকে ছাড়িয়ে উঠে যেতে পারে না, সমষ্টির রীতিনীতিকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে না। বরং যেন এ উপন্যাসে ব্যক্তির নিয়তি তত নিশ্চিত নয়, আবার সমষ্টির চেহারাও খুব স্পষ্ট নয়। এ দুইয়ের মাঝখানে উপন্যাসে কোথায় একটা ফাঁকা থেকে গেছে।

লেখক বা শিল্পীর পরবর্তী রচনা তাঁর পূর্ববর্তী রচনার অর্থ পাল্টে দেয়। কিন্তু সেই পরিবর্তিত অর্থ অনেক সময় তাঁর পুরনো পাঠকরা মেনে নিতে চান না। সেই মেনে

নিতে না-চাওয়াটা কোনো সচেতন প্রতিক্রিয়া সব সময় নয় হয়ত, পঠন আর রচনার মধ্যেই আছে এক বিপরীত গতি। লেখকের রচনা পড়ে পাঠকের প্রত্যাশা তৈরি হয়ে ওঠে। সেই প্রত্যাশাকেই তিনি মিটিয়ে নিতে চান লেখকের পরবর্তী রচনায়। লেখকের কোনো রচনাই তাঁর পূর্ববর্তী রচনার পুনরাবৃত্তি নয়, পাঠকও সে-পুনরাবৃত্তি পড়তে চান না। কিন্তু প্রতিটি রচনার মৌলিকতার মধ্যেও পাঠক একটা যোগসূত্র রচনা করে যেতে পারবেন— এমন প্রত্যাশাই পাঠকের থাকে। যখনই কোনো লেখক একটু বেশি রকম নাটকীয়তায় তাঁর পূর্ববর্তী রচনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন-তখনই তাঁর পুরনো পাঠকসমাজে একটা আলোড়ন আসে, কিছু পাঠক হয়ত সেই নাটকীয় নতুনত্বের সঙ্গে আপোষ করে নেন, আবার কিছু পাঠক হয়ত নিজেকে সরিয়ে নেন, আবার এই নতুনত্বের জন্যেই লেখক আবার নতুন কিছু পাঠক পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু লেখকের পক্ষে তাঁর প্রতিটি রচনাই তার পূর্ববর্তী রচনার পাঠ বদলে দেয়। লেখা হয়ে যাবার পরই কেবল তিনি নিজে আবিষ্কার করতে পারেন তিনি কী লিখেছেন। প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে এই রচনা-উত্তর পঠনের পাঠগত কোনো সম্পর্কও না থাকতে পারে বা কিছু সম্পর্কও হয়ত থাকতে পারে— অন্তত লেখক কোথা থেকে শুরু করেছিলেন সেটা বোঝার জন্যে। কিন্তু লেখক পড়ে যান ক্রমাগতই এক অলিখিত রচনায়। সেই লেখাটি হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী রচনা।

আমাদের পক্ষে তাই উজিয়ে গেলে হয়ত অনুমান করা সম্ভব লেখক তাঁর পূর্ববর্তী রচনার কোন পাঠ থেকে পরবর্তী রচনার দিকে এগিয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পর্বান্তরে লেখা গল্পগুলো এক সময় *উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ* নামে বেরিয়েছিল— তাঁর মৃত্যুর পরপরই। এই নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে গল্পগুলোকে একটু স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা। এমন একটি সংগ্রহে যে-গল্পগুলো রাখা হয়েছিল সেগুলো সবই যে মানিক বাবু কমিউনিস্ট হওয়ার পরে লেখা তা নয়। কিন্তু এই সংগ্রহ থেকে হয়ত আমরা মানিকবাবুর কমিউনিস্ট পর্বান্তরের কাহিনীবিবরণের গতিপথটা বুঝে নিতে পারি। এই গতিপথটা উপন্যাসে সব সময় এত স্পষ্ট নয়-প্রধানত উপন্যাস-কাহিনীর ব্যক্তির কারণেই।

গল্পগুলোকে পর-পর পড়ে গেলে আমরা দেখতে পাই প্রায় কালানুক্রমিকতা মেনে নিয়েই যেন মানিক বাবু দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী কালোবাজার, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী বেকারি, যুদ্ধ-পরবর্তী তেভাগা ও শ্রমিক আন্দোলন-এই সমষ্টি জীবনের কাহিনীগুলো লিখে গেছেন। পর-পর পড়ে গেলে এই গল্পগুলোর বিচ্ছিন্ন বিশিষ্টতার চাইতে তাদের অখণ্ড সমষ্টিবোধই আমাদের কাছে বেশি গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আর পাঠক হিসেবে এই গল্পগুলোর সেই অখণ্ড সমষ্টিবোধ গ্রহণ করার প্রক্রিয়াটা যদি আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সময়, মানুষজন আর ঘটনার কালানুক্রমিকতা আর ব্যক্তিতে প্রায় একটি উপন্যাস পাঠকের মনে সংগঠিত হয়ে উঠতে চায়। কথাসাহিত্যের আধুনিক নানা অভিজ্ঞতায় উপন্যাসের বা ছোটগল্পের গঠন সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার নানা বদল ঘটেছে। সেই নতুন ধারণা দিয়ে মানিক বাবুর এই ছোটগল্পগুলোকে যদি আমরা আকারগতভাবে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে হয়ত বলব-এগুলো একটাই কাহিনীবিবরণ-ন্যারেটিভ ডিসকোর্স।

আমাদের এই অনুমানটি স্পষ্টতর করার প্রয়োজনে *উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ*-এর কিছু গল্পকে আমরা প্রধান ঘটনার দিক থেকে তালিকায় সাজাতে পারি। এ গল্পগুলোর

বেশির ভাগই ছোট, ঘটনার বিস্তার খুব বেশি নয়, তাই প্রধান ঘটনা কোনটি এটা নির্ণয় খুব একটা অসুবিধেও হয় না।

দুর্ভিক্ষ : আজকাল পরশুর গল্প
দুঃশাসনীয়
নমুনা
গোপাল শাসমল
শত্রুমিত্র

যুদ্ধ : রাঘব মালাকার
যাকে ঘুষ দিতে হয়
মাসিপিসি
শিল্পী
কংক্রিট

যুদ্ধের পর : প্রাণের গুদাম
ছাঁটাই রহস্য
চক্রান্ত
ধান

দাঙ্গা : খতিয়ান
ছেলেমানুষি

আন্দোলন : ছেঁড়া
টিচার
একান্নবর্তী
দীঘি
গারেয়ন
হারানের নাত জামাই
ছোট বকুলপুরের যাত্রী

এই তালিকাটির মধ্যেই স্বাধীনতা-পরবর্তী দু-একটি গল্প হয়ত ঢুকে গেছে। এর পরের গল্পগুলো নিশ্চিতই স্বাধীনতা-পরবর্তী-সেই গল্পগুলোর কাহিনী বিবরণ আলাদাভাবে দেখার। প্রধানত প্রাক-স্বাধীনতা গল্পের এই ক্রমে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী বেকারি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দাঙ্গা এবং নানা ধরনের আন্দোলন— এই কালক্রমটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর সে কারণেই এই গল্পগুলোর ভেতর আমরা এই এক সময়ের কাহিনীবিবরণের ধারাবাহিকতা পেয়ে যাই।

কাহিনী বিবরণের এই ধারাবাহিকতা পাওয়া সম্ভবই হত না যদি এই গল্পগুলো ব্যক্তি নিয়েই লেখা হত। কাহিনী বিবরণের এই ধারাবাহিকতা একটা গল্পের সঙ্গে আর একটা গল্পকে যে গ্রথিত করে দিতে পারে তা সম্ভব হয়, কারণ একই সমষ্টিজীবন এই সবগুলো গল্পের স্পর্শগ্রাহ্য ভিত্তি কিংবা নিকট পরিপ্রেক্ষিত। সেই সমষ্টির ভিত্তি কিংবা পরিপ্রেক্ষিত, যাই বলা যাক না কেন, এই গল্পগুলোতে এত প্রধান যে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কোনো গল্পই আর গল্প থাকে না। অনেক গল্পই হয়ত ঘটনার দিক থেকে

ব্যক্তিরই গল্প। কিন্তু তেমন কোনো ব্যক্তিগত ঘটনাও এই গল্পগুলোতে স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় না, যা সমষ্টির সঙ্গে গল্পটিকে যুক্ত করে দিচ্ছে না। এই গল্পগুলোর ব্যক্তি সব সময়ই সমষ্টির অংশ বা এই ব্যক্তিদের মাত্র সেটুকুই এই গল্পগুলোতে বলা হচ্ছে। সেখানেই সমষ্টি জীবনের ভিত্তি বা পরিপ্রেক্ষিতের ধারাবাহিকতার যোগসূত্র। সমষ্টি এমনই প্রধান যে কোনো গল্প শুধু পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনাতেই নির্মিত হতে থাকে অনেক সময়। একটা উদাহরণ নেয়া যাক যেখানে পরিপ্রেক্ষিতটা ব্যক্তির জীবনের সত্য হয়ে উঠছে গল্পটা অনেকখানি এগোনোর পর আর তা সত্ত্বেও গল্পটা সমষ্টিতা থেকে চ্যুত হয় না।

> ... নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতকগুলি গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলক একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ বালকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে-ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে চাইবে বিড়বিড় করে বকতে-বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অ-তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের স্বরে ছায়া বলবে, 'কে, কে গো ওখানে?'

[দুঃশাসনীয়]

এ গল্প কোনো সময়ই এই পরিপ্রেক্ষিতের চাইতে বেশি ঘন হয় না, গল্প শেষ হয় এই পরিপ্রেক্ষিতেরই অপরিবর্তনীয় ইঙ্গিতে। সেই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয় কিছু ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি গল্পগুলোতে তৈরি হয় কাহিনী বিবরণের সূত্রেই, কাহিনীর সঙ্গে লেখকের মন্তব্য যেখানে মিশে যায় বাক্যগঠনের প্রক্রিয়ায়। জাল-বিয়ের অছিলায় মেয়েকে বিক্রি করে দিতে সম্মত হওয়া ব্রাহ্মণের।

> তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পড়া মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুলচন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা।
>
> মনে যেন পড়তে থাকে শৈলের বাপ।
>
> কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দুটি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইকরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিঃশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে করে বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

[নমুনা]

উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ-এ গল্পের স্বল্প আয়তনে শুধুই সমষ্টির ভেতর নতুন কোনো বোধের সঞ্চার বা পুরনো কোনো বোধের ধ্বংসের মাধ্যম মাত্র হয়ে উঠেছে। সমষ্টির বোধের এই বিপর্যয়ই এই গল্প সংগ্রহের কাহিনী বিবরণের মূল আবিষ্কার। ব্যক্তি তখনই ব্যক্তি হয়ে ওঠে যখন সে সমষ্টির একটা আবরণ পায়। হয় সেই আবরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অথবা সেই আবরণের বিরোধিতায় ব্যক্তি তার চরিত্র অর্জন

করে। কিন্তু মানিক বাবুর এই কমিউনিস্ট পর্বের গল্পগুলোতে সমষ্টি-কখনো দেশ, কখনো সমাজ এমন দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যে ব্যক্তিত্ব আর সেখানে কোনো আকার পায় না। তাই গল্পগুলো এক প্রায় অদ্ভুত পরাবাস্তবের জগতে আমাদের নিয়ে যেতে চায় অতিবাস্তবের একেবারে দলিলি বা খবরের কাগুজি বিবরণের ভেতর দিয়ে। সেখানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়া বাড়ির বৌ ফিরে আসে, আবার ফিরে আসে না, সেখানে না-খেতে পাওয়া মা তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খোঁজে কিন্তু সে মেয়ে এলে চিনতে পারে না, সেখানে 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে শোবে না বলে' একটি মেয়ে 'পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল', বিয়ের অছিলায় চুরি করে আনা বৌকে যখন চাল বেচে লাল হয়ে যাওয়া ব্যাপারী ভোগ করে তখন মেয়ের দালাল হিন্দু বিয়ের মন্ত্রের সংস্কারে খেপে ওঠে আর নতুন টাকার 'মন্ত্রবলে' ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সেখানে বৌকে কন্ট্রাক্টর দেয়ার সাহেবের কাছে জমা রেখে নতুন কন্ট্রাক্টর হুকুম তামিল করতে ছোটে। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সকলের জন্যে কাপড় জোগাড় করতে কাপড়ের চোরাচালানদেরকে খুন করা হয়, একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে দুই বুড়ি বিধবা বাঁটহাতে দাঁড়িয়ে থাকে, মদন তাঁতি গামছা বোনার দাদন নিতে অস্বীকার করে, কংক্রিটের কারখানার মালিক ও ম্যানেজারের গোপন ষড়যন্ত্র মজুর ফাঁস করে দেয়, সরকারি কর্মচারীদের স্ট্রাইক থেকে বাড়ি চলে এসে আবার অস্থির হয়ে সে-কর্মচারী শহরে ফিরে যায়, দেয়ারে কার্টুন আঁকার নতুন বিদ্যায় এক কর্মচারী কারখানায় ছাঁটাই রহস্য ফাঁস করে দেয়।

এরই ভেতর সমষ্টির আর-এক মাত্রা এই গল্পগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সেই গল্পগুলোতে সমষ্টির ধ্বংস সমষ্টির ক্ষয়ের চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছে সমষ্টির প্রতিরোধ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কমিউনিস্ট-পর্বান্তরের পরের গল্পগুলোতে সমষ্টির মৃত্যু, আর সমষ্টির প্রতিরোধ প্রায় পর পর এসেছে। মৃত্যু আর ধ্বংসের গল্পগুলোতে কোনো জায়গায় ডাইড্যাকটিজম নেই। সেখানে বিবরণে অলঙ্কারহীন বাস্তব। লেখকের প্রত্যক্ষ মন্তব্য যদি কোথাও ঢুকে যায়, সেটা ঢোকে কাহিনীর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, কাহিনী নিয়েই সে-মন্তব্য। ফলে লেখকের বিবরণ, ডিসকোর্স তৈরি হয়, সেই মন্তব্য কাহিনীর ভেতর থেকেই—

> শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মানে অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। পাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বের হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেটমোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

[নমুনা]

কিন্তু প্রতিরোধের গল্পগুলোতে লেখকের বিবরণ প্রায়ই কাহিনী থেকে আলাদা একটা ডাইড্যাকটিজমে শেষ হয়। এমন কি তাঁর বাক্য রচনার বৈশিষ্ট্যে যেখানে কাহিনী বিবরণ, ন্যারেটিভ ডিসকোর্স ও লেখকের বিবরণ একই বাক্যে আসে, সেখানেও লেখকের বিবরণটিকে আলাদা করা যায়।

> আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। ... যোগী সামলে সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাব নিকাশ বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। ... ইংরেজের

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরিয়ে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশি হতে নারাজ যে বৌ তার যে— ছেলে বা-মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা আজেবাজে খেয়ালে-সেব সব খেয়াল তাদেরই মানায়, তাদেরই ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে-লাখে মা-বাপ ছেলেমেয়ে-অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

['ছিনিয়ে খায় নি কেন']

আমরা আমাদের এই নিবন্ধের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বান্তরের গল্পগুলোর পঠনের কয়েকটি সঙ্কেতে পৌছতে চাই।

১. সমষ্টির প্রতিরোধের গল্পে লেখকের যে বিবরণকে আমরা ডাইড্যাকটিক বলে চিহ্নিত করছি কাহিনীতে তার সংস্থান কিন্তু ঘটছে মানিক বাবুরই নিজস্ব গদ্যরীতিতে। তা ডাইড্যাকটিক হয়ে উঠেছে শুধু এই কারণে যে লেখকের এই বিবরণ বা ডিসকোর্স শুধু কাহিনীর সীমাটুকু মানছে না।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের সেই আদিকার থেকে লেখকের বিবরণ অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বিবরণের একটা কখনো বিকল্প কখনো সমান্তরাল প্রবহমানতাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের আঁতাতকে বাঁধে। তাঁর পর্বান্তরের গল্পেও লেখকের সেই বিবরণই কাহিনীর ধনুর ছিলাকে টানটান রাখে।

৩. যে সমষ্টির প্রতিরোধের কাহিনীতে আমরা শেষ পর্যন্ত এই পর্বান্তরে পৌছাই (তার খুব স্পষ্ট উদাহরণ হয়ত 'শিল্পী', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই', 'ছিনিয়ে খায় না কেন', এই গল্পগুলো) সেই সমষ্টির কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক পর্বান্তর বিশিষ্ট রচনাগুলোর নির্ভর ছিল। *পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি*-কখনোই ব্যক্তিজীবনের আধারমাত্র নয়, সেখানে এক-একটি গ্রামের প্রকৃতি ও জনসমষ্টি আর সেই সমষ্টি উপাদানগুলোর বৈচিত্র্যে ঔপন্যাসিকের কাহিনী-বিবরণকে গড়ে তোলে। নিজের এই পুরনো লেখাগুলোর ভেতর থেকে সমষ্টি চরিত্রের এই পঠনই হয়ত মানিকবাবুর নিজের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে। নিজের লেখার এই পঠনই হয়ত তাঁকে সমষ্টির মৃত্যু কাহিনীতে এত তন্ময় করে তুলেছিল।

আমরা তখন পেয়েছি একটির পর একটি গল্পের ছোট আকারগুলোর মিলিত সন্নিবেশে উপন্যাসের অসংগঠিত বিস্তার। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দাঙ্গার সেই মৃত্যু কাহিনীর ধারাবাহিকতা এসে পৌছেছে প্রতিরোধের সমগ্রতায়।

এই কটি সঙ্কেতে পৌছে আমরা আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসটিকে চিহ্নিত করতে পারি মাত্র— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পথে ও সদস্য হওয়ার পরে যে-গল্প-উপন্যাসগুলোর রচনা করেছিলেন সেগুলো কাহিনী বিবরণের ও লেখকের বিবরণের দিক থেকে তাঁর প্রাক-কমিউনিস্ট পর্বের রচনাগুলো থেকে কি সম্পূর্ণতই বিচ্ছিন্ন ও পৃথক, নাকি, এই দুই পর্বের ভেতর তাঁর কাহিনী বিবরণের ও লেখকের বিবরণের নিজস্বতাই প্রয়োজনীয় সেতুটি নির্মাণ করে রেখেছে।

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কায়েস আহমেদ সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাধারণের চোখে পড়ে। তাতে অনেকেই শক্তির ও নতুনত্বের আমেজ পান। ক্রমে সেটি বিকশিত হয়ে লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশে তাঁর বই কী রকম বিক্রি হয় জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অ-বাঙালি দেখেছি যাঁরা তাঁর রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত আগ্রহশীল। অনেক দিন ধরে তাঁর বিশেষত্ব কি বুঝতে ও বোঝাতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু পারি নি। কাজটা কোন ক্ষেত্রেই সোজা নয়, মানিকের বেলা আরো শক্ত, কারণ, প্রথমত, তিনি এখনও অপরিণত, দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিক আমাদের কাছে অপরিচিত। সেই একটু গোড়ার কথা বলার প্রয়োজন।

দুটি চরিত্রের সংঘাত— এই হল নাটকত্বের প্রাণবস্তু। তাই থেকে একটি চরিত্রকে তুলে নিয়ে প্রতিবেশী সংস্থানকে বসালে দ্বন্দ্ব থাকে বটে, কিন্তু নাটকত্ব গল্পের দিকেই ঝোঁকে। যদি পারিপার্শ্বিককে চেপে রাখা যায় তখন একটি চরিত্রের অন্তরের বিভিন্ন টুকরো মানুষের বিরোধটাই নাটকত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এলিজাবেথান যুগের নাট্যকার এবং ইবসেন ও পিরান্ডেলার নাম উল্লেখ করা চলে। গ্রিক নাটকের গোড়ার দিকে ছিল নিয়তির বিপক্ষে বিদ্রোহ, কিন্তু নিয়তির কার্যাবলী ছিল মানবিক। ইবসেনের সময় সমাজ ঝানু হয়েছে তাই সামাজিক বাধার শক্তি হল ভীষণ, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বোধ ও গল্পাংশ বৃদ্ধি পেল। পিরান্ডেলোর বেলা মানুষের মন ধাক্কা খেয়ে সংকুচিত ও বিখণ্ডিত। সমাজ-বোধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এই নাটকত্ব আন্তরিক, অ-স্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। নিতান্ত সাধারণভাবে মন্তব্যলিপি লিখলাম। হাজার ব্যত্যয় থাকলেও মোটামুটি এইগুলি গ্রহণ করা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ইঙ্গিত আছে যে, নাটকের ছায়াতেই নভেল বেড়েছে। খুবই স্বাভাবিক। সমাজবন্ধন যখন দৃঢ় হয় নি তখন পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য নিয়ে বিরোধটাই প্রত্যাশা করা যায়; যখন হয়েছে, তখন ব্যক্তিগত বিরোধ সামাজিকতার মধ্যে বিস্তারিত; যখন আবার অত্যন্ত দৃঢ় তখন নোরা ও ক্লিটেমনেস্ট্রা স্বধর্মী। অন্য দিক থেকেও তাই। ঘটনার দ্রুত স্রোতে পাঠকের মন ভেসে গেলেও আগ্রহ ঘনীভূত হয় সংঘাতের আশায়। যে কেউ কথকতা শুনেছেন, কিংবা বিখ্যাত ঐতিহাসিক নভেলের পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ও তার পরিবর্তে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে রাত কাটিয়েছেন বলতে কুণ্ঠিত নন, তিনিই স্বীকার করবেন যে সংশয়, বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনোভাব জাগ্রত না হলে গল্পে মজা পাওয়া যায় না। ছোটগল্পের বেলা তো বটেই, নাটকত্বই তার কৃতিত্ব। এমন কি অতি-সভ্যতার চাপে মনের ওপর যখন মেউড়ি পড়েছে, সাধারণ জীবনযাত্রায় যখন উত্তেজনাই আসছে না তখনও সমস্ত খবরের কাগজের মধ্যে চোখে পড়ে চার্চহিল-হিটলার সংবাদ ও খুনি

মোকদ্দমার বিবরণ। নাটকীয় বিরোধের আশীর্বাদেই নভেল, গল্প বেঁচে আছে। একে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না।

কিন্তু এও ঠিক যে জীবনে এত একঘেয়েমি আছে ও সেটা এতই বেড়েছে যে বড় রকমের সংঘাতের অবকাশ আর নেই। গত মহাযুদ্ধে ফোশ, হেগ্, হিন্ডেনবর্গ, লুডেনডর্ফ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষের নাম মুখে মুখে ঘুরতে, এখন কারোর মনেই থাকে না। শুনি এটা যান্ত্রিক যুগেরই ফল। চাষবাসের যুগে একঘেয়েমি ছিল, যদিও ভিন্ন ধরনের। সে যাই হোক, বর্তমানে সংঘাত কমেছে বটে কিন্তু চাপ বেড়েছে। সে-চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত, কিন্তু *সক্রেটিক* পদ্ধতিতে তার বিপক্ষে মাথা তুলে মুখে বিষ ঢালতে কেউ সহজে রাজি নন। প্রধানত নাটকের পরিসর যেটা ওতপ্রোত তার জন্য স্থান হওয়া চাই প্রশস্ত। একদম অসম্ভব বলছি না, কারণ চেখভ-এর চেরি অর্চার্ড প্রভৃতি নাটক সার্থক। সহজসাধ্য নয়ই বলছি। নভেলের কিন্তু ঐ ধরনের সীমা নেই, তাই নভেলে 'চাপ'টা দেখান যায় ভালো। এই হিসেবে হেনরি জেম্‌স বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট। তিনি প্রভাবের আর্টিস্ট, যে-প্রভাব হাওয়ায় থাকে, অজানিতে, অথচ সুনিশ্চিতভাবে অপরের জীবনে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কোণ যায় খসে, সোজা কাঁধ যায় বেঁকে, বাঁকা কাঁধ হয় সোজা, দৃষ্টি হয় উজ্জ্বল। কিংবা ক্ষীণ স্বর হয় মিষ্টি কিংবা রুক্ষ। এই প্রকার সামান্য ও তুচ্ছ পরিবর্তনের সমষ্টিই পরিণতির পরিচয়। হেনরি জেমসে নায়ক-নায়িকার নামই মনে থাকে না, কারণ তাঁদের পরিণতি তীব্র সংঘাতের অভাবে আকস্মিক নয়। এই পদ্ধতিতে পাঠকের আগ্রহ জমে ওঠে স্রোতের অন্তে বই বন্ধ করার পর। ক্ষুদ্র ঘটনাকে বড় নক্‌শার অঙ্গ না ভাবলে জেমসীয় পদ্ধতিকে অবান্তরের ভিড় জমান বলে রূপ ফুটবে তাকে বহু পূর্বে কল্পনার অন্তর্গত করাই শক্ত, বিশেষত যখন এই পদ্ধতিতে লেখকের মনে কোন প্রকার বাঁধাধরা প্ল্যান থাকে না, তার উপর আবার তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক পরিপূর্ণতার যোগ স্থাপন করা— এতটা বুদ্ধিসাধনার প্রয়োজন বোধ হয় অন্য কোন রচনা-পদ্ধতিতে নেই। প্রতি মুহূর্তে লেখক মনকে সতর্ক রাখবেন, নচেৎ সব এলোমেলো হবে— গল্প একটা সময়ের পর নিজের তাগিদে চলতে চায়, তাকে স্বাধীনতাও দিতে হবে, না হলে গতি মন্দা হবে, আবার নাগাল বেশি ছাড়লেও চলবে না, পাগলের খেয়াল হয়ে উঠবে। এই প্রকার নানা বিপদ কাটাবার জন্য একমাত্র মার্জিত সচেতনতাই সাহায্য করতে পারে। অতটা মনঃসংযোগ জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাই এই সব নভেল বুদ্ধিসর্বস্ব, উঁচকপালে দুর্নাম অর্জন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাবধর্মী নভেলই বর্তমান যুগের উপযোগী।

প্রভাব-ধর্মে জাতিভেদ আছে অবশ্য। ডি. এইচ. লরেন্স-এর আঙ্গিক প্রুস্ত-এর আঙ্গিক থেকে পৃথক। লরেন্স-এর মূল ছিল ব্যক্তি। দুজন মানুষ বিশেষত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধের চাপই ছিল তাঁর প্রধান কারবার। *প্রুস্তের* ছিল আবহাওয়া; বড়লোকের বাড়িতে প্রকাণ্ড হলে নাচ গান হচ্ছে, রাস্তার দুধারে গাছের সারি, সেই রাস্তায় দুটি পরিবার পায়চারি করে— এই প্রকার সমবেত প্রভাব কখনও কাটাকাটি হচ্ছে, কখনও বা জুড়ে যাচ্ছে— কিন্তু প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। ফক্‌নারের আঙ্গিক সমগোত্রের না হলেও সমজাতীয় প্রাজনিক উত্তরাধিকার, পারিপার্শ্বিকের শত্রুতা প্রভৃতি অবাস্তব ও প্রশস্ত প্রভাব তাঁর রচনায় গ্রিক নিয়তির কাজ করে। এই সম্পর্কে স্ত্রী সাহিত্যিকের উল্লেখ একান্ত কর্তব্য। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড, ডরথি রিচার্ডসন, ডেলাফিল্ড

প্রভৃতি লেখিকা প্রভাবধর্মী। আমার বিশ্বাস মেয়েদের পক্ষে পূর্বোক্ত আঙ্গিক গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক।

কেবল তর্কনীতির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রভাব-ধর্মের প্রসার আশা করতে পারি। এমন একঘেয়ে জীবন, নাটকীয় সংঘাতের এমন দুর্ভিক্ষ, এমন মেয়েলি স্বভাব, এমন সংকীর্ণতা, এমন অনুকরণপ্রিয়তা আর কোথায় পাব? কিন্তু বাংলাদেশে যা আশা করা যায় তা ফলে না। প্রতিবেশী ঘটনার কিংবা চরিত্রের আবহাওয়া ওতপ্রোতভাবে নভেলের ঘটনা কিংবা চরিত্রকে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে, ও তারই জোরে পরিবর্তিত করছে এমন কোন সার্থক বাংলা দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে নি। চেষ্টা যেন একবার হয়েছিল মনে হয় শৈলজানন্দের হাতে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগ করলেন। তাঁর 'ষোল আনা' কিংবা 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' তখন গৃহীত হল না। বাংলা নভেলের পক্ষে এটা দুঃখের বিষয়। যে-কাজ শৈলজানন্দ পারেন নি সে কাজে আজ মাণিকলাল অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছেন। আজকালকার বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র প্রভাব ও চাপের লেখক। এই ভাবে দেখলে মাণিকলালের কৃতিত্ব ধরা পড়ে, তাঁর দোষেরও স্খালন হয়।

আমি মোটেই বলছি না যে মাণিকলাল পূর্বে যাঁদের নাম করেছি তাঁদের মতন একজন বড় আর্টিস্ট। তাঁর রচনায় অনেক দোষ। হাওয়াতে অনেক পকেট আর গর্ত আছে বলেই প্রভাব-বর্ণনা শিথিল হলে চলে না। লেখকের দুর্বলতা প্রভাবের দুর্বলতা একবস্তু নয়। প্রভাবটা স্ত্রীসুলভ, তাই মাণিকলালের প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-চরিত্রই জীবন্ত, স্ত্রীজাতির মোহটাই প্রহেলিকা, মাণিকলালের স্ত্রী-চরিত্রকে ধরা ছোঁয়া যায় না— কিন্তু সেজন্য সব স্ত্রী-চরিত্রই এক ছাঁচের হবে, এবং প্রহেলিকার বদলে তাঁরা সকলে একটু এলোমেলো, ছিটগ্রস্ত হবেন এমন কিছু কথা নেই। যদি তাই হন তবে বুঝব তাঁদের স্রষ্টার রচনাশক্তিতে না হোক চিন্তাশক্তিতে গলদ আছে।

মাণিকলালের প্রায় সব রচনাই পড়েছি। পড়ে আমার সন্দেহ হয়েছে যে তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর অসমতা ধারণার অক্ষমতা থেকে উৎপন্ন। তিনি প্রকৃত জিনিসটা ধরেছেন, কিন্তু মুঠো তাঁর আলগা হয়ে যায় এইজন্য যে শক্ত মুঠির শিক্ষা তাঁর নেই। এ-যুগের উপযোগী রচনার জন্য অভিজ্ঞতার মূলধন কিংবা ঐশী শক্তিটাই যথেষ্ট নয়। সজ্ঞানতার প্রয়োজন এ-যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মাণিকলালের চৈতন্য মার্জিত নয়— নচেৎ *পদ্মানদীর মাঝি*, '*কুষ্ঠরোগীর বৌ*'-এর মতন লেখায় তাঁর ইউটোপিয়া-প্রীতি সংযত হতো, বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে 'অহিংসা'য়। তাঁর রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে। প্রমাণ? '*কেরানীর বৌ*', 'সহরতলী', 'পুতুলনাচের ইতিবৃত্তে'র একাধিক অংশ, 'টিকটিকি', 'সড়ি'।

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-কৃতির এটিই প্রথম মূল্যায়ন]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগে' বলেছেন 'মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে 'বিচিত্রা'য় চলে এসেছে— পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলেরই' কুলবর্ধন।'

কথাটির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে, সম্পূর্ণ সত্য নেই। 'কল্লোলের' সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততা ও বক্রতার বহিরঙ্গে, আন্তরধর্মে তিনি একেবারেই স্বতন্ত্র।

এবং, একক।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন যে কল্লোলগোত্রীয়দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহের অবসর নেই। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' বাংলাদেশে বুদ্ধিবাদের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল— 'কল্লোলে' তার তরঙ্গ এসেছিল। প্রথম সমরোত্তর জর্জীয় সাহিত্যের নৈরাজ্য যেমন 'কল্লোলীয়দের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু 'কামনার কাপালিক' এই 'মুসাফিরে'র দল— যাঁরা 'নিখিল নারীর দ্বারে' 'নিত্য উন্মাদচঞ্চল' হয়ে ঘুরে বেড়াতেন— আসলে চরিত্র-ধর্মের দিক থেকে ছিলেন পুরোপুরি রোমান্টিক। সেই রোমান্টিকতার তাড়নাতেই তাঁরা দুঃখ বিলাসের চড়া সুরে তার বেঁধেছিলেন। হাকস্লির উপন্যাস কিংবা বোদ্‌লেয়ারের কবিতা থেকে তাঁরা যা কিছু প্রসাধনকলাই আহরণ করুন না কেন— বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে বিশেষভাবে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। এ ধারা 'কল্লোল'-এর নয়। পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর ওপর কখনো পড়ে থাকে, তা হলে দুজনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত, অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মনোবিকলনের জটিলতার মধ্য দিয়ে জীবনরহস্য সন্ধানের পথিকৃৎ জগদীশ গুপ্ত। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা— এ দুইয়ের মাঝখানে জগদীশ গুপ্ত অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে মনোলোকের গহনে নিঃসঙ্গ যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। কথন-কৌশলের দুর্বলতায় তাঁর গল্পগুলো সব সময়ে মহিমামণ্ডিত হয়নি— কিন্তু তা হলেও তিনি এক নতুন সম্ভাবনার আগল খুলে দিয়েছিলেন। আর কল্লোলপন্থী হয়েও শৈলজানন্দ বাংলা গল্পের ভৌগোলিক এবং মানবিক সীমান্তরেখাকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এনেছিলেন কয়লাকুঠির মানুষদের— আদিম মানুষদের, এনেছিলেন তাদের বিষ মাখানো 'কাঁড় বাঁশকে' আর এনেছিলেন তাদের উগ্র অমার্জিত কামনাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বিষয়বস্তুও দুটি ভাগে প্রধানত বিভক্ত। এর একদিকে আদিম মানুষের রক্তনালীতে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার— অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মনের সরীসৃপ কুটিলতা। আমার মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে— অন্তত প্রথম পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুটি গল্প দিয়েই চিহ্নিত করা যায়— একটি *প্রাগৈতিহাসিক* আর একটি *সরীসৃপ*।

মধ্যবিত্তের মধ্যগত যে অন্তঃসারশূন্যতা ও গ্লানি— তার সম্পর্কে কল্লোলীয় লেখকদেরও কোনো মোহ ছিল না। তাঁরাও একে যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন— এর মর্মনিহিত সমস্ত অসারতা আর আত্মবঞ্চনাকে আঘাত করেছিলেন নানাভাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমারের গল্পে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু তা হলেও তাঁদের মধ্যে যে পরিমাণে আত্মধিক্কার ছিল, সে পরিমাণে আত্ম-সমালোচনা ছিল না। এই আত্মনিরীক্ষার জন্যে যে নিরাসক্তি অপরিহার্য— তা তাঁদের পক্ষে আয়ত্ত করা সেদিন সম্ভব হয়নি। তাই 'পুন্নাম' কিংবা 'দুইবার রাজা'য় লেখকের বেদনার্ত ব্যক্তির উপস্থিত— তাঁদের সাহিত্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা নির্মোহ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন বাইরে থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় একজন ইউরোপীয় যেন আচ্ছন্নতাবর্জিত বুলির আলোকে আমাদের সমাজ-জীবনকে বিশ্লেষণ করছে— আর সেই বিশ্লেষণের মধ্যে সবসময়েই একটা বক্রতা সজাগ হয়ে আছে। অথবা এ উপমাও ঠিক হল না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় : একজন আদিম মানুষ যেন নিরঞ্জন দৃষ্টিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজকে দেখে নিচ্ছে, তার ওপরের সমস্ত বর্ণ-প্রলেপের নেপথ্যে যে ভণ্ডামি, স্বার্থবাদ আর কূটকামনার সর্পিল প্রবাহ বইছে— তার কিছুই তার চোখকে এড়িয়ে যায়নি।

এই জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে এমন অসাধারণ নির্মম। যে নির্মমতার তুলনা নেই 'আততায়ী' গল্পে, যখন বন্ধুর চোখকে অন্ধ করে দিয়ে অপর বন্ধু তার স্ত্রীকে আয়ত্ত করে, কিংবা অন্যত্র, তখন দুস্থ ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে না পেরে বাড়িওলা তার পাওয়া মিটিয়ে নেয় তাদের খোঁড়া মেয়েটির সঙ্গে ব্যভিচার করে, তখন তার বিষজ্বালায় আমরা পুড়ে খাক হয়ে যাই। আমাদের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য 'কুষ্ঠ রোগীর বউ'— এ সত্য চাবুকের মতো আমাদের পিঠে এসে পড়ে। 'ধরা-বাধা জীবনে' আমাদের জীবনকেই দেখতে পাই। *দর্পণে* আমরাই নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোথাও যদি পক্ষপাত থেকে থাকে— তা হলে তার অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে আদিম মানুষ সম্পর্কেই। ইংরেজি সাহিত্যে লরেন্সও একদিন এভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পে কিংবা *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে এই আদিম মানুষকেই তিনি প্রীতি নিবেদন করেছেন। তাই ডাকাত ভিখুর ডান হাতটা বল্লমের ঘায়ে শুকিয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে অপরাজিত। *সরীসৃপের* বনমালী একটা বীভৎস অবক্ষয়ের মূর্তি— প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মধ্য দিয়েও 'ভিখু' পাঁচীকে নিয়ে জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। রাজকুমারের মতো মধ্যবিত্ত নায়কের কোনো পরিণতি নেই— কিন্তু হোসেন মিঞার উপনিবেশ কুবের আর কপিলা আর একটা অনিশ্চিত অথচ অপূর্ব জীবনের দিকে যাত্রা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্যবাদের দিকে পদক্ষেপ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে আকস্মিক বলে মনে হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনাতেই তার সংকেত ছিল। মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদের কোনো মোহ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে অপজাত এই গোষ্ঠীটি যে ঐতিহাসিক নিয়মেই আত্মবিরোধে জর্জরিত হবে এবং ক্রমে ক্রমে অনিবার্য অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হবে— এই সত্যটি গ্রহণ করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব বেশি সময় লাগেনি। স্বাভাবিক প্রবণতায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে যে বিদ্বেষ এবং বিরূপতা তিনি লালন করেছিলেন, মার্কসবাদ তাকে যুক্তি ও বুদ্ধিগত সমর্থন দিয়েছিল। আর এই মধ্যবিত্তের সম্বন্ধসূত্রে ধনতন্ত্রের স্বরূপটিকেও তিনি যে ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন— তার স্বাক্ষর এর আগেই ফুটে উঠেছিল তাঁর *সহরতলী* উপন্যাসে— সত্যপ্রিয় আর জ্যোতির্ময়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল— তার পেছনে পূর্বসূচিত একটা মনোভঙ্গি এবং একটি সুনিশ্চিত বিবর্তনের ধারা ছিল। তাঁর 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে এই সন্ধিক্ষণটি চিহ্নিত রয়েছে। এর পরেই সাম্যবাদের নিশ্চিত প্রতীতির মধ্যে নেমে আসতে তাঁর পক্ষে আর বাধা ছিল না।

আমরা বলেছি, আদিম ও বলিষ্ঠ মানুষের শক্তি সম্বন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পক্ষপাত এবং সগোত্র-চেতনা ছিল। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সহজাত অবিশ্বাস আর 'মাটি ঘেঁষা মানুষের' দিকে এই প্রবণতা তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে নিয়ে এসেছে। তাই ভিখু আর কুবেরের দলকে তিনি নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলতে পেরেছেন। মার্কসীয় মতবাদের সহযোগে তিনি প্রাগৈতিহাসিক জীবন-সংগ্রামকে আরও 'বৃহত্তর-মহত্তর' সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসাতে সক্ষম হয়েছেন। আদিম সারল্যকে তিনি অগ্রসর করে দিয়েছেন *হারানের নাতজামাই* গল্পে, নতুন মহিমায় মাথা তুলেছে *রাঘব মালাকার*— কুবের কপিলা সুন্দরবনের অনির্দেশ দ্বীপকে পেছনে ফেলে যাত্রা করেছে *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* হয়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বে যখন তিনি সাম্যবাদী ভাবধারাকে অনুসরণ করেছেন, তখনও মধ্যবিত্তমূলক তাঁর কাহিনীগুলি অপেক্ষাকৃত দীপ্তিহীন। তাদের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারার প্রয়োগ আছে, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির চিহ্ন আছে, কিন্তু তবুও মনে হয়, তারা যেন ফর্মুলা-অনুযায়ী তৈরি হয়েছে; প্রাণের উত্তাপও তাদের মধ্যে তেমনভাবে অনুভব করা যায় না— কেমন নীরক্ত, কেমন বর্ণহীন। মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে তাঁর মানসিক অপ্রীতি গোত্রান্তরের মধ্য দিয়েও অপসৃত হয়নি; এই কৃত্রিম ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠিকে তিনি সহানুভূতি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, তাঁর সংগ্রামী চেতনাকে আবিষ্কার করতেও প্রয়াস পেয়েছেন— তা সত্ত্বেও এই সমাজ তাঁর বুদ্ধির অনুমোদনই পেয়েছে; কিন্তু হৃদয়গত মমত্বে স্নিগ্ধ হতে পারেনি।

সেই মমত্বে সার্থক হয়েছে, "কংক্রিটের'র রঘু— সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্তের বেশি যেটি লুকিয়ে রাখবার কথা" যে 'ভাবতেও পারে না।' সেই গভীর প্রীতি আর স্বজনত্ববোধে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে 'শিল্পী' মদন :

"চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে বাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে-"

আর এই কারণেই তাঁর 'পেশার' চাইতে ঢের বেশি সার্থক হয়েছে *হলুদ নদী সবুজ বন*। প্রাগৈতিহাসিক শক্তির সন্ধানী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শক্তির অপরিমিত সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন। *চাষীর মেয়ে* তারই সোনালি ফসল বয়ে আনছিল।

কিন্তু ফসল তোলা শেষ হল না। তার আগেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে চলে গেলেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়কেই আমরা পেলাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই তাঁকে চিরদিনের মতো থেমে যেতে হল।

এ ক্ষোভ আর ক্ষতি কোনোদিনই ভোলবার নয়।

'পরিচয়' ॥ পৌষ ১৩৬৩
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' ও উত্তরণ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

চিহ্ন পড়ে মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। কলাকৌশল যে তাঁর পরীক্ষার বিশ্রাম নেই, তার প্রমাণ *চিহ্ন*। এই সিনেমাশোভন বহু ব্যক্তির জীবনে অবলম্বিত একটি কাহিনী এই রকম সামাজিক রূপ পায়নি ভার্জিনিয়া উলফে, বা হেনরি গ্রিনের চলন্ত গল্পে। তার কারণ অবশ্যই মানিকবাবুর সামাজিক অবহিতি এবং বাস্তব ঘটনার সুযোগ। বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টিতে কলকাতার একটি স্মরণীয় রূপ মূর্তি পেল কলকাতার কয়েকটি মানুষের জীবনের প্রবল আন্দোলনে, স্থির সমকোণ নয়, ঘূর্ণায়মান চক্রে প্রগতিতে। যার সূত্রপাত অক্ষয় চরিত্রে। এমনি সততা মানিকবাবুর শিল্পীমনের, এমনি পরিমিত তাঁর রোমান্টিক আবেগ যে তাঁর দরদ স্বভাবতই পড়ে এই চরিত্রে, তার মানবিক পরিবর্তনে। সে পরিবর্তনে যে চূড়ান্ত ক্রান্তির চিহ্ন নেই, সেই তাঁর সামাজিক সততার প্রমাণ। ফেব্রুয়ারি-জুলাই-মে-আগস্টে, সেই বর্ষভোগ্য আগস্টই তো মুক্তি পায় আরেক আগস্টে চোদ্দই পনেরোই অদ্ভুত আনন্দের চিহ্নে।" বিষ্ণু দে, ১৩৫৪। *চিহ্ন* উপন্যাসের লেখকের কথায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা। ... এ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।' 'টেকনিক' শব্দটির গুরুত্ব আধুনিক উপন্যাস আলোচনায় কেবল নানামাত্রিক এক কলাকৌশল নয়। উপন্যাসের বিষয় বা অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা, Mark Schorer যাকে বলেন অ্যাচিভ্‌ড্‌কনটেন্ট— এর পার্থক্যই টেকনিক। টেকনিক-এর মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয়কে আবিষ্কার-উদ্ঘাটন-বিকশিত করেন। টেকনিক তার অর্থকে বহন করে, আবার মূল্যায়নও করে। ঔপন্যাসিকের বোধ ও সচেতনতাই বিশেষ উপন্যাসে বিশেষ টেকনিককে গ্রহণীয় করে তোলে, আবিষ্কার ও উদ্ঘাটন এই টেকনিকেই গভীরতর ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে, এ বোধের যথার্থই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের গঠন ও সংযুতিকে অনিবার্য করে তোলেন। যে লেখক তাঁর বিষয়ের টেকনিকগত বিশ্লেষণ যত সঠিকভাবে করবেন, ততই তাঁর উপন্যাস সর্বাপেক্ষা অর্থবহ বিষয়ের জন্ম দেবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকের কথা থেকে বোঝা যায়, এই বিশ্লেষণে তিনি সচেতন ছিলেন— চিহ্ন-র টেকনিকই তাঁর আঁকাড়া অভিজ্ঞতাকে অর্জিত অভিজ্ঞতায় পরিণত করে অনন্য শিল্পকাঠামোর জন্ম দেয়।

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসে *চিহ্ন* প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা উপন্যাসে ইতোমধ্যে বাস্তববাদী পরম্পরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের হাতে এর বাইরের ধারারও জন্ম হয়েছে, তবে প্রভাবশালী হয় নি। ন্যারেটিভের যে পরস্পরবিরোধী পদ্ধতির কথা রবার্ট স্কোলস ও কেলগ তাঁদের *দি নেচার অব ন্যারেটিভ* (১৯৬৬)-এ বলেন তার দৃষ্টান্ত পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাওয়া যায়, অন্য কারো কারো লেখাতেও বিচ্ছিন্নভাবে আছে। এম্পিরিক্যাল পদ্ধতিতে প্রাথমিত আনুগত্য থাকে রিয়্যাল বা বাস্তবের কাছে, ফিক্‌শন্যাল-এ আইডিয়াল বা আদর্শের প্রতি। প্রথমটির মাইমেসিস-এ বাস্ত

বমুখী অনুকৃতি থাকে— অভিজ্ঞতার প্রতি সত্য থাকার চেষ্টা থাকে। দ্বিতীয়টির অন্তর্গত রোমান্স, *অ্যালিগরি* : অ্যালিগরির কাঠামোয় একটা "উপদেশ-এর প্রচ্ছন্ন ছোঁয়া লাগবেই। এই দুই পদ্ধতির সমন্বয় আঠারো শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসে ঘটেছিল, কিন্তু বিশ শতকে, বিশেষত চলচ্চিত্রের আবির্ভাবে এই সমন্বয় ভেঙে যায়। বাস্তবমুখীনতার অপসারণ ঘটে— সাধারণ ফেনোমেনাল জগতের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাহিত্যগত বাস্তববাদের উদ্দেশ্য তা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে, মনোবিদ্যার বিকাশের ফলেও এটা ঘটে। পুরাণ, স্বপ্ন, প্রতীক প্রত্নপ্রতিমার ব্যবহারে এম্পিরিক্যাল পদ্ধতির জায়গায় ফিকশন্যাল পদ্ধতি প্রাধান্য পায়। *চিহ্ন* উপন্যাসটির অনুধাবনে আধুনিক উপন্যাসের এই বিকাশ-বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি মনে রাখা দরকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত বাস্তববাদের পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। ঘটনার, ফেনোমেনলা জগতের, বর্ণনা অপেক্ষা, বিভিন্ন চরিত্রের আন্তর-দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের গঠনটিই তাঁর ন্যারেটিভের বিষয়। অ্যালিগরির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, প্রতীকের ব্যবহার উপন্যাসে : শোভাযাত্রা ও তার অবস্থানটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রতীক। চলচ্চিত্রের পদ্ধতি সচেতনভাবে অনুসৃত। কিন্তু বাস্তববাদকে, সাধারণ ঘটনার জগৎকে মানিক বাতিল করতে পারেন না। নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস ইত্যাদির যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, তাকেই তিনি ধরতে চাইলেন উপন্যাসের অর্জিত অভিজ্ঞতায়, হয়তো ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি-তে ছাত্রদের অবস্থানের ওপর পুলিশের গুলি চালনার বাস্তব ঘটনাই তাঁর এ উপন্যাসের অব্যবহিত পটভূমি। এর সঙ্গে তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যুক্ত থাকতে পারে। হ্যারি লেভিন বলেছিলেন, বাস্তববাদী উপন্যাসের ইতিহাস দেখায় ফিকশন আত্মজীবনীর দিকে ঝোঁকে। ঔপন্যাসিকের কাছে যে ক্রমবর্ধমান মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অনুপুঙ্খের দাবি করা হয়, তাকে ঔপন্যাসিককে নিজ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতেই হয়। 'চিহ্ন'-তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের কাঠামোয় অর্জিত অভিজ্ঞতা করে তোলেন বাস্তববাদকে বাতিল না করে, তবে এম্পিরিক্যাল ও ফিকশনাল, দুই পদ্ধতিরই সমন্বয় ঘটান, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন চরিত্রাবলীর কোলাজে অনেক অ্যালিগরির আভাস, স্পষ্ট উপদেশ একটি থাকে। আবার শোভাযাত্রা-অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করেন তাঁর বিষয়কে— যে দ্বান্দ্বিক বীক্ষা মানিক জীবনে অর্জন করেন, তাতেই ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, এম্পিরিক্যাল ও ফিকশনাল, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মেশে। এ ঠিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নয়, এ যেন সার্ত্র-কথিত সমাজতান্ত্রিক রোমান্টিসিজম। ব্যক্তিগত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সীমা অতিক্রম করে, চরিত্রগুলো যে একটি অভীপ্সার দিকে নিজ নিজ ন্যায়ে অগ্রসর হয়, তাতে ধরা থাকে তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্ন। এই স্বপ্নের জোরেই অবস্থান এক জায়গায়-স্থাণু থাকে না— এগোয়। মানিক যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরকে, উপাদানকে একটি অবস্থানের সূত্রে গ্রথিত করেন, তাতে এই অর্জিত অভিজ্ঞতাটি একটি বিশেষ শিল্পকাঠামোর সৃষ্টি করে, যা একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক, বাস্তববাদী ও রোমান্টিক। উপন্যাসের এই নবনিরীক্ষায় বাস্তববাদের এই নতুন মাত্রায়, মানিক অবচেতনে ডুব দেন না, প্রত্যক্ষগত ন্যারেটিভ বিপর্যস্ত করেন না বা চৈতন্যের স্রোতে ভাসেন না, যদিও অবচেতন ন্যারেটিভ সরল ঐকরৈখিকতা ত্যাগ— এমনকি চৈতন্যের স্রোতের উপাদান, সবই তিনি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করেন। এযেন ব্রেখ্‌ট্ যেমন বলেছিলেন, বুর্জোয়া পদ্ধতি কলাকৌশলকে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা। মনে রাখা প্রয়োজন, *চিহ্ন*র পর দুখানি উপন্যাস আদায়ের ইতিহাস ও চতুষ্কোণ মার্কসবাদী পর্বের প্রায় মধ্যগগনে, এই দুটি উপন্যাস

লিখে মানিক প্রমাণ করেছিলেন, যান্ত্রিক বা ভালগার মার্কসবাদে তাঁর আস্থা নেই। চিহ্ন-র সাহসিক নিরীক্ষাতেও এই যথার্থ দ্বান্দ্বিকতা স্পষ্ট— তাঁর বীক্ষা তাঁকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে গিয়েছিল যে মধ্যবিত্ত সত্তা বিপর্যস্ত, ভবিষ্যৎহীন, নানা কানাগলিতে বদ্ধ। শ্রমনির্ভর সাধারণ মানুষের হাতেই ইতিহাস। সে-কারণেই ত্রিষ্টুপ-রাজকুমারের ব্যবচ্ছেদ, চিহ্ন-তেও সমাজের এ শ্রেণীর চরিত্র আছে, তবে এখানে অক্ষয় ও হেমন্তর চিত্রকল্পে অন্যমাত্রা আসে : এ স্তরের মধ্যেও বেরিয়ে আসার একটা আকাঙ্ক্ষা যে আছে তার পরিচয় তিনি দেন। আসলে চিহ্ন একটি উত্তরণের উপন্যাস— ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয়দিক থেকেই উত্তরণের স্বপ্ন ও উপন্যাসের শিল্প-বাস্তবে প্রত্যক্ষ। ১৯৪০-এর দশকে এই উত্তরণের প্রচেষ্টার চিহ্ন বাইরের রাজনীতি ও সমাজে ছিল, মানিক সেই চিহ্নকে শিল্প-রূপে বেঁধে নেন; অর্জিত অভিজ্ঞতার কাঠামোয় এই উত্তরণ সত্য ও বাস্তব হয়ে ওঠে। কিন্তু এ উত্তরণ ১৯৪৭-এর পর থেকেই ক্রমশ শিথিল হতে থাকে— মানিক চেষ্টা করেন উপন্যাসের বাস্তবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের, উত্তরণের স্বপ্নকে জীইয়ে রাখতে— যেমন *ছন্দপতন* (১৯৫১), কিন্তু *সোনার চেয়ে দামী*তে 'আপোষ'ই বড় হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য লড়াই, প্রতিকূল পরিস্থিতি ছাপিয়ে বাঁচবার স্বপ্নটি মানিকের উপন্যাসে থেকেই যায়— পুতুল নাচের ইতিকথার ট্র্যাজিক-বিষণ্নতা ও পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিয়া-তাড়িত মানুষগুলোর পাশে এই লড়াই, এই স্বপ্ন মানিকেরও উত্তরণ।

চিহ্ন উপন্যাসটির শুরুতে দেখি, "প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের। বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ব্যাপার, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবটাই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনিভাবে চেতনাকে তার গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে।" "হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীরস্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না।" বিপুল অবস্থানটির প্রতীকী যাথার্থ এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়— সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে— এই বাক্যে অবস্থানটির তীব্র ধাক্কা জীবনে ও চৈতন্যে কেমন হয়, গণেশের মত সাধারণ মানুষের চিত্রকল্পে ধরা হয়। অভূতপূর্ব এই অবস্থান উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু ও রূপান্তরের প্রতীকী মাধ্যম। দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ অনুচ্ছেদে আসে নদী-সমুদ্রের উপমা— আহত গণেশ তখন মৃত্যুর সমুদ্রের সামনে। "এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? ... এই দিনে ভাটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমির রোদ পোহায়। দেখে মনে হয়, কত যেন নিরীহ ভালোমানুষ জীব। অল্প জলে হঠাৎ তীরের মতো কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্বা রেখায় কেটে হাঙর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত অদ্ভুত রকমের মাছ। ... আহা দুঃখী নদী গো, কুমির মাছ মিলে কত জীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে বাঁয়ে যত দূর তাকাও তত দূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনি আসবে প্রাণের জোয়ার।" "সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে শহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল

ফুটপাথে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।" এই দীর্ঘ চিত্রকল্পে উপন্যাসের মূল থিমটি প্রতিষ্ঠিত। শিবঠাকুরের প্রলয় নাচনের সূত্রেই রূপান্তরের চরিত্রটি স্পষ্ট। ভাটার নদীর মতই প্রাত্যহিক জীবন— মাছ হাঙ্গর কুমির থাকে। জীবনের স্পন্দনহীন অস্তিত্ব নিয়ে হেমন্ত অক্ষয় সকলের জীবনেই সাদা ফেনার মুকুট পরে এল কালো চুলের ঢেউ। মৃত্যুর ঠিক আগে এই অবস্থানের গতিহীন গর্জনের সামনে গণেশের প্রশ্ন : "এরা এগোবে না বাবু?" এই প্রশ্নটিই যেন উপন্যাসের থিম-মিউজিক। এই প্রশ্নটির সূত্রেই উপন্যাসটির কাঠামোটি চরিত্রাবলী সংহত হয়েছে, নানাভাবে ছড়িয়ে থাকা অক্ষয়-হেমন্ত-রসুল-ওসমান, সীতা-অনুরূপারা সংলগ্ন হয়েছে— সকলেরই জীবননাট্যের প্রশ্ন : এগোবে কি? উপন্যাসের শেষে দেখি, গণেশের বাবা-মা-বোনকে পথ দেখাতে লালদীঘির বিরাট শোভাযাত্রা ও লোকারণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে অজয় নিজের মনে বলে, "আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি আমরা এগিয়েছি।" গণেশের প্রশ্ন ও শেষের এই ঘোষণার মধ্যবর্তী স্তর উপন্যাসটির প্রক্রিয়া। গণেশের নদী-জোয়ার-শিবঠাকুর-সমুদ্রের উপমা মনে হয়েছিল গতিহীন গর্জনে, অবস্থানে : আর শোভাযাত্রার সচলতায়, অবস্থানের গণ্ডি পেরিয়ে অগ্রগতির আরেক উত্তরণে, হাজার কণ্ঠের ধ্বনিকে মৃত গণেশের বাবা যাদবের মনে হচ্ছে, "বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।"

গণেশকে হাসপাতালে দিয়েছিল, ওসমান— যে বিশুদ্ধ শ্রমিক, গণেশের বাবু সম্বোধনকে সে ঘৃণ্য মনে করে। এর পরই মানিক আনেন হেমন্তকে— মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধায় যে দীর্ণ : "সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাই নি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল?" ছাত্র-জীবনে রাজনীতির স্থল নেই— এই সিদ্ধান্ত থেকে সে ঐ অবস্থানের স্পর্শে রূপান্তরের সম্মুখীন হয়। "প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি, আশে-পাশের ছাড়া ছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলো, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি একটা অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে।" একদিকে মা, অন্যদিকে সীতা— কষ্ট করে মা হেমন্ত-জয়ন্তকে, তাদের বোনকে বড় করছে, তিনি চান নিরুপদ্রব হেমন্ত চাকরি করুক, ভালো উপার্জন করুক, কষ্ট ঘোচাক, সীতা উল্টো পথের। এরপরই আসে নারায়ণ ও রজত। ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টার পর ঘোড়াসওয়াররা ফিরে গেছে। ঘোড়াগুলোর পেশির সঞ্চালনে মুগ্ধ পনেরো বছরের ছেলেটি। যুবকটি পরিস্থিতি বুঝতে চায়। ঘোড়সওয়ারের আঘাতে আহত ছেলে দেখে যুবকটি ক্রোধে জ্বলে ওঠে : খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কিশোর রজত অনেক পরিণত : "আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা।" রজত আহত ছেলেটিকে নিয়ে কবিতা লিখতে চায়। গণেশ-ওসমান ও নারায়ণ-রজতের মাঝখানে হেমন্তের প্রসঙ্গটি রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হেমন্তর দ্বিধা উত্তরণের বাস্তব-ভূমি তৈরি করেন। সব স্থানের প্রতীকী স্পর্শের পাশাপাশি এই দুটি না থাকলে এম্পিরিক্যাল পদ্ধতিটি আকস্মিক বাতিল হত।

এরপরই আসে রসুলের প্রসঙ্গ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থানটিকে কেন্দ্র করে সমাজেরই একটি মিনিয়েচার নির্মাণ করেন— প্রায় সব শ্রেণী ও স্তরই উপন্যাসটির কাঠামোয় অঙ্গীভূত হয়। আধুনিক বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের শ্রেণীগত শোষণ, অত্যাচার, কালোবাজারী কুৎসিত ব্যবসা যেমন আসে, তেমনি আসে মানুষের লড়াই, আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম। অবস্থানের সামনে বসে "আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠিচার্জ হবে।" তার মনে পড়ে "দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে

ফিরে গিয়েছিল, কয়েক জনকেও যদি বাঁচাতে পারে।" হিন্দু জমিদার বাধা দেয় রিলিফ সেন্টার খুলতে। খিচুড়ি বিতরণের আগের দিন সভায় লালপাগড়ির লাঠির ঘায় তার কপাল ফাঁক হয়। "গাঁয়ের শতকরা আশিজন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দিন— শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর। লালপাগড়ির "সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।" আজ "উত্তেজনা ও শৃঙ্খলার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রসুলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলো, কিন্তু মাথাগুলো ঠাণ্ডা আছে।" "ছাত্রদের শৃংখলা ও সংযত চাল-চলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।" "রসুলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রসুল ও আবদুলদের আঁকেন দৃঢ় বিশ্বাসে উজ্জ্বল, গভীর বোধসমন্বিত করে। আবদুল ও রসুল জানে, তারা একা নয়। আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগা-ভাগি হয়ে যাবে। লাঠিচার্জ হয়, গুলি চলে। রসুলের ডানহাতে গুলি লাগে— কিন্তু সে নিরুদ্বিগ্ন।

এরপর আসে অক্ষয়ের প্রসঙ্গ। রসুল-আবদুলের পর অক্ষয়ের প্রসঙ্গ আসাতে স্পষ্ট হয়, মানিকের উপন্যাসের স্ট্রাকচারটি। মদ না খাওয়ার তার সিদ্ধান্ত ও তা নিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই ঘটে অবস্থানটির পটভূমিকায়। বারের সামনে গিয়েও সে ফিরে আসে, অপ্রতিরোধ্য টানে সে ওই নীরব সমুদ্রের দিকে যায়— "ওরা কি করছে একবার দেখতে হবে।" অক্ষয়ের পর আসে অমৃত মজুমদার, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে নেতা হতে চায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী প্ররোচনা দেয়। এর পাশাপাশি আসে অজয় যে "এখন চাকুরে, কেরানি, মাসকাবারী চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ— হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরনো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে আছে জীবন তার চিরদিনের জন্য।" এই সমুদ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে মানিক তাঁর চরিত্রদের, যারা আবার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে টাইপও বটে, তাদের আত্মসমীক্ষায়, বিশ্লেষণে ঠেলে দেন। অজয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। মানিক এর পর ক্ষণেকের জন্য চলে যান কলকাতা থেকে মধুখালিতে। গণেশের বাবা-মা-বোনের কাছে। বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করার প্রতিশোধ নেয় গাঁয়ের মানুষ— তারা তাই পালিয়ে যেতে চায় কলকাতায় গণেশের কাছে : "ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগারখাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিন দিন, সেই হাঙ্গামার সুযোগেই সাঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে টেনে নিয়ে যায়। কলকাতার অবস্থানের তাৎপর্যটি যে কেবল কলকাতা-কেন্দ্রিক নয়, এটা বোঝাতেই রসুলের অতীত স্মৃতি, মধুখালির ঘটনা আসে। গণেশের প্রশ্ন, এরা এগোবে কি— নিখিল মানুষের প্রশ্ন : সমাজ যখন বদ্ধ খাঁচার মত, বৈষম্য-শোষণ-অত্যাচার-তাড়িত তখন এই জিজ্ঞাসা এই প্রশ্ন আসে। গণেশের খোঁজে ওসমানের হাসপাতালে আসা প্রতীকী— ১৯৪৬-এর পর এই উত্তরণ, এই মানবিক আবেগ দেখায় মানিক স্বাধীনতা আন্দোলনের আলো-আঁধারিতে খোঁজেন কাকে, কোন সমাধানকে। শিবনাথের ইমেজে মানিক যথার্থ রাজনীতিককে আনতে চান— সব সহজ-কঠিন কাজই সে করে, বক্তৃতা দেওয়া থেকে চিঠি পৌঁছে দেওয়া; "ওখানে ওই গুরুতর পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে, তারপর আর দরকার না থাকায় কাজ পালটে দায়িত্ব নিয়েছে রসুলকে

হাসপাতালে পৌঁছে দেবার। রসুল-ওসমান-শিবনাথ সেই মানুষ, যাদের হাতেই আসলে এই ভুবনের ভার।

হেমন্ত-মা অনুরূপা-সীতা— অনুরূপা-সীতার মুখোমুখি হওয়া এবং আমিনা-রসুলের প্রসঙ্গ দুটি মানিক পরপর আনেন যেন অনুরূপা ও আমিনার বৈপরীত্যটিই ধরে দেবার জন্য। অনুরূপার পরিস্থিতি বাস্তব, তার জীবনচরণের সামায় যুক্তিপূর্ণও। কিন্তু মানিক মধ্যবিত্ত যুক্তির অস্তিত্বের সীমাটাই দেখান। সীতার সামনে অনুরূপাকে প্রায় নগ্ন করে দেন। এর পাশাপাশি পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে নিশ্চিত জেনেও, হাসপাতাল থেকে গুলিবিদ্ধ ডান হাত নিয়ে রসুলের বাড়ি চলে আসার যে আবেগ, মা আমিনাকে বলা, "তোমায় দেখতে কেমন করতে লাগল মনটা", অন্যচিত্র নিয়ে আসে— অনুরূপা-সীতার দুঃসহ কথাকাটাকাটি, পাশে এই স্নিগ্ধতা আলো ছড়ায়। অথচ অবাস্তব বীর, একরঙা চরিত্র কখনোই সৃষ্টি করেন না মানিক। "ঘুমন্ত শহরের শেষ রাত্রির স্তব্ধতা যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে আমিনার কাছে : তোর কি শুধু একটি ছেলে? ... অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে।" আমিনা-রসুলের এই সাক্ষাৎকারের পরই মানিক আনেন অক্ষয়-সুধা— মদ না খেয়ে অক্ষয়ের বাড়ি ফেরা ও সুধার বিশ্বাস করতে না চাওয়া। অক্ষয়ের অনেকদিন পরে এমন সাদাসিধে সহজ কথা সাদাসিধে সহজভাবে ভাবতে বড় ভালো লাগে। সুধার কাছে মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার পটভূমি হাজার হাজার মানুষের অনিদ্র রাস্তায় জেগে থাকা। চিহ্ন উপন্যাসে প্রায় সকলেই ঐ শোভাযাত্রা অবস্থা, লাঠিচার্জ-গুলির সংলগ্নে আলোড়িত, নিজের নিজের জীবনের সীমা ছাড়াতে উদ্যত : ব্যতিক্রম বিদ্যুৎ লিমিটেডের দাশগুপ্ত— মানিক এই কুৎসিত ব্যবসা, চোরাচালান ইত্যাদির প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যান, গণেশ দাসগুপ্তরই চোরামাল পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল : তারপর ঐ সমুদ্রের জোয়ারের সামনের অভিজ্ঞতা। অনন্য এই অভিজ্ঞতায় নিজের অজান্তে যে চোরামাল সরবরাহকারী তার উত্তরণ গুলিবিদ্ধ হওয়া, মূল প্রশ্ন তোলা, "এরা এগোবে না বাবু?" দোল খায় তার নদী-জোয়ারের সমস্ত স্মৃতি। দাশগুপ্ত গণেশ সম্পর্কে ভাবিত নয়, ভাবিত মাল সম্পর্কে, সে ফেঁসে না যায় সে সম্পর্কে দাশগুপ্ত ও তার সাকরেদ চন্দ্রর পরস্পরকে খেলানোর চিত্রটিতে মানিক ধরেন আর এক দিক। এরপরই আর এক বিতর্কের প্রসঙ্গ আসে : ওসমান-রেজ্জাক-হানিফের। ছাত্রদের অবস্থান এই বস্তিবাসী শ্রমিকরা যোগ দেয়, তারা কি করবে? রেলগাড়ি বন্ধ করবে? "চলো যাই সব। আজ হাঙ্গামা হবে ভীষণ। মোরা চুপ করে থাকব?" লক্ষণীয়, মানিক এদের এই সিদ্ধান্তকে নিজেদের চৈতন্য-সৃষ্ট করেই দেখান। দোকানপাট ভাঙা, আবার এসব করলে গুণ্ডাদের সুবিধা হবে— এই তর্কেও তাই। এদের মধ্যেও গুণ্ডা আছে। এরই মধ্যে ওসমান, আমিনার কাছে তার মেয়েকে রসুলের স্ত্রী হিসাবে নেবার প্রস্তাব দেয়। "আমিনা জানে ওসমানের ছেলের হারানোর ইতিহাস।" সে ছেলে হাসপাতালের মারা যায়, মৃত্যুর তিনদিন আগে সে বাপের কাছে মাপ চেয়েছিল। "এস.ডি. ওর গাড়িতে চেপে আমাদের ফেলে খান বাহাদুর পালালেন, গাড়ির পেছনের চাকা আমার ডান পা পিষে দিয়ে গেল, সেজন্য দোষ দিই না। প্রজাদের মারতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তা কি জানতাম? আজ এসে প্রজাদের ক'জনের নাম করে বললেন কি, ওরা আমাদের মেরেছে বলতে হবে। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। প্রজারা কেউ আমাদের মারেনি। যাদের নাম করলেন, আমি জানি তারা ভিনগাঁয়ে কিষান-সভা করছিলেন। তোমার কথাই ঠিক হল। এবার বেরিয়ে তোমার কথা, জিয়াউদ্দিন সাহেবের কথা শুনব, তলিয়ে বুঝব, তবে কিছু করব।" মানিক কাট

করে চলে আসেন হাসপাতালে, তারপরই হেমন্ত-অনুরূপায়। হেমন্ত রূপান্তরিত, অনুরূপার দৃঢ়তা-বাধা দুর্বল : হেমন্তর ভাই জয়ন্ত কোথায়? উদ্বিগ্ন তিনি। সৈন্যবোঝাই গাড়ির সামনে কমান্ডারের মত জয়ন্ত বন্ধুদের সামনে চিৎকার করে ইনক্লাব জিন্দাবাদ! জয়হিন্দ্! বন্দে মাতরম্। গুলিতে তার দেহ লুটিয়ে পড়ে, নিষ্প্রাণ। অনুরূপা ছেলের খোঁজে। এভাবেই হেমন্তদের উত্তরণ ঘটে। উপন্যাসও সমাপ্তির দিকে : নিম্নমধ্যবিত্ত অভিমানক্ষুব্ধ পরিবারের নাটক অজয়দের পরিবারে। ওদিকে অজানা কলকাতায় ছেলের খোঁজে গণেশের বাবা-মা-বোন। ছেলের কাছে তাদের যেতেই হবে— অজয়কে তার যে বাবা আপিস যাওয়ার জন্য তাড়া দেন, তিনিই যেতে বারণ করেন। অজয় বেরোয়— যাদব ও তার পরিবার ছেলের খোঁজে দাশগুপ্তর কাছে আসে, বোঝে এখানে থাকা ঠিক নয়— গ্রামে যে মেয়ের সম্মান বাঁচাতে তারা গৃহত্যাগ করেছে, তার ওপরই লোলুপ দৃষ্টি। যাদবরা আবার পথে— নিজের ছেলের খোঁজে অগণিত ছেলের সামনে— স্তব্ধ সমুদ্র তখন সচল, গর্জমান। যাদব ঠিক শোনে বাঘের ডাক— স্প্রিং থান্ডার।

চিহ্ন উপন্যাসটির এপিসোডগুলোকে মানিক সচেতনভাবে সাজিয়েছেন। প্রায় প্রতি চরিত্র ও পরিবারের নিজস্ব জীবননাট্য পৃথকভাবেও গণ্য করা যায়— মানিক তাদের গেঁথেছেন ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তের শীর্ষে। এই দ্বান্দ্বিক ইতিহাস-বোধে, মানিক দেখান ব্যক্তি-পরিবারের ভিত্তিও কেমন রূপান্তরিত হয় বৃহত্তর ইতিহাসের প্রক্রিয়ায়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই নিজেদের পরিচিত-প্রচলিত প্রাত্যহিকতা ছেড়ে ঝাঁপ দিতে চায় নতুন চেতনায়, সকলেই নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে, এমন কি দাশগুপ্তর মত লোকও থমকে যায়। *চিহ্ন* একদিকে যেমন পরিবর্তনের, রূপান্তরের উপন্যাস, তেমনি আত্মআবিষ্কারের, সীমা-উত্তরণের, সমাজের ভিত ও উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্বময় সম্পর্কটির শিল্পসূত্র সন্ধানের।

২.

চিহ্ন উপন্যাসটির এই বিশ্লেষণের কারণ আমাদের মনে হয়, *পদ্মানদীর মাঝি*, হয়তো *পুতুলনাচের ইতিকথা* ছাড়া স্ট্রাকচারালি এত সংহত উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর লেখেননি। সেই সঙ্গে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গির, বীক্ষার যে পরিবর্তন ১৯৩৮ নাগাদ হতে শুরু করে, ১৯৪৩-৪৪-এ যা স্পষ্ট রূপ পায়, তার বোধকরি সর্বাপেক্ষা শিল্পোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত *চিহ্ন*— বাস্তব ঘটনা, লেখকের নিজস্ব জীবনের সংকট ও উপন্যাসের গঠন ও জগৎ এখানে এমনভাবে, নৈর্ব্যক্তিক শিল্পাবেগে মিশেছে যার তুলনা তাঁর পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথাতেই পাওয়া যায়। মানিক মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই রূপকার— শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতি সবাই এসেছে তাঁর রচনায়, অন্তত একবার পদ্মানদীর মাঝিতে জেলেরাই হয়েছে তাঁর একমাত্র কুশীলব, কিন্তু তাঁর মূল ব্যবচ্ছেদের বিষয় মধ্যবিত্ত সত্তা ও তার উত্তরণ-প্রচেষ্টা। যে-মধ্যবিত্ত সত্তাকে তাঁর একদা পুতুল, নিয়তিতাড়িত মনে হয়েছিল, তাকেই চিহ্নর মত উপন্যাসে তিনি যুক্ত করলেন বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে— মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারে ঐ সমূহের বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে অন্বিত হয়ে; তার নিজের সংকট বিচ্ছিন্নতা ও অচরিতার্থতাও এই পথেই কাটবে। কিন্তু মানিক কখনোই মধ্যবিত্ত চরিত্রকে একমাত্রিক করতে চাননি : তাদের জটিলতা, অবদমিত কামনা-বাসনা, লোভ, অচরিতার্থতার কথা বলে গেছেন। ত্রিষ্টুপ ও রাজকুমারের ব্যবচ্ছেদ যখন তিনি করছেন প্রায় তখনই লেনিনের এই উক্তি তাঁর অন্যতম বীজমন্ত্র :

Learn from the masses, try to comprehend their action; carefully study the practical experience of the struggle of the masses. জনগণের লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের গঠনে আনার এই চৈতন্যের অসামান্য উপন্যাস *চিহ্ন*— কিন্তু মধ্যবিত্ত জটিলতাকে নিয়ে, তার সীমা কাটানোর কথা তিনি বলেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা যেহেতু মানিকের নতুন, সেহেতু তিনি বলেন, "বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই।" দেশকালের প্রচ্ছদ ছাড়া উপন্যাস দাঁড়ায় না। তবে অনেক সময়ই উপন্যাসের চরিত্রকে এমনভাবে আনা হয়, যে মনে হয় তারা বিচ্ছিন্ন, স্বয়ম্ভু। মানিকের প্রাথমিক বীক্ষায় চরিত্রের মানসিক জটিলতা বিশেষ ব্যক্তির জটিলতা হিসাবে আসছিল, অবদমিত কামনা-বাসনা-আবেগের উৎস ও গঠন ব্যক্তির নিজ ইতিহাসের মধ্য থেকেই উঠছিল, কিন্তু চলিষ্ণু ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি অচিরেই বোঝেন, ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবনও বৃহত্তর দেশ-কাল-জীবন-শ্রেণীর ইতিহাসের দ্বারা স্পৃষ্ট। পুতুল ও নিয়তি নয়, ময়নাদ্বীপের হাতছানি নয়, মানুষকে তার সংকটের, তার সীমাবদ্ধতার সমাধান করতে হবে সচেতন কর্মের ভিতর দিয়ে— মধ্যবিত্তকে বাঁচতে হবে শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগে। দৈনন্দিন ও বিশেষ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার অংশভাক হওয়া ছাড়া এই শ্রেণীর বাঁচবার পথ নেই— অর্থাৎ ব্যক্তির, তার মনের ইতিহাসের অনেকটাই ছড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাসে। বীক্ষাগতভাবে মানিকের এই উত্তরণ কিন্তু মধ্যবিত্তরই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত : ১৯৩০ এর দশকেই মধ্যবিত্ত নিজেকে লগ্ন করতে চেয়েছিল নানা বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে, এর পূর্ণবিকাশ বা পরিণতি যে ঘটেনি, সে সম্পর্কে মানিকও সচেতন ছিলেন, অন্ত তাঁর দিনলিপি তাই বলে। এদেশের সাম্যবাদীদের যে সমালোচনা তিনি করেন তাতেই একথা স্পষ্ট। মানিকের জীবনেও তা ঘটেনি— এদিক থেকে তিনি উনিশ শতকের মধুসূদন দত্তর মতই প্রতীকী। উপন্যাসে যে অসংলগ্নতা ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে, তার কারণ মানিকের ব্যক্তিজীবনে সবটা পাওয়া যাবে না, সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সীমা উত্তরণের, নিজ সংকটের সমাধানের ব্যর্থতার মধ্যেও খুঁজতে হবে; মনে রাখতে হবে এই অসংলগ্নতা মানিকের গোড়া থেকেই আছে। আবার ১৯৪০-৪১-এই যশোদার মত চরিত্র তিনি সৃষ্টি করছেন। যশোদা তখনই বলেছে, "ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামি দামি জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়।" এই 'ভদ্রলোক'দের বিশ্লেষণ মানিক করেন নিরাসক্তভাবে— তার সঙ্গে বাইরের ইতিহাস, দ্বন্দ্বময় সময় এদের মধ্যেও কোন্ দ্বন্দ্ব, কোন্ চেতনা নিয়ে আসে তারও ইতিহাস লেখেন। মানিকের মধ্যবিত্ত তাই একই সঙ্গে যশোদার 'ভদ্রলোক' আবার তা পেরিয়ে সংগ্রামী, মনুষ্যত্ব অর্জনে উন্মুখ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দ্বান্দ্বিক বীক্ষায় মানুষের লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে অর্থাৎ তিনি তাঁর সময়ের বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে শ্রেণীগত ইতিহাস-বদ্ধতা-বিকাশ ও সীমা উত্তরণের চেষ্টাকে ধরতে চান। চিহ্ন এদিক থেকে তাঁর ক্রান্তিকালের সর্বাপেক্ষা শিল্পোত্তীর্ণ প্রয়াস, আবার ১৯৪৬-এর দাঙ্গার আলোয় চমৎকার বিশ্লেষণ করেন 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ (১৯৫১)। "আগের দিনের সে ঘরোয়া" সুখ দুঃখ আর নেই, "বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো জলের মত জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন।" বাড়িতে সকলে আতঙ্কিত থাকে,

"কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের"। 'ঘোলাটে আবর্ত' ও 'দলবদ্ধ ধ্বংস'— এই প্রায়-চিত্রকল্পে মানিক সময়ের হৃৎপিণ্ডে হাত রাখেন। তবে ১৯৫০-এর 'চিহ্ন'র পরবর্তী মানিকের চরিত্ররা এ সম্পর্কে সচেতন। তারা ১৯৪১-এর মতন নয়, যখন "মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাই রুগী।" এখনকার যে মধ্যবিত্তরা বাইরের ধ্বংস ও আবর্তর সুযোগ নিতে চায়, নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বড় করে দেখতে চায়, তারাও সচেতন; আবার যারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়, নিজেদের শ্রেণীগত সীমা চূর্ণ করতে চায় তারাও সচেতন। "এখন বাস্তব চেতনাটাই আশা ভরসা এবং ভবিষ্যৎ।" "সংসারে বেঁচে থাকার বাস্তবতাই মানুষকে চালায়, যে শ্রেণীর যার যেমন বাঁচা।"

দাঙ্গার কারণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ, সেই সূত্রে নাজিম, ইয়াসীন, রশৌনা, নানীর প্রসঙ্গ, গিরীন-গোকুলের অর্জিত সচেতনতা এ উপন্যাসের অ্যালিগরির দিক। আর এসবের মধ্যেই থাকে সুশীল-মণির সম্পর্কের টানাপোড়েন। *চিহ্ন*র মিছিল ও অবস্থান যেমন সমগ্র সমাজটাকে স্পষ্ট করে তোলে, মণির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরও ত্বরান্বিত হওয়া এক ছাত্রদের ডেমনস্ট্রেশনে যোগদান নিয়ে। মানিক কিন্তু ছাত্রদের 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' হিসেবেই দেখেন। অগ্নিগর্ভ দেশের পরিস্থিতি, দাঙ্গা মণিকে ক্রমশ পারিবারিক জীবন সম্পর্কেই প্রশ্নময় করে তোলে। এতকাল এক সঙ্গে মিলে-মিশে ভালবেসে হেসে-কেঁদে ন্যাকামি করে দু'জনে তারা পারিবারিক কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করার নামে ঝকমারি করে আসছিল। মণি বৃহত্তর জগতের ডাক শোনে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য সাধ্যমত না করলে মানুষ পশু। আর সুশীলের কাছে মণি তার স্ত্রী, জীবন্ত সম্পত্তি।" মণির এই চৈতন্যের উত্তরণে ধরা পড়ে মানিকের বীক্ষাগত উত্তরণের প্রয়াস। প্রাথমিকভাবে মানিক মানুষকে দেখেছিলেন প্রবৃত্তিতাড়িত, বিচ্ছিন্ন পুতুল হিসাবে; তারা অচেতন, পরে এদের তিনি দেখতে চাইলেন মানুষের লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সার্বজনীনতার দিকে মানিকের চরিত্ররা শুরু করে। কোন শ্রেণীর ভাঙন যে কেবল চুরমার হওয়া নয়, নতুন গড়ে ওঠাও, গতি পাওয়ায়, মানিক একথাই বলতে চান। মধ্যবিত্ত ভাঙনের এত প্রকট ও স্পষ্ট ছবি মানিকের মত বিশেষ কেউই আঁকেন নি। বারবার একথাই বলতে চেয়েছেন, আশা ভরসা নিচের তলায়। মেহনতী মানুষদের লড়াই ও বিশ্বাসের দ্বারেই মুক্তি আছে, এ বিশ্বাস মানিকের ছিল। আর সেই কুসুম-কপিলা থেকে শুরু করে যশোদা, মণি, আমিনা, সবিতার মধ্য দিয়ে মানিক বারবার খুঁজেছেন সেই শক্তিময়ীকে যে চূর্ণ করবে সীমা। মানিকের দিনলিপিতে যে কালীর সন্ধান আমরা পাই, তা আকস্মিক নয়। আমাদের আর এক বিদ্রোহী ঋত্বিককুমার ঘটকের মত মানিকও তাঁর চেতন-অবচেতনের বীক্ষায়, দ্বান্দ্বিক সমাজভাবনায় সেই শক্তিকেই খুঁজে ফেরেন যে উজ্জীবনের মন্ত্রে, গায়ত্রীতে ভেঙে দেবে ব্যক্তিগত সীমা। কিন্তু ইতিহাসের চালে, শ্রেণীর বিকাশে এই মুক্তি আসে না। তাই মানিক ও ঋত্বিক উভয়েই শেষ পর্যন্ত শিল্প-সংহতিতে থাকতে পারেন না— আপসহীন এঁরা আক্রান্ত হন অসংলগ্নতায়, প্রায় আত্মহননে। তাঁদের ট্র্যাজেডি গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি প্রতীকী, আমাদের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— এঁদের কঠিন সাধনার ব্যর্থতা, সহজ সাফল্যের থেকে অনেক গরীয়ান। স্বাধীনতার স্বাদে মণির এই উপলব্ধি ঘটে : "অত সহজ নয় স্বাধীনতালাভ, অত সস্তা নয় মুক্তি। সব বজায় রইল, আইন-কানুন, নিয়মরীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অবস্থার বদল হলনা দশজনের, একজন শুধু তার নিজের স্বামীটির সঙ্গে ঘরোয়া খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে

মুক্ত স্বাধীন নতুন জীবন আয়ত্তে এনে ফেলল— এটা ছেলেমানুষী চিন্তা।" (পৃ. ২৪২) এই সহজ মুক্তির বিরুদ্ধেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজও মধ্যবিত্ত সব বজায় রেখে 'মুক্তি' চাইছে— মানিকের উপন্যাস এরই প্রতিবাদ, তাই তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরেও তিনি বিশেষভাবে সমকালীন, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্পণ ও সে দর্পণ ভেঙ্গে উত্তরণের সঙ্গী।

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, জলার্ক, কলকাতা, ১৯৯০]

বিদেশীর শ্রদ্ধানিবেদন

পিয়ের ফালোঁ এস. জে.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাঁর সমস্ত রচনার সঙ্গেও তেমন পরিচয় নেই। সেই সমগ্রভাবে তাঁর সাহিত্যাকৃতি ও তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। তবুও মানিক-সাহিত্যের বিষয় যেটুকু জ্ঞান লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে, কেবলমাত্র বাংলা-সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও তিনি উচ্চস্থান পাবার অধিকারী। বিশেষ করে তাঁর *পুতুলনাচের ইতিকথা* ও *পদ্মানদীর মাঝি* বই দু'খানির জন্য এ স্থান তাঁর সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি সার্থক ইংরেজি অনুবাদ আট নয় বছর আগে বেরিয়েছে, কিন্তু অন্য বইখানির ইংরেজি অনুবাদ আজও বের হয়নি বলে মনে হয়। যদি তা না হয়ে থাকে আশা করি অচিরে এইটি অনূদিত হলে কথাশিল্পী মানিকের পরিচয় দেশ-বিদেশে অনেকে পাবার সুযোগ পাবেন।

প্রায় কুড়ি বছর আগে আমি যখন বাংলা শিখতে চেষ্টা করি, তখন স্বভাবত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম! বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী*ও আমি তখন পড়েছিলাম। এঁদের সকলের রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এঁদের কবিত্বময় আদর্শবাদিতায় ও রোমান্টিক ভাবধারায় আমার মনকে বিশেষ করে নাড়াও দিয়েছিল। তবু আমার মনের কি-একটা অভাব ও কৌতূহল তখনও পূর্ণ হয়নি। এই সময় একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* আমার হাতে পড়ে। আজও মনে আছে সেদিন প্রাণে একটা রূঢ় আঘাত পেয়েছিলাম। পল্লীজীবনের সেই মাধুর্যপূর্ণ ও ভাবমণ্ডিত চিত্র আর নয়— এখানে পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের একটা বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের কাছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। আমার এক ভাইকে সেই অনুবাদ পাঠিয়ে মানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। উত্তরে ভাই আমার এই অপরিচিত বিদেশী শিল্পীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমগ্র বইটির অনুবাদ তাঁকে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কি কারণে জানি না— সম্ভবত সময়ের অভাবে তাঁর সেই অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

"পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না ... আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে

শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায় আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কন বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয়, পূর্ববঙ্গের সেই ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরস কথ্যভাষায় অতি সার্থক প্রয়োগে উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টনিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ *পদ্মানদীর মাঝি* বইখানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলি রূপক নয়। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা ইত্যাদি মানুষগুলি রক্তমাংসেরই মানুষ। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। তবে লেখক সত্যকার স্রষ্টা ও শিল্পী বলে ঐ সকল চরিত্র সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করে বাস্তবের সঙ্গে এক গভীর ও সার্বজনীন সাঙ্কেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি ঐ সকল মাঝি-মানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর তো নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিত নর-নারীর প্রতিনিধি।

ফরাসি লেখক মোপাসাঁর কথা আপনি-আপনি মনে পড়ছে। মানিকের সঙ্গে মোপাসাঁর সুনিপুণ শৈলীও বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনপ্রণালী তুলনীয় বটে। বাস্তবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও সাধারণ মানুষের চরিত্ররূপায়ণে দু'জনে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তফাৎ অনেকখানি। মোপাসাঁর মধ্যে কি একটা উপেক্ষাপূর্ণ আভিজাত্যের ভাব রয়েছে, তিনি সাধারণ মানুষকে হয়তো চিনতেন কিন্তু ভালোবাসতেন না। তাঁর বর্ণনা কতকটা নিষ্ঠুর, নিজেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে বোধ করতেন না। মানিকের সেই নিষ্ঠুরতম লেশমাত্র নেই। অন্ততপক্ষে *পদ্মানদীর মাঝি* বইখানির মধ্যে নেই-ই। রুশ লেখক গর্কির মতো তাঁর বাস্তবধর্মী মনে মমতার অন্ত নেই। মানিক সত্যই কুবের ও গণেশ, মালা কপিলাকে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন বলে তিনি শরৎচন্দ্রের ন্যায় তাঁর চরিত্রগুলিকে ভাবমণ্ডিত করে তোলেন নি, কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ও পরম আত্মীয়তার গুণে তিনি তাঁদের রূঢ় অসভ্যতা ও নৈতিক দুর্বলতার দর্শনে তাদের একটুও অবজ্ঞা করেননি।

মানিক তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র সেই হোসেন মিঞার মতো ধীবর-পল্লীর সকল নর-নারীকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। হোসেন মিঞা চরিত্রটি *পদ্মানদীর মাঝি* বইখানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার মধ্যে মনে হয় মানিকেরই আত্ম'পরিচয়ে'র কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

"একটু রহস্যময় লোক এই হোসেনমিঞা। ... বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। ... ধনী দরিদ্র, ভদ্র ও অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনো সে জেলেপাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসিয়া দা-কাটা তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইসব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির

জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে।"

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি যতই সার্থক ও জনপ্রিয় হোক না কেন, তবু আমার বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পতুলনাচের ইতিকথা* বইখানির মধ্যে আমরা তাঁর শিল্পী-মনের উৎকৃষ্টতর ও গভীরতর অভিব্যক্তির নিদর্শন পাই। গল্পের বাঁধুনি একটু শিথিল হতে পারে; শশী ডাক্তারের জীবনকাহিনীর সঙ্গে কুমুদ ও মতির জীবন কথাটির সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ যোগ নেই বলে মনে হয়। বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের মর্মন্তুদ বর্ণনাটি অসামপ্ত পৃথক এক ছোটো গল্পের মতো; আসল উপন্যাসের সঙ্গে হয়তো তার কিছুটা অসংলগ্নতা রয়েছে। *পদ্মানদীর মাঝি* বইখানির মধ্যে যে সুতীব্র আবেগের সংযত ও ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, এই দীর্ঘতর ও অপেক্ষাকৃত মন্থরতর কাহিনীস্রোতে পাঠকের মনে হয়তো তেমন প্রবল সাড়া জাগবে না। তা সত্ত্বেও মানিকের এই উপন্যাসখানি তাঁর বাকি সকল উপন্যাস ও ছোটগল্পের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে সার্থকতা ও সাফল্যলাভ করেছে মনে হয়।

হোসেন মিঞা-চরিত্রের মারফতে মানিকের যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম, শশী ডাক্তারের চরিত্রে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা সেই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রার চাইতে আরও জটিল ও সমস্যাবহুল। স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মানিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্য ও বাস্তব চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা এখানে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যে যদি এই উপন্যাসের সমতুল্য ও সমজাতীয় কোনো সার্থক উপন্যাসের সন্ধান করতে হয়, তা হলে কেবল মোপাসাঁ কিংবা গর্কি নয়, হয়তো ফ্লোবের কিংবা বালজাক-এর নাম উল্লেখ করতে হবে। মানিকের পরবর্তী কতকগুলি উপন্যাস ও গল্পের পাঠেই এমিল জোলা ও গোঁকুল ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর শিল্পগত সহধর্মিতার কথা ভাবতে হয়েছে, কিন্তু *পুতুলনাচের ইতিকথা* বইখানিতে বাস্তবতার সঙ্গে চিন্তাশীল দার্শনিকতার সমন্বয় স্থাপন এবং গ্রাম্যজীবনযাত্রার ধূসর সঙ্কীর্ণতার বর্ণনার সঙ্গেই শিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি মানুষের মানসিক অস্থিরতার রূপায়ণ যেভাবে সাধিত হয়েছে উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউ সেইভাবে তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

শশী ডাক্তারের চরিত্র উপন্যাসটির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শশী কোনো আদর্শ পুরুষ নয়, গল্পের নায়ক হলেও তার জীবনে কিংবা তার ব্যক্তিত্বে কোনো অসাধারণ গুণ বা মাহাত্ম্য আছে বলা যায় না। 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তার গ্রাম্য'। তার জীবন পাড়াগাঁয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, বড় একঘেয়ে। এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের তিক্ততায় তার মনে কি যেন এক নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব স্থান পেয়েছে। নিছক কর্তব্যের তাগিদে তার নিরানন্দ ও নির্জন পথে এগিয়ে যায় সে বিতৃষ্ণা-পূর্ণ মন নিয়ে। তবু শশীর গভীর ও অস্থির ভাবুকতা তাকে বড় অশান্ত করে তোলে। গ্রামত্যাগের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে তার মনকে আলোড়িত করে। তার আশেপাশে গাওদিয়ার যে সকল নরনারীর অনাড়ম্বর ঘটনাবিহীন 'গদ্যময়' জীবনযাত্রা সে উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ করে বেড়ায়, শশী তাদের প্রতি অগাধ মমতা ও অনুকম্পা অনুভব করে। তাদের জীবনের শ্রীহীনতা তাকে ব্যথিতও করে। তার ছাত্রজীবনের নানান স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, ব্যাপকতর জীবনের আকর্ষণ, জীবন-মরণ সমস্যার চিন্তা তার আলোকহীন জীবনের মধ্যে এনে

দেয় এক তীক্ষ্ণ বেদনা ও গভীর নৈরাশ্য। শশী শত কাজকর্মে ব্যতিব্যস্ত হয়েও আসলে বড় নিষ্ক্রিয় ও নিরুৎসাহ জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকা তার নয়। সে কেবল দর্শক হিসাবে পুতুলনাচের চিরাভ্যস্ত দড়ি টানার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়, বিরক্তও হয়।

এই উপন্যাসে মানিক-সাহিত্যের সূক্ষ্ম বাস্তবধর্মিতা ও তাঁর অসাধারণ চরিত্রাঙ্কন-শক্তির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ গোপালের চরিত্র বালজাকেরই তুলিতে আঁকা হয়েছে বিশ্বাস হচ্ছে। যাযাবর ও বিশৃঙ্খল শিল্পী কুমুদের যে ছবি ফুটে উঠেছে, সেটিও অত্যন্ত বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু কুসুম ও মতির চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক আরও দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নারীহৃদয়ের এইরূপ বাস্তব বিশ্লেষণ খুব কম লেখকের দ্বারা ইতিপূর্বে সাধিত হয়েছিল। বিন্দুর চরিত্রাঙ্কনে মানিকের পরবর্তী গল্প ও উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকৌশল ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের অসাধারণ দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও জীবনসাধনার সমগ্র রূপটি এই গল্প দুটির আলোচনায় নির্ণয় করা যায় না, জানি। হোসেন মিঞা মাঝিদের ভালবাসত বটে, শশী ডাক্তারও গাওদিয়ার গ্রামবাসীদের ভালবাসত কিন্তু তাদের সেই ভালবাসা বড় নির্লিপ্ত ও ঔদাসীন্যপূর্ণ ছিল। মমতা ও সহানুভূতি তাদের প্রাণে জেগেছিল, তারা সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করেননি, তবুও তাদের কাছে তারা সক্রিয় ও নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান করেননি। মানিকের পরবর্তী জীবনে কি দুঃখপীড়িত ও অসহায় মানুষের প্রতি এক গভীরতর সহানুভূতি ও বাস্তবতার আত্মনিবেদনে ইচ্ছা একদিন জেগেছিল। তখন তাঁর সেই নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণা প্রবল আশাবাদিতা ও সক্রিয় বিদ্রোহিতার রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর সাহিত্যকীর্তি যত বড় হোক-না-কেন, মানুষ হিসাবেই তিনি আরো বড় ছিলেন, কারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে ততখানি পাওয়া যায় না, যতখানি পাওয়া যায় তার ব্যক্তিগত ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্যে। মানিকের ভ্রাতৃপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমের দ্বারা হয়তো তাঁর জ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত ছিল না, তাঁর আশাবাদিতা হয়তো শেষ পর্যন্ত লোকায়ত রয়েছিল, সেজন্য তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে সত্য-শিব সুন্দরের পূর্ণ আনন্দ ও শান্তির উপলব্ধি কতকটা স্তিমিত। "ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা" মানিক আজীবন করে গিয়েছেন। কিন্তু সেই নিরানন্দ পূজায় তিনি আন্তরিকভাবে ও একান্ত মনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে আমি শিল্পী মানিক ও মানুষ মানিকের নিকট আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কলকাতার একটি ব্যস্ততম রাস্তা। নিচে বাজারের অবিরাম হট্টগোল আর ওপরে প্রকাণ্ড ঢালাও ছাদে একটিমাত্র অফিসঘর।

অফিসঘরটি একটি প্রেসের। ব্যাঙের ছাতার মতো একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই অফিস থেকে তখন বেরিয়েছে। সম্পাদনার ভার আমার ওপর।

কাগজটির নাম করব না, কারণ প্রকাশকের সব আশা ও আমার মত কয়েকজন কর্মীর সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে নাম রাখবার মতো কিছু করবার আগেই তার আয়ু ফুরোয়।

তবু সেই কাগজ ও কাগজের অফিসঘরটি আমার কাছে আজও যে স্মরণীয় হয়ে আছে তার কারণ বিশেষ একজনের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত।

সে বিশেষ একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই অফিসঘরেই প্রথম আমার সাক্ষাৎ। লেখা দিতে সে অফিসঘরে তিনি আসেননি, সে-কাগজে কোনো লেখাও তাঁর বার হয় নি। তিনি এসেছিলেন আর একজন বন্ধুর মারফৎ আলাপ করতে।

তাচ্ছিল্য অবশ্যই করিনি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আলাপ হয়েছে নেহাৎ ভাসা ভাসা ক্ষণিকের! আর পাঁচজন সাহিত্য যশোপ্রার্থী নতুন লেখকের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবার মতো কোনো কারণ ছিল না।

শুধু তাঁর চেহারাটা ছাড়া।

ঢালাও ছাদের নিঃসঙ্গ অফিসঘরের একটি মাত্র বেশ উঁচু দরজা পূর্ব দিকে খোলা। প্রথম প্রবেশের সময় সেই দরজার মাথা পর্যন্ত ছোঁয়া তাঁর সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা আমার মনে কেমন করে মুদ্রিত হয়ে গেছে। বিকেলের ধূলিমলিন আকাশের পশ্চাৎপটে সেই নিঃসঙ্গ মূর্তির সঙ্গে নিচের বাজারের হট্টগোলটুকুও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবতে গেলে আমার সেই সেদিনের প্রথম দেখাটাই সব চেয়ে বেশি করে মনে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যিক ও মানুষ হিসাবে আমি যা বুঝেছি ও জেনেছি তাঁর সঙ্গে ও-ছবির কোথাও একটা মিল পাই বলেই হয়ত।

যত বিশেষই হোক, ও-ছবি বেশি দিন অম্লান নিশ্চয় থাকত না, যদি না কয়েকদিন বাদেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে দেখা করতে আসতেন। এবার তিনি শুধু আলাপ করতে আসেননি। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গুটি ছয় সাত গল্পের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাবার জন্য।

তাঁর কিছু আগেই আমি কলম ধরেছি, সুতরাং এরকমভাবে গল্প দেখাতে নিয়ে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। নতুন যাঁরা লেখেন অগ্রজদের কাছে এরকমভাবে

অনেকেই তাঁরা লেখা যাচাই করতে আনেন। আমার কাছে এরকম লেখা দু'চারজনের তখন আসে।

গল্পগুলি দেখে রাখব বলে সপ্তাহখানেক বাদে তাঁকে আসতে বলেছি। তারপর নিজের স্বাভাবিক আলস্যে ও অন্যমনস্কতায় সেগুলির কথা ভুলেও গেছি। যেমন আর পাঁচজনের লেখা পাই তা থেকে এ-লেখাগুলি সম্বন্ধে আলাদা আগ্রহ জাগবার কোনো হেতুও ছিল না।

যেদিন লেখকের আসবার কথা ঠিক আগের দিন রাত্রে— সৌভাগ্যক্রমে লেখাগুলির কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বসেছি।

বুলোতে গিয়ে চোখ সত্যিই স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত গল্পগুলি একবারের জায়গায় দুবার করে পড়া শেষ না করে উঠতে পারিনি।

পরের দিন অধীর আগ্রহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু তিনি আসবার পর কি করে আমার কথা তাঁকে বোঝাব ভেবে পাইনি।

এ তো শুধু বিস্ময় কৌতূহল প্রশংসা নয়, তার সঙ্গে কি একটা অস্ফুট যন্ত্রণা যেন মেশানো।

বিস্ময়, আশ্চর্য অসামান্য একজন লেখকের আকস্মিক আবিষ্কারে, কৌতূহল তাঁর লেখার অদ্ভুত ব্যতিক্রমের মূল সম্বন্ধে, প্রশংসা তাঁর সহজাত অনায়াস রচনাকৌশলের জন্যে, আর যন্ত্রণা তাঁর স্রষ্টা মনের সেই দুর্বোধ জটিলতার আভাসে জীবনের গভীর প্রতিচ্ছবিও যাতে কেমন একটু বাঁকা হয়ে ছাড়া দেখা দেয় না।

কি তাঁকে বলেছিলাম যথাযথভাবে মনে নেই। শুধু এইটুকু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু বোধ আমার আছে তাতে তাঁর প্রতিভা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সেই সঙ্গে সে প্রতিভা অতদিনে কতখানি স্বীকৃতি পাবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম মনে আছে। কারণও জানিয়েছিলাম এই যে, সাধারণত সুস্থ বলতে যা সবাই বোঝে তার প্রতিভা তা নয়।

লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিন যতটুকু জেনেছিলাম তারপর আরও অনেক গভীর ও বিস্তৃতভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ দেশের সমস্ত অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও পেয়েছি।

শুধু লেখক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবেও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তারপরে আমার হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জানার পরেও প্রথম দিনের সেই ছবি ও প্রথম লেখা পড়ার সেই অনুভূতি ও ধারণার আমূল কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

ছেচল্লিশ বছরের জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কম কিছু লেখেন নি। *পুতুল নাচের ইতিকথার* মতো বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মতো রচনা তার মধ্যে যেমন আছে তেমনি এমন রচনাও হয়ত আছে নেহাৎ জীবিকার্জনের দায়ে প্রকাশকের হাতে যা তাঁকে অনিচ্ছায় তুলে দিতে হয়েছে। কিন্তু লেখার নিপুণ হাত বাইরের নানা কারণে যেখানে তাঁর শিথিল ও ক্লান্ত সেখানেও তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দীপ্তি থেকে থেকে চাপা থাকেনি, এইটিই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।

এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর স্রষ্টামনের অভিনব গড়নের জন্যে, যে-গড়নের মধ্যে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য উদ্ভাবনের তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আংশিক ব্যর্থতার রহস্যও নিহিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবনে ও সাহিত্যে মানস-সত্তা যাঁদের অভিন্ন। কলে ছাঁটা মাপসই মানুষদের মাঝখানে বিসদৃশ বেমানান প্রাণাবেগ ও ঘোলাটে মুখস্থ ধারণার জগতে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আসবার যে ট্র্যাজিডি তাই তাঁর জীবন সৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ছাড়েনি।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর দুরন্ত প্রাণাবেগ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ উঠবার যদি কোনো অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে দায়ী সেই কাল ও সমাজ এ প্রাণাবেগকে সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়ার মতো সুবিন্যস্ত দৃঢ়তা যার মধ্যে এখনো অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জাগে তাহলে নিজেদের সুস্থতার স্বরূপও আমাদের আগে বিচার করা দরকার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গোত্রছাড়া প্রতিভা যে উৎসকেন্দ্র, তার কারণ আমাদেরই অসম বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্‌ণতার প্রতিবিম্ব।

মাঝারি মাপের মানুষ হলে এবং জীবন ও সাহিত্য তাঁর অভিন্ন না হলে হয়ত অনেক কিছু তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন; রচনায় ও জীবনে তেমন একটা সুলভ সৌষ্ঠব রেখে যাওয়ায় তাঁর সাধ্যাতীত হত না, সাবধানী সুবিবেচকদের বাহ্বা যাতে সহজেই পাওয়া যায়।

কিন্তু কোনো দিকেই মাঝারি হবার সৌভাগ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছাড়ানো, খাদও তেমনি অতল গভীর। তাই মানিয়ে নেবার মানুষ তিনি নন।

যেখানে নিজের এই অসামান্য সত্তাকে অস্বীকার করে মানিয়ে নিয়ে মাপসই হবার স্বভাববিরুদ্ধ চেষ্টা তিনি করেছেন সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার ফাঁদ তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পেতেছেন।

যে দলের মধ্যেই তিনি থাকুন, সমস্ত দলের উর্ধ্বে তিনি সেই নিঃসঙ্গ সরল অতিকায় একাগ্র উদ্দাম চিরকিশোর জীবনসন্ধানী মাঝারি মানুষের তৈরি জগতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে নির্বোধ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম যুঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে যাকে বিদায় নিতে হয়।

অকালে অকৃতার্থস্বরূপে বিদায় নিলেও আমাদের জীবনবোধের ভুয়ো আত্মপ্রসাদের ভিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বেশ একটু নাড়িয়ে যায় না কি?

দেশ, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু

কবিতার দ্বারা উপন্যাসের আক্রমণ আধুনিক পশ্চিমি সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ; — শুধু আক্রমণ নয়, রীতিমতো জয়, রাজত্ববিস্তার; গত একশো বছরের কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে তার মধ্যে স্পষ্ট দুটো বিভাগ চোখে পড়বে : একদিকে সরল বাস্তবপন্থা, লোকে যাকে জীবন বলে তার নিষ্ঠাবান আলেখ্য, অন্যদিকে নির্বাচন, অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি— এককথায়, কাব্যধর্ম। কবিতা, ছন্দ-মিলের শুদ্ধ রূপায়ণে বিপন্ন বোধ করে, কেমন করে বহুব্যাপ্ত গদ্য-সাহিত্যের বড় একটা অংশকে অধিকার করে নিলে, তার ইতিহাস রোমান্টিসিজম-এর পরিণতির সঙ্গে সমান্তর। বলতে লোভ হয়, ফরাসি প্রতীকীবাদের প্রভাব পরবর্তী কথাসাহিত্যেও সংক্রামিত হয়েছে— নয়তো মান কেমন করে 'ভেনিসের মৃত্যু' লিখতে পেরেছিলেন বা জয়স তার শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি?— কিন্তু এও স্মর্তব্য যে, ডস্টয়েভস্কি, যিনি কবি-ঔপন্যাসিকের গুরুস্থানীয় তিনি শার্ল বোদলেয়ার-এরই সমকালীন হয়েও কখনো *ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল* পড়েছিলেন বলে জানা যায় না। অবশ্যই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তদন্ত নয়, তবে অনায়াস দৃষ্টিতেই এটুকু ধরা পড়ে যে সাহিত্যের চিরকালীন বাস্তববাদ যে-সময়ে জোলা-র হাতে উগ্র প্রকৃতিবাদে পরিণত হলো, সেই একই সময়ে ইউরোপীয় উপন্যাসে একটি বিপরীত ধারা বলীয়ান হয়ে উঠছে, সে-ধারা তথাকথিত বাস্তবকে অস্বীকার করে, বাস্তবের অন্তরালবর্তী স্বপ্ন বা সত্যের সন্ধানী।

কিন্তু এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিণতির ধারা মেলে না। ইউরোপীয় কবিতায় ও উপন্যাসে যে-বিনিময়জনিত ভ্রাতৃবন্ধন গড়ে উঠেছে, বাংলায় তার লক্ষণ এখনো ক্ষীণ। বাংলা কবিতার কোনো-একটি অংশকে ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বলা যায়, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম অংশ আজ পর্যন্ত উনিশ-শতকি বাস্তববাদে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, অদম্য কবি হয়েও, তাঁর কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমের অনুগামী হয়েছেন, এবং যেখানে তা হয়নি অর্থাৎ যেখানে তাঁর মৌলিক কবিতাকে উপন্যাসের মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর উপন্যাসের— হয়তো কবিতারও— ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনো কোনো 'মুখ-টুখ' দেখতে পাননি বলে গর্ব করেছেন, কবিদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই উপহাস নিজের মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে হয়নি তাঁর, কোনো বাঙালি পাঠকেরও রুচিহীন মনে হয়নি। যুক্তিবাদী প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই নিজেকে কমনসেন্স, সাধারণবুদ্ধি বা সুবুদ্ধির প্রবক্তারূপে ঘোষণা করেছিলেন, 'চার ইয়ারী কথা'র রূপসী উন্মাদিনী কোনো মায়াপুরীর আভাস এনে দিলো না— নেহাৎই ডাক্তারি অর্থে পাগল হয়ে কল্পনার ডানা কেটে দিলে। এবং, সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, 'কল্লোল' পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো 'রিয়্যালিজম', তার তরুণ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আপত্তি করেছিলো— তাঁরা বাস্তববাদী বলে নন, যথেষ্ট বাস্তববাদী নন বলে। *তত্রাচ*, সেই উত্তেজনার অধ্যায়েও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের

অবিকল উদাহরণ হয়নি— কেনা, কোনো লেখক বা গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনোই সম্পূর্ণ মেলে না— আর মেলে না বলেই বাঁচোয়া— এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন শেষ বয়সে বুঝেছিলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বাস্তবতার গুণেই আদরণীয়, তেমনি, ততদিনে, নব্য লেখকরাও কেউ কেউ মেনেছিলেন যে নিছক বাস্তববাদ, শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি নেই।

বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ। দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো; প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ, সে-জমি ততদিনে জেতা হয়ে গেছে, এবং একই কারণে মণীন্দ্রলাল-গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের যুগে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই, তাঁর বিষয়ে প্রথম গুণগ্রাহী আলোচনা করেন 'কল্লোলে'রই প্রাক্তন লেখকরা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-গোষ্ঠী— যার আদর্শের উচ্চতা সে সময়ে কুখ্যাত ছিলো আর যার সঙ্গে 'কল্লোলে'র কোনো মিল ছিলো না, তারও তরফ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেশি দেরি করেননি। মতভেদ ছিলো না সে সময়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক শক্তিতে অসামান্য।

বর্তমান নিবন্ধকার একবার বলেছিলেন যে, বাংলা কথাসাহিত্যে দুটো ধারা লক্ষ করা যায়; একটা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র, অন্যটা রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী থেকে উৎসারিত। এই কথাটাকে এখন মনে হচ্ছে শোধনসাপেক্ষ; সত্যের নিকটতর হয় এ-কথা বললে যে, বঙ্কিম, পূর্ব-রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একই মূল ধারার অন্তর্গত, এবং উত্তর-রবীন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য ভাষাকে যতটা বদলেছেন, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারণা বিষয়ে ততটা পরিবর্তন আনতে পারেন নি। আনতে পারেন নি— এই ব্যর্থতার আংশিক দায়িত্ব পরবর্তী লেখকদেরও নিতে হবে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে কোথাও কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেন নি তাও নয়। কিন্তু আজকের দিনে যখন বলি যে, অন্নদাশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের বিপরীত লেখক, তার অর্থ এই যে অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ আলাদা জাতের গদ্য লেখেন, সামাজিক বিষয়ে তাঁর মতামতও ভিন্ন; কিন্তু উপন্যাস বস্তুটি কী— সে বিসয়ে এই অসবর্ণ লেখকদ্বয়ের মূল ধারণায় বিশেষ প্রভেদ বোঝা যায় না। বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি আজ পর্যন্ত বাস্তববাদের পরিপোষক; ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাই বৃহত্তম ধারাটির মহত্তম উপজীব্য। উপন্যাস বলতে বাঙালি পাঠক বোঝে— তথ্যের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচিত্রণ, যে-সব তথ্য স্বভাবী মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত; এবং অধিকাংশ বাঙালি লেখকও তা-ই বোঝেন।

বলা যেতে পারে, এই স্থল থেকে সব ঔপন্যাসিকই যাত্রা করে থাকেন। অর্থাৎ স্বভাবী বা স্বাভাবিকের বর্ণনায় যার কিছুমাত্র দক্ষতা নেই, তিনি কখনো ঔপন্যাসিক হবেন না, যদিও কবি হতে পারেন। কিন্তু অনেক পশ্চিমি লেখক বাস্তব থেকে যাত্রা করে বাস্তবের পরপারে পৌছান; উত্তীর্ণ হন, সারি সারি আপাতবাস্তব চিত্রকল্পের সাযুজ্যে, প্রতীকের, এমনকি পুরাণের মায়ালোকে। বাস্তব চিহ্নসমূহ 'জীবন্ত' হয় না তা

নয়— তা না-হলে তাঁদের প্রয়সা নীরক্ত রূপকমাত্রে পরিণত হতো— কিন্তু তাঁদের কাছে বাস্তব একটা ছল বা উপায় বা অভিনয় মাত্র, যার ব্যবহারে, সত্যিকার কবির মতো, মানব-মনের গোপন, সনাতন, নামহীন সম্পদকে তাঁরা ছেঁকে তোলেন। লক্ষণীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এর উল্টো প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে : তাঁর পূর্ব-রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথম বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাসের শিরোনামাতেই কবিতা আছে; 'দিবারাত্রির কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা', সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্যেই তাতে বার-বার দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে-থেকে। *পদ্মানদীর মাঝিতে* এমনকি *পুতুলনাচের ইতিকথায়*— তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও— এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি; বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি, এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটি আয়তন পায়— যেটা তথ্যগত নয়, ভাবগত। পরবর্তী এবং এক দিক থেকে আরো পরাক্রান্ত রচনায়, এই ভাবায়তনের বদলে দেখা দিলো কঠোরতর বস্তুনিষ্ঠা, এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, যা পাঠকের কোনো দুর্বলতাকেই দয়া করে না, সমাজের নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবের ছবি উদ্ধার করে আনে। আস্তে আস্তে এক দিগন্তহীন চতুষ্কোণ প্রদেশ তিনি দখল করে নিলেন : মানুষের নিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বর, জীবনসংগ্রামে আরক্তিম— যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠ-রোগী কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের মূলসূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। অর্থাৎ এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই, হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা— এই সব ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়, এমনকি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়। একটি গল্প মনে পড়ছে যার নাম 'বিবেক'; তাতে এক দারিদ্র্যক্লিষ্ট পুরুষ মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টায় প্রথমে এক ধনী বন্ধুর ঘড়ি পরে তার নিজেরই মতো এক দরিদ্রের টাকা চুরি করলে তারপর, তার স্ত্রীর বাঁচার আশা নেই, বড় ডাক্তারের এই রায় শুনে সন্তপ্ত চিত্তে ধনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলে কিন্তু গরিব বন্ধুর প্রাপ্য বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রইলো। মানুষের বিবেক শুদ্ধ ধনীর পক্ষপাতী, এই ব্যঙ্গই এখানে অভিপ্রেত, এবং অনুরূপ আরো অনেক উদাহরণ অনেক পাঠকই মনে আনতে পারবেন। বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি, তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন' 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ণ' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাবগত আদর্শের চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বভাবীরাও ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয় না, রক্তে-মাংসে সীমিত হয়ে থাকে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় ঘটনাবিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয়। মধ্য-বিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি; যে সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা অংশ প্রবল হয়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হয়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়, বঙ্কিমের

মতো অথবা কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে সরে যেতে হয় নি; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয় নি অতীতের কোনো নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে; বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন এবং তার যে অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন তা স্বাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥ ১৯৫৭
[উৎস : *মানিক বিচিত্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রণেশ দাশগুপ্ত

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদী রীতির গণকথাশিল্পী ও কমিউনিস্ট রূপে চিহ্নিত, আদৃত ও বিতর্কিত। অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের গণকথাশিল্পী হিসেবে ফরাসি উপন্যাসের কারিগর আঁরি বারবুসে ও লুই আরাগঁ যেমন করে কমিউনিস্ট হয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইভাবেই কমিউনিস্ট। অতি আধুনিক রীতির কবি পাবলো নেরুদা এবং বার্টোল্ড ব্রেখ্‌টের কমিউনিস্ট হবার ধরনটির সঙ্গেও তাঁর মিল রয়েছে।

এঁরা প্রত্যেকেই জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গিত করে প্রায় একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন অতি আধুনিক রীতিতে। সামান্য ও অসামান্য নির্বিশেষে এবং বিশেষ করে সামান্য ও সামান্য মেহনতী মানব-মানবীদের নিমগ্ন মনের সম্ভাবনা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মাধুর্য এবং বৈপ্লবিক ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করাই এঁদের অতি আধুনিকতার রীতি। বিশ্বজুড়ে এই ধারা গড়ে উঠেছে একই সঙ্গে চূড়ান্ত সংকট ও পরিবর্তনময় বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে ভাব-সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি ভাব-প্রগতিও সক্রিয়। পরিবর্তনবাদী বিদ্রোহী লেখক লেখিকারা মুক্তিসংগ্রামী জনগণের অগ্রপদক্ষেপে শরিক হয়ে আধুনিকতম রীতিকে গণবোধ্য ও সর্ব-গম্য করে স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে আলো ফেলে। ভাব সংকটের দিককে অতিক্রম করে ভাব-প্রগতিকে এরা এগিয়ে নিয়েছেন। বাংলার এই ধারার প্রবর্তক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এই বিপ্লবী বাস্ত বতাবাদের অনন্য সাধক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে এ কারণে যে, তিনি বস্তুতপক্ষে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সেই একমাত্র লেখক যিনি বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী ও অন্যান্য সন্নিহিতদের জীবনে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার রদবদলের সমস্ত প্রকাশ্য ও অন্তঃশীল অভিঘাতকে চিত্রিত ও ধ্বনিত করেছেন বিশের দশকের বাংলায় সদ্য প্রবর্তিত কাঁচা ও আকাড়া অতি আধুনিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পরিপূর্ণাঙ্গ করে তুলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ পদ্মা নদীর একান্তভাবে গায়ে-গতরে খেটে খাওয়া জেলেদের মনোবেদনার উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি* কিংবা আলোকিত কলকাতা মহানগরীর ছায়াবৃত উপকণ্ঠের বাসিন্দা শ্রমজীবী ও মজুরদের কারখানা-জীবন ও ঘরভাঙা ও ঘর বাঁধার একই সঙ্গে যাযাবরী ও সাংসারিকতার উনুন পাতার উপন্যাস *শহরতলী*, কিংবা চাষীর ঘরের কেশবতী নারীর জীবনে দুর্ভিক্ষের হানা এবং তার ন্যাড়া হবার কাহিনী নিয়ে লেখা ছোটগল্প 'নেড়ি'তে রয়েছে এই অতি আধুনিক রীতির রক্তক্ষরা স্বাক্ষর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচেছিলেন ৪৮ বছর। লেখা আরম্ভ করেছিলেন ২০ বছর বয়সে। এর পরে ২৮ বছর একটানা লিখেছিলেন। লেখাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন এবং নিজেকে 'কলমের মজুর' বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রায় ৪০টি উপন্যাস ও আড়াইশ ছোটগল্প, একটি কবিতার বই লিখেছিলেন ২৮ বছরের মধ্যে। শ্রমসাধ্য ও অবিশ্রান্ত ছিল তাঁর কাজ। নিজেকে আরাম দেয়া দূরে থাকুক দুঃখই দিয়েছেন তিনি বরং।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকজনকে পাওয়া যাবে বাংলায়, যাঁরা সাফল্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সময়টিতে বৈচিত্র্য যেমন যথেষ্ট, তেমনি উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক-লেখিকার সংখ্যাও হয়েছে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশের এবং তিরিশের দশকজুড়ে অবস্থান করেছিলেন এবং এমন কয়েকটি নামী উপন্যাস লিখেছিলেন এই সময়েই যেগুলি অতি আধুনিক রীতিকে এবং সামান্য ও সামান্যাদেরও নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছিল বলে এইসব লেখা সত্তরের দশকেও সজীব। তাছাড়া, অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছিল যে 'কল্লোল', তার লেখকেরা সত্তরের দশকেও সক্রিয় রয়েছেন। দৃষ্টান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু বিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত অতি আধুনিকের গণকথার ধারায় *চিন্তামণি*, *দর্পণ*, *স্বাধীনতার স্বাদ* এবং *হলুদ নদী সবুজ বন* ও অন্যান্য উপন্যাস লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এতে একটা 'কট্টর' ভাব এসে পড়তে বাধ্য। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি নিয়ে লেখায় কট্টরতা বিপজ্জনক। সুতরাং, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটানা একই লক্ষ্য নিয়ে লেখাতে শিল্পরূপের উৎকর্ষের ক্ষতি হয়েছে কিংবা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে উঠতে পারে অবশ্যই। ফলাফল বিচার্য নিশ্চয়। এই জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপন করবো না। কিন্তু তাঁর লেখার বিচার সার্থক বৈপ্লবিক ইতিবাচকতাই বিচার্য হতে বাধ্য। এই ইতিবাচকতা তাঁর অপরিমেয় অধিকাংশ লেখার অভিধা।

বস্তুতপক্ষে সমস্ত রকমের বিপর্যয় সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীতে নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ফলপ্রসূতার দিকে এগিয়েছে এবং এই অভ্যুত্থানের যারা লেখক-লেখিকা হয়েছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে বিপর্যয়ের মধ্যেও মনুষ্যত্বের অগ্রগতি রেখা আঁকতে পেরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছেন অতি আধুনিক হিসেবে।

তাঁর অতি আধুনিকতা, সাম্যবাদ ও গণাত্মকতার বিকাশ এবং তাঁর লেখার সময়ের বিপ্লবী গতিধারা পরস্পরের পরিচায়ক।

২.

সঙ্কটে বর্ধিত ও বিপ্লবে উত্তরিত বিশ শতকের বিশের ও তৎপরবর্তী তিন দশকের সমস্ত যন্ত্রণা ও সমৃদ্ধিরই যেহেতু রূপায়ণ ঘটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসে, সেজন্যে তাঁর রচনাবলী ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনা ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং আনন্দ-সমৃদ্ধ আশাবাদ ও দিকদর্শন। এই দুটো ব্যাপার পরস্পরকে নাকচ না করে বরং সমগ্রভাবে গতি সঞ্চারই করেছে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে একাগ্রতা ইতিবাচকতা এবং একাদিক্রমিকতা জুগিয়েছে।

১. এই কথাশিল্পী তাঁর লেখার চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন সংগ্রামী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীকে।

২. তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চেতন-অবচেতনের সূত্রগুলিকে শ্রমজীবী নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রকাশের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩. গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মজুর কিষানদের পাশাপাশি তিনি প্রায় একই স্তরের শোষিত ও বঞ্চিত নিম্নমধ্যবিত্ত বিভিন্ন বৃত্তির এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নরনারীর চরিতকথা বলেছেন। তিনি লেখা শুরু করেছিলেন এদের নিয়েই। যত দিন গিয়েছে ততই তাঁর লেখায় গায়ে গতরে খেটে খাওয়ারা প্রাধান্য পেয়েছে, তবে নিম্নমধ্যবিত্তদের কথাও তিনি শেষ পর্যন্ত বলেছেন। এরা নিরালম্ব বলে এদের পরিত্যাগ না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদের শ্রমজীবীদের সাথী করে নিয়েছেন সাম্যবাদী বিপ্লবের আয়োজনে।

৪. অসামান্য বীরচরিত-ভিত্তিক মহাকাব্যিক আখ্যান না লিখলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সামান্য ও সামান্য মানবমানবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাতে বহুবীর-সমন্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস এবং এর ফলে এদের আখ্যান লিখতে গিয়ে এক নতুন ধরনের গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস গড়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

৫. যে কোনো স্তরের যে কোন বর্ণের নরনারী যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কিংবা ছোটগল্পের বিষয়ের আওতায় এসেছে, তখন তার মুক্ত সত্তাটিকে বুঝতে এবং বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। সমস্যা হয়েছে, কাকে ফেলে কাকে রাখবেন। কিন্তু ফেলেননি কাউকেই। এইজন্যেই বাইরের চেহারার পার্থক্য দ্বারা রূপ কুরূপ নির্ধারণকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

৬. মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি জীবনাদর্শ ও বিশ্বদর্শন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী মানবমুক্তি সংগ্রামের নেতা, সেজন্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি হয়েছে তাঁর রাজনীতি। পরাধীনতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যে একটা অন্তঃশীল যোগ তাঁর নিমগ্ন মনে বিরাজ করছিল কৈশোর থেকেই, তাকেও এই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিই প্রকাশ্যে টেনে আনে। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি শোষণমুক্ত সমাজের জন্য শ্রেণীসংগ্রামে একত্র করতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে।

৭. ঘটনাবর্তে বা খেয়ালের বশে তিনি কমিউনিস্ট হননি। বরং, জীবনের ধাপে ধাপে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে ও কমিউনিস্টদের যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিত হবার পরে তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বাহ্নে সাথীদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাউকে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট বৃত্তের বাইরে।

৮. চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় পীড়িত জীবনে উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখাকে জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় করা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু ও ভাবনা-চিন্তা নির্বাচনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতাচারিতা বিস্ময়জনক। সাময়িক পত্রের কিংবা প্রকাশকের তাগিদেই অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন তিনি, কিন্তু কি নিয়ে লিখবেন সে সম্বন্ধে কেউ কখনও ফরমায়েশ দিতে পারেন নি। কিন্তু এই জাতবিদ্রোহী শিল্পী কোন অবস্থাতেই নিজেকে একাকী ও বিচ্ছিন্ন করে নেননি।

বরং তিনি বয়সের দিক থেকে যত এগিয়েছেন ততই বেশি বেশি সংঘমনা হয়েছেন।

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্মী ভেদবিভেদ কখনও উত্যক্ত করতে পারে নি। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি ঠিক সেইভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন যেমনভাবে পাখি আকাশে ওড়ে, নৌকা জলে ভাসে।

১০. নব পর্যায়ের প্রয়োজনে ও তাগিদে উপন্যাস ও ছোটগল্প কিংবা কবিতাকে অতি আধুনিকতার নানারকম ছাঁচে ঢাললেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পরীতিকে সমস্ত পর্বেই জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন, ভাষাকে এবং বর্ণনা-শৈলীকে প্রধানত গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীর আকাড়া কথাবার্তা ও আচরণে সম্পৃক্ত রেখে।

৩.

উপরোক্ত নির্দেশিকাগুলোকে এখানে খুব সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

প্রথমেই গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীদের কথা। এবিষয়ে এখানে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও অনুশীলনীয়।

প্রথমত, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের যে কথা আমাদের এই প্রিয় কথাশিল্পী বলেছেন, বিশের দশকে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল উপমহাদেশে পরাধীনতার অবসানের জন্য বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া নরনারীর নিচুতলার গহন কন্দর থেকে বেরিয়ে বিপ্লবের পতাকা নিজেদের হাতে নেয়ার ফলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই ঘটনা ছিল সারা বিশ্বব্যাপী ঘটনার অংশ। সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি এই সময়ে আমাদের উপমহাদেশের শ্রমজীবী জনগণের সাফল্য ছিল এই যে, এই উত্থান সাময়িক হলেও গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষ স্বাধীন ও সমাজ বিপ্লবের মূলশক্তি হিসেবে নিজেদের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাছাড়া জনগণের উত্থান একটা ঝড়ের মতো প্রশমিত হলেও বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবীরা যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটা মুছে যাবার ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকবরী' নাটকে শ্রমজীবীরা বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছিল। অতি আধুনিক বাস্তববাদীরা এই প্রতীকে সীমিত না থেকে শ্রমজীবীদের প্রধান চরিত্র করে লিখেছিলেন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে বিষয়টি সীমিত রাখলে দেখা যাবে, কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি ছোটগল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'আকস্মিক', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' শ্রমজীবী নরনারীর চরিত কথা এঁকেছিল।

এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্রথম গল্প লেখার সময় কল্লোলগোষ্ঠী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গী নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীদের নিয়ে যেভাবে লিখেছিলে সেইভাবেই শুরু করেছিলেন। তিরিশের দশকেই কিন্তু দেখা গেল, শ্রমজীবী মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। *পদ্মা নদীর মাঝি* অবাক করে দিয়েছিল অনেককে, যদিও একটা খটকাও ছিল। এই উপন্যাসের সমসাময়িক আরও চারটি উপন্যাস *জননী পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য* এবং 'জীবনের জটিলতা' নিম্ন মধ্যবিত্তদের পরিধির মধ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন-চেতনের ক্রিয়াকলাপগুলোকে বেশ ঘোরালোভাবে প্রয়োগ করায় *পদ্মা নদীর মাঝিকেও* মনে

হয়েছিল শ্রমজীবী নরনারীর নিমগ্ন মনের কাজ দেখানোরই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু তিরিশ দশকের শেষের দিকে এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে *শহরতলী* উপন্যাসের দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গেল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন শ্রমজীবী মানুষদের এবং তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে।

চল্লিশের দশকে সরাসরি শ্রমজীবীদের নিয়ে লেখা ছাড়াও যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এলো, সেগুলোতে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন দর্শনকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লব করার দর্শনের অনুসারী করা হয়েছে। মজুর কিষানের উত্থানেই সমস্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা। সমস্ত স্তরের শোষিত ও লাঞ্ছিত ও আশাহত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং সংকটগ্রস্ত নরনারীকে তিনি এই অদম্য বিপ্লবী অবিশ্রান্ত গণউত্থানের অভিমুখী করে দিয়েছেন।

শহরবাসের ইতিকথা, *ইতিকথার পরের কথা*, *সোনার চেয়ে দামী* কিংবা এমনকি *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবন-চিত্র বড় হলেও, জীবনের অর্থ পাবার সংকেত রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষদের ক্রিয়াকলাপেই।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামাজিক ভাঙচুরের উপাদান নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চিন্তামণি', ১৯৪৬ সারের নৌ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় গণঅভ্যুত্থানের উপকরণ নিয়ে লেখা উপন্যাস *চিহ্ন*, ১৯৪৬ সারে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের মালমসলা নিয়ে লেখা 'স্বাধীতার স্বাদ' উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দিকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ রয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, 'চিন্তামণি' গ্রামীণ পরিবেশের কাহিনী হলেও চাষী কিভাবে শ্রমিক হতে চলেছে তার দিকে ইঙ্গিত করেই দুঃখ জয়ের নির্দেশ রয়েছে।

খেটে খাওয়া নরনারীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু স্তরের মানবমানবী-চরিত্রে বহুলভাবে আনার মধ্যেও যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তার একটা প্রমাণ নারী সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবোধ সৃষ্টি।

নরনারীকে বিপ্লবের পক্ষপাতী হিসেবে সমমর্যাদা দেবার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিচার্য করেছেন তিনি নারীর পরিশ্রমী সত্তাটিকে। ক্ষেতখামার কিংবা কারখানায় শ্রমিকদের অগ্রণীর ভূমিকায় তিনি রেখেছেন নারীকে। 'শহরতলী'তে যশোদা, 'দর্পণ' উপন্যাসে রম্ভা, 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে লক্ষ্মী, 'হারানের নাতজামাই' গল্পে হারানের নাতনী— এরা মেহনতী নারী হিসেবে মজুর কিষানদের মতো সমানভাবে খাটিয়ে।

গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষদের বীর হিসেবে সামনে এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বহু-বীর নরনারী সমন্বিত গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস *দর্পণ* লিখেছেন, তাতে নারীর উপরোক্ত শ্রমিক-সত্তার জয়গান গেয়েছেন তিনি। রূপবতী সে, যে সংগ্রামী মেহনতী। যেমন, রূপবান সে, যে রূপবান মেহনতী।

এখানেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার ঘটনাও বিশেষ ব্যাখ্যার দাবিদার নিশ্চয়। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে শ্রমজীবী জনগণের প্রাধান্য ঘটানোর প্রাথমিক কাজ তিনি না করলেও প্রথমত, পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই প্রাধান্যের ধারা নিয়ে একাদিক্রমে কাজ করেছেন তিনিই এবং দ্বিতীয়ত, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন-চেতনের সূত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খেটে খাওয়া নরনারীর নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান একাদিক্রমে তিনিই করেছেন। সেই মানুষ সমৃদ্ধ, যার মধ্যে

পৃথিবীকে বদলে দেবার মানসিক শক্তি অবচেতনের তলায়। সাধারণ শ্রমজীবীরা এই শক্তির অধিকারী। এটা তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁকে অতি বাস্তবতাবাদের নয়া প্রবর্তক বলাটা যথোচিত।

নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমে তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীকে উপন্যাস ও ছোটগল্পের বৃত্তে টেনেছিলেন। এর কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রথমে এঁদের সঙ্গেই ছিল। বাস্তবতাবাদীর উচিত প্রত্যক্ষকেই চিত্রিত করা, এই ঔচিত্যবোধও নিশ্চয় তাঁর মনে কাজ করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ যত বেশি শ্রমজীবীদের সঙ্গে বেড়েছে, ততই শ্রমজীবী নরনারীর নিমগ্ন মনকে চিত্রিত করার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দিকে তাঁর যে ঝোঁকের জন্য তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের মতো ভাবলৌকিক বাস্তবচিত্র এঁকেছেন, সেই ঝোঁককে অ-ভাব-লৌকিক 'চিন্তামণি' উপন্যাসে নিয়োজিত করেছেন।

এখানে তাহলে আমরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নে দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ১. আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খেটে খাওয়া নরনারী চরিত্রকে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী করেছেন। ২. খেটে খাওয়া নরনারীর বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামকে ক্রমাগত উজ্জীবিত রেখেছেন বলে নিম্নবিত্তের মনের গহনে সন্ধান করতে গিয়েও 'পদ্মা নদীর মাঝির' লেখক অবচেতনায় আচ্ছন্ন হলেও চেতনায় উত্তরিত হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ী প্রয়োগের রেওয়াজকে কখনও কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেননি। নরনারীর যৌনজীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে অবচেতনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সত্যচিত্র দিতে চেয়েছেন তাঁর বহু উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকেও *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে *দিবারাত্রির কাব্য*-সংক্রান্ত যৌনমানসের ছবি এঁকেছেন। তবে সেখানেও অবক্ষয়ীরা যেভাবে যৌনতাকে সর্বময় করে সমগ্র জীবনসত্যকে খণ্ডিত করতে চেয়েছে সেরকম কিছু করেন নি তিনি। 'দিবারাত্রির কাব্য' কিংবা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য যৌনতা নয়। উদ্দেশ্য, পূর্ণাঙ্গ মানব-মানবী চরিত্র, বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র-কথা। সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা ছাড়া অন্য কিছু যখন বলতে চান নি, তখন তাঁর কট্টর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটাও তিনি এনেছেন বিপ্লবের বিপুলতাকে দেখাবার জন্যে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের মধ্যে অবস্থান করে তাঁর নরনারীর চরিত্রগুলিকে লেখার পরিধিতে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেকের মুক্ত সত্তাটিকে বুঝতে গিয়ে অনুপম মাধুর্যের ছবি যেমন পেয়েছেন, তেমনি জৈবিক আকাঙ্ক্ষাও পেয়েছেন। এই মুক্ত সত্তাই বাস্তবজীবনে এবং বিপ্লবের সংগ্রামের উন্মোচনে জৈবিকতায় আবদ্ধ থাকাকে ইচ্ছা নাম দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি। বিপ্লবের কাছ থেকে সে পেয়েছে বিপুলতর ইচ্ছা। এই কারণেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পে যৌনতা বা জৈবিকতা ক্লেদসৃষ্টির ফুরসুত পায় নি।

৪.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট থেকেও অবক্ষয়ীদের ফাঁদে পা দেননি, তার মূলে ছিল তাঁর খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও সম্ভাবনাময় শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংযোগ। কিন্তু এখানে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে

এসে তাদের কথা লিখতে লিখতে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের ভাবের ঘোরের কারবারী একদিন কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। তাঁর এই কমিউনিস্ট হওয়াটা তাঁর জীবনতৃষ্ণা এবং শ্রমজীবী দর্শনের অবধারিত সিদ্ধান্ত। তিনি খেটে খাওয়া মানুষের লেখক এবং কমিউনিস্ট পার্টি খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির কথা সবচেয়ে বিজ্ঞানমনস্কভাবে বলে, এই জন্যে তাঁর কমিউনিস্ট না হয়ে উপায় ছিল না।

কমিউনিস্ট হয়েছিলেন বলেই অবশ্য একদিকে যেমন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারেন নি, তেমনি তিনি নিম্নবিত্তদের সহস্র জ্বালাযন্ত্রণা ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে নিরালম্বভাবে থাকতে না দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট হয়ে আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে থেকেছিলেন বলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবের অন্যতম অতি-আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন চূড়ান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে '*পদ্মা নদীর মাঝি*' উপন্যাস লিখবার সময় নির্মল বাতাসের মতো প্রাকৃতিকভাবে অপরিহার্য জীবনের উপকরণরূপে সামনে এনেছিলেন। 'ময়না দ্বীপে' হিন্দু-মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান খাড়া করবে না, এটা ছিল একটা বক্তব্য। এই প্রাকৃতিক সামাজিক ব্যাপারটাকে আমরা 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে পাই কমিউনিস্টের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তায় বিন্যস্ত।

দেশ ভাগ হবার পর 'ছিন্নমূল' মানুষ নিয়ে তিনি যে 'সার্বজনীন' উপন্যাসটি লিখলেন কিংবা কৃষক অভ্যুত্থানের গল্প লিখলেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে একজন কমিউনিস্টের সংস্কারমুক্ত সূর্যোজ্জ্বল মন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানোর তাগিদ এই কমিউনিস্ট অতি-আধুনিক লেখকের মনে জাগ্রত ছিল '৪৭ সালের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে।

তাঁর আন্তর্জাতিকতা অবশ্যই আকাশচারী ছিল না কোন দিক দিয়েই। তিনি যেমন কমিউনিস্ট হয়েছিলেন খেটে খাওয়া মানুষের কথা লিখতে গিয়ে তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারায় যুক্ত থেকে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং লেখায় খোলাখুলি নিয়ে আসেন। এই স্বাধীনচেতা ও জাত-বিদ্রোহী মানুষটি প্রগতি লেখক সংঘের প্রবক্তা এবং বামপন্থী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ান। অবক্ষয়ীরা, প্রতিক্রিয়ার তল্পীবাহকেরা এবং কিছু কিছু সংগ্রাম-বিমুখ সাহিত্যানুরাগী এই ব্যাপারটাকে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারে কাজে লাগিয়েছে। তারা বলেছে, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *দিবারাত্রির কাব্য* যিনি লিখেছেন তিনি যে এমন বই আর লিখলেন না, তার কারণ রাজনীতি। অর্থাৎ কমিউনিস্ট রাজনীতি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *পদ্মা নদীর মাঝির* লেখক রাজনীতি-বর্জিত কোনদিনই ছিলেন না। প্রথমদিকে তাঁর মনে রাজনীতি ছিল অন্তঃশীল। যে শ্রমজীবী নরনারীর মনোভূমিকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের উত্থান এবং দৃষ্টিগোচর হওয়াটা সম্ভব ছিল বিশের এবং তিরিশের দশকে রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানের জন্যেই। তিরিশের দশকের শেষের

দিকে শহরতলীতে যে ধর্মঘটের তরঙ্গ উঠেছিল, তার মর্ম ছিল রাজনৈতিক। ১৯৪৩ সালে লেখা *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসটি পড়লে বুঝতে পারা যায়, রাজনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তিনি মাথা ঘামাচ্ছে। এর মধ্যে দুটি দিকই প্রবল। *প্রতিবিম্ব* বইটির লেখক কমিউনিস্টদের কাছ থেকে চেয়েছেন বেশি স্বাদেশিকতা। এখানে একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল এটা পাচ্ছেন না বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট মহিলাকর্মীর যে মর্যাদাপূর্ণ ছবি তিনি এতে এঁকেছেন, তা একজন গুণগ্রাহী ছাড়া অন্য কারও কাছে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এটা সত্য নয় যে, ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট হবার আগে তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি রাজনীতির গভীর খোঁজই রাখতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পরে তাঁর লেখায় বস্তু-সত্য বাড়লো। *দর্পণ* এর প্রমাণ। *দর্পণ* উপন্যাসে তিনি দেখালেন, কমিউনিস্টরা স্বদেশের নিচুতলার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই লড়াই করে, কমিউনিস্টরা আকাশচারী নয়।

এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষ বাস্তব রাজনীতিতে তাঁর বেশি বেশি করে জড়িত হওয়ার দরুন ক্রমাগত বেড়েছে বলেই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্প বেরিয়ে এসেছে ইশতেহারকে নাটকীয়তা দিয়ে। লেখক ইশতেহার নিয়ে গল্প লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করেননি।

৫.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যেমন লিখবার জন্য দেশ, বিশ্ব ও জনগণের কাছ থেকে উপকরণ নিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন তিনি কঠোর পরিশ্রম। নেবার দিক থেকে যেমন তিনি ছিলেন নম্র, দেবার ব্যাপারেও ছিলেন বিনম্র। যে লেখক আটাশ বছর খেটে খাওয়া নরনারীকে নিয়ে একটানা লিখে গেলেন দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা এবং অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে, তিনি নিশ্চয় খুবই একগুয়ে ছিলেন। কিন্তু নিজেকে কোনদিন তো একাকী কিংবা বিচ্ছিন্ন মনে করলেন না। এই চূড়ান্ত সংবেদনশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী লেখক লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বড় লেখক হবেন। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে মন না বসিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করলেন উপন্যাস ও ছোটগল্পে এবং কবিতায়। খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই '*প্রথম লেখাটি লিখে*'। একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তিনি চড়া অতি আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও অতি-আধুনিকতার বিরোধীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত মহলের প্রিয়। তারাশঙ্কর তখন দুই পুরুষ, *ধাত্রী দেবতা* ও *গণদেবতা* লিখেছেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিতা* লিখেছেন। বাংলা উপন্যাস নতুনভাবে জমজমাট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত আত্মসচেতন থেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পীকে দেখা গেল, লেখার স্বাতন্ত্র্যকে বেশি বেশি করে পরিস্ফুট করতে।

কিন্তু কোন পর্বেই বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হবার উপায় তাঁর ছিল না তাঁর লেখার কুশলীর নির্বাচনের দরুন। বিপ্লবী জনগণের যেমন একক ও ছিঁড়ে-ফুড়ে একাকার হলে সর্বনাশ, বিপ্লবী লেখক লেখিকারও তেমনি বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হলে সর্বনাশ। আত্মম্ভরিতা ছিল তাঁর কাছে অকল্পনীয়।

শরৎচন্দ্রের *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসকে যখন অতি আধুনিকতাবাদীরা তুলোধুনো করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ প্রশ্নকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লিখেছেন, এইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন তাঁর কবিতা না লিখলেও চলবে, কারণ যা চাই তা সুকান্ত দিয়েছেন।

৬.

পুতুলনাচের ইতিকথা, *দর্পণ*, ও *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসের অতি আধুনিকতাবাদী লেখক যদি একটা নিজস্ব কথকী ধারা ঠিক করে নিতেন, তাহলে তা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতো না। কারণ, বাংলায় এবং অন্যত্র অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গণকথাশিল্পী হবার জন্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন এবং এই কারণেই শুধু সংলাপ নয় বর্ণনাও হয়েছে জনগণাত্মক।

অবশ্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক করার প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁদের যাঁরা বিশের দশকের শুরুতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন খেটে খাওয়া পরিবেশ ও মনের কথাকে বাস্তবানুগ, সত্যসন্ধ এবং সোচ্চার করে খুলে বলার জন্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রদূত। বীরভূম ও বর্ধমানের শ্রমজীবী মানুষকে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছিলেন। রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর এই ভাষা প্রয়োগ দ্বারা শ্রমজীবী-চিত্তকে প্রকাশ করার চেষ্টায়। কিন্তু বিশের দশকের গণউত্থান প্রশমিত হবার পরে একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাসা ব্যবহারে ভাটা পড়ে, তেমনি এক অঞ্চলের সুশিক্ষিত মানুষের চলতি ভাষা অতি আধুনিক রীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। তিরিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একটি ছোটগল্পে আনুপূর্বক পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহার করে একটা চমক আনলেন। এরপর *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে সংলাপে এই ভাষার ব্যবহার দ্বারা পদ্মানদী ও তার দুপারের বাসিন্দাদের মুখরিত করে দিলেন।

বিশের দশকে যেটা পরীক্ষার স্তরে রয়ে গিয়েছিল, সেটাকে স্থায়ী করেছিলেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরের দশকে *চিন্তামণি* উপন্যাসে পত্র রচনায় চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ ভাষা ব্যবহার করে ব্যাপারটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিলেন। 'চিন্তামণি'তে যেহেতু পত্রই হলো ঘটনাবলীর যোগসূত্র, সেজন্য সমস্ত বর্ণনাটাতেও একটা গ্রামীণতা এসে গেলো।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে উত্তরকালে ছোটগল্পগুলোতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনায় ও সংলাপে কলকাতা মহানগরীর শহরতলি ও চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার একটা আদল করালেন। এই ভাষাটা এমন যে, কথাগুলি শহরমুখী গ্রামীণ নরনারীর মনের অচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। 'ইতিকথার পরের কথা'ই হোক অথবা 'হারানের নাতজামাই' এর মতো ছোটগল্প হোক, এর বর্ণনাতেও ভাষা জনগণাত্মক।

একটা ব্যাপার ঘটাচ্ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত। উপন্যাস ও গল্পকে বর্ণনাতেও খেটে খাওয়া মানুষের নিকটস্থ করে তুলছিলেন। শব্দে শুধু নয়, পদ-ব্যবহারেরও চেষ্টা ছিল তাঁর বহুকালের লিখিত সাহিত্য ও জনগণের ব্যবধানকে পুরোপুরি ভেঙে দেবার।

আঞ্চলিকতাকে ছাপিয়ে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে যাতে ভাবের আদান প্রদান হতে পারে এজন্য তিনি একটা অশিক্ষিত চলতি ভাষার প্রচলন করছিলেন। আরও একটা ঘটনা এখানে লক্ষণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খেটে খাওয়া মানুষের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বও বড় ছিল বলেই তাদের আঞ্চলিক ভাষা বড় ছিল। যখন মনে হয়েছে, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার না করেও শ্রমজীবী মানুষকে, অথবা

তার সঙ্গী নিম্নবিত্ত শোষিত বঞ্চিত সামান্য মানবমানবীকে বড় করে প্রকাশ করা যায়, তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেননি তিনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, *পদ্মা নদীর মাঝি* এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা* একই সময়ে পূর্ব বাংলা নিয়ে লেখা হলেও '*পুতুলনাচের ইতিকথা*তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন নি।

কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পকে জনগণাত্মক করে তোলার জন্যে এর ভাষা ও শিল্পগত গঠনে একটা সহজ আদলের প্রবর্তন করার ব্যাপারে তিনি ক্রমাগত এগিয়ে আসছিলেন।

সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে এই যে সমস্যায় প্রবেশ, এই যে ইচ্ছাকৃত শিল্পরূপগত ধরনের অতি আধুনিকতার ভাঙচুর, এর জন্যেও তাঁকে পরের দিকের লেখায় কঠোর বা 'কট্টর' হতে হয়েছে।

পরের দিকের উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রসাদগুণের ও স্বাচ্ছন্দ্যের আপেক্ষিক অভাবের মূলে রয়েছে এই জনগণাত্মক শৈলী তৈরির অসম্পূর্ণতা। মহিমাময় এই অসম্পূর্ণতা উত্তরসূরিদের জন্যে নতুনের ভিত্তি।

৭.

আরও যা লিখতে চেয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তা লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু যা লিখে রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের বাংলার শিল্পরূপে প্রাধান্যের তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে পৌঁছবার সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী সমাবেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামনের সারিতে রয়েছেন তাঁর মৃত্যুভেদী লেখাগুলোকে নিয়ে। বাংলা এমন একজন লেখককে বিশ্বসমাবেশের সামনের সারিতে দিতে পেরেছে বলে নন্দিত।

বিশ্বের সকল ভাষার মানবমানবীরা সর্বাত্মক মুক্তির সাম্যবাদী সমাজের জন্যে প্রয়াসে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে বুঝবার প্রয়োজনে যে শিল্পরূপের বিবরণ চায়, তাতে বাংলার সুদৃঢ় যোগ রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রমাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আদরও তাই বাড়তেই থাকবে। যেভাবে গোর্কির আদর বাড়ছে কিংবা ব্রেখট, নেরুদা, বারবুসে কিংবা লুই আরাগঁ এবং এমন সব কমিউনিস্ট গণকথাশিল্পীরই আদর বাড়ছে সেইভাবেই।

শ্রমজীবী নরনারীর হাতে এগিয়ে চলার লাল পতাকা। দেশে দেশে নতুন নতুন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কাজ করছেন। কোন কাজ সম্পূর্ণ, কোন কাজ অসম্পূর্ণ। খেটে খাওয়া মানুষেরা সম্পূর্ণ করে নেবে। কারণ, শ্রমজীবী মানুষই সমস্ত শিল্পসুষমার সৃষ্টির মূলে। বহুকাল এ কাজ খেটে খাওয়া মানুষ করেছে সমাজের মধ্যে চাপা পড়ে অন্তঃশীল থেকে। আজ বোঝাপড়া করছে তারা প্রকাশ্যভাবে, কারণ বিশ্বের দখল নেয়া হলো বলে তারা ঘোষণা জারি করে দিয়েছে।

অন্তঃশীল ও প্রকাশ্যের বিস্ফোরিত সম্মেলনের অতি আধুনিক গণকথাশিল্পী কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর স্মারকসঙ্গী।

[উৎস : *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ*, রণেশ দাশগুপ্ত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬]

একখানি বৈপ্লবিক উপন্যাস

রাধারমণ মিত্র

প্রকৃত সৃজনশক্তির সঙ্গে নতুন সমাজ চেতনার সংযোগ হলে তার ফল কি বিস্ময়কর হতে পারে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত *চিহ্ন* নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি।

মার্কসের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, "জাতির জীবনে কখন কখন ঘটনাস্রোত এত মন্থর গতিতে বয়ে চলে যে, এক দিনকে মনে হয় কুড়ি বছরের মত লম্বা, আবার কখন কখন ইতিহাসের চাকা এত দ্রুতগতিতে ঘোরে যে মাত্র একটি দিনকে মনে হয় যেন কুড়ি বছরের ঘন নির্যাস।" এই কলকাতা শহরে কিছুদিন আগে— যখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নিরস্ত্র ছাত্রের দল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর লাঠি ও গুলিকে উপেক্ষা করে শীতের সমস্ত রাত রাজপথ কামড়ে পড়ে থেকে ডালহাউসি স্কোয়ারে যাবার মরণজয়ী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। তারা কিন্তু একা ছিল না সেদিন। অগণিত হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক, কর্মচারী, নাগরিক, পথচারী, পুরুষ, নারী, যুবক, বৃদ্ধ, বালক তাদের সঙ্গে ও পেছনে ছিল। গোটা শহরটা যেন হঠাৎ আপনা থেকেই বোমার মত ফেটে পড়েছিল সেদিন অত্যাচারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণায়। এই ঘটনা অবলম্বনে *চিহ্ন* রচিত।

আমরা অনেকেই এই ঐতিহাসিক দুটি দিনকে দেখেছি, গভীরভাবে নাড়াও খেয়েছি। অনেক সাহিত্যিকও যে না দেখেছেন তা নয়— নাড়া খেয়েছেন কি না জানি না! কিন্তু এটা সত্য যে তাঁরা অনেকেই এর ইতিহাস লিখতে পারলেন না।

এর কারণ কী? কারণ এই যে, যাঁদের দেশ বা সমাজ সম্বন্ধে চেতনা আছে তাঁদের সৃষ্টি-প্রতিভা নেই, আর যাঁদের সৃষ্টির প্রতিভা আছে তাঁদের সাধারণত দেশ সম্বন্ধে হয় চেতনা নেই, নয় যে চেতনা আছে সে চেতনা বাস্তব নয়। মানিকবাবুর কথায় বলা চলে, "পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে! কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটেছে চোখের সামনে, দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে— নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়।" কিন্তু যেমন হেমন্তর তেমনি এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের, এসব চোখে পড়ে না। "নিজেদের পুরাতন ধারণা, পুরাতন বিশ্বাসের স্তরেই তারা ধরে রেখে দিয়েছেন দেশকে— চোখ-কান বুজে, ভাবেন তাঁদের মন এগোয় নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তাঁদেরই খাতিরে।" আর বেশির ভাগ সাহিত্যিকই তো এই 'শাশ্বত সত্য' বিশ্বাস করেন যে মানুষ বদলায় না।

সুতরাং কি করে তাঁরা নতুনকে চিনতে পারবেন? চোখের সামনে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে দেখে কি করে তার গুরুত্ব ও অর্থ বুঝতে পারবেন? ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁদের

কাছে তুচ্ছ আর অতি তুচ্ছ ঘটনা তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক। দেশের অধিকাংশ লোকের মরণ-বাঁচন সমস্যা তাঁদের কাছে সমস্যাই নয়, আর একটি মাত্র নর বা নারীর একান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সমস্যা যেন গোটা মানুষ জাতটার জীবন-মরণ সমস্যা। বড় বড় রাজা, জমিদার, পুঁজিপতি বা মহাপুরুষ, দেশ বা ধর্মের নামে যা কিছু করেন তা হল ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ তাঁদের ধারণা এঁরাই হলেন ইতিহাসের নায়ক ও নির্মাতা। কিন্তু আগের দিনের সম্বন্ধে এ ধারণা খানিকটা সত্য হলেও আজ যে মোটে সত্য নয়— আজ যে ইতিহাসের নায়ক ও স্রষ্টা দেশের সাধারণ লোক— শ্রমিক, কৃষক কর্মচারী, ছাত্র এরাই যে দেশ— এদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই যে দেশেরই স্বাধীনতার জন্য লড়াই সে চেতনা এঁদের হয় নি।

এ চেতনা কিন্তু মানিকবাবুর পরিপূর্ণ মাত্রায় হয়েছে। তিনি গভীরভাবে বুঝেছেন যে এরাই আজ আমাদের দেশের ইতিহাসের চাকা ঘোরাচ্ছে, বর্তমানকে বদলাচ্ছে ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলছে। এই উপন্যাসের নায়ক হিসেবে তাই আমরা পাই শ্রমিক ও ছাত্রদের। কারোর নাম আছে, কেউ বা অনামী, কিন্তু সাহসে স্থৈর্যে চরিত্রের দৃঢ়তায় তারা সকলেই সমান। কারোর পরাজয়ের মনোবৃত্তি নেই, দুর্বলতা নেই, চিত্তের দোদুল্যমান ভাব নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এগুলোই, কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তারা অবস্থার দাস নয়, কলের পুতুল নয়। কী অসম্ভব পরিবর্তন মানিকবাবুর নিজের দৃষ্টি ও চিন্তার মধ্যে! তিনিই না একদিন *পুতুলনাচের ইতিকথা* লিখেছিলেন? সেদিন সাধারণ মানুষগুলো ছিল তাঁর কাছে পুতুলনাচের মত, কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নাড়াত, চালাত। পল্লীগ্রামের গরিব ভদ্রোলোকদের মধ্যে বা আধা-ভদ্র আধা-চাষীদের মধ্যে সত্যই তিনি সেদিন সে 'মানুষ' দেখেন নি যাকে পরে দেখতে পেয়েছেন কলকাতার রাস্তায়, ফুটপাতে, বস্তিতে। সেদিন তাই লিখেছিলেন 'ইতিকথা' আজ লিখলেন 'ইতিহাস'; সেদিন অবস্থার দাস পুতুলের, আজ অবস্থা-জয়ী মানুষের।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তার পরিবর্তনের গোড়ায় আর একটা গভীরতর পরিবর্তন লক্ষ করবার আছে, সেটা হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার পরিবর্তন। এতদিন তিনি বহুকে দেখেছেন, সমষ্টিকে দেখেন নি, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন, যুক্তভাবে দেখেন নি। তার ফল হয়েছে এই যে, ব্যক্তি ও সমাজকে তিনি পরস্পরের বাহ্যিক ও বিরোধী শক্তি হিসেবেই দেখে এসেছেন। হয় একদিকে অসীম শক্তিশালী অথচ হৃদয়হীন সমাজ দুর্বল নিরীহ মানুষগুলোকে নিজের পায়ে তলায় ফেলে পিষে মারছে যেমন *পুতুলনাচের ইতিকথা*-য় আর নয় অন্য দিকে একজন মানুষ অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির মতই এক অমানুষিক শক্তিতে পরিণত হয়ে সমাজের ঊর্ধ্বে উঠেছে যেমন *পদ্মানদীর মাঝি*। কিন্তু আজ তার এক ও সমগ্র সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বুঝেছেন জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, দুঃখ, পরিতাপ, দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ও পশুত্বের মূল কারণ। তাই যুক্ত হতে হবে সবার সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে। এই একাত্মবোধ তাঁর মধ্যে কত গভীর ও ব্যাপক হয়েছে তার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায় *চিহ্ন*-র পাতায় পাতায়। আর এই বোধ নিজেকে প্রকাশ করেছে এই কয় রকমে :

১. এই উপন্যাসের নায়ক কোন ব্যক্তি নয়— জনসমষ্টি। এই দিক থেকে এই বইখানি আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। এক সোভিয়েট নভেলেই এর তুলনা মেলে ।

২. কতকগুলি ব্যক্তিগত চরিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু তারা সকলেই গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ— যেমন হেমন্ত, অক্ষয়। ছাত্র, শ্রমিকদের মত

তারা ঘটনাকে বদলাচ্ছে না, ঘটনাই তাদের বদলাচ্ছে। তার কারণ, তারা সকলেই জনগণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক। সীতা ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তার ও ঘটনার প্রভাবে পড়ে ভালো ছেলে হেমন্ত যে শুধু পড়াশোনা করাটাকেই ছাত্রজীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে ভাবত এবং সভাসমিতি, রাজনীতি, ছাত্র-আন্দোলন থেকে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে চলত, সেও শেষ পর্যন্ত না বদলে পারল না। মাতাল অক্ষয় যে রোজ মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে, সেও অন্তত একটা রাতের জন্য মদ খেল না ও ভবিষ্যতে খাবে না বলে সঙ্কল্প করল, "কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে— গেঁজানো রক্ত।" অকথ্য দারিদ্র্যের মধ্যেও মাধুর শান্তভাব ও হাসির কারণ এই যে, সে বুঝছে যে সে একা কষ্ট পাচ্ছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক তারই মত বা তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে।

৩. সকলের সঙ্গে একতার বোধ শ্রমিকদের মধ্যে এত প্রবল ও ব্যাপক যে তাদের ব্যক্তিগত জীবন যেন কিছু নেই— কর্মে ও চিন্তায় তারা দেশের ও দশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। দেশের চিন্তা তাদের চিন্তা, দশের সমস্যা তাদের সমস্যা। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এসে। শ্রমিক ওসমান ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে কারখানায় কাজ করবার সময় আপসোস করে। তার "অহরহ, মনে হয়েছে ট্রামের কাজ থাকলে আজ তো সে নিজেকে ওদেরই একজন ভাবতে পারত, চব্বিশ ঘণ্টা আপনা থেকে অনুভব করতো হাতে হাত মেলানো হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে।"

মা অনুরূপা চেয়েছেন, তাঁর ছেলে হেমন্ত সকলের থেকে আলাদা হয়ে লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পেয়ে মাত্র তাদের কটিকে নিয়ে একটি সুখের নীড় রচনা করবে, আর গুলিতে আহত রসুলের মা "আমিনার তো মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মতো— অন্য কোন পথ তাদের নেই। ... কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে সমাহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে।"

৪. মানিকবাবুর মন স্বভাবতই বস্তুনিষ্ঠ— তার পরিচয় পেয়েছি তাঁর *পুতুলনাচের ইতিকথা* ও *পদ্মানদীর মাঝি* দুয়েতেই। কিন্তু এই স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠা জনগণের সঙ্গে একাত্মতায় কতখানি বাস্তববোধে পরিণত হতে পারে তার সন্ধান মেলে চিহ্ন-তে। তাঁর আগেকার বস্তুনিষ্ঠা ছিল Naturalism (Natural realism) আর *চিহ্ন*-তে বস্তুনিষ্ঠা পাই তা হচ্ছে Realism (Socialist realism)। Naturalism ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মতো কাজ করে— বাছবিচার করে না, যা কিছু আছে তাকেই গ্রহণ করে— নজরটা তার কিন্তু থাকে অন্ধকার, খারাপ দিকগুলোর দিকে বেশি করে। তাই যতকিছু অপাঙক্তেয়, বর্জনীয় সাহিত্যে তাদের বড় স্থান দেয়। Realism হচ্ছে ছবি আঁকার মত, তা বাছবিচার করে, কাটছাঁট করে, অসুস্থকে করে বর্জন, সুস্থকে দেয় প্রাধান্য। Naturalism নিরাশাবাদী, Realism আশাবাদী। Naturalism নেতিবাচক, সে সমালোচনা করে প্রতিবাদ করে। Realism ইতিবাচক— সে গড়ে তোলে। এই বাস্ত ববোধ পরিস্ফুট *চিহ্ন*-র ছত্রে ছত্রে। শ্রমিকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এতখানি নির্ভুল জ্ঞান তাদের সঙ্গে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছাড়া সম্ভব নয়। অন্য যে দু-চারজন ঔপন্যাসিক শ্রমিক-জীবন এঁকেছেন, তাঁরা তাদের দেখেছেন কল্পনাপ্রবণ 'ভদ্র' চোখ দিয়ে। মানিকবাবু শ্রমিকদের দেখেছেন শ্রমিকদের চোখ দিয়ে। তেমনি ছাত্রসংঘের কোন নেতা বা কর্মী এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনতে পারবেন না যে তিনি ছাত্র

আন্দোলনের স্বরূপ বা কর্মপদ্ধতিকে বিকৃত করে দেখিয়েছেন। পনের-ষোল বছরের রজত বলছে, "আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ... আমরা যেই মারামারি করতে যাব, ব্যাস্, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব।" পুনশ্চ "ছাত্রদের শৃংখলা ও শান্ত সংযত চালচলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, সংযম হারিয়ে তাদের ক্ষেপে উঠবার সম্ভাবনা আর নেই। ... ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে।" ছাত্র-শ্রমিক-আন্দোলন যে, 'গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথার সমন্বয়' একথা সাহিত্যকদের মধ্যে মানিকবাবু ছাড়া আর কেউ বুঝেছেন বলে মনে হয় না।

৫. স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও ঐক্যবোধ লেখকের টেকনিককে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। লেখক নিজেই বলেছেন বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা। সে হচ্ছে এই, যে একদিনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়–গ্রিক নাটকের স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্যের অনুরূপ। একটি মাত্র ঘটনা ঘটেছে কলকাতার বাইরে মধুখালি গাঁয়ে এক কৃষক পরিবারে। কিন্তু এ ঘটনার স্রোতও বয়ে এল কলকাতায়। সেইজন্য কোন আনুষঙ্গিক ঘটনারই চরম পরিণতি বা শেষ বলে কিছু নেই। এইখানেই অন্যান্য উপন্যাস থেকে এই উপন্যাসের তফাৎ— যার জন্য লেখক বলেছেন, 'একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। একটার পর একটা লোক বা ঘটনা আসছে, কিছুকাল ধরে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন আলাদা আলাদা জনবিন্দু বা স্থির চিত্র মিলিয়ে যায় একটি প্রবাহে বা চলচ্চিত্রে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মনের ওপর যে ছাপ মিলিয়ে যায় সেটা হচ্ছে একটা দ্রুত গতিবেগের। রসুল, অমৃত মজুমদার, অক্ষয়, সুধা, সীতা, মধু, অমর, ওসমান, যাদব, গণেশের মা, রানী, হেমন্ত, অনুরূপা, অনন্ত, আমিনা এদের শেষ পর্যন্ত কী হল–এ প্রশ্নের জবাব নেই। শুধু একটি প্রশ্ন— যা গল্পের গোড়াতেই গণেশ বারবার করেছিল— এরা এগোবে না বাবু?... এগোবে না?— তারই উত্তর পাওয়া যায় শেষ পাতায় অজয়ের মুখে— 'আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি আমরা এগিয়েছি!' এই এগিয়ে যাওয়াটাই হল এ গল্পের প্রাণ ও অঙ্গ দুই-ই। দেশের 'প্রগতি' প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের অন্ত রে। আর তাঁর অন্তরের প্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

তবে কি 'শিল্পী' মানিকবাবুর মৃত্যু ঘটেছে 'প্রচারক' মানিকবাবুর মধ্যে? এ সিদ্ধান্ত করাবার কোন উপায়ই তিনি রাখেন নি। গোপাল হালদারের ভাষায় তিনি 'প্রচার' করেন নি— করেছেন 'প্রকাশ'। তিনি স্বভাবশিল্পী জন্মগত ঔপন্যাসিক। বর্তমান উপন্যাস-জগতে তাঁর সমকক্ষ কেউ আছেন কিনা এ প্রশ্ন যদি আগে কারো মনে জেগে না থাকে, তো অনেকের মনে জাগবে চিহ্ন পড়বার পরে। কী অসাধারণ তাঁর শিল্প-দক্ষতা। তাঁর কলমে যেন জাদু আছে। কী সহজ সরল অথচ সতেজ তাঁর ভাষা। পণ্ডিতি নয়, গেঁয়ো মেয়েলী ভাষা, যেন দেশের মাটির মধ্যে তার শেকড় আছে, আর মাটির সজীব রসধারায় সে পুষ্ট। বাক্য বাহুল্য-বর্জিত। শব্দের মিতব্যয়িতা অসাধারণ অথচ কী জটিল ভাবই না প্রকাশ পেয়েছে এই অল্প কথার মধ্য দিয়ে। শুধু ভাব নয়, রূপও। যেখানে অন্য বড় লেখকদেরও পাতার পর পাতা লাগে সেখানে মাত্র দুচারটি আঁচড়ে একটি জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে তাঁর হাতে— প্রমাণ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মধু'। পট এত ছোট ও তুলি এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় প্রত্যেক চিত্র যেন একটি পারস্য বা মুঘল 'মিনিএচার ছবি', কিংবা দামি পাথরের ওপর জহুরির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজ।

উপমাগুলিও কী চমৎকার লাগসই। বাধা পাওয়া ছাত্রের দল "লাইন ক্লিয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মতো শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেমে ফুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়।" অক্ষয়ের, 'ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার মতো মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নিচে নেমে ঘুরে ঘুরে।' তাঁর সংলাপ পড়তে পড়তে বারবার শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের পর এত স্বাভাবিক, সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ সংলাপ আর কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় না; এমনকি লেখকের নিজের পূর্ববর্তী উপন্যাস দুখানিতেও না। আর কী সূক্ষ্ম আর প্রখর তাঁর দৃষ্টি— যত ছোটই হোক না কেন, কোনো জিনিসেই তাঁর নজর এড়াতে পারে না। তাই মুসলমান ' খোদাকস্‌ম', 'মালুম', 'সাদী', 'লহমা', 'খপসুরত' ইত্যাদি উর্দু শব্দ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর চোখে পড়ে সার্জেন্টদের নিখুঁত ছাঁটের দামি পোশাক আর ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলো তালে তালে পা ফেলার সঙ্গে তাদের পেশিগুলোতে নেচে নেচে ওঠা এক ধরনের ঢেউ।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়কর তাঁর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে— মদ খাবে কি না এই নিয়ে অক্ষয়ের নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর তিনটি সংলাপ– অমৃত মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস অরুণা মজুমদারের মধ্যে, হেমন্ত ও তার মা অনুরূপার মধ্যে এবং অনুরূপা ও সীতার মধ্যে। শেষের সংলাপটি তো একটি master-piece— পড়তে পড়তে বারবার করে শরৎচন্দ্র কিংবা ডস্টয়ভস্কিকে মনে পড়ে।

কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা যার মধ্য দিয়ে চরম বিকাশ লাভ করেছে, সে হচ্ছে মধুখালি গাঁয়ের কৃষক যাদবের সপরিবারে গাঁ ছেড়ে পলায়ন ও কলকাতায় পৌঁছে রোজগেরে ছেলে গণেশের সন্ধানের কাহিনী, যে গণেশ আগেই পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। কী ছোট্ট, আর কী মর্মস্পর্শী এই গল্প! যদি এটিকে বাকি উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার উপায় থাকত, তাহলে যে জগতের শ্রেষ্ঠ গল্প ভাণ্ডারে এটি স্থান পাবার যোগ্য হত তাতে কোন সন্দেহই নেই। প্রাণের কী অপরিসীম দরদ অথচ সংযম দিয়ে এই সরল দরিদ্র কৃষক পরিবারের প্রত্যেককে শিল্পী এঁকেছেন। যাদব, যাদবের স্ত্রী, মেয়ে রানী— এরা সবাই যেন লেখকের কত যুগের চেনা মানুষ— শুধু চেনা নয়, যেন পরম আত্মীয়। শুধু এইখানে এসে খটকা লাগে তাঁর সহানুভূতি কার সঙ্গে বেশি— চাষী না মজুর? মনে হয় শহরে বাস করলেও শহর তাঁর বাসভূমি হয়ে ওঠে নি এখনও। এখনও তাঁর পিছন-টান রয়েছে পল্লির দিকে। এবং শহরের লোকদের চেয়ে যে তিনি পাড়াগাঁয়ের সরল, দরিদ্র, নির্যাতিত লোকদের বেশি জানেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কাহিনীর শেষটি এত করুণ যে গ্রিক ট্রাজেডির সঙ্গে তুলনা হতে পারে।

আর একটি চরিত্র এই উপন্যাসের অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে, সে হচ্ছে ব্যাংকের কেরানি মাতাল অক্ষয়। তার অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা এত শক্তিশালী যে মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয়। নিছক আর্টের দিক থেকে ও স্বতন্ত্র গল্প হিসেবে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে এ চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং যে নতুন জগতের সন্ধান এই উপন্যাসে লেখক দিয়েছেন, তার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না এই লোকটা। অক্ষয় হল সেই পুরনো জগতের লোক, যে জগৎ অতীতের গর্ভে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আরও একটি লোক আছে এই পুরনো জগতের, সে হচ্ছে 'বিদ্যুৎ-লিমিটেড'-এর এন. দাশগুপ্ত। অক্ষয় শুধু দুর্বল, মাতাল আর

দাশগুপ্ত হচ্ছে সমাজের শত্রু— ঘৃণ্য চোরাকারবারি। অন্য দশটা জিনিসের সঙ্গে সে মদ ও মেয়ে মানুষের দেহেরও চোরাকারবারি করে থাকে। তবু যতই অধঃপতিত সে হোক, গত যুদ্ধে দুর্নীতির সুযোগে যারা রাতারাতি বড়লোক হয়েছে তাদের মুখোশ খোলার দিক থেকে সে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়, যেমন নয়, পুরনো ধরনের নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী বাক্‌সর্বস্ব অমৃত মজুমদার। আর গল্পের দিক দিয়েও দাশগুপ্তের একটা স্থান উপন্যাসে আছে। অক্ষয়ের তাও নেই। অথচ সেই এ উপন্যাসে অনেক পাতাজুড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, দাশগুপ্ত বা অমৃত মজুমদার কেউ সহানুভূতি উদ্রেক করে না। কিন্তু অক্ষয় এতখানি দরদ দিয়ে আঁকা যে সে পাঠকের সহানুভূতি আর্কষণ করতে চায়। এই থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। আগেকার Naturalism মরতে বসলেও, এখন একেবারে মরে নি— তার রেশ তাঁর অন্তরে এখনও একটু আধটু রয়েছে। তাঁর অন্তর্বিপ্লব বহুদূর অগ্রসর হলেও এখনও সমাপ্ত হয় নি— আশা করি সে সমাপ্তি বেশি দূরে নয়।

—দুটি অবিস্মরণীয় দিনের ঘটনা এক অসাধারণ সংবেদনশীল শিল্পীমনের ওপরে যে গভীর দাগ রেখে গেছে *চিহ্ন* হল তারই চিহ্ন। *চিহ্ন* একাধারে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ও ভবিষ্যতের সঙ্কেতচিহ্ন।

—'চিহ্ন' কলকাতার রাজপথের ইতিহাসের রক্তাক্ত পদচিহ্ন।

পরিচয়, ১৯৪৭

[রচনাটি 'পরিচয়' পত্রিকায় 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে প্রকাশিত হয়। পরে, সুবীর পোদ্দার সম্পাদিত 'রাধারমণ মিত্রর প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড'-এ অন্তর্ভুক্তিকালে রচনাটির নামকরণ করা হয়।]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন লেখকের মৃত্যুর পরে সাধারণত তাঁর সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধগুলিতে অতিকথনের আতিশয্য কিছু-না-কিছু থাকেই। মানিকবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারের যে প্রয়াস হয়েছিল স্বভাবতই তার কোন কোনটা যে এ-দোষে দুষ্ট নয় এমন বলা চলে না। সম্ভবত, এরই আশু প্রতিক্রিয়ায় সম্প্রতি কোন বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-কীর্তি পরিমাপের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা উত্তপ্ত। অবশ্য যদি আমরা উষ্মাকে তীব্রতা বলতে রাজি নাও থাকি এবং ঔদ্ধত্যকে দৃঢ়তা, এ-জাতীয় আলোচনায় আমাদের আগ্রহ তাহলেও শেষ অবধি অনির্বাণ থাকে। কারণ কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এ আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছে। এবং যদিও উক্ত আলোচনায় *পদ্মানদীর মাঝি* সম্বন্ধে একটি চকিত মন্তব্যই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে, চতুষ্কোণকে প্রয়োজনীয় প্রাধান্য দিতে গিয়ে *সহরতলী* এবং *চিহ্ন* প্রসঙ্গ অনুচ্চারিতই থেকে গেছে তথাপি জীবনের অখণ্ড সামগ্রিকতা প্রসঙ্গে "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে যৌনতা আছে প্রচুর" উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ-পত্র নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যকে যাচাই করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম আলোচনা কালে প্রথমে লেখকের attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গির কথা অবশ্যই অপরিহার্য। কোন লেখকের মনোভঙ্গির কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা নিঃসন্দেহে কোন অস্পষ্ট আপ্তবাক্য উচ্চারণ করি না। লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের নিজস্ব বৃত্তি যার সাহায্যে লেখক নিজ শিল্পকর্মে স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি হতে পারেন। এই স্বাধীন-স্বাচ্ছন্দ্য উপন্যাসের বা গল্পের কাঠামো নির্মাণে, চরিত্র সৃজনে, ভাষাবয়নে এবং জীবন ব্যাখ্যায় সর্বত্রই অনুভূত হয়। বস্তুত, লেখকের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ধ্যান-ধারণা বা লেখকের মনোভঙ্গির উপরেই সার্থক উপন্যাসের রস পরিণাম নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, লেখকের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা বা মনোভঙ্গি এবং লেখকের ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে এক বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের পক্ষে এক গভীরতর প্রশ্ন। লেখকের দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটা অপেক্ষাকৃত বাইরের প্রশ্ন। সে কারণে দুজন মার্কসবাদী লেখকের দৃষ্টিকোণের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজনের মনোভঙ্গির মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। হাওয়ার্ড ফাস্ট এবং এরেনবুর্গ উভয়েই একই রাজনৈতিক দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং উভয়েরই উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত হলেও উভয়ের রচনার প্রসাদ যে ভিন্ন তার মূলে দুই লেখকের মনোভঙ্গির পার্থক্য। একজন যে ব্যক্তিকে ইতিহাসের পটে স্থাপন করে তাকে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী এবং একজন যে ইতিহাসকে ব্যক্তির জীবনবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত করায় সচেষ্ট এখানেও দুই লেখকের নিজস্ব মনোভঙ্গিই

সক্রিয়। লেখক যে জীবনকে দেখেছেন সেটা অবশ্যই তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয়ে থাকে এবং সেই জীবনরস সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির কথাই ঘোষণা করে। সে কারণেই হেনরি জেম্‌সের সুবিখ্যাত বক্তব্যটি আমরা স্মরণে রাখি যে No good novel will ever proceed from a superficial mind। তাই উপন্যাসের শিল্পকর্মের বিচারে লেখকের মানসবিচারই হয়ে থাকে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমাদের মানিকবাবুর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বা attitude-এর কথা সর্বাগ্রে আলোচ্য। মানিকবাবু ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনটার জন্যেই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে মানিকবাবু জীবন থেকে কী 'নির্বাচন' করেছেন, কোন্ বক্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন— স্থূল কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি কী। একজন লেখকের শিল্পগত এই মনোভঙ্গি বিচারের কালে আমাদের করণীয় কী এ সম্বন্ধে রসজ্ঞ পণ্ডিতদের সূত্রও এ প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। কোন শিল্পকর্ম বিচারে, বিশেষত উপন্যাস বিচারে আমাদের বিবেচ্য এবং আলোচ্য তিনটি বিষয়— প্রথম, লেখক কী পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন; দ্বিতীয়, কী তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কী তিনি বর্জন করেছেন, তৃতীয়, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন্ নৈতিক বোধে বিশিষ্ট। যে কোন লেখকের সাহিত্য-কীর্তি আলোচনা করতে গেলে উক্ত সূত্র তিনটির আলোকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা রকম-ভাবে জীবনকে দেখা যায় বলেই সার্তর কমিউনিস্ট হলেও গোর্কি হবেন না। তারাশঙ্কর মন্বন্তর লিখলেও তারাশঙ্করই থাকেন। সে কারণেই মানিকবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা অনর্থক। সে কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে যদি দেখা যায় যে, মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসে বিষয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন— এ কথার উল্লেখও হল না তখন সে আলোচনাও অপূর্ণ।

৩.

মানিকবাবুর উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটে মোটা দাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে পড়ে *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *পদ্মানদীর মাঝি* আর একভাগে পড়ে *চতুষ্কোণ*, *সরীসৃপ*, *অহিংসা* প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে *সহরতলী*, *চিহ্ন*, *আরোগ্য* প্রভৃতি। যদিও এই তিন ভাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি— জীবনকে গ্রহণের পদ্ধতি— প্রথমাবধি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিকবাবুর শক্তি এবং তাঁর দৌর্বল্যের উৎস এই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। অবশ্যই কোন লেখক তাঁর attitude towards life-কে পরিহার করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় নিজ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাকে যদি কেউ পরিবর্তিত করে নিতে চান তাহলে তাঁর অবস্থা হয় শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের মত। সুবোধবাবুর শিল্পীজীবনের মধ্য পর্যায়ে গান্ধীবাদে পৌঁছানোয় আমার কোন ক্ষোভ ছিল না যদি সুবোধবাবুর নবলব্ধ বিশ্বাস তাঁর শিল্পীজীবনে ফাঁকির সৃষ্টি না করত। গান্ধীবাদকে গ্রহণ করার পর সুবোধবাবুর যথার্থ শিল্পীহৃদয় যেটা আবিষ্কার করল সেটা হল অযান্ত্রিক, গোত্রান্তর এবং ফসিল রচনার কালে জীবন সম্বন্ধে লেখকের যে মনোভঙ্গি ছিল গান্ধীবাদকে শিরোদেশে অঙ্কিত করে সে ভঙ্গিতে জীবনদর্শন আর সম্ভবপর নয়। শ্রেণীসমন্বয়, হৃদয়ের পরিবর্তনের, মতাদর্শের সঙ্গে গোত্রান্তরের মতাদর্শকে মেলানো শিবের অসাধ্য। অতএব সুবোধবাবুকে এমন দায়-হীন (কিন্তু

সশ্রদ্ধভাবেই বলছি দায়িত্বহীন নয়) প্রেমের গল্প লিখতে হয়। এই চকচকে গল্পগুলোর তাৎপর্যহীনতার পিছনে শিল্পীজীবনের ঐ ফাঁকিই সক্রিয়। দুঃখের বিষয় মানিকবাবুর ক্ষেত্রেও শিল্পের সংকটের যে অনুযোগ উত্থাপিত হয় সে সংকট মানিকবাবুর পক্ষে মতবাদের সংকট। এই সংকটের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে মানিকবাবুর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা দরকার এবং এ আলোচনার সূত্রপাতেই একটা মোটা কথা পাঠকের মনে না হয়ে পারে না। সেটা হল চতুষ্কোণ এবং সরীসৃপ পর্যায়ের রচনাগুলি ব্যতীত *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* অথবা *সহরতলীতে* কিম্বা *চিহ্নে* যৌনতাকে মুখ্য বিষয় কোথাও করা হয় নি। *সহরতলী*, *চিহ্ন*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* মুখ্য বিষয় মানুষ। যদিও তাঁর প্রথম পর্যায়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিস্তর পার্থক্য তথাপি এই দুই পর্যায়ে মানুষেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন মানিকবাবু হয়েছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে একমাত্র চতুষ্কোণ পর্যায়েই যৌন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাত্র চতুষ্কোণকে অবলম্বন করে মানিকবাবুর রচনায় জীবন কম, যৌনতা বেশি এ অভিযোগ করা সমীচীন হবে না।

বরঞ্চ আমাদের মনে হয় চতুষ্কোণকে গৌণ আসন দিয়ে চতুষ্কোণ পর্যায়ের আগে এবং পরে মানিকবাবুর আরম্ভ এবং পরিণতির কথাটাই বিশেষ বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বিবেচ্য হবে *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা*। বস্তুত, *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *পুতুলনাচের ইতিকথায়* মানিকবাবুর বক্তব্য প্রায় এক। শুধু জীবনের দুটো ভিন্ন বিন্যাসে সে বক্তব্যকে ধরা হয়েছে— এই যা তফাৎ। বই দুটি মানিকবাবুর বিশিষ্ট শক্তির প্রায় সমস্ত চিহ্নই বহন করছে। মানিকবাবুর সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির লক্ষণ এই : মানিকবাবু জীবনের বর্ণবহুল মুহূর্তগুলিকে পরিহার করতে চান। মানুষের হাসি-কান্নার প্রেম-বিরহের উপরিতলশায়ী সমস্ত বিকারের অপেক্ষা চৈতন্যের গভীরতর প্রশ্নকে তিনি ধরার পক্ষপাতী। সুতরাং ঋজু এবং প্রত্যক্ষভাবে ইমোশনকে জাগ্রত করবে এ জাতীয় সমস্ত প্রলোভনকে স্বভাবতই তিনি পরিহার করবেন। বলা বাহুল্য, মানিকবাবুর বিষয় যেহেতু মানুষের মন সেই হেতু ঘটনার প্রোজ্জ্বল রঙ চড়ানো বর্ণনা অপেক্ষা মানুষের মনের উপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য তিনি বেশি উৎসুক। তাই *পুতুলনাচের ইতিকথায়* 'ভোরের দিকে সেনদিদি মরিয়া গেল' মৃত্যুর বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর চেয়ে অধিক সময় দিতে নারাজ। কারণ সন্তান প্রসবের পর সেনদিদির মৃত্যুতে শশী এবং গোপালের মানস প্রতিক্রিয়াই মানিকবাবুর মুখ্য লক্ষ্য। *পুতুলনাচের ইতিকথার* শশীর সমস্যা নিশ্চয় যৌন সমস্যা নয়। সম্পূর্ণই শশীর মনের সমস্যা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ উপন্যাসের বিষয়— গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনা এক হয়ে যাওয়ার সমস্যা। যেহেতু মানিকবাবুর নায়ক একান্তভাবে মানিকবাবুরই নায়ক সেকারণে শশীর কাছ থেকে ধাত্রীদেবতার শিবনাথের ব্যবহার এবং চরিত্র আশা করা অন্যায় হবে। সুপণ্ডিত সমালোচক শশীর সমস্যাটাকে যে সহানুভূতি দিয়ে অনুধাবন করেন নি সেটা বুঝি তখন, যখন দেখি যে শশীর সমস্যাটাকে চেপে রেখেই উপন্যাসের আলোচনা শেষ হল। তাই যখন দেখি যে কুসুমের সেই বিখ্যাত উক্তিকে "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন, ছোটবাবু"— উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হল শশীর তৎপরবর্তী স্বগতোক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই তখন দুঃখ হয়। অথচ ঐ বিচিত্র স্বগতোক্তি উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায়ের ক্রমেই ঘটেছে। "শরীর শরীর, তোমার কি মন নাই কুসুম"— এইটেই তো শশীর প্রশ্ন। আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার গঠনের

ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক কি তারই প্রতীক নয়? শশীর ফুলের চারা মাড়িয়ে কুসুমের দাঁড়ানোটার কি কোন মানে নেই? শশী কি কলকাতার তথা উপনিবেশের প্রয়োজনানুগ শিক্ষাযন্ত্রের তৈরি শশীবাবু (উপন্যাসে ছোটবাবু) মাত্র নয়? এই বাবুত্বের আরোপিত যন্ত্রণায় মানুষ শশীটা ছটফট করেও শেষ অবধি শশী ডাক্তার হয়েই কেমন করে শেষ হয়ে যায় সেইটাই উপন্যাসের বিষয় নয় কি? মানুষের মনটাই ছিল শশীর অন্বিষ্ট। অথচ এইটা শশী জানত না যে কুসুমের মন গাওদিয়ার মন, শশীর অনুরূপ নয়? অপরের মনের সঙ্গে নিজের মনের মিল না পাওয়া গেলে শশী নিজের মনের মানেও খুঁজে পাবে না। এবং এই মিল তাকে সেখানে খুঁজতে হচ্ছে যেখানে 'কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকাইলে' আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতে শশীর লজ্জা করে। গাওদিয়াকে কলকাতার ছাঁদে গড়ে নিতে গিয়ে শশী পারে না এটাও আমাদের সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ। শশীর জীবনে এবং মনে গাওদিয়ার জটিল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই তাই গাওদিয়া রূপময় হয়ে ওঠে। গাওদিয়ার মানুষগুলো 'রোজকার জীবনযাত্রার' প্রসঙ্গ না টেনে আনলে একে রূপময় করে তোলা যাবে না, সে মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার উপন্যাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হওয়া চাই এও অসংগত দাবি। সমালোচক কি জানেন না যে It is a matter rather of the firm and vivid concreteness with which the representative attitudes and motives are realized। যে গুণে একজন শিল্পী তাঁর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন তার প্রধান কথা হল He must be exceptionally aware of them। এই exceptional awareness-এর পরিচয় রোজকার জীবনযাত্রার সংবাদ প্রদানের মধ্যে থাকে না। এর পরিচয় খুঁজতে হয় অন্যভাবে। কারবারি লোক গোপাল দাসের প্রতিদিনকার কারবারি কেনাবেচার মধ্যেই তাকে সন্ধান করতে হয় না। শশী সম্বন্ধে তার মনোভাবের মধ্যে যে অধিকারের চেতনা জাগ্রত ছিল সেটাই তার সম্পত্তিবান গ্রাম্য মালিক মনোভাবের যথেষ্ট প্রমাণ। তার জন্যে তাকে গণদেবতার শ্রীহরি পাল হতে হবে নিশ্চয় এ আবদার আমরা করব না। জীবিকার উপরিতলশায়ী 'পরিচয়ে'র চেয়ে এ পরিচয় যে অনেক গভীর রসজ্ঞ সমালোচক সে-কথা ভুলে যান কী করে তা আমার বুদ্ধির অগম্য, বুদ্ধির অগম্য কী করে গোপাল দাস পুত্রের কাছে স্বীকৃতি চেয়েছিল তাই শশী আর গোপাল দাসের সম্পর্কের শেষ ব্যাখ্যা হিসাবে এই উক্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। আসল কথা মানুষের মন এবং তার আচার-আচরণের মানে একে বিষয় করে রচিত উপন্যাসের বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধেই সচেতন নই। তাই এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির কাছে যা দাবি করার নয় তাই দাবি করে বসি।

৪.

এবং এই ঠিকে ভুল আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় *পদ্মানদীর মাঝির* হোসেন মিয়ার চরিত্রের মূল্য নিরূপণে। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া প্রীতির উল্লেখেই তার চরিত্রের ব্যাখ্যা কার্য শেষ করতে চাই বলে হোসেন মিয়ার সম্যক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। তাই হোসেন মিয়ার চরিত্র আলোচনাকালে তার গান বাঁধার প্রসঙ্গ অনালোচিত থাকে আমাদের আলোচ্য সমালোচনায়। গানটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

আঁধার রাইতে আশমান জমি ফারাক কইরা থোও
বোন্ধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার পিকু
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগ্যা হাওর দিয়া বইয়া চেরাগ-নাও
দিল জাগানি আলেন যিনি, মিয়া
চিরা মেঘের বাদাম তুল্যা বন্ধু কনে যাও?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকে শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি, কত ঘুমাইবা।

যদিও বাউল মুর্শিদের গানের আদলে এ গান রচিত তথাপি কত ঘুমাইবা এই ধুয়ার মধ্যেই গানটির অন্য তাৎপর্য হোসেন মিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু একে বুঝতে হলে কিছুক্ষণ আগে *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *পদ্মানদীর মাঝি* যে সমান ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে দু-কথার প্রয়োজন। অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মানুষের কথাই এই দুটি উপন্যাসের উপজীব্য। গাওদিয়ার গ্রাম সমাজ এবং পদ্মা নদী এই দুই উপন্যাসে অদৃষ্টের অন্ধ নিয়তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। কিন্তু *পদ্মানদীর মাঝিতে* উপন্যাসের রূপ কল্পনা কিঞ্চিৎ পৃথক। হোসেন মিয়া এবং পদ্মা কুবের ও তার সমগোত্রীয়দের কাছে অবশ্যই একই দূরতিক্রম্য বিধিলিপির প্রতীক। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং পদ্মা পরস্পরের সহযোগী কদাচ নয়। বরঞ্চ হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতাই তার ভূমিকা। পদ্মার তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের কথা পদ্মার কাছে সমর্পিত ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজ ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির মাঝখানে দ্বীপ রচনায় একাগ্রচিত্ত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। পদ্মার ক্রূর প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে হোসেন মিয়াই কঠিন হাতে পাঞ্জা ধরেছে। কাজেই তার ব্যবহারও অক্রূর নয়। তাই 'কত ঘুমাইবা' উপরে উদ্ধৃত গানের এই ধুয়ার অর্থ বাউল-মুর্শিদ-ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের যে বিরুদ্ধতা হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ গানটির রূপকে তাই বলা হয়েছে। এবং এই গানের পর বিস্মিত কুবের যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে— আপনি গাই বাইন্ধবার পারেন? তখন হোসেন মিয়ার জবাবটিও লক্ষ করার মত— খুশ হলে না পারি কি? অবশ্য কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রায় ঐশী শক্তির সমতুল্য। দ্বীপে বসতি রচনা এবং গান রচনা খুশি হলে সে সব পারে— দুই-ই তার লীলা। সে কারণেই ময়নাদ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়ার পুরুষকার প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিক-বাবুর রচনার দরকার হয়— কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জন্যই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। এর কোন কথাই, আশা করি, নতুন কথা নয়। তবু একটা কথা বোধ করি কাউকে

অসম্মান না করেই বলা চলে যে হোসেন মিয়ার মত কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্রমালায় আর একটিও নেই। পুতুলনাচের ইতিকথায় যাদব আর হোসেন মিয়া একই মনোলৌল্যে গঠিত এ-কথা তাই আর একবার আমাদের আঘাত করে।

৫.

এ সমস্ত কারণেই চতুষ্কোণ অবলম্বন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বসে থাকা হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যৌনতা আছে বেশি জীবন আছে কম। চতুষ্কোণের ক্ষণিক পর্যায় মানিকবাবুর আদি এবং অন্তে কোথাও স্থায়ী চিন্তা হিসাবে ছিল এ প্রমাণ নেই। চতুষ্কোণের পরবর্তীকালে *সহরতলী*, *চিহ্ন* এবং *আরোগ্য* মানিকবাবু নতুন করেই মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। মানুষের গোটা চেহারায় তারই সমাজ প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল চতুষ্কোণে এ বক্তব্যের ব্যর্থ শিল্প রূপায়ণের পর স্বাভাবিকভাবেই মানিকবাবু অগ্রসর হয়েছেন নতুন জিজ্ঞাসায়। এবং এরই ফলে মানিকবাবু মার্কসবাদকে স্বীকার করেন।

নিঃসন্দেহে এই স্বীকরণ নির্ভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে নিজ শিল্পীজীবনে জারিত করে নিতে গেলে নিজেই শিল্পী ইতিহাসকে যেভাবে অনুধাবন করা দরকার সে ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ব্যত্যয় ছিল। তাঁর শেষ দিকের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোন যোগ্য বিনীত সমালোচনা হলে একথা নিশ্চয় উত্থাপিত হবে। শুধু যখন অন্বিষ্ট হয় নিজের মন অথবা মনের মানে, তখন— অথবা অন্ধ অদৃষ্টতুল্য প্রকৃতির গ্রাসেউপায়হীন জীবন যখন উপজীব্য তখন যে মনোভঙ্গি কার্যকরী, মানুষ নিজ ইতিহাসকে নিজেই রচনা করে একথা বলবার সময় আর সে মনোভঙ্গি কার্যকরী হয় না। মানুষ পরিবেশের অধীন সহরতলী পর্যন্ত এ কথা যত শিল্পসম্মতভাবে মানিকবাবু বলেছেন— মানুষ আপন অদৃষ্ট রচনায় অংশগ্রহণ করে একথা তত শিল্পসম্মতভাবে তিনি বলতে পারেন নি। অথচ মানিকবাবু হোসেন মিয়ার মত চরিত্র সৃজন করেছেন। যশোদার নিঃসঙ্গতার ছবি এঁকেছেন। পাকার আতমানুষন্ধানের ছক রচনা করেছেন। অক্ষয়ের মদের গ্লাসে তাজা ছেলের রক্ত দেখেছেন।

তাই তাঁর শিল্পীজীবনের যেখানে ব্যর্থতা সেখানে আমরা নিশ্চয় অঙ্গুলিসংকেত করব। কিন্তু একথা বলব না যে তাঁর রচনায় যৌনতা বেশি, জীবন কম। বলব না যে, তাঁর রচনায় কখনো জীবনের স্বাস্থ্য আসে নি : আর পুতুলনাচের ইতিকথা সম্বন্ধে অংশত আলোচনা করে, *পদ্মানদীর মাঝি* সম্বন্ধে অস্ফুট মন্তব্যে তৃপ্ত থেকে, শেষবর্তী রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে শুধু চতুষ্কোণ প্রসঙ্গে লরেন্সর প্রতি-তুলনা ডেনে আনা প্রায় মশা মারতে কামান দাগা। উপন্যাসের শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে মানুষের স্বরূপেরই সন্ধান করেন। সে সন্ধানকার্য কোন সমালোচনা সূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নাও হতে পারে। শিল্পীকে বিষয়ের সন্ধানে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তাই বিচার করতে হয় প্রতিভাত শিল্পকর্মের। আর যখন শিল্পকর্মই প্রশ্ন তখন সার্থকতর শিল্পসৃষ্টিকে বাদ দিয়ে শিল্পীর গৌণ কর্মের পিছনে অকারণ সময় ব্যয়ের কোন মানে হয় না। কোন বিদেশি পণ্ডিত এবং কোন আহৃত পাণ্ডিত্যের দোহাই দিয়েও নয়।

[উৎস : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬২]

হোসেন মিয়ার গান

সরোজ দত্ত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের হোসেন মিয়া সবই পারে, খুশি হলে গানও বাঁধতে পারে মুখে মুখে। এ-কথারই প্রমাণ হিসেবে হোসেন ইতিমধ্যেই পদ্মানদীর মাঝি কুবের-কে গান বেঁধে শুনিয়েছে এক সকালে, তারই দাওয়ায় বসে :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না।
আলো করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চিরাগ নাও
দিল-জাগনি আলেন যিনি মিয়া,
চিরা মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কোনে যাও?
— জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ ভাঙেনা, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।

হোসেনের মুখের গান এইভাবেই ছাপা হয়েছে গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত *মানিক গ্রন্থাবলী*-র প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে, (২৫ বৈশাখ ১৩৭৯)। যদিও ঐ প্রথম খণ্ডেরই প্রথম সংস্করণে (২৫ বৈশাখ ১৩৭০) আছে 'বিবির বুকের শির।' শুধু সেখানেই বা কেন, উপন্যাসটির সবচেয়ে পুরনো যে-সংস্করণটি পাওয়া গিয়েছে (৫ম সংস্করণ/বেঙ্গল পাবলিশার্স/চৈত্র ১৩৫৮) তাতে এবং তারই মতো উপন্যাসটির দ্বাবিংশ মুদ্রণেও (বেঙ্গল পাবলিশার্স/চৈত্র ১৩৮৭) ছাপা হয়েছে 'বিধির বুকের শির'-এর বদলে 'বিবির বুকের শির।' শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (১৩৭৮) গ্রন্থে সমগ্র গানটি উদ্ধার করে গানটির ভাবাত্মক উদ্দীপনার সূত্রটি ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন; তাঁর উদ্ধৃতিতে ঐ 'বিবির বুকের শির'-ই আছে। ছাপা-র সামান্য ভুলে এটুকু ওলট-পালট হয়ে যেতেই পারে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক, গানটির বাকি অংশের সঙ্গে মিলিয়ে এই দু'টি সামান্য পৃথক বাক্যাংশকে যদি ব্যাখ্যা করতে চাই, তা হলে ব্যাখ্যা দু'টিও পৃথক হবে। 'বিধির বুকের শির' ধরে ব্যাখ্যা করলে, মনে হয়, গীতিকার

বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে অথবা সবচেয়ে প্রিয় হিসেবে মানুষকে সম্বোধন করে তাকে জাগাতে চেয়েছেন। আর 'বিবির বুকের শির'-কে সঠিক মেনে নিলে পুরুষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে নারীর সবচেয়ে আদরণীয় সম্পদ। অবশ্য *মানিক গ্রন্থাবলী*র সম্পাদক বা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বা বেঙ্গল পাবলিশার্স কি-ভাবে পেয়েছিলেন ঐ বাক্যাংশ সেটা অজ্ঞাতই থেকে যায়।

কিন্তু সেটুকু জানা দরকার ছিল। কারণ ১৯৪৮-এর মে মাসে, বোম্বাইয়ের কুতুব পাবলিশার্স থেকে *Boatman of the Padma* নামে *পদ্মানদীর মাঝি*-র শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ অংশটি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে এসেছে এইভাবে—

you are sunk in slumber, your head

on your lover's heart,

But the time to sail is going, gone".

এ-থেকে বাংলা তর্জমান করলে আলোচ্য অংশটি হয়ে দাঁড়ায় 'বিবির বুকে শির।' এ-গুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে বেছে নেওয়া হবে অভ্রান্ত বলে? উপন্যাসটির কিছু অংশ এক সময়ে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু পত্রিকাটির সেইসব সংখ্যা এখন দুষ্প্রাপ্য, তাই মিলিয়ে দেখা গেল না কি-ভাবে এই অংশটুকু ছিল সেখানে। অবশ্য এতদূর অবধি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি না সে-প্রশ্নও থেকে যায়। দুষ্প্রাপ্য উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণও এবং অলভ্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। সুতরাং সমস্যাটির সমাধানের জন্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতামতের উপর নির্ভর করাটা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। ৫-২-৮৫ তারিখে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন : 'যে সংস্করণটি থেকে অনুবাদ করেছিলাম চল্লিশ বৎসরাধিক কাল পূর্বে, তা আমার নেই। ... এটুকু আশ্বাস পরিপূর্ণভাবে দিতে পারি যে অনুবাদ অবিকলভাবেই আমি করেছিলাম— কিছু পরিমাণে অন্তত সে-সাধ্য আমার ছিল।'

প্রসঙ্গত এ-কথাও বলে রাখা যাক— হোসেন মিয়ার মুখের এই গানটি *মানিক গ্রন্থাবলী* বা এককভাবে উপন্যাসটিরই বিভিন্ন সংস্করণে ছাপা হয়েছে বড় বেশি স্বাধীনতা সহকারে। ফলে, পরিবর্তিত হয়েছে এর বানান পদ্ধতি, বদলে গিয়েছে গানটির বিভিন্ন চরণে ছেদচিহ্নের ব্যবহার এবং প্রায় যথেচ্ছভাবে; বদলে ঘটেছে অন্যান্য বাক্যাংশেরও। এইসব কারণে গানটি প্রথমে যে ঠিক কি অবস্থায় ছিল সেটা যেমন জানা যায় না তেমনি রীতিমতো বাধার সৃষ্টি হয় গানটির অর্থবোধের ক্ষেত্রে। যেমন, গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের *দিল-জাগনি*— যার মানে হওয়া উচিত হৃদয়ে জাগ্রত যিনি, মূল উপন্যাসের চৈত্র ১৩৮৭-র সংস্করণে (বেঙ্গল পাবলিশার্স) ছাপা হয়েছে *দিল-জাগনি*— অর্থাৎ মনকে জাগিয়ে তোলেন যিনি। হয়তো, এই *দিল-জাগনি*-ই সঠিক কারণ হৃদয়ে জাগ্রত যিনি, বাইরে থেকে তার আসাটা খুব একটা অর্থবহ নয়। তবে এ-ও অনুমান মাত্র, বড়জোর যুক্তিসহ অনুমান।

হোসেনের গানের কথাগুলিকে গদ্যরূপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো অতিরিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, যা থেকে এর অব্যবহিত অর্থ বা ব্যাচ্যার্থকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়াই যায় না যতক্ষণ না উদ্দিষ্ট অর্থ বা ভাবার্থ দিয়ে সেই শূন্যতাকে ভরিয়ে নেওয়া হয়। সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে ধরবার জন্যেই গানটির গদ্যরূপের একটি খসড়া আমরা প্রথমে করে নিতে পারি— "অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ আর মাটির মধ্যে দূরত্ব রচনা

করে রেখে বন্ধু আর কতকাল ঘুমিয়ে কাটাবে? তোমার বাঁয়ে বিবি (স্ত্রী) আর ডাইনে পোলা (সন্তান), তুমি আকাল ফসল বোনো; মিয়া, কত ঘুমোবে? 'মান' অর্থাৎ কচু-র পাতায় রাত্রের শিশির (পানি) রুপোর মতো জ্বলে [আলোর প্রতিফলনে], তুমি উঠে দেখবে না! নিঃশব্দ চরণে এসে, [যিনি] ঘরের জীর্ণ আচ্ছাদনকেও আলোয় ভরিয়ে দেন, তুমি তার হদিস রাখবে না! তোমারই জন্যে, জলাভূমি পার হয়ে আলোক-তরণীতে আসে যে নেয়ে, [তোমার] খাঁচার পাখি তার কাছে জানতে চায়, ছিন্ন মেঘের পাল তুলে দিয়ে সে কোন উদ্দেশের যাত্রী! চেতনা জাগে না (দিল জাগে না) তোমার, ঘোর-ও কাটে না (ঘুম ভাঙে না) *বিধির বুকের শির* অথবা *বিবির বুকের শির*। পাড়ি দেবার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তুমি এখনও অচঞ্চল, মাঝি কত ঘুমোবে?"

এই গদ্যরূপ থেকে একেবারেই নিঃসংশয় হওয়া যায় না, বরং আরো তীক্ষ্ণ হয় জিজ্ঞাসা। যেমন, আসমান জমিন ফারাক করার অংশটিকে না হয় আকাশ মাটির ব্যবধান বলে পাওয়া গেল কিন্তু এর নিহিতার্থ কি? অকাল ফসল বলতেই বা কি বোঝানো হয়েছে? তা ছাড়া, 'আকাল ফসল রোও' কি শুধু বিকৃতিমূলক, না কোনো অনুজ্ঞা আছে এর মধ্যে? অর্থাৎ যে-অভাগা অকাল ফসল বপন করে চলেছে এখানে কি তার কর্মধারা বা জীবন-যাপন পদ্ধতিই শুধু বর্ণনা করা হচ্ছে, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার নিষ্ফল আয়োজনের কথা; না কি অকাল অর্থাৎ দুর্দিন বা অনাগত সময়ের প্রস্তুতি হিসেবে তাকে ফসল বোনায় উৎসাহিত করতে চাওয়া হয়েছে? 'মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি'— অংশটিতে ঘটনার কাল কি রাত্রি এবং এই সংঘটনের গুরু সোমদেব অথবা উষালগ্নে বিশ্বব্যাপী জাগরণের ভাবগত তর্জমান এই অংশ এবং সূর্যই তার ধীরোদাত্ত নায়ক? আর একেবারে শেষাংশের সমস্যা তো থেকে যাচ্ছেই।

হোসেন মিয়া আর তার গান নিয়ে *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (১৩৭৮)-এর লেখক বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য : "যদিও বাউল মুর্শিদের গানের আদলে এ-গান রচিত তথাপি 'কত ঘুমাইবা' এই ধুয়ার মধ্যেই গানটির অন্য তাৎপর্য হোসেন মিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।" এরপর তিনি বলেছেন : "'কত ঘুমাইবা' উপরে উদ্ধৃত এই ধুয়ার অর্থ বাউল মুর্শিদ-ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ।" এবং এ-প্রসঙ্গে লেখকের শেষ মন্তব্য : [হোসেনের মতো] 'কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্রমালায় আর একটিও নেই।" আমাদের আক্ষেপ থেকে যায়, গ্রন্থকার শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র গানটিকে ব্যাখ্যা করে যদি হোসেনের সঙ্গে এই সম্পর্কটাকে আরেকটু প্রাঞ্জল করে দিতেন। আর হোসেন মিয়া যদি বিশেষভাবে 'কল্পনা-সিদ্ধ' কোনো চরিত্রই হয় তা হলে 'নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তার সমগ্র জীবনের সারার্থ'-র মূল্যই বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকে?

গানটির গদ্যরূপ ধরে যদি এক একটি স্পষ্ট অব্যবহিত অর্থ পেতে চাই, তা হলে দেখা যাবে যে, সেখানে যে ফাঁকটুকু থেকে যাচ্ছে তাকে একটি নিটোল অবয়বে পাবার জন্যেই বাউল-মুর্শিদ তত্ত্বের অবলম্বনটুকু প্রাথমিকভাবে খুব দরকার। *চর্যাগীত-পদাবলী*-র ভূমিকায় সুকুমার সেন বাউল সাধনার সঙ্গে চর্যাকর্তাদের সাধনার যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে চর্যা-র তত্ত্বগত মর্মকথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন : "পাপপুণ্য, সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, এমন কি জন্মমৃত্যু— সবই চঞ্চল চিত্তের সৃষ্টি। গুরু-উপদেশে সাধনার দ্বারা চিত্ত অচঞ্চল হইলে তবে স্বাভাবিক অর্থাৎ 'সহজ

অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। এ-অবস্থায় দ্বৈত বা বিকল্পজ্ঞান নাই ... চিত্ত স্থির হইলে দেহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন টুটিয়া যায় ... তখন সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত।" অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির মধ্যেই সমস্ত ভেদবুদ্ধির অবসান। হোসেনেরও গানেও একইভাবে অসত্যকে আঘাত করা হয়েছে, খোঁজা হয়েছে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের পথ, অবশ্যই ঐ আধ্যাত্মিক মহিমাটুকু ব্যতিরেকে। এই জন্যই হোসেন স্থিরতা থেকে বরং চঞ্চলতায় আহ্বান করে, তবে সমগ্রভাবে সত্যের অভিমুখী হবার জন্যেই তাকে বাউলের রূপকের আধারটুকু মেনে নিতে হয়। আসমান জমিন ফারাক-এর প্রায় সমান দুটি চরণ ৭ সংখ্যক চর্যায় (কাহ্ন রচিত) পাওয়া যায়—

'তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না
ভনই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না।'

তিনি অর্থাৎ কাম, রূপ ও অরূপ অথবা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল অথবা কার, বাক্ ও চিত্ত— যাই হোক না কেন, এই ভেদবোধ যে অজ্ঞানতা থেকে, উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন প্রমুখ সবাই অভিন্ন মতেরই পোষক।

হোসেনের গানেও যে-অন্ধকার আকাশ ও মাটির মধ্যে ব্যবধান রচনা করে, সে-অন্ধকারও ঐ সত্যদর্শনক্ষমতার অভাব থেকে জন্ম নেয়, না হলে সূচীভেদ্য প্রাকৃতিক অন্ধকারে আসমান-জমিন ফারাক হবার বদলে একাকার হয়ে যাবারই কথা। এই সত্যদৃষ্টির অভাবের কাল-ই অকাল। অতএব 'আকালে ফসল রোও' কোনো অনুজ্ঞামূলক উক্তি নয়, এই অসময়ে যে ফসল বোনে আত্মসুখের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে, পরিণামে সেই আয়োজন বৃথা যাবে— এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে। 'বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা' নিয়ে তামস-মগ্ন জন সেই সুখের সন্ধানেই রত। 'মান' (কচু)-এর পাতায় রাত্রের শিশির ভোরের আলোয় রূপোর মতো দীপ্তি পায়, চরাচরে তখন অন্ধকার ঘুচে গিয়ে কুটিরের জীর্ণ আচ্ছাদনও আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে, বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনার কাল সাঙ্গ একেবারে। 'হাওর' বা জলাভূমি দুর্গত পৃথিবীর রূপক। অপ্রস্তুত দুর্গত মানুষকে জাগাবার সঙ্কল্প নিয়ে আলোকের দূত ফেরে দ্বারে দ্বারে। এই আলোর উৎসবে যে-প্রাণে সাড়া জাগে না, সেই প্রাণই বন্দী প্রাণ— 'খাঁচার চিড়িয়া'। সত্যের আহ্বান তার কাছে ব্যর্থ হয়, তার কাছে আসা আলোকের দূতের কাছে সে জানতে চায় কি তার উদ্দেশ? কেন না, সে তখনও লালসশয়নবিলগ্ন— 'বিবির বুকে শির' (এই বাক্যাংশই সঙ্গততর)। দেখা যায়, গানটিতে শব্দে শব্দে রূপক সৃষ্টি হয়েই চলেছে। গীতিকার স্বরচিত 'সন্ধ্যাভাষা'য় জীবনসত্যের সন্ধান দিতে চান।

গানটির রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং একটি রচনা করতে তিনি যে কতটা যত্ন নিয়েছিলেন তার কিছু অন্তর্লীন প্রমাণ আছে। যে শব্দভাণ্ডার গানটিতে ব্যবহৃত, বোঝা শক্ত নয়, তার মধ্যে পূর্ববাংলায় (এখন বাংলাদেশ) ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি এবং সেখানকার কথনরীতিরই প্রাধান্য। কিন্তু পূর্ববাংলা বা এখনকার বাংলাদেশে অনেকগুলো আঞ্চলিক ভাষা আছে; এবং শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* মিলিয়ে দেখলে গানটির মধ্যে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ ও কথনরীতির প্রয়োগ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দসমূহ এভাবে মিলে মিশে যায় তখনই, যখন অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সূত্রে গানটি নানা অঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। তাতে অবশ্য

মূল রচনা অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। হোসেনের মুখের এই গানটির সে সৌভাগ্য ঘটে থাকলে প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রহের কোনো না কোনো সঙ্কলনে গানটিকে পাওয়া যেত। অতএব বুঝে নিতে বাধা নেই গানটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেরই রচনা। উপন্যাসে নিজের উদ্দেশ্যটিকে প্রয়োগ করবার জন্য যেমন ঔপন্যাসিকের এই গান রচনা, তেমনি হোসেন মিয়ার চরিত্র সৃষ্টি। হোসেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যের পরিপোষক চরিত্র। তারই মধ্য দিয়ে লেখক স্বয়ং উপস্থিত এই কাহিনীতে। হোসেনের বিচিত্র গতিবিধিময় জীবনের কথা মনে রাখলে, তার মুখের গানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সহাবস্থান খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সুতরাং হোসেনকেই সামনে রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধান করেছেন এ-রকম রূপকাশ্রয়ী ভাষা ও শব্দের, নিজের জোরালো অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে যা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কাহিনীতে গানের ব্যবহার অনেক কারণেই করা হতে পারে; বৈচিত্র্যসৃষ্টি, পটভূমি রচনা, কাহিনীর গ্রন্থিমোচন বা বক্তব্যকে প্রসারিত করা— এ-সবই তার সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এ-ভাবে ব্যবহার করলেন তাঁর গান? সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এর একটা সহজ উত্তর আছে : জাগরণের কালে নিষ্ক্রিয়, আত্মায়, সুখসন্ধানীকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেই এই গান। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক হিসেবে বিচার করতে গিয়ে তাঁকে পর্বে পর্বে যে-ভাবে খণ্ডিত করা হয়, সেই অনুযায়ী যে-উপন্যাসে গানটি ব্যবহৃত সেটি 'প্রাক-কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর রচনা। দ্বিতীয়ত উপন্যাসটিতে ধীবর সম্প্রদায়ের অভাবী এবং দুর্গত জীবনের কথা যত নিপুণভাবেই বর্ণিত হোক না কেন, কাহিনীর সূচনায় বা সমাপ্তিতে কোথাও জনজাগরণের প্রসঙ্গ নেই। তা হলে কি বুঝব অন্য কাউকে জাগাতে নয়, নিজেকে উজ্জীবিত রাখতেই হোসেনের এই গান? 'পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী' হোসেন মিয়া (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*) ক্রূর পদ্মার সঙ্গে লড়াইয়ে এই গান গেয়ে নিজেকে অটুট রাখে? কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে এমন একটি সংঘাতের চিত্রও নেই যেখানে হোসেন এবং পদ্মা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। তা হলে কাকে জাগাতে চায় হোসেন? নাকি তার নিজের ক্ষোভ আর নৈরাশ্যকে সে প্রকাশ করে এইভাবে? জনসমুদ্রে জোয়ার জাগবার আগেই এই যে ভাসবার আয়োজন হোসেন তার নিঃসঙ্গ সাক্ষী! আলোকতীর্থের দূতকে বন্দনার জন্যেই তার এই স্তোত্র রচনা?

পদ্মানদীর আর এক মাঝি গণেশ-এর মুখেও একটি গান আছে— 'পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই।' যুগল, শম্ভু, বগা বা নকুল— উপন্যাসের এইসব চরিত্রের যে-কারো মুখে গানটি বেশ মানিয়ে যায়; এমন কি মোটেই বেখাপ্পা লাগে না অনেক রঙ্গপটীয়সী কপিলার মুখেও। কিন্তু 'আঁধার রাইতে' গানটিকে অন্য কারো মুখে ভাবা-ই যায় না হোসেন মিয়া ব্যতীত। কারণ সমগ্র উপন্যাসে হোসেনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, তাঁর অচ্ছেদ্য সত্তা। হোসেন ময়নাদ্বীপের স্বপ্নে বিভোর— যে দ্বীপের অধিবাসীরা জাতিসম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এক নতুন জীবনবোধের ছন্দে পা মেলাবে, হোসেনের কল্পনায় জ্বলজ্বল করে সেই ছবি। ২৭/২৮ বছর বয়সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমন এক জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার প্রায় এক দশক আগেই। আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস এ-বিষয়ে তাঁকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এর মূল উৎস মানবপ্রেমিক শিল্পীর তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা। নিঃসঙ্গ জাগরব্রতী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুরূহ প্রেরণাবশে হোসেনের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে বেদনার্ত আহ্বান

জানিয়েছেন— 'বোনধু কত ঘুমাইবা', 'মাঝি কত ঘুমাইবা', 'মিয়া কত ঘুমাইবা'। পরবর্তীকালে শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় রাজনীতিকে মেনে নেওয়ার অর্থ হয়তো এই যে, জীবনের ধারা পরিবর্তনের স্তরপরম্পরার যে সূত্র তখনও তাঁর কাছে অজ্ঞাত, ঐ বিশেষ মতাদর্শের মধ্যে তারই সন্ধান করা। দলীয় রাজনীতিটাই যে তাঁর কাছে শেষকথা ছিল না কমিউনিস্ট পর্বের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও তার বিশদ বিবরণ আছে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে দেখা যায়, হোসেনের আহ্বান অভিপ্রেত চাঞ্চল্য আনে না যূথবদ্ধ তথা যূপবদ্ধ মানুষগুলোর মনে। তাই চঞ্চল হয়ে ওঠে হোসেন মিয়া, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ বেলা বয়ে যায়, লগ্ন যায় যায়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসা এক গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অস্থির লেখক তখন হোসেনকে করে তোলেন প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, এই মূঢ় মানবিকদের নতুন নিয়তি। হোসেনের কণ্ঠে জাগরণের গান আর সর্বনাশের গান এককার হয়ে যায়। মূঢ় অর্বাচীনদের উৎখাত করেই সে তাদের উদ্ধার করে। একে একে স্ব-ভূমি থেকে, নিজের নিজের অবস্থান-কেন্দ্র থেকে উৎখাত হয় আমিনুদ্দি, রসুল, নছিবন, কুবের ও কপিলা। সবাই তারা হোসেনের স্বপ্নলোকের যাত্রী, ময়নাদ্বীপের যাত্রী। হোসেন বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সফল করাই তাদের কাজ। হোসেন মারফৎ এই নবাগতদের কি দিতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? পুরুষকে দিতে পারেন নারী বা নারীকে দিতে পারেন পুরুষ; দিতে পারেন তাদের অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব; এর বেশি আর যেটুকু দিতে পারেন সে ঐ জাতিধর্মনির্বিশেষে জীবনযাপনের একটা প্রাথমিক খসড়া। আর কিছুই আশা করবার নেই লেখকের কাছে, কেননা, নিজেই তিনি নিঃসম্বল তখন। সুতরাং সমুদ্রের বুকে ময়নাদ্বীপ যে অস্পষ্ট থাকে সে শুধু কুয়াশার জন্যেই নয়, লেখকের ঝাপসা দৃষ্টির জন্যেও অনেকটা। শ্রেণী-সম্প্রদায়হীন সমাজের ধারণাটুকুই মাত্র তিনি করতে পেরেছিলেন, তার বাস্তব রূপাবয়ব তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না, সেই সময়কার ভারতবর্ষে থাকা সম্ভবও ছিল না। সেই কারণেই গানের মধ্যেকার বরণীয় পুরুষের ভাবমূর্তির ধারণাও খানিকটা অস্বচ্ছ থাকে— সে কি শুধু সুন্দরের আবির্ভাব, নাকি তার কর্মেই তার পরিচয়?

হোসেন মিয়া-কে ড. সরোজমোহন মিত্র-র মনে হয়েছে 'কামুক শঠ' অথচ 'উদার' (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*/ ১৩৭৭)। শঠতা এবং উদারতার বিরোধাভাস হোসেনের মধ্যে আছে। তবে তার মধ্যে কামুকতাকে আবিষ্কার করতে হলে তার কোনো কোনো কাজকে প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়। এবং সেই ধরনের বিচার-বিবেচনা উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে কতটা জরুরি? আবার কুবের-এর চোখে হোসেন-এর 'মানুষ' হয়ে ওঠা-র জন্যই তার আফিম-এর অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া দরকার (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*/ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/ ১৩৭৮)— এ-ও যেন হোসেনকে একেবারেই খণ্ড খণ্ড করে ফেলা এবং সেই সূত্রে একটা অসত্যকেই প্রায় স্পর্শ করে যাওয়া। একটি চরিত্র কোনো কাহিনীতে সত্য হয়ে ওঠে ঘটনাবলীর সমগ্রতায়। একক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় চরিত্রটি ততখানি প্রতিফলিত হয় না। তা ছাড়া মনুষ্যত্ব মানেই নীচতা— এই-ই বা কি বিধান? হোসেন যে পাঠকদের রীতিমতো অস্বস্তি ও বিভ্রান্তির কারণ তার আরও প্রমাণ আছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যপত্র'-র (কার্তিক-পৌষ/১৩৯১) বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়াকে পরিচিত করতে চেয়েছেন 'উপনিবেশের মধ্যে অন্য উপনিবেশ তৈরী'-র স্থপতি

হিসেবে (*'মতাদর্শ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'*)। শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ হোসেনের মধ্যে দেখেছেন 'এই সমাজের এক রাঘব বোয়াল'-কে ('প্রাক কমিউনিস্ট পবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'/অনুষ্টুপ/শারদীয়া ১৩৯২)। আবার 'লেখক সমাবেশ' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৮৫) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'পুতুল নাচ ও পদ্মানদী' প্রবন্ধে শশী এবং হোসেনকে পাশাপাশি রেখেছেন, কারণ এদের একজনও স্থিতিশীল, নিশ্চিন্ত জীবন বেছে নেয় নি, যদিও সে-সুযোগ তাদের দু'জনেরই ছি! এ ছাড়াও প্রবন্ধকার হোসেন মিয়াকে 'ঔপনিবেশিক স্বার্থের নির্মাণকারী' বলে শনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই লিখেছেন : 'কিন্তু তবু একই সঙ্গে, কবিও।' বুদ্ধিকে তটস্থ করতে করতেই এই সব মন্তব্য উপর্যুপরি আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। হোসেন যদি ঔপনিবেশিক স্বার্থের প্রতিভূ হয় তা হলে তার মধ্যে বা আরও নির্দিষ্ট করে তার গানের মধ্যে 'চেতনার উন্মেষ' খোঁজা অকারণ। আবার হোসেন মিয়া যদি রাঘব বোয়ালই হয় তাহলে ড. মিত্র-নির্দিষ্ট হোসেনের উদারতায় টান পড়ে। এবং হোসেন যদি শঠ হন, তাহলে তাকে নিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কথিত 'জেলে পাড়ারই একজন হয়ে থাকা'-র গর্বই বা থাকে কোথায়? এই ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞার সহাবস্থান একটি চরিত্রে সম্ভব? একটি চরিত্রের সঙ্গতির কথা-ও তো আমাদের মনে রাখতে হবে, যে-সঙ্গতির সীমানা সম্ভবত হোসেন কখনও লঙ্ঘন করেনি। অথচ, গুণীজনদের নিরীক্ষাকেই বা পুরোপুরি অমান্য করা যায় কিভাবে? বিশেষত নির্ধারিত লক্ষণগুলোর বেশ কয়েকটি আভাস যখন আপাতদৃষ্টিতে হোসেনের চরিত্রে পাওয়াই যায়!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ সঙ্কল্পের যাবতীয় দায় বহন করতেই উপন্যাসে হোসেন মিয়ার উপস্থিতি। ঔপন্যাসিকের দাক্ষিণ্যেই সে এক অ-মানবিক, দানবীয় শক্তির অধিকারী। সেইজন্যে ভীরু, দুর্বল মানুষগুলো হোসেনকে যতটা ভালোবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তার থেকে ভয় করে অনেক বেশি। এই মানুষগুলোর মোহ-ঘোর কাটতে না কাটতেই, তাদের জাগরণ তাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠার আগেই, হোসেন তাদের এক নতুন ঘোরের মধ্যে নিক্ষেপ করে নির্মম খানিকটা বা নিষ্ঠুরভাবে। তারপরে তারা গড়েনিক তাদের নিজস্ব ইতিহাস। তার স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রের সাধনার্থেই হোসেন মিয়া আগুনের মতো সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে চলে যায়— ছোটখাটো ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সামাজিকতা-অসামাজিকতার বোধ জ্বলে জ্বলে যায় সেই পাবকশিখায়। হোসেন মিয়া যে শুধু কুবের, ধনঞ্জয়, নকুল, পীতম, রাসু-র কাছেই রহস্যময় তা-ই নয়, সমান রহস্যময় সে-উপন্যাসটির পাঠক-সমালোচকের কাছেও; এবং ঐ রহস্যময় অস্পষ্টতার কারণ তার চরিত্র-পরিকল্পনার মূলে তাকে ঐ শক্তির আধার করে সৃষ্টি করার বাসনা। মানবহিতবাসনায় যদি ঔপন্যাসিক এত তীব্রভাবে আন্দোলিত না হতেন, যদি তাঁর বিবেচনাকে আরেকটু সজাগ রেখে সতর্ক থাকতে পারতেন তা হলে হয়তো হোসেন মিয়াকে এতটা ক্ষমতার অধিকার দিতেন না। সেই অসতর্কতার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে পরবর্তীকালে— মানুষের জীবনকাহিনী রচনা করতে গিয়ে বারবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে তাঁরই সৃষ্টি হোসেন মিয়া। সুতরাং হোসেনের গানটিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা দরকার হোসেনের চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝবার জন্যেও।

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, জলার্ক, কলকাতা, ১৯৯০]

বাবাকে কেমন দেখেছি...

সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সাংসারিক অশান্তি এড়াবার জন্য ঠাকুরদা টালিগঞ্জের বাড়িটি বিক্রি করে দিলে যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বরানগরের ভাড়া বাড়িতে এসে উঠলাম ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯-এ। আমার তখন বয়স চার, ফলে টালিগঞ্জের স্মৃতিতে নেই কোনো পরিবারের মানুষজন, শুধু থেকে গেছে বাড়ির সামনে বাগানে একটি ফলবতী পেয়ারা গাছের আবছা ছবি।

বরানগরের ভাড়াবাড়ির বর্ণনা আমার মা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি সাক্ষাৎকার (২৭ অক্টোবর ২০০৫ প্রয়াত হয়েছেন) এবং দু-একজন শিল্পী-সাহিত্যিকের স্মৃতিচারণ থেকে অনেকেই হয়তো কিছু কিছু জেনে গিয়েছেন। দুটি ঘরের একটিতে আমরা ছোট চার ভাইবোন আর আমাদের মা, অন্য ঘরটির মাঝামাঝি চটের পার্টিশনের একপাশে লেখকের বৃদ্ধা পিতা, অন্য অংশটি বরাদ্দ পুত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। সেখানে একটি কাঠের চেয়ার, টেবিল, ছোট একটি বুক-সেলফ, শোয়ার জন্য একটি তক্তপোশ, তক্তপোশের উপরে পাতলা তোশক (?) আর একটি কাঠের পুরনো আলমারি। আলমারিতে লেখকের সংগ্রহের কিছু বই আর তাঁর পিতৃদেবের সংগ্রহ চামড়া/রেক্সিনে বাঁধানো বেশ কিছু 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'কালি-কলম' ইত্যাদি প্রত্রিকা। আমরা সাধারণত ওঘরে বেশি যেতাম না, কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন। মাঝে মাঝে মা ফ্লাস্কে চা নিয়ে নিঃশব্দে রেখে আসতেন। তবে পার্টিশনের ওপাশে শায়িত অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার বার্ধক্যের একাকিত্ব বা অসহায়তার দীর্ঘশ্বাস লেখকের মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাত কিনা আজ আর জানার উপায় নেই।

কখনো বাবাকে দেখেছি ওই ঘরের সামনের ছোট বারান্দায় বসে প্রশস্ত মাঠটির দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে একান্ত চিন্তামগ্ন, হয়ত তখন মানসপটে অঙ্কুরিত হচ্ছে *ইতিকথার পরের কথা, আরোগ্য, তেইশ বছর আগে পর, হলুদ নদী সবুজ বন*-এর মতো উপন্যাস বা 'বিচার', 'উপায়', 'কালোবাজারের প্রেমের দর', 'আর না কান্না'-র মতো গল্প।

লেখার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, সাধারণত খবু ভোরে বা সন্ধ্যার পর বেশি রাত পর্যন্ত লিখতেন কিংবা দুপুরে। বিকেলে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতেন বারান্দায় বসে, মাঝে মাঝে মাঠে বাঁশি নিয়ে রেফারিং করতে নেমে পড়া। আবার ছেলেমেয়েদের ঝগড়ার মীমাংসাও করতে হত তাঁকে। বাড়িতে লুঙ্গি আর হাফহাতা গেঞ্জি, বাইরে বেরোবার জন্য লং ক্লথের সাদা গোল-হাতা ফুল পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি। বাড়িতে খড়ম পরতেন।

মাঝে মাঝে লেখা ছেড়ে এঘরে চলে আসতেন আমাদের কাছে, এঘরে রাখা বিয়ের খাটটিতে বসে দুই দিদিকে ডেকে নিয়ে সে সময়ের বিখ্যাত 'ডোয়ারকিন' হারমোনিয়াম নিয়ে দিদিদের গান ধরতে বলতেন, দিদিরা তখন নিয়মিত গান শিখত। কখনো কখনো বাবাও গলা মেলাতেন, হারমোনিয়ামও বাজাতেন। প্রধানত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এছাড়া নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা দ্বিজেন্দ্রগীতি, কখনো বা রামপ্রসাদী। বাবার একটি প্রিয় গানের কথা মনে আছে, ('কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি') বাড়িতে পাঁচ-ছটি বাঁশি ছিল, অধিকাংশই আড় বাঁশি। মাঝে মাঝে বেশি রাতে ঘুম ভেঙে যেত বাঁশির শব্দে, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে। আমাদের জানা ছিল, ঐ ঘরের সামনের বারান্দায় বসে বাবা বাঁশি বাজাচ্ছেন।

সাধারণভাবে বাবাকে একটু রাশভারী বলেই মনে হত। আবার একই সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু ব্যবহারে ছিল শিশুর সারল্য। সংসারের খুঁটিনাটি সবকিছু সামাল দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমাদের মায়ের। তবে প্রয়োজনে লেখা ফেলে রেখে এসব দায়িত্ব তাঁকেও পালন করতে হয়েছে কখনো কখনো, যার কিছু কিছু উল্লেখ তাঁর ডাইরিতে রয়েছে। নিয়মিত বাজার করতে হত, আমিও মাঝে মাঝে হাত ধরে সঙ্গে যেতাম। বাবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর আমাদের সকলকে কয়েকটি অসুখের প্রতিষেধক হিসেবে TABC ইঞ্জেকশন নিতে হত, ফলে প্রায় দু'দিন ধরে প্রচণ্ড ব্যথা আর জ্বরে কাবু আমরা সকলে। মাঝে মাঝে সারারাত ধরে ভেজানো চিরতার জল সকালে উঠেই গলাধঃকরণ করতে হত বাবা নির্দেশে। সাধারণত মা পাঠ করতেন, কখনো দিদিরা। মাঝেমধ্যে ছেদ পড়ে যেত, হঠাৎ একদিন বাবার সচেতন হলেন, আবার শুরু হলো পড়া। দুটি মহাকাব্যই শেষ পর্যন্ত পড়া হয়েছিল কিনা আজ আর মনে নেই।

তদানীন্তন কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ে আপনাদের বাড়িতে? তাঁদের আসা-যাওয়া কেমন নিয়মিত ছিল?

বরানগরের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষজন মাঝে মাঝে আসতেন। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিশিষ্ট জনেরাই আসতেন বেশি। সাধারণত তাঁরা সকালের দিকে আসতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলত। মাঝে মাঝে মা চা পৌঁছে দিতেন। অনেকের নাম মনে পড়ে যায়, যেমন, গোপাল হালদার, অনিল কাঞ্জিলাল, অনিল সিংহ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, অমল দাশগুপ্ত, চিন্মোহন সেহানবিশ, সুলেখা সান্যাল, রামকৃষ্ণ মৈত্র, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন বসু এবং আরো কেউ কেউ। মস্কো থেকে এসে কলকাতায় থাকলে ননী ভৌমিক। আর বিশেষ করে মনে পড়ে সরোজ দত্তের কথা।

কবে প্রথম বুঝলেন, যদি মনে করতে পারেন, আপনার বাবা একজন প্রখ্যাত লেখক?

স্তূপাকার কাগজপত্রের ভিড়, নানান বইপত্র চারপাশে, কলম হাতে একজন মানুষ লেখার টেবিলে এবং সর্বোপরি ইতস্তত ছাপার অক্ষরে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'—এভাবেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি উনি লেখক। আর কাগজপত্রে ছাপার অক্ষরে মাঝে মাঝেই নাম দেখতে পেলে বিখ্যাত বা প্রখ্যাত মনে তো হবেই।

কবে প্রথম বুঝলেন, আপনার বাবার তদানীন্তন রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে যোগ ছিল?

এ তো হঠাৎ একদিন বুঝতে পারার ব্যাপার নয়। বাড়িতে নিয়মিত 'স্বাধীনতা' পত্রিকা আসত। সেখানে দিনের পর দিন পুলিশি অত্যাচারের ছবি এবং তার সঙ্গে খবরের শিরোনাম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিরোধের ভূমিকা সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এছাড়া, এরই প্রতিক্রিয়ায় বাবার মাঝে মাঝে সহমর্মিতার প্রকাশ বা উচ্চারণ কিংবা মিটিং মিছিলে যোগদানের ঘটনাগুলিই জানিয়ে দেয় তিনি এইসব অত্যাচারের সক্রিয় প্রতিবাদী। একেই রাজনীতি বলে জানার কথা তো আমার ক্ষেত্রে পরে আসবে।

বাবা শেষদিকে অন্তত দু-বার বড় সময়ের জন্যে হাসপাতালে ছিলেন। আপনি তখন কিশোর। মন খারাপ করত বাবার জন্য? সেই দিনগুলি কেমন কেটেছে?

আমার জন্মের পর স্মৃতি ধারণের ক্ষমতা যখন একটু একটু করে গড়ে উঠছে, তখন থেকেই দেখছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই অল্পবিস্তর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়া, তাঁর সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন তিনি প্রায় ২৬ বছর বয়স থেকে (১৯৩৫ বা সমসময়) দুরারোগ্য মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। ডাক্তারদের মতে প্রাণান্ত কর সাহিত্যসাধনার ধকল এর কারণ। আমরা জানি, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিনটি উপন্যাস রচিত হতে থাকে প্রায় সমসময়েই, *দিবারাত্রির কাব্য* 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৪১ থেকে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ থেকে পূর্বাশায় শুরু হচ্ছে *পদ্মানদীর মাঝি*, ভারতবর্ষ পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে *পুতুলনাচের ইতিকথা*। ফাল্গুন ১৩৪১ সালে প্রকাশিত হয়েছে আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস *জননী*। এই রোগের আক্রমণে তাঁকে প্রায়ই দেখেছি রক্তাক্ত হতে। হয়ত বাবা তাঁর লেখার টেবিলে, মা এবং আমরা ভাইবোনেরা পাশের ঘরে। হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ— মা দিদিরা ছুটে গিয়ে বাবার মুখে গামছা গুঁজে দিচ্ছেন। যদিও ইতিমধ্যে প্রবল খিঁচুনিতে মুখের ভিতরে রক্তপাত ঘটে গিয়েছে। এমনও হয়েছে, পড়ে গিয়ে ফেটেছে মাথা। ফলে দিনের পর দিন বাবার অসুস্থতা, রক্তাক্ত হওয়ার দৃশ্য, কখনো বা মদ্যপানে ঝিমিয়ে যাওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ফলে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি হয়ত ছিল আমার। সর্বোপরি মনে হয়, অত অল্প বয়সে খুব বেশি গভীরে মন খারাপ করে না।

আপনার পিতামহের কথা কি মনে পড়ে?

আমার ঠাকুরদা ছিলেন যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এবং অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত। বাবার প্রয়াণের দু'বছর পর তিনি প্রয়াত হন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন একই ঘরের ক্যানভাসের পার্টিশনের ওপাশে কৃতীপুত্রের অকাল প্রয়াণের প্রস্তুতি।

আপনারা আপনাদের আত্মীয়স্বজনদের সহায়তা কেমন পেয়েছেন? বিশেষত পিতৃকুলের, আপনাদের দুঃসময়ে বাবার মৃত্যুর পর কি কোনো যোগাযোগ ঘটেছিল? তাঁদের মধ্যে কেউ আসতেন? কোনও সহায়তা?

পিতৃকুলের সঙ্গে যোগাযোগ সাধারণভাবে অনিয়মিত ছিল বাবার জীবিতকাল থেকেই। অন্যান্য সহায়তা, ধরে নিচ্ছি আর্থিক সহায়তার কথা বলা হচ্ছে, ছিল না। আমার মনে হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না থাকলে সহায়তাদানের তাগিদও বোধহয় সেভাবে আসে না। এবং বাস্তব ঘটনা হল তাঁদের সাধারণভাবে সাহিত্যের প্রতি বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে খুব একটা আকর্ষণ ছিল না, যদিও লেখকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের গর্ব তাঁদের ছিল।

আপনার বাবার শেষ দিন মনে পড়ে? শোকযাত্রা? বাড়িতে জনসমাগম?

বাবা মারা গেলেন নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ। এর দু'দিন আগে থেকেই বাড়িতে শয্যাশায়ী প্রধানত ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি আক্রমণে। ক্রমশ অচেতন হয়ে পড়তে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর অ্যাম্বুলেন্সে প্রায় অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে। আজও আমার সেই দৃশ্য মনে পড়ে, প্রায় অচেতন অবস্থায় কলম ধরার ভঙ্গিতে ডান হাতটি শূন্যে তুলে ধরে কিছু একটা লেখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যন্ত্রণাকাতর মুখে অস্ফুট অব্যক্ত ভাষা।

শোকযাত্রায় শুধুমাত্র আমার দাদাকে নেওয়া হয়েছিল মুখাগ্নি করার জন্য। অন্তিমযাত্রার বিবরণ আমরা পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারি। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো জনসমাগম বাড়িতে অন্তত হয় নি। শেষ কয়েক বছর যাঁরা বাবা এবং আমাদের নানান সহায়তা দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য নিয়মিত এসেছেন।

কোনো স্মরণসভায় গিয়েছেন?

প্রয়াণের ঠিক পরে পরেই কোনো স্মরণসভায় সম্ভবত যাই নি। তবে পরবর্তীকালে দু-একটি সভায় নিশ্চয়ই গিয়েছি, নির্দিষ্ট করে মনে করতে পারছি না।

বাবার প্রয়াণের পর আপনার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা, সংসারের হাল ধরা— মাঝের এই দীর্ঘ সময় নিয়ে যদি কিছু বলেন।

অনেকেই হয়ত জানেন, বাবার জীবিতকালের শেষ কয়েকটি বছর তাঁর চিকিৎসা এবং আর্থিক সংকট সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট কয়েকজনের ভূমিকার কথা। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অতুলচন্দ্র গুপ্তের অভিভাবকত্বে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, প্রসূন বসু প্রমুখের প্রচেষ্টা লেখকের প্রয়াণের পরও অব্যাহত ছিল। তবে স্বভাবতই সেসব ছিল সাময়িক সমাধান। ১৯৫৮ সালে ঠাকুরদার প্রয়াণের পর আমরা কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার (৬৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা) একটি বাড়িতে উঠে আসি। এ সময়ে এমনও হয়েছে আমাদের এক শুভানুধ্যায়ীর ব্যবস্থাপনায় বাবার বইগুলির কিছু কিছু সৌজন্য সংখ্যা বরানগরের এক বই বিক্রেতার দোকানে, অর্ধেক দামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়। আবার, ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আত্মীয়ের পরামর্শে সংকট কাটিয়ে ওঠার উপায় হিসেবে বহুল প্রচলিত প্রতিদিনের লক্ষ্মীপূজোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদের মা সাধারণভাবে এধরনের ধর্মাচরণে খুব আগ্রহী ছিলেন না। তাছাড়া, আমার গলার জোরও একটু একটু করে বাড়ছে। দেখা গেল অর্থাগম বৃদ্ধি পায় নি বরং বাতাসা, নকুলদানার খরচ থেকে যাচ্ছে। ফলে দেড়-দু'বছরের মধ্যেই ওপাট চুকে গেল। এ সময়ে আমাদের এক অতিনিকট আত্মীয় দায়িত্ব নেয় প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনা করার। কিছুকাল পরে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক কবি যুগান্তর চক্রবর্তীর। ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা থেকে লেখকের কনিষ্ঠ কন্যা আমার ছোড়দি শিপ্রার সঙ্গে বিয়ের আয়োজন। এ উপলক্ষে অর্থ সংস্থানের উদ্যোগ নিতে গিয়ে দেখা গেল, সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টির দ্বারা আমরা প্রতারিত হয়েছি। ব্যাংকের সঞ্চয় প্রায় শূন্য, প্রকাশকদের কাছ থেকেও প্রাপ্য অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সময়েই প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিলেন যুগান্তরদা এবং তখন থেকে লেখকের রচনাগুলি

অনেকাংশে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মনে আছে, ১৯৬১-তে ছোড়দির বিয়েতে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বিয়ের দিন সকালে এসে একটি দামি শাড়ি উপহার দেন। ১৯৬২-তে আমার বড়দি শান্তার বিয়ে হয়। দুটি বিয়েই সামান্য আয়োজনে সম্পন্ন হয়। এরপর ১৯৬৬ সালে আমি একটি ব্যাংকে চাকরি পাই, ফলে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসে।

বাবার প্রয়াণের পর তাঁর পাণ্ডুলিপি, বইপত্র, কিভাবে রক্ষিত হল? কারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

আমরা সকলেই ছোট, আমাদের মা সংসার এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামলাতেই ব্যস্ত। ফলে পাণ্ডুলিপিগুলো বাঁচিয়ে রাখার গুরুত্ব আমরা বুঝি নি সে সময়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা বা বাবার বাতিল করা কাগজপত্র দিয়ে নিয়মিত উনুন ধরানো হয়েছে। লেখক-পিতার মৃত্যু এবং নষ্ট করা পাণ্ডুলিপি বলতে শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে কয়েকটি উপন্যাস, গল্পের বিচ্ছিন্ন কিছু অসম্পূর্ণ অংশ, প্রবন্ধের একাধিক অসম্পূর্ণ পাঠ, কয়েকটি ডায়েরি, বাঁধানো ছোটবড় কয়েকটি খাতা, চিঠিপত্র, কবিতার দুটি খাতা, কবিতার কিছু ছিন্ন পৃষ্ঠা, ইংরেজিতে লেখা কিছু 'নোটস' ইত্যাদি।

এই থেকে যাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকেই আমরা পেয়ে যাই বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা-সমৃদ্ধ লেখকের ডাইরি, চিঠিপত্রের সংকলন, '*অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*'। সংকলনটি প্রকাশের পরে পরেই ডায়েরির কোথাও কোথাও লেখকের তথাকথিত 'অতিলৌকিক' উচ্চারণ প্রকাশ করার যৌক্তিকতা নিয়ে সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তীকে অনেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, কখনো কখনো লেখক পরিবারকেও। তবে আজ এতদিন পরে মনে হয়, এই অভিযোগ অনেকটাই স্তিমিত হয়েছে। লেখকের সমগ্র সাহিত্যভূমি, তাঁর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, স্থায়ী অসুস্থতা, সর্বোপরি অস্তিত্বের অমোঘ দ্বান্দ্বিকতাই হয়ত এর কারণ। এছাড়া, এই পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেই আমরা পেলাম তাঁরই সম্পাদনায় লেখকের কবিতার একটি সংকলন *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*।

এ পর্যন্ত লেখকের মূল পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং বাংলা একাডেমী, ঢাকাকে সংরক্ষণ তথা সম্ভাব্য গবেষকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ১৯ মে ১৯৯৭ লেখকের নব্বইতম জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে *জননী*, *দিবারাত্রির কাব্য* (প্রধানত আদিপাঠ), *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *জীবনের জটিলতা* (বহুলাংশে ভিন্ন একটি পাঠ), *অহিংসা* এবং কয়েকটি গল্পসহ মোট ৪৪৬ পৃষ্ঠার মূল পাণ্ডুলিপি কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অগণিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকের প্রতি কিছুটা দায়বদ্ধতা থেকে লেখকপত্নী ঢাকায় বাংলা একাডেমীকে পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা প্রদানের একটি প্রস্তাব দেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁরা অবিলম্বে সম্মত হন। ওইদিন সকালে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন দপ্তরের মাধ্যমে ঢাকা-বাংলা একাডেমীকে বিভিন্ন রচনার নমুনাস্বরূপ ৪৬ পৃষ্ঠার মূল পাণ্ডুলিপি প্রদান করা হয়েছে। আমাদের কাছে থেকে যাওয়া পাণ্ডুলিপি ভবিষ্যতে উপযুক্ত স্থানে প্রদান করা হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা লেখালিখি, তার নানা পাঠ, সংস্করণ উদ্ধারে সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকা আছে আমরা জানি। এই কাজে কবে ব্রতী হলেন?

অনেকেই হয়ত জানেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল, প্রধানত সঠিক পাঠসহ একটি সুসম্পাদিত রচনাবলি প্রকাশের তাগিদে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনলস উদ্যোগে আইনি জটিলতার বাধা পেরিয়ে, এবং অবশ্যই পূর্বতন প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে নতুনভাবে সমগ্র রচনা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখনই সকলের সহযোগিতায় দ্বিগুণ উৎসাহে বেশ কিছু, বলা যেতে পারে 'উজ্জ্বল উদ্ধার' সম্ভব হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যে যেতে চাই না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের এক ব্যাপক উন্মাদনা চারপাশে দেখছি। যে মাত্রায় শতবর্ষ পালনের আয়োজন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ততখানিই পঠিত? আমি এমন কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনের কাছ থেকে শতবর্ষ পালনে আমার কিছু সহযোগিতার অনুরোধ পেয়েছি, যেসব পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে এ পর্যন্ত হয়ত একটিও প্রবন্ধ বা আলোচনা প্রকাশিত হয় নি। তাঁর কিছুকিছু সাহিত্যকর্ম অবশ্যই পাঠক আনুকূল্য পায়, তবে তা কখনোই তাঁকে স্মরণ করার এই সার্বিক উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমার মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম, সাধারণ মানুষের প্রতি নির্ভেজাল দরদ, মমত্ব (যা তাঁর প্রথম লেখাটি থেকে শেষতম রচনাগুলির বাক্যবন্ধে এমনকি একটি বা দুটি শব্দ নির্বাচনেও প্রকাশ পায়), লক্ষ্যে অবিচল থাকা, সর্বোপরি সাম্যবাদে আস্থা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা সম্ভ্রমের দূরত্বও এনে দিয়েছে এবং তাঁকে স্মরণ অনেকাংশে আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্দেহ নেই, তাঁর সাহিত্যের চর্চা উত্তরোত্তর বেড়েছে। আমাদের পারিবারিক সংগ্রহেই রয়েছে প্রায় ৪৫টির মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ। কিছুকাল আগেও বাংলাদেশের সমালোচনা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ততটা চর্চিত ছিলেন না কিন্তু আজ সেখানেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্যের আলোচনা প্রকাশিত হতে দেখি।

এই সুযোগে সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই। লেখকের কিশোর গল্পগুলিকে বাদ দিলে এ পর্যন্ত লভ্য বড়োদের গল্পের সংখ্যা ২৭২ এবং এর মধ্যে সাধুভাষায় লিখিত গল্প ৭৬টি এবং চলিতভাষায় ১৯৬টি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ১১টি, চলিতে ২৬টি এবং কিছুকাল আগে সংগৃহীত একটি অগ্রন্থিত উপন্যাস লেখা হয়েছে আংশিক চলিত ভাষায় এবং বৃহত্তর অংশটি সাধু ভাষায়। কোন একটি গল্প বা উপন্যাস কেন সাধুভাষায় বা চলিতে, গল্প বা উপন্যাসটির রচনার কাল, সর্বোপরি রচনাটির কাহিনীর প্রয়োজনেই সাধু বা চলিত ভাষায় প্রয়োগ এ বিষয়েও তো চুলচেরা চর্চা হতে পারে? প্রসঙ্গত, অধিকাংশ গল্পের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের কাল থেকে দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে ১৯৪১-৪২ সালের পর থেকে প্রকাশিত গল্পগুলির প্রায় সবকটি চলিত ভাষায় লেখা। আমরা জানি, ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভের কয়েক বছর আগে থেকেই বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বাড়ছে। এই সময় বিভিন্ন মিছিলে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চলার সঙ্গে সঙ্গে লেখার ভাষাতেও কি আনতে চাইছেন সেই ঋজুতা এবং তাই এই চলিত ভাষার ব্যবহার? আবার *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসটির প্রথম তথা আদিপাঠ লিখিত হল সাধুভাষায়। প্রায় পাঁচ বছর পরে 'বঙ্গশ্রীতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত পাঠ লিখিত হল চলিত ভাষায় এবং এটিই গ্রন্থাগারে

প্রকাশের সময় গৃহীত হল। কেন ভাষার এই পরিবর্তন? কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত এবং এ পর্যন্ত অগ্রন্থিত একটি উপন্যাসের পত্রিকা পাঠে এক ব্যতিক্রমী ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা গেল। ১২ কিস্তিতে সমাপ্ত *খুনী* উপন্যাসটির প্রথম চারটি কিস্তি চলিত ভাষায় লিখিত হয়ে পঞ্চম কিস্তি থেকে শেষ পর্যন্ত সাধু ভাষার ব্যবহার। পঞ্চম কিস্তির সঙ্গে প্রকাশিত হল লেখকের চার লাইনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য। তারই দু'টি লাইন : "...কাহিনীটি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপ গ্রহণ করায় এখন মনে হইতেছে শুদ্ধ ভাষাই কাহিনীটির পক্ষে বেশি উপযোগী হইবে। তাই ভাষার এই পরিবর্তন।" এবং উপন্যাসটি পাঠ করলে দেখা যাবে এখান থেকেই চরিত্রগুলির জটিলতা প্রকাশে রচনাশৈলীর এক আশ্চর্য উত্তরণ এবং সাবলীল গতি।

আর একটি বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের প্রকাশের সময় কম বা বেশি পরিমার্জন করেছেন এবং তুলনা করলে দেখা যাবে সেগুলির উল্লেখযোগ্য উত্তরণ ঘটেছে। এগুলি নিয়েও তো গভীর আলোচনা হতে পারে।

সবশেষে, সাম্প্রতিককালের মানিকচর্চা বিষয়ে একটি আশার কথা বলি। সেটি এই যে, ইদানীং দেখা যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন আর ততখানি ফ্রয়েড বা মার্কস-এ অথবা প্রাক্-কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট-পরবর্তী পর্বে বিভাজিত হচ্ছেন না, সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব নিয়েই বিবেচিত হচ্ছেন। 'শৈলজ শিলা', 'টিকটিকি', 'ভূমিকম্প' বা 'হলুদ পোড়া' প্রভৃতি গল্পকে অস্বীকার করব কী করে?

হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত

সুমিতা চক্রবর্তী

উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র কর্মশীলতা, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, উচ্ছ্বাস-আবেগ-হোসেন মিয়া ও তাহের দ্বীপ যেন তাহারই উচ্চতম চূড়া, তাহার শীর্ষদেশ সূর্যালোক ঝলসিত জ্যোতির্বিন্দু। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ৫১২)

একথা বলা ছাড়াও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন হোসেন মিয়ার 'দুর্ভেদ্য রহস্যাবৃত প্রকৃতি ও গতিবিধি'; দেখেছিলেন তার মধ্যে 'বলিষ্ঠ উদারতার ব্যঞ্জনা'।

বিস্মিত হই না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাহিত্য-রুচি ও উপন্যাস-ধারণার যুগে নিজের শিল্পবোধ অর্জন করেছিলেন সে যুগে উপন্যাসে সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগ-অনুভূতির অথবা ভাববাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রত্যাশিত। পৃথিবীতে যত অসঙ্গতিই থাকুক, থাকুক মানুষের কদর্য পরাজয়— শিল্পে মানবাত্মার জয় ঘোষণা করতে হবে, দেখাতেই হবে জীবনের এক সুসঙ্গতি— এই বিশ্বাস সামনে রেখেই তিনি বিচার করেছিলেন বাংলা উপন্যাসের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আদৌ সেই ভাবনা-বৃত্তে ধরা পড়ে না, তাই তাঁর ব্যাখ্যা থেকে গেছে অ-যথার্থ।

ঈষৎ বিস্মিত হই যখন দেখি অনেক পরবর্তীকালের সুধী সমালোচকও হোসেন মিয়ার চরিত্র ও তার সমুদ্র-বেষ্টিত নির্জন রহস্যময় দ্বীপের পরিকল্পনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক মনের শিকড় সন্ধান করেছেন। প্রায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেরই প্রতিধ্বনি করে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন— "গ্রন্থটি শেষ করে এক এক সময়ে মনে হয়, ওই রহস্যময় ময়না দ্বীপ যেন ঠিক বাস্তব কোনো দ্বীপ নয়, কুবের ও তার মত অনেক দুঃখপ্রহৃত মানুষর অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, এক সাঙ্কেতিক চরিতার্থতার প্রতীক বুঝি!" (*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, ১৯৮৬, পৃ. ৩৩২)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসের হোসেন মিয়া ও তার ময়না দ্বীপকে লেখক যে একটি সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় মুড়ে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে সংকেত যে আমাদের কোনো রোমান্টিক রহস্যের বা রহস্যময় চরিতার্থতাবোধের ইঙ্গিত দেয়, তা বোধ হয় নয়। অত্যন্ত প্রখর ও নগ্নভাবে সত্য এক বাস্তবতাকেই লেখক উদ্‌ঘাটন করেছিলেন ঐ সংকেতের সাহায্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও সমাজ বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকার অর্জন করেছিলেন সচেতনভাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করবার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। 'ভাববাদের চোরা গলি' এড়িয়ে

যাওয়াই ছিল তাঁর স্বকথিত ঘোষণা। তাঁর শিল্পীর মন সংকেত রচনা করেছে সেই সংকেতের অমোঘ ইঙ্গিতে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যই। সেদিক দিয়ে তাঁর সংকেত খানিকটা রূপকধর্ম বিশিষ্ট। এমন কি, *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসও, প্রাঞ্জলতার একটু অভাব থাকলেও, তাঁর প্রবণতা সে রকমই। সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

হোসেন মিয়ার মধ্যে পুরুষকারের প্রতিরূপ দেখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় :

> সে নিজে ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকুল জলরাশির মাঝখানে দ্বীপ রচনায় একাগ্রচিত্ত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। ... সে কারণেই ময়না দ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে *স্থিরনেত্র* হোসেন মিয়ার *পুরুস্কার* প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিকবাবুর রচনায় দরকার হয়— কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জন্যই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ১৯৮০, পৃ. ৩১০-৩১১)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার বিখ্যাত গানটিকে চেতনার নিষ্ক্রিয়তার এবং নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। হোসেন মিয়ার দিক থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছুটা গ্রহণযোগ্য। হোসেন অবশ্যই সাহসী, কর্মিষ্ঠ, উদ্যোগী, শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। বড় মাপে পরিকল্পনা করবার শক্তি তার আছে, অনেক দূর পর্যন্ত সে দেখতে পায়। কিন্তু তাই বলে সে কি *পুরুষকারের* প্রতিমূর্তি? পুরুষকার বলতে কি শুভবোধ-বিচ্ছিন্ন কেবলমাত্র ক্ষমতার জোরই বোঝায়? গাওদিয়া গ্রামে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রত শশীর চরিত্রে (*পুতুলনাচের ইতিকথা*) আমরা যে অনমনীয় *পুরুষকার* দেখি হোসেন মিয়া তার সমতুল্য হয়ে ওঠে না। তার আফিমের ব্যবসা কেবলমাত্র কুবেরের কাছে তাকে বাস্তব করে তোলার জন্য— এ ব্যাখ্যাও সংশয়বহ। হোসেন মিয়া দরিদ্রের বিপদে কর্জ দেয়, রীতিমত টিপছাপ লিখিয়ে। তার উদ্দেশ্য ঋণজালে বেঁধে মানুষগুলোকে করায়ত্ত করে ফেলা। বিশেষ মতলব নিয়েই সে কুবেরের ঘরের চালে নিষিদ্ধ আফিমের প্যাকেট রাখে। সব শেষে কুবেরকে চুরির দায়ে জড়িয়ে ফেলে ময়না দ্বীপে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরকমভাবেই সে ময়না দ্বীপের লোকসংখ্যা বাড়ায়। একদিকে তাদের রিক্ত করে, অন্যদিকে তাদের লোভ দেখায়— সে লোভ প্রায়ই অবৈধ কামনার চরিতার্থতার লোভ। তাই আধুনিক কালের অন্য এক সমালোচক যখন বলেন— "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ সঙ্কল্পের যাবতীয় দায় বহন করতেই উপন্যাসে হোসেন মিয়ার উপস্থিতি। ... তার স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রের সাধনাতেই হোসেন মিয়া আগুনের মতো সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে চলে যায়— ছোটখাট ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সামাজিকতা-অসামাজিকতার বোধ জ্বলে জ্বলে যায় সেই পাবকশিখায়।" (জলার্ক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা এক, হোসেন মিয়ার গান, সরোজ দত্ত, মাঘ ১৩৯৩-পৌষ ১৩৯৪) তখন আমাদের বিস্ময় বাড়ে। কোথায় হোসেন মিয়ার শুভ সঙ্কল্প? দরিদ্র মানুষগুলিকে ময়না দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন ও সাহস দান করা?

ময়না দ্বীপের যে চেহারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দেখিয়েছেন সেখানে কোনো স্বপ্নই দেখা যায় না। দরিদ্র বিপন্ন মানুষগুলি সেখানে গিয়ে রিক্ততর হয়ে যায়— রাসুর উদাহরণে তা স্পষ্টতই দেখিয়েছেন লেখক। সামাজিক নিয়ম পারিবারিক নিয়ম সংক্রান্ত মূল্যবোধসমূহ সেখানে পরিত্যাজ্য। লোভ ও কামনাই জয়ী। এনায়েত ও বসির মিয়ার স্ত্রীর মিলন প্রথম উদাহরণ, কুবের কপিলার একত্র যাত্রা দ্বিতীয় উদাহরণ। সেখানে অমানুষিক পরিশ্রমের পরও গ্রাসাচ্ছাদনটুকুই মাত্র জোটে। বাধ্য না হলে

সেখানে কেউ যায় না। উপায় থাকলে সেখান থেকে মানুষ পালাতে চেষ্টা করে। ময়না দ্বীপ কারো স্বপ্নের দ্বীপ নয়। কোনো চরিতার্থতাবোধের সূর্যালোক সেখানে জ্যোতির্বিন্দুর মতো জ্বলে ওঠে নি।

হোসেন মিয়ার ভিন্ন রূপ যে কোনো সমালোচক দেখেন নি তা নয়। তার ময়না দ্বীপ যে ঔপনিবেশিক অভিপ্রায় সিদ্ধিরই প্রয়াস তা লক্ষ করেছেন বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। (*মতাদর্শ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পত্র*', কার্তিক-পৌষ, ১৩১১)। তার কুচক্রী ও মতলববাজ চরিত্র দেখে তাকে 'রাঘব বোয়াল' বলে অভিহিত করেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ ('প্রাক-কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *অনুষ্টুপ*, শারদীয় ১৩৯২)। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণে মন্তব্যগুলি যাথার্থ্য পায় নি। ঔপনিবেশিকতাবাদী চারিত্র্য সর্বাংশে হোসেন মিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশবাদ একটি রাষ্ট্রনৈতিক আগ্রাসন নীতি। এই শোষণ ও আগ্রাসন কোনো একক ব্যক্তির ক্ষমতাসাধ্য নয়, যদি না সমগ্র রাষ্ট্রের সমর্থন থাকে তার সঙ্গে। ঔপনিবেশিকতা রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রেরই একটি সার্বিক পররাষ্ট্রনৈতিক চেহারা। কিন্তু হোসেন মিয়া সামন্ততান্ত্রিক পথে অধিকার বিস্তার করে না। পদ্মানদীর পারের কেতুপুর গ্রামের জমিদার মেজোবাবুর কাছে প্রজারা বাঁধা আছে। জমিদার খেয়াল-খুশি মতো তার প্রজাদের শাসন, পীড়ন, শোষণ এবং সময়ে সময়ে সাহায্যও করে থাকে। এখানেই সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের চেহারা। সেখান থেকে ছিন্ন হয়ে তার প্রজারা হোসেন মিয়ার প্রজা হতে চলেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও আসলে তারা প্রজা নয়— হয়ে উঠছে শ্রমিক। মাঝি, জেলে, চাষির জীবন ছেড়ে গ্রাসাচ্ছাদন ও একটি ঘরের বিনিময়ে ময়না দ্বীপে জমি চাষ করে সে মজুরিটুকুই পাবে, পাবে না উৎপাদনের অংশ। আসলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে বেরিয়ে আসা ধনতন্ত্রের নিয়মগুলিই হোসেন মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত। অর্থাৎ এই স্বরূপও কোনো কোনো সমালোচক বেশ স্পষ্টই অনুধাবন করেছেন— "হোসেনের সমস্ত শক্তির উৎস অর্থ এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও অর্থ। বুর্জোয়া মানি-মার্কেটের ভাব-প্রতিরূপ হিসেবে হোসেন মিয়াকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।" (জীবনে মানিক, সাহিত্যেও মানিক, গুণময় মান্না; 'জলার্ক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা দুই; পৌষ ১৩৯৫)।

'বুর্জোয়া মানি মার্কেট' অভিধায় কথাটিকে বেশ স্পষ্টই করেছেন গুণময় মান্না। আমরা একেই বলেছি ধনতন্ত্র — ধনতন্ত্রের সূত্র। কিন্তু ময়না দ্বীপ কিসের প্রতিরূপ তা গুণময় মান্না ব্যাখ্যা করেন নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সুবিশ্লেষিত প্রবন্ধে অরুণ বসুও দেখেছেন— "হোসেন মিয়া ধূর্ত ব্যবসায়ী। নানা চালানের ব্যবসায়ে তার উপার্জন এখন অবিশ্বাস্য, সেই সঙ্গে আফিমের চোরাচালানেও সে রপ্ত। ... শহরে গরু-ছাগল চালান দেওয়া তার ব্যবসার অন্যতম প্রত্যক্ষ অঙ্গ, কিন্তু ময়না দ্বীপে মানুষ চালান দেওয়াই তার সমস্ত বাণিজ্যের পরোক্ষ লক্ষ্য।" (*মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, অরুণ বসু, 'পদ্মানদীর মাঝি', ১৯৮১, পৃ. ১০৪-১০৫)।

এর পরেও হোসেন মিয়ার চরিত্রটিকে অরুণ বসুর রহস্যময় মনে হয়, মনে হয় চরিত্রটি সম্পর্কে লেখক মন স্থির করতে পারেন নি। তাঁর এরকম মনে হবার কারণ— ময়না দ্বীপের তাৎপর্য তিনি খুঁজে পান নি। "পদ্মানদীর মাঝি শেষ পর্যন্ত ময়না দ্বীপের যাত্রীতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু এতে লেখকের কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হল, এই

প্রশ্নটিই আমাদের কিছু উদ্‌ভ্রান্ত করে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না হোসেনের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন জাল বিস্তারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব।" (ঐ, পৃ. ১১০)

এ সমস্যা অনেকেরই। কিন্তু হয়তো ময়না দ্বীপের সংকেতটি বুঝতে পারলে ব্যাখ্যাটি পাওয়া যেত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দিষ্ট রূপকথাটি একই সঙ্গে হোসেন মিয়া ও ময়না দ্বীপকে দু-হাতে ধারণ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি কথা রাখতে হবে— ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেও তার বহু আগে থেকেই তাঁর মন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমুখী ও ভাববাদ-বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও মার্কসবাদের বা সমাজতন্ত্রবাদের মূল তত্ত্ব ও সূত্রগুলি সম্পর্কে কেউ অনবহিত থাকবেন— এমন না হতেই পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮। ১৯২৯-এ তাঁর বয়স একুশ। এই বছর থেকেই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শাসকের কমিউনিজ্‌মভীতি সম্পর্কে বাঙালিদের অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত একাধিক বাঙালি এই মামলার আসামি। ১৯৩৩-এ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তি ঘটে, ১৯৩৪-এ ব্রিটিশ শাসক নিষিদ্ধ করে দেয় কমিউনিস্ট পার্টিকে। ১৯৩৪-এ আরম্ভ হয় *পদ্মানদীর মাঝি*। 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় কিছু অংশ প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে গিয়ে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩৬-এ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার গভীরকর্ষিত ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের সূত্রগুলি তখনই প্রবেশ করতে শুরু করেছিল মনে করা অসংগত নয়। *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাসে ব্যক্তির সম্পর্ক বিন্যাসে, সমাজ-বিন্যাসে ও চরিত্রগুলির মনের অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিকতার সূত্র কিভাবে নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে তা-ই তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমরা বুঝতে চেয়েছি অন্যত্র। এখানে দেখি সমাজসচেতন ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে কিভাবে উৎপাদন ও উৎপাদক সম্পর্ক বিবর্তিত হয় তারই একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক।

কেতুপুর গ্রাম জমিদার-শাসিত। সামন্ততন্ত্রের শিকার। ঔপনিবেশিকতার সামন্ততন্ত্রে প্রজারা দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে অথচ পরিত্রাণের উপায় জানে না। তাদের অস্তিত্ব যখন ভেঙে পড়ার মুখে তখনই দেখা দেয় হোসেন মিয়া। চতুর ব্যবসায়ী। নির্ভুল ক্যাপিটালিস্ট। সামন্ততন্ত্রের জীর্ণতা ভেঙেই ধনতন্ত্রের যাত্রা শুরু। একটি পর্যায়ের পর আর একটি পর্যায়।

ক্যাপিটালিজ্‌মের একটিই ধর্ম, একটিই লক্ষ্য— বিত্তের বিস্তার সাধন। তার পথ সরাসরি লুণ্ঠন নয়, দেবতা বা রাজা বা প্রভুর নামে হরণ করা নয়, তার পথ ব্যবসায়ের। সেই সঙ্গেই তাকে হতে হয় কঠিন শ্রমে অভ্যস্ত, ঝুঁকি নিতে হয় বারবার, বিশাল সম্পদের স্বপ্নে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করবার শক্তি থাকা চাই। ক্যাপিটালিজ্‌ম কোনো ছোট মাপের চৌর্যবৃত্তি নয়; ক্যাপিটালিজ্‌ম শক্তিমানের বিপুল বিত্ত সঞ্চয়ের কামনাকে সত্যে পরিণত করবার প্রক্রিয়া।

এ কাজে ক্যাপিটালিস্ট-এর দুটি পুঁজি লাগে— এক, মূলধন; দুই শ্রমিক। মূলধন বাড়ে ব্যবসাবুদ্ধিতে; শ্রমিক সংগৃহীত হয় চাতুর্যে। এই দুটিতেই হোসেন মিয়া অপরিসীম দক্ষ। ক্যাপিটালিজম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সব কিছুই সেখানে হিসেব কষে দেখা হয়। ক্যাপিটালিজম্-এর কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, পাপের ভয় নেই, মানবিকতাবোধও নেই। তার একটাই মন্ত্র— তা সম্পদ অর্জনের। খাঁটি ক্যাপিটালিস্টকে হতে হয় দানবের মতো কর্মক্ষম; এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক

বেশি প্রত্যাশা করার ও ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা ও সাহস থাকে তার। হোসেন মিয়ার সবই আছে। তার গানে নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদও একান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে হোসেন মিয়ার শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েও তার বিত্ত অর্জনের আকাঙ্ক্ষাটি শেষ পর্যন্ত ময়না দ্বীপে বসতি গড়ে তোলার চেষ্টায় পর্যবসিত হয় কেন— এটাই প্রশ্ন।

এখানেই মনে হয় 'ময়না দ্বীপ' প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতীক— সত্যিই বাস্তবের কোনো নির্জন দ্বীপ নয়। ধনতন্ত্রবাদীর পুঁজির লগ্নি, উৎপাদনের বৃদ্ধি ও লভ্যাংশের অধিকার নানা মাধ্যমে ব্যবহার করে ঘটতে পারে। কোথাও কলকারখানা, কোথাও কৃষি-পণ্য, কোথাও জনরঞ্জকপণ্য— পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে একই, কিন্তু উৎপাদন আলাদা আলাদা। শ্রমিক সেখানে শ্রম দেবে, পারিশ্রমিক পাবে কিন্তু লভ্যাংশ পাবে না। পাবে না মূলধনের অধিকার। এই পদ্ধতিটির প্রতীকরূপেই দেখা হয়েছে ময়না দ্বীপকে। ময়না দ্বীপকে পরিপূর্ণ দেখতে চায় হোসেন মিয়া যেমন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী তার উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিখুঁত দেখতে চায়।

একই রকমভাবে লোভ দেখিয়ে, বিপদে ফেলে, বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করে সে। ধনতন্ত্রের পদ্ধতিতে শ্রমিক জানে যে সে শোষিত হচ্ছে কিন্তু সে নিরুপায়। একই নিরুপায়তা নিয়ে স্বেচ্ছায় ময়না দ্বীপে যায় তারা। মালিকের ইচ্ছা পূরণের জালে জড়িয়ে পড়ে আর নিজেদের ভোলার জন্য অবৈধ নেশায় অবসর ভরিয়ে তোলে। কখনো আফিম, কখনো অবৈধ নারীসংসর্গ। ক্যাপিটালিস্ট সমাজের অভ্রান্ত ছবি। ময়না দ্বীপের জীবনের যে ছবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন সেখানে অনেকবারই এই ইঙ্গিত আছে। একটি বিবরণই যথেষ্ট—

> এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়।

ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতি এভাবেই লোভের হাত বাড়ায় সমস্ত কিছুর দিকে— হোক সে মানুষ অথবা প্রকৃতি, হোক সে কুবের, রাসু, আমিনুদ্দির জীবন অথবা ময়না দ্বীপের মাটি। *পদ্মানদীর মাঝি* শেষ হয়েছে রোমান্টিকতা কিংবা চরিতার্থতাবোধের নয়, নৈরাশ্যবোধে— কুবেরের অসহায় উক্তিতে—

> ময়না দ্বীপি হোসেন আমারে নিবই কপিলা।
>
> একবার জেল খাইটা পার পামু না।

সামন্ততন্ত্র থেকে যে ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির দিকে পৃথিবী সরে আসছে তার বিকৃতি উপলব্ধি করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতটুকুও দেরি হয় নি। তাঁর পক্ষে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ক্রমে ঝুঁকে পড়া বেশ স্বাভাবিকই ছিল। তাই ঘটেছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে সাম্যবাদে দীক্ষা নেবার আগেই, ১৯৩০-৩৪-এর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র ও নব্য ধনতন্ত্র তথা আধুনিক পুঁজিবাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো কতখানি স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে তারই নিদর্শন হোসেন মিয়ার চরিত্রচিত্রণ আর ময়নাদ্বীপের রূপক।

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১]

খুনী

হাই তুলে মুকুন্দ বিছানায় উঠে বসে। আলোয় ঝলমল উজ্জ্বল সুন্দর সকাল। বাতাসে আজ শীতের আমেজটুকুও নেই। বসন্তের দোমনা ভাব যেন শেষ হয়েছে। আজ শীত শেষ হয়ে কাল থেকে গ্রীষ্ম আরম্ভ হবে।

নিরীহ গোবেচারি ভালো মানুষ মুকুন্দ বেশ সজীব বোধ করে।

মনের সহস্র আড়াল থেকে উল্লাসের পুরানো অনুভূতি ক্ষীণ সাড়া পাঠিয়েছে।

কেমন একটা মুক্তির স্বাদ। ভার যেন একটু হালকা হয়েছে, একটু যেন ঢিল হয়েছে বন্ধন। এখনও যেন একটা আবেশের জের চলছে, স্বপ্নের খেই দিনের আলোতেও হারায়নি। ভাগ্যের জাঁতাকলে সে আটকা পড়েছিল ছ-মাস আগে, তারপর প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে চাপ শুধু বেড়ে এসেছে আজ পর্যন্ত। অদৃষ্টের ফাঁকির সঙ্গে নিজের ফাঁকি জড়িয়ে সে এক অদ্ভুত ফাঁদ রচনা করে নিজেকে বেঁধেছে। পিষে তার চ্যাপটা হয়ে যাবার কথা। যে-কোনো মুহূর্তে মিথ্যার প্রাসাদ হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে ভেঙে পড়তে পারে। ছ-মাস লুকিয়ে রেখেছে, লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা ও আয়োজনের পরিমাণ বেড়েছে দিন দিন, সেগুলোও লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে ধরা পড়ে যেতে পারে। আজ কেন তার নিজেকে হালকা মনে হবে?

কামিনী জানে না। আজও কিছুই জানে না। কিন্তু তার জানাকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে মুকুন্দ? মরে না গেলে কামিনী সব জানবেই আর ক-দিনের মধ্যে। সেটা পরার বাড়া হবে কামিনীর পক্ষে।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে তার মনে হয়েছিল, কামিনীর নিঃশ্বাস পড়ছে না, কামিনী মরে গেছে। এ-কথা কেন [...] না। কামিনীর মরার কথা সে কখনও ভাবেনি। [...], ওকথা কি মনে আনতে আছে! অথচ ঘুম ভেঙেই সকলের আগে অতি স্পষ্টভাবে তার মনে হল, কামিনী আর বেঁচে নেই। খুব যে খানিকটা চমক লাগল তার তা-ও নয়। আর-দশটা সাধারণ চিন্তা যেমন সহজভাবে মনে আসে কামিনীর মৃত্যুর চিন্তাটাও তেমনি বিনা আড়ম্বরে তার মনে এল। কামিনী ঘুমোচ্ছে মনে করার সঙ্গে কামিনী মরে গেছে মনে করার যেন বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই!

তবে হ্যাঁ, কামিনী [...] ঘুমোচ্ছে এটা সে জানত : আগাগোড়া যতক্ষণ [...] মনে হয়েছিল সে বেঁচে নেই ততক্ষণ একমুহূর্ত [...] সে ভোলেনি যে পাশে শুয়ে [...] ঘুমোচ্ছে জেনেও কি করে [...]? অতক্ষণ ধরে [...] আজ সকালে অদ্ভুত ঠেকেছে [...] মনে হয়নি এতে খাপছাড়া কিছু [...] এ ব্যবহার বিসদৃশ!

খারাপও বোধ হয় লাগেনি ওইজন্যই। সুস্থ বলে জোয়ানমদ্দ মেয়েমানুষটা নিরাপদে নিদ্রা যাচ্ছে এই জ্ঞান টনটনে থাকায় সে মরে গেছে ভাবতে কষ্টও হয়নি, আফসোসও জাগেনি। অনুচিত অসংগত চিন্তাকে আনমনে চেখে দেখবার প্রক্রিয়াটা বিশেষ অবস্থায় নিরীহ ভালো মানুষেরও আয়ত্তে এসে যায়। পাপের কথা শুনলে যে

জিভ কাটে,— লোক দেখাবার জন্য নয়, সত্যই আঁতকে উঠে জিভ কাটে, মহাপাপের কথা সেসময় বিশেষ নির্বিবাদে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে পারে। অত্যন্ত বেশিরকম প্রয়োজন বলে তখনকার মতো খেয়াল করতেই তার ভুল হয়ে যায় যে চিন্তাটা তার পাপচিন্তা!

মুকুন্দের ক্ষমতা নেই যে অর্ধেক হার্টফেল না করে সচেতনভাবে ভালোমন্দ উচিত* অনুচিত পাপপুণ্যের হিসাব রেখে কামনা করতে পারে কামিনী মরে যাক। অতি তুচ্ছ বাজে চিন্তা হিসাবে কথাটাকে সে মনে আসতে দিতে পারে। তার কাছে কোনো দাম নেই ও-চিন্তার। নিজের সঙ্গে ও তার একটা তামাশা মাত্র!

নইলে সত্যি সত্যি সে যদি ওকে মারতে চাইত, কাল রাত্রে শেষ করে দিতে পারত না? বাড়িতে শুধু তারা দুজন, আর কেউ ছিল না। কাল হঠাৎ বাড়িটা খালি হয়ে গেছে, এখনও তিন দিন বাড়িতে তারাই শুধু দুজন থাকবে। সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হয়ে ছিল, অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল কামিনী, নিজে সে কি যা খুশি করতে পারত না কাল রাত্রে? তিন দিন কেউ খোঁজও নিতে আসত না কামিনীর কী হয়েছে। এমন সুযোগ সে যে কাল রাত্রে যেতে দিয়েছে তাতেই কি প্রমাণ হয় না তার কোনো খারাপ মতলব নেই? শুধু ভাবলে কী এসে যা! মাঝরাত্রে ঘুম না এলে অমন কত কথা লোকে ভাবে!

খালি বাড়ি! একেবারে খালি বাড়ি!

কাল রাত্রির চেয়েও আজ সকালে বাড়িটা যেন বেশি খালি মনে হচ্ছে! প্রতিরাত্রে ঘরে খিল দিয়ে তারা একা হয়ে যায়, বাইরে থাকে রাত্রির বিচিত্র শব্দের স্তব্ধতা। সকালে ঘুম ভেঙেই বাড়ির লোকের কলরব কানে আসে। আজ কারও সাড়াশব্দ নেই। কামিনী কী করছে কে জানে!

নিচে নেমে মুকুন্দ দেখতে পেল, কামিনী বাসন মাজছে কলতলায়। ভাঙাচোরা দাঁতগুলিতে আঙুল দিয়ে আলগোছে পেস্ট মাখাতে মাখাতে মুকুন্দ বলল, বললাম একটা ঠিকে ঝি রেখে দি। সব নিজেকে করতে হবে।

কামিনী বলল, দুটো দিন বই তো নয়। কষ্ট তোমারও করতে হবে। চা খেয়ে বাজার করে নিয়ে এসো দিকি চট করে। আপিসের রান্না চাই তো?

আপিসের রান্না! বাড়িতে আজ চার বছর আপিসের রান্না হয়ে আসছে তার জন্য! গত ছ-মাস সে তাগিদ দেয়নি কিন্তু তার প্রয়োজনও হয়নি। কামিনীই তার হয়ে জের টেনে এসেছে তাগিদের। চাকরির জন্য কী খাতিরটাই কামিনী তাকে করে এসেছে চিরদিন!

আজ আপিস যাব না ভাবছি।

কামিনী মুখ তুলে তাকাল।

তোমার আজকাল কী হয়েছে বলো তো? আপিস যাবার [...] চাকরিবাকরি ছেড়ে দেবে না কি! মুকুন্দের বুকটা ধড়াস করে উঠল।— বাড়িতে তুমি একলা থাকবে, তাই তিন দিন ছুটি নিয়েছি। রাজুটা থাকলে কথা ছিল না।

তুমিই তো জোর করে রাজুকে পাঠিয়ে দিলে ওদের সঙ্গে। আমিও ভাবলাম, জোয়ান চাকর নিয়ে একলা থাকার চেয়ে খালি বাড়িতে একলা থাকাই ভালো। তুমি

* মুদ্রিত উপন্যাসে [...] চিহ্নিত অংশগুলি কীটদষ্ট হওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

ছুটি নিয়েছ জানলে কি ওকে যেতে দিতাম! কেমন ধরা যেন হয়ে যাচ্ছ তুমি দিনকে-দিন, সত্যি।

বারান্দায় একফালি সোনালি রোদ এসে পড়েছে। কামিনীর তৈরি [...] চুমুক দিয়ে সেদিকে চেয়ে মুকুন্দ একবার [...] সব জানিয়ে দেবে? [...]

[...] মাথা ঝিম ঝিম করে এল। আর কি জানানো [...] পরে! গোড়াতে যে-ভয়ে কামিনীর কাছে কথাটা সে প্রকাশ করতে পারেনি আজ সেই ভয়ের কারণ শতগুণে বেড়ে গেছে।

আপিসের তাড়া নেই শুনেই কামিনীর কাজে ঢিল পড়েছিল। রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল। আবদারের সুরে বলল, আপিস যখন যাবে না— কী হল? চমকালে কেন?

ভাঙা কাপটার দিকে চেয়ে মুকুন্দ বলল, একটা কথা ভাবছিলাম।

মনুদের বাড়ি নিয়ে চলো না আজকে আমায়? খুব সেজেগুঁজে যাব। নতুন হারটা মনুকে দেখানোই হয়নি। সেবার এসে ঘটা করে চুড়ি দেখিয়ে গেল আমায়— আমি যেন জানিনে শাশুড়ির অনন্ত ভেঙে চুড়ি গড়িয়েছে, স্বোয়ামি দেয়নি। আমার স্বোয়ামি হার দিয়েছে, না দেখিয়ে ছাড়ব কেন? কামিনী হাসল, যাবে নিয়ে?

মুকুন্দ সায় দিয়ে বলল, বেশ তো।

চলো তবে বেরিয়ে পড়ি। ওরা তো না খাইয়ে ছাড়বে না, মিছিমিছি কেন রেঁধে মরব! দাড়িটা কামিয়ে নাও। বড় ট্রাংকের চাবিটা দাও।

উৎসাহে কামিনী চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুকুন্দের হাতধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সে বড় আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে বসিয়ে দেয়। সাবান, ক্ষুর প্রভৃতি কামাবার সরঞ্জামও এনে দেয় নিজেই। বলে, চাবিটা দাও, তুমি কামাও, আমি সেজে ফেলি। আমরা গেলে বেচারিরা খাওয়ার আয়োজন করবে।

চাবিটা কোথায় রেখেছি?

কামিনীর তখন অন্য কথা মনে পড়েছে।— আমি চান করে নেব? সেই ভালো চানটা সেরেই যাই। কামিনী তুমি চাবিটা খুঁজে রাখো, আমি আসছি চট্ করে।

বড় ট্রাংক খুলে গয়না বের করে কামিনী আজ সাজবে! গালে সাবান মেখে স্ট্রপে ক্ষুরটা ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ কথাটা বিবেচনা করে দেখল। তিন মাস যে কামিনী সেজেগুঁজে গয়না পরে কোথাও যেতে চায়নি তাই তো আশ্চর্য— আজ চেয়েছে বলে তার তো নালিশ করবার কিছু নেই। এ বরং ভালোই হয়েছে। দুদিন আগে না খুলে আজ খালি বাড়িতে কামিনী বড় ট্রাংক খুলে তার গয়নাগুলি বের করতে যাবে।

স্নান সেরে এসে কামিনী এসে দেখল, মুকুন্দের গালে সাবান মাখা, সে ক্ষুরে ধার দিচ্ছে। দেখে, অভিমানে চোখে তার জল এসে পড়বার উপক্রম হল।

এখনও কামানো হল না তোমার?

তার সেই সজল সুর শুনে মুকুন্দের নিঃশ্বাস যেন আটকে এল। এত সামান্য কারণে যার এমন অভিমান হয় সব টের পেলে কী ভয়ংকর আঘাতটাই না তার লাগবে! ছ-মাস তার চাকরি নেই, জমানো টাকা আর গয়না বিক্রির টাকা থেকে মাসে মাসে সে বেতন এনে তার হাতে দিয়েছে, ছ-মাস ধরে দশটায় খেয়েদেয়ে সে আপিস যাচ্ছে, এসব কি জানতে দেওয়া চলে কামিনীকে?

তারচেয়ে হাতের ক্ষুরটা ওর গলায় একবার বুলিয়ে দেওয়াই কি ভালো নয়? কী নরম সরু গলা কামিনীর! ক্ষুরের ধারে মাখনের মতো ফাঁক হয়ে যাবে।

কত সংক্ষেপে কী সহজ সমাধান [...] জন্য মুকুন্দের সমস্ত চেতনাটাই [...] মতো ক্ষুরের ধারে দু-ফাঁক [...] সেকেন্ড দু-একটি কেটে যাওয়ার পরে [...] কেটে কামিনীকে খুন করার সমগ্র প্রক্রিয়াটি [...] চিন্তায় মাখনের ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সমধর্মী হয়ে থাকে। কামিনী নড়ে না, শব্দ করে না, কিছু [...] না, এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত পড়ে না তার [...] দিয়ে— নিজের সৃষ্টি করা যে সমস্যার চাপে ছ-মাস ধরে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মুকুন্দের ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল [...] অস্তিত্ব থাকে না!

হাতে ক্ষুর নিয়ে কামিনীর গলার দিকে চেয়ে [...] নিস্পন্দ হয়ে থাকে আর তার অদ্ভুত একাগ্র [...] কামিনীর মনে হয় যে তার সাবান-মাখা রূপে লোকটা মুগ্ধ হয়ে গেছে! কামিনীর রোমাঞ্চ হয়। সলাজ সুখের হাসিতে মুখখানি তার দীপ্তি লাভ করে। তাতে চকিতের জন্য স্বস্তি ও আনন্দের এক মজার অনুভূতির মধ্যে মুকুন্দের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এসে পরক্ষণে সক্রিয় হবার জন্য সে যেন ঠিক বৈদ্যুতিক প্রেরণা লাভ করে।

কী দেখছ?

কামিনীও টের পায় না মুকুন্দও টের পায় না এই একটি মৃদু সলজ্জ প্রশ্নে কীসে কী এসে গেল! আর কয়েক সেকেন্ড যদি দেরি করত কামিনী এই প্রশ্নটি উচ্চারণ করতে, প্রয়োজনে [...] মুকুন্দের হাতের ক্ষুর [...]।

মুকুন্দ স্তম্ভিত হয়ে ভাবত, [...], সত্যি সত্যি খুন করে বসলাম কামিনীকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভয়ানক কিছু করবে কিনা ভেবে স্থির করতে যাওয়ার এই বিপদ আছে মানুষের, করব কি করব না ভাবতে ভাবতে হয়তো এমন-এক মুহূর্ত আসে যখন উজ্জ্বল দিনের আলোয় হঠাৎ মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখার মতো মানুষ [...] যায় এবং হয় তা সলাজ [...] ইঙ্গিতের চাবিতে অজানা [...] দুয়ার খুলে গিয়ে বন্যার মতো বেরিয়ে আসে সে অন্ধ অদম্য আবেগ। তাকে ঠেকানো যায় এখন এক অন্য ঝোঁকের বন্যাকে [...] মতো সামান্য ঘটনা যে যথাসময়ে ঘটে কত [...]

[...]

[...] শুনে কামিনী আশ্চর্য হয়ে বলল, তৈরি হব না? [...] কাপড় বের করব না?

[...]

[...] বিশ্বাস করতে পারল না ইতিমধ্যে মুকুন্দের মত বদলে গেছে। এইমাত্র যে তার সাবান-সাফা মুখ দেখে অমন করে তাকাচ্ছিল, সে কখনো বলা নেই [...] যাওয়া বন্ধ করে তার মনে কষ্ট [...] নিশ্চয় তামাশা করছে।

বললেই হল থাক।

[...] স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে মুকুন্দ বলল, সত্যি যাওয়া হবে না কামিনী। আরেক দিন [...] চলার আওয়াজে এতক্ষণে কামিনীর [...]।

কী হল তোমার? [...], আজ হবে না?

কাজ আছে।

[...] থাকায় খানিক অপেক্ষা করে কামিনী গলা চড়িয়ে আবার বলল, জবাব দাও না যে? [...] তিনদিন ছুটি নিয়েছ কি এমন কাজ [...] মনুদের ওখানে [...]

[...] মুকুন্দের সংযম আর রইল না। তীব্রকণ্ঠে সে ধমক দিয়ে উঠল, তা শুনে তুমি কী করবে? বলছি কাজ আছে, বাস।

হঠাৎ তার এই খাপছাড়া অসংগত ক্রোধে প্রথমটা কামিনী থতমত খেয়ে গেল! যে নিরীহ গোবেচারি ভালোমানুষ স্বামীটি তার কোনোদিন কোনো কারণে একটি কড়া কথা পর্যন্ত বলেনি অকারণে তাকে বারুদের মতো ফেটে পড়তে দেখে তার মনে হল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু বিস্ময় নিয়ে কামিনীর বেশিক্ষণ সময় কাটল না। [...] সাধে বাদ সেধেছে। তার উপর আবার [...] কৈফিয়ৎ দেবার বদলে!

[...] উঠল, অত চোট করছ কার ওপরে?

[...] আমাকে তুমি কী পেয়েছ শুনি?

[...] রাগ বাড়ছে মুকুন্দের, যে মুকুন্দ [...] চিরদিন! একটা অসহ্য হিংসার তীব্র জ্বালাবোধ তুবড়ির আগুনের মতো তার মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠছে। কামাতে গিয়ে গাল কেটে একটু রক্ত বার হওয়ার সঙ্গে যেন তার সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে মরিয়া হয়ে খেপে যাওয়ার প্রক্রিয়া। এই কামিনী তার শত্রু, তার জীবনের অভিশাপ। এ কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে এর মনে কষ্ট লাগবে বলে চাকরি যাবার খবরটা সে এর কাছে গোপন করেছিল? এর মনে যাতে ব্যথা না লাগে মাসের পর মাস সেই চেষ্টায় রত থেকে সে উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছে?

মুকুন্দের মুখ দেখতে পেলে হয়তো কামিনী [...] তখনকার মতো দাম্পত্য কলহ স্থগিত রেখে [...] মুকুন্দ তার দিকে পিছন ফিরে [...] একটি গালে ছিল সাবানের ফেনায় [...] কয়েকটি কথা কাটাকাটির পর [...] দাঁতে লাগিয়ে চুপ করে গেল [...] তীব্র তীক্ষ্ণ কথা শুনিয়ে চলল [...] স্বামীকে।

রাগ চরমে উঠবার আগেই মুকুন্দ [...] বেড়াবার সুশ্রী লাঠিখানা দিয়ে [...] আরম্ভ করল। প্রথম তিনটি আঘাত লাগল কামিনীর সুগঠিত তরুণ কোমল দেহে, যে দেহের স্পর্শ কল্পনা করলেও মুকুন্দের রক্ত এতকাল [...] কামিনী আর্তনাদ করতে করতে [...] মুকুন্দ চতুর্থ আঘাতটি বসিয়ে দিল তার মাথায়, তাতে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ায় মুকুন্দের [...] করে চরমে উঠে গেল। দু-হাতে প্রাণপণ [...] কামিনীর গলা চেপে ধরে সে ঠিক পাগলের মতো তাকে ঝাঁকাতে লাগল।

তার শত্রু তার জীবন্ত অভিশাপ! তার প্রবঞ্চনার কথা [...] কামিনীর [...] মুকুন্দ তার [...] তাকে সে মেরে বসল মাথায়! [...] তার মনেও পড়ল না যে ওকে সে খুন করেছে তার উদ্দেশ্য কী। এমন তার মনে হয়েছিল যে ধারাল ক্ষুরে কামিনীর মাখনের মতো গলা দু-ফাঁক করে দেবার সহজ উপায়টির কথা [...] গেল।

[...]

সার্টিফিকেট দিল অভয় ডাক্তার। ডাক্তারি পেশায় অভয়ের অভিজ্ঞতা দশ-বারো বছরের, কিন্তু পসার ভালো হয়নি। মুকুন্দের সে ঠিক বন্ধু নয়, তবে দুজনের ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের।

অভয়কে মুকুন্দ ডাকেনি। কামিনীকে বিছানায় তুলে শুইয়ে দিয়ে মুকুন্দ চুপচাপ নিস্পন্দ হয়ে বসে ভাবছিল, এবার কী করা যায়। এবার তাকে কিছু করতে হবে এই বোধশক্তিটুকু মুকুন্দের ছিল, কী করতে হবে অথবা কেন করতে হবে এসব কোনো চিন্তাই তার মাথায় স্পষ্ট হয়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছিল না। অনেকটা মুখস্থ কথা আবৃত্তি

করার মতোই সে মনে মনে ভেবে চলেছিল, কী করা যায়, কী করা যায়। ঝাড়া তিন ঘণ্টা এ অবস্থায় যখন কেটে গেছে তখন বাড়িতে এল অভয় ডাক্তার।

কয়েকটি টাকা পাওনা ছিল অভয়ের এবং একটু বিশেষ দরকার পড়েছিল টাকার। দিন চারেক আগে তাগিদ দিতে মুকুন্দ তাকে বলেছিল, পাওনাটা আজ মিটিয়ে দেবে। কামিনী খুন হবার ঘণ্টা তিনেক পরে অভয় ডাক্তারের এ বাড়িতে পদার্পণের মধ্যে এইটুকু যোগাযোগ ছিল।

সদর দরজা খুলে অভয় ডাক্তারকে দেখেই মুকুন্দ জানতে পারল তার কী করতে হবে। কথাটা হঠাৎ মনে এলেও সেই আকস্মিকতা সম্বন্ধে তার কোনো চেতনা রইল না। মনে হল, আগে থেকেই তার ভেবে-চিন্তে সব ঠিক করা ছিল।

ওঁর বড় অসুখ অভয়বাবু। আপনি এসে ভালোই হয়েছে।

কী অসুখ?

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, তারপর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না।

অভয় চমকে গেল, বলেন কী! চলুন চলুন, দেখি গিয়ে কী হল।

আসুন।

মুকুন্দের অবসন্ন নিস্তেজ ভাব দেখে অভয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যার স্ত্রী ক্রমে নির্জীব হয়ে আসছে তার মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার এমন অভাব অভয় কখনও দেখেনি, এমন নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব।

বিছানার কাছে গিয়ে অভয় মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কামিনীর গলা ও মাথার দৃশ্য থেকে মুকুন্দের মুখের দৃশ্যান্তরে চোখ সরিয়ে সে বুঝতে পারে যে মুকুন্দ প্রতীক্ষা করছে কামিনীকে পরীক্ষা করে অথবা পরীক্ষা না করে সে কী বলে।

অভয় স্টেথোস্কোপ বের করে কানে লাগায়!

পরীক্ষা শেষ করে বলে, মুকুন্দবাবু, উনি তো বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই? ও, বেঁচে নেই?

ফিট হয়েছিল। তারপর হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

সত্যি? সত্যি বলছেন অভয়বাবু? মুকুন্দের স্তিমিত ঘোলাটে চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, আমি তবে ওকে খুন করিনি!

ওসব কথা থাক।

অভয়ের কথার সুরে মুকুন্দ আবার ঝিমিয়ে গেল। অভয়ের কথায় সে বিশ্বাস করেছিল। কামিনী নিজে থেকে মারা গেছে, সে তাকে মারেনি বিশ্বাস করে উত্তেজনার বসে নিজের মুখে খুন করার কথাটা উচ্চারণ করে ফেলেও তার ভয় হয়নি। ডাক্তার তাকে নিয়ে খেলা করছে টের পেয়ে এবার এতক্ষণ পরে তার কান্না এল। কান্নার সেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে সে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেল।

মাথা খারাপ করবেন না মুকুন্দবাবু।

মুকুন্দ চোখ বুজল।

মনে আঘাত লাগলে মনের জোরেই তা সামলাতে হয়। মুকুন্দ দাঁতে দাঁতে কামড়ে আছে, কথা কইতে পারে না।

শ-পাঁচেক টাকা জোগাড় করুন।

পাঁচশো টাকা? কোথা পাব?

অ-ওম। অভয় স্টেথোস্কোপ পকেটে ভরে।— গলার হার আর হাতের চুড়িগুলো খুলে ফেলুন। বাক্সে আর যা আছে বের করুন।

মুকুন্দ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

অভয় কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়েই বলে, তাকিয়ে থাকলেই হবে? শ্মশানে নিতে হবে না, দাহ হবে না? আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পাড়ার সুকর্ম্ম সংঘের কর্মীরা কামিনীকে পোড়াতে নিয়ে গেল। সধবা মেয়েমানুষ, কামিনীর গলা মুখ মাথা সিঁদুর আর আবিরে প্রায় ঢেকে দেওয়া হল। ওটা অভয়ের পরামর্শ। মুকুন্দও সঙ্গে গেল। চিতা ভালো করে জ্বলতে থাকলে সে সরে এল। এদিক-ওদিক পাক খেতে খেতে হাজির হল কালীঘাটের মন্দিরে।

অঙ্গনে একটা কাঠের বেঞ্চে পা তুলে বসে পাঁঠা বলি দেখতে দেখতে তার মনে পড়ল, সুকর্ম্ম সংঘের কর্মীদের একটা পাঁঠা কিনে দিতে হবে। একটা পাঁঠা, দুটি বোতল। হাতে তার টাকা নেই। অভয়কে কথাটা জানাতে হবে। বেঞ্চ থেকে পা নামিয়ে মুকুন্দ জুতো খুঁজে পায় না। প্রথমটা সে আশ্চর্য হয়ে যায়। কোথা গেল জুতো? তারপর মনে পড়ে, বাড়ি থেকে শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে খালি পায়েই সে বেরিয়েছিল, জুতো আনেনি।

মুকুন্দ গভীর স্বস্তি বোধ করে। জুতো হারায়নি, তার মোটে ওই একজোড়া জুতো, হারালে বা চুরি গেলে মুশকিল হত।

এবার কী করা যায় প্রশ্নের নিরসন হয়নি। উঠে দাঁড়িয়েই মুকুন্দ বুঝতে পারে কোথায় যাবে কী করবে কিছুই তার ঠিক নেই। জীবনের সমস্ত কর্তব্য যেন তার শেষ হয়ে গেছে, কোনো আর উদ্দেশ্য নেই বেঁচে থাকবার। জীবনে আজ প্রথম মুকুন্দের একটা অদ্ভুত, অসহনীয় অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। নিজের সমাপ্তি— নিজের ভারহীন শূন্যতা। শারীরিক ও মানসিক অনেকরকম যন্ত্রণা সে ভোগ করেছে, সেসবের সঙ্গে আজকের অকথ্য অনুভূতির কোনো মিল নেই। ঠিক যন্ত্রণাই যেন এটা নয়, এ অনুভূতির স্পন্দন নেই, বাড়া-কমা নেই, তীক্ষ্ণতা নেই। একসঙ্গে বাতাসের মতো হালকা হয়ে গিয়ে ভিতরে বাইরে প্রচণ্ড ও নিষ্ক্রিয় চাপ অনুভব করার মতো অবর্ণনীয় ব্যাপার।

চলতে আরম্ভ করে মুকুন্দ সজোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়।

শোক হোক, কষ্ট হোক। হে ভগবান, সুতীব্র যন্ত্রণা হোক তার, মর্মান্তিক বেদনা জাগুক। আত্মার এই স্তব্ধতা সে সইতে পারে না। মাটির পুতুলের দোকানের দিকে চেয়ে তার মনে হয় জীবন্ত মানুষের এই ভিড়ের মধ্যে, সারি-বাঁধা জীবন্ত ভিখারিগুলির মধ্যে সে যেন জমে গেছে, মাটির মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। পা টেনে টেনে যে চলছে সে অন্য কেউ, সে নয়। পা তার নয়। দেহটাও তার নয়। সে নেই।

বেঁচে তো আছে সে? নিজের অজ্ঞাতে মরে তো যায়নি? কথাটা তার হাস্যকরও মনে হয় না, অসম্ভবও মনে হয় না। মরে গেছে কি বেঁচে আছে যাচাই করার তাগিদও বিন্দুমাত্র অনুভব করে না। সুপরিচিত আবেষ্টনী সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় তার কাছে সব কিছু আরও বেশি অবাস্তব, আরও ঘোরালো স্বপ্নের মতো হয়ে যায়।

একটু ফুল ও মালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একজন লোকের সঙ্গে একটু জোরে ধাক্কা লাগায় আবার চলতে আরম্ভ করে।

ট্রামলাইনের মোড় পার হয়ে খালধারের পথ ধরেই সে এগিয়ে চলে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছু না জেনেই। শ্লথ মন্থর পদে সে হাঁটতে থাকে, একটু টলটলায়মান অবস্থায়। পিছু থেকে এসে নাগাল ধরে দীনেশ তাই তার অবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বলল, এর মধ্যে এতটা গিলেছ?

মুকুন্দের যখন চাকরি ছিল সহকর্মীদের মধ্যে এই দীনেশের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশি।

মুকুন্দ দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও তার মুখ দেখে দীনেশের হাসি মুছে গেল।

কী হয়েছে মুকুন্দ?

আমার স্ত্রী মারা গেছে ভাই।

মারা গেছে? কবে?

আজ সকালে। হঠাৎ ফিট হয়ে হার্টফেল করে মারা যায়। এইমাত্র পুড়িয়ে এলাম।

ইস! এমন হঠাৎ! শুধু এইটুকু বলে আন্তরিক সহানুভূতিতে দীনেশ বোবার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

খেতে যাচ্ছিলি? সেই দোকানে? মুকুন্দ জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ। তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

আমিও খেতে যাচ্ছিলাম।

কথাটা মিথ্যা। কিছু তফাতে একটা দেশি মদের দোকান আছে বটে এবং অনেকদিন আগে দীনেশের সঙ্গে এসে সেখানে সে একঢোক মদ খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীনেশকে দেখবার আগে মদ খাওয়ার কথা তার মনেও পড়েনি। যাই হোক, দীনেশের সঙ্গে মদের দোকানে গিয়ে কাঠের একটা বেঞ্চে বসে মদ খেতে খেতে মুকুন্দ একসময় বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দীনেশ তাকে রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে গেল কাছেই খোলার ঘরের একটি মেয়ের কাছে। মুকুন্দর অবস্থা দেখে মেয়েটি নাক সিটকে বলল, গলায় দড়ি!

মুকুন্দ কাজ করত ধনদাস দত্তের আপিসে।

ধনদাসের কারবার যত বড় আপিস তত বড় নয় অর্থাৎ যেমন হওয়া উচিত ছিল। যত কম লোক নিয়ে কাজ চলে তার বেশি একজন লোকও আপিসে কাজ করে না। বাড়তি লোক রাখতে ধনদাস নারাজ।

কাজ চলে। অবিরাম।

কাজে কেউ যাতে এতটুকু ফাঁকি দিতে না পারে তার কয়েকটি সহজ-সরল সিস্টেম ধনদাস কাজে লাগায়। প্রথমত, তার আপিসে সব কাজই জরুরি— আর্জেন্ট— ইমিডিয়েট। একটি কাজ সাত দিন পরে হলেও চলে এবং আরেকটি কাজে সময় লাগে সাত দিন। দুটি কাজই সে চায় দু-দিনের মধ্যে। নিজেই অবশ্য সে জানে সেটা অসম্ভব এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার জিদ তার নেই। সাত দিনের কাজটা দিন পাঁচেকের মধ্যে সম্পন্ন হলেই সে খুশি হয় যদিও দেখায় বড়োই অখুশির ভাব, যাতে

কর্মচারীটি নিজের অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতায় লজ্জা ও ভয়ে আরও বেশি করে খাটবার স্বর্গীয় প্রেরণা অনুভব করে। তখনও সাত দিন পরে হলেও চলে যে কাজটি সেটি বাকি আছে কিন্তু ইতিমধ্যে কর্মচারীটির ঘাড়ে চেপেছে আরও জরুরি কাজ। যত চেষ্টাই সে করে কাজ আর শেষ করে উঠতে পারে না, বাড়তি থেকেই যায়। চেষ্টারও তাই কামাই পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, আপিসে সকলকে আসতে হয় দশটায়, খাতায় সই করতে হয় নাম। দশটার পর কৈফিয়ত, সাড়ে দশটার পর লেট, এগারোটার পর গরহাজির। গরহাজির কিন্তু এসেছো যখন, কাজ করতে দোষ কী? কাজ তো শেষ করা চাই!

টিফিনের ছুটি আধ ঘণ্টা। ঘড়ির কাঁটা ধরে— কম নয়, বেশি নয়। ঠিক একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। ধনদাস প্রায়ই একটা বাজার একটু পরে আপিসটা একবার পাক দেয়। যারা আসনে বসে থেকেই চা আর খাবার আনিয়ে খাচ্ছে দেখতে পায় তাদের সঙ্গে হাসিমুখে দু-একটা কথা কয়। অধিকাংশ কর্মচারীই তাই টিফিনের ছুটিটা ছেঁটে ফেলেছে। বাইরে যে উঠে যায় সে-ও পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি বাইরে থাকে না।

ছুটি পাঁচটায়। হ্যাঁ, ছুটি। যার খুশি চলে যাও, আটকাবার কেউ নেই। তবে কিনা, ধনদাস স্বয়ং কিংবা তার আই-সি-এস-এ বাতিল ম্যানেজার দীনেশ কিংবা সেক্রেটারি মণিলাল এরা কেউ আপিসে থাকলে আগে যাওয়াটা কি ভালো দেখায় অধীনস্থ কর্মচারীর? একটু অপমান করা হয় না কি উপরওলাদের? অন্তত না বলে যাওয়াটা— বলতে গেলে :

ধনদাস কিংবা দীনেশ কিংবা মণিলাল :— পাঁচটা বেজে গেছে? আচ্ছা আসুন।

কর্মচারী গমনোদ্যত।

ধনদাস কিংবা দীনেশ কিংবা মণিলাল :— শুনুন। এই ফাইলটা নিয়ে যান। স্টেটমেন্টটা কাল বারোটার মধ্যে চাই। আর যা যা ফাইলটাইল দরকার, যাদববাবুর কাছে আছে। হারাবেন না যেন।

এদিকে রাত বারোটা এবং ওদিকে ভোর ছ-টা থেকে ন-টা পর্যন্ত না খেটে কার সাধ্য সে স্টেটমেন্ট তৈরি করে!

আপিস তাই চলে সিস্টেমে, মানুষ চালায় না।

ধনদাসের বন্ধু রাইচাঁদের ব্যবস্থা অন্যরকম। সে লোক রাখে বেশি। তবে মাইনে দেয় কম!

বলে, তোমার ও ভুল। বেশি খাটালেই কি কাজ বেশি হয়? একটা ক্যাপাসিটি তো আছে খাটবার? টায়ার্ড হয়ে পড়লে এক ঘণ্টার কাজে দু-ঘণ্টা লাগে, ভুলচুক বেশি হয়।

ধনদাস বলে, তুই জানিস কচুপোড়া। ওসব ঢের শুনেছি। ও-ব্যাটারাই ওসব কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। একগাদা বিদ্যা নিয়ে চাকরি করতে আসে আর কাগজে প্রবন্ধ ছাপায় যে কম খাটলে কাজ বেশি হয়!

ধনদাসের ইনসুরেন্স কোম্পানি, ব্যাংক আর চালানি কারবার আছে। সব ক-টাই ভালো চলে।

একজনের দেনার দায়ে একটা ছাপাখানা একদিন সস্তায় ধনদাসের হাতে এল। বেচে দিলে মুনাফা মিলত ভালোই কিন্তু ধনদাস ভাবল, প্রেস তো মাছ নয় যে পচে

গিয়ে রাতারাতি লোকসান হবে। প্রেস চালিয়ে দশজন যখন লাভ করছে, তার প্রেসটা কিছুকাল ভালো ব্যবস্থায় চালিয়েই দেখা যাক না ব্যবসাটা কেমন, লাভ লোকসান কী দাঁড়ায়। না পোষায়, বেচে দিলেই হবে।

ধনদাস এইসব ভাবছে আর প্রেসের মালিক এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিজের প্রেসের জন্য একটা সিস্টেম ঠিক করার ধান্ধায় আছে, একদিন বেলা দশটায় গাড়িতে আপিস যাবার সময় দেখল, ফুটপাথে মুকুন্দ হেঁটে চলেছে।

পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে নামিয়ে ধনদাস মুকুন্দকে ডাকিয়ে আনল।

কেমন আছেন মুকুন্দবাবু? খবর ভালো?

আজ্ঞে, আছি একরকম।

মুকুন্দের একমাথা ঝাঁকড়া চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, পরনে ময়লা শার্ট আর ফরসা ধুতি, পায়ে মেয়েদের লপেটা, যেটা কামিনীর ছিল। একটু পাগলাটে পাগলাটে দেখাচ্ছিল মুকুন্দকে।

কবির মতোই দেখাচ্ছে আপনাকে। খুব লিখছেন বুঝি?— ও, না, আপনার স্ত্রী মারা গিয়েছেন শুনলাম।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বলে একটু ম্রিয়মাণ থেকে সলজ্জভাবে প্রতিবাদ জানাল আজ্ঞে, কবিতা কখনও লিখিনি। একটু গদ্য লেখায় ঝোঁক ছিল—

ও একই কথা। যাঁহা গদ্য তাঁহা পদ্য। কাজ করছেন নাকি কোথাও?

আজ্ঞে না।

আপনি আগে একটা প্রেস খুলেছিলেন না, আমার এখানে আসবার আগে?

ঠিক আমি খুলিনি, এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে খুলেছিলাম। টাকা-পয়সা যা ছিল ওতেই গেছে।

ধনদাস একটু চিন্তা করার ভঙ্গি করে বলল, আমার আপিসে একবার আসুন না? একটা প্রেস কিনেছি, ভাবছিলাম আপনাকে যদি নেওয়া যায়।

মুকুন্দ সাগ্রহে বলল, আজ সময় আছে আপনার?

তিনটে নাগাদ আসবেন।

ধনদাসের গাড়ি গাড়ির স্রোতে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও মুকুন্দ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আকস্মিক উত্তেজনায় কান ঝাঁঝাঁ করছে। ধনদাস তাকে হঠাৎ একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছ-মাস চাকরি ছিল না। সেজন্য কামিনীকে তার খুন করতে হয়েছে। আবার ধনদাস তাকে চাকরি দিতে চায়। রাস্তায় চলতে চলতে একটা চাকরি তার কাছে যেচে এসে হাজির হয়েছে।

কামিনীকে সে কি খুন করেছিল? সে তো শুধু লাথি দিয়ে মেরেছিল কামিনীকে। রাগের মাথায় মেরেছিল। খুন করার ইচ্ছা তো তার ছিল না।

ধনদাসের প্রেসে কাজ আরম্ভ করার পর হইতে মুকুন্দ নিজের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন অনুভব করিতে লাগিল। একটা আর্ত উত্তেজিত অবস্থা হইতে সে যেন ক্রমে ক্রমে ঝিমাইয়া পড়িতেছে, ধীর-মন্থরভাবে একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তীব্রতার— প্রচণ্ডতার— স্থায়ী বিস্ফোরণের

জমাট-বাঁধা চাপ গলিয়া যাইতেছে, উগ্র একটা নেশা উপিয়া যাইতেছে ধীরে ধীরে। এরকম একটা অদ্ভুত অবস্থা যে তার হইয়াছিল এতদিন সে তা টেরও পায় নাই। কামিনীর মৃত্যুর পর হইতে এ-পর্যন্ত নিজেকে তার মনে হইয়াছিল অতি শ্রান্ত জীর্ণশীর্ণ আধমরা স্থবিরের মতো, কোথাও মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে পারিলে বাঁচে। জীবনীশক্তির অভাবে শরীরের তাপ এত কমিয়া গিয়াছে মনে হইত যে মাঝে মাঝে সে জ্বরের রুগির মতো শিরায় শিরায় শীত অনুভব করিয়া কাঁপিয়া উঠিত।

অথচ এখন প্রেসের শত ঝঞ্ঝাট ও অজস্র খাটুনিতে বিব্রত ও শ্রান্ত হইয়া পড়ার সঙ্গে সে টের পাইতেছে, এতদিন সে ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঠাসা বোমার মতো, চুপ্‌সানো বেলুনের মতো নয়।

কতদিন সে এ-অবস্থায় ছিল? মুকুন্দের মনে হয় জন্ম হইতেই তার যেন এভাবে কাটিয়াছে। সে বুঝিতে পারে এটা সত্য নয়, সম্ভবও নয়। কিন্তু এই অপসৃয়মান বিকার তার অতীতকে এতদূর পর্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে কোনোমতেই ধরিতে পারে না কবে হইতে মাথাটা তার এভাবে খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কামিনী মারা যাওয়ার সময় হইতে? চাকরি যাওয়ার পর চুপি চুপি যখন কামিনীর গয়না বেচিয়া মাসের গোড়ায় বেতন আনিয়া কামিনীকে দিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন? অথবা তারও আগে, যখন ধনদাস হঠাৎ তাকে বরখাস্ত করিয়াছিল? কে জানে!

মাঝে মাঝে কামিনীর জন্য শোকও সে আজকাল অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যাপারটাই তার কাছে সবচেয়ে উদ্ভট ঠেকিয়াছে। কোথাও কিছু নাই, অবসন্ন দেহটা হঠাৎ কেমন অবশ হইয়া আসে, চোখের সামনে আলো ম্লান হইয়া যায়। ভিতরে চাপা কান্নার মতো পাক দিয়া উঠিতে থাকে কামিনীর জন্য অদম্য শোক। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। মেঝেতে গড়াগড়ি দিবার বাসনা জাগে। নানা সাজে নানা ভঙ্গিতে কামিনী মনের মধ্যে ভাসিয়া আসে। কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতেই তন্ময় হইয়া একসময় সে নিজের অজান্তে শোক ভুলিয়া যায়। হঠাৎ যখন সচেতন হয় তখন সে এই অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে, মনের মধ্যে শোকের চিহ্নও নাই। কামিনীকে স্মরণ করিয়া দুঃখ জাগাইবার চেষ্টা করিয়াও সে আর তখন দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, এ-বিষয়ে তার বোধশক্তিটা একেবারে ভোঁতা হইয়া থাকে।

আবার যখন শোক জাগে, অবিকল এই প্রক্রিয়ায় আচমকা জাগে। কামিনীর চিন্তায় অন্যমনা করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

এমনিভাবে দিন কাটিয়া যায়। মুকুন্দ কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। আর যেখানে-সেখানে যখন-তখন চেনা-অচেনা মানুষের মুখের দিকে শিশুর মতো কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া জানিবার চেষ্টা করে মানুষটা কী ভাবিতেছে, কেন ভাবিতেছে।

সে দৃষ্টির সামনে ধনদাস পর্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করে।

প্রেসের কাজ ভালোই চলিতেছে। সে-বিষয়ে কিছু বলিবার নাই। তবে অসন্তোষ প্রকাশ করাটাই ধনদাসের চিরদিনের ধর্ম। সে তাই বলিতে চেষ্টা করে, ঘড়ির কাঁটা ধরে সবাই দেখি চলে যায় মুকুন্দবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্যাক্টরির আইন বড় কড়া। বেশিক্ষণ আটকালেই একস্ট্রা দিতে হয়।

অমন আইন দেখেছি ঢের।

আজ্ঞে, আপিসের ব্যাপার আলাদা হয়। এটা ফ্যাক্টরি কিনা— টাইমের পর কাউতে থাকতে বলা যায় না।

বলতে জানলে বলা যায়।

মুকুন্দ চুপ করিয়া থাকে। ধনদাস প্রেসে আসে শেষ সময়ে— ছুটি হইবার খানিক আগে। যথাসময়ে মেশিনের ঘটাংঘটাং শব্দ বন্ধ হইয়া যায়। প্রেসের লোকের কাজ ছাড়িয়া হাতে সাবান ঘষিতে আরম্ভ করে। ধনদাস জ্বালার সঙ্গে বলে, ওরা দেখছি যাবার জন্যে পাগল!

মুকুন্দ জবাব দেয় না।

প্রেসের এই আপিসঘরের জানালা দিয়া আলো কম আসে, ইতিমধ্যেই আলো জ্বালিতে হইয়াছে। ধনদাসের হিংস্র কুটিল মুখের গাঢ় অসন্তোষের ছাপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মুকুন্দের মনে হইয়াছে যে লোকটার প্রাণ বড়ো পলকা। জলো চোখ ফোলা গাল আর চামড়ার বিবর্ণতায় যেন মরণের চিহ্ন আঁকা হইয়া আছে। কামিনীর চেয়েও ঢের সহজে একে মারিয়া ফেলা যায়!

তবে একথা অবশ্য ঠিক যে ধনদাসকে মারিবার তার কোনো কারণ নাই।

এ এক অর্থহীন অবান্তর চিন্তা। ধনদাসকে মারিবার তার কোনো কারণ নাই। নাই-ই তো! চিন্তাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিবারও কোনো কারণ নাই। অগাধ অতল জলাশয়ের রহস্য হইতে ওটা বুদবুদের মতো এমন কত এলোমেলো উদ্ভট চিন্তাই মানুষের মনে ভাসিয়া ওঠে— আবার মিলাইয়া যায়। কে খেয়াল রাখে। কার কী আসিয়া যায়। ধনদাস তার উপকার করিয়াছে। আবার তাকে চাকরি দিয়াছে। নিজের মধ্যে কৃতজ্ঞতা আবিষ্কার করিতে পারিতেছে না, এটাই মুকুন্দের কাছে আফসোসের কথা। অথচ ধনদাসকে মারিবার চিন্তাটাও সে নিজের মন হইতে দূর করিতে পারে না।

না, ধনদাসকে মারিবার কথাটা সে ভাবে না। সে শুধু ভাবে যে ওকে মারা কত সহজ। ধনদাস চোখের সামনে আসিলেই সে তার মুখে মৃত্যুর ছাপ দেখিতে পায়— সদাজাগ্রত মৃত্যু যেন ঘুমের ভাণ করিয়া তার মুখে সাঁটিয়া আছে। কামিনীর মাখনের মতো নরম সুগঠিত মসৃণ গলা দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল ক্ষুরের ধারে বাতাস বা জল কাটার মতো গলাটা অনায়াসে দু-ফাঁক হইয়া যাইবে। আজকাল ধনদাসের শুষ্ক শীর্ণ কাঠির মতো বিসদৃশ গলাটাও শুধু হাতে মুঠা করিয়া ধরিলেই মট করিয়া মটকাইয়া যাইবে!

তার চাউনি দেখিয়া ধনদাস দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

কী দেখছেন হাঁ করে?

আজ্ঞে না।— মুকুন্দ চমকিয়া উঠিয়া দ্রুতবেগে কয়েকবার চোখ বন্ধ করে আর খোলে, মাথায় ঝাঁকি দেয়।

শুনেছেন তো যা বললাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি বইকি।

ধনদাসের বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় মুকুন্দ সবকথাই শুনিয়াছে এবং বুঝিয়াছে। ধনদাস তখন একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, আপনার রকমসকম দেখে মনে হচ্ছিল আপনি যেন কোনো রাজ্যে বাস করছেন! একাই থাকেন বুঝি বাড়িতে?

চাকরবাকর থাকে।

ধনদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, আর কেন মুকুন্দবাবু, একটা বিয়ে-থা করে ফেলুন এবার। শোক দুঃখ সব সয়ে বাঁচতে তো হবে মানুষকে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? ছেলেপিলে থাকলেও কথা ছিল। নাঃ, একটি ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলুন।

বিয়ে? কী বলছেন আপনি?

মুকুন্দের ব্যাকুলতা দেখিয়া ধনদাস একটু লজ্জিতও হইলেন, বিরক্তও হইলেন। এ আবার কোন্ দেশী বউ-প্রীতি? চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেছে, এবার শান্তশিষ্ট ভালো মানুষের মতো বিয়ে করিয়া ঘরসংসার পাতিলে সব ঠিক হইয়া যায়। একটি মেয়েও ধনদাসের জানা আছে। রঙ একটু কালো, একটি পা একটু খোঁড়া— কিন্তু বেশ ডাগর মেয়ে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ভার নিতে পারিবে। বিয়েটা হইলে ধনদাসেরও একটা ভার কমিবে।

ধনদাস চলিয়া যাওয়ার পর মুকুন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবে। সামান্য উত্তেজনাতেই আজকাল তার মনে উদ্ভট কল্পনার রাশ আলগা হইয়া যায়। প্রথমেই তার মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে ধনদাসের মতলব কী? কামিনী মরিতে-না-মরিতে আরেকজনের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে ধনদাসের এত আগ্রহ কেন? ধনদাস নিজেই তো কৌশল করিয়া কামিনীকে মারে নাই, তার সঙ্গে অন্য একটা মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য? নয়তো কামিনী মরিবার তিন মাসের মধ্যে আবার তাকে চাকরি দিয়া বিবাহ করার জন্য সাধাসাধি করে কেন?

মুকুন্দ বুঝিতে পারে অসুস্থ মস্তিষ্কে সে এসব ভাবিতেছে। তার মনে ছাড়া আর কোথাও এসব যুক্তির স্থান নাই। চাকরিতে নিযুক্ত করার পর ধনদাসের মনে পড়িয়া থাকিতে পারে যে এ লোকটার বউ মরিয়াছে, এর কাছে বউ হিসাবে একটা মেয়েকে গছাইয়া দেওয়া যায়,— আগে হইতে তাকে আরেকবার বিবাহ করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া ধনদাস তাকে চাকরি দিয়াছে, একথা হাস্যকর জানিয়া বুঝিয়াও মুকুন্দ কিন্তু এই অর্থহীন কল্পনার জাল বুনিয়া চলে, তার মনে একটা উদ্ধত আশা জাগিয়া থাকে যে এইভাবে চলিতে চলিতে একসময় সে কামিনীর আরেকজন হত্যাকারী আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিবে।

আবিষ্কারটা যে করিয়া ফেলিয়াছে প্রথমেই কিন্তু হঠাৎ সেটা সামনে আনিলে তো চলিবে না, যুক্তিতর্কের সাহায্যে খুঁজিয়া বাহির করিয়া থ বনিয়া যাইতে হইবে। নয়তো, তার কাছে একটা মেয়ে গছানোর উদ্দেশ্য লইয়া ধনদাস তাকে আবার চাকরি দিয়াছে একথা সে ভাবিতে পারিল আর এইটুকু ভাবিতে পারিবে না যে মেয়েটাকে গছানোর জন্য ধনদাস তাকে বরখাস্ত করিয়া কামিনীকে খুন করাইয়া তারপর আবার তাকে চাকরি দিয়াছে!

তার জন্য ধনদাসের যেন রাতে ঘুম হয় না!

কিন্তু একথা ঠিক ধনদাস তাকে তাড়াইয়া না দিলে কামিনীকে সে খুন করিত না। নিছক যোগাযোগ।

তা-ও সে জানে। চাকরি গেলে বউকে খুন করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। জগতে হাজার হাজার বউ তবে স্বামীর হাতে খুন হইয়া যাইত। চাকরি তো কত লোকেরই যায়, তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থাও তো কত লোকের হয়, স্ত্রীকে খুন করিতে যায় কে? ও শুধু অবস্থার বিপাক, ভাগ্যের বিপর্যয় ছাড়া আর-কিছু নয়।

ধনদাসের কোনো দোষ নাই। ধনদাস তাকে বরখাস্ত করায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল যে কামিনীকে সে খুন না করিয়া পারে নাই— সত্য শুধু এইটুকু। সে-ব্যাপারের সঙ্গে ধনদাসকে এর বেশি আর কোনোমতেই জড়ানো চলে না।

খুন করিয়াছে? না, কামিনীকে সে খুন করে নাই। ওকে খুন করার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। কামনার অসুখ ছিল, কামিনী হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে।

মুকুন্দ দিন দিন রোগা হইয়া যায়। খিদে কমিয়া গিয়াছে, খাইলেও ভালো হজম হয় না। শরীরের মেদ-মাংসে ভাটা ধরিয়াছে এটা তার খেয়াল থাকে না কিন্তু মাথার ঝিমঝিমানির মধ্যে মাঝে মাঝে শরীরের দুর্বলতা টের পায়। ঘুমের অভাবটাই তাকে কাবু করিয়াছে সবচেয়ে বেশি।

রাতটা তার ঘুমাইয়া কাটে না জাগিয়া কাটে সে ভালো বুঝিতে পারে না। জাগিয়া যখন চিন্তা করে তখনও তার মনে ভাসিয়া আসে সারি সারি ছবি, ঘুমাইয়া যখন স্বপ্ন দেখে তখনও থাকে ছবি— কোন্‌টা চিন্তা কোন্‌টা স্বপ্ন পৃথক করা কঠিন হয়। পৃথক করার চেষ্টাও যে সে খুব বেশি করে তা-ও অবশ্য বলা যায় না। প্রয়োজন বোধ করে না।

ধনদাস একদিন জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কী? এমন চেহারা হচ্ছে কেন?

মুকুন্দের হঠাৎ বড় রাগ হয়।— কেন, কী হয়েছে চেহারায়?

কী হয়েছে! শুকিয়ে যে হাড়গিলে হয়ে গেলেন মশায়! ডাক্তার দেখান— ডাক্তার দেখান। ক্ষয়রোগ ধরেনি তো?

মুকুন্দের হাতের আঙুলগুলি নিশপিশ করিতে থাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে নীরবে ধনদাসের শুকনো শীর্ণ গলাটার দিকে চাহিয়া থাকে।

ধনদাস চলিয়া যাওয়ার পর দুঃস্বপ্নের ধোঁয়াটে আতঙ্ক শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশার মতো তার মনে ঘন হইতে থাকে— হাড়গিলের মতো হইয়া গিয়াছে? ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে? অসম্ভব!

রোগা যে হইয়া গিয়াছে সেটা সে নিজেই অনুভব করিতে পারে। কীরকম রোগা হইয়াছে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু হাড়গিলে? যত কঙ্কালসার হোক, তাকে কি কখনও হাড়গিলের মতো মনে হইতে পারে— এমন সে সুপুরুষ? অসম্ভব!

দু-হাতে চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিয়া সে বসিয়া থাকে। তার মধ্যমাকার গভীর কালো চোখের রহস্যময় জ্যোতি পলক ফেলার তালে তালে যেন সংকেত করিয়া চলে। পর-পর বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট শব্দের একটানা পুনরাবৃত্তির সঙ্গে মেশিনে ছাপার কাজ চলিতে থাকে, স্টেথোস্কোপের মারফতে যেন বিচিত্র হৃদস্পন্দন কানে আসিতেছে যা মানুষের বুকের একার্থক ধুকধুকানি নয়। দেয়ালের অনেক উঁচুতে কালো ছোটো জানালাটি দিয়া সামান্য আলো আসে, তাতে শুধু ভিতরের অন্ধকারকে সকরুণ আবছা ছায়ায় পরিণত করিতে পারে, শেডহীন হলদে আলো বাল্‌বগুলি কামলা রোগীর চোখের মতো স্তিমিত মনে হয়। জিভে পচা ডোবার জলের আস্বাদন যেমন নাকে লাগে অবিকল সেইরকম স্যাঁতসেঁতে সোদা স্বাদ লাগে।

জমাদার গণেশ আসিয়া বলে, মেশিন বন্ধ করতে হবে বাবু।

কেন?

বড় গরম হয়ে গেছে।

হোক চালাও।

মেশিন খারাপ হয়ে যাবে বাবু।

গণেশের কপাল চওড়া, গাল একটু ফোলা, নাক আর চিবুক থ্যাবড়া, বিড়ালের মতো কটা চোখ। মাসে দু-দিন কি তিন দিন সে দাড়ি কামায়, তখন তার মুখের ক্লেদ-রংঙের আঠা-লেপা ব্রণের ছিদ্র-ভরা অস্বাস্থ্যকর আবরণ আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

হোক খারাপ, চালিয়ে যাও।

গণেশ আমতা আমতা করিয়া বলে, কর্তা সবাইকে খুন করে ফেলবেন বাবু। চালাতে গেলে যন্তর জখম হবেই। কর্তা তা মানেন না।

চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও।

কম্পোজিটরদের ঘরটা একবার সে ঘুরিয়া আসে। লোচন, মনা, হরিশ আর কুনু প্রায়ই জ্বরে ভোগে, আজ অন্য সকলের সঙ্গে এদের চারজনকেই উপস্থিত দেখিয়া মুকুন্দ আশ্চর্য হইয়া যায়। এদের মুখের শীর্ণ টান-ধরা চামড়ায়, নিষ্প্রভ শান্ত চোখে, শিরাবহুল শুকনো হাতে, কুঁজো হইয়া সকাতরে বসিবার ভঙ্গিতে মুকুন্দ হাড়গিলের সাদৃশ্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, ক্ষয়রোগের লক্ষণ খোঁজে। এদের চেয়েও সে কি রোগা? এদের চেয়েও মরণাপন্ন?

জ্বর নিয়ে কাজ করছ নাকি লোচন? তোমার চোখ যে টকটকে লাল?

কী করি বাবু!

প্রাণটা আঁকুপাকু করে মুকুন্দের। কী যেন সে বুঝিতে পারিতেছে না, ধরিতে পারিতেছে না। নিজের নামের মতো অতি জানা নামটি এই মনে ছিল, পরমুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টায় মনে করিতে না পারার মতো কী একটা শোচনীয় ব্যাপার ঘটিতেছে। তার জীবনের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার সরল সহজ ও বাস্তব ব্যাখ্যা যেন অন্য কয়েকজনের মধ্যে ভাসাভাসাভাবে আর এই চারজন জ্বরের রোগীর মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া আছে। কিন্তু চোখ-বন্ধ মানুষের মতো আলোর আবির্ভাব টের পাইলেও কিছুই সে দেখিতে পাইতেছে না। লোচন বলিয়াছে, কী করি বাবু। জ্বর গায়ে লোচন কাজ করিতে আসিয়াছে। বাড়িতে বউ আছে, ছেলেমেয়েও হয়তো আছে। কাজ করিতে না আসিয়া লোচনের উপায় নাই। বউ-ছেলে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। কিন্তু বউ-ছেলে মরিয়া যাওয়ার ভয়ে লোচনের জ্বর গায়ে ধুঁকিতে ধুঁকিতে কাজ করিতে আসার মধ্যে কাজ না থাকায় মুকুন্দের বউকে খুন করার সম্পর্ক কী? সাদৃশ্য কোথায়?

তোমার ছেলেমেয়ে ক-টি লোচন?

আজ্ঞে আমি বিয়ে করিনি।

ব্যাপারটা অর্থহীন অসঙ্গত মনে হয়। চেয়ারে বসিয়া আবার সে ভাবিতে থাকে, নতুন আতঙ্ক ও নতুন অস্বস্তি জয় করিবার চেষ্টা করে। দারোয়ান ডাক আনিয়া দিলে তার হৃষ্টপুষ্ট সবল দেহটি দেখিয়া মুকুন্দের হঠাৎ অসহ্য রাগ হয়। লোকটাকে খুব খানিকটা গালাগালি করার একটা যেমন-তেমন ছুতা খুঁজিয়া সে হয়রান হইয়া যায়। অন্যসময় রাগ করার এমনি কত কারণ মনে পড়ে, এখন সে কিছুই মনে করিতে পারে না। তার মুখের ভাব দেখিয়া দারোয়ান নীরবে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে।

মুকুন্দ তখন বোমার মতো ফাটিয়া যায়।

কাহে চলা যাতা উল্লু? না বোলকে কাহে যাতা শালা বজ্জাত হারামজাদা...

এই অকারণ অকথ্য আক্রমণে দারোয়ান বেচারি গরম হইয়া প্রতিবাদ করা মাত্র মুকুন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডিসমিস করিয়া দেয়।

বাড়ি ফেরার পথে সে ব্যাকুল আগ্রহে রুগ্ণ ও শীর্ণ মানুষের মুখে সেই অনায়ত্ত সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, ছাপাখানার কম্পোজিটরদের ঘরে যে সত্যের ইঙ্গিত সে পাইয়াছিল। এতদিনের আত্মকেন্দ্রিক মনটা তার সংসারের আরও অসংখ্য মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে। কোনো দার্শনিক তথ্য তার মনে আসে না, তার শুধু মনে হয় আর দশজন অসুস্থ বিষণ্ন মানুষের মধ্যে তার নিজের সম্বন্ধে এমন একটা জ্ঞান অর্জন করার উপায় আছে, যা তার জানা দরকার, জানা উচিত৷ বাড়ি ফিরিয়া দাড়ি কামানোর ছোট আয়নাটিতে সে নিজের মুখখানা বিশেষভাবে সতর্কতার সঙ্গে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, কীরকম সে রোগা হইয়াছে। মনোযোগ দিয়া দেখিতে গেলে চিরকাল যেমন হইয়াছে আজও তেমনি নিজের মুখ তার কার কাছে কেমন খানিকটা অপরিচিত মনে হয়— আজন্মপরিচিত অন্যের প্রতিদিনের দেখা মুখেও খোঁজ করিতে গেলেই যে অনিবার্য প্রতিকারহীন অপরিচয়ের রহস্য দেখা যায়।

তখন হঠাৎ মুকুন্দের মনে পড়িয়া যায় কামিনীর বেশভূষা প্রসাধনের জন্য কেনা প্রকাণ্ড আয়নাটির কথা। ও-আয়নায় সে নিজেকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবে, শুধু মুখখানা নয়।

এতকাল একবারও সে এ-ঘরের তালা খোলে নাই। এঘরে কামিনীর সব আছে, হয়তো-বা কামিনী নিজেও আছে, এই তিক্ত মিথ্যার বিদ্যুৎস্পর্শের স্বাদ মাঝে মাঝে চকিতের জন্য সে উপভোগ করিয়াছে।

দরজা খুলিয়া মুকুন্দ ভিতরে যায়। সুইচ টিপিয়া আলো জ্বলে। কামিনীর অসংখ্যা স্মৃতিচিহ্নের সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার বদলে সোজা আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া সে জামাকাপড় খুলিতে থাকে। আপিস হইতে ফিরিয়া সে জামাকাপড় ছাড়ে নাই।

আয়নার ধুলা জমিয়াছে। নিজেকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য প্রতিবিম্বের দিকে না চাহিয়া প্রথমে পরনের ধুতি দিয়া মুকুন্দ আয়নাটা সাফ করে।

তারপর অনেকদিন পরে আয়নার মধ্যে পরিচিত নিরাবরণ একটি দেহকে একক দেখিয়া, নিঃসঙ্গ দেখিয়া মুকুন্দ ঘাড় ফিরাইয়া ডাকে, এই! শুনছো? শিগগির এসো, লক্ষ্মীটি।

কামিনীকে খুন করিবার ছ-মাস পরে তাদের সোদগন্ধী মাকড়সার জাল-ভরা *ধূলিমলিন* শূন্য শয়নঘরে মুকুন্দ মুখ ফুটিয়া উৎসুক কণ্ঠে তার এই অনভ্যস্ত অনুচিত একাকিত্ব ঘুচানোর জন্য কামিনীকে ডাকিয়া বসে। তার একটি হাত আরেকটি অস্তিত্বহীন কোমল হাত ধরার জন্য খোঁজার ভঙ্গি গ্রহণ করে।

হাত ধরাধরি করিয়া তারা আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। সে আর কামিনী দুজনে একখণ্ড কাচের মধ্যে সৃষ্টি করিত অপূর্ব সুন্দর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার প্রামাণ্য বাস্তব ছায়ারূপ। শুধু পরস্পরকে দেখার বদলে দুজনেরই দুজনকে পাশাপাশি একত্র দেখার সে কী অনির্বচনীয় শান্তি ও স্বস্তি, কানায় কানায় ভরিয়া-উঠা জীবনের মহাসমন্বয়ের পরম উপলব্ধি! তারপর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া গালে গাল রাখিয়া তারা নিঃস্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকিত আয়নার দিকে যেখানে মিলনের চেয়ে পূর্ণতর চিরন্তন অবিচ্ছিন্নতা। মুকুন্দের মনে হইত, আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রতিবার মনে হইত,

কলেজে-পড়া সেই বাগার্থমিব সম্পৃক্তৌ উপমাটিকে সে— তারা দুজনে— জীবন্ত রূপ দিয়াছে।

কামিনী বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিত না। তার চোখ দুটি ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিত, ধীরে ধীরে মাথাটি নামিয়া আসিত মুকুন্দের কাঁধে। ভারবোধ মুকুন্দকে জানাইয়া দিত কীভাবে কামিনীর দেহ ক্রমে ক্রমে শিথিল অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। বিছানায় গিয়া কামিনী আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ডাকিলেও আর সাড়া মিলিত না। দেহ মন চেতনা সবকিছুই সে মুকুন্দকে দান করিত, এত সে ভালোবাসিত তাকে! তখন সেই ক্ষীণাঙ্গী উজ্জ্বলবর্ণা শায়িতা শ্রীমতীর আত্মলুপ্তির মহিমা এক অব্যক্ত বেদনার ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিত মুকুন্দের হৃদয়ে। আত্মসন্তুষ্টির মোহকারী নেশা কাটিয়া গিয়া নিজেকে তার মনে হইত স্থূল দেহসর্বস্ব মানুষ, সে যোগ্য নয় কামিনীর মতো এই অপার্থিব সম্পদের। একে-একে তার মনে পড়িতে থাকিত কামিনীর অসংখ্য স্বাভাবিক শুচিতা ও কমনীয়তা।

তার প্রাতঃস্নানের সিক্ত স্নিগ্ধ পবিত্রতা, ফুলচন্দনে দেবপূজা, সন্ধ্যায় ধূপগন্ধী অভ্যর্থনা, সংযত স্বল্পাহার, চলাফেরায় লঘুতিছন্দ, মৃদু শান্ত হাসি ও কথায় সুরের ক্ষীণ ঝংকার, উন্মুখ সহানুভূতির অশ্রুধারা। এই রূপ, এই মন, এই হৃদয় পাওয়ার উপযুক্ত মানুষ সে তো নয়! হৃদয় মন টনটন করিতে থাকিত মুকুন্দের। কামিনীকে সে যে রক্তমাংসের মানুষের মতো, পুরুষের মতো, ভালোবাসিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যেন ধীরে ধীরে শয্যাশ্রিতা অচেতন কামিনীর কেশের সুবাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়া, অতি সন্তর্পণে তার সর্বাঙ্গে চুম্বন দিয়া, মুগ্ধ ব্যথিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কামিনীকে সে পূজা করিত। মধ্যরাত্রির অটুট স্তব্ধতা তার কাছে বিচিত্র ঝিমিঝিমি শব্দে মুখর হইয়া উঠিত। ঘরের বিদ্যুতের আলোর স্থির পরিবর্তনহীন ঔজ্জ্বল্য তার চোখে ঝিলিক খেলিত অবিরাম।

এই তার সেই খেলাঘর। আজও সব যেমন ছিল তেমনি আছে, শুধু খেলার সাথীটি নাই। আলনায় উপরে ভাঁজ-করা শাড়িগুলি সায়া-ব্লাউজগুলি সাজানো, নিচে পাশাপাশি তিনজোড়া জুতো, প্রসাধনের টেবিলে চুলের ফিতা কাঁটা, পাউডার, ক্রিম, সিঁদুরের কৌটা, তেলের শিশি, গাঢ় সবুজ রঙের সুজনি পাতা খাটের বিছানা, একটি বালিশে আজও কামিনীর মাথার চাপের ছাপ আছে। বিয়ের ট্রাংকের ওই নকশা-তোলা সাদা ঘেরাটোপ, সুটকেসটার ওই খাকির আবরণ কামিনীর তৈরি করা। মুকুন্দের সিগারেটের আগুনে-পোড়া মশারির ওই ছেঁড়াটুকু কামিনী সেলাই করিয়াছে। নোড়া দিয়া দেয়ালে ওই ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁতিতে গিয়া কামিনীর আঙুল ছেঁচিয়া গিয়াছিল, ব্যথায় চোখে জল আসিবার লজ্জায় কী অপূর্ব মুখভঙ্গিই যে করিয়াছিল কামিনী।

আর্তবিহ্বল দৃষ্টিতে মুকুন্দ চারিদিকে চাহিতে থাকে। সেখানে ছোটবড় কেজো-অকেজো যে জিনিসেই চোখ পড়ে তার মধ্যে কামিনীকে সে খুঁজিয়া পায়। তার নিজের ব্যবহারের জিনিসগুলিতে পর্যন্ত কামিনী জড়াইয়া আছে। কুচানো ধুতিটির দিকে চাহিলে তার চোখের সামনে পেলব আঙুলের দ্রুত সঞ্চালন চলিতে থাকে; খাটের ওপর রাখা শুকনো কাপড়গুলির সামনে খাট ঘেঁষিয়া দাঁড়ানো কামিনী, আঙুলে কাপড় কুচানোর ছন্দের তালে-তালেই যেন বাঁ পায়ের হাঁটু দিয়া মাঝে মাঝে খাটে ঠোকা দিতেছে। তার পালিশ-করা জুতোর একটির ভিতরে কামিনীর বাঁ করতল ঢুকানো, উবু হইয়া বসিয়া একটু সামনে ঝুঁকিয়া ডান হাতে বুরুশ ধরিয়া সে জুতায় ঘষিতেছে, টান পড়ায় পিছনে

ব্লাউজের তলাটা উপরে উঠিয়া শুভ্র পিঠের একটু অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দুই হাঁটুর চাপে স্তন দুটি ব্লাউজ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে দুপাশে। মনের শখে মুকুন্দের জুতা বুরুশ করিতে বসায় সর্বাঙ্গে অপরূপ দোলনের ছন্দ নামিয়াছে কামিনীর। সম্মুখে পিছনে, এপাশে ওপাশে, উপরে নিচে, তির্যকে, সমতলে ঢেউ-তোলা অবিরাম দোলনের ছন্দে চোখ-ঝলসানো তীব্রোজ্জ্বল ঝিলিক খেলিতেছে কামিনীর সর্বাঙ্গের স্মৃতি। বাড়িঘর আলনা টেবিলে খাট সব কামিনীর চারিদিকে পাক দিয়া নাচিতে নাচিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে চারিদিকে বহুদূরের বিস্তৃত অন্ধকারে। ওখানে জ্বলন্ত সাজানো কাঠের ভিতরে শাড়ি-জড়ানো কামিনী পুড়িতেছে আর এখানে সামনেই শুইয়া আছে নিরাবরণ নিখুঁত নিটোল সোনার বরণ কামিনী। ওর বুকেই আছড়াইয়া পড়া যাক।

সিফিলিস? রাগে বিস্ময়ে মুকুন্দের চোখে পলক পড়ে না।— তোমরা কচুপোড়া ডাক্তার। আমার সিফিলিস হতে যাবে কেন? জীবনে আমি কখনও কোনো বেশ্যার দিকে চোখ তুলে তাকাইনি।

তার ডাক্তার-বন্ধু সহজভাবেই জবাব দেয়, তা হবে। বেশ্যাবাড়ি না গেলেও সিফিলিস হতে পারে।

মুকুন্দ একটু আহতভাবে বন্ধুর দিকে তাকায়, তুমি ভাবছ অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে—? আমার এই আটাশ বছর বয়স হল, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি ভাই, কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও আমার খারাপ সম্পর্ক হয়নি।

তা-ও হবে। তবু তোমার সিফিলিস হতে পারে এবং হয়েছে। শুধু এই একভাবে এ-রোগ হয় না, যদিও সাধারণ লোকের ধারণা তাই। নানাভাবে এ-বিষ একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে ঢুকতে পারে। কাছাকাছি আসার, ছোঁয়াছুঁয়ি হবারও দরকার পড়ে না। রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছ, একজন সেই কাপে তোমার জন্য সিফিলিস রেখে গেছে। তবে এভাবে রোগটা ছড়ায় কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে দেয় আর বাপ-মা-র কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা পায়। তুমি কোথায় পেয়েছো জানি না, কিন্তু স্পেশালিস্টকে দিয়ে ভালো করে অনেকদিন চিকিৎসা করাতে হবে। আর-একটা কথা বলি, কোনো কথা গোপন কোরো না।

মুকুন্দ যেন শুনিতে পায় না, অভিভূতের মতো বলে, সিফিলিস আমার সিফিলিস? আমি টের পেলাম না, আমার সিফিলিস!

টের পাবে কী করে? বেশ্যাবাড়ি না গেলে সিফিলিস হয় না ধরে রেখে নিশ্চিন্ত ছিলে, হয়তো সারাগায়ে ইরাপসনৎ বের হলেও ভাবতে খোসপাঁচড়া হয়েছে। তবে কী জানো, এ বড় খাপছাড়া শয়তান রোগ। কারও বেলা হইচই করে জানান দেয়, কারও বেলা গোড়ায় এমন নিরীহের মতো থাকে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে টের পাওয়া কঠিন হয়। কারও বেলা বছরের-পর-বছর নানা রোগের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। এ-সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন কত লোকের যে প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা হয় না, রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, চিকিৎসায় হাঙ্গামা বাড়ে। শুধু কি চিকিৎসার হাঙ্গামা? ইতিমধ্যে তিনি না জেনে সমাজের গোড়া খুঁড়তে থাকেন— স্ত্রীকে রোগ দেন, রোগা, পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ছেলেমেয়ে জন্মান। সমাজের এ একটা যে কতবড় অভিশাপ, তোমার ধারণাও নেই মুকুন্দ। ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যোগ দেয়, কিন্তু তুমি ভড়কাচ্ছ কেন? জানা গিয়েছে যে এ তো তোমার মঙ্গল। চিকিৎসা করিয়ে ভালো হয়ে যাবে।

ভালো হয় তো? কেউ কেউ বলে সিফিলিস নাকি সম্পূর্ণ সারে না?

না জেনে-শুনে লোকের ওরকম বলা স্বভাব বলেই তো গোলমাল। মূর্খতার এই হল সবচেয়ে বড় লক্ষণ। যে কিছুই জানে না তার এই দিক দিয়ে মস্ত একটা সুবিধা আছে— সে একেবারে নিরঙ্কুশ, যা মনে এল বলে গেল, ভুল হল কি ঠিক হল ভেবে মাথা ঘামাতে হয় না। এ তো তুমি সব বিষয়েই দেখতে পাচ্ছ। যে জানে তার চেয়ে যে জানে না সে হাজারগুণ জোরের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তুমি তো শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ—

মুকুন্দ বাধা দিয়া বলে শিক্ষার কথা রাখো ভাই। শিক্ষা চুলোয় যাক। একটা কথা ভাবছি। আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হল কীসে?

ডাক্তার বলে, ওই যে বললাম তোমায়, এ-রোগের নানা ছদ্মবেশ। সেদিন তুমি হঠাৎ ওভাবে অজ্ঞান হয়ে গেলে। শরীরের দুর্বলতা, মেন্টাল স্ট্রেন এসবের জন্য ওটা হতে পারত, তবে এসব ক্ষেত্রে একবার টেস্ট করিয়ে নিশ্চিত হতে হয়।

পাংশু বিবর্ণ মুখে মুকুন্দ মাথা নত করিয়া বসিয়া থাকে। ব্যাপারটা ধারণা করিতেও তার কষ্ট হয়। মানুষের যে-রোগ সম্বন্ধে চিরদিন সে মনে মনে অকথ্য ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে, যে-রোগকে সে গণ্য করিয়া আসিয়াছে মানুষের দেহগত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে, সে-রোগ তার নিজের দেহে প্রবেশ করিয়াছে শুধু এইটুকু জানাটাই তার কাছে ছিল নিদারুণ ব্যাপার। কিন্তু এ জ্ঞানের সঙ্গে আরও-এক ভয়াবহ চিন্তা আসিয়া দেহের রোগ হওয়াকে ছোটো করিয়া দিয়াছে তার কাছে।

কামিনীর জন্য অসহ্য মনোবেদনার চাপে নয়, সিফিলিসের জন্য সেদিন সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কামিনীর জন্যই কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু ওরকম কষ্ট হইয়াছিল রোগের জন্যই। এ যদি সত্য হয়, তবে তো সমস্ত অতীত বুঝি তার মিথ্যা হইয়া গেল, ফাঁকিতে পরিণত হইয়া গেল। তার এতদিনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা, সার্থকতা-ভরা জীবন শুধু জীবনের একটা বিকার মাত্র, নিজের দেহের মধ্যে থাকিয়া এই অজানা অদৃশ্য শত্রু এতকাল তাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো খেলা করাইয়াছে। অ্যালকোহল যেমন মাতালকে মাতাইয়া রাখে, সিফিলিসের বিষ তাকে এতকাল হাসি-কান্নায় মাতাইয়া রাখিয়াছে। ভাবিতে গেলেও মাথা ঝিমঝিম করিয়া আসে মুকুন্দের। কামিনীর সঙ্গে তার সেই তীব্র মধুর অনুভূতিময় রোমাঞ্চকর বছর কয়েকটাও তবে ফাঁকি? কামিনীর জন্য শোক যদি তার বিকার হয়, প্রেমটাও বিকার ছিল বইকি।

মুকুন্দ ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছিল, কামিনীর সঙ্গে তার বাঁচার প্রয়োজনও শেষ হইয়া গিয়াছে, তার বাঁচিয়া থাকার অর্থ নাই। আজ সে বুঝিতে পারে, ভুল হইয়াছিল। নিজের হাতে বিনাশ করা কামিনীর জন্য মর্মান্তিক যাতনায় কাতরাইতে কাতরাইতে বাঁচিয়া থাকারও মানে ছিল, তা-ও হইত জীবন। জীবনটা তার অর্থহীন বলিয়া জানা গেল আজ। জীবন তার শেষ হয় নাই— শুধু এইজন্য যে নিজস্ব জীবন বলিয়া কোনোদিন তার কিছু ছিল না।

প্রশ্ন করা মিথ্যা জানিয়াও ভিতর তাগিদের কাছে হার মানিয়া মুকুন্দ একসময় জিজ্ঞাসা করে, আমার ওটা তবে সিফিলিটিক স্ট্রোক হয়েছিল, সেদিন যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া বলেন, না। তবে সিফিলিসও দায়ী ছিল। আমি সব জানি বলেই আমার পক্ষে বলা সহজ হচ্ছে। অন্য ডাক্তারের পক্ষে মুশকিল হত।

তোমায় আগেই বলেছি, ছ-সাত মাস তোমার যেরকম স্ট্রেন চলছিল, শরীরটাও যেরকম দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে ও-অবস্থায় এমনিই তোমার ফিট হতে পারত। কিন্তু তাই বলে রোগটার দায়িত্ব কম মনে কোরো না। হয়তো—

হয়তো?

হয়তোই-বা কেন বলি, কথাটা সত্যি। স্ত্রীর জন্য তোমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে এসেছে, রোগটা না থাকলে ওটা অত জোরাল হত না।

শুনিয়া মুকুন্দ খুব বেশি সান্ত্বনা পায় না। তবে রোগটার কাছে সে যে সম্পূর্ণ আত্মবিক্রয় করে নাই, ক্ষীণ হোক দুর্বল হোক তার নিজস্ব সত্তা খানিকটা বজায় আছে, এই ভরসাটুকু তার মানসিক মৃত্যু-যন্ত্রণা অনেকখানি নিবারণ করে।

কনকনে শীত পড়িয়াছে। সকাল ও সন্ধ্যায় ধোঁয়ার ম্লানিমা ছাড়া দিনগুলি শহরেও উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ। মেঘহীন নির্মল আকাশে ঊর্ধ্বচারী পাখিগুলিকেও সঞ্চরণশীল কালো বিন্দুর মতো দেখা যায়। রাত্রে নরম লেপ ও দিনে গরম জামাকাপড়ে ঢাকা দেহগুলি আরাম বোধ করে মনোরম। বাজারে নানারকম নতুন ফলমূল তরি-তরকারি উঠিয়াছে, ভাগ্যবানদের রসনাগুলি স্বাদ-বৈচিত্র্যের পুলকে রসস্থ হইয়া উঠিয়াছে। খাওয়া একটু ভালো হইবার ফলে অনেক অপরিপুষ্ট দেহের স্বাস্থ্যেরও খানিকটা উন্নতি হইয়াছে—যত সামান্যই হোক। কেবল স্নেহহীন খড়ি-ওঠা চামড়ায়, হাসিহীন ফাটা ঠোঁটে শীত শুধু কর্কশ ধারাল স্পর্শ, উষ্ণতার অভাবে কোঁকড়ানো আর্ত স্নায়ুতে নিষ্ঠুর কাঁপুনি। সংকুচিত চর্মের টানাটানি আর প্রায় জমিয়া যাওয়া মজ্জার হিমশীতলতা মিলাইবার আগেই রোদ পোহানো শেষ হইয়া ঘনাইয়া আসে রাত্রির আতঙ্ক, ঘুম আসিবার আগেই কুড়োনো ডালপালা শুকনো পাতা ও আবর্জনা ছাই হইয়া ফুরাইয়া যায় আগুন পোহানো। তারপর ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া চট আরও ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকাইয়া পড়িয়া থাকা প্রভাতের প্রত্যাশায়।

মুকুন্দ জানিত না এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এত লোক শীতে এত কষ্ট পায়।

বাংলায় এত বৃষ্টি। আপনি কি জানেন বাংলায় জলের অভাবে কত লোক কী কষ্ট পায়? পাশের বাড়ির নারায়ণ আচার্য বলে মৃদু হাসির সঙ্গে। নারায়ণের চোখের গাম্ভীর্য হাসিটাকে হালকা হইতে দেয় না। কোনো বিষয়ে সে কিছু জানে না কেউ এরকম ইঙ্গিত পর্যন্ত করিলে আগে মুকুন্দের অভিমানে ঘা লাগিত, সে সব জানে প্রমাণ করিবার জন্য ভিতরে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করিত। এখন সে জগতের যত জানার আছে তার প্রায় কিছুই জানে না বলিয়াই লজ্জা অনুভব করে, অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় না।

দেশের অবস্থা কিছু কিছু সকলেরই জানা দরকার। নারায়ণ বলে।

নিশ্চয়, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

মুকুন্দ আন্তরিকতার সঙ্গে সায় দেয়, ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়। মুকুন্দের দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতি। চোখ-মুখ হতেই সেই আত্মগ্লানি ও বিষণ্ণতার ছাপ মুছিয়া গিয়াছে, কথায় ব্যবহারে চালচলনে দিশেহারা উত্তেজনার ভাবটাও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে মুখে যন্ত্রণার স্থায়ী বিকৃতি দেখিয়া অপরিচিতেরও মনে হইত লোকটার বুঝি কলিক বা দন্তশূল হইয়াছে, সে মুখে আজ দেখা দিয়াছে শান্তি-ভরা হৃদয়মনের শান্ত পরিতৃপ্ত ভাব। মুকুন্দ আর একা থাকে না, এলোমেলো খাপছাড়া চিন্তাও করে না, অনুভূতির জগতে উদ্দাম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া উপভোগও করে না।

অবাধ্য মন যে তার বশে আসিয়াছে তা বলা যায় না, নিজের চেষ্টায় মানসিক বিকারগুলিকে সে যে বর্জন করিতে পারিয়াছে তা-ও নয়। দেহগত কঠিন রোগটার সুদীর্ঘ চিকিৎসার লম্বা সময়টা সংযত সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, নিজের বিষাক্ত শরীরটা নির্মল ও শুদ্ধ করিবার দিকে একাগ্রতা, সমগ্র জীবনে বিপ্লব আনিয়া দিবার মতো সাংঘাতিক বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড আঘাত ও ক্রমিক প্রতিক্রিয়া এবং আরও অনেককিছু তার মধ্যে এই পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। প্রথমে হতবম্ব হইয়া গিয়াছিল, গভীর হতাশার সঙ্গে মনে হইয়াছিল আর বাঁচিয়া থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভালো। এই আত্মহত্যার চিন্তাটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করার সময় হঠাৎ একটা কথা খেয়াল করিয়া সে প্রায় বিভীষিকা দেখার মতো চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

মুকুন্দের মনে হইয়াছিল, যে অসুস্থ মনের বিকৃত খেয়ালে সে স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই অসুস্থ মনেই কি নিজেকে হত্যা করার এই প্রেরণা জাগিতেছে না? মন তার স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, একেবারে না হোক খানিকটা সে উন্মাদেরই শামিল। ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বিবেচনা করার ক্ষমতা কি তার আছে? এই বিষাক্ত দেহ এবং ব্যর্থ বিধ্বস্ত জীবনটা শেষ করিয়া সব চুকাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা জাগাটাই হয়তো তার রোগেরই একটা লক্ষণ!

আতঙ্কে মুকুন্দ দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। মনটাই যদি তার পচিয়া গিয়া থাকে তবে তো ছোট বড় সমস্ত চিন্তা আর অনুভূতিই তার বিকৃত! তার সমস্ত ধারণা মিথ্যা, তার সুখ দুঃখ হাসি কান্না কৃত্রিম, তার প্রতিমুহূর্তের জীবন শুধু নিছক একটা প্রতারণা মাত্র! আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ার আগে যে অসহ্য যন্ত্রণা তার হইয়াছিল, সেই যন্ত্রণাই যেন আবার এই বিকৃত আত্মোপলব্ধির রূপ নিয়া তাকে উন্মাদ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।

প্রাণপণে আর্তনাদ করিয়া সে কোনোদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার অন্ধ কামনাকে যে কীভাবে পরিণত করিয়াছিল উদ্ভ্রান্তের মতো আবার তার ডাক্তার-বন্ধুর কাছে ছুটিয়া যাওয়াতে, সে তা জানে না।

কী হল মুকুন্দ?

আমি কি পাগল হয়ে গেছি? ভাঁওতা দিয়ো না। দোহাই তোমার, ভুলিয়ো না আমায়। সত্যি করে বলো, অনেকদিন থেকে আমি কি উন্মাদ?

না।

কী করে জানলে?

শান্ত হয়ে শোনো বলছি। শুনলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। পাগল কখনও ভাবে না সে পাগল কি না। আমি পাগল কি না, এ সন্দেহ যার মনে জাগে তার পক্ষে পাগল হওয়া অসম্ভব।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

পাগল না হই, আমার মনটা তো বিকারগ্রস্ত? প্রশ্ন করিয়া ব্যাকুল আগ্রহে মুকুন্দ বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

এককথায় তোমার এ-প্রশ্নের জবাব হয় না। সম্পূর্ণ বিকারহীন মন জগতে ক-টা আছে জানি না, আমি আজ পর্যন্ত একটিরও সংস্রবে আসিনি। তবে কারও মধ্যে বিকার বেশি থাকে কারও মধ্যে কম।

আমার মধ্যে বেশি আছে নিশ্চয়?

বন্ধু একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়াছিল, সম্ভব।

তারপর আতঙ্কের উগ্রতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার-বন্ধু অনেকবার স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, অসুখ তার সারিয়া যাইবে, একটু বেশিদিন চিকিৎসার দরকার। মুকুন্দ ভাবিয়াছিল, তাই যদি হয়, তবে ধৈর্য ধরিয়া দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়? দেহের সঙ্গে মনও হয়তো তার সুস্থ হইয়া উঠিবে।

এইসঙ্গে সে ঠিক করিয়াছিল, কোনো বিষয়ে বিচলিত হইবে না, ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করিবে না। ঠিক আর-দশটি সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, সে-ও ঠিক তেমনিভাবে বাঁচিয়া থাকিবে। মনকেও সংযত করিবে। বুদ্ধি যখন তার মোহাচ্ছন্ন, মনের কোন্ ভাবটা খাঁটি কোন্টা ফাঁকি ঠিক করার ক্ষমতা নাই, তখন কোনো বিষয়েই মানসিক বাড়াবাড়িকে সে প্রশ্রয় দিবে না। সুখ দুঃখ কামনা বাসনা গ্লানিবোধ অনুতাপ ভয় ভাবনা হতাশা বিষাদ সবকিছু দমন করিয়া রাখিবে। কামিনীকে খুন করার কথাটা পর্যন্ত ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে— যতদিন দেহ মন তার সুস্থ না হয় ততদিন পর্যন্ত। কে জানে কামিনীর জন্য তার শোক দুঃখ অনুতাপ আত্মগ্লানি এসব বিকার নয়, আত্মপ্রতারণা নয়?

মনকে সবদিক দিয়া নির্বিকার সংহত করার কথা ভাবা যত সহজ, কাজে তত সহজ নয়। গোড়ার দিকে ঘনঘন মুকুন্দকে সচেতন হইয়া উঠিতে হইত যে মনটা মোটেই বাগ মানিতেছে না, প্রতিজ্ঞার কথা স্রেফ ভুলিয়া গিয়া বর্জিত, নিষিদ্ধ চিন্তা ও ভাবে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেছে। এমনকি নিজের অক্ষমতার অজুহাত আশ্রয় করিয়াও ক্ষোভে দুঃখে আকুল হইয়া মুকুন্দ নিজেকে অভিশাপ দিয়াছে, মরণ কামনা করিয়াছে! মনকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার জন্যই মন তার হইয়াছে অশান্ত!

চিকিৎসা না চলিতে থাকিলে হয়তো সঙ্কল্পটা দুদিনেই স্বপ্নের মতো মুছিয়া যাইত, দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকেই পাক খাইয়া মরিত মুকুন্দের মন। কিন্তু চিকিৎসার অতিশয় বাস্তব নিয়মকানুন বিধিনিষেধ তাকে ভুলিতে দেয় নাই, হতাশ হইলেও হাল ছাড়িতে দেয় নাই। ক্রমাগত মনে পড়িয়া গিয়াছে যে তার উদ্দাম কল্পনা ও দুরন্ত ভাবাবেগ অর্থহীন, তার স্বকীয় নয়।

নানাভাবে সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমোদপ্রমোদ ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হালকা হাসিতামাশা গল্পগুজব তাস-পাশা খেলার আড্ডা দিতে গিয়া দেখিয়াছিল, ওসব তার সহ্য হয় না, দম আটকাইয়া আসে। কেবলি মনে হয়, এরা সকলে মানসিক বিকারের একটানা পীড়ন হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সস্তা অভিনয় করিয়া নিজেদের ফাঁকি দিতেছে। ভোঁতা নিরুৎসব নিরীহ গোবেচারি সাধারণ সংসারি লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া বরং তার ভালো লাগিয়াছে— সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনে রোগশোক দুঃখ-বেদনা পর্যন্ত যেন এদের কাছে উপভোগ বৈচিত্র্য, হাসিকান্না জীবনের সাধারণ চলতি নিয়ম।

এদের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া অন্যমনস্ক থাকিবার আরেকটি উপায় মুকুন্দ আবিষ্কার করিয়াছিল,— বই পড়া। জ্ঞানলাভের পিপাসা তো তার নয়, তাই গোড়ায় সে শুরু করিয়াছিল চিত্তাকর্ষক সস্তা নাটক নভেল পড়িবার চেষ্টা করিয়া। আগে কত ভালো লাগিত এসব বই, এখন কিন্তু পড়িতে তার রীতিমতো কষ্ট হইতে লাগিল, কোনো কোনো বই পড়িয়া কল্পনা তার উদ্দাম হইয়া উঠিতে লাগিল তার নিজের সম্বন্ধে, যা সে

ভাবিতে চায় না অনুভব করিতে চায় না সেইসব ভাবনা অনুভূতি যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাকে আরও বেশি কাবু করিয়া দিতে লাগিল। তারপর একদিন সে ডাক্তার-বন্ধুর কাছ হইতে আনিল একটি ডাক্তারি বই— পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টায় যেটুকু বোঝা গেল তারই ভিত্তিতে ভাবিবার চেষ্টায় ক-টা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল সে জানিতেও পারিল না। মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুটির কাছ হইতে একবার সে একখানা মনস্তত্ত্বের বই আনিল। তারপর শুধু এই ধরনের বই আনিয়াই সে পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে জুটিয়া গেল সমাজ ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই। জ্ঞানের জন্য নয়, নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য।

কিন্তু মন দিয়া পড়িলে ও ভাবিলে জ্ঞান বাড়িবেই। একদিন দেখা গেল সকালে চা খাইতে বসিয়া নারায়ণের বোন অপর্ণার সঙ্গে সে সাইকোলজির আলোচনা করিতেছে। অপর্ণা এই সাবজেক্টে সদ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিয়া ভাবিতেছিল কী করিবে। বাড়ি ফিরিয়া মুকুন্দের প্রথম এটা খেয়াল হইল যে অপর্ণার সঙ্গে আলোচনা করিতে তার কোনো অসুবিধা হয় নাই, বরং অপর্ণাকেই সে অবচেতন মনের ব্যবহারিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি নতুন আবিষ্কারের কথা শুনাইয়া আসিয়াছে, যা অপর্ণা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না সন্দেহ হওয়ায় সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মুকুন্দ এতদিন জানিত না কোনো বিষয়ে সে কিছু জানে।

যেদিন ডাক্তার তাকে বলিয়াছিল সে সম্পূর্ণ সারিয়াছে, আর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, সেদিন অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়াছিল মুকুন্দের, কলেজজীবনে শেষ পরীক্ষা দিবার পর যেরকম পরম একটা মুক্তি-বোধের আনন্দের সঙ্গে সমাপ্তি-বোধের মৃদু বিষাদ।

সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে একথায় জোর দিবার জন্য ডাক্তার পর্যন্ত বলিয়াছিল, ইচ্ছে করলে এবার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারো।

শুনিয়া মুকুন্দের হাসি পাইয়াছিল।

কামিনীর দাদা মনোহর চাকরি করে পাটনায়। কামিনীর মা এবং ভাইবোনেরাও সেখানে থাকে। কামিনীর আপনজনের ভুলিয়া থাকিবার স্বস্তি ভোগ করিতে মুকুন্দ মনের সঙ্গে বোঝাপড়া একটা করিয়া ধারণা গড়িয়া নিয়াছিল যে ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র কামিনীর সঙ্গেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ওদের কাছে সে এখন পর। কলের মতো দু-তিনখানা চিঠির জবাব দিয়াছিল, তারপর মানসিক বিপর্যয় চরমে উঠিবার সময়টা অন্যান্য চিঠির মতো পাটনার চিঠিও খুলিয়া পর্যন্ত দেখে নাই।

পরে অনেকের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ তার গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পাটনা হইতে কোনো চিঠি আসে নাই, সে-ও লেখে নাই। ফাল্গুনের গোড়ায় মনোহরের একখানি চিঠি আসিল। সে এক মাসের ছুটি নিয়াছে সকলকে নিয়া কলকাতায় আসিয়া থাকিবে। মুকুন্দ যেন একটি বাড়ি ঠিক করিয়া রাখে।

আত্মীয়তা-ভরা চিঠি। খবর দেওয়া-নেওয়া না করার জন্য অনুযোগ, ছোট বড় দরকারি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য অকুণ্ঠ দাবি, তার জন্য সকলের চিন্তিত থাকার খবর। কামিনীর মা নাকি তাকে একবার দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাকে দেখিলে মনে একটু শান্তি পাইবেন।

দার্শনিকের উদারতায় আশেপাশের মানুষগুলিকে বুঝিবার ও আপন করিবার চেষ্টার মধ্যেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে কাল্পনিক কুটুম্বিতা হইয়াছিল, আসল কুটুম্বের একখানি চিঠির আঘাতে সেটা যেন ফাঁসিয়া গেল। বেদনা বৈরাগ্যে রসাল হওয়ায় হৃদয়

একটি তুচ্ছ আশ্রিতা মহিলার অতিশয় ভালো একটি মেয়ে ব্রত করিয়াছে, সেজন্য ধনদাসের বাড়িতে মুকুন্দের নিমন্ত্রণ! স্বয়ং ধনদাস আসিয়া তাকে গাড়িতে তুলিয়া বাড়ি নিয়া যাইব নিমন্ত্রণ রাখিতে!

ভাত খাইয়া মুকুন্দ আপিসে আসিয়াছে। কিন্তু নিজের বাড়িতে কামিনীর ভাইবোনদের আবির্ভাবের উত্তেজনায় পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখিতে পারিবে। কিন্তু কেন এ নিমন্ত্রণ?

ধনদাসের গাড়িতে পিছনের সিটে এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া এই কথাটাই মুকুন্দ ভাবে।—

ধনদাস একথা-ওকথার পর বলে, এই নিয়ম সংসারে, জানো, এই হল নিয়ম। একজন রোজগার করবে, দশজন তার ঘাড়ে বসে খাবে। তবে কী জানো, মেয়েটি বড় ভালো। চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে— সংসারের এমন কাজ নেই জানে না। সেলাই-ফোঁড়াই গানবাজনা এসবও জানে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বড় স্নেহ করি মেয়েটাকে। পাত্র খুঁজছি— আমি সেকেলে মানুষ বাবু, মেয়েদের অল্পবয়সেই পার করা ভালো মনে করি। পণ-টন বিশেষ দেব না— তবে নাতজামাইকে উন্নতি করিয়ে দেব। ওটা করতেই হবে, ওটা কর্তব্য, কী বলো?

নিশ্চয়।

অল্প মোটা শ্যামবর্ণা ব্রতচারিণী মেয়েটি মুকুন্দকে পরিবেশন করিল। মেয়ে দেখানো নয়, এ নিমন্ত্রণ। ধনদাস কি মেয়ের দালাল না ঘটক যে মুকুন্দকে বাড়িতে ডাকিয়া মেয়ে দেখাইবে? কিন্তু লজ্জায় ভয়ে ঘামে ও অকাল যৌবনের অনিবার্য কৌতূহলে আত্মহারা বেচারি মেয়েটিকে একবার দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুকুন্দ ভাবিবার চেষ্টা করে যে ধনদাসের কাছে না জানি সে কতবড় অর্থলোভী ভিক্ষুক, লম্পট, ছোটলোক। নতুবা তাকে এভাবে মেয়েটিকে দেখানোর কথা ধনদাস কী করিয়া ভাবিল! মেয়েটির গায়ে সেমিজ নাই, ব্লাউজ নাই, পরনের শাড়িখানা প্রায় নেটের মশারির মতো স্বচ্ছ! এ কী সত্যই ধনদাসের পরিকল্পনা? ধনদাস বোকা নয়। সে নিশ্চয় জানে এভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায় কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে-উত্তেজনা বিবাহ করিয়া কোনো মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করার ভূমিকা নয়।

ব্যাপার সে বুঝিতে পারে খাওয়ার পর বৈঠকখানার বদলে দোতলার একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে বিশ্রামের হুকুম পাইয়া। গড়গড়ায় তামাক আসে— সুগন্ধি তামাক। নলে দু-চারটা টান দিয়া ধনদাস নলটা মুকুন্দের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলে, বিশ্রাম করো মুকুন্দ। প্রেসে যাও তো যেয়ো, নইলে ছুটি নাও আজকের দিনটা। আমিও শুইগে একটু।

তারপর আসে মেয়েটি, ধনদাসের পিসি অথবা মাসির মেয়ে। তার হাতে পানের রেকাবি। পান নিন।

মুকুন্দের কেমন ভয় করিতে থাকে। মেয়েটিকে তার ঘাড়ে চালান করিয়া দিতে এমন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কেন ধনদাস যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত তার লোপ পাইয়াছে? কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কি কখনও লোপ পায় ধনদাসের? ধীর স্থির চালাক, ধড়িবাজ ধনদাসের? মতলব না ছকিয়া তো সে কোনো কাজ করে না। সস্তায় দূরসম্পর্কের

আশ্রিতা মেয়েটির একটি পাত্র জোটানোর মতলবটা সহজেই বোঝা যায়, মুকুন্দ শুধু বুঝিতে পারে না তাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য বিশেষ কী ফন্দিটা সে করিয়াছে। শুধু মেয়েটিকে এভাবে সামনে ধরার মতো স্থূল উদ্ভট উপায়ের উপরে ধনদাস নির্ভর করিয়াছে মুকুন্দের বিশ্বাস হয় না। অত কাঁচা মানুষ ধনদাস নয়। তাছাড়া, কিসের এত তাগিদ যে মুকুন্দকে খেলাইয়া তুলিবার বদলে বর্শায় গাঁথিবার মতো এই স্পষ্ট অভদ্র উপায়টা তাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে?

তোমার নাম কী?

সুধা।

আচ্ছা সুধা, তুমি যাও। আমার আর-কিছু দরকার নেই।

আমায় গল্প করতে বলেছে আপনার সঙ্গে।

আর কী বলেছে?

বলেছে—। সুধা একমুহূর্ত ইতস্তত করে, তারপর সোজা মুকুন্দের চোখের দিকে চাহিয়া বলে, বলেছে আপনি আমার হাতটাত ধরলে যেন—

চেঁচিয়ে ওঠো?

না, চুপ করে থাকি।

সুধা পাগল নয়, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এখন উন্মাদিনীর।

বাড়ি ফিরিতে মুকুন্দের বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সে বাড়ি না থাকায় কারও কোনো অসুবিধা হয় নাই, খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই করা ছিল— চাকর ও ঠাকুর সকলের সবরকম আরামের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ স্টেশনে যায় নাই বলিয়া, তাদের আগমন উপলক্ষে একটা দিন ছুটি নেয় নাই বলিয়া, কামিনীর আপনজনেরা একটু যেন গোসা করিয়াছেন মনে হইল।

কিন্তু মুকুন্দ যখন জানাইয়া দিল কেন সে তাদের অভ্যর্থনা করিতে স্টেশনে যায় নাই, বাড়িতেও থাকে নাই, সকলের রাগ যেন জল হইয়া গেল একমুহূর্তে। স্বয়ং কর্তা নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গাড়িতে তাকে বাড়িয়ে নিয়া গিয়াছিলেন! সত্যই তো, এ-অবস্থায় মনিবকে চটাইয়া সে কী করিয়া অন্যদিকে নজর দেয়!

শাশুড়ি বলিলেন, বেঁচে থাকো, বাবা। এমনি করেই তো উন্নতি হয় মানুষের। আপিসের বড়কর্তা নিজে মাখামাখি করছেন, তুমি উঠবে। অনেক উঁচুতে উঠবে। আমার কামিনী যদি আজ বেঁচে থাকত!

বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ, খুব বেশিক্ষণ নয়, ডাক ছাড়িয়া কামিনীর জন্য কাঁদিলেন। এটা প্রথা। মেয়ে মরার পর জামায়ের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম দেখা। ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়িতে ঢুকিবার আগেই তিনি কান্না শুরু করিয়াছিলেন। ভিতরে গিয়া মুকুন্দ বাড়িতে নাই জানিয়া সেটা স্থগিত ছিল। মুকুন্দ এখন আসিয়াছে। স্থগিত-করা কান্নাটা এখন সম্পূর্ণ করা দরকার।

মনোহরের মা বেশ ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন, মনোহরের বউ রাধারানী ঘনঘন শুকনো চোখ মোছে, মনোহরের ছোটভাই তমোহর ঠোঁটে আঙুল দিয়া মাথা নিচু করিয়া থাকে, তেরো-চোদ্দো হইতে দুই-তিন বছর বয়সের গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া চোখ বড় করিয়া মুকুন্দের দিকে তাকায়, মুকুন্দ চাহিয়া থাকে কামিনীর বোন যামিনীর দিকে। যামিনীও তার দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু তাকে দেখিতে পাইতেছে কি না

তার শান্তই ছিল বলা যায়, হঠাৎ যেন আবার মুচড়াইয়া গেল অসংখ্য বাস্তব স্মৃতির ঘূর্ণাবর্তে।

অসহায়ের মতো মুকুন্দ নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করে, কেন? আবার কেন?

পরদিন মনোহরকে সে জবাব লিখিয়া দিল যে বাড়ি ভাড়া করার দরকার নাই, তার বাড়িতেই সকলে আরামে থাকিতে পারিবে। আরামে থাকার কথাটা সে কেন লিখিল কে জানে, বোধ হয় তার মনে হইয়াছিল ওদের সঙ্গে একবাড়িতে একটা মাস তার বেশ আরামে কাটিয়া যাইবে।

মনোহরদেব যেদিন কলকাতা পৌঁছিবার কথা সে-দিনটা বড়ো খারাপ গেল মুকুন্দ।

কম্পোজিটর কালাচাঁদের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ তার অত্যন্ত ফরসা, প্রায় সাদাটে বলা চলে। এককালে সুপুরুষ ছিল অনুমান করা যায়। এখন অবশ্য চেহারাটা জীর্ণ শীর্ণ ঝরা পাতার মতো হইয়া গিয়াছে। শহরের দক্ষিণের হাওয়া আসিবার সঙ্গে বসন্ত রোগের প্রকোপ বাড়িয়া যায়। কালাচাঁদের বউয়ের বসন্ত হইয়াছে। ছেলেমেয়েদেরও হইয়াছে, ক-জনের মুকুন্দ সঠিক জানিত না। আগাম দশটা টাকা কালাচাঁদ কয়েকদিন আগে আদায় করিয়াছিল— অর্থাৎ দয়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কালাচাঁদকে। যদিও এরকম দেওয়ার একটা রীতি বরাবর বজায় আছে।

দুদিন কালাচাঁদ কাজে আসে নাই। আজ সে আসিবামাত্র মুকুন্দ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

মাসখানেক তুমি ছুটি নাও কালাচাঁদ।

ছুটি, বাবু? মাইনে পাব তো?

কী বীভৎস চেহারা হইয়াছে কালাচাঁদের, এত ফরসা রঙ তার। এর চেয়ে মেটে রঙ হইলেও বোধ হয় এত তাকে খারাপ দেখাইত না। ছেলেবেলা মাছের ফটকা নিয়া খেলা করিয়াছে মুকুন্দ, কালাচাঁদের মুখে মানুষের চামড়ার বদলে যেন সেই শুকনো মাছের ফটকা টান করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাইনে পাবে কীরকম? মাইনে-টাইনে পাবে না। তবে, তোমায় বরখাস্ত করছি না, এক মাস পরে এসো, যেমন কাজ করছিলে তেমনি আবার কাজ করবে।

মুকুন্দ দম নেয়।

কর্তার হুকুম কালাচাঁদ। ছোঁয়াচে রোগ কি না। তোমার দূরে থাকাই ভালো কিছুদিন।

স্তিরি আজ মারা গেছে বাবু। ভোরবেলা।

মারা গেছে? ও! মুকুন্দ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

কিছু টাকা নিতে এসেছিলাম বাবু। স্তিরির সৎকাজে লাগবে। ও-মাসে কেটে নেবেন। আর ছুটিফুটি দেবেন না বাবু, ছুটি চাইনে। ছুটি নিলে কি আমাদের চলে?

কী করা যায়? কী করিয়া একে বুঝানো যায় যে বাড়িতে এসব রোগ হইলে যে বরখাস্ত করার বদলে বিনা বেতনে এক মাস ছুটি দেওয়া হয়, ধনদাস এটা বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে?

টাকা তো হবে না কালাচাঁদ।

ঘরে মড়া পচবে বাবু?

মুকুন্দ চোখ বোজে। ধারটার করে—

কে ধার দেবে বাবু? কালাচাঁদ যেন হন্যে কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করিয়া কথা বলে, যদিও কথাগুলি বলে অতি সাধারণ— স্তিরি, দুই মেয়ে আর ছেলেটাকে ধরেছেন শেতলা। অ্যাদ্দিন চিকিৎসে হল কীসে? ধার করতে বাকি রেখেছি কোথাও? কালাচাঁদ হাসে, সত্যই হাসে— বন্য শেয়ালের মতো।— আপনিই তবে ধার দেন বাবু দশটা টাকা। ও-মাসে ঘটিবাটি বেচে শোধ দিয়ে যাব।

মুকুন্দ ধার দিবে? টাকা কই মুকুন্দের! কামিনীর আপনজনদের আরামের ব্যবস্থা করিতে নিজেকেই তার টাকা ধার করিতে হইয়াছে মাসের মাঝামাঝি সময়ে— বেতনের টাকায় কুলায় নাই।

জানি বাবু, জানি। কালাচাঁদও বলে। নিরীহ গোবেচারি কালাচাঁদ। সে যেন সব জানে তাই তার আর-কিছু বলিবার নাই। সে যেন জানে যে মুকুন্দেরা নিজেদের স্ত্রীদেরও খুন করে, কালাচাঁদের স্ত্রীরা মরিয়া গেলেও দশটা টাকা ধার দেওয়া কর্তব্য মনে করে না।

ব্লটিংয়ে আঁচড় কাটে মুকুন্দ। স্ত্রী? স্ত্রীলোক? সোনালি স্তন, বাঁকা কোমর, বোকামি-ভরা ভীরু চোখ, কাঁদো-কাঁদো ঠোঁট। কি নিষ্ঠুর ওরা! এমন ওরা বশ করে পুরুষমানুষকে যে চাকরি যাওয়ার লজ্জাটুকু গোপন করিতে ওদের খুন করিতেও হয়।

এবার স্টেশনে যাওয়া উচিত। আর দেরি করিলে মনোহরদের গাড়ি আসিয়া পড়িবে।

টেলিফোনটা বাজিয়া ওঠায় মুকুন্দ রিসিভারটা কানে লাগায়।

ধনদাস বলে কাজকর্ম কেমন চলছে?

মুকুন্দ বলে, আজ্ঞে ভালোই চলছে। একজন কম্পোজিটরের বাড়িতে বসন্ত হয়েছে—

দারোয়ানকে বলে দিন প্রেসে যেন ঢুকতে না দেয়। এসব বিষয়ে কড়া হবেন মুকুন্দবাবু— মুকুন্দই বলি তোমাকে, কেমন? তুমি আমার ছেলের বয়সি। রোগ-ব্যারামকে বড়ো ডরাই মুকুন্দ। ও-ব্যাটাকে কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না, খবরদার!

আজ্ঞে, না।

বেশ। বেশ। কী যেন বলছিলাম, ও হ্যাঁ। মুকুন্দ, আজ তুমি আমার বাড়িতে খাবে। কিছু মনে কোরো না, আগে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার বাড়িতে থাকে, মাসি না পিসি কী যেন হয় আমার, তার মেয়ে ব্রত করেছে। এই উপলক্ষ আর কী— বড় ব্যাপার কিছু নয়। মেয়েটি বড় ভালো মুকুন্দ। এমন ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

আমি আসছি। তোমায় তুলে নিয়ে যাব।

স্টেশনে আর যাওয়া গেল না। উপায় কী! স্বয়ং ধনদাসের নিমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না, পৃথিবী উলটাইয়া গেলেও না। পিয়ন হরিদাসকে অনেক উপদেশ দিয়া মুকুন্দ স্টেশনে পাঠাইয়া দেয়। ধনদাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভাবে যে হঠাৎ এ কীসের নিমন্ত্রণ? মাসি অথবা পিসি জানিয়াও ধনদাস জানিতে অস্বীকার করে এমন

সন্দেহ। ঠোঁট-কাঁপা নিঃশব্দ কান্নায় তার দু-চোখ জলে টইটুম্বুর, বাড়তিটা গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

দু-বোনে যতটুকু মিল থাকা সম্ভব যমজ বোন ছাড়া, মিল ততটুকুই। মুখের ছাঁদের মিল— ভুরু, নাক, কান, ঠোঁট, চিবুক, চুল কিছুই একরকম নয়, তবু যেন কোথায় মিল আছে। কামিনীও নিঃশব্দে কাঁদিত। কামিনী যেন যামিনীর মতো কাঁদিতেছে। কান্নার ভঙ্গিটা তার অবিকল কামিনীর মতো। আর দেহের গড়ন। গড়নের সাদৃশ্যটাই বেশি অদ্ভুত, বেশি রোমাঞ্চকর। যামিনীর মাথা, গলা, কাঁধ বুক, বাহু, কোমর, উরু, হাঁটু, পায়ের পাতা, আঙুল সব কামিনীর মতো। দু-হাতে যামিনী যদি মুখ ঢাকে, যদি ঘোমটা দেয়, মুকুন্দ দেখিয়া চিনিতে পারিবে না কামিনীই আবার রক্তমাংসের দেহ ধরিয়া তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কি না।

মুকুন্দ অনেকদিন যামিনীকে দেখে নাই, প্রায় দু-বছর। দু-বছর আগে যামিনী ছিল অপূর্ণ, অপরিপুষ্ট। মুকুন্দ তখন কল্পনাও করিতে পারিত না কামিনীর সঙ্গে যামিনীর কোনো মিল আছে, যামিনীর পক্ষে একদিন অবিকল কামিনীর দেহ-সৌষ্ঠব সংগ্রহ করা সম্ভব।

মুকুন্দের চোখে পলক পড়ে না, সহস্র সূক্ষ্ম অমিল লোপ পাইয়া যামিনী সমগ্র হইয়া তার চোখে কামিনী হইয়া যায়। একবার, শুধু আর একবার, সে কামিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। কামিনী নাই সে জানে। কামিনী মরিয়া গিয়াছে সে জানে। কামিনীকে সেই খুন করিয়াছে সে জানে। তবু কামিনী যখন সামনে আসিয়াছে রক্তমাংসের দেহ লইয়া তাকে সে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিতে চায়।

মাথা ঘুরিয়া যাওয়ায় মুকুন্দ মেঝেতে বসিয়া পড়ে। আশেপাশে চেয়ার ছিল না।

তখন মনোহরের মা ক্রন্দন সম্বরণ করেন। মুকুন্দের মুখ দেখিয়া তার মনে হয় তার মেজোমেয়ের শোকে জামাই বুঝি পাগল হইয়া গিয়াছে। সর্বনাশ, কামিনীর শোকে মুকুন্দের যদি মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকে, রোজগার করা ও সংসার করার সাধ যদি তার শেষ হইয়া গিয়া থাকে, যামিনীর কী উপায় হইবে?

যাক সে আবাগি। আমাদের কাঁদিয়ে যেতে এসেছিল, কাঁদিয়ে গেছে, যাক সে আবাগি। মুকুন্দ, বাবা আমার...

পরদিন মুকুন্দ প্রেসে গিয়াছে, প্রেসের একটা গুরুতর ব্যাপারে বেলা দুটোর সময় ধনদাসকে টেলিফোন করিতে ম্যানেজার জানাইলেন, ধনদাস আপিসে আসেন নাই।

আসবেন না আজ?

না। ওঁর বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আপনি জানেন না?

কী ব্যাপার? কীসের দুর্ঘটনা?

সে এক মজার কাণ্ড মশায়। ছি ছি, কী দিনকাল হল। কর্তার একটি নাতনি সুইসাইড করেছে। আমি এতক্ষণ ওখানেই ছিলাম, এইমাত্র ফিরেছি।

মেয়েটি কে? সুধা?

সুধাই বুঝি নাম।

মুকুন্দের মনে হয়, সুধা আত্মহত্যা করে নাই, তাকে খুন করা হইয়াছে। সে চমকাইয়া উঠে। খুন? না, ঠিক সেরকম খুন নয়, কামিনীকে সে যেভাবে খুন করিয়াছিল। কিন্তু

তবু এ-ও খুন বইকি। তফাত শুধু প্রক্রিয়ার। নিজের হাতে না করিয়া ধনদাস সুধাকে দিয়াই সুধাকে খুন করাইয়াছে। অস্ত্র বা বিষের কাজ করিয়াছে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি।

চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া যায় মুকুন্দের। চারিদিকে সে দেখিতে পায় এইরকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড। চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কারণ নয়। ডাক্তার থাকিতে, দোকান-ভরা ওষুধ থাকিতে সারিয়া উঠার বদলে যে মরিয়া যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে। পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো বাতাসহীন নোংরা আবর্জনাময় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সহবাস করিতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ রীতিনীতি যারা জানিবার সুযোগ বা মানিবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু হত্যা ছাড়া আর কী? দেশ জুড়িয়া অনিবার্য গতিতে চলিয়াছে এই মানুষ খুন করার অভিযান, কারও বেলা আকস্মিক, কারও বেলা দ্রুতবেগে, কারও বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে। মুকুন্দ, শিহরিয়া উঠে, তার মাথা ঘুরিয়া যায়।

এই প্রকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়াও এটা সে খেয়াল করে নাই, মুখে মুখে অপমৃত্যুর উলঙ্গ ছাপ দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই! এ কী অদ্ভুত অন্ধতা তার। শুধু কি তার একার? ক-জনের একথা মনে হইয়াছে যে আইনের সংজ্ঞায় দু-দশটা খুন ছাড়াও জগতে অগণ্য খুন চলিতেছে অহরহ।

কে দায়ী? কারা দায়ী?

মুকুন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবে। প্রেসের জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন আধমরা মানুষগুলিকে দেখিতে দেখিতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘৃণায় তার হৃদয় ভরিয়া যায়। এমন ঘৃণা সে জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। মৃদু হোক, জোরাল হোক, ঘৃণার সঙ্গে চিরদিন সে অবজ্ঞা আর কেমন একটা অস্থিরতার কষ্ট অনুভব করিয়াছে। আজ এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় হৃদয় মন ভরিয়া গেলেও ওসব কিছুই সে বোধ করিল না, এক অসাধারণ স্থৈর্য ও দৃঢ়তার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে মহৎ ও শক্তিশালী মনে হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘৃণা বিদ্বেষের বহু ঊর্ধ্বে সে উঠিয়া গিয়াছে। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক আর সে তাকে ঘৃণা করিতেছে তাদের সকলের প্রতিনিধি হিসাবে যারা খুন হইয়াছে ও হইতেছে। সে নিজেও ওদেরই দলে।

প্রেসের সমস্ত লোককে সে ডাকিয়া পাঠায়। সকলে আসিয়া দাঁড়াইলে বলে, আমি আপনাদের প্রেস ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর আসব না। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

সে কী বাবু, এমন হঠাৎ?

হ্যাঁ, হঠাৎ যাচ্ছি। এমনভাবে খুন হতে পারব না। আপনারাও যদি বাঁচতে চান,—

না, তা হয় না। তার কথা আলাদা। বাঁচিবার জন্য তার মতো এদের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে চলিবে না। এইখানে কাজ করিতে করিতেই বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে, খুনের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে হইবে।

কাজ ছেড়ে যাচ্ছি কিন্তু এসে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

সকলে ভাবে হঠাৎ কি মাথা খারাপ হইয়া গেল ম্যানেজারবাবুর? তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে মুকুন্দ ধীরপদে প্রেস ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। না, কাজে ইস্তফা পর্যন্ত সে দিবে না, ধনদাসকে জানাইবারও কোনো প্রয়োজন নাই। প্রায় এক মাসের বেতন

পাওয়া যাইবে না। তা হোক। চাকরি করিয়া থাকিলে যথারীতি ইস্তফা দিয়া পাওনা টাকা লইয়া সে বিদায় হইত, কিন্তু চাকরি তো এতদিন সে করে নাই। দাসত্ব করিয়াছে, মোসাহেবি করিয়াছে, সহযোগিতা করিয়াছে এক খুনের সঙ্গে।

বহুদিন পরে আজ মুকুন্দের মন শান্ত হইয়াছে। ঘৃণা যে মানুষকে এত উঁচুতে তুলিয়া দিতে পারে, তলাইয়া দিতে পারে সমস্ত ছোটো ছোটো দুঃখ যন্ত্রণা অশান্তি ও ভয়, ঘুচাইয়া দিতে পারে এতকালের সুদীর্ঘ জীবনের একটানা অনিশ্চয়তা, মুকুন্দের তা জানা ছিল না। পথ চলিতে চলিতে যে মানুষের ভিড়কে বুকের মধ্যে অনুভব করে— বাহিরের জনতা এতদিন পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে জনাকীর্ণ করিয়াছে, ঘুচিয়া গিয়াছে এতদিনের নিঃসঙ্গতা।

কামিনীর কথা মনে পড়ে। আজ সে প্রথম দ্বিধাহীন সংশয়হীন বিশ্বাস করিতে পারে যে কামিনীকে খুন করার দায়িত্ব তার নয়। যে মন লইয়া সে কামিনীকে খুন করিয়াছিল সেই মনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিকৃত ও ভয়াবহ আবেষ্টনী যারা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, দায়ী তারা। চাকরি না থাকার অভিমানে কামিনীর শ্রদ্ধা হারানোর কল্পনায় যে-মন কামিনীকে খুন করিয়াছিল, সে-মন সে গড়ে নাই, গড়িয়াছিল এই খুনিদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ।

খবর শুনিয়া কামিনীর মা-র চমক লাগে।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে বাবা?

হ্যাঁ। চাকরিবাকরি আর করব না।

যামিনীর মা ভাবিয়াচিন্তিয়া বলেন, তবে বাবা তুমি যামিনীর জন্য একটি পাত্র খুঁজে দাও।

দেব, নিশ্চয় দেব।

মুকুন্দ স্নান করিতে যায়।

ডিসেম্বর ১৯৪৩ - এপ্রিল ১৯৪৫

[উৎস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭]

কেরানির বৌ

সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয়। বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোট ছোট কটা চোখ। গায়ের রঙ তার খুবই ফরসা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙালি গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড় হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকি সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মতো শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।

ঘটনাটা নিছক মাতৃমূলক। সরসীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, চল্লিশের কম নয়; কিন্তু এখনো তার শরীরের বাঁধুনী দেখিলে আপনার বিস্ময় বোধ হয় এবং তিনি লজ্জা পান।

তের বছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহঙ্কার করার মতো গায়ের রঙ তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। টের পাইবার পর সরসীর কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে অবাক!

‘ও কী লো? ও আবার কী ঢং?’

‘ঢং আবার কোথায় দেখলে?’

‘ও কী কাপড় পরার ছিরি তোর? সং সেজেছিস কেন?’

‘বেশ করেছি। তোমার কী?’

‘মুখে আগুন মেয়ের!— যাসনে, সং সেজে ঢং করে পাড়া বেড়াতে তুই যাসনে সরি! মেরে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব।’

পাড়া বেড়ানোর শখ সরসীর আপনা হইতেই গেল।

একদিন বাড়ি ফিরিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তার কী কান্না!

‘কী হয়েছে লো?’

সরসী বলিতে পারে না। অনেক চেষ্টায় একটু আভাস দিল। বাকিটুকু মা জেরা করিয়া জানিয়া নিলেন।

জানিয়া মাথায় যেন তার বাজ পড়িল। এ কী সর্বনাশ! রাগের মাথায় মেয়ের পিঠেই গুম্ গুম্ করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, ‘সেইকালে বারণ করেছিলাম সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়াসনে সরি, বেড়াসনে। হল তো এবার? মুখে চুনকালি না দিয়ে ছাড়বি, তুই কি সেই মেয়ে!’

সরসী খুব কাঁদিল। রাত্রে ভাত খাইল না। কারণ অভিমানে ভাবিতে লাগিল, মা আমাকেই মারল কেন? আমার কী দোষ?

সংসারের অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে চূড়ান্ত রকমের রূঢ় ঠেকিল। তার কোনোই অপরাধ নাই, সুবলদার মতলব বুঝিতে পারা মাত্র তার হাতে কামড়াইয়া দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে সে এত ভালো মেয়ে। তবু তাকেই মার খাইতে হইল। সকলের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল এই একটা অপকর্ম করিয়াছে, দোষ আগাগোড়া তারই!

সুবলের কী শাস্তি হয় দেখিবার জন্য সরসী ব্যগ্র হইয়া রহিল, কিন্তু সুবলের কিছুই হইল না। সুবলের বাবাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবার পরামর্শ পর্যন্ত মার যুক্তিতর্কে বাতিল হইয়া গেল। সরসীর প্রতিই শাসনের অবধি রহিল না। আপনজন যে বাড়ি আসিল সকলের কাছে একবার করিয়া ব্যাপারটার ইতিহাস বলিয়া তাকে লজ্জা দেওয়া হইতে লাগিল। এ বাড়িতে দুজনকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিলেই সরসী বুঝিতে পারে, তার কথাই আলোচিত হইতেছে। নিদারুণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সরসী হাঁপাইয়া উঠিল।

সময়ে শাসনও একটু শিথিল হইল, সরসীরও সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভীরু হইয়া পড়িল বলিবার নয়।

ছেলেবেলা হইতে চেনা ছেলেরা বাড়িতে আসিলে একা তাদের সঙ্গে কথা বলিতে সরসী ভয় করিতে লাগিল। লোকে দোষ দিবে, ভাবিবে, কী জানি মনে ওর কী আছে! একা পাশের বাড়ি যাওয়ার সাহস পর্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। দুপুরবেলা সে মার কাছে শুইয়া থাকে, ঘুম আসে না, অন্য ঘরে গিয়া একটু একা থাকিতে ইচ্ছা করে, তবু সে শুইয়া থাকে। কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি বলে যে বাড়িতেই ছিল, পাশের ঘরে ছিল, কোথাও যায় নাই, মা হয়তো সে কথা বিশ্বাস করিবে না।

সংসারের আর সমস্ত মেয়ের মতো সে নয়, কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য তার ওদের মতো যথেষ্ট ও প্রাণপণ চেষ্টা নাই; সকলের মনে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে জানিয়া সরসী দিবারাত্রি সজ্ঞানে নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারা হইয়া রহিল চোর।

উপদেশ শুনিল : মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কী মা? চাদ্দিকে পুরুষ গুণ্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়,— ব্যস এইটুকু সামলে চলা।

ছড়া শুনিল : পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই!

শুনিয়া শুনিয়া সরসীর ভয় বাড়িয়া গেল। সংসারের নারী-সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আশ্চর্য কাজটা করাই নারী-জীবনের একমাত্র তপস্যা।

সাবধানী হইতে হইতে সরসী ক্রমে ক্রমে অতি-সাবধানী হইয়া গেল। ভালো হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায়, শুধু এই জন্যই নারীধর্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য নিজেকে সে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া নিল।

তারপর, ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারীর সঙ্গে সরসীর বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, রাসবিহারী কেরানি।

বলা বাহুল্য এই জন্য যে সরসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, বরাবর গাঁয়ে থাকার জন্য খানিকটা গেঁয়ো আর কথামালা পড়া বিদ্যায় লুকাইয়া নভেল পড়ার জন্য একটু শহুরে, অসামান্য অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্য তার শুধু স্বাস্থ্য ভালো এবং গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী। কেরানি ছাড়া এসব মেয়ের বর হয় না। রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন একশর কাছে এবং একদিন দু-শর কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রঙটুকুর কল্যাণে।

রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্তী, তাই। সরসীকে সে মাঝারি নিয়মে ভালোবাসিল, কখনো মাথায় তুলিল, কখনো বুকে নিল, কখনো পায়ের নিচে চাপিয়া রাখিল। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে রাগের মাথায় দুই একবার চড় চাপটা দিতে যেমন কসুর করিল না, ন'ভরি সোনার একছড়া হার এবং মধ্যে মধ্যে ভালো কাপড়ও তেমনি কিনিয়া দিল।

রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়িতেই বাস করিতেছিল। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার তিনের চার অংশ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বিবাহের বৎসর দুই পরে সেটা কমাইয়া কমাইয়া অর্ধেক করিয়া আনায় বনবিহারী তাকে পৃথক করিয়া দিল।

পটলডাঙ্গায় একটা বাড়ির দোতলায় একখানা শয়নঘর, একটি রান্নাঘর ও খানিকটা বারান্দা ভাড়া নিয়া রাসবিহারী উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

সরসীকে বলিল, 'চালাতে পারবে তো?'

সরসী বলিল, 'ওমা! তা আর পারব না?'

বলিয়া বিবাহের পর এই প্রথম হাসিমুখে যাচিয়া দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে চুম্বন করিল।

স্বাধীনতার, বেশি নয়, অল্প একটু স্বাধীনতার লোভে সরসীর খুশির সীমা ছিল না। স্বামী তো তাহার আপিস যাইবে? সে বাড়িতে থাকিবে,— একা! একেবারে একা! চাকরের চোখের সামনে কলতলায় স্নান করিলে কেহ তাকে গাল দিবে না, দুই বেলা পাশের বাড়ি গেলে কেহ জানিবে না, খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিলে আর রাস্তার অজানা, অচেনা, ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় লোকদের নিজেকে দেখাইলে কেহ কিছু মনে করিতে আসিবে না।

বনবিহারীর স্ত্রী চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আর অজস্র পানদোক্তা খাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীর যাওয়ার দিন সে স্বামীকে বলিল, 'যাই বল বাবু, বাঁচলাম।'

এবং এক সময় রাসবিহারীকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিল :

'তোমার ভালোর জন্যই বলা।'

রাসবিহারী কৌতূহল প্রকাশ করিলে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিচু গলায় :

'বৌকে একটু সামলে চলো।'

'কেন?'

'কেমন যেন বাড়াবাড়ি। সেদিন রাখাল এসেছিল জানো, নিচে আমি খাবার-দাবার করছি, বললাম, ও ছোটবৌ, বাড়িতে একটা লোক এসেছে, দুটো কথাবার্তা বলগে,

একা একা চুপ করে বসে থাকবে? তা ছোটবৌ কী জবাব দিলে শুনবে? বললে, 'পারব না দিদি, আমার লজ্জা করছে!' আমার ভাইয়ের,— বয়েস এখনো ওর আঠার পোরে নি, ভগবান সাক্ষী,— আমার ভাইয়ের কাছে ওর লজ্জা কী বলো তো?'

রাসবিহারী বলিল, 'কি জানি।'

'অথচ আড়াল থেকে নুকিয়ে নুকিয়ে দেখার কামাই নেই! কী তাকানি, যেন গিলে খাবে!'

রাসবিহারী বলিল, 'তা তোমার ভাইকে দেখলে দোষ কী?'

বনবিহারীর স্ত্রী একটু হাসিল। অনেক পানদোক্তা খাওয়ার জন্য মুখের হাসি পর্যন্ত তার ঝাঁজালো।

বলিল, 'তারপর শোনো। এদিকে ছাতে কাপড়টি মেলে দিয়ে আসতে বললে যায় না, বলে, চাদ্দিক থেকে তাকায় দিদি, আমি যাব না। আমি মরি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, ভাবি, আহা ছেলেমানুষ, না যায় না যাক, পাড়ার লোকগুলোও তো পোড়ারমুখো নয় কম। ওমা, এদিকে দুপুরবেলা চোখ বুজিছি কি বুজি নি, অমনি তুড়ুক করে ছাতে গিয়ে হাজির!'

রাসবিহারী বলিল, 'ছাতে গিয়ে কী করে?'

'কে জানে বাবু কী করে। কে খোঁজ নিতে যায়? একদিন মাত্র দেখেছি, মাথার কাপড় ফেলে, চুল এলো করে মহারানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'চুল শুকোচ্ছিল হয়তো।'

'হবে। কিন্তু নুকিয়ে যাবার দরকার! যাব না বলে শরমের কাঁদুনি গাইবার দরকার!'

সরসীর কৌতূহল প্রচণ্ড। বাড়ির কোথাও গোপনে কিছু ঘটিবার জো নাই। রাত্রে বনবিহারী কতক্ষণ হুঁকা টানে, বড়বৌ তাকে কী বলে না বলে, কী নিয়া মধ্যে মধ্যে তাদের বচসা হয়, এসব খবরও সরসী অনেক রাখে। আড়ালে দাঁড়াইয়া বড়বৌয়ের কথাগুলি শুনিতে সে বাকি রাখিল না। তখনকার মতো সরসী চুপ করিয়া রহিল। বড়বৌ চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে চুল বাঁধিল, সিঁদুর পরানোর পর যথানিয়মে তাকে প্রণামও করিল। জিনিসপত্র অধিকাংশই সকালে সরানো হইয়াছিল, বিকালে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিস উঠাইয়া রাসবিহারী যখন শেষবারের মতো নিচে গিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া সরসী বড়বৌকে বলিল, 'সকালবেলা ওঁকে কী বলেছিলে দিদি?'

'কাকে? ঠাকুরপোকে? কই কিছু বলি নি তো!'

'তোমার মুখে কুঠ্ হবে।'

'কী বললি?'

'বললাম তোমার মুখে কুঠ্ হবে। কুঠ্ কাকে বলে জানো না? কুষ্ঠব্যাধি।'

'কার মুখে কুঠ্ হবে ভগবান দেখছেন। আমি তোর গুরুজন, আমাকে তুই— '

'আ মরি মরি, কী গুরুজন। মুখে আগুন তোমার মতো গুরুজনের! বানিয়ে বানিয়ে কথা শুনিয়ে স্বামীর মন ভারি করে দিতে একটু বাঁধে না, তুমি আবার গুরুজন কিসের? পাবে পাবে, এর ফল তুমি পাবে। যে মুখে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছ সে মুখে

যদি পোকা না পড়ে তো চন্দ্র সূর্য আর উঠবে না দিদি, ভগবানের সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। আমি যদি সতী হই তো— ' ভাবাবেগে সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বলিতে ছাড়িল না,— 'আমি যদি সতী হই তো আমার যতটুকু অনিষ্ট তুমি করলে ভগবান তোমাকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবেন। অঙ্গ তোমার খসে খসে পড়বে দিদি, পচে যাবে, গলে যাবে— ভাসুরঠাকুর দূর দূর করে তোমাকে বাড়ি থেকে দেবেন খেদিয়ে!'

সরসী যে এমন করিয়া বলিতে জানে বড়বৌয়ের তা জানা ছিল না। হেলে সাপকে কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়া সে এমন অবাক হইয়া গেল যে ভালোমতো একটা জবাবও দিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া গাড়ি চাপিয়া সরসী বিজয়-গর্বে চলিয়া গেল। মুখ দিয়া উপরোক্ত কথাগুরি স্রোতের মতো অবাধে বাহির করিয়া দিতে পারিয়া নিজেকে তার খুব উচ্চশ্রেণীর আদর্শ স্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল।

নতুন বাড়িতে আসিয়া সরসী সংসার গুছাইয়া বসিল। শোবার ঘরখানা রাস্তার ঠিক উপরে। রাস্তার ওপাশে সামনের বাড়ি হইতে ঘরের ভিতরটা সব দেখা যায়। জানালার আগাগোড়া সরসী পরদা টাঙাইয়া দিল। রাসবিহারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল— 'পরদা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ি থেকে দেখা যায়। ঘরটা একটু অন্ধকার হল,— কী করব!'

রাসবিহারী ভাবিল, বড়বৌয়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।

কাল তারা হোটেলের ভাত আনিয়া খাইয়াছিল। ঘর গোছানো ও জানালায় পরদা টাঙানোর হিড়িকে এবেলাও সরসী রাঁধিতে পারে নাই। রাসবিহারীর আপিসের বেলা হইলে সরসী বলিল, হোটেলে খেয়ে তুমি আপিসে চলে যাও, আমি এক ফাঁকে দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব।

রাসবিহারী মনে মনে বিরক্ত হইয়া জামা গায়ে দিল। ঘরের দেয়ালে একটু ফুটা থাকার আশঙ্কার কাছে স্বামীর খাওয়া চুলোয় যায়, সব সময় এ গভীর ভালবাসা হজম করা শক্ত।

তবু, বাহিরে যাওয়ার আগে রাসবিহারী বলিয়া গেল, 'ছাতে উঠো না।'

সরসী বলিল, 'না।'

বলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু কাপড় শুকোতে দেব কোথায়?'

'দিও, ছাতেই দিও। দিয়ে চট্ করে নেমে আসবে।'

'আচ্ছা।'

এসব অপমান সরসীর গায়ে লাগে না। অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খোলা ছাতের চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে বিস্ময়, চারিদিকে রহস্য। স্বামী তো বারণ করিবেই। কিছু মন্দ ভাবিয়া নয়, তার মঙ্গলের জন্যই বারণ করা।

রাসবিহারী বাহির হইয়া যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সরসী ছাতে উঠিল। ভাবিল, এক মিনিট, এক মিনিট শুধু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আসব।

কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো যায় না।

ইটের স্তূপ জড়ো করিয়া মানুষ এই শহর গড়িয়াছে, চারিদিকে সীমাহীন সংখ্যাহীন মানুষের আস্তানা, কোনোদিকে শেষ নাই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নীড়ে নীড়ে একটা বিস্ময়কর জমজমাট আলিঙ্গন, ছাতে ছাতে আলিসায় কার্নিশে একটা অবিশ্বাস্য মিলন। এই বিপুলতার বিস্ময় অনুভব করিতেই সরসীর আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোনো

একটি বিশেষ বাড়িকে বিশেষভাবে দেখিবার অবসর এই সময়ের মধ্যে সে পাইল না,— এ তো তার চেনা শহর, সে বাড়ির ছাত হইতে সকলকে লুকাইয়া,— না, সকলকে লুকাইয়া নয়, অত সাবধানতা সত্ত্বেও বড়বৌ টের পাইয়াছিল,— এই শহরকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু নতুন বাড়ির নতুন ছাতে মাথার কাপড় পায়ের নিচের শুকনো শ্যাওলায় লুটাইয়া মলিন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত পর্যবেক্ষণের সবটুকুই আজ অভিনব।

মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাতের কোথায় এক টুকরা ভাঙা কাচ পড়িয়াছিল সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনোমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের উর্ধ্বাংশ একেবারে অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চিৎকারে সরসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বান ডাকিয়াছে, সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেয়াল-চাপা দুর্বল প্রাণে খোলা ছাতের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না-করার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি বুকের চামড়ায় পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোর উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মতো সমস্ত ছাতে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে।

আর চেঁচায়। গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চেঁচায়। সে যে ঘরের বৌ, সে যে বোবা অসহায় ভীরু স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া আছে সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়। অথবা আলিসা ডিঙাইয়া নিচে লাফাইয়া পড়ে।

হ্যাঁ, শূন্যে পড়িবার সময়টুকু উন্মত্ত উল্লাসে হাতপা ছুড়িতে ছুড়িতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ওই শক্ত রোয়াকটিতে আছড়াইয়া পড়িলে ভালো হল। মাথাটা গুঁড়া হইয়া যাইবে কিন্তু শরীরের তার কিছু হইবে না। তার এই কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে। রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে।

কোথায় লজ্জা, কোথায় সঙ্কোচ! কে জানিবে এই দেহের মধ্যে যে বাস করিতেছিল নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে দিন কাটাইয়াছে, আঠার বছরের বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে, স্বামী ভিন্ন জগতের আর একটি পুরুষের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে সাহস পায় নাই? কে অনুমান করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে এ কাজ করিতে পারিয়াছে? নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তার এই শেষ প্রতিশোধ।

স্বামীর সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনি একটা কদর্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল, তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, এ কথাটাও কি কারো একবার মনে হইবে না?

দুই হাত শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া সরসী এখন আপন মনে বিড়বিড় করিতেছে, তার মুখের দুই কোণে সূক্ষ্ম ফেনা দেখা দিয়াছে। হঠাৎ একসময় হাঁটু ভাঙিয়া সে ছাতের উপর বসিয়া পড়িল। দুই করতল সজোরে ছাতে ঘষিতে ঘষিতে সে জোরে জোরে বলতে লাগিল—

'বেশ, বেশ, বেশ! আমার খুশি! আমার খুশি আ— মা— র খু— শি!'

তারপর শূন্যের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিয়া শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, হল তো?

তাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ কলরব করিতেছে, সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাকে ছি ছি করিতেছে, তার কথা কেহ শুনিবে না, তার কোনো মুহূর্তের আত্মজয়ের দাম দিবে না, তাকে ঠাসিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া তারই কটা চামড়ার স্বেদে তারই যৌবনের উত্তাপে তাকে সিদ্ধ করিবে।

সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লুটানো আঁচল তুলিয়া নিজেকে সে আবৃত করিয়া নিল। ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিস্টিরিয়ার ফিটের পর যেমন সমস্ত জগৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়, মুখে একটা ধাতব স্বাদ লাগিয়া থাকে, সরসীর কানের কাছে তার নিজের রক্তের কোলাহল তেমনিভাবে অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে, জিভে একটা কটু স্বাদ লাগিয়া আছে।

এখন আর তার কোনো উত্তেজনা নাই। সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হইতেছে, এমন একটা কাজ সে করিয়া বসিয়াছে সাধারণ কোনো মেয়ে যা করে না। কাজটা তার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

রাসবিহারীর আদেশ অমান্য করিয়া ছাতে বেড়ানোর জন্য সরসীর কোনো আফসোস নাই, স্বামীর ছোট-বড় অনেক আদেশই অমান্য করিতে হয়, নহিলে টেকা অসম্ভব, কিন্তু তারও অতিরিক্ত কিছু সে কি করিয়া বসে নাই? নিজেকে তবে কলুষিত অপবিত্র মনে হইতেছে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে সরসী নিচে নামিয়া গেল। ছাতের নিচেকার ছায়ায় দাঁড়ানো মাত্র তার যেন অর্ধেক গ্লানি কাটিয়া গেল। জানালার পরদা টাঙানোর জন্য ঘরের আলো স্তিমিত হইয়া আছে, বাতাসের মৃদু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনো শুকাইয়া যায় নাই, সরসীর চোখেমুখে আর সর্বাঙ্গে অল্প অল্প স্নিগ্ধতা সিঞ্চিত হইতে লাগিল।

ঘরের অসমাপ্ত কাজগুলি ঠিক যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুক্ত হইয়া আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরসী চারিদিকে সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কত কাজ তার, কত অফুরন্ত কর্তব্য! তার কি নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় আছে? সংসারে কী হয় আর কী হয় না, তাই নিয়া মাথা ঘামানোর অবসর সে পাইবে কোথায়? স্বামী হোটেলে খাইয়া আপিসে গিয়াছে, এবেলার মধ্যে সমস্ত কাজ তার সারিয়া রাখিতে হইবে, ওবেলা দুটি রাঁধিয়া না দিলে চলিবে কেন? হোটেলের ভাতে পেট ভরানোর জন্য সে তো তাকে ভাত কাপড় দিয়া পুষিতেছে না।

সরসী অবিলম্বে কাজে ব্যাপৃত হইয়া গেল। নোড়া আনিয়া দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া কোনাকুনি একটা দড়ি টাঙাইয়া দিল, জড়ো করা পরনের কাপড়গুলি একটি একটি করিয়া কুঁচাইয়া রাখিল; তাকে খবরের কাগজ বিছাইয়া তেলের শিশি, জুতার বুরুশ, রাসবিহারীর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তার নিজের মুখে মাখার পাউডার, পায়ে দেওয়ার আলতা, সিঁথিতে দেওয়ার সিঁদুর সমস্ত টুকিটাকি জিনিস গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল।

চুল বাঁধার যন্ত্রপাতিগুলি সাজাইয়া রাখার সময় একটু হাসিয়া ভাবিল, ও ফিরে আসার আগে চুল বাঁধার সময় পাব তো? খাবারটা করেই চট্ করে একটু সাবান মেখে গা ধুয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলব চুলটা, যে নোংরাই দেখে গেছে।

চুলগুলি মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, দুই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া খালি ঘরে একটা অনাবশ্যক অপচয়িত মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে সরসী এলো-খোঁপা বাঁধিয়া নিল।

এবার কোন কাজটা আগে করিবে?

বাক্সগুলি ও-কোণে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলের কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে।

জলের কুঁজো! সরসীর দুচোখ চকচক করিয়া উঠিল। কী তৃষ্ণাই তার পাইয়াছে!

হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকিটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।

কী তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল!

জুলাই ১৯৩৩

সিঁড়ি

একতলার উত্তর প্রান্ত থেকে দোতলা আর তিনতলার মধ্যস্থতা অতিক্রম করে সিঁড়িটা তেতলার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে পৌঁছানোর জন্যে সাধারণ নিয়মে চৌষট্টি বার একটি পায়ের জোরে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করতে হয়। তবে সাধারণ নিয়ম সকলের জন্য নয়। এমন মানুষও জগতে আছে যারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় দুটো তিনটে ধাপ একেবারে ডিঙিয়ে যায়। এরা মানুষ হয়েও ঠিক মানুষ নয়, — মহামানব। মহামানব এইজন্যে যে এ জগতে মহামানবী নেই, কারণ মেয়েরা কোনোদিন দুটো তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে ওঠে না। ক্ষমতাও নেই, বাধাও আছে।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটাকে ঢাকা দেবার ছাদটুকুর উপরে পাতলা দেয়াল আর টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এ বাড়িতে। পথ থেকে বাড়ির ভিটেয় উঠবার জন্য আর একতলার বারান্দা থেকে উঠানে নামবার জন্য এ বাড়িতে ধাপের ব্যবস্থা মোটে একটি করে; কিন্তু চিলেকুঠিতে ওঠানামার জন্য ধাপ আছে দুটি, তাই এও একটা সিঁড়ি। দুটি একের সমষ্টি যখন দুই এবং ধাপের সমষ্টি মাত্রেই সিঁড়ি, চিলেকুঠিটিকে সিঁড়ি থাকার গৌরব না দিয়ে উপায় নেই।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটিকে বাড়ির ছায়াই শীতল করে রাখে, চিলেকুঠির সিঁড়ি কিন্তু চিলেকুঠির ছায়া পায় শেষ বেলায়, গ্রীষ্মকালেও সূর্য যখন নিস্তেজ। মেঘলা দিন বাদ দিয়ে শীতের দুমাস পরেও দুপুরবেলা চিলেকুঠিটি হয়ে থাকে শীতার্ত মানুষের স্বর্গ আর সিঁড়িটি হয়ে থাকে আগুন। শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে যে শীতার্ত, তারও পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেয়।

ডান পায়ের চেয়ে ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোট। হ্রস্ব পা-খানি প্রথম ধাপে নামিয়েই সে তুলে নেয়। ব্যাপারটা মানবকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁতের ফাঁকে সজোরে শব্দ করে, 'ইস!'

মানব বলে, 'গরম বুঝি?'

ইতি বলে, 'আগুন হয়ে আছে।'

ঘরে কুঁজোয় জল ছিল, একতলা থেকে মানবের নিজের বয়ে আনা জল। কুঁজো কাত করে মানব সিঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। যতক্ষণ সে জল ঢালতে থাকে ইতি কথা বলে না, সবটুকু জল মানব ঢেলে দেয় কি না দেখবার জন্য চুপ করে থাকে। কুঁজো খালি হয়ে গেলে মানবের হাত চেপে ধরে বলে, 'সব জল ঢেলে দিলে? একটু খেতাম আমি, তেষ্টা পেয়েছে।'

'এতক্ষণ খাও নি কেন?'

'এতক্ষণ কি মনে ছিল? জল দেখে খেয়াল হল।'

মানব একটু হাসে। চল্লিশ বছরের পুরনো মুখখানায় সাত দিনের দাড়িগোঁফ জমেছে, বাঁ দিকের গালটি কবে যেন চিরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘাম মুছে মুছে মাজা বাসনের মতো কপাল চিকচিক করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঠোঁট দুটি কালো। দাঁতে আর মুখে বেহিসেবি পান খাওয়ার ইতিচিহ্ন। শান্ত নির্মল হাসিটুকু তাই আরো অপূর্ব মনে হয়,— ইতির মুখও সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, ব্রণের ছোট ছোট গর্তভরা দুটি গালেই টোল পড়ে সৃষ্টি হয় দুটি বড় গহ্বরের।

মানব বলে, 'চলো নিচে যাই। তুমি জল খাবে আমি কুঁজোটা ভরে নিয়ে আসব।'

ইতি বলে, 'তোমার তেষ্টা পায় নি?'

মানব বলে, 'পাবে পাবে, ভাবছ কেন?'

ধাপ দুটি ভাসিয়ে কুঁজোর জল ছাদে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, নালির কাছাকাছি একসঙ্গে মিলে এতক্ষণে নালি দিয়ে নিচে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ছাদে শুকনো শ্যাওলা, আর কয়েকটি দুপুরের রোদ পেলেই আলগা হয়ে উঠে জাগবে আর সন্ধ্যার পর মানবের পায়চারিতে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কুঁজো হাতে এক ধাপ নেমেই বোধ হয় আগামী সন্ধ্যায় নিজের পায়চারি করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে ওঠে মানবের, মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'সন্ধ্যার সময় আসবে একবার?'

'না এলে রাগ করবে?'

'রাগ? আর কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? এবার থেকে অভিমান করব।'

'তা হলে আসব না।'

মানব খুশি হয়ে বলে, 'সেই ভালো। আজ একা একা তারা গুনে অভিমান করব, কাল তুমি এসে আমার অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করছে ইতি! কী রকম যে লাগছে আমার কী বলব!'

'আমারও।'

দৃষ্টির একটু গভীরতা এসেছে বৈকি মানবের, মনটি তো অন্তত শান্ত হয়েছে। দুজনেই যখন ছাদে নেমেছে, সে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ইতি?'

'না গো, না। কিসের কষ্ট?'

সন্ধ্যার পর না এসে ইতি তাকে অভিমান করার সুযোগ দেবে, পরামর্শ হচ্ছে এই। এখনই যেন মানবের অভিমান হয়, মুখখানা গম্ভীর করে সে বলে, 'তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কিনা, তাই বলছি।'

'আমিই বা কী এমন আকাশের পরী!'

অভিমান গাঢ় হয়; মানুষের চোখ পর্যন্ত যেন ছলছল করে।

'আকাশের পরী হলে তুমি আমার দিকে তাকিয়েও দেখতে না তো?'

'কী ছেলেমানুষ তুমি।'

আকাশে রোদ, ছাদ গরম। আবার মানবের মুখ হাসিতে ভরে যায়, ইতির কাঁধে মুখ রেখে কথা বলতে গিয়ে কিছু না বলাই সে ভালো মনে করে। কথা বলার চেয়ে কঠিন হাসি হেসে ইতিকে তাই হাসির জবাব দিতে হয়। এ কী আশ্চর্য যে নিচে নামবার কথা ভুলে যাওয়ার মতো ভঙ্গিতে দুজনে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? পায়ের তলার ছাদটুকু ছাড়া আর সব যেন অনাবশ্যক হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে এই

ছাদ— দামি একটা হাউই পৃথিবী ছেড়ে যত উঁচুতে উঠতে পারে হয়তো তত উঁচুতে নয়, কিন্তু কে আর সে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে দামি হাউই ছেড়ে? আশপাশের বাড়িগুলো তো এত উঁচু নয়, এ বাড়ির মতো ইট বের করার নয় বলে কেবল দেখতে সুন্দর। কিন্তু সেটুকুও এ বাড়ির ছাদে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরই ভালো লাগে, চোখ মেললেই সমগ্রভাবে চোখে পড়ে। তা ছাড়া পাওয়া যায় আচ্ছন্ন, অভিভূত হওয়ার একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা।

'ইস।'

এবার মানবের চমক লাগে।

'গরম বুঝি?'

'আগুন হয়ে আছে।'

মানব আফসোস করে বলে, 'তোমাকে আজ খালি কষ্ট দিচ্ছি।'

'দিচ্ছই তো। খালি খালি কষ্ট দেওয়ার কথা বলছ।'

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়ির ছায়াতে নেমে যাওয়া মাত্র দুজনে যেন আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মানব বলে, 'সিঁড়িটা তো বেশ ঠাণ্ডা!'

ইতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'গরম থেকে এলে কিনা। এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারি নি তোমার ঘরটা কী গরম।'

ধীরে ধীরে ইতি নামতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়তে চাওয়ার মতো অলস অনিচ্ছুক পদে। সিঁড়ির মুখের কাছে তাপ ও আলো মেশার ফলে ছায়া একটু কম শীতল, কম ম্লান, প্রত্যেক ধাপ নামার সঙ্গে যেন বুঝতে পারা যায় ছায়া গাঢ় হচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে। কিন্তু এই গরমে কোনো ছায়াই এমন শীতল হতে পারে না যে একটু আরাম দেওয়ার বেশি কিছু দিতে পারবে, ইতি কিন্তু একবার শিউরে ওঠে। জ্বরের রোগীর গায়ে কেউ যেন হঠাৎ বরফের ছেঁকা দিয়েছে।

তেতলার বারান্দায় বছরখানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটি চুষছিল চুষিকাঠি আর মেয়েটি চুষছিল ছেলেটার গোটা তিনেক আঙুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁকের ধাপটি একটু প্রশস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ইতি শিহরনটুকু সামলায়, তারপর ফিরে যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু উপক্রম করেই ক্ষান্ত হয়। ছুটে পালানোর এই আকস্মিক প্রেরণার জন্যই বোধ হয় মুখখানা একটু অপ্রসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, ততক্ষণে মানবও এদিকে ভদ্রতা করে ফেলেছে।

'মায়ে-পোয়ে কী হচ্ছে?'

মেয়েটি মাথার কাপড় তুলে দেয়, মুখ থেকে ছেলের আঙুল খসে পড়ে। অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইতির দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'নরেন আজ কখন আপিস চলে গেল, জানতেও পারি নি।'

'উনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, আমার বোনের বাড়ি হয়ে আপিস যাবেন। আজ ধীরেসুস্থে রান্নাবান্না করেছি, একেবারে রাঁধবই না ভেবেছিলাম, হঠাৎ আমার দেওর এসে পড়ল কিনা, তাই রেঁধেছি। রেঁধেবেড়ে না খাওয়ালে নিন্দে করত তো? গিয়ে বলত, ভাইকে তো পর করেইছি, বাড়িতে এলে একবেলা খেতেও বলি না,— এই মাত্র চলে গেল। কেন এসেছিল জানেন? টাকা চাইতে! এদিকে আমার নিন্দে ছাড়া মুখে

কথা নেই, দাদাকে বাড়ি না পেয়ে আমার কাছে দিব্যি দশটা টাকা চেয়ে বসল। আমি বললাম, আমি টাকা কোথায় পাব, দাদার কাছ থেকে নেবেন।— তুই ছাতে কী করছিলি ইতি?'

ইতি বলে, 'বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেই জন্য।'

ছেলের ভার ডান হাত হতে বাঁ হাতে গ্রহণ করে আবার মেয়েটি অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে ইতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ একটু ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়বার ভঙ্গিতে বলে, 'ও, হ্যাঁ— আমাদের ভাড়ার টাকাটাও তো দেওয়া হয় নি। কী করেই বা দেব, কাল তো মোটে মাইনে পেলেন। আজ দিতে বলে গেছেন। একটু দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিই, কেমন? খোকাকে একটু ধরবি ভাই ইতি?'

ইতির কোলে ছেলে দিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছায় বার কয়েক ঝনাৎ করে শব্দ তুলে ঘরের ভিতরে মেয়েটি বাক্স খোলে। গোটা দুই বাক্স মোটে তার সম্পত্তি কিন্তু চাবির গোছায় চাবি যেন আঁটে না, আঁচল ছিঁড়ে পড়তে চায়। বাক্স খোলা আর বন্ধ করতেও কত যে অনাবশ্যক শব্দের সে সৃষ্টি করে বলবার নয়।

মানব নিচু গলায় ইতিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ভাড়া দিতে এসেছিল নাকি?'

ইতি বলে, 'না, ওর কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে তো?'

ইতিকে খোকা অনেকদিন থেকে চেনে, প্রায় আজন্ম। কিন্তু ইতি কোনোদিন তার হাতের আঙুল মুখে পুরে চোষে না বলেই বোধ হয় ইতির কোলে থাকতে তার ভালো লাগে না। চুষিকাঠি প্রথমে নিচে পড়ে যায়, এদিক ওদিক চেয়ে খোকা মুখ বাঁকায়, তারপর মানব তার গালে একটা টোকা দেওয়া মাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বাক্সে চাবি দিতে দিতে মেয়েটি আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, 'আসছি রে আসছি, দুষ্টু কোথাকার। এক মিনিট আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি না, আচ্ছা ছেলে হয়েছিস তো তুই!'

ভাড়ার টাকা, স্বামীর লিখে রাখা রসিদ আর এক কলম কালি নিয়ে খোকার মা বারান্দায় আসে, মানবকে টাকা গুনে দিয়ে রসিদে তার সই নেয়, তারপর ছেলেকে কোলে করে বলে, 'এত টাকা ভাড়া তো পান, কী করেন টাকা দিয়ে? সমস্ত বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এই গরমে একা একা চিলেঘরে কী করে থাকেন আপনি! আমি হলে তো পারতাম না।'

মানব ভাড়ার টাকা কোমরে গুঁজে বলে, 'না পেরে উপায় কী, খোকার বাবার মতো আমি তো চাকরি করি না।'

খোকার মা চোখ বড় বড় করে বলে, 'আপনার আবার চাকরি! এক মাসে আপনি যা সুদ পান, ওঁর মাইনের তা কগুণ কে জানে! একটু শুইগে খোকাকে নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে তো তোকে ডাকব ইতি। পাখিটার ঠোঁট আর পা দুটো ভালো হচ্ছে না একটু দেখিয়ে দিস। কটি করে ঘর বুনতে বলেছিলি ভুলে গেছি ভাই, যা দুষ্টুমি করে খোকা!'

মানব বলে, 'আরেকজন দুষ্টুমি করে না?'

'করে না?'— ফিক করে হেসে ফেলে পাক দিয়ে ঘুরেই খোকার মা ঘরের ভিতরে চলে যায়। কুঁজোটা তুলে নিয়ে মানব সিঁড়ির এক ধাপ নেমে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইতি নীরবে আসে। সমতল বারান্দায় ছোট-বড় পা নিয়ে চলার ভঙ্গিটি তার বেশ। অন্য সব মেয়ে যেন শুধু চলে। ইতি একটা অজানা ছন্দে দুলে দুলে চলে। কোলে ছেলে নেই ইতির, আঁচলে নেই চাবির ভার, তবু বুকে পিঠে কাঁখে ছেলে যেন আছে তার অনেকগুলো, আঁচলে বাঁধা আছে সে যত ভার বইতে পারে না তার চেয়ে বেশি ভারি চাবির গোছা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, 'তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি আছে।'

'হ্যাঁ।'

মানব রসিকতা করে বলে, 'অন্য কোনো ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।'

'হ্যাঁ।'

'রাগ হল নাকি, ভাড়ার কথা বললাম বলে?'

'না, না, রাগ কিসের?'

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় নামার শিথিল এলায়িত ভঙ্গি এখন দোতলায় নামার সময় স্খলিত পদে নামার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাও যেন কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

মানব মুখ ভার করে বলে, 'অত হিসেব করে কথা বলা আমার আসে না। যা মনে আসে বলে ফেলি। কী এমন বললাম যে তোমার মুখ ভার হয়ে গেল?'

ইতি একটু হাসে। হাসলে মুখের ভার হালকা হয়।

'মুখ আবার ভার হল কোথায়? কী ছেলেমানুষ তুমি! তোমার কথায় কি আর মুখ ভার করেছি, মুখ ভার করেছি তেতলার ওই লক্ষ্মীছাড়ির কথায়। খোকার বাবা তো এদিকে মাইনে পায় তেষট্টি টাকা, অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে!'

সুতরাং মানবও হাসে। ইতির কথায় স্ত্রী-চরিত্রের একটি স্থূল দিক ফুটে উঠেছে আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেটা বুঝতে পেরেছে বলে গর্ব আর আমোদ অনুভব করে। ইতিকে নাড়া দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রের আরো দুটো দিক আবিষ্কারের আশায় বলে, 'কেন, নরেশের বৌ বেশ লোক।'

'বেশ না ছাই। সুখে আছে তাই, আমার মতো পোড়াকপাল তো নয়।'

'তোমার পোড়াকপাল নাকি?'

দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। ইতি পিছনে হেলে যায় সাপের ফণা ধরার মতো, বলে, 'কী বলছেন?'

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমার পোড়াকপাল বলছ, আমার জন্য তো?'

সাপের ফোঁস করার মতোই ইতি সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে, কিন্তু ছোবল মারার বদলে বয়স্কা নারীর চিরন্তন ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'তোমার সঙ্গে আর পারলাম না। মা-বাবা, ভাই-বোনেদের কথা ভেবে ও কথা বলেছি, কী কষ্টে আছে সবাই বলো তো? নইলে, আমি তো আজ রাজরানী। অবিশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরানী নই, তোমার জন্যে রাজরানী।'

তেতলায় মানুষ আছে, দোতলায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই— তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি আমার রাজা।'

দুজনে দোতলায় নামামাত্র উপরের যে ঘরটিতে খোকাকে নিয়ে খোকার মা শুতে গেছে ঠিক তার নিচের ঘর থেকে বের হয়ে আসে মাঝবয়সী একটি মহিলা। মহিলাটি

এত মোটা যে পদক্ষেপে মেঝে না কাঁপলেও দুমদাম শব্দ হয়। তবে এখন পা ফেলার শব্দটা তার একটু জোরালো, হয়তো একটু বেশি জোরেই সে এখন পা ফেলছে।

'কোথায় ছিলি ইতি?'

'তেতলায় ছিলাম, খোকার মার কাছে।'

'ছাই ছিলি, তিনবার ওপরে নিচে তোকে খুঁজে এসেছি।'

'তখন হয়তো চিলেঘরে গেছলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেইজন্য। এতক্ষণ তো খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম, জিজ্ঞেস করে আয় খোকার মাকে। খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম না মানববাবু?'

মানব বলে, 'করছিলে বৈকি।'

ইতি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি বললেন না কুঁজোয় জল ফুরিয়ে গেছে? আমি বললাম না, চলুন নিচে গিয়ে কুঁজোতে জল ভরে দিচ্ছি?'

মানব মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মোটা মেয়েটির রঙ খুব ফরসা! এতক্ষণ মুখখানা তার লাল হয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরো জোরে দুমদাম পা ফেলে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে, দরজা বন্ধ করে দড়াম করে খিল তুলে দেয়।

পরক্ষণে খিল খুলে আবার বের হয়ে আসে।

'তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া? খোঁড়া পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ি যাস না কেন তুই?'

মানব বলে, 'সুধা, আজ হাসপাতালে যাও নি?'

সুধা বলে, 'দেখতে পাচ্ছ না, যাই নি?'

মানব আবার বলে, 'আজ ডিউটি নেই বুঝি?'

সুধা হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে, 'ডিউটি থাক বা না থাক, তোমার কী?'

মানব শান্তভাবে বলে, 'না, এমনি বলছি। ভাড়ার টাকা দেবে নাকি আজ কিছু?'

সুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের চারিদিকে অতিরিক্ত মাংস ফেলে ছোট ছোট চোখ দুটিকে বড় করবার চেষ্টা করে।

'ভাড়া চাইছ? ভাড়া!'

মানব মৃদু একটু হেসে বলে, 'তুমিই তো বলেছিলে আজ কিছু দেবে।'

'এখনো মাইনে পাই নি।'

'বেশ মাইনে পেলে দিও। নগেনকে ফিরে আসবার জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, না সুধা?'

সুধা মুখ সাদা করে বলে, 'কে বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি?'

'কাগজে দেখলাম। বেশ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা আর কতকাল চালাব, আমার জন্যে না হোক ওদের কথা ভেবে ফিরে এসো, ইতি তোমার সুধা। তোমার বিজ্ঞাপন যদি চোখে পড়ে সুধা, যেখানে থাক নগেন ছুটে আসবে।'

সুধা আর কথা বলে না, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তার পদক্ষেপের শব্দও হয় কোমল, দরজা বন্ধ করার শব্দও হয় মৃদু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করে ইতি বলে, 'সিঁড়ি যেন আর ফুরোতে চায় না।'

'কষ্ট হচ্ছে?'

'থাক, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই। সুধাদির কমাসের ভাড়া বাকি আছে?'

'কমাস আবার, দু-এক মাস। কী করবে বলো বেচারি, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চারদিকে অন্ধকার দেখছে। নার্সগিরিতে কি পয়সা আছে?'

'তুমি দেও না কেন?'

'আমি কেন দেব? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? আর দু-মাস দেখব, ভাড়া যদি না মেটায়, পষ্ট বলে দেব বিনা ভাড়ায় যে বাড়িতে থাকতে পাবে সেখানে থাকো গে, আমার এখানে ওসব চলবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার স্খলিত ভঙ্গি ইতির এবার নিজের হঠাৎ মুচড়িয়ে ভেঙে পড়বার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে সিঁড়িও ফুরিয়ে আসছে, প্রাণপণ চেষ্টায় মানবের বাহুমূলে আস্তে একটি চড় মেরে মৃদু হেসে সে তাই বলে, 'কী দুষ্টুই তুমি ছিলে!'

তেতলায় খোকার মা খোকাকে যেমন করে দুষ্টু বলেছিল, ঠিক তেমনি করে বলে! তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কই দিলে না?'

মানব বলে, 'কী?'

'মা যে দশ টাকা ধার চেয়েছে? ভাড়ার টাকা তো পেলে, তাই থেকে দাও না?'

মানব মৃদু হেসে কোমরের গোঁজা টাকা বের করে ইতিকে দশটা টাকা দেয়। ইতি ঘাড় গুঁজে নামতে থাকে।

একতলার বারান্দায় নেমে দেখা যায় : বারান্দায় মাদুরে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ইতির মা ঘুমোচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বছর তিনেকের একটা উলঙ্গ ছেলে, সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলো পাঁচড়া। বারান্দার অপর প্রান্তে এঁটো বাসন পড়ে আছে। ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভালো না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভালো না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।

ইতির মার ঘুম ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজে থাকা। মটকা মেরে নয়, শ্রান্তিতে আর দুর্বলতায়।

চোখ মেলে ইতির মা বলে, 'ইতি এলি?'

বলে মানবের মুখের দিকে চেয়ে ইতির মা বলে, 'সকালবেলা এক কুঁজো জল নিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেছে? ইতি, যা তো মা, কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে আয়। ওসব কি পুরুষ মানুষের কাজ!'

মানব বলে, 'সিঁড়ি ভাঙতে ইতির কষ্ট হয়, আমিই নিয়ে যেতে পারব।'

ইতির মা এ কথা শুনতে পায় না। মেয়ের পদমূলে চোখ রেখে বলে, 'তোর গায়ে রক্ত কিসের লো ইতি?'

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, 'পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।'

মানব বলে, 'তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি?'

প্রশ্ন শোনামাত্র ইতি বিনা ভূমিকায় ক্ষেপে যায়। আর্তনাদ করার মতো বলতে আরম্ভ করে, 'হ্যাঁ হয়েছে, একশটা হয়েছে। কী করবে তুমি? ঘেন্না করবে? করগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে? দেখছ না ভাইয়ের গায়ে পাঁচড়া, জান না ভাইকে আমি কোলে নিই? পাঁচড়া হবে না তো কী হবে আমার?'

তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও দেখে না।

'ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বলে একেবারে তিন-চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মতো মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

মার্চ ১৯৩৭

সমুদ্রের স্বাদ

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার! কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। সাত বছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কী আশ্চর্যই সে হইয়া গিয়াছিল। এ কি সম্ভব? কই, সে তো রেলে চাপিয়া কত দূরদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামাবাড়ি যাইতে সকালবেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই। চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ির সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলকাতায় সাহেব-কাকার ছেলে বিনুদা বিলাত গেল— সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ-তরকারিতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা দুবেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরি হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া! সারাদিন গরমে ছটফট করিবার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে!

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণ দিকে বাবা?'

'চারিদিকে সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর— আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্বত, তারপর তিব্বত আর চীন! ম্যাপটা আবার ভালো করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারো দিলেন। সমুদ্র দেখার আর হাঙ্গামা কী? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামতো একবার বোধ হয় যাইতেও হইবে। নীলার মার অনেক দিনের সাধ।

কিন্তু কেরানির স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায়! অনেক কষ্টে একরকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদি-বা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময়ে যে ভিড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকায়ও কুলায় না। ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনাই বা করিবে কে?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরো কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।' বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মতো কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার ভুলিয়া গেল অন্য কিছুর স্বাদ। মা-বাবা তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা?'

গাড়ি হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া, জিরিয়ে নিই, বলবখন সব।'

কী বলিবেন? কী প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র-স্নানের বর্ণনা শোনে নাই? বলাইদের বাড়ির তিনতলার ছাতে উঠিয়া চারিদিকে যেমন আকাশ পর্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি রাশি বাড়ি দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ির সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও এতটুকু ফাঁকি আছে নীলার? কেবল চোখে দেখা হইল না, এই যা। বাপের আদুরে মেয়ে সে, অন্তত সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইল না, কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া, স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করলেন, 'পুজোর সময় যেমন করে পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হলে তাও করব। কাঁদিস নে নীলা, সারারাত গাড়িতে ঘুমোতে পাই নি, দোহাই তোর, কাঁদিস নে।'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পুজোর সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোনতা স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয়, বাড়ির সকলেই কাঁদিল। কিছুদিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরো কতবার নীলা কাঁদিয়াছে। বাড়ির শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে, পেটের ব্যথায় ফোড়ার যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও সে দু-চারবার কাঁদে নাই এমন নয়। এমন কষ্ট হয় কাঁদিতে!— দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারি হইয়া যায়, জ্বর হওয়ার মতো সর্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মতো ঝাপসা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দুরকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে— বৈচিত্র্যহীন আলুনি ও কড়া নোনতা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে অন্যরকম— রক্তের স্বাদের মতো। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারি কুটিতে, কোনো কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল

কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে— রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ি গেল। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফস্বলের ছোট শহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মার ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর কটা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হত না দাদা? একটা ছোটখাটো বাড়ি ঠিক করে নিয়ে—'

মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

'ও!' বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, শহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ি গেল। সকালে গাড়িতে উঠিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে সেখানে পৌঁছানো যায়। স্থানটির পরিবর্তন হয় নাই, অনেক কালের ভাঙা ঘাটওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আমবাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়িখানিরও পরিবর্তন হয় নাই। কেবল মামারা, মামিরা, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই মামার বাড়ির আদর, সকলের আনন্দ-গদগদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার তো একবারও কেউ বলিল না, এটা খা— ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না! একটু কাঁদিবে নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলার জন্য একটু বেশিরকম কান্না?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনো পরে নাই; গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই; কলসি কাঁখে জল আনে নাই, বিছানা তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক খারাপ কথার বকুনিও শোনে নাই। হায়, একটু ভালো জিনিস পর্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে যে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়! কিন্তু তারই না হয় অভদ্ররকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাইবোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা-পায়েসের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারির ছেলের মতো বেশ করিয়া তার ভাই দুটিকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দুবেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে, এটা নীলার খেয়ালও থাকে না, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহার-বিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড়মামি বলেন, 'বড় তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?'

মেজমামি বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেয়েছ একেবারে।'

নীলার মা বলেন, 'দাও না তোমরা ওর একটা গতি করে, মেয়ে যে দিন দিন কেমনতরো হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে আবার শহরের সেই বাড়ির মতো একটা বাড়িতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর-যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মতো কোনো প্রতিবেশীর তিনতলা ছাদে উঠিয়া

চারিদিকে বাড়ির সমুদ্র দেখিতে পারিবে, বলাইয়ের মতো কারো কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে?

ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কী একটা অজানা অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজ মেয়ে সন্তান প্রসব করিতে বাপের বাড়ি আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একেবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপর দিকের বাড়িতেও একটি মেয়ে আরো আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, একদিন রাতভর চেঁচাইয়া সে নিজেই মরিয়া গেল। আমবাগানের ওপাশে আট-দশখানা বাড়ি লইয়া যে পাড়া, সেখানেও পনের দিন আগে-পিছে দুটি বাড়ি হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউন্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালোই হইয়াছে বলা যায়। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু যা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা-মরা, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোটভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকাল ছিল, একটু অতিরিক্ত পারিপাট্য ছিল তার নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠন-বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। বিশেষ আর এমন কী পরিবর্তন হইয়াছে জীবনের? বাস কেবল করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথাবার্তা চালচলন নীলা ভালো বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে হয় একটি অর্ধ-পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্তা চালচলন আরো বেশি দুর্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনোদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজায় খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কী যে সে বলিতে আরম্ভ করে, নীলা ভালো বুঝিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে, আবেগে উত্তেজনায় অনাদি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরি হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়াই যাইত! কোনো দিন ঘরে আসিয়া দেখিতে পায় অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কি না সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবে না, নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কী বলিবার আছে, কী করিবার আছে? হয় দাঁতের ব্যথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব, অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলে নীলা চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মতো স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনোদিন করে নাই, কী রকম স্বামী পাইলে সুখী হইবে, কোনোদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার নাই। আশাই সে করে নাই, তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই সোহাগ পাওয়ার সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগরদোলায় ক্রমাগত

স্বর্গ ও নরকে ওঠা-নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবনযাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বাতিল করিয়া দিয়া সকলের মতো সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে স্বর্গই সত্য, বাকি সব নিছক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েদের সব নয়, গত জীবনের একটা বড় রকম প্রত্যাবর্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে শহরে তাদের সেই আগেকার বাড়িতে থাকা, সকলের না হোক অন্ত ত একজনের কাছে সেইরকম আদর-যত্ন পাওয়া, অবসর সময় বলাইদের মতো কোনো প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ির সমুদ্র দেখা আর বলাইয়ের মতো কারো মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে। এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ির চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে; এখানে তাকে যে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে, সে নিজেও তেমনি আপনা হইতে সেটা অনুভব করিয়াছে। মামাবাড়ির চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশি। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁজালো স্বাদ সে প্রথম অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্রি মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই— শানাই বাজাইয়া একদিনে তার জীবনের সাধ, আহ্লাদ, সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কী হয়েছে?'

'কাঁদি নি তো।'

কাঁদিতেই কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি, কী আসিয়া যায়? কাঁদা আর না-কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন আনিয়া দিয়াছে, এমনিভাবে অনাদি তাকে আদর করে; ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায়, কেন কাঁদিতেছে নীলা, কী হইয়াছে নীলার? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে? মা-বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনিই অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে!

কিন্তু কী বলিবে নীলা, বলার কী আছে? সে কি নিজেই জানে, কেন সে কাঁদিতেছে? আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোন কান্না বকুনির, কোন কান্না অভিমানের, কোন কান্না শোকের, আর কোন কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মতো জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমতো ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর! আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দুদিন নীলা কাঁদে কি না সেই জানে না, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না শুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কী হয়েছে, যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জ্বালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, এবার স্বামীর একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরো বেশি আকুল হইয়া কাঁদিতে পারিত, কিন্তু ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে থামিয়া গেল।

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'না।'

'তবে?'— নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতও ব্যথা করিতেছে না, মাথার যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন, বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন? দাঁতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয়!

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষে, মাঝে মাঝে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে, বৌয়ের তার কান্নার কোনো কারণ নাই, বৌটাই তার ছিঁচকাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা-ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এদ্দিন বলি নি তোকে, কী জানি হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্ত্রণা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি— বড্ড ছিঁচকাঁদুনে বৌ তোমার। একটু কিছু হল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আগে ভাবতাম, বৌ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম! আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ও-বাড়ির কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এল, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে সে কী কান্না বৌয়ের! সমুদ্দুরে চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে গেল। যাবার সময় চুপি চুপি আমায় বলে গেল, বৌকে মাদুলি তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভালো নয়।'

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন। শুনলি?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারি কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

আগস্ট ১৯৩৯

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে-পরে গাঁয়ে দু-দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল-সতের বছরের একটা রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা-পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আট চির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্য পক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায় নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়ে ছিল! গাঁয়ে সবশেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁসুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয় নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি— '

চশমার কাচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটা দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুলগাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেইরকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার, পাস-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এসসি পাস করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথমদিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাত জন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দুবছরে চারিটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ-তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাব বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বললে, 'শ্রীপুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস-করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? কী হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তুমিও কী বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা-আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দুজনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরো অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ওর সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ-তক। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন, রও! এখনি হয়েছে কী! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়।'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো ভাই।'

উঠানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায় নি। যদি ছোঁয়াচে লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়ে-পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে। ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহলভরা পরম উপভোগ্য শিহরন।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছ? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে।

কুঞ্জকে জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর ও সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুধ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কারতভাবে বলল, 'আমায় মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রকৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটা অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না; ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাড়টি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে

শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে-নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোন দিক থেকে কী ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরোনো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খবরদার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরো স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল; কথাটা তুমি কীভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যঙের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি এক মাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইলখানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমন ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতেপায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে

বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তা হলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয় নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারি মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে! কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠি-পড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।— 'আমি, মাস্টারবাবু। বাঁশকাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তিপিসি বলল, নতুন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দি হয়ে ধীরেন আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেতনি। বেটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে-অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারিঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা-পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশ পেতে দাও।'

'বাঁশটা পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আবার রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দুপ্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোনো কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায় নি। দু-তিনটি তার দেখা দিয়েছে, আরো কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো। বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো। কী হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না। মাটিতে শোয়ানো বাঁশ। শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশচেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল; মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

সেপ্টেম্বর ১৯৪২

হারানের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাট বিশ্রাম ছেঁটে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধানকাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমাচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারানের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁসুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড় মাস চেষ্টা করে পায় নি, ভুবন এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবার কোনো চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারানের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে কার ঘরে নিয়ে গেছে হারানের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে, ভুবন হারানের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ-গাঁয়ে? শীতের তেভাগা চাঁদের আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘসে গফুর আলি বলে, 'দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে! দেইখা লমু।'

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনো গাঁয়ে সে ধরা পড়ে নি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙা হয়ে ওঠে। লাঠি-সড়কি-দা-কুড়াল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন-চারটে টর্চ। হাঁসতলা পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারানের বাড়িটা ঠিক চিনত না।

সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারান দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারান ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারান আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আজ্ঞা, কোন হারান দাসের কথা কন?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উঁকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

এদিকে হারান বলে, 'হায় ভগবান।'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি।'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায় নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারান। কী হয়েছে ভালো বুঝতে বোধ হয় পারে নি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারান তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোনো কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব!

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়া বাপটার তরে ভাবনা।'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা!'

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করেছিলেন।'

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারানকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আফসোস ফুঁসে ওঠে, 'আহ! ভালো শাড়িখান পরতে পারলি না?'

বলছ নাকি? 'ময়না বলে।'

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলোভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িখানা।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামাইয়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে বলে, 'ভালো কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিনাড়া, থানা গৌরপুর— '

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ-দুর্দশার ছাপ ও রেখা রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

'গাঁ ভাইঙা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কী, গাঁয় মাইনষের সাড়া নাই!'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে! দশ-বিশটা খুন-জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কী হয়।'

শ-দেড়েক চাষি চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারানের ঘরের সামনে— দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথর, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষিদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়। স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিমাণটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারানের ঘর তল্লাশ করতে। তল্লাশ করে আসামি না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাশ করতি দিমু না।'

প্রায় দুশ গলা সায় দেয়, 'দিমু না।'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামি রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তল্লাশ করবার চান, তল্লাশ করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন আইসা, তল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়ে দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরয়া তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কী দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা করে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি— '

'আচ্ছা, আচ্ছা।'— মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।'

গৌর সাউ হেঁকে বলে, 'অত চুপেচুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?'

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই, চুপেচাপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে।'

গৌড় আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপে-ধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথর, পিঁচুটির মতো চোখে এঁটে যায় ঘোমটা-পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি.এ. পাস মন্মথর কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ,

যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আফসোস হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার আলুথালু বেশ।

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারি সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ মন্মথ গর্জন করে হারানকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনির বর?'

হারান বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।'

'অ!' মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। উড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলার দিয়া খপর দিলেন মাইয়া নাকি মর-মর তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রতিভরা সোনারুপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবি লোক বটে।' মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নাই, বাড়িগুলি তল্লাশ ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু-পা পিছু হটে এখনো চাষির দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয়ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথা কালি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারানের বাড়িতে। অল্প নেশায় রঙিন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য— চোখ তার রঙিন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায়। ময়নার কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ভাইটা উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে— ' ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কী কমু দারোগাবাবু— '

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আর দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোনো, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কী করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।'

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই। মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বের করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে। এমন তামাশা কেউ কখনো করে নি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করে নি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা। সে যেন এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ংকর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনাচিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কী লো ময়না, জামাই কী কইলো? দিছে কী?' লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে-সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ-সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারানের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, 'আরে শোনো, শোনো, তামুক খাইয়া যাও।'

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কী কাণ্ড বুঝলা নি'।

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তারা সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটাসুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?'

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছো ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরে নি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই,

তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখানা!'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে। চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অবাক হয়ে।

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্ত-সমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল জানা ছিল এ সময় এমনিভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আসো বাবা আসো। ও ময়না পিঁড়া দে। ভালো নি আছে বেবাকে। বিয়াই-বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আর একটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোঁসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটাছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভালো ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির, পণ করেছে জগমোহন। লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারান হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান।'

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারান সকাল থেকে কেন দেখে না, কী হয়েছে হারানের নাতির, ময়নার ভাইয়ের, জানতে চাইবে জগমোহন, কিন্তু কোনো খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বসো বাবা, বসো।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব।'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ। ময়নার মাও

শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না-দিছে, তুমি দোষ ধরলা? অন্যে তো কয় না?'

'অন্যের কী? অন্যের বৌ হইলে কইত।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভাইয়ের লগে ক্যান্ কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চৌদ্দপুরুষ। হারান কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?' ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কী হয়েছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সংবিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, 'কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদবো না?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?'

'শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী?'

'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথে করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইর না।'

'বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কী কইব?'

'জামাইয়ের অভাব কী। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটব।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আসো।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

'ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!'

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরো কাঁদে।

ঘর থেকে হারান কাঁপা কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া জোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সঙ্গে, দারোগা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা চলে; অবুঝ, পাষণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারান, 'আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডলখুড়ার লগে গৌদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

'ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগেই বুঝি।'

বসে বসে কী ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয়, জামাইকে বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও।' আবার বলে, 'রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

'থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।'

'তবে খাইয়া যাও। আখা ধরাই। পোলাটারে ধইরে নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেই রকম শোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশি। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারানের বাড়ি।

'কী গো মণ্ডলের শাশুড়ি,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

‘এটা আবার কে?’

‘জামাই’। ময়নার মা বলে।

‘বাহ্, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে— ’

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, ‘মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!’

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমে নি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে; জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা-পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়। শুধু বেশি হয় নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারান সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ‘ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!’

জানুয়ারি ১৯৪৭

কোথায় গেল?

কোথায় গেল?— প্রশ্নটা যে বিষ্ণুবাবু পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাদের সকলের চেয়ে বেশি বার উচ্চারণ করেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের পরিচয় থাকলেই যে কোনো লোক বিনা দ্বিধায় এ বিষয়ে তাঁকে জোরালো সার্টিফিকেট লিখে দিতে রাজি হবে। কখন যে কোথায় রাখেন তাঁর মিনিটে মিনিটে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভদ্রলোকের তা একেবারেই খেয়াল থাকে না। নাকে চশমা এঁটে, চশমা খুঁজে ঘরবাড়ি তোলপাড় করে বেড়াবার মতো মানুষ আর কী!

মফস্বলের শহর, বোধ হয় সেইজন্যই আজও গাড়ি চাপা পড়েন নি। চাকরিটা যে তিনি কী করে বজায় রেখেছেন বাড়ির লোকে অবাক হয়ে তাই ভাবে। একটা কারণে বরাবরই ঠকলে তাঁর কাছে রীতিমতো কৃতজ্ঞতা বোধ করে— সেটা হচ্ছে— আমার আপিস কোথায় গেল?— বলে আজ পর্যন্ত তিনি একদিনও হইচই কাণ্ড বাধিয়ে বসেন নি।

সেবার বর্ষার গোড়ায় বিষ্ণুবাবু এক মাসের ছুটি নিলেন। সপরিবারে দেশে যাবেন। আপিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল, অনেক কাল ছুটিও নেওয়া হয় নি, দেশেও যাওয়া হয় নি। তাড়াতাড়ি একটা দরখাস্ত লিখে দাখিল করে দিলেন। তারপর কথাটা গেলেন ভুলে।

কথাটা মনে পড়ল, দরখাস্তটা মঞ্জুর হবার খবর যেদিন এল সেই দিন।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন, ওগো, জিনিসপত্র গোছাও।

এই যে গোছাই। যাওয়া হবে কোথায়?

দেশে যাব। এক মাসের ছুটি নিয়েছি।

শুনে ভদ্রমহিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এই বর্ষার সময় ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়া! তাও আবার সেই দেশে যেখানে বাড়ির উঠোনে নৌকোয় বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরা চলে!

কেবল তাই নয়, বিষ্ণুবাবুর ছোটো ছেলেটির বয়স মোটে ছ-মাস। এতটুকু ছেলে নিয়ে এত দূরের রাস্তা যাওয়া, ওই বারোমেসে বন্যার দেশে বাস করা! আরও যে এক পাল ছেলেমেয়ে আছে দুরন্তর একশেষ, তাদের মধ্যে কোন্‌টা কবে জলে ডুবে মরবে ভগবান জানেন!

স্ত্রীর মুখ দেখে বিষ্ণুবাবু টের পেলেন, কোনো একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। অন্যায় কী করেছেন ঠিক বুঝতে না পারলেও স্থানত্যাগ করাই ভালো মনে করলেন।

গামছাটা কোথায় গেল? বলে তিনি পালিয়ে গেলেন একেবারে উঠোনে কুয়োতলায়। অন্যমনস্কতার অপবাদ থাকলে মাঝে মাঝে দরকারের সময় সেটা মানুষের কাজেও লাগে বলতে হবে বটে।

ছোটো খোকা খিদেয় কাঁদছিল। তাকে দুধ খাইয়ে দেশে যাওয়ার ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার জন্য স্বামীর খোঁজে গিয়ে বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী আবিষ্কার করলেন, কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে তিনি গায়ে তেল মাখছেন। স্নানের জন্য জল তুলে রেখে চাকর মাখনলাল সবিস্ময়ে তাই নিরীক্ষণ করছে।

রাগের মধ্যেও বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী না হেসে থাকতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, তেল মাখছ যে!

দেখছ না চান করব।

বিকেলে চান করবার সময় লোকে গায়ে তেল মাখে নাকি?

বিষ্ণুবাবু থতমত খেয়ে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে একবার আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন। প্রতিবেশী উকিলবাবুর রান্নাঘরের পিছনে এইমাত্র সূর্য অস্ত গিয়েছেন, ওদিকের আকাশটা এখনও টকটকে লাল। আকাশের রঙ প্রতিফলিত হয়ে পড়ার জন্যই বোধ হয় বিষ্ণুবাবুর মুখখানা বড়ো বেশিরকম লাল দেখাতে লাগল।

হঠাৎ তিনি করলেন কী, চাকর মাখনলালের গালে বসিয়ে দিলেন ঠাস করে এক চড়!— ব্যাটা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কী তখন থেকে? একবার বলতে পারলি না, এখন বিকেলবেলা, এখন তেল মাখবেন না বাবু।

বিষ্ণুবাবুর হাতে চড় খেলে মাখনের লাগে কিন্তু দুঃখ হয় না। চাকরকে মারলেই একটু পরে বিষ্ণুবাবুর এখন গভীর অনুতাপ উপস্থিত হয় যে নিজের জরিমানা বাবদ কিছু তার হাতে গুঁজে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পান না। বাবু রোজ কেন চড়টা-চাপড়টা মারেন না বলেই বরং মাখনের মনে আপশোশ হয়।

ক-দিন মহাসমারোহে যাত্রার আয়োজন হল। বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীর শরীরটা ভালো ছিল না, মনেও নানারকম দুর্ভাবনা। তিনি ছাড়া সকলেরই উৎসাহ দেখা গেল প্রচণ্ড। কোথাও যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই বিষ্ণুবাবু মহা বিপদ বাধান। এটা কোথায় গেল, ওটা কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করতে করতে সকলকে তো অতিষ্ঠ করে তোলেনই, আর নিজেরও প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

যাত্রার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাঁর চিরন্তন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হল। প্রথমেই হাঙ্গামা বাধল চটিজুতা, টুথ ব্রাশ আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। অনেক খোঁজার পর জিনিস কটা পাওয়া গেল একটি গোছালো সুটকেসের ভিতরে। বিষ্ণুবাবু জিনিসপত্র গোছাতে স্ত্রীকে কাল একটু সাহায্য করেছিলেন!

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, গাড়ি তো সেই সন্ধের সময়, কাল এগুলো বাক্সবন্দি করবার কী দরকার ছিল?

এ প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারে? বিষ্ণুবাবু চুপ করে রইলেন। কিন্তু সে কেবল কিছুক্ষণের জন্য। রওনা হওয়ার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, তিনি ততই ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়তে লাগলেন। এ জিনিসটা টানেন, ও বাক্সটা খোলেন, একে ধমকান, ওকে উপদেশ দেন, এ ঘর থেকে ও ঘরে যান আর ও ঘর এ ঘরে আসেন। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন।

পাড়াতে সচকিত করে একসময় বাড়ির সামনে থেকে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়ল। স্টেশন প্রায় তিন মাইল তফাতে। টাইমটেবলে ট্রেনের সময় দেখে বিষ্ণুবাবু দেড় ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছেন।

পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়েই বিষ্ণুবাবু বললেন, আমার চুরুটের বাক্স কোথায় গেল?

গাড়ি থামল এবং মাখনলাল নেমে ছুটল বাড়ির দিকে। বিষ্ণুবাবু নিজেই ভরসা দিয়ে বললেন, সাড়ে সাতটায় গাড়ি, ঢের সময় আছে।

মাখনলাল চুরুটের বাক্স নিয়ে এলে আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। পথে বিষ্ণুবাবু আরও কয়েকবার কোথায় গেল বলে উঠলেন বটে, কিন্তু জিনিস কয়েকটি অপরিহার্য না হওয়ায় গাড়ি থামানো হল না, মাখনলালকেও বাড়ি পাঠানো হল না।

স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল তাঁদের গাড়ি ছেড়ে গেছে আধঘণ্টা আগে।

বিষ্ণুবাবু রেগে বললেন, ছেড়ে গেছে বললেই হল! টাইমটেবলে টাইম দেখলাম সাড়ে সাতটায়— কোথায় গেল টাইমটেবলটা?

মাখনলাল অনেক খুঁজে টাইমটেবলটা আবিষ্কার করে বাবুর হাতে দিল। এদিকে খোকার মা এতক্ষণ স্টেশনের কুলির সঙ্গে বোধ হয় গাড়ির সময় সম্বন্ধেই আলাপ করছিলেন, বললেন, ওটা দেখে আর কী হবে, ট্রেনের টাইম বদল হয়ে গেছে এক মাসের ওপর। কোন্ বছরের টাইমটেবল ওটা দ্যাখো তো?

রাত এগারোটার সময় আর একটা ট্রেন আছে। ঠিক হল সেই গাড়িতেই যাওয়া হবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুবাবু তাড়াতাড়ি সপরিবারে ওয়েটিং রুমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

খানিক পরেই নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী শ্রান্তভাবে বললেন, শুভদিনে শুভক্ষণে যাত্রা করেছি বটে।

বিষ্ণুবাবু ভরসা দিয়ে বললেন, জোরে বৃষ্টি নামাই তো ভালো, কিছুক্ষণ বর্ষেই আকাশ সাফ হয়ে যাবে!

অনেকক্ষণ বর্ষণের পর বৃষ্টির জোর কমল বটে, একেবারে কিন্তু থামল না। ছেলেমেয়েদের খিদেও পেয়েছে, কিন্তু খাইয়ে একটা বিছানা পেতে ওদের শুইয়ে দেবার পরামর্শটা বিষ্ণুবাবুই দিলেন। খাবার সঙ্গে আছে— কিন্তু খাবার জল?

জলের কুঁজো কোথায় গেল?

আনা হয় নি।

বিষ্ণুবাবু রেগে বললেন, কেন আনা হয়নি? একটা দরকারি জিনিস আনতে যদি তোমাদের মনে থাকে। যেখানে সেখানে জল খেয়ে এবার কলেরা হোক সবার!

স্ত্রী জানালেন, বিষ্ণুবাবুর হুকুমেই ঘোড়ার গাড়ি থেকে শেষমুহূর্তে জলের কুঁজোটি নামিয়ে রেখে আসা হয়েছে। এমনিই মালপত্র হয়েছে একগাদা, তার উপর কুঁজোর বোঝা বাড়াতে তিনি রাজি হননি।

বিষ্ণুবাবু দমে গিয়ে বললেন, খাবার জলের কুঁজোটা নামাতে বলেছিলাম নাকি? যা হাঙ্গামা চলেছে কদিন থেকে, মাথার কী ঠিক থাকে কারো!

মাখন ছাতি মাথায় দিয়ে গিয়ে খাবার জল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। খাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা সকলেই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। খোকাকে পাশে নিয়ে শুয়ে বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীও একসময়ে পড়লেন ঘুমিয়ে। দরকার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাখন ঝিমোতে লাগল। বিষ্ণুবাবু ঢুলতে ঢুলতে মাঝে মাঝে চমকে সজাগ হয়ে বলতে লাগলেন, ঘুমিও না, ঘুমিও না, সবাই মিলে ঘুমিও না। তুই যে বড় ঘুমোচ্ছিস মাখন?

মাখনও চমকে সাড়া দিতে লাগল, আজ্ঞে না বাবু, ঘুমোই নি।

মাখনকে অবশ্য বেশিক্ষণ সাড়া দিতে হল না, খানিক পরে বিষ্ণুবাবু নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মাখনও ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু নিজের ভাগের খাবার খেয়ে বেচারার পেট ভরে নি। চুপি চুপি কিছু খাবার সংগ্রহের আশায় সে জেগে রইল। খাবার জোগাড় করে পেটটি ভরিয়ে মাখন আবার যেই ঘুমের আয়োজন করতে যাবে, বছর তিনেকের একটি ছেলে কাঁদতে আরম্ভ করায় বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী তাকে মাখনের কোলে ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে চোখ বুজলেন। মাখনের আর ঘুম এল না এবং জোর বৃষ্টির মধ্যে সেই শুনতে পেল গাড়ি আসবার প্রথম ঘণ্টা।

একটু চিন্তা করে, বাবুর হাতঘড়িটা দেখে, মাখন বাবুকে ডেকে তুলল। তারপরেই বেধে গেল হইচই কাণ্ড। বিষ্ণুবাবু এক এক হ্যাঁচকা টানে এক একটি ছেলেমেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলেন। কেবলি বলতে লাগলেন, ডাক ডাক কুলি ব্যাটাদের ডাক। বাঁধ বাঁধ বিছানাপত্র বাঁধ। ফসকালো রে, এ গাড়িটাও ফসকালো!

গাড়ি অপরদিকের প্লাটফর্মে দাঁড়াবে— ওভারব্রিজ পার হয়ে যাওয়া চাই। এই বৃষ্টির মধ্যে এতগুলি ছেলেমেয়ে মোটবহর নিয়ে এটা সোজা কাজ নয়। গাড়ির প্রথম ঘণ্টা যদিও কেবল পড়েছে— এদিকে ঘড়িতে পার হয়ে গিয়েছে গাড়ির সময়। বিষ্ণুবাবু একেবারে খেপে যাবার উপক্রম করলেন।

বিছানা গুটিয়ে সকলকে নিয়ে কোনো রকমে ভিজতে ভিজতে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোনো গেল। এখনো ট্রেনের দেখা নেই। প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিষ্ণুবাবু বললেন, দাও, খোকাকে আমার কাছে দাও।

খোকা তো তোমার কাছেই?

কী সর্বনাশ! খোকা কোথায় গেল?

মাখন তুই এখানে দাঁড়া ওদের নিয়ে। বলে ব্যাকুলভাবে বিষ্ণুবাবু সোজা লাইন ডিঙিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে ছুটলেন, তাঁর স্ত্রীও প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফ দিলেন লাইনে। ওয়েটিং রুম ফাঁকা। বিষ্ণুবাবু ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন, কাতরভাবে বললেন, খোকা কোথায় গেল?

কুলিরা নিশ্চয় চুরি করেছে।

কুলিরা অতটুকু ছেলে চুরি করবে কেন? তা ছাড়া, কুলি দুটো বরাবর আমাদের সঙ্গেই ছিল।

একটু দম নিয়ে দুজনে ফিরলেন। এবার গেলেন ব্রিজের উপর দিয়ে, দুদিকে তাকাতে তাকাতে। যদি ফেলে গিয়ে থাকেন! কিন্তু কোথায় খোকা? খোকার চিহ্নও নেই কোথাও। ছেলেমেয়েরা কাঁদছে, মাখন তাদের আগলিয়ে আছে। বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ব্যাপারটা যেমন ভয়ানক, তেমনি আশ্চর্য! মাখন যখন সকলকে ডেকে তুলল, খোকা তখন বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীর পাশে শুয়ে আছে। তারপর কুলি ডাকা, ছেলেমেয়েদের ডেকে তোলা, বিছানা বাঁধা, এই সব হট্টগোলের মধ্যে একটা জ্যান্ত শিশু শূন্যে মিলিয়ে গেল!

বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওগো শুনছ, খোকার কান্না শুনতে পাচ্ছি আমি। কোথায় যেন কাঁদছে খোকা।

বিষ্ণুবাবুরও মনে হচ্ছিল, দু-একবার খোকার কান্না যেন অতি ক্ষীণভাবে দূর থেকে তাঁর কানে ভেসে এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা মনের ভুল বলে আমল দেননি। এবার স্ত্রীর

সমর্থন পেয়ে বললেন, স্টেশনের আগাগোড়া আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব। মাখন, আমার টর্চটা গেল কোথায়?

মাখন একটা বিছানা দেখিয়ে বলল, আজ্ঞে, ওর মধ্যে।

বিছানাটা ওয়েটিং রুমে পাতা হয়েছিল, টর্চ হাতে স্টেশনের প্রত্যেক ইঞ্চি স্থান খুজে দেখবেন স্থির করে প্রকাণ্ড অভিযানে যাবার আগে বড় বড় বীরদের যেমন মুখের ভাব হয় সেই রকম মুখ করে বিষ্ণুবাবু বললেন, টর্চটা বের কর।

বিছানা খোলা হল। টর্চটা অবশ্য পাওয়া যেত বিছানার মধ্যেই, কিন্তু খোকাকেও আধমরা অবস্থায় তার মধ্যে পাওয়াতে কেউ আর টর্চের জন্য মাথা ঘামাল না। ভাগ্যে বিছানাটা তাড়াতাড়িতে আলগা করে গোটানো হয়েছিল! ভাগ্যে খোকার মুখটা পড়েছিল ধারের দিকে! তবু আর কয়েক মিনিট দেরি হলে 'খোকা কোথায় গেল'— এ প্রশ্নের জবাব বোধ হয় আর পাওয়াই যেত না।

বিষ্ণুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে মাখনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।— শয়তান! তোকে আমি ফাঁসিকাঠে লটকিয়ে ছাড়ব।

বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী বললেন, বিছানাটা গুটিয়েছিলে কিন্তু তুমি!

অক্টোবর ১৯৩৯

জব্দ করার প্রতিযোগিতা

সুকুমার আর পঞ্চানন পরস্পরের প্রাণের বন্ধু অথবা পরম শত্রু, এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে ঠিক করে বলা কঠিন। মনস্তত্ত্বে যাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাদের পক্ষেও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ হবে কিনা সন্দেহ। অনেকদিন থেকেই দুজনের মধ্যে ভাব আছে, দুজনে গল্প করে, তর্ক করে, বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়— আবার সুযোগ পেলেই পরস্পরকে জব্দ করে। সময় সময় একজনকে জব্দ করার জন্য অপরজন সুযোগ সৃষ্টিও করে দেয়।

কতদিন থেকে যে তারা এভাবে পরস্পরকে জব্দ করে আসছে দুজনের একজন বোধ হয় স্মরণ করতে পারবে না। এ পাগলামি তাদের কেন পেয়ে বসল তা-ও তারা বলতে পারবে না। এখন ব্যাপারটা দুজনের কাছেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা প্রতিযোগিতায়। দুজনকে প্রশ্ন করলে দুজনেই জবাব দেয়, ও আমায় জব্দ করেছে, আমি ওকে জব্দ করব না?

ছেলেবেলা হয়তো নিছক ছেলেমানুষি খেয়ালের বশেই একজন আর একজনকে একটু জব্দ করেছিল, ব্যস্, সেই থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। এখন তারা বড়ো হয়েছে, কলেজে ছাত্রজীবন প্রায় শেষ হয়ে এল, এখনও কিন্তু সে প্রতিযোগিতার অন্ত হল না। কী করেই বা হবে? এ তো আর সাধারণ লড়াই নয় যে কোনো পক্ষ হার না মানলেও দুপক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে লড়াই বন্ধ করা সম্ভব হবে। এদের লড়াই যখনি বন্ধ হোক, তখনকার অবস্থাটা হবে এই একজন জব্দ হয়েছে, আর একজন জব্দ করেছে। কাজেই, একজন যদি জব্দ হওয়াটা হজম না করে, এদের যুদ্ধ কোনোদিন শেষ হবে না। কে জানে, বুড়ো বয়সে একজনকে জব্দ করেই যদি অপরজন ফাঁকতালে মরে যায়, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাহলে অন্য যে বেঁচে থাকবে সেও হয়তো রাগের চোটে হার্ট ফেল করে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। তারপর স্বর্গে গিয়েও দুজনের প্রতিযোগিতা চলবে কিনা, মর্ত্যের মানুষের পক্ষে সে বিষয়ে গবেষণা না করাই ভালো।

কলেজে কয়েকজন বন্ধুর কাছে সুকুমারকে পঞ্চানন মাস তিনেক আগে বড়ো হাস্যাস্পদ করেছিল। এতদিন সুকুমার প্রতিশোধের সুযোগ পায় নি।

সম্প্রতি পঞ্চাননের জ্বর হওয়ায় সপ্তাহখানেক কলেজ যায়নি। আজ সে ভাত খেয়েছে এবং ঠিক করেছে পরদিন কলেজে যাবে। আজই সে যেত, কলেজ কামাই করতে তার ভালো লাগে না, কিন্তু বাড়ির সকলে নিষেধ করাতে বিশেষ করে সকালে এসে সুকুমার পর্যন্ত বারণ করায় আজ কলেজ যাওয়াটা সে বন্ধ রেখেছে। সুকুমারের দরদ দেখে পঞ্চাননের মনটা ভিজে গেছে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে, সুকুমার যদি আর কিছু না করে, তাহলে সেও আর সুযোগ পেলেও তাকে কখনো জব্দ করার চেষ্টা করবে না।

বিকালে পঞ্চানন যখন এই সব কথা ভাবছে, সুকুমার এল। বলল,— কিরে, মিটিংয়ে যাবি নাকি?

কীসের মিটিং?

তুই জানিস না? সেই লাইব্রেরির ব্যাপার নিয়ে।

কলেজের লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব, লাইব্রেরিতে বসে পড়বার জন্য ভালো ব্যবস্থার অভাব, বই দেওয়া-নেওয়ার গোলমেলে ব্যবস্থা, এসব বিষয়ে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কিছুদিন থেকে গোলমাল চলছিল। পঞ্চানন ছিল ছেলেদের পক্ষ থেকে এই গোলমাল চালানোর অন্যতম পাণ্ডা। খবর শুনে তার অভিমানের সীমা রইল না।

লাইব্রেরির ব্যাপার নিয়ে মিটিং, আর ছেলেরা আমায় একটা খবরও দেয়নি।

সুকুমার সান্ত্বনা দিয়ে বলল, জ্বরে ভুগছিলি, খবর দেবে কী? তোর জন্য সবাই আপশোশ করছিল, তুই থাকলে মিটিংটা বেশ জোরালো হতো।

সে বিষয়ে পঞ্চাননেরও কোনো সন্দেহ নেই। বসে বসে সে ভাবতে থাকে, লাইব্রেরি সংস্কারের আন্দোলনটা একরকম সেই-ই আরম্ভ করেছিল, আজ তার অনুপস্থিতিতে ছেলেরা দাবিগুলি রিজেলিউশনে পরিণত করতে গিয়ে হয়তো গোলমাল করে ফেলবে। সে যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন না করে, সকলকে যদি বুঝিয়ে না দেয় যে দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কত বড়ো অন্যায় মেনে চলতে হচ্ছে, দাবিগুলো হয়তো ফসকেই যাবে।

পঞ্চানন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চল, আমিও যাব।

সুকুমার হেসে বলল, বোস, বোস, এখনো তো দেরি আছে। কী বলবি একটু ভেবেচিন্তে ঠিক করে নে— না, না, সব বক্তৃতাটা লিখে নিতে বলছি না, শুধু পয়েন্টগুলি গুছিয়ে একটা কাগজে নোট করে নে। এ তো আর এমনি বাজে মিটিং নয়, লাইব্রেরির অ্যানিভার্সারি।

মিটিংটা যে সত্যই যেমন তেমন বাজে মিটিং নয়, কলেজ পৌঁছেই পঞ্চানন তা টের পেল। বড়ো লেকচার হলটিতে ভিড় করে ছেলেরা জমা হয়েছে, প্রায় সমস্ত প্রফেসরই উপস্থিত আছেন, স্বয়ং প্রিন্সিপাল পর্যন্ত সশরীরে বর্তমান। ছেলেদের লাইব্রেরি সভায় এদের এরকম সদলবলে উপস্থিত থাকতে দেখে পঞ্চানন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

সুকুমার বলেছিল, মিটিং আরম্ভ হতে দেরি আছে। কিন্তু বোঝা গেল, মিটিং অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। একজন প্রফেসর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, পঞ্চানন আর সুকুমার তখন একেবারে সামনে গিয়ে বসবার উপক্রম করেছে। প্রফেসার বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার জোর গলায় ঘোষণা করল, প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে আমি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরীকে কিছু বলতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বিশেষ অনুরোধ জানাবার কারণ, আমাদের আলোচ্য বিষয়ে পঞ্চাননবাবুর বলার অধিকার সকলের চেয়ে বেশি। পঞ্চাননবাবু সেই মহাপুরুষের নিকট আত্মীয়, সমস্ত জীবন যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেছেন, যার বাড়ির প্রাইভেট লাইব্রেরির সঙ্গে অনেক পাবলিক লাইব্রেরিরও তুলনা হয় না।

সুকুমার বসতেই পঞ্চানন চাপা গলায় বলল, তুই কী পাগল হয়ে গেছিস? পঞ্চাননের বৌদির দাদামশায়ের ভাই একজন বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন, তাঁর একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরিও ছিল। কিন্তু কলেজ লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষ অধিকার সেজন্য তার জন্মাবে কেন? পঞ্চানন ভেবে পেল না। মাঝে মাঝে সুকুমার এমন উন্মাদের মতো কাজ করে বসে! যাই হোক, সুকুমারকে ভর্ৎসনা করার সময় ছিল না। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পঞ্চাননকে উঠে দাঁড়াতে হল। প্রথমে সে আরম্ভ করল ছাত্রজীবনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তার কথা নিয়ে তারপর গলা আরও চড়িয়ে বলতে লাগল তাদের কলেজ লাইব্রেরির শোচনীয় দুরবস্থার কথা— আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে দিতে লাগল লাইব্রেরিকে এভাবে অবহেলা করার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষকে খোঁচা।

সকলে নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে পঞ্চাননের বক্তৃতা শুনছিল। প্রথমটা সকলের মুখে দেখা গেল একটা বিস্ময়ের ভাব, তারপর সকলে যেন হতভম্বের মতো পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আরম্ভ হল ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল।

প্রিন্সিপাল তীব্র গলায় বললেন, এটা পাগলামি করার জায়গা নয় পঞ্চানন। লাইব্রেরির কথা বলার কী তুমি আর সুযোগ পাবে না যে একজন মহাপুরুষের স্মৃতিসভায় যা-তা বকতে আরম্ভ করেছ?

ছেলেদের নানারকম টিটকিরি কানে আসছিল। পঞ্চানন একবার সুকুমার যেখানে বসছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখলে। সুকুমার আগেই কোনো ফাঁকে উঠে পালিয়ে গেছে। সভার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে মাথা নিচু করে পঞ্চানন ধীরে ধীরে হল থেকে বেরিয়ে গেল।

জীবনে কখনো পঞ্চানন এরকম জব্দ হয়নি। কলেজে কী করে মুখ দেখাবে ভেবে না পেয়ে সে ক-দিন কলেজ যাওয়াই বন্ধ রাখল। মনের মধ্যে কেবলি ঘুরপাক খেতে লাগল একটিমাত্র চিন্তা,— প্রতিশোধ চাই, এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হল দিন সাতেক পরে। পঞ্চানন সহজভাবে বলল, কিরে কেমন আছিস সুকুমার!

সুকুমারও সহজভাবেই বলল, কিরে ভালো আছিস তো পঞ্চু!

হাতে কিছু কাজ না থাকায় দুজনে সিনেমায় গেল। দুজনের ভাব দেখে কে কল্পনা করতে পারবে তাদের একজন ভাবছে কী করে অপরজনকে অপদস্থ করা যায় এবং অপরজন ভাবছে কোন্ দিক থেকে কীভাবে আক্রমণ আসবে।

দুজনেই অভিজ্ঞ ও দক্ষ লড়ায়ে এবং সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে জানে। দিন কাটতে কাটতে মাস কেটে গেল, পঞ্চাননের দিক থেকে প্রতিশোধের কোনো আয়োজন দেখা গেল না।

এমন সময় দিন সাতেকের জন্য কলেজ বন্ধ হল। ছুটির পর দিন সুকুমার বলল, কাল পাটনায় যাচ্ছি। যাবি?

পঞ্চানন ঘাড় নেড়ে বলল— না, তুই কদিন থাকবি?

ছুটির কটা দিন থাকব, আবার কদিন?

সুকুমারের কাকা যাদববাবু পাটনায় ডাক্তারি করেন। পরদিন সুকুমার তার কাকার কাছে ছুটিটা কাটাবার জন্য রওনা হয়ে গেল। পঞ্চাননের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও

পাটনা থাকেন, দু-দিন পরে পঞ্চাননও তার দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেল।

কোনোদিন যে চিঠিপত্রও লেখে না, বিনা খবরে তার আকস্মিক আবির্ভাবে আত্মীয়টি একটু চমকে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ?

অনেকদিন থেকে পাটনায় বেড়াতে আসব ভাবছিলাম, ক-দিন ছুটি পেয়ে হঠাৎ মনে হল আপনারা যখন আছেন—

নিশ্চয়, নিশ্চয়— আসবে বইকি— বেশ করেছ। তোমার বাবার শরীর ভালো তো?

পরদিন থেকেই পঞ্চানন একেবারে ডিটেকটিভ গল্পের ডিটেকটিভের মতো নিজে আড়ালে থেকে যাদব ডাক্তারের সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল।

বছর পঞ্চাশেক বয়েস, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি খুব ভালোমানুষ। কৌশলে আত্মীয়টির কাছে খবর নিয়েও পঞ্চানন জানতে পারল, লোক হিসাবে যাদব ডাক্তার সত্যই খুব সাদাসিধে, অমায়িক ও পরোপকারী, তবে ডাক্তার হিসাবে তেমন পসার নেই। বোধ হয় ভালোমানুষ বলেই।

একটা গোটা দিন খবর সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে পরদিন সকালে পঞ্চানন যাদব ডাক্তারের বাড়ির কাছে একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সুকুমার যদি ইতিপূর্বেই বেড়াতে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, দোকানের ভিতরে ঢুকে আত্মগোপন করা চলবে। মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে থাকার পর যাদব ডাক্তারের বাড়ি থেকে সাত-আট বছরের একটি খাকি প্যান্ট পরা ছেলে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। পঞ্চানন তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করলে।

খোকা শোনো, তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে— না? কলকাতা থেকে তোমার যে দাদা এসেছে, সে বাড়ি আছে? খোকা সবেগে মাথা নেড়ে জানাল— না।

তোমার দাদা কবে কলকাতা যাবে?

পরশু। তুমি কে?

আমি? আমি একজন লোক। ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন?

আছেন, তুমি যাও না।— বলে লাফাতে লাফাতে সবেগে প্রস্থান করল।

যাদব ডাক্তার বাইরের বসবার ঘরের একপেশে আড়াইটি ওষুধের আলমারিওয়ালা ডিসপেনসারিতে বসে রোগীর প্রতীক্ষা করছিলেন।

ঘরে ঢুকেই পঞ্চানন গভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলল, ডাক্তারবাবু কী উপায় হবে? আমার ছোটো ভাই হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। একটা ওষুধ দিন।

যাদব ডাক্তার বললেন, বসুন, বসুন। ব্যস্ত হবেন না। কে আপনার ছোট ভাই? না দেখে ওষুধ দেব কী করে?

একটা আধ-ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে পঞ্চানন হতাশ ভাবে বলল, তাইতো, এটাতো আমার খেয়াল হয়নি। যা বিপদটা ঘটল হঠাৎ, নিজেরও কী মাথার ঠিক আছে। ক-দিন আগে ছেলেটা এল কলকাতা থেকে, দিব্যি ভালো ছেলে, পাগলামির কোনো চিহ্ন নেই, কাল হঠাৎ মাথাটা বিগড়ে গেল।

যাদব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

পঞ্চানন তার কাল্পনিক ভাইয়ের পাগল হওয়ার কয়েকটা লক্ষণ বর্ণনা করল। শুনে যাদব ডাক্তার বললেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন মনে হচ্ছে। একবার দেখা দরকার। ওকে তো আনা সম্ভব নয়, আমিই বরং একবার—

পঞ্চানন বলল, তাই চলুন ডাক্তারবাবু। আমি একবার পোস্টাপিস থেকে ঘুরে আসছি, একেবারে একটা গাড়ি নিয়ে আসব। বলে হাত জোড় করে পঞ্চানন আবার বলল, দয়া করে আমার আর-একটা কাজ করে দিতে হবে ডাক্তারবাবু।

পঞ্চাননের ডান হাতের আঙুলগুলিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে যাদব ডাক্তার বললেন, বলুন।

বাবাকে একটা খবর দেওয়া দরকার, কিন্তু নিজে চিঠি লিখতে পারছি না। কাল রাত্রে ওকে যখন সামলাচ্ছিলাম, একবার এমন জোরে হাতের আঙুলগুলিতে কামড়ে দিল— এখনো টনটন করছে। আপনি যদি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেন—

যাদব ডাক্তার বললেন, বেশ তো। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সে আর এমন কী ব্যাপার!

পঞ্চানন বলতে লাগল এবং একটা সাদা প্যাডে যাদব ডাক্তার লিখতে লাগলেন।

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে বড়োই দুঃসংবাদ জানাইতেছি। শ্রীমান সুকুমার হঠাৎ—

যাদব ডাক্তার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ভাই-এর নাম কি সুকুমার?

পঞ্চানন বলল, আজ্ঞে না, শ্রীকুমার।

সুকুমার-এর 'সু'কে কালি বুলিয়ে 'শ্রী'তে পরিণত করে যাদব ডাক্তার আবার লিখতে লাগলেন :

— পাগল হইয়া গিয়াছে। কেন যে এরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় অতিরিক্ত পড়াশোনা করার দরুণ। শ্রীমান কখনও শান্ত থাকিতেছে, কখনও ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিতেছে। শান্ত থাকিবার সময় এরূপ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতেছে যে তখন বুঝাই যায় না যে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। উগ্রভাবের জন্য শ্রীমানকে বাধ্য হইয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। গতকাল একবার স্বাভাবিকভাবে সুস্থ ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা বলায় এবং চালচলন দেখানোয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র বঁটি লইয়া বামুন ঠাকুরকে কাটিতে গিয়াছিল। আমি না থাকিলে সর্বনাশ হইয়া যাইত। শ্রীমানকে সামলাইবার সময় সে আমার হাতে কামড়াইয়া দিয়াছে।

এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছি, দুই চারিদিন দেখিয়া কলকাতা লইয়া যাইব। কিন্তু কলকাতায় লইয়া যাইতে ভরসা পাইতেছি না। কলকাতায় একজন বন্ধু নাকি তাহার কী ক্ষতি করিয়াছে, শ্রীমান বলিতেছে কলকাতা গিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। এ অবস্থায় কী করিব জানাইবেন।

আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও শ্রীমান হয়তো লুকাইয়া কলকাতা পলাইয়া যাইতে পারে, এইজন্য লিখি যে, তাহাকে দেখিবামাত্র আটকাইয়া রাখিবেন। দরকার হইলে বাঁধিয়া রাখিতেও কসুর করিবেন না। নতুবা সে কী সর্বনাশ ঘটাইয়া বসিবে কিছুই স্থিরতা নাই।

আরও লিখি যে, শ্রীমানের কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া পাগল হইয়াছে মনে না হইলেও তাহাকে আটক রাখিবেন। পাগল হইলে নানারূপ চালাকি বুদ্ধি মাথায় আসে।

চিন্তা করিবেন না। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীমান অবশ্যই শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে। ইতি—

প্রণত যাদব

যাদব ডাক্তার আবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম যাদব?

পঞ্চানন বলল, আজ্ঞে না— মাধব।

'ও'! বলে যাদব ডাক্তার 'যাদব'-এর 'য'কে কলমের খোঁচায় 'ম'তে পরিণত করে দিলেন।

চিঠিখানা বাঁ হাতে নিয়ে পঞ্চানন উঠে দাঁড়াল, বলল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু আসি। নমস্কার।

খামের ওপর সুকুমারের বাবার নাম ঠিকানা টাইপ করিয়ে পরদিন পঞ্চানন চিঠিখানা পোস্ট করে দিল। তার পরদিন সুকুমারের সঙ্গে একগাড়িতে কলকাতা রওনা হওয়ার আগে যাদব ডাক্তারের নাম দিয়ে সুকুমারের বাবার কাছে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম করে দিল যে সুকুমারের একটি বন্ধুর সঙ্গে সুকুমারকে কলকাতা পাঠান হল।

মাঝের একটা স্টেশনে পঞ্চাননকে হঠাৎ করে তার কামরায় উঠতে দেখে সুকুমার যত না অবাক হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়ে গেল সে হাওড়া স্টেশনে বাড়ির প্রায় সকলকেই উপস্থিত দেখে। মায় বুড়ি পিসিমা পর্যন্ত!

সকলের ব্যবহারে, বিশেষ করে পিসির ব্যবহারে, বিস্ময় তার সীমা ছাড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামামাত্র পিসি তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন, কেন তোর এমন হল বাবা!

এত লোকের সামনে পিসির এই কাণ্ডে লজ্জা ও বিরক্তির বশে যেই সে পিসিকে একটু জোরের সঙ্গে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়েছে, পঞ্চানন তখন যে কাণ্ডটা করে বসল তাতে তার সীমা ছাড়ানো বিস্ময় মনের এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেল, যেখানে মানুষ অন্ধকার দেখে থাকে। ছুটে এসে তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে পঞ্চানন তার বাবাকে বলল, শিগগির ধরুন শক্ত করে। এতক্ষণ বেশ শান্ত ছিল, আবার আরম্ভ করেছে।

এতক্ষণ যদি-বা আরম্ভ করেনি, এইবার সুকুমার সত্যিই আরম্ভ করে দিল। রাগে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে মুক্তিলাভের জন্য এমন ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিল যে কারও আর সন্দেহ রইল না, যে, সে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

দুজন কুলির সাহায্যে ও সকলের মিলিত চেষ্টায় জোর করে হাত-পা বেঁধে তাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল, একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেওয়া হল। সুকুমার ভেতরে গজরাতে লাগল।

সুকুমারের মা আর পিসির কান্না দেখে পঞ্চাননের একবার মনে হল, এবার বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। এতটা জব্দ না করলেও হত। কিন্তু এতদূর এগিয়ে আর তো থামা যায় না।

ক-দিন ছুটির পর সেই দিন প্রথম কলেজ খুলেছে। ছুটির পর জনাদশেক বন্ধুকে সঙ্গে করে পঞ্চানন সুকুমারের খবর নিতে গেল।

সুকুমারের বাবা সেদিন আপিস যাননি। তিনিই বললেন, ও ঘুমোচ্ছে। পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন? কী বললেন?

সুকুমারের বাবা বিরস মুখে জবাব দিলেন, ডাক্তারবাবু বললেন বিশেষ কিছু হয়নি, সেরে যাবে। এখন আমার অদৃষ্ট! একটা ইনজেকশন দিয়েছেন, তারপর থেকেই ঘুমোচ্ছে।

কয়েকদিন পরে কলেজে যেতেই প্রথম যে বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হল, সে বলল, কিরে সেরে গেছিস?

কিন্তু সুকুমার কোনো জবাব দিল না। তারপর আরও কত বন্ধু ও চেনা ছেলে কতবার ওই ধরনের প্রশ্ন করল, কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। এমনকি একজন প্রফেসর পর্যন্ত যখন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে সুকুমার, মাথার গোলমালটা সেরে গেছে তো? তখনও সে নির্বাক রইল।

খুব সম্ভব সে অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। ভাবছিল, কীভাবে পঞ্চাননকে জব্দ করা যায়!

অক্টোবর ১৯৪০

তিনটি সাহসী-ভীরুর গল্প

ভূষণের জন্য না হলে লম্বা লম্বা পা ফেলে গিরিশ নিশ্চয় সন্ধ্যা নাগাদ নদীর ধারে পৌঁছে যেত, খেয়াটাও ফসকে যেত না। ভূষণের জন্যই সব গোলমাল হয়ে গেল। কে জানত রাস্তায় এমন হাঙ্গামা হবে!

গিরিশ যাচ্ছে কলকাতায়। গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে প্রকাণ্ড একটা নদী পার হয়ে আরও তিন মাইল হাঁটলে রেল স্টেশন। গাড়ি সেই রাত্রি দশটায়। তবু গিরিশ ভেবেছিল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বেলা একটা দুটোর মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে, দিনে দিনে স্টেশনে পৌঁছে না হয় গাড়ির জন্য অপেক্ষাই করা যাবে কয়েক ঘণ্টা। মাঠ আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদী পার হয়ে যে পথ স্টেশনে যাবার!

কিন্তু ভাবলে কী হবে! একজন মানুষ কলকাতা যাচ্ছে তার জন্য একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না করলে কী বাড়ির মেয়েদের চলে? রাত্রে তো খাওয়া জুটবে না, তাই বোধ হয় দুবারের খাদ্যটা একবারেই গিরিশের পেটে ঢুকিয়ে দেবার মতলব তাদের ছিল। বেলা তিনটেয় যদি-বা খাওয়া শেষ হল, এক ঘণ্টার মধ্যে গিরিশের আর নড়বার ক্ষমতা রইল না।

তবু, ছ-ফিট লম্বা লিকলিকে মানুষ, গায়ে মাংসের ভারও নেই, সঙ্গে মালপত্রও নেই। হাঁটতে হাঁটতে পেটের ভার যত হালকা হয়ে আসত, গতিও তদনুপাতে বাড়িয়ে দিতে থাকলে নদীর ধারে পৌঁছাতে বড়জোর সন্ধ্যাই হত। ভূষণের জন্য ব্রেকজার্নি করতে হল।

মাঠ ডিঙিয়ে পায়ে হাঁটা পথটা যেখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে, সেখানে আসতেই গিরিশ দ্যাখে কী, কোমরে ছেঁড়া ময়লা কাপড় জড়ানো কালো নোংরা সাত-আটজন লোক ফরসা জামা-কাপড় পরা একটি লোককে ছেঁকে ধরেছে। কারও কারও হাতে বাঁশের লাঠি, দুজনের হাতে আবার দুটি দা— তবে বিশেষ চকচকে নয়। লোকটির বেশ হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান চেহারা, কিন্তু ভয়ে অবস্থা বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে। কাঁপতে কাঁপতে কেবলি বলছে, দোহাই বাবা তোদের, যথা সর্বস্ব নিয়ে নে, প্রাণে মারিস না বাবা। সব দিচ্ছি তোদের, শুধু জ্যান্ত ছেড়ে দে আমায়—

কিন্তু সর্বস্ব বের করে দেবে কী, আতঙ্কে শার্টের পকেট হাতড়ে পাচ্ছে না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার উপক্রম।

তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। দিনের বেলা পথে ঘাটে ডাকাতি! গিরিশের মেজাজ বিগড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে ব্যূহের মধ্যে আক্রান্ত লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে প্রচণ্ড রবে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই ব্যাটারা, কী চাস তোরা?

ভূষণ (আক্রান্ত লোকটির নাম যে ভূষণ, পরে পরিচয় হবার পর সেটা জানা গিয়েছিল) কাঁপতে কাঁপতে বলল, আহা, আহা, করেন কী মশায়! দিয়ে দিন না যা আছে, প্রাণে বাঁচলে পয়সাকড়ি ঢের হবে।

গিরিশ বলল, আপনি থামুন।

তার ধমকে ডাকাতেরা দু-এক পা করে পিছিয়ে গিয়েছিল, একজন বুড়ো ডাকাত বলল, তিন রোজ খাইনি বাবু, কটা পয়সা দেন।

গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, পয়সা না তোর মাথা দেব। তিন রোজ খাসনি বলে দিন দুপুরে ডাকাতি করবি! আয় পয়সা খাওয়াচ্ছি—

তেড়ে যেতেই বুড়ো ডাকাত পিছন ফিরে দে ছুট। তারপর দেখতে দেখতে বাকি ডাকাত মশায়েরাও যে কোনো দিকে মিলিয়ে গেলেন টেরও পাওয়া গেল না।

পাশেই একটা আমগাছ ছিল, তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভূষণ তখন চোখ বুজল।

একটু জল।

এখানে জল কোথা পাবে? এগিয়ে চলুন, নদীতে গিয়ে যত খুশি জল খাবেন।

ভূষণের আর সাড়া নেই! চোখ বুজে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। এতবড় একটা জোয়ান মর্দ লোকের অবস্থা দেখে গিরিশ তো অবাক।

কী হল মশাই আপনার?

ভূষণ কথা বলে না।

হাঁপানির ব্যারাম আছে নাকি?

এবার ভূষণ অতিকষ্টে বলল, না, একটু সামলে নিতে দিন।

ভয়ে যে মানুষের এমন অবস্থা হয় গিরিশের জানা ছিল না। এমন ভীরু মানুষও থাকে! যাই হোক, এদিকে বেলাও আবার হয়ে এল, আর দেরি করা সঙ্গত নয়।

আচ্ছা আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এগোলাম— বলে গিরিশ যেই পা বাড়িয়েছে, ভূষণ একেবারে আর্তনাদ করে উঠল, ও মশায়, যাবেন না, যাবেন না— আমায় ফেলে যাবেন না মশায়, দোহাই আপনার! আবার যদি ওরা আসে?

কী আর করে, গিরিশকে অপেক্ষা করতে হল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ভূষণও কলকাতায় যাচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, একটু অপেক্ষা করে যদি একজন সঙ্গী পাওয়া যায় মন্দ কী! খেয়া ঘাটের পাশেই আবার শ্মশান— খেয়া নৌকা আবার সময় সময় ওপারে থাকে, এপারের ঘাটটি হয়ে থাকে জনশূন্য। ভীরু হোক, কাপুরুষ হোক, একজন জীবন্ত সঙ্গী পাওয়া যাবে তো! এই সব ভেবে গিরিশ উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরায়। মুখে কথা ফুটতেই ভূষণ যে প্রশংসাটাই আরম্ভ করে দেয় গিরিশের সাহসের, ছাপিয়ে প্রচার করলে গিরিশ বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী লোক বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। বিড়ি টানতে টানতে গিরিশ সবিনয়ে বলে, না, না, ও আর কী! সামান্য ব্যাপার। খেতে না পেয়ে লোকগুলো ওরকম করছিল, চেহারা দেখলেন না? আপনি ধমক দিলেও সরে পড়ত। তবে হ্যাঁ, চোর ডাকাত গুণ্ডাকে আমি একদম কেয়ার করি না। একবার কী হয়েছিল জানেন—

গিরিশ নিজের সাহসের গল্প বলে, ভূষণ শোনে। ভীরুর কাছে নিজের সাহসের গল্প বলতে মানুষের কী মজা লাগে, তা তো তোমরা জানোই।

এদিকে হয়ে যায় সন্ধ্যা। গিরিশ উঠতে চাইলেই ভূষণ তাকে আঁকড়ে ধরে, বলে যে তার হাত-পা তখনও অবশ হয়ে আছে, হাঁটতে পারবে না। আর পাঁচ মিনিট বসবার জন্য এমন কাকুতি-মিনতিই আরম্ভ করে দেয় বলবার নয়।

ভেবে-চিন্তে তখন গিরিশ বলে, কিন্তু আমি ভাবছি কী জানেন? লোকগুলো যদি আশেপাশে লুকিয়ে থাকে, দলবেঁধে আবার এসে ঘিরে ধরে আমাদের?

অ্যাঁ?— বলেই ভূষণ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে এবং একরকম ছুটতে আরম্ভ করে দেয়। নিজের লম্বা লম্বা পা নিয়েও তার সঙ্গে চলতে গিরিশের রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশ চলে, একরকম গা ঘেঁষে। মনে হয় দুজনে যেন কতকালের প্রাণের বন্ধু, জড়াজড়ি করে না চললে তাদের পথ চলতেই ভালো লাগে না— ।

কিন্তু নদীর ধারে পৌঁছে তারা দ্যাখে কী, ঘাট একদম ফাঁকা। চারিদিক জনশূন্য, খেয়া নৌকাটিও অদৃশ্য হয়েছে। মাঝি নৌকা নিয়ে ওপারে গেছে, না খেতে গেছে, না রাত্রের মতো বিদায় নিয়েছে ভগবান জানেন।

ঘাট আর কিছুই নয়, ছোট একটা খড়ের চালা, চারদিকটা খোলা। চালার নিচে দাঁড়িয়ে দুজন যে নিরুপায় হয়ে একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে তারও উপায় নেই, অল্প অল্প মেঘ করে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করা না যাক, নদীর ধারের ঝোপগুলিকে কিন্তু অস্পষ্টভাবে ততটুকু বেশ দেখা যাচ্ছে যতটুকু দেখা গেলে মনে হয়, সেগুলি পৃথিবী ছাড়া কোনো অতিকায় জন্তু, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। ডান দিকে খানিক তফাতে কতকটা জায়গা ফাঁকা, ভাঙা কলসি, পোড়া কাঠ, মড়ার মাথা এসব কোনো চিহ্ন চালার নিচে থেকে এখন চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু যার আগে থেকেই জানা আছে তার পক্ষে আর অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় যে ওই ফাঁকা জায়গাটাতেই মড়া পোড়ানো হয়, অন্য অদৃশ্য চিহ্নগুলিও সে অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারে।

গিরিশ ঘন ঘন ডানদিকে তাকায় আর ভূষণের গা ঘেঁষে আসে।

কী হল? ঠেলছেন কেন?— ভূষণ একটু সরে দাঁড়ায়।

গিরিশ আবার তার গা ঘেঁষে আসে, কাঁপা গলায় বলে, কিছু হয়নি। কথা বলুন না, চুপচাপ ভালো লাগছে না, গল্পটল্প করুন না একটু?

ভূষণ অবাক হয়ে বলে, গল্প? গল্প করব কী মশায়, এই কী আপনার গল্প করার সময়? উপায় ঠাওরান একটা কিছু? অন্ধকারে এখানে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ভূতের মতো?—

আঃ, কেন ওসব নাম করছেন সন্ধের পর!

গিরিশের শিহরণটা ভূষণ টের পায়। একটু খুশিও সম্ভবত হয়। গিরিশ যে তাকে কীরকম ভীরু কাপুরুষ মনে করেছে এতক্ষণ, টের পেতে তার তো বাকি থাকেনি। একটু হেসে ভণিতা করে সে বলতে আরম্ভ করে, ভূত বিশ্বাস করেন বুঝি আপনি? তা, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বাস জাগে বইকি। ওদিকটাতে আবার শ্মশান— সকালে আমি যখন যাচ্ছিলাম, দেখি দুদুটো মড়া পোড়াচ্ছে একসঙ্গে। তবে হ্যাঁ, ভূত প্রেত দৈত্যদানোকে আমি একদম কেয়ার করি না। একবার কী হয়েছিল জানেন—

গিরিশ তার সাহসের গল্পগুলি নির্বিবাদেই ভূষণকে শোনাতে পেরেছিল, ভূষণের ভূতের গল্প ভূমিকার বেশি এগোতে পারে না। গিরিশ কাঁপতে কাঁপতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, দোহাই দাদা, থামুন। আমায় মেরে আপনার লাভ নেই। চাদ্দিকে বাগদিদের বস্তি, ওদের সব কটা ডাকাত, দলবেঁধে যদি আসে—

তখন ভূষণ বলে, ভয় করবেন না দাদা, ভয়ের কিছু নেই। জানেন তো ভয় না পেলে ভূত প্রেম মানুষের কিছু করতে পারে না, আমি যখন সঙ্গে আছি—

গিরিশও জবাবে বলে, কি জানেন, ওরা হল ছোট লোক, পেটের জ্বালায় চুরি-ডাকাতি করে বটে, ভদ্রলোককেও ভয় করে খুব। সাহস করে ধমক দিলেই পালিয়ে যায়! আমি যখন সঙ্গে আছি—

দুজনের মধ্যে যেন একটা চরম বোঝাপড়া হয়ে যায়। চালার নিচে একটা চাটাই পাতা ছিল, পাশাপাশি বসে দুজনেই দুটো বিড়ি ধরিয়ে পরমাত্মীয়ের মতো পরামর্শ আরম্ভ করে। পরামর্শের আর কী আছে? কাছেই যখন শ্মশান এবং ডাকাতদের বস্তি, এখানে বসে থাকার প্রশ্নই আর ওঠে না। এখন শুধু ঠিক করা এগোবে না পিছোবে। ফিরে গেলে আবার সেই জঙ্গল আর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, হাঁটতেও হবে অনেক বেশি। এগিয়ে গেলে রাস্তা ভালো, স্টেশনও অনেকটা কাছে, কেবল নদীটা সাঁতরে পার হতে হবে। নদীতে ঢেউ নেই, বেশি স্রোত নেই, সঙ্গে মালপত্র নেই, গরমের সময় নদীর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে স্নান করার আরামও আছে। সুতরাং দু-একখানা বাড়তি কাপড় আর দু-একটি খুঁটিনাটি জিনিসের গামছা বাঁধা ছোট ছোট দুটি পুঁটলি দুজনের সঙ্গে ছিল। গামছা পর পরনের জামা কাপড় আর পায়ের জুতো নিয়ে দুজনে সবে আবার শক্ত করে দুটি পুঁটলি বেঁধেছে, এমনসময় এল আমাদের তিন নম্বর সাহসী। যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি মোটা গলার আওয়াজ। কথা শুনেই গিরিশ আর ভূষণ দুজনের বুকের মধ্যেই ধড়াস করে ওঠে। ব্যাপার শুনে আগন্তুক বলে, কিন্তু সাঁতরে নদী পার হয়ে লাভ কী হবে মশায়? ট্রেন আজ আর ধরতে পারবেন না। তার চেয়ে এখানেই রাতটা কাটিয়ে যান, স্টেশনে এমটি একটা চালাও পাবেন না, জল বৃষ্টি নামলে ভিজতে হবে।

দুজনে তা জানে। স্টেশন নামেই স্টেশন, আসলে সেটা লেভেল ক্রসিং ছাড়া কিছু নয়— প্যাসেঞ্জার ওঠানো নামানোর দরকার না থাকলে ট্রেন দাঁড়ায় না পর্যন্ত। তবু একজন জমাদার তো আছে, তার ঘরটা তো আছে।

গিরিশ সবিনয়ে বলে, কি জানেন, পাশেই শ্মশান কিনা, এখানে রাত কাটানো—

ভূষণও সবিনয়েই বলে, চাদ্দিকে বাগদিদের বস্তি, ওরা সব চুরি ডাকাতি করে খায়, একবার টের পেলে—

শুনে আগন্তুকের সে কী হাসি! হাসি শুনে গিরিশ আর ভূষণের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গিরিশ ভাবে, কে জানে মানুষের মূর্তি ধরে এ আবার কে এল! আর ভূষণ ভাবে, এ লোকটা ডাকাত না হয়েই যায় না।

হাসি কমলে আগন্তুক বলে, খুব সাহসী তো আপনারা! করুন যা খুশি আপনাদের, আমি এইখানেই রইলাম। রাতদুপুরে নদীতে সাঁতার দেবার শখ নেই। বলে আগন্তুক চাটাইয়ে জেঁকে বসল এবং গিরিশ ও ভূষণ নেমে গেল নদীতে।

কিছু পয়সা হাতে পেয়ে লেভেল-ক্রসিং-স্টেশনের জমাদার দুজনকে কেবল আশ্রয় নয়, বেশি করে রুটি সেঁকে রুটির ভাগও দিল। তবে রাতটা কাটাতে হলে পুরু করে বিছানো খড়ের বিছানায়।

সকাল সাতটায় গাড়ি। গাড়ি আসবার প্রায় আধঘণ্টা আগে খেয়াঘাটের সেই আগন্তুক এসে উপস্থিত। দুজনকেই দেখেই একমুখ হেসে বলল, দেখছেন তো, ভূতেও ধরেনি, ডাকাতেও মারেনি।

ভয় পাওয়ার কোনো কারণ না থাকলে, বিশেষত সকাল বেলার উজ্জ্বল আলোতে মানুষের নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না, গত রাত্রেই কোনো অবস্থায় ভয় পেয়ে তার হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল! ভয় পাওয়ার ঘটনাটা মনে হয় যেন স্বপ্ন! তাই সাক্ষীকে সামনে হাজির দেখলে বড়োই লজ্জা বোধ হয়। পরস্পরের কাছে গিরিশ আর ভূষণের কোনো লজ্জা ছিল না, দুজনেই দুজনের সাহস আর ভীরুতার পরিচয় পেয়ে গেছে। কিন্তু এ লোকটির কথা আলাদা।

লোকটিও যেন তাদের পেয়ে বসল, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়বে না। সেই সে গল্প জুড়ে দিল, গাড়ি এলে দুজনে যে কামরায় উঠল সে-ও সেই কামরাতে উঠে জের টেনে চলল সেই গল্পের। লোকটিও কলকাতায় যাচ্ছে, নাম তার বীরেন্দ্র।

প্রথমটা গিরিশ আর ভূষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেও, ক্রমে ক্রমে যে ভাবনা কিন্তু কেটে গেল। প্রথম প্রথম দু-একবার একটু খোঁচা দিয়ে ঠাট্টা তামাশা করলে দেখা গেল বীরেন্দ্র লোকটি ভালো। ভালো করে পরিচয় হবার পর আর একটিবারও সে রাত্রের ঘটনার উল্লেখ করল না। সন্ধ্যার পর তিন জনে যখন কলকাতা পৌঁছাল তাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে।

তিনজনেই কলকাতা এসেছে কাজে, দু-চার দিন থেকে কাজ সেরে আর চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বায়স্কোপ দেখে ফিরে যাবে। তিনজনে একই হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিল। ঠিক হল, দেখার কাজগুলোও তিনজনে একসঙ্গেই সারবে, তারপর তিনজনে ফিরেও যাবে একসঙ্গে।

কোথা দিয়ে কটা দিন যে হইচই করে কেটে গেল! যাওয়ার আগের দিন সকালে বীরেন্দ্র হঠাৎ বলল, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম এসব তো অনেকবার দেখলাম, একটা জিনিস কিন্তু দেখা হল না— মনুমেন্ট।

গিরিশ বলল, ও তো যেতে আসতে সর্বদাই দেখছি।

উঁহু, বাইরে থেকে নয়, ভেতরে ঢুকে ওপরে উঠে দেখার কথা বলছি।

উঠতে দেয় নাকি?

দেয় বইকি। লালবাজারে একটা দরখাস্ত করতে হয়।

শুনে তিনজনেরই মনে হল, বাস্তবিক, এতবার কলকাতা যাতায়াত করেছে কিন্তু মনুমেন্টের ওপরে তো ওঠা হয়নি! সেইদিন চিড়িয়াখানা যাবার পথে তিনজনে লালবাজারে আবেদন পত্র দাখিল করে দিল। হাঙ্গামা হল কম নয়, তারপর আবেদন মঞ্জুর করে তাদের জানানো হল, পরদিন সকাল আটটার সময় মনুমেন্টের নিচে পুলিশ চাবি নিয়ে হাজির থাকবে।

তিনজনের উৎসাহের সীমা নেই, পরদিন সাতটা বাজতে না বাজতে সকলে মিলে মনুমেন্টের নিচে গিয়ে হাজির। একঘণ্টা বসে থাকার পর একজন পুলিশ এসে গেট খুলে দিল।

ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে দেয়ালের গায়ে ফোকর দিয়ে অল্প অল্প একটু আলো আসছে। বীরেন্দ্র আগে আগে উঠতে থাকে,

তারপর গিরিশ আর ভূষণ। সঙ্গী দুজনকে পুরানো কথা তুলে একটু খোঁচাবার সাধ বীরেন্দ্রের কেন জাগে বলা কঠিন, যেখানে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার সেখানে একটু থেকে সে তামাশা করে বলে, কি মশায়, ভয়টয় করছে না তো আপনাদের!

গিরিশ আর ভূষণ কী আর বলবে, নীরবেই তামাশাটা হজম করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়িরও কী শেষ আছে, মনে হয় পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গেই বুঝি উঠছে তিনজনে। ওপরে রেলিং ঘেরা স্থানে তারা যখন গিয়ে দাঁড়ায়, তিনজনেই কামারের হাপরের মতো পাচ্ছে।

কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে গিরিশ আর ভূষণ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়, মনে হয় সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রম সত্যই সার্থক হল। দুজনে হাঁ করে নিচে শহরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাড়ি-ঘর, ট্রাম-বাস, সব ছোটো হয়ে গেছে, মানুষগুলিকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে—

অস্ফুট আর্তনাদের মতো আওয়াজ শুনে দুজনেই চমকে বীরেন্দ্রের দিকে তাকায়। দুহাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ে বীরেন্দ্র থরথর করে কাঁপছে।

ধরুন মশায়, একটু ধরুন আমাকে। মাথা ঘুরে পড়ে যাব যে, আমায় ধরুন শিগগির।

গিরিশ বলে, পড়বেন কী করে, রেলিং রয়েছে তো।

তবু ধরুন, রেলিং ভেঙে যদি পড়ে যায়!

দুজনে তাকে ধরে, সান্ত্বনা দিয়ে বলে, একটু সামলে নিন, ভয় পাবার কী আছে!

বীরেন্দ্র প্রায় কাঁদতে কাঁদতে মিনতি জানায়, এইবার ধরাধরি করে আমায় নামিয়ে নিয়ে চলুন। এখন যদি ভূমিকম্প হয়।

গিরিশ আর ভূষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

অক্টোবর ১৯৪০

তৈলচিত্রের ভূত

একদিন সকালবেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, বোসো, নগেন।

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে লিখে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

বসতে বললাম যে? এরকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কিনা, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কীসের!

গুরুতর কিছু যে ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনোদিন ছিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তা-ও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ডাক্তার-কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কী পাগল হয়ে গেছি?

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কী মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে!

তবে— দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা ডাক্তার-কাকা, প্রেতাত্মা আছে?

প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।

নেই? তবে—

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাসী কাহিনী। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এইরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল— শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ একসময় তার মনে হল, সারাজীবন তো ভক্তিশ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্যসত্যই ভক্তিশ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে-জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্পদামি আর অনেকদিনের পুরানো, ভিতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানারকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তাছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে— কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বার-তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনও ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারও ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালেনি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এবাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে 'আমায় ক্ষমা করো মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ

করেছে— বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফোরিত।

তারপর?

নগেন ঢোঁক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার-কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আগে কোনোদিন ফিট হয়েছিল নগেন?

নগেন মাথা নেড়ে বলল, ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয়নি। আপনি ভুল করছেন ডাক্তার-কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি তাকে মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন, আগে, তাহলে বুঝতে পারবেন।

সমস্ত সকালটা নগনে মরার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসায় ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এখন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা! ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রমাণ করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নীচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে! দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃদকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই-বা মানুষের চলে কী করে? খানিক পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ;

চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন অস্থির অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলো থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কী জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার-কাকা।

অজ্ঞান হয়ে গেলে?

না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাইনি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার-কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কীসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।

পরাশর ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?

কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। কোনোদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনোদিন জ্ঞান থাকে।

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, আমি কী করব ডাক্তার-কাকা? এমন করে কদিন চলবে? মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথা ভাবি।

পরাশর ডাক্তার বললেন, তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।

একটু থেমে আবার বললেন, ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরানো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব

আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কী ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনী শুনিয়েছে, সারাদিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেননি। এক দিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়— নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের উপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, আলোটা জ্বালব ডাক্তার-কাকা?

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন।— না।

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমেনি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শুধু।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার-কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই—

নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। ভয় পেয়ে গেছেন?

পরাশর ডাক্তারকে স্বীকার করতে হল একটু ভয় তিনি সত্যিই পেয়ে গেছেন। তার বৈজ্ঞানিক মন এতদিন পরে একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করল যে, মানুষের মন চিরদিনই মানুষের মন। যুক্তি-তর্ক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে মানুষ ভয়কে জয় করতে পারে না। দেহে আঘাত লাগলে যেমন বেদনা বোধ হবেই, তেমনি উপযুক্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে মানুষকে ভয় পেতেই হবে।

যাই হোক, এতদিন যদি তিনি ভুল বিশ্বাস পোষণ করে এসে থাকেন, আজ ছবির ভূতের কল্যাণে সে ভুল তার ভেঙে যাবে। তাতে ক্ষতি কি? দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পিছন দিকে দুপা ছিটকে গিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিলে।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিটপাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্‌ব, ফিট করা হয়েছে?

আমি কী জানি! ছ-মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখনো তেমনি অবস্থাতেই আছে।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোন্ দেশী ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছেন।

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেকদিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বের করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।

হ্যাঁ। সে এবছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেবে কেন?

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এখবরটা যদি আগে দিতে আমায়— নগেন সংশয়ভরে বলল, কিন্তু ডাক্তার-কাকা—

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না,— ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হত। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে, আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সেসময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই—

পরাশর ডাক্তার চুর করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসাবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পাস-ফেল

নিখিলের জীবনে মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। কী করবে নিখিল, ভেবে পায় না আর রাগে দুঃখে অভিমানে হতাশায় তার দুচোখে জল এসে পড়ে। পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসছে, এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করা দরকার, কিন্তু এরকম মানসিক অবস্থায় কেউ পড়াশোনায় মন দিতে পারে? পরীক্ষাই হয়তো এবার তার দেওয়া হবে না।

তিন দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফিজ দাখিল করতে হবে। কোথায় পাবে সে ফি-এর টাকা?

দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে কোনো রকমে ঘাড়-গুঁজে থেকে আরও কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের দয়ায় কোনো রকমে এতদিন সে পড়ার খরচটা চালিয়ে এসেছে। আত্মীয়টি ইচ্ছা করলে পরীক্ষার জন্য দরকারি টাকাটা অবশ্য দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন একসঙ্গে অত টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিখিলকে যে সিঁড়ির ঘরটাতে থাকতে দেন আর দুবেলা খেতে দেন, তাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিখিল দরবার করেছে। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের অক্ষমতা জানিয়েছেন আর সেই সঙ্গে মামা বলেছেন কাকার কাছে যেতে, কাকা বলেছেন পিসের কাছে যেতে।

নিখিলের ভাগ্যটাই খারাপ। তার যে-কজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় আছেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের প্রত্যেকের মনে একসঙ্গে এই ধারণার উদয় হয়েছে যে, নিখিলের পরীক্ষার খরচ জোগানের দায়িত্বটা অন্যজন নেবেন না কেন?

টাকা না দিয়েও যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য নিখিল চেষ্টা করেছিল, তারও কোনো ফল হয়নি।

এখন উপায়? আর তিনটি দিন মাত্র হাতে আছে, তারপর টাকা জোগাড় করতে পারলেও কিছু লাভ হবে না। কত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে, প্রাণপণ চেষ্টায় কতশত কষ্ট অতিক্রম করে এতদিন সে পড়া চালিয়ে এসেছে— এখন তীরে এসে তরি ডুবল।

কেবল একজনের কাছে চেষ্টা করা বাকি আছে— সতীশবাবু। নিখিলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, নিখিলের বাপ বেঁচে থাকতে দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিল মাত্র। কিন্তু সতীশবাবুর কাছে আবেদন জানিয়ে কোনো লাভ হবে এ ভরসা নিখিলের নেই। ভদ্রলোক যেমন ধনী তেমনি কৃপণ,— বোধহয় আরও বেশি নিষ্ঠুর। একবার দুটি টাকা সাহায্য চাইতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কতখানি আশা করা যায় সে বিষয়ে নিখিল পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে এসেছে।

তবু, আর কোনো দিকে কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে নিখিলের আজ মনে হতে লাগল, সতীশবাবু কিছুই করবেন না জানা কথা, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ

কি? আগেরবার সে যখন গিয়েছিল, হয়তো তখন সতীশবাবুর মেজাজ ভালো ছিল না। মনটা ভালো থাকলে হয়তো নিজের হাজার হাজার বাড়তি টাকা থেকে নিখিলের পরীক্ষার খরচটা দান করে ফেলবার উদারতা তাঁর জাগতে পারে।

অনেকক্ষণ ভেবে, অনেক ইতস্তত করে, বেলা প্রায় নটার সময় নিখিল সতীশবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ির গেটে গিয়ে হাজির হল।

দোতলার একটি ছোটো ঘরে সতীশবাবু সকালবেলা নিজের কাজকর্ম করেন, হিসাবপত্র মেলান। এ বাড়িতে নিখিলকে সবাই চেনে, যদিও বড়লোকের বাড়িতে আসবার ভরসা হয় তার কদাচিৎ। দু-একজন শুধু জিজ্ঞাসা করল সে কেমন আছে। আর কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। নিখিল উপরে গিয়ে সতীশবাবুর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল।

তখন তার বুক টিপটিপ করছে। সতীশবাবু তার শেষ আশা, সতীশবাবু যদি সাহায্য করতে অস্বীকার করেন তবে তার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। ঘরে ঢুকে সতীশবাবুকে না দেখে এক মুহূর্তের জন্য নিখিল একটু স্বস্তি বোধ করল। পরক্ষণে তার বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল শতগুণ।

টেবিলে খাতা আর কাগজপত্রের পাশে একতাড়া নোট পড়ে আছে।

ব্যাপারটা অনুমান করতে তার দেরি হল না। হিসাব মেলাতে মেলাতে সতীশবাবু দু-এক মিনিটের জন্য কোনো দরকারে উঠে গেছেন— এখনই ফিরে আসবেন।

কিন্তু তাঁর ফিরে আসার আগেই নিখিল কয়েকটি নোট তুলে নিয়ে অনায়াসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

নিখিলের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, মাথা ঘুরে উঠল। মাথার মধ্যে কেবল একটি চিন্তা পাক খেতে লাগল যে, এ জগতে তার আপনজন কেউ নেই, চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে না পারলে তার কোনো উপায় নেই। সতীশবাবুর এত টাকা আছে, চাইলে সতীশবাবু একটা পয়সা দেবেন না, এরকম অবস্থায় তার দরকারি কয়েকটা টাকা টেবিলের নোটের তাড়া থেকে তুলে নিলে কী আসে যায়? এরকম নিরুপায় অবস্থায় একটিবার, জীবনে শুধু একটিবার, চুরি করা এমন কী মহাপাপ?

চেয়ে সতীশবাবুর কাছে সাহায্য পাবার সামান্য একটু ভরসা থাকলে, কী কাজ সে করতে যাচ্ছে ভালো করে ভেবে দেখবার সময় পেলে নিখিল হয়তো প্রলোভনটা জয় করতে পারত। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের বেশি ভাববার সময় ছিল না। কেবল তার দরকার যাতে মিটবে অনেকগুলি নোট থেকে কেবল সেই কখানা নোট নিয়ে নিখিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রায় সেই সময় সতীশবাবু সেই ঘরে বসে কাজ করছিলেন, ভেজানো দরজা খুলে চোরের মতো নিখিল ঘরে ঢুকল।

সতীশবাবু গম্ভীর মুখে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, কী চাই?

নিখিল কথা বলতে পারল না। নীরবে কয়েকখানা নোট সতীশবাবুর সামনে রেখে দিল।

কীসের টাকা?

কাল চুরি করেছিলাম।

তা জানি। ফেরত দিচ্ছ কেন?

নিখিল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কী বলবার আছে তার?

সতীশবাবু খানিকক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি যখন কথা বললেন, মনে হল গলাটা যেন অনেক কোমল হয়ে এসেছে।

টাকাটা কেন চুরি করেছিলে নিখিল?

নিখিল জড়িয়ে জড়িয়ে কোনোরকমে মোটামুটি ব্যাপারটা বলল। প্রতি মুহূর্তে তার ইচ্ছা করছিল, বিকট একটা আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে কোনো বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কোথা থেকে পরীক্ষার টাকা পেয়েছ?

না।

তবে টাকাটা যে ফেরত দিচ্ছ?

পরীক্ষা দেব না।

সতীশবাবু আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন।

আমার কাছে না চেয়ে চুরি করলে কেন?

নিখিল চুপ।

চাইলে আমি দেব না ভেবেছিলে, না?

নিখিল এবারও চুপ।

কিন্তু দ্যাখো, এবার না চাইতেই দিচ্ছি নিখিল। দান করছি ভেবো না কিন্তু, ধার দিচ্ছি। এবার থেকে আমি তোমার সব পড়ার খরচ চালাব, তুমি আমার এখানে থাকবে। পড়াশোনা শেষ হলে তোমায় আমার একটা কাজে লাগিয়ে তোমার মাইনে থেকে সব শোধ করে নেব। কেমন?

নিখিল সজল চোখ বুজে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

এপ্রিল ১৩৪১

শৈশব-স্মৃতি যাচাই করার গল্প

কত ছেলেবেলার কথা মনে থাকে মানুষের?

আমি অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে, নানা রকম পরীক্ষা আর গবেষণা করে দেখেছি, এ-প্রশ্নের একমাত্র জবাব— যার যেমন মনে থাকে। একজনের মনে যে বয়সের অনেক ছোটো বড়ো ঘটনা স্পষ্ট ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে, আরেকজনের মনে হয়তো সেই বয়সটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা, একটি বিচ্ছিন্ন স্মৃতির ক্ষীণ একটি আলোর রেখাও নেই। অনেকে আবার করে কী জানো, বড়ো হয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিজের ছেলেবেলার গল্প শুনে মনের মধ্যে কল্পনায় কতকগুলি ছবি এঁকে নেয়। তারপর আরও বড়ো হয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যায় যে কথাটা পরের মুখ থেকে শুনেছিল। তখন সে বিশ্বাস করে বসে যে, মনের ওই ছবিগুলি তার নিজেরই মনে করে রাখা শৈশব-স্মৃতি।

কেবল বড়োদের কাছে ছেলেবেলার গল্প শুনেই নয়, নিজে নিজে আমরা যে সব কল্পনা বানিয়ে সুখ পাই, তার দুটো একটা মনের মধ্যে আটকে থেকে যায় আর বড়ো হয়ে ধারণা জন্মে যে ব্যাপারটা খুব শৈশবে ঘটেছিল।

এই জন্য মানুষকে শুধু, ওহে, তোমার কত ছেলেবেলার কথা মনে আছে বলো তো শুনি? জিজ্ঞাসা করে আর তার জবাব শুনেই ঠিক করে বলা যায় না, সত্যি সত্যি কত ছেলেবেলার কথা তার মনে আছে। সত্য নির্ণয়ের জন্য অনেক কৌশল খাটাতে হয়, কাজটাও বড়ো কঠিন। এমন কথা যদি কারও মনে থাকে যা সে ছাড়া আর কারও জানা সম্ভব ছিল না এবং সেই সঙ্গে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে কথাটা মনগড়া কল্পনা নয়, তা হলে বলা চলে কত ছোটোবেলার কথা তার মনে আছে।

এ বিষয়ে পরীক্ষা করে সত্য নির্ণয়ের জন্য নিজের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর কাকে পাওয়া যাবে? আমি তাই আমার অনেকগুলি শৈশব-স্মৃতিকে ভালো করে যাচাই করে দেখেছি। দুটি জায়গায় দুটি যাচাইয়ের গল্প তোমাদের বলি। মনে রেখো এ কিন্তু শৈশব-স্মৃতির গল্প নয়, শৈশব-স্মৃতি যাচাইয়ের গল্প।

একটা স্থান, পশ্চিমবঙ্গের হলদি নদীর ধারে একটি গ্রাম, আরেকটি স্থান, পূর্ববঙ্গের পদ্মানদীর ওপারের একটি গ্রাম। প্রথম গ্রামটিতে স্মৃতি অর্জন করেছিলাম চার বছর বয়সে, দ্বিতীয় গ্রামটিতে স্মৃতি অর্জনের সময় বয়স আমার তিন বছরও পূর্ণ হয়নি।

হলদি নদীর ধারের আরও দুটি গ্রামের স্মৃতি মনে জমে আছে, ছ-মাস আট মাস করে ছিলাম গ্রামগুলিতে। স্মৃতিগুলি অনেকটা পরিষ্কার, তাই প্রথম যাচাই করতে গেলাম হলদি নদীর ধারে, পদ্মাকে রাখলাম পরের জন্য। ভাবলাম, শৈশবকে অতিক্রম করেছি যে ভাবে, কম বয়স থেকে বেশি বয়সে এগিয়ে, স্মৃতি যাচাই করব তার উলটোভাবে, বেশি বয়স থেকে কম বয়সে গিয়ে।

স্মৃতিটা এই। নদী থেকে শখানেক গজ তফাতে পাশাপাশি দুটি খাল কাটা আছে। একটিতে লক আছে, জল তার লোনা কিন্তু পরিষ্কার এবং নদীর জোয়ার-ভাটাকে অগ্রাহ্য করে ক্যানালে জল সব সময়েই ভর্তি থাকে। অন্যটিতে লক নেই, জোয়ারের সময় ভরে যায় লাল কর্দমাক্ত জলে, ভাটার সময় মাঝখানে আধ হাত জল থাকে কিনা সন্দেহ। দুপাশে লাল এঁটেল মাটির স্তর— পাঁকের মতো। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য লাল লাল কাঁকড়া। কাঁকড়া ধরে ধরে একটা কাচের বয়েমে ভরে রাখতে গিয়ে আমি কোমর পর্যন্ত নরম পাঁকে ডুবে গিয়েছি। না পারি এদিকে সরতে, না পারি ওদিকে সরতে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। তিন-চার হাত লম্বা একটা বাঁশ আমি প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছি। তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই।

কিন্তু কী ঘটেছিল? কে আমায় আঠার মতো নরম এঁটেল মাটির সমাধি থেকে রক্ষা করেছিল? কেঁদেছিলাম কিনা, আর্তনাদ করেছিলাম কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু যন্ত্রণা যে অনুভব করেছিলাম বীভৎস, তা স্পষ্টই মনে আছে। আজও আমার সেই অসহায় অবস্থার অকথ্য মানসিক কষ্টভোগের কথা মনে করলে বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে থাকে।

ঘটনাটি কী আমার কল্পনা? বড়ো হয়ে বাড়ির সকলকে প্রশ্ন করেছি, তারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। অপর খালটিতে আমি যে জলে ডুবে মরতে বসেছিলাম তার একটা গল্প এরা আমাকে শোনান, কিন্তু এদিকের খালে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে আমি কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম বলে তারা শোনেননি।

ডুবে মরবার ঘটনাটা আমারও মনে আছে। লকের কাছে ওভারসিয়ার বাবুর একটা নৌকা বাঁধা থাকত। মাঝে মাঝে আমি আর সেজদা চুপিচুপি নৌকায় খেলা করতে যেতাম। সামনে খাড়া হয়ে থাকত দুর্গপ্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য লকের সিমেন্ট-বাঁধানো একটা অংশ, মৃদু বাতাসে ক্যানেলের জল তাতে ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে। জলের নিচে রাশি রাশি গাঢ় সবুজ শ্যাওলা আর শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ— উঁকি দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন রহস্যের মায়াপুরী! একদিন আমি একটা লগি তুলে নিয়ে লকের সিমেন্ট-বাঁধানো অংশে ঠেলা দিয়ে নৌকাটা একটু সরিয়ে দিতে গেলাম। লগি গেল পিছলে। সঙ্গে সঙ্গে আমি টুব করে সোজা তলিয়ে গেলাম জলের নিচে সবুজ রহস্যের রাজ্যে!

যে বয়সের মানুষই হোক, জলে ডুবে গেলে একবার ভেসে উঠবেই। আমিও ভেসে উঠেছিলাম এবং নাকি হাতও ছুড়েছিলাম। সেজদা নৌকার ধারে ঝুঁকে আমি যেখানে তলিয়ে গিয়েছিলাম সেখানটা অবাক হয়ে দেখছিল। কে তাকে বুদ্ধি দিল কে জানে, খপ করে আমার একটা হাত সে ধরে ফেলল। তারপর এল লকের একজন খালাসি। আমায় নৌকায় টেনে তুলল সেই এবং ব্যাপারটা বলবার সময় এইখানে বাড়ির লোকেরা ভারী আমোদ অনুভব করেন— টেনে তুলে আমার গালে ঠাস করে বসিয়ে দিল এক চড়!

এই ঘটনার কথা মনে আছে, অন্য ঘটনাটি কারও মনে নেই কেন? আমি কী নিজেই কোনো রকমে শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং মার ও বকুনির ভয়ে কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করিনি? কিন্তু কাচের বয়েমে লাল কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কোমর পর্যন্ত এঁটেল কাদায় ডুবে যাওয়া, একখণ্ড বাঁশ আঁকড়ে ধরা— এসব কথা যদি স্পষ্ট মনে থাকে আমার, পরে কী হল আবছাভাবেও তা মনে নেই কেন?

এরকম কত প্রশ্ন যে আমি নিজেকে করেছি, তার সংখ্যা হয় না। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সমস্যার কথা ভেবেই কাটিয়ে দিয়েছি। মানুষের জীবনে কত বড়ো বড়ো সমস্যা থাকে, কত বিরাট রহস্য কত রূপে দেখা দেয়, দুদিন পরে মানুষ সব ভুলে যায়, আর ওসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু আমার ভাবতে ভাবতে এমন হয়েছিল যে, আমার শৈশবের এই ঘটনাটি সত্য অথবা কল্পনা, সত্য হলে কী এর পরিণতি, আর কল্পনা হলে কেন এ কল্পনা আমার মনে এমনভাবে দাগ কেটে স্থায়ী হয়ে রইল, জানবার জন্য আমি মাঝে মাঝে একরকম ছটফট করতাম। এ থেকেই বুঝতে পারবে বড়ো হয়ে হলদি নদীর ধারে গ্রামটিতে যখন গেলাম, মনে মনে আমি কতখানি আগ্রহ পোষণ করছি! জায়গাটির যে সব ছবি মনে ছিল, তার অনেকগুলিই মিলে গেল। তবে ইতিমধ্যে প্রায় কুড়ি বছর সময় কেটে গেছে, স্থানটিতে যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ক্যানালের পাশে মাঠের মধ্যে বড়ো একটা বটগাছ ছিল, সেটা খুঁজে পেলাম। কে যেন গোড়াটা পাকা বাঁধিয়ে দিয়েছে। ক্যানালের তীরেই একটা পুরানো মরচে ধরা ট্যাংক পড়ে থাকত যার মধ্যে ঢুকে ঢুকে অনেক খেলা করেছি, সেটা খুঁজে পেলাম না।

নদী নাকি অনেকটা এদিকে সরে এসেছে। ক্যানেল অথবা খালের কী পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে বলতে পারব না, চার বছর বয়সের স্মৃতি অত নিখুঁতও নয়, ব্যাপকও নয়। তবে একটা বিষয় লক্ষ করলাম যে, এপাশের খালটিকে আমি অবাধ বলে জানতাম, আসলে তা নয়। একটি ক্যানেলে লক বসানো আছে নদীর খুব কাছে এবং এই লকের মারফত ক্যানাল ও নদীর মধ্যে নৌকা চলাচল করতে পারে। অপর ক্যানেলে আরও খানিকটা ভিতরের দিকে স্থায়ী লক বসানো— বাঁধই বলা যায়, শুধু চাষের জন্য জল আটকে রাখবার উদ্দেশ্যে। বাঁধ আর নদীর মধ্যে আলের যেটুকু অংশ তাতে নদী জোয়ার ভাটাতে যাতায়াত করে। এবং ভাটার সময় তেমনি এঁটেল লাল মাটির কাদায় অসংখ্য লাল কাঁকড়া দেখা দেয়।

দুটি খালের মাঝখানে ভূখণ্ডে যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম, আজও সে বাড়িটা আছে, যদিও আমার কল্পনার সঙ্গে বাড়িটার আজ অনেক অমিল। বাড়ির সঙ্গে কোনাকুনি রেখা টেনে, যেখানে পাঁকে ডুবে গিয়েছিলাম কিনা যাচাই করতে এসেছি খালের সেইখানে, খালের ধারে একটা অজানা গাছের নিচের কাঠের একটা গুঁড়িতে বসে প্রায় সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম। আমি নৌকায় এসেছি, নৌকা বাঁধা আছে অপর ক্যানালটিতে। মাঝখানে একবার কেবল নৌকায় গিয়ে স্নানাহার সেরে এসেছি, তারপর আর এই খালের তীর ছেড়ে নড়ি নি।

অল্প দূরে ছোটো একটি টিনের চালা আর দরমার বেড়ার বাড়ি। বাড়ির ছেলেবুড়ো যে আমাকে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করছে, আমি তা অনেকবার অনুভব করেছি। ছেঁড়া বিবর্ণ সবুজ রঙের একটা কোট গায়ে দিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ আমাকে দুএকটি প্রশ্নও করে গেছে। আমল দিলে লোকটি হয়তো আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করত, অনেক কথার জবাবও দিত খুশি হয়ে। কিন্তু আমার তখন মানুষের সঙ্গ ভালো লাগছিল না।

আমার বুঝতে বাকি থাকেনি, শৈশব-স্মৃতির যে রহস্য আমাকে এতকাল পীড়ন করে এসেছে কোনোদিন আমি তার মর্মকথা আবিষ্কার করতে পারব না। তবু খালের ধার থেকে সরে যাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। হলদি নদীর এক সংকীর্ণ কাদা-ভরা

কাঁকড়া-বহুল খাল আমাকে যেন কী এক জাদুমন্ত্রে মোহাচ্ছন্ন করে তার তীরে জোর করে সারাটা দিন বসিয়ে রাখল। কত চিন্তা মনে এল, কত বিচিত্র অনুভূতি, চেতন ও অচেতনের সীমারেখার এপারে ওপারে আনাগোনা করল— সন্ধ্যায় মনে হল সারাদিন যেন জেগে স্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্ন নয়, তবু একটা দুঃসহ ভার মনের মধ্যে চেপে রয়েছে।

চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল; নিঃশ্বাস ফেলে একরকম জোর করে নৌকায় ফিরে গেলাম। ঠিক ছিল সন্ধ্যার আগেই নৌকা ছাড়া হবে— কিন্তু খালের ধার থেকে চলে এলেও একেবারে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছা হল না। ভাবলাম, আজ রাত্রিটা যাক, কাল দিনের বেলা একটু খোঁজ খবর করে ফিরে যাব।

শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম খুবই, কিন্তু শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম— ঘুম এল না। হঠাৎ আমার মনে হল, সমস্যার সমাধানে একটা উপায় তো আমি অবলম্বন করে দেখিনি! খালের কাদায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করে তো দেখিনি, সেবার শেষের দিকে কী ঘটেছিল যে কথা মনে পড়ে কিনা! অনুরূপ অবস্থা বা আবেষ্টনী অনেক সময় অনেক ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে উপায়টা যে আমার বিশেষ কাজে লাগবে না, এ আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কেরই একটা কল্পনা মাত্র, আমি তা সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম। তবু, পরদিন সকালে পরীক্ষাটা করে দেখব স্থির করা মাত্র আমার সমস্ত ছটফটানি যেন কমে গেল, অল্পক্ষণের মধ্যে শান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর ধীরে ধীরে অনুভব করলাম, অতি কোমল চটচটে ভিজে কাদার মধ্যে শুয়ে আছি, দুই কাঁধের নিচে হাত দিয়ে কে যেন আমায় ঝাঁকুনি দিতে দিতে ডাকছে, বাবু! বাবু!

পরিষ্কার জ্যোৎস্না চারিদিকে। খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থেকে চিনতে পারলাম, এ সেই টিনের চাল আর দরমার বেড়া দেওয়া বাড়ির বিবর্ণ সবুজ কুর্তা পরা বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের সাহায্যে উঠে দাঁড়ালাম— কাদায় পা ঢুকে গেল প্রায় হাতখানেক।

পরিষ্কার ক্যানেলের জলে স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে নৌকায় সামনের দিকে বসলাম। ঘড়ি দেখলাম, রাত প্রায় দেড়টা। জামাকাপড় দিয়েছিলাম আমারই, বুড়ো কিন্তু খালের কাদা সাফ করে পরিষ্কার হয়ে আসতে গিয়েছিল বাড়িতে। খানিক পরে রীতিমতো বাবুটি সেজে সে এল।

বাবু কী ঘুমের চোখে উঠে ঘুরে বেড়ান? তবে তো জলপথে যাতায়াত করাটা— আমি বললাম, না হে বাবু, ঘুমের মধ্যে উঠে ঘুরে বেড়ানোর রোগ আমার নেই। আজকেই প্রথম। তুমি টের পেলে কী করে?

বুড়ো মানুষ ঘুম তো আসে না চোখে। উঠে তামাক টানছি, দেখি আপনি সরাসরি খালের কাদার মধ্যে নেমে গেলেন। প্রথমটা বড়ো ভয় হয়েছিল বাবু—

বুড়ো কথা বলতে বড়ো ভালোবাসে। আমার আর ঘুমানোর সাধ ছিল না, ঢুলতে ঢুলতে তার বিস্তারিত কাহিনী শুনতে লাগলাম। প্রথমে তার বড়ো ভয় হয়েছিল, তারপর সাহস করে গিয়ে আমায় সে টেনে তোলে— মোট কথাটা এই। কিন্তু আরও কথা ছিল বুড়োর, যা শোনা মাত্র আমি হঠাৎ পূর্ণ মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠলাম।

— অনেক কাল আগের কথা, বাবু। ওই যে বাড়িটা দেখছেন হেথায়, ও বাড়িতে এক ভদ্দরলোক ছিলেন, তার ছোট্ট একটা ছেলে আপনার মতো খালের পাঁকে আটকে গিয়েছিল বাবু, আমি গিয়ে ছেলেটাকে তুলে আনি। বাপকে বলে দেব ভয়ে ছেলেটা আমাকে ঢের টাকা বকশিশ দিয়েছিল বাবু।

চোখের পলকে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। শৈশব-স্মৃতির সম্পূর্ণ পরিণতির সন্ধান পাই। শেষটুকু কেন ভুলে গিয়েছিলাম, তাও ক্রমে ক্রমে যেমন বুঝতে পারি, এই খালের কাদার আকর্ষণ এমনভাবে এতকাল আমায় কেন টেনেছে, তাও তেমনি বুঝতে পারি। এইখানে থাকবার সময় একবার বাবার অনেকগুলি টাকা চুরি গিয়েছিল, গল্প শুনেছি। বুড়োকে দেবার জন্য টাকা চুরি করেছিলাম আমি। খালের কাদার-অ্যাডভেঞ্চার আর টাকা চুরির কথা নিজের মধ্যে গোপন করে রাখতে গিয়ে তারপর থেকে পলে পলে আমি যন্ত্রণা সহ্য করেছি— চার বছর বয়সে এত বড়ো দুটি ব্যাপার কেউ হজম করতে পারে! তারপর খালের দুর্ঘটনার কথা আমার কাছে কেউ কোনোদিন উল্লেখও করে নি— কিন্তু রহস্যময় চুরির কথাটা অনেকবার উঠেছে। তখন আমার কাছে খাবার জিনিস চুরি আর টাকা চুরির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে যতই বুঝতে আরম্ভ করেছি, টাকা চুরি করাটা ঠিক কোন ধরনের ব্যাপার, ততই আমার ভিতরের যন্ত্রণা বেড়ে গিয়েছে। এরকম অবস্থায় প্রকৃতির একটা সহজ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে— বিস্মৃতি। আমি তাই কম কষ্টদায়ক স্মৃতিটা মনে রেখেছি, বেশি কষ্টদায়ক স্মৃতিটা তলিয়ে দিয়েছি মনের তলার গুদামখানায়, সমস্ত বিস্মৃত স্মৃতি যেখানে জমা থাকে।

পদ্মানদীর ওপারের গ্রামটির স্মৃতি কয়েকটি হল অতি তুচ্ছ বিষয়ের কয়েকখানা ছবি— কোনোটি খুব অস্পষ্ট, কোনোটি বেশ উজ্জ্বল। আগের কিছু মনে নেই, পরের কিছু মনে নেই, মনে কেবল আঁকা আছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের চিত্র— ঠিক ফটোর মতো। একটি ঘরের মাটির ভিত আর বেড়ার মধ্যে ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক, তার মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি হাত— কেন কে জানে! এই হল একটা ছবি। কে একজন লম্বা একটা বাঁশ দিয়ে গাছ থেকে আম পাড়ছেন, ডালপালার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি টুকটুকে একটি সিঁদুরে আম, ঠিক আমার ডাইনে কয়েক হাত তফাতে ছোটো একটি পুকুরের তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঘাট। এই হল আরেকটি ছবি। আরেকটি ছবি হল— একটা খাটের তলায় বসে খাটের তলার দিকের কাঠে নরুন দিয়ে গর্ত করছি।

যে উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলাম এবং যতদিন সেখানে ছিলাম তাতে আমার তখনকার বয়স নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সহজ ছিল। দুবছর কয়েক মাস মাত্র বয়সের জীবন থেকে কয়েকটি টুকরো চেতন মনে সঞ্চয় করে রেখেছি, এটুকু প্রমাণ করা নয় কেবল, শিশুচিত্তের কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই টুকরোগুলি বেছে নিয়েছি তাও আবিষ্কার করার সুযোগ পাব ভেবে, গভীর আগ্রহ বুকে নিয়েই স্মৃতি যাচাই করতে গেলাম। স্মৃতি-চিত্রের এমন কতকগুলি খুঁটিনাটি বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেল যে, বুঝতে পারলাম ছবিগুলি স্মৃতিই বটে, আমার তৈরি কল্পনা নয়।

কিন্তু সেকেলে খাটের নিচে নরুনের গর্ত খুঁজতে গিয়ে গেলাম ভড়কে। দাগ অনেক রকম আছে কিন্তু নরুনের দাগের চিহ্নও নেই। সে দাগ মিলিয়ে যাবার নয়, অন্য দাগের নীচে যে চাপা পড়বে তাও সম্ভব নয়। এই স্মৃতিটা কী তবে আমার কল্পনা? মনটা দমে গেল। যে সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে অন্য ছবিগুলিকে স্মৃতি বলে গ্রহণ করেছিলাম,

সেগুলিও যেন তুচ্ছ হয়ে গেল, মনে হল সবই আমার মনের ভুল। দামি আর প্রিয় কিছু হারিয়ে গেলে যেমন কষ্ট হয়, ফাঁকা ফাঁকা লাগে, সেইরকম একটা কষ্ট, একটা অভাব বোধ আমায় পীড়ন করতে লাগল।

পরদিন গেলাম মাইল দশেক উত্তরে বড়ো একটা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি। সমাদর করে খাটে বসিয়ে আত্মীয় বলতে লাগলেন, কতকাল পরে তোকে দেখলাম, কী লম্বা তালগাছ তুই হয়ে গেছিস! সেই একবার এসেছিলি যখন তুই এতটুকু শিশু— কী দুরন্তই ছিলি তুই সেই বয়সে। একদিন মোটে ছিলি, ঘরে প্রায় আগুন লাগিয়ে বসেছিলি।

মনে একটা খটকা লাগল। ভাবলাম সময়মতো খাটের তলাটা একবার খুঁজে দেখব। কিন্তু সুযোগ আর পাই না। এতকাল পরে একটি দিনের জন্য এসেছি, বাড়ির কেউ যেন আমাকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। আদর-যত্নের শেষ নেই, গল্পগুজবের শেষ নেই। মধ্যাহ্ন ভোজনটা এমন গুরুতর হল যে, আশঙ্কা জাগল, এরপর সুযোগ পেলেও খাটের তলায় ঢুকে মনের খটকা মিটিয়ে নেবার ক্ষমতা হয়তো আমার হবে না।

খাটের উপরেই দুপুরবেলা বিশ্রামের ব্যবস্থা হল এবং সুযোগও পেলাম কিছুক্ষণ পরে। পেটের প্রতিবাদ অবহেলা করে হামা দিয়ে ঢুকে পড়লাম খাটের নিচে। পিতলের হাঁড়ি-কলসি থেকে আরম্ভ করে কত কী যে খাটের নিচে জমা করা আছে তার সংখ্যা হয় না। সেই সব গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অরণ্যে পথ করে করে নরুনের দাগ খুঁজতে সময় লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। বড়ো বড়ো আবিষ্কার করে বড়ো বড়ো আবিষ্কারকদের কীরকম আনন্দ হয় জানি না, তবে সেদিন সেকেলে একটা খাটের তলার দিকে কয়েকটা নরুনের দাগ আবিষ্কার করে আমার যে রকম আনন্দ হয়েছিল সেরকম আনন্দ যদি তাঁরাও বোধ করেন,— আবিষ্কারের জন্য নিদারুণ দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও লাভ আছে বলতে হবে।

মহোল্লাসে খাটের বাইরে এলাম। গায়ে মুখে অনেক ঝুল লেগেছে, ঝাড়তে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়েই কাঠের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেলাম। বাড়ির প্রায় সকলেই সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কেবল সীতাদেবী ছাড়া ধরণীদেবী আর কারও দরকারের সময় দ্বিধা হন না কেন বলো তো!

জুন ১৯৩৯

আমার কান্না

বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ চলছে। ছোট ভাইটির বয়স আড়াই কী তিন। দুমকায় থাকি। বাবা তখন সেখানে চাকরি করতেন। আমার জন্মও দুমকাতেই।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু অতি মাত্রায় দুরন্ত। হাঁটতে শিখেই প্রথমে মাছ কাটা মস্ত বঁটিতে নিজের পেটটা দু-ফাঁক করি— আজও সেলায়ের চিহ্ন আছে। এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্নই সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যথা পেলেও কিছুতে কাঁদতাম না। সুর করে (কালোয়াতি নয়!) গান (আবোল-তাবোল) ধরতাম, ব্যথা বাড়লে সুর চড়ত আর দু-চোখ দিয়ে জল পড়ত ধারা স্রোতে। মারে বাপরে বলে, হাউমাউ করে, শুধু চেঁচিয়ে, ভ্যাঁ করে প্রভৃতি যে নানা পদ্ধতি আছে সাধারণ কান্নার তার একটাও নাকি আমি শিখিনি। এদিকে আবার যখন তখন আপন মনে নিজের খাপছাড়া সুরে যে কোনো কথা বা শব্দ নিয়ে গানও আমি গাইতাম— সব সময় তাই বোঝা কঠিন ছিল আমি কাঁদছি না গাইছি! একদিন দুপুরে মা ও বড়দি বারান্দায় খেতে বসে শুনছেন রান্নাঘরে আমি গান ধরেছি। খানিক পরে সুরটা কেমন কেমন ঠেকায় আর পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়ায় তাঁরা উঠে এসে দ্যাখেন উনানের সামনে বসে গতি করছি মুখখানা বিকৃত করে, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কী হয়েছে বুঝতে তাঁদের মিনিট খানেক সময় লেগেছিল। তারপর চোখ পড়ল, আমার বাঁ পায়ের গোড়ালির খানিক ওপরে মস্ত একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পুড়ছে, বেশ খানিকটা গর্ত হয়েছে! কাঠের উনান, চিমটে দিয়ে গনগনে কয়লাগুলি নিয়ে খেলতে গিয়ে এই বিপদ!

কী বোকা ছেলে তুই! ফেলে দিতে পারলি না আগুনটা?

ডাকতে পারলি না, হাবা কোথাকার?

কাঁদতে পারলি না গাধা ছেলে?

প্রায় এক ইঞ্চি পোড়া দাগ এখনো আছে। পরে অনেকবার ভেবেছি, সত্যি, এমন বোকা কী করে হলাম সেদিন? বয়স বাড়লে বুঝেছি, ওরকম তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকলে সব ছোট ছেলেই বোকা হাবা গাধা হয়ে যায়— সাময়িকভাবে।

আরেকদিন মা রসগোল্লার কড়াই নামিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন, আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। আমার ভাগ্য ভালো যে রান্নাঘরেই অন্য কাজে মার বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল, নয় তো রসগোল্লার কড়াই নামিয়েই কোনো কাজে মা বাইরে গেলে হয়তো সারা জীবন আমাকে হাত পোড়া আর মুখ পোড়া হয়ে থাকতে হত! সুযোগ যখন পেলাম কড়ায়ের রসটা তখন আর ফোস্কা পড়াবার অবস্থায় নেই তবে মজা টের পাইয়ে দেবার মতো গরম আছে। খাবলা দিয়ে কতকগুলি রসগোল্লা তুলেই মুখে পুরে দিয়ে সেটা টের পেলাম।

সেই মুহূর্তে মা আর মেজদা ঘরে ঢুকলেন। মা উঠলেন চেঁচিয়ে, মেজদা তিনলাফে এগিয়ে এসে কড়ায়ে আঙুল ডুবিয়ে দেখে নিলেন রসটা গরম কত।

তারপর বললেন, ঠিক সাজা হয়েছে রাক্ষসের। আর খাবি?

যন্ত্রণায় কান্না আসছিল। আমার কচি চামড়া, মেজদা বোধ হয় সেটা হিসান করেন নি যে তার গরম বোধের চেয়ে আমার গরম বোধটা কত বেশি, তা হলে হয়তো মায়া হত। হঠাৎ ওরা এসে হাজির না হলে মুখের রসগোল্লা ফেলে আমি নিশ্চয়ই একটু কাঁদতাম। কিন্তু আর তো রসগোল্লা ফেলাও যায় না, কাঁদাও যায় না। এতক্ষণে দিদিরাও এসে পড়েছে, মেজদার কথা শুনে ওদের মুখে কৌতুকের হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে রসগোল্লা গিলে ফেললাম।

আর খাবি?

সকলের মুখে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কড়াই থেকে আরও কয়েকটা—আগের বারের চেয়ে সংখ্যায় কম মুখে পুরলাম। হাত মুখ আগেই জ্বলছিল, এবার যেন পুড়ে গেল। কাঁদলাম না, রসগোল্লাও চিবোতে লাগলাম কিন্তু দমটা আটকে রইল আর চোখে জল এসে গেল। মা এতক্ষণ কেমন এক দ্বিধাগ্রস্ত ভাব নিয়ে আমায় দেখছিলেন, এবার এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন। মেজদাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুই কী রে সন্তোষ!

মেজদাই আমার হাতে আর মুখে গাওয়া ঘি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা কোনদেশী ছেলে? আমি ভাবলাম, বেশি গরম লাগলে কাঁদবে, কাঁদছে না দেখে—

বাড়ির পিছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল, কপি, বেগুন আর নানারকম তরকারিও হত বাগানে। জল দেবার জন্য বড় একটা কাঁচা কুয়ো ছিল বাগানে, পরিধি খুব বড় কিন্তু বেশি গভীর নয়। কুয়োর মুখটা বাঁধানো তো ছিলই না, বাঁশ বা কাঠের কোনো বেড়া পর্যন্ত ছিল না মুখের চারিপাশে। বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হলে লাল ঘোলাটে জলে কুয়ো ভরে উপচে পড়ত, শীতকালে সামান্য তলানি যেটুকু জল থাকত একবার বাগানে দিতেই তা ফুরিয়ে যেত।

এই কুয়োটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার কাছে। কুয়োর মধ্যে বড় বড় ব্যাং বাস করত অনেকগুলি। দুপুরবেলা সকলে বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত থাকার সময় চুপি চুপি কোনোদিন একা, কোনোদিন ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োর ধারে গিয়ে উবু হয়ে ঝুঁকে ব্যাং দেখতাম, ঢিল ছুড়ে চেষ্টা করতাম ব্যাঙ শিকারের। বাগান তখন একান্ত নির্জন থাকত, ধারে কাছেও কেউ আসত না।

শরতকালে কুয়োটার জল তখন মাঝামাঝি নেমেছে। ভাইকে সঙ্গে করে একদিন ব্যাং দেখতে গিয়েছি। ভাইটি আমার বেশি ঝুঁকতে গিয়ে ঝুপ করে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল! আমি বাড়ির দিকে ছুটলাম। ঘরের মধ্যে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে বসে মা আর দিদিরা কথা বলছে পাড়ার এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, পাশের ঘরে শুয়ে আছে বড়ো জামাইবাবু আর মেজদাদা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ভয় হল মনে। সবাই যদি ভাবে আমি ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়েছি ভাইকে কুয়োর মধ্যে, মেজদা যদি শাসন করে! বাড়ির মধ্যে একমাত্র মেজদাকেই ভয় করতাম, তার শাসন ছিল বড় কড়া। এমনকি, আমাদের বেশি শাসন করার জন্য বাবা পর্যন্ত তাকে মাঝে মাঝে শাসন করে দিতেন।

ভয় হল কিন্তু ওদিকে ভাইটা কুয়োয় পড়ে গেছে। সবদিক বাঁচিয়ে তাই মা-র কাছে গিয়ে চুপি চুপি কানে কানে বললাম, মা, লালু কুয়োয় পড়ে গেছে। মা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, কুয়োয় পড়ে গেছে! কোন্ কুয়ো?

বাগানে।

মা চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে ডাকতে ছুটলেন। তার পিছনে ছুটলেন বড়দি। অন্য সবাই ছুটল কয়েক হাত পিছনে।

লালুর জামাটা তখনো ভাসছিল, ভিজে জামায় বাতাস আটকে ভাসিয়ে না রাখলে ততক্ষণে সে তলিয়ে যেত। মা দেখেই কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। দিদিও দ্বিধা মাত্র না করে মাকে অনুসরণ করল।

তারপর দড়ি বালতি এল, বাঁশ এল, মই এল। লালু উঠল, দিদি উঠল, মা উঠলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই লালু আবার খেলে বেড়াতে লাগল।

মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনা আর কড়া ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া আমার দিকে এতক্ষণে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, এবার মেজদা গম্ভীর মুখে এসে আমার কান ধরে বললেন, চল, তোকে চুবিয়ে আনি কুয়ো থেকে। দড়ি বেঁধে তোকে দু-ঘণ্টা কুয়োর মধ্যে ফেলে রাখলে—

জামাইবাবু কাছে ছিলেন, বললেন, আরে আরে! কী করছ? মেজদাকে ঠেলে সরিয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, ওকে কোথায় মাথায় তুলে আদর করবে, তার বদলে শাস্তি দিচ্ছ?

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

জামাইবাবু আবার বললেন, ওর জন্যেই তো লালু আজ বাঁচল। এইটুকু ছেলে, ওর তো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কথা। চুপ করেও থাকতে পারত। ও যে সঙ্গে সঙ্গে এসে খবর দিয়েছে এজন্য ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি ওকে আজ রসগোল্লা খাওয়াব যত খেতে পারে।

আবহাওয়া বদলে গেল।

চাকরেক জামাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা আনতে পাঠিয়ে দিলেন। চাকর ফিরলে বড় এক জামবাটি ভরা রসগোল্লা আমার সামনে রাখা হল। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সকলে হাসিমুখে সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

মেজদা কোমল সুরে বললেন, খা মানিক, খা। নয় একদিন একটু অসুখ হবে। তাতে কী? বিকেলে তোকে সাইকেলে চাপিয়ে বেড়িয়ে আনব।

চারিদিকে তাকিয়ে আমি—

আমি হুহু করে কেঁদে ফেললাম!

অক্টোবর ১৯৪৫

বড়ো হওয়ার দায়

ছেলেবেলার আরেকটা গল্প বলি। শৈশব কালের নয়, কিশোর বয়সের।

বাবা তখন টাঙ্গাইলে, ময়মনসিংহ জেলার একটা মহকুমা শহর। মাছ দুধ যে কত সস্তা ছিল বলব না, তোমরা ভাববে আমি বোধ হয় খুব বুড়ো হয়ে গেছি— ছেলেবেলা মানে একেবারে সেকালের কথা বলছি। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম ছাব্বিশ সালে।

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবারের বর্ষার পর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় কদিন স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঘুরে বেড়ানো বন্ধ, কানে একটানা চলেছে কুইনিনের ভোঁ ভোঁ। কী করা যায়? কালীপূজা আসছে, বাজিই বানানো যাক।

একটা মোটা বেঁটে শিশিতে (!) বারুদ রেখে ঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে পটকা বানাবার জন্য ব্যবস্থাগুলি সারছি, কাছে ঘেঁষে বসে আছে ছোট দুটি ভাই। সেই যে লালু নামে ভাইটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েও বাঁচিয়ে দেওয়ায় রসগোল্লা পুরস্কার পেয়েছিলাম, সে আর তার পরের ভাই।

আমি এদিকে একমনে ন্যাকড়ার ফালি পাথরের কুচি ঠিক করছি, ওদিকে লালু করেছে কী, শিশি থেকে একটু বারুদ শিশিটার কাছেই মাটিতে ঢেলে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখতে গেছে জ্বলে কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে শিশিটার বিস্ফোরণ এবং ছররা গুলির মতোই টুকরো টুকরো কাচের আমাদের তিন ভায়ের অঙ্গে প্রবেশ। রক্তে বারান্দা ভেসে যাওয়া।

ঠিক সেই সময় বাবা কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

রাস্তা থেকেই শিশি ফাটার শব্দ আর বাড়ির লোকের চিৎকার শুনে আমার সর্বনাশ হলরে বলতে বলতে ছুটে ভেতরে এলেন এবং একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমাদের রক্তপাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন।

প্রত্যেকের শরীরে আট-দশটা করে ফুটো হয়েছে গভীর, সহজে কী রক্ত বন্ধ হয়! অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আমরা খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম— সবচেয়ে বেশি কাবু হয়েছিল ছোটো ভাইটি।

তিন ভাই কী জন্য সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম জানো? উবু হয়ে বসার জন্য! ওভাবে বসায় পেট আর বুক ছিল পায়ের আড়ালে, হাত আর পায়েই তাই কাচ ঢুকেছিল— পায়েই বেশি। তারপর ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনজনে বিছানা নিলাম।

পরদিন কাচ বের করার পালা।

সরু ফুটো করে কাচ শরীরে ঢুকেছে, শলা ঢুকিয়ে আগে ঠিক করতে হবে কাচের টুকরোর অবস্থান, তারপর মাংস কেটে মুখ বড় করে বের করতে হবে।

ডাক্তারবাবু আমায় বললেন, তুমি বড়, প্রথমে তোমায় ধরব। একটা কথা মনে রাখতে হবে। তুমি বারুদ বানিয়েছ, বোকার মতো কাচের শিশিতে বারুদ রেখেছ।

তোমার জন্য ছোটো ভাই দুটির এত কষ্ট। কাচ বের করার সময় তুমি যদি বেশি চেঁচামেচি কাঁদাকাটা কর, ওরা দু'জন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। তুমি বড়, ব্যথা লাগলেও চেঁচানো চলবে না। বুঝতে পেরেছ?

সোজা কথাটা না বুঝে উপায় কী? অগত্যা দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজলাম। ক্ষতের মধ্যে শলা ঢুকিয়ে ডাক্তার যখন আস্তে আস্তে ভিতরে নেড়ে কাচ কোথায় আছে খোঁজেন, কাচ বের করার জন্য ছুরি কাঁচি চালান; তখন একটু চেঁচাবার অধিকার না থাকা যে কী ব্যাপার সেদিন খুব ভালো করেই টের পেয়েছিলাম।

কয়েকটা টুকরো অবশ্য বার করা গিয়েছিল সহজেই।

তবু সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ।

শেষ ব্যান্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন, এ তো আশ্চর্য ছেলে, একটু শব্দ করল না।

ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজন বোঝেনটি ব্যাপারটা তাই তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বীরত্ব বা অসাধারণ সহ্য শক্তির কোনো পরিচয়ই আমি সেদিন দেই নি।

আমি চোখ বুজেছিলাম কেন জানো! আহত রক্তমাখা ভাই দুটির চেহারা, যন্ত্রণায় বিকৃত কাতর তাদের মুখ মনের চোখের সামনে রাখার জন্য। আমি কেন, ভাই দুটি ভয় পাবে ভড়কে যাবে জেনে ওই অবস্থায় কেউ চেঁচাতে পারে না।

আগস্ট ১৯৫২

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। (প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন।) মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ওই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য,— দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে!

জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

দান করি বলা ঠিক নয়— পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে— আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারি যা কোনদিন পেত না। কিন্তু এই কারণে লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপসোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হব।

১৯৪৪
[উৎস : *লেখকের কথা*, ১৯৫৭]

সাহিত্য করার আগে

সাহিত্য জীবন আরম্ভ করার একটা গল্প আমি এখানে ওখানে বলেছি। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞান শিখতে শিখতে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে 'অতসীমামী' গল্পটি লিখে বিচিত্রায় ছাপানো এবং হঠাৎ এভাবে সাহিত্য জীবন শুরু করে দেবার গল্প। কিন্তু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় এই : কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কি একজন লেখকের সাহিত্যজীবন শুরু হয়ে যেতে পারে?

আমি বলব, না, এ রকম হঠাৎ কোন লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে আসতেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।

প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কিভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবনযাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।

সাহিত্যজীবন আরম্ভ হওয়ার পর সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ব বর্জন করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নিজের অতীত জীবন বিশ্লেষণ করলে প্রস্তুতিটা কিভাবে ঘটেছিল তা কম-বেশি জানা প্রত্যেক লেখকের পক্ষে সম্ভব।

সাহিত্য করার আগে কয়েকটা বিষয়ে সকল হবু লেখকের মিল থাকে। যেমন, সাহিত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব খোঁজার তাগিদ, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনকে বাস্তব জীবনে খুঁজে নেবার চেষ্টা, ইত্যাদি— এসবই সাহিত্য জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা ঘটাবার কারণ স্বরূপ হয়। দশজনের চেয়ে সাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর গভীরতরভাবে নেওয়ার ফলে চিন্তা ও ভাব জগতে সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চিত হয়ে চলে, তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিজের বাস্তব জীবনের সংঘাত ও পরিবেশের প্রভাব, আয়ত্ত করা জ্ঞানের প্রভাব আর সংস্কারের প্রভাব। মোটামুটি এভাবেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্যের জোরালো প্রভাব ছাড়া সাহিত্যের জন্ম হয় না।

হাতে-কলমে না লিখেও চিন্তা জগতে এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে যেন লেখা মক্‌শ করার কাজটাই চলে, চিন্তাকে খানিকটা সাহিত্যের টেকনিকে সাজাবার অভ্যাস জন্মে যায়।

একটা কঠিন ও জটিল বিষয়কে আমি শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম। লেখক তৈরি হবার প্রক্রিয়াটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার আমি যে আসল কথায় আসছি সেটা স্পষ্ট করার জন্য এটুকু বলা দরকার ছিল।

সাহিত্যিক হতে হলে বাস্তব জীবনের মতো সাহিত্যকেও অবলম্বন করতে হয়। সাহিত্য না ঘেঁটে, নিজের জানা জীবন সাহিত্যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে নিজে যাচাই করে না জেনে এবং প্রতিফলনের কায়দা—কানুন আয়ত্ত না করে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সাহিত্য-সমালোচক হওয়া যায় কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে!

জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।

সমাজ জীবনে কি আছে কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে— সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।

লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি— জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।

সে তো বটেই। মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টাপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।

মার্কসবাদই আবার আমাদের এটাও শিখিয়েছে যে, এজন্য আপসোস করলেও নিজেকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।

সদিচ্ছা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, জীবন ও সাহিত্য থেকেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলাম, কিন্তু মার্কসবাদ না জানায় কিছুই করতে পারি নি— এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মার্কসবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ। নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা ঘোষণা করার অধিকার আমি পাইনি। জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাব?

প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করেছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি

নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে? তখন ওপরের ওই সূত্র ধরেই আমি অকারণ আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাই, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার লেখার মূল্য কতটুকু এবং কিসে তা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কথাটা বুঝে দেখুন। সূত্রটা কি? বাংলা সাহিত্যে আমি যেটুকু দিয়েছি সেটুকু বাতিল করার প্রশ্নে আমি ভাবছি বাংলা সাহিত্যকে উড়িয়ে দিতে চাওয়ার স্পর্ধার কথা। এ যেন বিনয়ের ছলে আমার আরেকটা স্পর্ধা প্রকাশ যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বলতে আমার দানকেও বোঝায়!

কথাটা আমারও মনে হয়েছে বৈকি। কারণ, এটাই তো আসল কথা। বিচার করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নই তাই দাঁড়িয়েছে : আমি নিজের প্রয়োজনে অথবা বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্য করতে নেমেছিলাম? সাহিত্য করার তাগিদ আমার কিভাবে আর কেন এসেছিল? সাহিত্যের আদর্শ জানা ছিল না, সমাজ জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতাম না— তবু, জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিশ্চয়ই ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি কি আমায় সন্ধান দিয়েছিল কিছু নতুন বক্তব্যের— বাংলা সাহিত্যে যা বলা হয়নি?

নেহাত শখের খাতিরে, নামকরা লেখক হবার লোভে সাহিত্য করতে নামিনি, সেটা বলাই বাহুল্য। এটুকু সম্বল করে নামলে সাহিত্যিকের বেশি দিন হালে পানি পাবার সাধ্য থাকে না।

ছাত্র বয়সে আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েক বছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।

আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু-বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব শোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।

স্কুলজীবনেই অনেক নভেল পড়েছি। বোধ হয় ফোর্থ ক্লাস কিংবা থার্ড ক্লাস থেকে 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসী' প্রায় নিয়মিত পড়তাম। 'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসীই' তখন প্রধানত ছিল বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র।

ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরিব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে।

গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত— জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা-বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মতো সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম, গল্প-উপন্যাস। গল্প-উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।

স্কুলজীবনেই কয়েকবার *শ্রীকান্ত* পড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক শ্রীকান্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার আমায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়নি। আমিও ভয়ানক দুরন্ত আর দুঃসাহসী ছিলাম, অনেক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের চিহ্ন সর্বাঙ্গে আছে। বইখানার নরনারীর চরিত্র আর সম্পর্ক আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অভিভূত করেছিল কিন্তু আমি ছেড়ে কথা কইনি— আমার একটা বড় জিজ্ঞাসার জবাব আদায় করে ছেড়েছিলাম। পরে শরৎবাবুর *চরিত্রহীনে*ও যার সমর্থন পেয়েছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যাটা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে সাহিত্যের ছাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়ত।

রাজলক্ষ্মীকে দেখলাম, মধ্যবিত্ত সংসারের সেবাময়ী স্নেহময়ী নারীত্বের প্রতিমূর্তি, শুধু সংসারের নিয়ম-নীতি বাধা নিষেধ পরাধীনতার কবল থেকে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়িকাকে গৃহের সংকীর্ণতা আর বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন পরিবেশে আনার জন্যই যে তাদের প্রেমের নতুনত্ব, আসলে এও সাহিত্যেরই ওই ছাঁকা অবাস্তব প্রেম— দেহ নিয়ে ওরা বিব্রত হয়ে না পড়লে, দেহকে এত সমারোহের সঙ্গে বাতিল করা না হলে, ওই বয়সে কথাটা খানিক আঁচ করাও হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হত না। মনটা খুঁত খুঁত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেল, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন? ঘরের দেয়াল খসে পড়লে আর সতর্ক পাহারা সরে গেলেও নারী অমানুষ হয়ে যায় না, এই সত্যের সঙ্গে কি বিরোধ আছে বাস্তবের? অথবা এটাই সাহিত্যের রীতি?

চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধহয় আট-দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে! গল্প-উপন্যাসের নৈতিক আড়ষ্টতা বর্জনের চেষ্টা আরও কয়েকজন নামকরা লেখকও করছিলেন। সাহিত্যে নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন বিচার করার সাধ্য তখনও ছিল না, কিন্তু মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা খুব স্পষ্টভাবেই সম্পন্ন হত এবং সেদিনকার সেই ছেলেমানুষি বিচার আজও আমার কাছে অভ্রান্ত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হতো তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এরকম ভাবা সম্ভব হতো না। মনে হতো, তারা যেন অনুচিত জেনেও গায়ের জোরে সেটা উচিত বলে সমর্থন করছেন।

শরৎচন্দ্রের বেলায় কোন প্রশ্ন জাগতো না, কিন্তু অন্য লেখকদের পতিতা, অসতী বা অনুচিত প্রেমকে কেন গ্রহণ করতে পারতাম না, পরে এটা স্পষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের

কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি।

যাই হোক, ছোট-বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা— যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে— সাহিত্যে স্থান পায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করতো। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক, ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রজীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে লিখতে আরম্ভ করার পর বাস্তবকে স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে এই সংঘাতের তীব্রতা কমে আসে।

মার্কসবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হলো ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজজীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সাহিত্য নিয়েও এই রকম সংঘাতের যাঁতাকলে পড়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসি, বাস্তবতার ঊর্ধ্বে তোলা মধ্যবিত্তের হৃদয় মনও ভাবপ্রবণতার প্রতিফলন বলেই এ সাহিত্যকে ভালোবাসি। আমার ভাবকে সরস করে ফেনিয়ে তুলে, কল্পনা স্বপ্নকে আরও রঙদার করে আমাকে মুগ্ধ ও মশগুল করে রাখে বাংলা সাহিত্য। আবার বাস্তবকে না পেয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনে কৃত্রিমতা, বিকৃতি ইত্যাদির মুখোশ খুলে না

দেওয়ার উদাসীনতা পরোক্ষ প্রশ্রয় হয়ে দাঁড়ানোয় এবং বাস্তব-ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায়, বড়ই আপসোস আর রাগ হতো।

সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে এই আপসোসও তেমনি তীব্র হতে থাকে। একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জাগায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি এর কি প্রতিকার নেই।

এই সংঘাত থেকে সাধ জাগতো যে, আমি একদিন লেখক হবো। নিজেই প্রতিকার করবো।

সাধ ক্রমে ক্রমে পণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমি হবোই। কিন্তু যতই হোক, মধ্যবিত্তের মন তো। স্কুলজীবনের লেখক হবার কল্পনা কলেজজীবনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হলেও— সেটা কাজে পরিণত করার কোন চেষ্টাই করতাম না। ভাবতাম এখন নয়, সাহিত্য চর্চা ছেলেমানুষের কাজ নয়। বয়স বাড়ুক, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক, পাস-টাস করে চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিই, তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান!

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিনি। রবীন্দ্র সাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস পড়েও আমার মনে কোনো প্রশ্ন বা নালিশ জাগতো না। কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে সত্যই আমি রেহাই দিয়েছিলাম। যেমন তাঁর 'কাবুলীওয়ালা' গল্প পড়ে সত্যই এ কথা আমার মনে হয়নি যে কাবুলীওয়ালাকে তিনি শুধু স্নেহশীল পিতা হিসাবেই দেখলেন, অমন কত স্নেহশীল গরিব পিতার নিরুপায় পিতাকে সে যে কেমন জোঁকের মতো শোষণ করে সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়লো না!

বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই। কেন দিই, সেটা এ প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়।

সাহিত্য করার আগের দিনের দ্বিতীয় ভাগটা প্রধানত প্রথম ভাগটারই জের ও পরিণতি।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল, কালি-কলমীয় ধারা অর্থাৎ যাকে বলা হতো 'আধুনিক সাহিত্য' এবং যাকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা 'বস্তুপন্থী' বলে দাবি করতেন— এই ধারাকে আমি কিভাবে গ্রহণ করেছিলাম এটাই প্রধান কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়া।

সাহিত্যে ওই 'আধুনিক' মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড শোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্য দিক্‌পালরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বলগাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক আত্মসমর্পণ করেছিলেন এই দুরন্ত বন্যার কাছে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন এবং সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র কচি কচি নেতাকে নিমন্ত্রণ করে আলাপ ও ভাব করেছিলেন— পাছে এরা বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু

ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁকেও ছিন্ন ভিন্ন করে উড়িয়ে দেয়। দু-একজন তাল ঠুকেছিল। একজন কবি রবীন্দ্রনাথকে 'ডোন্ট কেয়ার' করার কবিতা পর্যন্ত লিখেছিল।

কোনো দেশে কোনো কালে খ্যাতনামা কবি বা সাহিত্যিককে গুন্ডার মতো সোজাসুজি আক্রমণে ঘায়েল করে যেন কেউ কবি বা সাহিত্যিক হতে পেরেছে।

বন্ধু-বান্ধবেরা খ্যাতি দিয়ে কি কোনো কবি বা সাহিত্যিককে খ্যাতনামা করতে পারে! খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক মানেই জনসাধারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে, স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে যাকে তারিফ করছে। এদের ভূমিসাৎ করে কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরানো যায় না। কাব্য সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েই এদের ভূমিসাৎ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না— সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।

জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।

১৩৩৩ সালের 'কালি কলমে' সাহিত্যের নতুন অভিযানের স্বপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠি ছাপা হয়। তিনি লিখছেন "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি ...গোর্কি-হ্যামসুনের জগতে এলে ইউক্লিডেরা ফাঁপরে পড়ে। এ যে একেবারে মগের মুলুক! এ যে জীবনের জটিল দুর্বোধ্য জগৎ!"

চিঠিখানায় আরও কয়েকবার 'হ্যামসুন-গোর্কি'র নামোল্লেখ আছে। প্রেমেনবাবুর ছোট একখানা চিঠিতে সাহিত্যে নতুন বিদ্রোহের স্বরূপ যেন ধরা দিয়েছে, বেশি দূর হাতড়াতে হয় না। বাংলা সাহিত্যে জীবন নেই, সব কিছুই গণিতের নিয়মে ছকে বাঁধা প্রাণহীন ব্যাপার। হ্যামসুন-গোর্কির মগের মুলুকে পরিণত করতে হবে বাংলা সাহিত্যকে!

হ্যামসুনের দু-একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেনবাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে, *মাদার* পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম— হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?

আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?

অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ি। ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আশা ও উল্লাস জাগায়— তারই পাশাপাশি হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়।

বিতৃষ্ণা জাগাতো কিন্তু খুব বেশি বিচলিত হতাম না। জীবনের কতগুলি বাস্তব নিয়মে আমার বিশ্বাস ছিল। তখনই আমি জানতাম যে, সমাজে যেমন সাহিত্যেও

তেমনি বড় একটা আলোড়ন দেখা দিলে সেই সুযোগে কতকগুলি চ্যাংড়া কিছু ফাজলামি জুড়বেই— আসল আন্দোলনটা যদি ঠিক থাকে এই সব হালকা ছ্যাবলামির জন্য বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।

শনিবারের চিঠির 'হায় হায়, সব গেল' আর্তনাদ অকারণ এবং হাস্যকর মনে হতো। সুযোগ পেয়ে কয়েকজন বাজে মানুষ খানিকটা নোংরামি এবং ন্যাকামি করেই যদি একটা দেশের সাহিত্যকে গোল্লায় পাঠাতে পারে, তবে সে সাহিত্যের গোল্লায় যাওয়া উচিত।

'আধুনিকতা'র আন্দোলন যদি শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের সাহিত্যে আনা সম্ভব করে থাকে, বস্তির জীবনকে অন্তত সাহিত্যে প্রবেশের পথ করে দিয়ে থাকে,— শুধু এইজন্যই রাশিকৃত জঞ্জালের আবির্ভাবটা ক্ষমা করা চলে।

আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা, আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লা খনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ— কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি— বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি— সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের— সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?

অথচ প্রথম গল্পই আমি লিখি 'অতসীমামী'— রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি— লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপানো নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য। এ গল্পে তাই নিজের আসল নাম দিইনি, ডাক নাম 'মানিক' দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরেও কি রোমান্টিক কাহিনী আমি লিখিনি— কোমর বেঁধে যখন লিখতে আরম্ভ করেছি? লিখেছি বৈকি, *দিবারাত্রির কাব্য* তার চরম নিদর্শন!

যে সংঘাতের কথা বলছি— এও তারই প্রমাণ। ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম— তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের!

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে— কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারি নি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।

তারও প্রয়োজন ছিল বৈকি। অন্তত খাঁটি বস্তুবাদী জীবনাদর্শ গ্রহণ করার স্তরে উঠবার একটা ধাপ হিসাবে।

[উৎস : *লেখকের কথা*, ১৯৫৭]

প্রতিভা

প্রতিভা সম্পর্কে সাধারণ লোকের— এবং স্বয়ং প্রতিভাবানদেরও— ধারণা আছে ওটা এক ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিস। প্রতিভাকে এরকম রহস্যময় পদার্থ মনে করার ফলে লেখক-কবিদের এ জিনিসটার ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে গিয়েছে। বড় বৈজ্ঞানিকের 'বৈজ্ঞানিক প্রতিভা' থাকে কিন্তু বড় একজন কবি নিজেই প্রতিভা। বৈজ্ঞানিকের বেলা প্রতিভার অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, কবির বেলা প্রতিভার অর্থ দুর্বোধ্য একটা গুণ। এর কারণটা অনুমান করা সহজ— লেখক-কবিদের সাধারণ লোক মানুষের পঙ্‌ক্তি থেকে তফাতে সরিয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর রহস্যময় জীব করে রেখেছে। এরকম ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী অবশ্য লেখক-কবিরাই।

কিন্তু সেটা কে খেয়াল রাখে? লেখক-কবিরা তো খুশি হয়ে গর্বের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণের এই ধারণাকে গ্রহণ করে নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের ধারণায় পরিণত করে নিয়েছেন— তাঁদের প্রতিভা স্বতন্ত্র অন্য সবরকম গুণী থেকে তাঁরা পৃথক। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নেতা, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী সকলে গুণী— লেখক-কবি গুণীর মধ্যে গুণী, তাঁর জাতই আলাদা [illegible]তা, একথা কে অস্বীকার করবে যে, ছবি আঁকতে পারা আর কবিতা লিখতে পারা দুরকমের গুণ। লেখক-কবিরা এটুকু মানতেও রাজি নন। ছবি আঁকা যদি গুণ হয়, তবে কবিতা গল্প-লেখা গুণই নয়, দুর্লভ দুর্বোধ্য একটা কিছু! কেন, মানুষ কি যুগ যুগ ধরে মেনে আসছে না সাধারণ কোন সংজ্ঞাই তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না?

তাঁরা ঠিক মানুষ নন, তাঁদের প্রতিভার মানে নেই। অথচ, কথাটা যে কি সাংঘাতিক তলিয়ে বুঝতে গেলে গা শিউরে উঠবে!

যুগ যুগ ধরে মানুষের রহস্যময় অন্তর্লোকের সন্ধান জানিয়ে জানিয়ে, সাধারণ বুদ্ধিতে অগম্য অনাগত ভবিষ্যৎকে অনুভূতির সঙ্কেতে প্রকাশ করে করে, হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ-বেদনার হিল্লোল জাগিয়ে জাগিয়ে এবং নিজেকে সযত্নে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে ও মাঝে মাঝে শুধু অসাধারণ অলোকসামান্য কথাবার্তা চালচলন ব্যবহারের মধ্যে খানিক খানিক আত্মপ্রকাশ করে জনতার মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে যে মিথ্যা মোহ, ভ্রান্তধারণা বহুকাল ধরে লেখক-কবিরা সৃষ্টি করে এসেছেন, আজ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার যুগে সেই জালে আটক পড়ে তাঁদের বিপদের সীমা নেই। কাব্য সাহিত্যের আসরে পর্যন্ত বিজ্ঞান এসে জুড়ে বসছে, ঠুনকো রঙিন কাচের মতো ভেঙে পড়ছে ঈশ্বরের দুর্গের দেয়াল থেকে কাব্যলক্ষ্মীর অন্দরমহলের দেয়াল, জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করা হচ্ছে ভ্রান্তির জঞ্জাল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আজ আর কলম ধরার উপায় নেই। কিন্তু পুরুত-মোল্লা-পাদরিদের মতো লেখক-কবিদের হয়েছে বিষম বিপদ। যুগ যুগ ধরে সযত্নে সৃষ্টি করা জনতার যে সংস্কার ভিত্তি করে এতকাল তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, আজ নিজের হাতে কেমন করে সে ভিত্তি ভেঙে দেবেন, দাঁড়াবেন

কোথায়! ভিত্তি কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে, কে ঠেকাবে? নতুন ভিত্তিও তৈরি হচ্ছে। জনতার যে সংস্কারের প্রতিক্রিয়া ছিল লেখক-কবিরও পুরনো সংস্কার, একটাতে ভাঙন ধরার সঙ্গে স্বভাবতই অন্যটাতেও ভাঙন ধরে। কিন্তু সমস্যা এখনো মেটেনি— এখনই বরং সমস্যাটার সবচেয়ে উৎকট অবস্থা। জনতার পুরনো ধারণা ভাঙতে শুরু করায় গোড়ার দিকে বরং লেখক-কবির পক্ষে সম্ভব ছিল নিজের ধারণা না বদলিয়েও পুরনো কায়দাতেই জনতাকে খুশি রাখা— গণ-বিক্ষোভের গোড়ার দিকে যেমন রাজা মহারাজা মালিকের পক্ষেও দেশভক্ত সেজে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে খুশি করা সম্ভব। আজ আর সে অবস্থা নেই। আজ লেখক-কবিকে নিজের সম্পর্কে নিজেরই পুরনো ধারণা ও বিশ্বাস ছেঁটে ফেলতেই হবে, নতুবা তাঁর ব্যবসা চলে না।

মনের জগতে জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত প্রজা করে রেখে পরম মাননীয় রাজা সেজে রাজত্ব করা আজ অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। রাজসিংহাসন ত্যাগ করে রাজার মনোভাব নিয়ে নেতা হবার পর্যন্ত উপায় নেই।

মানুষের সমাজে নিজেদের আজ মানুষ বলেই ভাবতে হবে, প্রতিভাকে দেখতে হবে প্রতিভা বলেই। আজ তাই লেখক-কবির পক্ষেও দরকার হয়ে পড়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে আর নিজের প্রতিভাকে যাচাই করা— সত্য যেমনি হোক অভিমানে কাতর না হয়ে তা মেনে নিতে হবে। মাথা নিচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা— মানুষ হয়ে জন্মে কারো সাধ্য নেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অতিমানব হয়ে যাবে। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

হবে হ্যাঁ, কাজের তারতম্য আছে। দক্ষতারও তারতম্য আছে। শুধু এইটুকু।

প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছুই নয়।

কোনো বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না। ভ্রূণে প্রতিভার বীজ— অর্থাৎ বিশেষ দক্ষতার জন্য বিশেষ শক্তি অর্জনের যে ভবিষ্যৎ পরিণতি তার সম্ভাবনা— থাকতে পারে কিন্তু ওটা নিছক বীজ। এবং এমনই বীজ যে তা কোন্ নির্দিষ্ট গাছে পরিণত হবে সেটা অনির্দিষ্টই থাকে। সাধারণ গাছের বেলায় তা অনির্দিষ্ট নয়,— বীজটা বট গাছেরই তবে কিনা দেখে চিনতে পারা যাচ্ছে না। প্রতিভার বেলায় অন্য। সে বীজ থেকে যে-কোন গাছ হতে পারে। আঁতুড়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে কারো পক্ষে বলে দেওয়াই অসম্ভব ছিল যে, এককালে তিনি প্রতিভাবান কবি হবেন; শুধু তাই নয়, কবিই যে তিনি হবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনাই ছিল না। আইনস্টাইন হতে পারতেন, জওহরলাল হতে পারতেন— আবার কিছু নাও হতে পারতেন! কবিতা লেখায় দক্ষতা অর্জনের পথে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে পরে, তাঁরই জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়ার মধ্যে।

আসল কথাটা এই : দুটি জিনিস নিয়ে প্রতিভা—দেহের উপকরণাদির উৎকর্ষ এবং আঁতুড় থেকে (হয়তো ভ্রূণের অবস্থা থেকেই—ভ্রূণের ওপর মায়ের মারফতে বাইরের প্রভাব কতটা হয় এখনো বেশি জানা যায়নি) প্রতিটি মুহূর্তের প্রভাব— ঘরের বাইরের কাজের অকাজের প্রত্যেক মুহূর্ত। সব মিলিয়ে এই প্রভাব কিভাবে একদিকে হৃদয় মনের বিশেষ গড়ন দেয় আর অন্যদিকে হৃদয়-মনের চলতি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, আজকের অসম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান তার যতগুলি নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছে

প্রতিভার স্বরূপ জানার পক্ষে আজ তাই যথেষ্ট। শিশুকাল থেকে দুরন্ত অবাধ্য অমনোযোগী ছেলে হঠাৎ বদলে গিয়ে যখন অসাধারণ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকে পরিণত হয় তখন স্বভাবতই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়— বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ছেলেটির মধ্যে 'লুকিয়ে' ছিল, যেদিন থেকে সে ভালো ছেলে হয়েছিল সেদিন থেকে ওই প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। কিন্তু খুঁজলে দেখা যাবে প্রতিভার বিকাশ তার হচ্ছিল ছেলেবেলা থেকেই, যতই দুরন্ত হোক আর স্কুলের পড়ার মন দিতে না চাক, মন তার জিজ্ঞাসু হয়েই উঠছিল ক্রমে ক্রমে, জবাব পাবার জিদটাও চড়ছিল দিন দিন। মানুষ বদলায় কিন্তু হঠাৎ বদলায় না, হঠাৎ কোন যোগাযোগে বদলাবার প্রেরণাটাই শুধু আসা সম্ভব। বদলটাও শুধু এই নীতিতেই ঘটতে পারে যে, ছেলেটির গাছের ডালে পাখির বাসায় কি আছে খুঁজে বার করবার প্রবৃত্তিটা বইয়ে কি লেখা আছে জানবার ইচ্ছায় এবং তা থেকে অণু ভেঙে লুকানো শক্তি কি করে বার করা যায় তার পরীক্ষা করার সাধে পরিণত হতে পারে। মানুষ কেন হাসে কাঁদে ভালোবাসে ঘৃণা করে জানবার সাধ জেগে দার্শনিক বা কবি বা লেখকও ছেলেটি হতে পারতো।

অবশ্য শুধু জিজ্ঞাসু মন নয়, আরও অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতো তার প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা কবি-লেখক হওয়াটা। প্রতিভাবিহীনদের চেয়ে খানিকটা বেশি মস্তিষ্ক থাকারও প্রয়োজন হতো। জন্মাবামাত্র রবীন্দ্রনাথ কিংবা আইনস্টাইনের স্থানে আরেকটি নবজাত শিশুকে এনে বসিয়ে দিলে এবং সে এক তিল এদিক ওদিক না করে অবিকল ওদের জীবনের অনুকরণ করে বড় হলেই যে একদিন রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়ে উঠতো তা নয়। অণুগুলি যেভাবে সংযোজন করে দেহটি গঠিত হয়েছে,— সেটুকুকেও যদি প্রতিভার ঈশ্বরদত্ত দিক বলা হয়, আমি তাও মানতে রাজি হবো না— পূর্বপুরুষদত্ত এই বিশেষণ প্রয়োগ করবো।

প্রতিভা আসলে এক। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভার মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই— পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে। স্কুলে কলেজে লেবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার। জীবনের স্কুলে লেখক-কবির শিক্ষা, হৃদয়মনের লেবরেটরিতে চিন্তা আর অনুভূতিকে শব্দে রূপান্তরিত করার পরীক্ষা, কবিতা সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকের কাজে মনের চর্চাটা বেশি, লেখক-কবির হৃদয়ের চর্চা। প্রতিভার যা মূল কথা, মনোনিবেশের শক্তি, সেটা কারো কম নয়। লেখক-কবির কাজে যে হৃদয়টা বেশি লাগে বলেছি ওটা শুধু কথার কথা, আসলে সবই মনের খেলা। মনের কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারকেই হৃদয় বলা হয়, হৃদয় বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নেই। বুকের যেখানটায় হৃদয় আছে বলা হয়, বিশেষ অবস্থায় যেখানটা টন টন বা ধুপ্ ধুপ্ করে, সেখানে শরীরের একটা বিশেষ অংশ অবস্থাবিশেষে কমবেশি সাড়া দেয়— ব্যথা, না ভয়, না প্রেম কিসে সাড়া দিলো না জেনেই। মন বলি বা বুদ্ধি বলি বা মস্তিষ্ক বলি, বৈজ্ঞানিকও সেটাই খাটান, কবিও সেটাই খাটান— নিজের নিজের কাজে। চিন্তায় মগ্ন বৈজ্ঞানিক আর লেখায় মগ্ন লেখক-কবির আশেপাশের জগৎ ভুলে যাওয়া মগ্নতা, সাধারণ জীবনে অন্যমনস্ক ভাব, ইত্যাদি এক জিনিস।

আজ লেখক-কবি, বৈজ্ঞানিকের আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া নয়, একাকার হয়ে যাবার দিন এসেছে। জনতার তাই দাবি। লেবরেটরিতে পরমাণুর শক্তিকে মুক্তি দিতে পারার মধ্যেই বৈজ্ঞানিককে তার কর্তব্য শেষ করতে দিতে মানুষ আর রাজি নয়। মানুষ আজ দাবি করতে শুরু করেছে, আণবিক বোমা নয়, তোমার ওই পরমাণুর শক্তি আমার কি

কাজে লাগে বাৎলিয়ে দাও। বৈজ্ঞানিক টের পাচ্ছেন, দাবি হুকুম হয়ে উঠলো বলে— সে হুকুম অমান্য করা চলবে না। নিছক বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকা আর চলবে না বেশি দিন, লেখক-কবির মতো মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, গবেষণার খাতিরে গবেষণা চালাতে হবে। আর লেখক-কবিও টের পাচ্ছেন যে, নিছক হাসি-কান্নার আরক আর ভূমার মূলধনে প্রেম চলবে না মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষের রোগ উপবাস লড়াই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।

সেজন্য নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবা ছাড়াও আমার পথ নেই। জনসাধারণ সাধারণ আর আমি অসাধারণ, কারণ আমি লেখক, এ ধারণা নিয়ে ভালোবাসতে গেলে মানুষ কাছে ঘেঁষতে দেবে না, মানবপ্রেমে বুক ফেটে যাওয়া বেদনার সৃষ্টিও গ্রহণ করবে না। তাই সাহিত্যে প্রগতি আনার খাতিরে, গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রাণের ছটফটানি মেটানোর জন্য অগত্যাই আজ সবার আগে লেখক-কবিকে এই চিন্তাটা স্বভাবে পরিণত করতে হবে— আমি দশ জনের একজন।

তাতে দোষের কিছু নেই। প্রতিভাও তো জনসাধারণেও সম্পতি। জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়। প্রতিভার মালিককে জনসাধারণ কত যে শ্রদ্ধা সম্মান দিয়েছে তার সীমা হয় না, ভবিষ্যতেও চিরকাল দিয়ে যাবে, কিছু শ্রদ্ধা সম্মান ফিরিয়ে দেওয়াই তো উচিত। তবে মুশকিল এই, যাকে নিচু ভাবি তাকে ঠিক ভালোবাসাও যায় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানও করা যায় না। সেজন্য আগে নিজের মিথ্যা অহঙ্কারটা ছাঁটা দরকার।

[উৎস : *লেখকের কথা*, ১৯৫৭]

উপন্যাসের ধারা

লিখতে শুরু করার আগে শুধু আশা নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল যে, একদিন আমি লেখক হবো। তবু নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সাগ্রহে ছাত্র হয়েছিলাম বিজ্ঞানের, অনার্স নিয়েছিলাম অঙ্কশাস্ত্রে। আজ চর্চা নেই সময় আর সুযোগের অভাবে; কিন্তু বিজ্ঞানকে আজও সমানভাবেই ভালোবাসি।

লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল *পুতুলনাচের ইতিকথার* উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি— এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।

পরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভালো করে মিলিয়ে বুঝে 'কেন লিখি?' তত্ত্বগত দিকটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন জরুরি হয়ে উঠলো সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে নানা এলোমেলো থিয়োরি ও তার ব্যাখ্যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটা আশ্চর্য কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল— যদি কোনোদিন আমি লিখি, ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে।

আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয় তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বভাবিক!

কথাটা কী দাঁড় করাচ্ছি? আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র না হলে, কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান চর্চা না করলে, উপন্যাস লেখা যায় না? আজ পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা সকলেই—?

যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি দু'চারখানা উপন্যাস লিখেছি সেই হেতু ওটাই হবে উপন্যাস লেখার একটা শর্ত— যেটুকু বলেছি তার এরকম যান্ত্রিক ও হাস্যকর তাৎপর্য কারো কারো মনে আসা আশ্চর্য নয়। কথাটা এখানেই পরিষ্কার করা দরকার। সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কিছুমাত্র পরিচয় না থাকলেও এ বিচারবোধ মানুষের আয়ত্ত হতে পারে। সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই প্রভাবের জন্য সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের

চিন্তাজগতে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাপদ্ধতির, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছে,— যত কম আর অস্পষ্টই সেটা হোক। বিজ্ঞানচর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও, ঔপন্যাসিক খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়। সমাজের মাধ্যমে সে সম্পর্কের সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সাহিত্যের তথাকথিত সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক অঙ্গ কবিতার গতিপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সমকালীন বিকাশের সাথে কিভাবে জড়িত তা খুঁজে বার করা কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ছিল, উপন্যাস ছিল না। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় এবং আদরণীয় হয়।

কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকে ভাববাদ অবাধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্য ও কারণকে রাখা গিয়েছে ভাববাদেরই স্তরে, মানে খোঁজা সম্ভব হয়েছে জীবন ও জগতের। অধ্যাত্মবাদকে টেনে আনা গিয়েছে যতখানি প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞান তো ছেড়ে কথা কয় না। বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ। যে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা করে থাকুন, বস্তুজগতে মানবতার বাস্তব অগ্রগতিই চিরদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।

গদ্য ভাষায় সাহিত্যে এল বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা; নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবন বোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করলো উপন্যাস।

বিজ্ঞানকে, মানুষের বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশকে, একেবারে আর উপেক্ষা করতে না পেরে সাহিত্যকে নতুন একটি বিভাগ খুলতে হলো : অধ্যাত্মবাদের জের এবং ভাববাদ আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিবাদের সাহায্যে বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করলো উপন্যাসের ধারা।

যুক্তিবাদ খাঁটি দর্শনে বিশেষ খাতির পায়নি— ইতিহাস দর্শনকে যে মূল ভাগে ভাগ করেছে (অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও বস্তুবাদ) তারই নানারকম আল্‌তো বাদ হিসাবে অনেক শাখাপ্রশাখা গজিয়েছে, যুক্তিবাদ তারই একটা।

যুক্তিবাদ কারণ দেখায় না, যুক্তি দেয়। 'এরকম হওয়া উচিত' এটাও যুক্তিবাদের যুক্তি।

দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের অবদান খুবই সামান্য, সাহিত্যে উপন্যাসের নব-বিধান যেন যুক্তিবাদেরই জয়গান— আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। আসলে সেটা বস্তুবাদেরই অগ্রগতি। অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ এবং বস্তুবাদ কোনোটাই সমসাময়িক

সুবিধাবাদের নীতি মানে নি। মানবতার বিকাশের মূলনীতি ক্ষয়বৃদ্ধি এগোনো পিছানোর বাস্তব কার্যকরী নীতিকেই মেনে এসেছে।

বাদ নিয়ে বাদানুবাদের প্রবন্ধ লিখতে চাইনি। এটুকু ভূমিকা মাত্র। আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু যাচাই হয়ে গিয়েছে গোড়াতেই। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিত্‌টা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে। উপন্যাসেও কাব্য সৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হতে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই; কিন্তু বাস্তব মানুষ, বাস্তব জীবন, বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এসব ঘটাতে হবে।

কবি-বন্ধুর মনে কথা জাগতো, কথায় তিনি তা প্রকাশ করে দেখতেন! কবিতা লিখতেন কিংবা লিখতেন ছোটগল্পরূপী গদ্য-কবিতা। আমার মনেও কথা জাগতো, কথা তুলে রাখতাম মনেরই তাকে। বাস্তবতার আশ্রয় ছাড়া আমার কথা দাঁড়াবে কিসে? আরও বয়স বাড়ুক, অভিজ্ঞতা হোক, বাস্তবতাকে আরও ভালো করে জেনে চিনে আমার কথার ভিত গাঁথতে শিখি, তারপর মনের কথাকে বাইরে আনবো। একদিন উপন্যাস লিখবো ভাবতাম কি? মোটেই না। সোজাসুজি ভাবতাম যে, লিখতে শুরু করার আগে আমাকে আরও পাকতে হবে? উপন্যাস লিখতেই যে এই পাকামি দরকার হয় সেটা জেনেছি অনেক পরে।

প্রথম লিখলাম একটি গল্প— তাও লেখার খাতিরে নয়, কয়েকটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে তর্কের ফলে সাধারণ একটা বাস্তব সত্যকে হাতে নাতে প্রমাণ করার জন্য। এ ঘটনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল আমার ঔপন্যাসিকের ধাত, সাধারণ যুক্তিবোধ, বাস্তব-বোধ। তর্কটা ছিল মাসিকের সম্পাদক-মশাইদের অবিবেচনা, উদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষ নিয়ে। সম্পাদকেরা কিরকম জীব কিছুই জানতাম না, কিন্তু ভালো একটা লেখা হাতে পেলেও শুধু লেখকের নাম নেই বলেই লেখাটা তাঁরা বাতিল করে দিয়ে থাকেন, এটা কোনমতেই মানতে পারি নি। কোন যুক্তিই খুঁজে পাইনি সম্পাদকদের এই অর্থহীন অদ্ভুত আচরণের। ভালো লেখার কদর নেই কদর আছে শুধু নামকরা লেখকের এ তো স্রেফ পরস্পরবিরোধী কথা। যদি ধরা যায় যে, ভালো গল্প লেখা অতি সহজ, গাদাগাদা ভালো গল্প তৈরি হওয়ায় সম্পাদকের কাছে তার বিশেষ কোনো চাহিদা নেই— তা হলে নামকরা লেখকের নামেরও কোন মানেই থাকে না। এত সোজা কাজ করার জন্য নাম হয় কিসে?

ভালো লেখা অন্যান্য কারণে সম্পাদকীয় অবজ্ঞা লাভ করতে পারে, লেখক নতুন বলে কখনোই নয়! এই সত্যটা প্রমাণ করার জন্য নিজে একটি গল্প লিখেছিলাম।

সাহিত্যজগতের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না থাকলেও উপলব্ধি করেছিলাম যে, সাহিত্যের জগৎও মানুষেরই জগৎ, সংসারে সাধারণ নিয়মকানুন সাহিত্যের জগতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি ভালো এক গল্প লিখলে যে কোন সম্পাদক যে সেটা নিশ্চয় সাগ্রহে ছাপবেন এ বিষয়ে এমনই দৃঢ় ছিল আমার বিশ্বাস যে তখনকার সেরা তিনটি মাসিকের যে কোন একটিতে ছ'মাসের মধ্যে আমার গল্প বার করা নিয়ে বাজি রাখতে দ্বিধা জাগেনি। কবি মনের ঝোঁক নয়, ঔপন্যাসিকের প্রতীতি— যা আসে বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে।

গল্পটা লেখার মধ্যে ছিল এই বাস্তব বিচারবিবেচনা, কি হয় আর কি না হয় তার হিসাব। এর মধ্যেও সন্ধান পাওয়া যাবে যে, ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক একদিকে কিরকম নির্বিকার নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার সমগ্রতাকে ধরবার চেষ্ট করেন, অন্যদিকে তারই মধ্যে বজায় রেখে বলেন আবেগ অনুভূতির সততা— মোহহীন, মমতাহীন বিশ্লেষণে সত্যকে যাচাই করে নিয়ে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন (যার যেমন বিশ্লেষণ ও যার যেমন প্রাণ!)। প্রথমে হিসাব করেছিলাম কি ধরনের গল্প লিখবো। সবদিক দিয়ে নতুন ধরনের নিশ্চয় নয়! একেবারে আনাড়ি, হঠাৎ একদিন কলম ধরে নতুন টেকনিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন বিষয়ের গল্প খাড়া করা সম্ভবও নয়, বেশি 'নতুনত্ব' সম্পাদকের পছন্দ নাও হতে পারে। ভেবেচিন্তে স্থির করেছিলাম যে, রোমান্টিক গল্প লেখাই সবচেয়ে সহজ, এরকম গল্প জমে গেলে সম্পাদকেরও চট করে পছন্দ হয়ে যাবে।

আদর্শ অপার্থিব প্রেমের জমকালো গল্প ফাঁদতে হবে। কিন্তু সমস্তটাই আজগুবি কল্পনা হলে তো গল্প জমবে না, বাস্তবের ভিত্তিও থাকা চাই গল্পের। কি হবে এই ভিত্তি? কাহিনী যদি দাঁড় করাই প্রেমাত্মক অবান্তর কল্পনার, গল্পের চরিত্রগুলিকে করতে হবে বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষ।

অতিজানা অতিচেনা মানুষকে তাই করেছিলাম 'অতসী মামী'র নায়ক-নায়িকা। সত্যই চমৎকার বাঁশি বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশি বাজালে মাঝে মাঝে সত্যই তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বাঁশি বাজানো সত্যই অপছন্দ করতেন তাঁর স্ত্রী, মাঝে মাঝে কেঁদে কেটে অনর্থ করতেন।

শুধু এটুকু নয়। সত্যই দুজনে তাঁরা একেবারে মশগুল ছিলেন পরস্পরকে নিয়ে। এঁদের দেখেছিলাম খুবই অল্প বয়সে, সেই বয়সেও শুধু এঁদের কথা বলা, চোখে চোখে চাওয়া দেখে টের পেতাম অন্যান্য অনেক জোড়া চেনা স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে এঁদের মধ্যে বাঁধনটা ঢের বেশি জোরালো, সাধারণ রোগে ভুগে ভদ্রলোক মারা গেলে কিছুকালের জন্য তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

'অতসী মামী' লিখবার সময় এঁদের দুজনকে আগাগোড়া মানস চোখের সামনে রেখেছিলাম। শুধু তাই নয়। সোজাসুজি কাহিনীটা লিখে না গিয়ে নিজে আমি অল্পবয়সী একটি ছেলে হয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকে তার মুখ দিয়ে গল্পটা বলেছিলাম।

আমার এই প্রথম গল্পের কাহিনী হাস্যকর রকমের রোমান্টিক কল্পনা। আজও যখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাত্রে প্রতিবছর অতসী মামীর রেললাইনের ধারে নির্জন মাঠে একাকিনী সারা রাত মৃত প্রিয়ের সঙ্গ অনুভব করতে যাওয়ার কথা ভাবি, আমার নিজেরই হাসি পায়। এমনি ভাবতে গেলে হাসি পায়, কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনেও হাসবার সাধ্য হয় না।

কারণ, কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভটভাবে হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম।

আমার এই আদি গল্পের মোট কথা আর সাহিত্যের আদিম উপন্যাসের মোট কথা একই— কল্পনার রূপায়ণের জন্য বাস্তবকে আশ্রয় করা। উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত— অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।

[উৎস : লেখকের কথা, ১৯৫৭]

প্রগতি সাহিত্য

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। দীর্ঘ চার বছর পরে বর্তমান চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি সম্মেলনের মধ্যে এই দীর্ঘ ব্যবধান ঘটার প্রধান কারণ আমাদের অর্থাৎ সংঘের পরিচালকদের দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব আমার সঠিক অনুভব করতে পারি নি, এবং এই অক্ষমতা এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শগত অনিচ্ছতা থেকে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাস্তব অবস্থা সম্মেলন আহ্বান করার অতিশয় প্রতিকূল ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রচণ্ড আঘাতে ও বঙ্গবিভাগের ফলে আমাদের সংগঠন একরকম ভেঙে যায়। শাখাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বহু শাখার অস্তিত্ব লোপ পায়। কেন্দ্রের কার্যকলাপও বহুদিন বন্ধ রাখতে হয়। এ আঘাত সামলে উঠতে না উঠতে শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণ।

বাস্তব বাধা ও অসুবিধাগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার না করেও বলা যায়, এই সব বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করে অনেক আগেই আন্দোলনের আয়োজন করা অসম্ভব ছিল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য কেবল ১৯৪৬ সালে সম্মেলন সম্ভব ছিল না, পরের বছর সম্মেলন আহ্বান করা যেতো। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে সম্মেলন ডাকা সম্পর্কে আলোচনা ও প্রাথমিক পরিকল্পনা স্থির হয়— সংঘের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে বাংলা শাখার রিপোর্টে এই পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। প্রতিক্রিয়ার সরকারি ও বেসরকারি আক্রমণও এতদিন সম্মেলন না ডাকার অনিবার্য কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার বেসরকারি আর্তনাদ এখন তীক্ষ্ণতর, এবং সরকারি দমননীতি তীব্রতর হয়েছে এবং আমার এই সম্মেলনের আয়োজনও করেছি।

সুতরাং সম্মেলন এই ১৯৪৯-এ পিছিয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য, যুগ্মসম্পাদক দুজন এ বিষয় সকলের চেয়ে বেশি দায়ী।

আজ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমাদের অন্যান্য ভুলভ্রান্তির মতো এই নিষ্ক্রিয়তার মূল উৎস হচ্ছে, বর্তমান জগতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা-সংশয়হীন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আদর্শগত দ্বিধাসংশয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির বিরাট অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আমার প্রগতির ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে এনেছি সত্য, কিন্তু এগিয়েছি আমার দ্বিধাগ্রস্তভাবে, বাস্তবতার দ্রুত রূপান্তরের অনেকখানি পিছনে পিছনে। আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় করতে, সত্যোপলব্ধির আলোতে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের লক্ষ্য কি, কর্তব্য কি, এ বিষয়ে দ্বিধাহীন, আপোষহীন শাণিত তীক্ষ্ণ আহ্বান, সংঘ দিতে পারেনি।

সংঘের গত কয়েক বছরের ইতিহাস সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে এই দুর্বলতার সুস্পষ্ট চেহারা এবং এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

যুদ্ধের সময় সংঘের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রসার লাভ ও শক্তিশালী বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠা, বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। এই সাফল্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য আজ আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন— এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন; সংঘের শাখা ছিল মাত্র ২টি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ১৪টি শাখা গড়ে ওঠে।

কেন্দ্র ও শাখাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা হাজারের উপরে উঠে যায়। কলকাতা ও মফস্বলে বহু সাংস্কৃতিক সভা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ, লাইব্রেরি পরিচালনা প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে আন্দোলন অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে।

কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই অসাধারণ সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, আদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সহজ সত্যই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল এই সাফল্যের মধ্যে যে, আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শ খুঁত থাকবে, অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে, এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন বা আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক; অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপসাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে, পৃথিবীব্যাপী সংকটের সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল নির্ভুল। সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলার সময় প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল— তার সবটুকু সৃজনী শক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োগ করা।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ১৯৪৫ সালে তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম পরিবর্তন করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম রাখা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের আদর্শগত সামগ্রিক ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে জরুরি হয়ে ওঠে। শিল্পী ও সাহিত্যের ফর্ম কন্টেন্ট থেকে শুরু করে সামাজিক ভূমিকা পর্যন্ত নানা বিষয়ে, এত প্রশ্ন ও সংশয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যে, মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রগতি আন্দোলনের নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীণ আদর্শ স্থির করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই চেতনার তাগিদে, সংঘের বিভিন্ন সভার ও সাপ্তাহিক বুধবারের বৈঠকে এবং 'পরিচয়' ও অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকায়, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সঠিক

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংঘের অন্যান্য সভ্যদের বড় একটি অংশের মধ্যে আদর্শের দিকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্যদিকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সাফ করার এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন সুবিধাবাদী কিছু কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকের মানসিক দৈন্য প্রকট হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সংঘ থেকে সরে গিয়ে এঁরা প্রগতি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শিল্পী ও সাহিত্যের থিয়োরির দিকটা সম্পর্কে আমাদের এই ঝোঁক, অপ্রয়োজনীয় বুদ্ধিবিলাস ছিল না, এদিকে আরও বেশি সক্রিয়তা ও উৎসাহেরেই বরং প্রয়োজন ছিল। আর্ট ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এই অভিযানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিষ্ঠুর সত্য— বিদেশী শাসক কত যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার পদানত দেশের মানুষগুলির চিন্তাজগতে, পুরনো মৃত যুগের কত বিভ্রান্তির জঞ্জালকে, কত অন্ধ সংস্কারকে জিইয়ে রাখে— স্বাধীন দেশে কালের গতির সঙ্গে আপনার থেকে যা ধুয়ে-মুছে যায়।

আমাদের মানসজগতের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে সযত্নে রক্ষা করা বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলগুলি উপড়ে ফেলার জন্য, থিয়োরি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অফুরন্ত প্রয়োজন আছে। আমাদের ত্রুটি এদিকে ঘটেনি, আমাদের ভুল হয়েছে অন্যদিকে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার দ্রুত রূপান্তর সম্পর্কে একেবারে উদাসীন না থাকলেও, এদিকে যতখানি মনোযোগ দেওয়া, এই বাস্তবতাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া একান্তভাবে জরুরি ছিল, আমরা তা দিইনি। আমাদের গলদ থেকে গিয়েছিল— প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না দিলে আদর্শগত বিভ্রান্তি বা মোহ থেকে যে মুক্ত থাকা যায় না— এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতে।

শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা এবং সোভিয়েটের নেতৃত্বে জগতে ধনতন্ত্রের অবসান ও নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর, প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগদান— এই সব সত্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব সত্যের বাস্তব অভিব্যক্তি যে এক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। সমস্ত জগৎ দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন ঘটবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একইরূপ আপোষহীন সংঘাতের মধ্যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অভিযান প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকবে— এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারি নি।

আমরা তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরনো ধারার জের টেনে এসেছি। শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে এগোতেও বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা। আমরা যে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনসাধারণের পক্ষে, সোভিয়েটের পক্ষে, —দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে আমরা ইতস্তত করেছি।

সংঘ এদিকে যেমন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বজায় রেখে অগ্রসর হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা যখন প্রচণ্ড তম হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছুদিন ছাড়া সংঘ কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সংঘের সাধারণ নিয়মিত কাজের মধ্যে সোমেন চন্দ লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালনা, এবং বুধবারের বৈঠক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বক্তা পাঠাবার ব্যবস্থাও সংঘ বরাবর করে এসেছে। দাঙ্গার সময়, সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিরাট দাঙ্গাবিরোধী অভিযান গঠন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দাঙ্গাবিরোধী চেতনাকে শিল্পী সাহিত্যে, চিত্র ও রচনার মধ্যে রূপায়ণ, এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ সভা ও শোভাযাত্রায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দেওয়া, আমাদের সংঘের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সময় (১৯৪৬) বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। অপর দিকে ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, সর্বদলীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক ঐক্যমূল্য দিতে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে, শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অসম্ভব সর্বদলীয় ঐক্যের প্রতি মোহের পরিচয়ও সংঘ দিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি বিরোধী ধারাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়া সম্পর্কে শ্রমিক ও জনসাধারণের মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারায় বিরোধীরূপ,— প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ— প্রকট হয়ে ওঠে।

'আর্ট ফর আর্ট্স সেক'-এর পন্থী শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কয়েকজন নামকরা ব্যক্তির সঙ্গে, সংঘের প্রগতিবাদী সভ্যদের মতের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘ দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভ্রান্তমতের বিরোধিতা করে। প্রগতিবিরোধী এই সাহিত্যিকেরা সংঘ থেকে সরে গিয়ে সংঘকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিন্দা ও মিথ্যাপ্রচারের অভিযান শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন 'সাংস্কৃতিক' পত্রিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের সংগঠন এই সময় আমাদের সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে।

আমাদের সংঘের বিরোধিতার উদ্দেশ্য স্থাপিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত সংস্কৃতির জের টেনে প্রগতিশীল নতুন ও জীবন্ত সংস্কৃতির বিরোধিতায় নামার অর্থেই, ভাব ও প্রেরণার অসীম দৈন্য— এই দৈন্য নিয়ে কোন সংঘ প্রাণবান ও সক্রিয় হতে পারে না। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' তাই বারবার মাথা তুলতে চেয়ে ঝিমিয়ে গিয়েছে।

আমাদের সংঘ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করেছে— 'পরিচয়' এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকার সাহায্যে এবং সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রগতিশীল মতবাদের প্রচারে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী ধারা প্রবল হবার পর 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় নীতির যে পরিবর্তন করা হয়, এবং যে দৃঢ়তার সঙ্গে এ নীতি অনুসরণ করা হয় তা বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

বিরোধীপক্ষের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘ প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সক্রিয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংঘ সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারেনি। বুর্জোয়া ভাবধারার মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারায়

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারা আজ কতদূর শক্তিশালী— সংঘের পুরোপুরি সে ধারণা জন্মায়নি, এবং এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবার দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা থেকে গিয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারি নি।

গত এক বছর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, নিন্দা ও অপপ্রচারের স্তর অতিক্রম করে, প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নির্যাতনের স্তরে পৌঁছেছে। সংঘের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় আজ বহুদিন বিনা বিচারে আটক হয়ে আছেন। সংঘের কেন্দ্রীয় অফিসে একাধিকবার পুলিশের পদার্পণ ঘটেছে, কয়েকটি শাখায় সার্চ করে উৎসাহী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গণনাট্য সংঘ এবং সোভিয়েত সুহৃদ সংঘও পুলিশের কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এই আক্রমণের প্রতিরোধে সংঘের উদ্যোগে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' স্থাপিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সামনে সংস্কৃতির এই নতুন সংকটের স্বরূপ তুলে ধরা ও জোরালো প্রতিবাদ সৃষ্টি করার কাজে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদে'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধাবসানের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত রূপান্তর হয়েছে। আজ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন বিশ্বযুদ্ধের প্রকাশ্য প্রচারের রূপ নিয়েছে। এই সোভিয়েত বিরোধিতা রাজনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ফ্যাসিস্ট দমননীতিতে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। তাই, যেটুকু মোহ ও জড়তা অবশিষ্ট ছিল আজ তা ঝেড়ে ফেলবার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ নেই আমরা তা পারবো। প্রগতির অভিযান সকল বাধা ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যাবে।

বাংলা ভারতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি হিন্দি ও একটি উর্দু শাখা আছে। এই শাখা দুটির সঙ্গে এতদিন আমাদের প্রায় কোনো যোগাযোগই ছিল না, অল্পদিন হয় এঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই এই প্রতিষ্ঠান দুটির নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। আমরা সহযাত্রী, আমাদের মধ্যে ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবধানটুকুও আমরা রাখতে চাই না।

২২-৪-৪৯

[উৎস : লেখকের কথা, ১৯৫৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনকথা ও রচনাপঞ্জি

সংকলক : সৈয়দ আজিজুল হক

১৯০৮ ১৯ মে, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বিহারের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার (বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলার) বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতা : নীরদাসুন্দরী দেবী। পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; ডাকনাম মানিক। মানিক ছিলেন পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের (আট ছেলে ছয় মেয়ে) মধ্যে পঞ্চম। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত।

১৯০৮-২২ পিতার বদলিপ্রবণ চাকরিসূত্রে মানিকের বাল্য-কৈশোর ও স্কুলজীবন অতিবাহিত হয় অখণ্ড বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে– প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে। বাল্যজীবনের একাধিক ঘটনায় মানিকের চঞ্চলমতিত্ব, নির্ভীকত্ব, কৌতূহলপ্রবণতা ও বিবেচনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ের ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে : মাছ কাটা বঁটিতে নাভির এপাশ-ওপাশ কেটে দু-ফাঁক করা, লাল কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কাদায় আটকে পড়া, চুলোর গনগনে কয়লা দিয়ে খেলতে গিয়ে পায়ের মাংস পুড়িয়ে ফেলা, গরম কড়াই থেকে রসগোল্লা মুখে পুরে প্রচণ্ড কষ্ট হলেও গিলে ফেলা, ইঁদুরের বাচ্চা ধরতে গিয়ে আলমারি-চাপা পড়া প্রভৃতি। এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানিকের সর্বমুখী অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসু বৈশিষ্ট্য ও অপরিসীম সহ্যশক্তি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর স্কুলশিক্ষা শুরু হয় কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে।

১৯২২-২৪ সুধাংশুকুমারের চাকরির ক্ষেত্র বদল হওয়ায় ১৯২২ সালে মানিককে চলে আসতে হয় পিতার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে। বাল্যকাল থেকেই মানিক-চরিত্রে যে-চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা ছিল তা টাঙ্গাইলের জীবনে বিপুলভাবে প্রকাশিত হয়। জেলে-মাঝি-গাড়োয়ানসহ নিম্নবর্গের মানুষের সংসর্গেই অতিবাহিত হয় তাঁর অনেকটা সময়। এ সময়ের মানিক অত্যন্ত অশান্ত প্রকৃতির, এবং বেপরোয়া, কল্পনাপ্রবণ ও ডানপিটে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কালীপূজার পূর্বে বাজি বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, বাঁশি হাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঠে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়ানো, গাড়োয়ানদের সঙ্গে গল্পগুজব করে রাত পার করে বাড়ি ফেরা, মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে দু-চারদিন তাদের নৌকায় কাটানো প্রভৃতি ঘটনায় মানিকের অতৃপ্ত মনের বিশৃঙ্খল ও বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রীতি লক্ষণীয়।

১৯২৪-২৬ টাঙ্গাইলে ১৯২৪ সালের ২৮ মে তারিখে মা নীরদা দেবীর মৃত্যু ঘটলে মানিক হয়ে পড়েন কেন্দ্রচ্যুত। মানিকের সংবেদনশীল মনে মাতৃবিয়োগের প্রতিক্রিয়া ছিল গভীর ও ব্যাপক। মাতৃবিয়োগের ঘটনায় তাদের পরিবারেরও টাঙ্গাইল-বাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরো পরিবার চলে যায় মানিকের মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল কাঁথিতে। সদ্য ডাক্তারি পাস করে তখন তিনি সেখানে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। মানিক সেখানে কাঁথি মডেল স্কুলে ভর্তি হলেও কিছুদিন পর কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুরে, তাঁর বড়ো বোন শিশিরকুমারী চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরালয়ে। দীর্ঘ রোগভোগের পর মানিক ভর্তি হন মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। মেদিনীপুরের জীবনে তাঁর আকর্ষণের বিষয় ছিল বস্তির অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ, শহরঘেঁষা কাঁসাই নদী, পাশের কুঁড়েঘরসর্বস্ব গ্রাম, রেললাইনসংলগ্ন প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ এবং শহর পেরিয়ে বিরাট বিশাল শালবন। ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেলামেশা হইচই আড্ডা খেলাধুলা, গ্রামে আগুন নেভাতে যাওয়া প্রভৃতির পাশাপাশি তিনি হয়ে ওঠেন নির্জনতাপ্রিয় ও আবেগপ্রবণ। ওই স্কুল থেকেই ১৯২৬ সালে মানিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৬-২৮ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের পর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে ভর্তি হন। বাঁকুড়ার হোস্টেলজীবনে বৃদ্ধি পায় তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপ্রেম। এ সময়ে মানিক নিয়মিত ধূমপায়ী, অনিয়মিত মদ্যপায়ী, কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক তরুণ। বাঁশি ও গান এ পর্বেও তাঁর জীবনসঙ্গী। গোপন 'অনুশীলন' দলের সঙ্গে সংযোগ, বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তিলাভ, 'সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কোরে' ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা অর্জন প্রভৃতি তাঁর দু-বছরের বাঁকুড়া জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাঠ্যবইয়ের প্রতি আকর্ষণ ও জীবনসন্ধানে উন্মত্ততা সত্ত্বেও আইএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ।

১৯২৮ প্রথম বিভাগে আইএসসি পরীক্ষা পাসের পর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বিএসসি ক্লাসে ভর্তি। কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' রচনা এবং ১৩৩৫-এর পৌষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশ। প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের ফলে এটিই তাঁর লেখকনামরূপে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অতসীমামী'র রচনা ও প্রকাশসম্পর্কিত এই তথ্য মানিকের নিজের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*-এর ১১শ খণ্ডে (ডিসেম্বর ২০০৭) মুদ্রিত অগ্রন্থিত গল্পের তালিকায় 'ম্যাজিক' নামের একটি গল্প রয়েছে যেটি 'অতসীমামী'র তিন মাস আগে (আশ্বিন ১৩৩৫/ সেপ্টেম্বর ১৯২৮) প্রকাশিত হয় অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায়। ধারণা করা হয়, 'অতসীমামী' লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরণের পরেই হয়ত 'ম্যাজিক' লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল আগে।

আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লিখে সম্পাদকদের তাগিদে কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেও তাঁর

লেখকজীবন যে শুরু হয় কবিতা চর্চার মাধ্যমে তার প্রমাণ মিলেছে পরে। কৈশোরে কবিতা চর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশটি কবিতার সম্পূর্ণ একটি খাতা তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভেতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-সম্পাদকের তাগিদে তাঁর গল্প লেখা অব্যাহত থাকে। এ বছর 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প : জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৩৬) 'নেকী' এবং আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৩৬) 'ব্যথার পূজা'। এর আগে জানুয়ারিতে (মাঘ ১৩৩৫) 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায় 'শেষ মুহূর্তে' ও এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৩৬) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রকমারি' নামে গল্প। প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্যের* আদি রচনা শুরু হয় এ বছরেরই শেষ দিকে। সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশের ফলে স্বাভাবিকভাবে কলেজশিক্ষায় মনোযোগ হ্রাস পায়।

১৯৩০ 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পের প্রথম কিস্তি ছাপা হয় জানুয়ারি মাসের (মাঘ ১৩৩৬) 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। এর বাকি অংশ ছাপা হয় 'বিচিত্রা'র পরবর্তী সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩৬)। মার্চে (চৈত্র ১৩৩৬) 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয় 'চাপা আগুন' গল্প। সাহিত্যচর্চায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ায় কলেজপাঠে দেখা দেয় বিপুল অমনোযোগ। মানিকের পড়াশোনার খরচ জোগাতেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠ্যবিষয়ে মানিকের অমনোযোগের কথা অবহিত হয়ে তিনি পড়াশুনার খরচ জোগানো বন্ধ করে দিলে মানিক কলেজ হোস্টেল ত্যাগ করে আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে গিয়ে ওঠেন। এভাবে আর্থিক অসচ্ছলতার মুখোমুখি হন। লেখালেখির মাধ্যমে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের কথা ভেবে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যচর্চায়।

১৯৩১ জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৩৮) প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প :'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় 'মাটির সাকী' ও টাঙ্গাইলের 'অগত্যা' পত্রিকায় 'বিড়ম্বনা'। বিজ্ঞান ও মানবমনস্তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলনসহ দেশী-বিদেশী সাহিত্যপাঠে মনোযোগী হয়ে পাঠ্যবিষয়ে অবহেলা করায় প্রথমবার বিএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে অকৃতকার্য হন।

১৯৩২ জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৩৮) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'সর্পিল'। মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৩৮) 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় 'ধাক্কা' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'যাত্রা'। জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৩৯) 'বিচিত্রা'য় মুদ্রিত হয় 'জন্মের ইতিহাস' এবং 'প্রবাসী'তে 'ভূমিকম্প'। আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৩৯) 'গল্পলহরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শৈলজ শিলা'। সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৩৯) 'দীপক' পত্রিকায় বের হয় 'মহাকালের জটার জট', 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয় 'পোড়াকপালী' এবং 'উত্তরা'য় অক্টোবরে (কার্তিক ১৩৩৯) 'তাঁতি বৌ' ও ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৩৯) 'আই.সি.এস-এর বৌ'।

দ্বিতীয়বারের মতো সিটি কলেজ থেকে বিএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে অকৃতকার্য হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবসান ঘটান এবং সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন।

১৯৩৩ 'গল্পলহরী'তে এপ্রিলে (বৈশাখ ১৩৪০) ও জুনে (আষাঢ় ১৩৪০) বের হয় 'তফাৎ' ও 'গাঁদাফুলের বাগান' শীর্ষক দুটি অনুগল্প। জুনে 'প্রবাসী'তে

'পোস্টাপিসের পিওন ও তার মেয়ে', 'উত্তরা' পত্রিকায় জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪০) বের হয় 'কেরানীর বৌ', সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪০) বের হয় 'পূজারীর বৌ' এবং নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৪০) প্রকাশিত হয় 'রাজার বৌ' গল্প। সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪০) প্রকাশিত হয় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'সরীসৃপ' এবং 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় 'প্রাগৈতিহাসিক'। অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪০) 'ছোটগল্প' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'চোর' গল্প। ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৪০) 'ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপা হয় 'আত্মহত্যার অধিকার'।

১৯৩৪ ১৫ জানুয়ারি তারিখে প্রবল ভূমিকম্পে মুঙ্গের শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার খবর শুনে মানিক সেখানে ছুটে যান। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়সহ পরিবারের অনেকেই তখন মুঙ্গেরে ছিলেন। এই বিপর্যয়ে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক কন্যা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। আর্থিক সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানিক কয়েক মাস যুক্ত ছিলেন 'নবারুণ' পত্রিকার সঙ্গে, সম্পাদক হিসেবে। এ সময় তাঁর বসবাসের স্থল : কলকাতার দত্তবাগান এলাকার জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড।

ফেব্রুয়ারি মাসে (ফাল্গুন ১৩৪০) 'উত্তরা' পত্রিকায় বেরোয় 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', মার্চে (চৈত্র ১৩৪০) 'পূর্ব্বাশা'য় 'দুর্ঘটনা', 'নারায়ণ' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১-এ 'ভাঙা পুতুলের পা', 'চোখের জলের দাগ' ও 'কৌতূহল' এবং 'প্রবাসী'তে 'জীবিকা' (কার্তিক ১৩৪১)। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৪১) প্রকাশিত হয় বড় গল্প 'একটি দিন'। পরে এই গল্পই ধারাবাহিক উপন্যাসের রূপ নিয়ে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি' এবং শেষে 'দিবারাত্রির কাব্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৪১) শেষ হয়। এটিই পরের বছর *দিবারাত্রির কাব্য* নামে উপন্যাসাকারে বের হয়।

মে মাস (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) থেকে 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাস এবং ১৯৩৫-এর জুলাই (শ্রাবণ ১৩৪২) পর্যন্ত ৯ কিস্তি মুদ্রিত হবার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৪১) 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় 'লড়াই' গল্প।

ডিসেম্বর মাস থেকে (পৌষ ১৩৪১) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাস।

১৯৩৫ এ বছরেই গ্রন্থকার হিসেবে প্রথম আবির্ভাব ঘটে মানিকের। মার্চ মাসে (ফাল্গুন ১৩৪১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স প্রকাশ করে *জননী* উপন্যাস। একই সংস্থা থেকে প্রথম গল্পগ্রন্থ *অতসীমামী* প্রকাশিত হয় আগস্ট মাসে (আষাঢ় ১৩৪২)। ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৪২) ডি.এম. লাইব্রেরি প্রকাশ করে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর মাসে (মহালয়া ১৩৪২) 'নাগরিক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'প্রকৃতি' গল্প ও 'পাঞ্চজন্যে' 'বাগ্দীপাড়ায় একটি রাত' (শারদ ১৩৪২)। শারীরিক মানসিক অতিরিক্ত শ্রম এবং নিজের প্রতি অযত্ন-অবহেলায় মানিকের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। এ বছরেরই কোনো একদিন সংজ্ঞা হারান মানিক এবং

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা : নীরদাসুন্দরী দেবী

দু-একমাস অন্তর এটা ঘটতে থাকলে চিকিৎসায় ধরা পড়ে তিনি Epilepsy বা মৃগীরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ এ বছর প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস। ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে *পুতুলনাচের ইতিকথা*; মে মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে *পদ্মানদীর মাঝি*; এবং ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস থেকে *জীবনের জটিলতা*। প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি গল্প : জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৩) 'উত্তরা' পত্রিকায় 'ওমিলনাইন' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'সাহিত্যিকের বৌ', সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৩) 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'অন্ধ', 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪৩) 'চাকরি' ও নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) 'মাথার রহস্য' এবং ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৪৩) 'অগ্রগতি' পত্রিকায় 'দিক পরিবর্তন'।

এ বছর থেকে পুনরায় পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে থাকছেন কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে একই গৃহে, যদিও দাদা-বৌদিদের অনেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর বনিবনার অভাব।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ : *প্রাগৈতিহাসিক* (এপ্রিল)। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৪৩) *অমৃতস্য পুত্রাঃ* উপন্যাসটি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং মোট বারো কিস্তিতে শেষ হয়। গল্প : 'দিনের পর দিন' ('বঙ্গশ্রী', মাঘ ১৩৪৩)। 'অগ্রগতি' পত্রিকায় মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৪৩) প্রকাশিত হয় 'সিঁড়ি', মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) ছাপা হয় 'হাত' এবং সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র ১৩৪৪) বের হয় 'অবগুণ্ঠিত'। জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৪) 'পরিচয়'-এ বের হয় 'টিকটিকি'।

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান; মাসিক বেতন পঁয়ষট্টি টাকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়। বছরের শেষভাগে দিগম্বরীতলায় (টালিগঞ্জ) পিতৃঅর্থে ক্রয়কৃত বাড়িতে পিতা ও অন্য তিন ভাইয়ের একান্নবর্তী সংসারে বসবাস শুরু এবং পরবর্তী এগারো বছর ওই বাড়িতেই বসবাস।

বুখানিনের *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ* ও লিয়েনতিয়েভের *মার্কসীয় অর্থনীতি* শীর্ষক গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মার্কসীয় মতবাদে উজ্জীবিত।

মৃগীরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি; চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী স্নায়ু অবশকারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসাবিদ্যার বইপত্র ঘেঁটে নিজেই এক প্রকার ওষুধের ব্যবস্থা করেন যাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশি। এ ধরনের ওষুধ সেবনের ধারাবাহিকতায় তিনি ক্রমশ অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৩৮ মৃগীরোগের চিকিৎসাকল্পে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী শারীরিক-মানসিক সুস্থিতির জন্য মানিকের বিয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মে মাসে (বৈশাখ ১৩৪৫) বিক্রমপুরের পঞ্চসারনিবাসী এবং ময়মনসিংহের সরকারি

গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় মানিকের।

জুলাই মাসে কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে বের হয় *অমৃতস্য পুত্রাঃ*। সেপ্টেম্বর মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স বের করে গল্পগ্রন্থ *মিহি ও মোটা কাহিনী*।

কয়েকটি গল্পের প্রকাশতথ্য এরকম : জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৪৫) 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় বেরোয় 'নদীর বিদ্রোহ'; জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৫) 'পরিচয়'-এ ছাপা হয় 'প্যাক' ও 'অগ্রগতি' পত্রিকায় 'বিষাক্ত প্রেম'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৫) 'চতুরঙ্গে' বের হয় 'বোমা', 'আনন্দবাজার'-এ 'মহাজন' এবং 'যুগান্তর'-এ 'বন্যা'।

১৯৩৯ 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা ও বঙ্গশ্রী কটন মিলের মালিক সচ্চিদানন্দ বাবুর সঙ্গে মতান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ১ জানুয়ারি থেকে উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা।

অনুজ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস নামে একটি ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন। জানুয়ারি মাস (মাঘ ১৩৪৫) থেকে 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে *অহিংসা* উপন্যাস, যা শেষ হয় ১৩৪৭-এর পৌষে। আগস্ট মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *সরীসৃপ*। সেপ্টেম্বর মাসে সম্পূর্ণ উপন্যাস *সহরতলী* মুদ্রিত হয় শারদীয় 'আনন্দবাজার'-এ। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস মুদ্রণের ঘটনা এই প্রথম এবং এর মধ্য দিয়ে বিশেষ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি সূচিত হয়। অক্টোবর মাস (কার্তিক ১৩৪৬) থেকে মাসিক 'পত্রিকা'য় *সহরতলী* উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের মুদ্রণ শুরু হয় এবং শেষ হয় পরবর্তী আশ্বিনে।

গল্প : 'সপ্তয়াভিলাষীর অভিমান' ('আনন্দবাজার', ফাল্গুন ১৩৪৫), আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৪৬) মাসিক 'পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় 'সমুদ্রের স্বাদ', সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৬) 'নতুন পত্রে' মুদ্রিত হয় 'পূজা কমিটি' এবং 'পূর্ব্বাশা'য় 'স্নায়ু', 'সচিত্র বর্ষবাণী'তে 'চাষার বৌ' (১৩৪৬), 'বৈজয়ন্তী'তে 'কলহের জের' (পৌষ ১৩৪৬)।

আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৪৬) রমাপতি বসু সম্পাদিত *১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা* শীর্ষক সংকলনে মুদ্রিত হয় 'উত্তর দক্ষিণ' নামে মানিকের একটি কবিতা।

১৯৪০ বছরের শুরুর দিকে লেখকের নিজের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *বৌ* এবং সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। জুলাই মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে গ্রন্থাকারে বের হয় *সহরতলী* ১ম পর্ব।

গল্প প্রকাশের বিবরণ নিম্নরূপ : মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৪৬) 'অলকা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'কাজল' এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'মানুষ কাঁদে কেন' ও 'প্রতিক্রিয়া'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৪৭) মুদ্রিত হয়

'সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ' এবং জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৭) 'উদারচরিতানামের বৌ'। সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৭) 'নবশক্তি' পত্রিকায় বের হয় 'অকর্মণ্য', 'নতুন পত্রে' 'ভাঙা ঘর', 'অলকা' পত্রিকায় 'স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই' এবং 'নরনারী'তে 'প্রতিক্রিয়া'। অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪৭) মাসিক 'পত্রিকা'য় ছাপা হয় 'গৃহিণী'। নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বের হয় 'জুয়াড়ীর বৌ'। ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৪৭) 'চতুরঙ্গে' ছাপা হয় 'মালী'। অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪৭) 'পরিচয়' পত্রিকায় মানিক সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে *সহরতলী* ২য় পর্ব, ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে *অহিংসা* এবং ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস থেকে *ধরাবাঁধা জীবন* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *ধরাবাঁধা জীবন* সেপ্টেম্বর মাসের (আশ্বিন ১৩৪৮) 'নর-নারী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। এপ্রিল মাস (বৈশাখ ১৩৪৮) থেকে 'প্রবর্তক' পত্রিকায় *আদায়ের ইতিহাস* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ পর্যন্ত পাঁচ কিস্তি ছাপা হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং বৈশাখ ১৩৫০ (এপ্রিল ১৯৪৩) থেকে নতুন করে উপন্যাসটি পুনঃপ্রকাশিত হয়ে পরের বৈশাখে শেষ হয়।

এ বছরে গল্প প্রকাশের তথ্য এরকম : 'অপর্ণার ভুল' ('নর-নারী', মাঘ ১৩৪৭), ফেব্রুয়ারি মাসে (দোল ১৩৪৭) 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'আততায়ী'; এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৪৮) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বের হয় 'অন্ধের বৌ', 'পরিচয়ে' বের হয় 'ঘটক' এবং 'বৈশাখী'তে ছাপা হয় 'ফাঁদ'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৮) 'চতুরঙ্গে' বের হয় 'ধনজনযৌবন' এবং 'দেশ' পত্রিকায় 'ট্রাজেডির পর'; অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪৮) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা হয় 'প্রৌঢ়ের [দুনম্বর] বৌ'।

১৯৪২ মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় *চতুষ্কোণ*। সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৯) শারদীয় 'আনন্দবাজার'-এ বের হয় সম্পূর্ণ উপন্যাস *সহরবাসের ইতিকথা*। পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে অসম্পূর্ণ থাকে *দর্পণ* উপন্যাস।

গল্প প্রকাশের তথ্য : জুন মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) 'দেশ' পত্রিকায় বের হয় 'প্যানিক'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৪৯) 'সম্প্রতি'তে ছাপা হয় 'ভয়ঙ্কর'; অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৪৯) 'দেশ' পত্রিকায় 'বিবেক' এবং 'পরিচয়ে' 'হলুদ পোড়া'।

১৯৪৩ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান এবং বছরের শেষভাগ পর্যন্ত কর্মরত। এটিই তাঁর শেষ চাকরি। এই চাকরিসূত্রে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরার এবং সেই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধবিষয়ক প্রচারসহ নানা রকম বেতার অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ; যেমন : আগস্ট মাসে ‘ডেভিড কপারফিল্ড’ ও ‘আধুনিক দৃষ্টিতে বঙ্কিম’; অক্টোবরে ‘চাওয়ার শেষ নেই’ ও ‘মেজাজের গল্প’ শীর্ষক বেতার কথিকা পাঠ।

সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫০) বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে বের হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বাদ* এবং এ মাস থেকেই ‘পূর্ব্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে শুরু করে *রাঙামাটির চাষী* উপন্যাস, যার শেষ কিস্তি ছাপা হয় ১৩৫১র ফাল্গুনে। পরে এটি *চিন্তামণি* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ মাসেই ‘যুগান্তর’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হয় *প্রতিবিম্ব* যা এ বছরেই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এবং এর সূত্র ধরে যোগাযোগ ঘটে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে, যার পরিণতিতে মানিক যুক্ত হন এই সংঘের সাংগঠনিক কার্যক্রমে। সুনীলকুমার ধর সম্পাদিত ‘নতুন জীবন’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫০/ডিসেম্বর ১৯৪৩) থেকে প্রকাশিত হয়ে বারোটি কিস্তিতে দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৫২) সমাপ্ত হয় *খুনী* উপন্যাস। অগ্রন্থিত এই উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*-এর ১১শ খণ্ডে (ডিসেম্বর ২০০৭) সংকলিত হয়েছে।

গল্প : সেপ্টেম্বর মাসে ‘আনন্দবাজার’-এ ‘বাস’, ‘সঞ্চয়নে’ ‘বিলাসমন’, ‘অলকা’ পত্রিকায় ‘দিশেহারা হরিণী’ ও ‘বৈশাখে’ ‘স্বামী স্ত্রী’ মুদ্রিত হয়; নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৫০) ‘সংকেত’ পত্রিকায় বের হয় ‘মৃতজনে দেহ প্রাণ’; ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৫০) ‘রূপান্তর’ পত্রিকায় ‘রোমান্স’, ‘নতুন জীবন’ পত্রিকায় ‘খুনি’ ও ‘সঞ্চয়নে’ প্রকাশিত হয় ‘তোমরা সবাই ভালো’।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ২৫-২৭ আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগদান এবং সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন। সংঘ থেকে প্রকাশিত *কেন লিখি* শীর্ষক গ্রন্থে উক্ত শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন। এ বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ এবং আমৃত্যু পার্টি ও তার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সংশ্লিষ্ট থাকেন। অক্টোবরে সিগনেট প্রেস থেকে বের হয় *ভেজাল* গল্পগ্রন্থ। গল্প : ফেব্রুয়ারিতে (ফাল্গুন ১৩৫০) ‘সঞ্চয়নে’ ‘আধুনিক অতিথি’, মার্চ মাসে পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত *মহামন্বন্তর* গল্পসংকলনে মুদ্রিত হয় ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে’, ‘প্রাঙ্গণে’ ‘সন্ধ্যা ও তারা’, এপ্রিলে (বৈশাখ ১৩৫১) ‘অর্চনা’ পত্রিকায় ‘সাড়ে সাত সের চাল’, ‘সম্প্রতি’তে ‘জোতদার’ (শারদ ১৩৫১)।

আগস্ট মাসে ‘রূপমঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *ভয়ঙ্কর* শীর্ষক নাটিকা। সেপ্টেম্বর মাসে ‘নতুন জীবন’ পত্রিকায় ছাপা হয় ‘যৌন জীবন’ প্রবন্ধ।

এ বছরে গণনাট্য সংঘের প্রকাশনায় বের হয় ‘ভারতের মর্ম্মবাণী’ প্রবন্ধ। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত *Stories of Rural Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় মানিকের গল্প ‘Hutmakers Romance’’ ।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে সম্মেলনে এ প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। সম্মেলনে মানিক সংঘের কার্যকরী কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত। ১২ মে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা থেকে তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকদের কথিকাভিত্তিক বেতার অনুষ্ঠান 'আমার গল্প লেখা' পর্যায়ে বেতার-বক্তৃতা উপস্থাপন, যা পরে সংকলিত হয় জ্যোতিপ্রকাশ বসু সম্পাদিত *গল্প লেখার গল্প* গ্রন্থে এবং এই নামে তাঁর *লেখকের কথা* (১৯৫৭) গ্রন্থে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা বেতার থেকে 'আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালি সংগীতকার' বিষয়ে কয়েকটি পর্যায়ে বেতার-কথিকা উপস্থাপন। ১৬ ডিসেম্বর 'বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব' শীর্ষক বেতার-কথিকা পাঠ।

মে মাসে কমলা পাবলিশিং হাউস থেকে বের হয় *হলুদ পোড়া* গল্পগ্রন্থ।

জুন মাসে বুক এম্পোরিয়াম থেকে প্রকাশিত হয় *দর্পণ* উপন্যাস।

অক্টোবর মাস (কার্তিক ১৩৫২) থেকে 'নতুন জীবন' পত্রিকায় মুদ্রিত হতে থাকে *ডাক্তারবাবু* উপন্যাস (গ্রন্থাকারে নাম : *পেশা*)

গল্প : 'আগুনের ফুলকি' ('রূপ-মঞ্চ', মাঘ-ফাল্গুন ১৩৫১), মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২) 'পরিচয়' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'সিঁড়ী', 'নতুন জীবনে' 'সাঁওতাল'; জুন মাসে 'চতুরঙ্গে' ছাপা হয় 'শত্রুমিত্র', 'পূর্ব্বাশা'য় 'কষ্টিপাথর'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫২) প্রকাশিত হয় 'যুগান্তরে' 'দুঃশাসনীয়', 'পরিচয়ে' 'কৃপাময় সামন্ত', 'কৃষক' পত্রিকায় 'বেড়া', 'রূপমঞ্চে' 'নেশা' এবং 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় 'বুড়ী'; অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৫২) 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় বের হয় 'মঙ্গলা' এবং নভেম্বরে (অগ্রহায়ণ ১৩৫২) 'বসুমতী' পত্রিকায় ছাপা হয় 'আজ কাল পরশুর গল্প'।

১৯৪৬ জানুয়ারির শুরুর দিকে কমিউনিস্ট প্রার্থী কল্পনা দত্তের সমর্থনে জনসভায় যোগ দিতে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম গমন। সেখানকার মিলিটারি বর্বরতা নিয়ে লেখা তাঁর প্রতিবেদনটি ২০ জানুয়ারির 'জনযুদ্ধে' ছাপা হয়। ৩১ জানুয়ারি ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয়ে চীনা সাহিত্যিক চেন হান সেং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

১৬ আগস্ট ও তার পরবর্তী কয়েক দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গাবিরোধী শান্তি স্থাপনে সক্রিয়তা।

ফেব্রুয়ারি মাসে ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে বের হয় *সহরবাসের ইতিকথা*। এপ্রিলে (বৈশাখ ১৩৫৩) দৈনিক 'বসুমতী' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় *চিহ্ন* উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। এপ্রিল-মে-তে ছাপা হয় নাটক *ভিটেমাটি*। মে মাসে সংকেত ভবন প্রকাশ করে গল্পগ্রন্থ *আজ কাল পরশুর গল্প*। জুলাই মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে বের হয় *চিন্তামণি* উপন্যাস। সেপ্টেম্বর মাস (আশ্বিন ১৩৫৩) থেকে 'পরিচয়' পত্রিকায় *জীয়ন্ত* উপন্যাস

ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে শুরু করে এবং ১৩৫৫র চৈত্র মাসে শেষ হয়। অক্টোবর মাসে অগ্রণী বুক ক্লাব বের করে *পরিস্থিতি* গল্পগ্রন্থ।

গল্প : মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৫২) 'দিগন্ত' পত্রিকায় ছাপা হয় 'প্রাণ', 'চতুরঙ্গে' 'ছেঁড়া', 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় 'মাসী-পিসী'; এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৫৩) 'রংমশাল'-এ বের হয় 'সিদ্ধপুরুষ', মাসিক 'বসুমতী'তে 'পেটব্যথা'; মে মাসে (জৈষ্ঠ ১৩৫৩) 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'অমানুষিক'; জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৫৩) 'পরিচয়ে' বের হয় 'কংক্রিট'; জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৫৩) 'পূর্ব্বাশা'য় মুদ্রিত হয় 'রাসের মেলা', 'রংমশাল'-এ বের হয় অনুবাদ-গল্প 'পিংপং'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫৩) রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত *কথাশিল্প* গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় 'চক্রান্ত', 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয় 'চালক', 'বসুমতী' পত্রিকায় 'টিচার' ও 'যুগান্তরে' 'একান্নবর্তী', 'ভারতে' 'প্রেমিক', 'গল্পভারতী'তে 'সমানুভূতি'; নভেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ১৩৫৩) মাসিক 'বসুমতী'তে ছাপা হয় তিন কিস্তিতে প্রকাশিতব্য 'মাটি' গল্পের প্রথম অংশ, যার সংহত রূপ 'মাটির মাশুল'। ডিসেম্বর মাসে সাধনাকান্ত রায় চৌধুরী সম্পাদিত *নতুন লেখা* (১ম খণ্ড) গল্পসংকলনে ছাপা হয় 'গুণ্ডামি' এবং 'গল্পভারতী'তে মুদ্রিত হয় 'চোরাই'। এছাড়া 'গল্পভারতী'র প্রথম বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫৩) বের হয় 'প্রাণের গুদাম' এবং 'সীমান্ত' পত্রিকায় 'শিল্পী'।

১৯৪৭ জানুয়ারিতে নিজ উদ্যোগে টালিগঞ্জ সংস্কৃতি সংঘ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা। জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে বরিশাল গমন। ৮ এপ্রিল কলকাতা বেতারে স্বরচিত গল্পপাঠে অংশগ্রহণ। মে মাসে তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লেখেন 'কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ'। ৬ সেপ্টেম্বর 'ভালোবাসা' গল্পটি পাঠ করেন কলকাতা বেতারে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান এবং গণসাহিত্য শাখায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

জানুয়ারি মাসে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বের হয় *চিহ্ন*। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে ছাপা হয় *আদায়ের ইতিহাস*। আগস্ট মাসে মুদ্রিত হয় গল্পগ্রন্থ *খতিয়ান*।

গল্প : জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৫৩) 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় বের হয় 'হারানের নাতজামাই'; ২০ এপ্রিল সংখ্যা 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'চৈতালী আশা'; 'গলায় দড়ির কেন' ('মেঘনা', বৈশাখ ১৩৫৪); জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৫৪) 'মৌচাক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ছোটদের জন্য লেখা 'ভূতের গল্প'; আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৫৪) 'পূর্ব্বাশা'য় ছাপা হয় 'স্থানে ও স্তানে'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫৪) 'যুগান্তরে' বের হয় 'গায়েন', 'স্বরাজ' পত্রিকায় 'ধান', 'দেশ' পত্রিকায় 'তথাকথিত', 'দ্বন্দ্বে' 'দলপতি', 'হিন্দুস্থানে' 'বাঘের বংশরক্ষা' এবং 'ভারত' পত্রিকায় 'ছেলেমানুষি'; ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৫৪) 'পূর্ব্বাশা'য় ছাপা হয় 'পেরানটা'।

সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'প্রতিভা' প্রবন্ধ এবং শারদীয় 'বসুমতী'তে কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'প্রথম কবিতার কাহিনী'।

১৯৪৮ জানুয়ারি মাসে জে.জে. প্রোডাকশনের সঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথা* ছায়াচিত্রের চুক্তি সই। মে মাসে বোম্বাইয়ের কুতুব পাবলিশার্স প্রকাশ করে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ *Boatman of the Padma*।

দুটি গল্পগ্রন্থ : পূরবী পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে বের হয় *ছোটবড়* এবং বিমলারঞ্জন প্রকাশন থেকে *মাটির মাশুল* ।

গল্প : এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৫৫) 'অগ্রণী' পত্রিকায় ছাপা হয় 'ব্রিজ'; আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৫৫) 'চলন্তিকা'য় 'আপদ', 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'নিচু চোখে দু'আনা ও দু'পয়সা'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫৫) 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় 'সখী', 'বসুমতী'তে 'প্রাণাধিক', 'অরণি' পত্রিকায় 'মেজাজ', 'চলন্তি কা' পত্রিকায় 'বাগদীপাড়া দিয়ে' এবং 'সংবাদ' পত্রিকায় 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। এছাড়া 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫৫) বের হয় 'স্টেশন রোড' গল্প।

ফেব্রুয়ারি মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার 'পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনায়' বের হয় মার্কসবাদী সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণমূলক রচনা।

১৯৪৯ ১৮-২০ জানুয়ারি কলকাতায় সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ; ২১ জানুয়ারি ছাত্রমিছিলে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান এবং 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫৫-এর মাঘ সংখ্যায় এর প্রতিবাদে লেখেন 'মানবতার বিচার' শীর্ষক সম্পাদকীয়।

৭ ফেব্রুয়ারি লেখকের পিতা টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার দুদিন আগেই মানিক তাঁর পরিবারসহ বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর রোডের এক ছোট ভাড়াবাড়িতে উঠে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটান।

২৬ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান।

১৪ এপ্রিল সিটি কলেজের ছাত্রদের আমন্ত্রণে অতিথি হন নববর্ষের অনুষ্ঠানে। ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন ও কার্যকরী কমিটির অন্যতম সম্পাদক হিসেবে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টটি পরে 'প্রগতি সাহিত্য' শিরোনামে প্রবন্ধগ্রন্থ *লেখকের কথায়* (১৯৫৭) অন্তর্ভুক্ত। ২৪-২৬ নভেম্বর প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন।

বাড়ি বিক্রির টাকা পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে লেখকের পিতা ধনাঢ্য পুত্রদের গলগ্রহ হয়ে পড়লে ডিসেম্বর মাসে মানিক তাঁর পিতাকে নিজের দু-কামরার অপরিসর ভাড়াগৃহে নিয়ে আসেন। (এই গৃহেই তাঁর পিতা অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন মানিকের অকালমৃত্যু। মানিকের মৃত্যুর দু-বছর পরে আটাশি বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন)।

জুলাই মাসে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড থেকে মুদ্রিত হয় গল্পগ্রন্থ *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* ।

গল্প : 'ডুবুরী' ('ইস্পাত', আষাঢ় ১৩৫৬), সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় বের হয় 'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই', 'অভিধারা'য় 'নেতা'। এছাড়া জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৫৫) 'মৌচাক' পত্রিকায় ছাপা হয় ছোটদের গল্প 'দুআনা আর দুপয়সা'। এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৫৬) 'পরিচয়' পত্রিকায় বেরোয় 'সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি' শীর্ষক নিবন্ধ। ১৮ জুলাই মুক্তি পায় চলচ্চিত্র *পুতুলনাচের ইতিকথা*।

১৯৫০ জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৫৭) 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে 'বক্সা ক্যাম্পে শিল্পীসাহিত্যিক' শীর্ষক নিবন্ধ। ৪ অক্টোবর ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরে 'উপায়' গল্পপাঠ। ১৩ অক্টোবর বরানগরে অনুষ্ঠিত কলকাতার প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন। এ বছর বিশ্বশান্তির পক্ষে স্টকহোম শান্তি আবেদনে স্বাক্ষর প্রদান।

কমিউনিস্টদের ওপর সরকারি পীড়নের তীব্রতা বৃদ্ধির পটভূমিতে, মানিকের কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্টতার কারণে, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও পত্রিকা কর্তৃক তাঁর লেখা ছাপা বন্ধ হয়ে গেলে লেখালেখির আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানিক দারুণ অর্থকষ্টের শিকার হন।

জুলাই মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স বের করে *জীয়ন্ত* উপন্যাস। এ বছর জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে বের হয় *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*, এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির বের করে *মানিক গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ*।

গল্প : আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৫৭) 'অশনি' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'বন্ধু'; সেপ্টেম্বর মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় বের হয় 'উপায়', 'ছাড়পত্রে' 'কালোবাজারের প্রেমের দর', 'সত্যযুগে' 'ভীরু', 'নির্দেশ' পত্রিকায় বের হয় 'অন্ন'। এছাড়া বের হয় 'দুটি যাত্রী' ('সচিত্র বর্ষবাণী')

জানুয়ারি মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার নবপর্যায় প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৯৫১ বছরের শুরু থেকে আর্থিক সংকট যেমন তীব্র হতে থাকে তেমনি বাড়তে থাকে রোগের আক্রমণ।

চারটি উপন্যাস প্রকাশ : বছরের শুরুতে ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে *পেশা* [পূর্বনাম : 'নবীন ডাক্তারবাবু'], জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন) বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে *সোনার চেয়ে দামী* (প্রথম খণ্ড : বেকার), জুনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে *স্বাধীনতার স্বাদ* [পূর্বনাম : 'নগরবাসী'] এবং অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে *ছন্দপতন* [পূর্বনাম : 'কবির জবানবন্দী']।

মে মাসে 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'উপন্যাসের কথা' প্রবন্ধ। 'বসুমতী'তে গল্প 'শারদীয়া' (শারদ ১৩৫৮)।

১৯৫২ আর্থিক সংকট দূর করার প্রচেষ্টা হিসেবে তিন মাসে (মে-জুলাই) অন্তত পাঁচশ টাকা সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে ব্যয় সংকোচ ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য

সংযম সাধনের ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে পারেন নি। অক্টোবর মাসে জে জে প্রোডাকশনের সঙ্গে *পদ্মানদীর মাঝি* চলচ্চিত্রায়ণের চুক্তিপত্র সই। একই মাসে *পদ্মানদীর মাঝির* সুইডিশ অনুবাদের চুক্তি সম্পাদন। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে (ফাল্গুন ১৩৫৮) বের হয় *সোনার চেয়ে দামী* (দ্বিতীয় খণ্ড : আপোষ), আগস্ট মাসে *ইতিকথার পরের কথা* এবং সেপ্টেম্বর মাসে *পাশাপাশি*; একই মাসে ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে ছাপা হয় *সার্বজনীন*। অক্টোবর মাসে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বের হয় *মানিক গ্রন্থাবলী* ২য় খণ্ড।

গল্প : এপ্রিলে *শান্তির স্বাক্ষরে* 'সবার আগে চাই'; মে মাসে 'বসুমতী'তে 'ভোঁতা', 'আগামী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ছোটদের গল্প 'পুরস্কার'; জুন মাসে 'মুখপত্রে' 'গেঁয়ো','পরশমণি'তে ছাপা হয় ছোটদের গল্প 'বিপদ ও বন্ধু'; সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৫৯) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মীমাংসা', 'গল্পভারতী'তে ছাপা হয় 'রূপান্তর', 'অনন্যা' পত্রিকায় 'বিয়ে', 'পরিচয়ে' 'শিল্পী', 'বসুমতী'তে 'কোন দিকে?'; 'গল্প-ভারতী'তে 'মায়া নয়, দায়' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৯)। নভেম্বর-ডিসেম্বরে কিশোর-মাসিক 'অরুণোদয়ে' বের হয় 'শিল্প সাহিত্য 'সৃষ্টি' কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধ। ডিসেম্বরে 'মৌচাকে' ছাপা হয় ছোটদের গল্প 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা'। বীরভূমের 'ডাক' পত্রিকায় বের হয় জনৈক পাঠকের প্রতি ছোটগল্প লেখা সম্পর্কিত নির্দেশনা।

১৯৫৩ অব্যাহত থাকে আর্থিক সংকট ও শারীরিক অসুস্থতা।

জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পাদিত হয় *চিহ্ন* উপন্যাসের চেক অনুবাদের চুক্তি। এ সময়ে প্রকাশিত হয় *পদ্মানদীর মাঝির* সুইডিশ অনুবাদ; অনুবাদক : Viveca Barthel। ৪ এপ্রিল স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে প্রগতি লেখক সংঘ আয়োজিত শোকসভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১১-১৫ এপ্রিল রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম ও শেষ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন। মে মাসে কাশীপুরে গণনাট্য সংঘের সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন। ২৩ জুলাই প্রত্যক্ষ করেন 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের মঞ্চায়ন (নাট্যরূপ : গোপাল চট্টোপাধ্যায়)। সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় খাদ্য আন্দোলন ও ভুখা মিছিলে যোগ দেন। এ বছরেই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে অন্যান্য লেখক-শিল্পীর সঙ্গে সংবর্ধিত হন। *পুতুলনাচের ইতিকথার* গুজরাটি অনুবাদের (*মাটি না মহেল*) জন্য চেতনা প্রকাশনা গৃহ লিমিটেডের ভোগীলাল গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি সই; এ বছরই গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশ; অনুবাদক : শ্রীকান্ত ত্রিবেদী।

এপ্রিল মাসে সাহিত্য জগৎ থেকে বের হয় *নাগপাশ* । মে মাসে ক্যালকাটা বুক ক্লাব থেকে মুদ্রিত হয় *আরোগ্য*। একই মাসে ক্যালকাটা পাবলিশার্স থেকে ছাপা হয় গল্পগ্রন্থ *ফেরিওলা* এবং অক্টোবরে উপন্যাস *তেইশ বছর আগে পরে*। ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে মুদ্রিত হয় *চালচলন*। বছরের শেষ দিকে রিডার্স কর্নার থেকে ছাপা হয় গল্পগ্রন্থ *লাজুকলতা*।

গল্প : এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৬০) 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় বের হয় 'স্টুডিও'; জুলাই মাসে 'মৌচাকে' ছাপা হয় ছোটদের গল্প 'ম্যাজিক', 'মঞ্জরী'তে

'বিচিত্র' ও 'শারদী' পত্রিকায় 'ছোট একটি গল্প'; সেপ্টেম্বর মাসে 'মুখপত্রে' মুদ্রিত হয় 'রত্নাকর', 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকায় 'বিষ', 'গল্প-ভারতী'তে 'অগ্নিশুদ্ধি', 'চতুষ্কোণে' 'রক্ত নোনতা', 'স্বাধীনতা'য় 'সশস্ত্র প্রহরী' ও 'আগামী' পত্রিকায় ছোটদের গল্প 'ঠাকুরমার গোসা'; ডিসেম্বরে 'গল্প-ভারতী'তে 'কলমে-হরফে'। মার্চ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ স্তালিন সংখ্যায় ছাপা হয় 'মহামানব স্তালিন'; জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৬০) 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় বের হয় 'সাহিত্যিকের জীবিকা', যা 'লেখকের সমস্যা' নামে পরে *লেখকের কথা* গ্রন্থে সংকলিত; আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৬০) 'নতুন সাহিত্যে' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' শীর্ষক নিবন্ধ; সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় 'বসুমতী'তে বের হয় 'সাহিত্যের কানমলা' নিবন্ধটি।

১৯৫৪ আর্থিক সংকট, অসুস্থতা ও আসক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়েও বারবার ব্যর্থ হন মানিক। পরাজয়ের বেদনায় হয়ে পড়েন পর্যুদস্ত। মৃগী রোগ ছাড়াও আমাশয় ও যকৃতের রোগ তাঁকে দুর্বল করে ফেলে।

মে মাসে সাহিত্য জগৎ থেকে ছাপা হয় *হরফ* উপন্যাস; অক্টোবর মাসে ডি.এম. লাইব্রেরি বের করে *শুভাশুভ* । প্রকাশিত হয় *পদ্মানদীর মাঝির* চেক অনুবাদ; অনুবাদক : দুসান ঝাভিতেল।

গল্প : আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৬১) 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয় 'ঘাসে কত পুষ্টি'; সেপ্টেম্বর মাসে বের হয় 'রোমাঞ্চকর', 'বসুমতী'তে 'চিন্তাজ্বর', 'ক্রান্তি'তে 'দুর্ঘটনা', 'স্বাধীনতা'য় 'প্রাক্ শারদীয় কাহিনী', 'গল্প-ভারতী'তে 'মতিগতি', 'বন্দেমাতরমে' 'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু', 'মধ্যবিত্তে' 'মাছের লাজ ও মাংসের ঝাঁজ' ও 'যুগান্তরে' 'হাসপাতালে' ।

১৯৫৫ তীব্র আর্থিক সংকট ও চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে তাঁর অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজ ইচ্ছের বিরুদ্ধে, ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভর্তি হন ইসলামিয়া হাসপাতালে। মাসাধিককাল হাসপাতালে থাকার পর চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে যান ২৭ মার্চ তারিখে। শুভানুধ্যায়ীদের শেষ চেষ্টা হিসেবে কড়া নিয়মের মধ্যে চিকিৎসা করানোর জন্য ২০ আগস্ট ভর্তি করা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে। দুমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

মে মাসে রিডার্স কর্নার থেকে বের হয় *পরাধীন প্রেম*।

গল্প : সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় 'অর্চনা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'বিদ্রোহী', 'পরিচয়ে' 'শান্তিলতার কথা' ও অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩৬২) 'বসুমতী'তে বের হয় 'তারপর'।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে বের হয় *হলুদ নদী সবুজ বন*। জুন মাসে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে বেরোয় জীবদ্দশায় শেষ গল্পসংকলন *স্বনির্বাচিত গল্প*। অক্টোবর মাসে সাহিত্য জগৎ থেকে ছাপা হয় জীবদ্দশায় শেষ উপন্যাস ও গ্রন্থ *মাশুল* । গল্প : শারদীয় 'স্বাধীনতা'য় 'খাটাল', 'জন্মভূমি'তে 'জল-মাটি-দুধ-ভাত'।

বছরের শুরু থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিতে আক্রান্ত হন একাধিকবার। এবং ২৫ জুন তারিখে একবার মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। ৩০ নভেম্বর তারিখে হঠাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারান। ২ ডিসেম্বর রাত দশটায় সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) সোমবার ভোর ৪টায় সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওইদিন বিকেল ৪টায় কলকাতায় বের হয় এক বিরাট শোকমিছিল এবং তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় নিমতলা শ্মশানঘাটে।

শোকমিছিল সম্পর্কে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ : 'শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দুপাশে।...

বাংলাদেশটাকে আমি বুঝতে পারি না। হাত বাড়িয়ে বারবার ফুল নিচ্ছিলাম আর অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। দেশের জ্ঞানী, গুণী আর সাধারণ মানুষের এই শোক এই আবেগ যে কত অকৃত্রিম, তা আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝেছি। কাল এমনি সময় অ্যাম্বুলেন্সে বসে বাংলাদেশকে আমি ঘৃণা করেছিলাম। আজ তাকে কী বলব? কাল কাঁদি নি, এখন আমার চোখে জল এল।

হঠাৎ গোপাল হালদার আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। ফুলের ভারে দামি পালঙ্কের একটা পায়ে ফাটল ধরেছে।...'

[সরোজমোহন মিত্র-রচিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য* (১৯৭০) গ্রন্থ, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত *মানিক বিচিত্রা* (১৯৭১) গ্রন্থ, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (প্রথম দে'জ সংস্করণ : [illegible]) গ্রন্থের 'জীবনীপঞ্জি' অংশ, কায়েস আহমেদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে সুশান্ত মজুমদার-সংকলিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনাপঞ্জি' অংশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত এগারো খণ্ডের *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্রের* 'গ্রন্থ-পরিচয়' ও 'জীবনপঞ্জি' অংশের তথ্য এবং ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (২য় সংস্করণ : ২০০১) গ্রন্থের মাহবুবুল হক-সংকলিত 'জীবনপঞ্জি' অংশের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এই জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি]